প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমত কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোন শিক্ষার্থীও এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশকিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ ঃ জুলাই, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক বাংলা (ষষ্ঠ পত্র) **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম : পর্যায় : EBG : 6 : 22

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1-3	অধ্যাপক দিলীপকুমার নন্দী	অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক

পাঠক্রম : পর্যায় : EBG : 6 : 23 (ক)

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1-4	অধ্যাপক দিলীপকুমার নন্দী	অধ্যাপক পুলিন দাশ

পাঠক্রম : পর্যায় : EBG : 6 : 23 (খ)

	রচনা	সম্পাদনা
একক 5-7	অধ্যাপক নীহারকান্তি মণ্ডল	অধ্যাপক দিলীপকুমার নন্দী

পাঠক্রম : পর্যায় : EBG : 6 : 24

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1 & 2	অধ্যাপক নির্মলেন্দু ভৌমিক	অধ্যাপক জীবেন্দুকুমার রায়

পাঠক্রম : পর্যায় : EBG : 6 : 25

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1-4	শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা মজুমদার	অধ্যাপক পুলিন দাশ

পরিমার্জন, প্রুফ-সংশোধন ও পুনঃসম্পাদনা ঃ

ড. অনামিকা দাস, এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, স্কুল অব হিউম্যানিটিস
ড. মননকুমার মণ্ডল, এসোসিয়েট প্রফেসর, স্কুল অব হিউম্যানিটিস

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

E B G – 6

(বাংলা বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম)

পর্যায়

22

একক 81 ❑ নাটক 7–19

একক 82 ❑ দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর নীলদর্পণ 20–96

একক 83 ❑ নীলদর্পণ ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ 97–122

পর্যায়

23(ক)

একক 84 ❑ নাটক ঃ রবীন্দ্রনাথ 125–134

একক 85 ❑ রূপক-সাংকেতিক নাটক ঃ রথের রশি 135–191

একক 86 ❑ গণনাট্য আন্দোলন ঃ নবান্ন — বিজন ভট্টাচার্য 192–292

একক 87 ❑ নবান্ন নাটকের আলোচনা 293–369

পর্যায়

23(খ) নাটক ও মঞ্চ

একক 88 ❑ নাট্যমঞ্চ ঃ দেশি ও বিদেশি 370–389

একক 89 ❑ মঞ্চাভিনয় ঃ বাংলা নাটক 390–411

একক 90 ❑ বাংলা নাট্যাভিনয়ের নবযুগ 412–422

পর্যায়

24

একক 91 ❑ কাব্য ঃ গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য 425–451

একক 92 ❑ নাটক ঃ সাহিত্যের রূপভেদ 452–482

পর্যায়

25

একক 93 ❑ প্রবন্ধ ঃ গুরু প্রবন্ধ ও লঘু প্রবন্ধ 485–495

একক 94 ❑ কথাসাহিত্য ঃ উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস 496–514

একক 95 ❑ আত্মজৈবনিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস ও পত্রোপন্যাস 515–526

একক 96 ❑ কথাসাহিত্য ঃ ছোটগল্প, অতিপ্রাকৃত গল্প, উদ্ভট গল্প এবং সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্প 527–540

একক ৮১ ❐ নাটক

গঠন

৮১.১ উদ্দেশ্য
৮১.২ প্রস্তাবনা
৮১.৩ নাটক ঃ সংজ্ঞা ও লক্ষণ বিচার
৮১.৪ সারাংশ
৮১.৫ অনুশীলনী—১
৮১.৬ নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ
৮১.৭ বাংলা নাটকের আদিযুগ ঃ নাট্যগীত, যাত্রা, কৃষ্ণযাত্রা
৮১.৮ আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা ও বিকাশ ঃ রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু
৮১.৯ সারাংশ
৮১.১০ অনুশীলনী—২
৮১.১১ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১.২)
৮১.১২ গ্রন্থপঞ্জি

৮১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি নাটক, নাটকের সংজ্ঞা, লক্ষণ, নাটকের উদ্ভব-বিকাশ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা অর্জন করতে পারবেন। নাটক পাঠ ও আলোচনায় এটি অপরিহার্য শুধু নয়, নাট্যরস আস্বাদনে এই এককটির গুরুত্ব তাই অপরিসীম। এই এককটিকে পাঠ্য তিনটি নাটক পড়ার ভূমিকারূপে গণ্য করা যেতে পারে।

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- নাটকের সংজ্ঞা ও লক্ষণ জানতে পারবেন।
- সাধারণভাবে নাটকের এবং বাংলা নাটকের উদ্ভব ক্রমবিকাশ সম্পর্কে একটি ধারণা অর্জন করবেন।
- বাংলা নাট্য-সাহিত্য সম্পর্কে অর্জিত প্রাথমিক জ্ঞান থেকে পাঠ্য তিনটি নাটক পড়া সহজ হবে।
- পাঠ্য তিনটি নাটক পড়ার অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি যে কোন বাংলা নাটক পড়ে বুঝতে এবং নিজে নিজে আলোচনা করতে পারবেন।

৮১.২ প্রস্তাবনা

নাটক জীবনের দর্পণ। জীবনকে প্রত্যক্ষত দেখতে, জানতে, বুঝতে নাটকের বিকল্প নেই। দেশ-কাল-সমাজ ও সমাজ-আশ্রিত জীবন নাটকে প্রতিফলিত হয়। নাটক মিশ্রকলা—একাধারে যেমন পাঠ্য আবার অভিনয়েও বটে। প্রাচ্য নাট্যশাস্ত্রী ভরত-এর মতে, নাটক হল সর্ব শাস্ত্র, শিল্প, কর্ম ও বিদ্যার সমন্বয়ে রচিত। নাটক জীবন নিয়ে রচিত। তাই সমাজের জীবনের নানা সমস্যা ও সংকটের শিল্পীত রূপ নাটকে প্রতিফলিত হয়। নাট্যকার শব্দ ও অর্থের সাহচর্যে, তাঁর জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ও অনুভব নাটকে রূপায়িত করে পাঠকের মনোরঞ্জন করেন। নাটকের এটিই অন্বিষ্ট। এই অন্বেষা থেকে নাট্যকার শব্দ ও অর্থের সাহায্যে কল্পনায় অনুভূত জীবন অভিজ্ঞতার একটি বাস্তবসম্মত রূপ প্রদান করেন নাটকে। যেখানে দর্শক-পাঠক দেখতে পান মানব প্রবৃত্তির নানা সংঘাত, প্রতিকূল প্রতিবেশ দৃশ্য অদৃশ্য শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গড়ে ওঠা নিয়ত রহস্যময় একটি চলমান জীবন। এই জীবনকে তুলে ধরতে নাট্যকার তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে নাটকের চরিত্র সৃষ্টি করেন। চরিত্রগুলি তাদের আঙ্গিক-বাচিকাদি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে রূপায়িত করেন। নাটক তখন দেখা, শোনা, হৃদয় দিয়ে অনুভব করার মধ্য দিয়ে শ্রাব্য, দৃশ্য ও কাব্য হয়ে ওঠে। মানুষের জীবনের গভীরতর রসচৈতন্যের সঙ্গে এভাবে যোগ সৃষ্টি হয় নাটকের। তাই নাটকের জন-সমাদর যুগ থেকে যুগাতীত ব্যাপ্ত।

বর্তমান এককে আপনারা নাটককে জানবেন স্বরূপে, তার তত্ত্বে, ইতিহাসে, শিল্পকর্মে ও প্রয়োগে। আঙ্গিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যখন নাটক শ্রাব্য-দৃশ্য ও কাব্য হয়ে ওঠে, জনপ্রিয়তা পায়, তা থেকেই নাট্যসাহিত্যের চাহিদা তৈরী হয়। বাংলা নাটক রচনার প্রেরণা প্রধানত এই চাহিদা থেকেই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশকালের সামাজিক রাজনৈতিক অন্তঃপ্রেরণা। নাটক ক্রমশ হয়ে উঠল মনোরঞ্জন থেকে মননের বিষয়। নাটক ও মঞ্চ এভাবে মধ্য উনিশ শতক থেকে একুশ শতকে পদার্পণ করেছে।

বাংলা সাহিত্যে নাটকের উদ্ভব ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। উদ্ভব লগ্নের দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে বাংলা নাটক যথার্থ অর্থে পদার্পণ করল মধুসূদন দত্তের সীমিত কয়েকটি নাট্যপ্রয়াসের মধ্য দিয়ে। আর তারই সমকালে দেশকালের প্রেক্ষাপটে রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ'। এই নাটকটি বাংলা নাট্য-সাহিত্যে কয়েকটি 'দর্পণ' নাটকের প্রেরণা জুগিয়েছে। কলকাতার সখের নাট্যদল ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে (১৮৭২) এই নাটকটির অভিনয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর নাট্যাভিনয় আর শৌখিন নাট্যদলের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না। কলকাতায় একাধিক পেশাদারী মঞ্চ ও মঞ্চাভিনেতার আবির্ভাব ঘটল। এদের মধ্যে গিরিশচন্দ্রের নাট্যপ্রতিভা স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি একাধারে ছিলেন অভিনেতা, নাট্যশিক্ষক, পরিচালক ও নাট্যকার। মঞ্চের প্রয়োজনে নাটক লেখার আগ্রহও দেখা গেল। অনেক শক্তিশালী নাট্যকারের এ সময় আবির্ভাব ঘটেছে। যেমন—অমৃতলাল বসু, ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথ এই নাট্যপ্রয়াসের ব্যতিক্রম নন। তিনি নানা রসের ও আঙ্গিকের নাটক রচনা করেছেন।

বাংলা সাহিত্যে রূপক-সাংকেতিক নাটকের তিনি অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। তাঁর 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'ডাকঘরের' মত 'রথের রশি' রূপক-সাংকেতিক পর্যায়ভুক্ত।

পরপর দুটি মহাযুদ্ধ বিশ্বসমাজ—রাজনীতিতে নানা আলোড়ন ও রূপান্তর ঘটিয়েছে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়াকে বাস্তবায়িত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা জনমানসের প্রগতি চেতনায় নতুন মাত্রা যুগিয়েছে। শোষণমুক্ত সমাজ নিদেনপক্ষে দারিদ্র্যক্লিষ্ট শ্রমিকের দুঃখ দুর্দশার সহমর্মী হতে এবং তা অপনোদনে প্রেরণা জুগিয়েছে।

মঞ্চে গড়ে উঠেছে প্রগতি নাট্য আন্দোলন—ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। এদের প্রথম বাংলা নাটক দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং ১৩৫০-এর মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন'। পরবর্তীকালে গণনাট্য আন্দোলন ক্রমশ নবনাট্য সৎনাট্য আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে। 'নীলদর্পণ', 'রথের রশি' ও 'নবান্ন'—এই তিনটি নাটক পাঠের মধ্য দিয়ে বাংলা নাট্য সাহিত্যের বিকাশ ও তার সাম্প্রতিক উত্তরাধিকার সম্পর্কে আপনি বর্তমান পত্রে অবহিত হতে পারবেন।

৮১.৩ নাটক ঃ সংজ্ঞা ও লক্ষণ বিচার

সাহিত্যের স্বতন্ত্র একটি শিল্পরূপ হোল নাটক। সাহিত্য জীবনের শিল্প। নাটকও জীবনকে নিয়ে রচিত—জীবনের দর্পণ। নাটকে জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত তার দ্বন্দ্বকে ফুটিয়ে তোলে। নাটকের প্রাণ হল দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বহীন নাটক শিল্প হিসেবে দুর্বল, ব্যর্থ সৃষ্টি।

ইংরেজি ড্রামা (Drama) শব্দের অর্থ অনুকরণাত্মক অভিনয়—এই অর্থে ড্রামার বাংলা প্রতিশব্দ 'নাটক' বহুল প্রচলিত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে 'নাট্য' শব্দের অর্থ ছিল—নৃত্য, গীত ও বাদ্যের সমবায়। পরে এই তিনের সহযোগে অভিনয় অর্থে নাট্য শব্দটির বহুল ব্যবহার ঘটেছে। নাটকে জীবনের প্রতিরূপ প্রতিফলিত হয় বটে কিন্তু তা অনেকটা গতিশীল, চঞ্চল, তরঙ্গাবিক্ষুব্ধ, অশান্ত। ভাষান্তরে বেগচঞ্চল জীবনের শিল্পীত প্রকাশ হোল নাটক।

গ্রীক আলংকারিক অ্যারিস্টটল ট্রাজেডিকে জীবনের 'অনুকরণ' বললেও, বস্তুতঃ নাট্যক্রিয়ার অনুকরণ—অর্থাৎ জীবনের সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতের অনুকরণ। জীবনের এই ঘাত-প্রতিঘাতের সূত্র ধরে নাটকে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার হয়। নাটককে একটি নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে দ্রুত টেনে নিয়ে যায়। নাট্যক্রিয়ায় এই গতিবেগ নাটকের সাফল্যের অন্যতম শর্ত। নাট্যকার কতকগুলি প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিয়ে নাটকে গতিবেগ সঞ্চার করেন। এজন্য নাটকীয় সংঘাত, নাট্যোৎকণ্ঠা, নাট্যশ্লেষ, প্রচ্ছন্নতা, আকস্মিকতা প্রভৃতি নাটকে অবতারণা করা হয়।

নাটকের লক্ষণগুলিকে পরিশেষে দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা—সাধারণ লক্ষণ, যা সাহিত্যের অন্য শাখাতেও বিদ্যমান, আর শুধু নাটকে আছে এমন লক্ষণগুলিকে 'বিশেষ লক্ষণ' বলা যেতে পারে। এগুলি হোল ঃ

(১) সাধারণ লক্ষণ ঃ অনুকরণ, দ্বন্দ্ব, নাট্যমায়া, প্রচ্ছন্নতা, সঙ্গীত, শ্রাব্যত্ব, কাব্যত্ব প্রভৃতি।

(২) বিশেষ লক্ষণ ঃ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, উৎকণ্ঠা, আকস্মিকতা ও শ্লেষ, দৃশ্য-ধর্মিতা, জনসংযোগ প্রভৃতি।

নাটকের গঠনগত দিক থেকে কয়েকটি অঙ্গ আছে। যথা—ঘটনা সংস্থাপন, চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ। নাট্য ঘটনার উদ্ভব-বিকাশ ও পরিণতি বিবর্তন থেকে দেখা যায়। নাট্যকাহিনীর ঘটনাটিতে জটিলতা সৃষ্টি করে, সেই জটিলতামুক্ত নাট্যকারের উদ্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়। কখনো কখনো ঘটনার সঙ্গে উপকাহিনি যুক্ত হতে দেখা যায়। অনুরূপ চরিত্রেরও একটি ক্রমবিকাশ, পরিশেষে পরিণতি লক্ষ করা যায়। নাটকের বাণী ফুটে ওঠে তার সংলাপে। বাহ্যত নাটকের ধারক-বাহক তার সংলাপ। ঘটনা ও চরিত্র সংলাপের সাহায্যেই বিকশিত ও মূর্ত হয়ে ওঠে। তাই সংলাপে একধারে যেমন নাটকীয়তা থাকা দরকার, তেমনি তার একটি সাহিত্যগুণও থাকা প্রয়োজন। শেষোক্তটি নাটককে তার মঞ্চের অভিনয়ের গন্ডি থেকে চিরন্তন সাহিত্যের দরবারে হাজির করে দেয়।

নাটকের বিষয়বস্তু রস-পরিণতি ও উপস্থাপনা রীতি অনুযায়ী নাটকের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। যেমন—পুরাণ ও ইতিহাস অবলম্বনে রচিত পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক নাটক। আবার রসপরিণতি অনুযায়ী—ট্র্যাজেডি, ক্ল্যাসিক্যাল, রোমান্টিক এবং কমেডি, প্রহসন। উপস্থাপনা রীতি অনুসারে বাস্তবধর্মী, রূপক, সাংকেতিক প্রভৃতি।

নাটক পাঠ ও বিচার বিশ্লেষণের সময় পূর্ব আলোচিত প্রসঙ্গগুলি স্মরণে রাখতে হবে।

৮১.4 সারাংশ

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে আপনারা জেনেছেন নাটক জীবনের কথা আলোচনা করে—নাটক জীবনশিল্প। তার একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে। দেশকালের প্রেক্ষাপটে নাটকীয় উপাদান সংগৃহীত হয়। আর অন্যান্য শিল্পকর্মের মত সেই বাস্তবের সেই উপাদানগুলির সাহায্যে নাটকে একটি চিরন্তন সত্যকে তুলে ধরা হয়।

ইংরেজি নাটকের আদর্শে বাংলা নাটক রচনার সূচনা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। ১৮৭২-এ সাধারণ রঙ্গামঞ্চ প্রতিষ্ঠার পর, তার ব্যাপক বিস্তার, স্বদেশী প্রেরণায় তার ক্রম পরিণতি বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাটক ভিন্ন মাত্রা নিয়ে সাহিত্যে-মঞ্চে স্থান করে নেয়। নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের নানা স্তরে রামনারায়ণ, মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব নাট্যসাহিত্যের সমৃদ্ধি ঘটেছে। মহাযুদ্ধের প্রতিক্রিয়া ও মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে বাংলা নাট্যান্দোলন নতুন বাঁক নেয়। গণনাট্য আন্দোলনের সূচনা হয়—যা পরে নবনাট্য, সৎ নাট্য আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছে।

দীনবন্ধু মিত্রের ‘নীলদর্পণ’, রবীন্দ্রনাথের ‘রথের রশি’ ও বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ এই বিবর্তন অনুসরণেই রচিত হয়েছে। নাটককে শ্রাব্য-দৃশ্য-কাব্য বলা হয়। এ দিক থেকে নাটক মিশ্র শিল্প। নাটক জীবনাশ্রয়ী, জীবনের শিল্প। জীবনে সুখ-দুঃখের দোলায় নাটকীয় দ্বন্দ্ব ফুটে ওঠে। দ্বন্দ্ব নাটকের প্রাণ।

সাধারণতঃ বিষয় ও রস-বৈচিত্র্য অনুসারে নাটকের শ্রেণি বিভাজন হয়—পৌরাণিক, ঐতিহাসিক, অথবা ট্র্যাজেডি, কমেডি প্রভৃতি।

নাটক পাঠ ও বিশ্লেষণে এ বিষয়গুলি মনে রাখা প্রয়োজন।

৮১.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। উত্তর করা হলে ১৮-১৯ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১) একক ১ পাঠ করার অন্তত দুটি উদ্দেশ্য বুঝিয়ে দিন।

২) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) নাটক জীবনের ———, (খ) নাটক ——— একাধারে ——— আবার ——— বটে। (গ) ——— তাঁর সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে ——— ——— সৃষ্টি করেন। (ঘ) অ্যারিস্টটল ——— জীবনের ——— বললেও, সে বস্তুত ——— অনুকরণ।

৩)নাটক কাকে বলে? নাটকের প্রধান লক্ষণগুলি কী?

৪) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) বাংলা নাটক রচনার সূচনা—	(১) ১৮২৩
	(২) ১৮৫২
	(৩) ১৮৬০
(খ) 'নীলদর্পণ' নাটক রচয়িতা—	(১) দীনবন্ধু মিত্র
	(২) রামনারায়ণ তর্করত্ন
	(৩) মধুসূদন দত্ত
(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও মন্বন্তরের পটভূমিকায় রচিত 'নবান্ন'	(১) গণনাট্য
	(২) নবনাট্য
	(৩) সৎনাট্য

৫) 'নাট্যশাস্ত্র' গ্রন্থটির রচয়িতা কে? নাট্যশাস্ত্রানুসারে নাটকের সংজ্ঞার্থ কী?

৮১.৬ নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগ

সভ্যতার আদিযুগে মানুষ তার দৈনন্দিন আহার সংগ্রহের অভিযানের কথা, তার অভিজ্ঞতা, তার আনন্দ বেদনার কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে যে আবেগ, ছন্দ ও অভিব্যক্তির সাহায্য নিয়েছে, তা-ই কালক্রমে জন্ম দিয়েছে নাটকের। নাটক কালক্রমে জনচিত্তরঞ্জনের বিশিষ্ট উপাদান হিসেবে পরিচিত হোল—গ্রামে ও ভারতবর্ষে। হাজার বছর ধরে তার জয়যাত্রা চলেছে। নাটক এখন আর শুধু বিনোদনের উপায় নয়,

জীবনের সমস্যা-সঙ্কট, আনন্দ-বেদনা, সংযত আবেগ উচ্ছ্বাস প্রকাশের মাধ্যম। সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের হাতিয়ার। নাটক আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু সে জনজাগরণ ও গণচেতনার উদ্বোধন করে। নাটক বস্তুতঃ জাতির জীবনের প্রতিচ্ছায়া।

প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্যে, বিশেষতঃ ঋগ্বেদের সংবাদ সূক্তে (dialogue hyms) কতকগুলি কথোপকথনাত্মক প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে—এগুলিই সম্ভবত প্রথম নাট্যসাহিত্যের আদিমতম রূপ, ঋক্ ও অথর্ব বেদের সময়ে স্ত্রী-পুরুষরা ভাল পোষাক পরে নাচগান করতেন, উল্লেখ পাওয়া যায়। সামবেদ সংগীত প্রধান—তাই 'সামগান' শব্দটির প্রচলন। আবার বৈদিক কর্মকাণ্ডে অনেক নাটকীয় আচরণের পরিচয় আছে। বিদগ্ধ ভারততত্ত্ববিদরা মনে করেন গ্রীসের সংস্পর্শে আসার পর থেকেই ভারতের নাট্য-সাহিত্য ক্রমশ পরিণতি লাভ করেছে। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষণায় গ্রীক নাটকের অভিনয় হোত, তা থেকেই ধীরে ধীরে ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে তা সংক্রামিত হয়। গ্রীক ও সংস্কৃত নাটকের চরিত্র চিত্রণে অনেক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু ভারতের চিরন্তন বৈশিষ্ট্য হোল—তার স্বকীয় মৌলিকত্বের সাহায্যে তাকে নতুন রূপ দিয়ে একান্ত নিজস্ব করে নেওয়া। ভারতের স্বভাবধর্মে কোন কিছুই আর গ্রীক থাকে নি, ভারতীয় করে নিয়েছে। সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের সূচনা এই সংশ্লেষধর্মীতার মধ্য দিয়ে। শূদ্রক রচিত 'মৃচ্ছকটিক', কালিদাসের 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' প্রভৃতি সংস্কৃত দৃশ্যকাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন।

সংস্কৃত নাটকে সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষারই ব্যবহার আছে। স্ত্রী চরিত্র বাদে উচ্চশ্রেণির কুশীলবরা সংস্কৃত সংলাপ করেন। স্ত্রী চরিত্রসহ অন্যান্য চরিত্র প্রাকৃত ভাষায় কথা বলেন। প্রাকৃত নাটকে এমনটি হয় না। উচ্চ নীচ স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যই প্রাকৃত সংলাপ বিধেয়। এ জাতীয় নাটককে 'সট্টক' বলে। অনুসন্ধানে জানা যায় 'সট্টকে'র ইতিহাস সুপ্রাচীন। রাজশেখর রচিত 'কর্পূর মঞ্জরী' সট্টকের বিশিষ্ট নিদর্শন।

সংস্কৃত নাটকে কালিদাস স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। কিন্তু পূর্ববর্তী কালের অন্যতম নাট্যকার ভাস। ভাস ও কালিদাস উভয়ের নাটকের তুলনায় বিচার করলে দেখা যায়, কালিদাসের নাটকে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা অপেক্ষা ভাসের প্রাকৃতে প্রাচীনত্বের ছাপ বেশি। ভাসের সংস্কৃত সর্বত্র ব্যাকরণসম্মত না হলেও, তাঁর গদ্য রচনা কালিদাসের থেকে সুসংহত ও যথার্থ ব্যঞ্জক। কালিদাস অঙ্কিত রাজসভার বর্ণনা অপেক্ষা ভাস-এর রাজসভার বর্ণনা সরল ও অনাড়ম্বর। সংস্কৃত নাট্য সাহিত্যের অপর প্রতিভাবান শিল্পী শূদ্রক—তাঁর 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের জন্য সবিশেষ খ্যাতি। 'মৃচ্ছকটিক' প্রচলিত ধারার ব্যতিক্রম। মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্য থেকে বিভিন্ন শ্রেণির চরিত্র নির্মাণ করে শূদ্রক অভিনবত্ব শুধু নয়, সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। চারু দত্ত ও নগরনটী বসন্তসেনার প্রেমে জীবনের সহজ সত্যটিকে আবিষ্কার করা যায়। রাজকীয় ঐশ্বর্য, কল্পনা এবং ভোগবিলাসই যে প্রেমের লীলাক্ষেত্র নয়, প্রেম বস্তুতঃ জীবনাশ্রয়ী, তার একটি বাস্তব দিক আছে। বহুমুখীনতা ও বৈচিত্র্য মানবচরিত্রের বৈশিষ্ট্য—এই পরম সত্যটি শূদ্রক প্রথম তুলে ধরেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যে যা একান্তই অভাবনীয়। অন্যান্য সংস্কৃত নাটক প্রসঙ্গ বহু আলোচিত, এক্ষেত্রে তা বাহুল্য মাত্র।

৮১.৭ বাংলা নাটকের আদিযুগ ঃ নাট্যগীত, যাত্রা, কৃয়যাত্রা

সংস্কৃত নাটকের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গে বাংলা ও বাঙালির কোনো সময়েই গভীর যোগ ছিল না। বাংলা নাটকের সূচনা বিলিতী থিয়েটারের অনুকরণ প্রয়াস থেকে। তথাপি বাঙালি জনসাধারণ যে বিশিষ্ট অভিনয় শিল্পে সেকালে তৃপ্তবোধ করেছে, তার নাম 'যাত্রা'। যাত্রা বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে বুঝতে যাত্রার আলোচনা এসে পড়ে ইংরেজি ও সংস্কৃত নাটকের মত বাংলা নাটকে যাত্রা ও নাট্যগীতের সবিশেষ প্রভাব আছে। উনিশ শতকে যখন বাংলা নাটক সৃষ্টি হচ্ছে, সে সময় যাত্রা খুবই সক্রিয় ছিল। অদ্যাবধি বাংলার গ্রাম ও শিল্পাঞ্চলের মানুষ তাদের নাট্যরস পিপাসা চরিতার্থ করে যাত্রাপালা অভিনয় দেখে। ব্যয়সাপেক্ষ আধুনিক প্রসেনিয়াম থিয়েটারের শিল্পিত অভিনয়ের ভাষা ও উপস্থাপনার আবেদন সেখানে সীমিত। প্রাচীন যাত্রার প্রত্যক্ষ পরিচয় একাল পর্যন্ত এসে পৌঁছয় নি।

বাঙালি জনমানসে যে যাত্রার প্রভাব আজও ব্যপ্ত, তার উদ্ভবের ইতিহাস কুয়াশাচ্ছন্ন। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকে যে যাত্রাগানের প্রচলন ছিল বলে জানা যায় তার কোন লিখিত রূপ আজ আর পাওয়া যায় না।

আধুনিক নাট্যশিল্পের অনেক কাছের জিনিস বাংলা লোকনাট্য। গ্রামীণ লোকসমাজে এর উদ্ভব ও সমাদর। লোকনাট্যের মধ্যে রচয়িতার কল্পনা শক্তির পরিবর্তে ঐতিহ্যসম্পন্ন কাহিনিই এর অবলম্বন হোত। স্থানীয় অধিবাসীদের আদিম বীরত্ব কাহিনী অবলম্বনে গীতপালা গড়ে তোলা হোত। পরবর্তী কালের সমাজ, ধর্ম, সামাজিক আদর্শ প্রভৃতি এর সঙ্গে যুক্ত হলেও, আদিম সংস্কারগুলি মূল কাহিনি থেকে হারিয়ে যেত না। লোকনাট্যে অঞ্চল বিশেষের প্রকৃতি ও জীবনের ছবি যেমন ফুটে ওঠে, সেই সঙ্গে আঞ্চলিক সংগীত ও নৃত্যেরও প্রভাব থাকে। পৃথিবীর সর্বত্র আঞ্চলিক সংগীত ও নৃত্য থেকেই লোকনাট্যের উদ্ভব ঘটেছে। এ সব ক্ষেত্রে আদিম সমাজে প্রচলিত নৃত্য ও গীতের প্রভাব অনেকাংশে থেকে যায়। এঁদের বাদ্যযন্ত্রে চামড়ার বাজনা, সঙ্গে বাঁশি, শিঙার ব্যাপক প্রচলন থাকে। লোকনাট্যের সংলাপ সুরেলা ও আবৃত্তিধর্মী, ভাষায় আঞ্চলিকতা অবশ্যম্ভাবী হলেও কবিত্ব বা অলঙ্কার থাকে না। এর বিষয়বস্তু সাধারণতঃ ধর্মমূলক। এখানে মানুষের থেকে দেবদেবীর মহিমাই প্রাধান্য পায়। ধর্ম-অধর্ম, পাপপুণ্য, নীতি-দুর্নীতির দ্বন্দ্বে অশুভশক্তির পরাজয় ঘটে। লোকনাট্য তাই লোকশিক্ষার বাহন।

নাট্যগীতও বহুদিন থেকে লোকশিক্ষায় ও লোকরঞ্জনের অন্যতম শক্তিশালী বাহন। জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত পদাবলী 'শ্রী গীতগোবিন্দম্' নাট্যগীতের উজ্জ্বলতম নিদর্শন। চর্যাপদে বুদ্ধ নাটকের কথা আছে—'বুদ্ধ নাটক বিসমা হোই', পদাবলী কীর্তনে পদকর্তা দোহার সঙ্গে নিয়ে গান করেন। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' পাত্র-পাত্রীর সংলাপে যখন তাল-লয় যোগে গাইতে দেখা যায়, তা বাস্তবে প্রাচীন যাত্রাপালার গান ছাড়া আর কিছু নয়। এ থেকে আখড়াযুক্ত কীর্তনের সঙ্গে প্রাচীন যাত্রার নিকট সম্বন্ধ অনুমান করা সম্ভব। পরবর্তীকালে কৃষ্ণকে নিয়ে রচিত এ ধরনের গান কৃয়যাত্রা নামে পরিচিত হয়েছে। যাত্রার ধর্ম ও সঙ্গীত বাহুল্য থাকলেও, সেখানে নাটকের প্রাণ যে মানবিক দ্বন্দ্ব, তা থাকে না। ধর্ম-

অধর্ম, পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ দেবলীলা মাহাত্ম্য বর্ণনা প্রাচীন যাত্রা বা নাট্যগীতের বিষয়। হাস্যরস পরিবেশনের জন্য স্থূল ভাঁড় চরিত্র ও আপ্তবাক্য শোনাবার জন্য বিবেক জাতীয় চরিত্র যাত্রায় অপরিহার্য।

এই জাতীয় অভিনয় পরিবেশিত হোত দর্শক পরিবেষ্টিত খোলা আসরে। গায়ক, অভিনেতা, বাদ্যযন্ত্রী ও অন্যান্য সহযোগী এবং দর্শক সকলেই আসরে বসে অভিনয় উপভোগ করেন। অপরিমার্জিত, নিরক্ষর দর্শক শ্রোতাকে আকৃষ্ট করতে একটু বেশি অঙ্গ-সঞ্চালন, তীব্র কণ্ঠস্বর ও আবেগ প্রকাশ করা প্রয়োজন হোত। সুরেলা আবৃত্তিমূলক সংলাপ উচ্চারণ শ্রোতাদের মনোরঞ্জক হোত।

যাত্রাপালা, লোককাব্য বা নাট্যগীত বাংলার লোকজীবনকে যে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেছিল, তার পরিচয় আজও পাওয়া যায়, শিব, চণ্ডী, মনসাকে কেন্দ্র করে নৃত্য গীতাভিনয়ের প্রচলন দেখে। বনবিবি, দক্ষিণ রায় প্রভৃতি আধুনিক লৌকিক দেবদেবীর পালাগানও অনেক পাওয়া যায়।

যাত্রার জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও উনিশ শতকের যাত্রার উন্মুক্ত প্রাঙ্গন ছেড়ে অভিনয় কলা প্রথমে কলকাতা অভিজাত প্রাঙ্গনে, পরে প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে আশ্রয় পেয়েছে। বাংলা নাটক রচনার চাহিদা এ সময় থেকে গভীরভাবে অনুভূত হোল। বিদ্যাসুন্দর পালা সাময়িক প্রয়োজন মেটালেও মঞ্চের প্রয়োজন বাস্তব জীবনের সমস্যা-সঙ্কট নিয়ে লেখা নাটকের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। সে স্বতন্ত্র ইতিহাস। তবে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে নাটকের জয়যাত্রার সূচনা হলেও, যাত্রা হারিয়ে যায় নি। বাঙালির যাত্রার সংস্কার থিয়েটারের অভিনয় বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করেছে। ঠিক তেমনি থিয়েটারও যাত্রাকে প্রভাবিত করেছে। এই আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে অভিনয় কলা নিত্যনতুনভাবে নিজেকে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করছে।

৮১.৮ আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা ও বিকাশ ঃ রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু

পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মধ্য দিয়ে বাঙালি বিদ্বৎজনের ইংরেজি নাট্য সাহিত্য, বিশেষতঃ সেক্স্পীয়রের নাটকের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটে। তদুপরি কোলকাতার বিলাতি থিয়েটারে পাশ্চাত্য নাটকের অভিনয় নাটক রচনায় / অনুবাদে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাঙালি যথার্থ অর্থে নাটকের সঙ্গে পূর্বে ঘনিষ্ঠ না হলেও সদৃশ শিল্প—যাত্রা, লোকনাট্য ও নাট্যগীতের সঙ্গে পরিচিত ছিল। বাঙালি মানসে এর অন্তঃপ্রেরণাটি কাজ করে থাকবে। বস্তুতঃ বাংলা নাটক ইংরেজি নাট্যসাহিত্য ও নাট্যকলার অনুকরণ প্রয়াসী হলেও, সম্পূর্ণত দেশজ লোকায়ত শিল্পকলার প্রভাব অনেকদিন কাটিয়ে উঠতে পারেনি। ফলে, একালের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারদের রচনার বহু জায়গায় যাত্রাপালা বা নাট্যগীতের প্রভাব দেখা যায়।

আধুনিক বাংলা নাটকের সূচনা ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে। পূর্বে কয়েকটি সংস্কৃত নাটক অনুবাদের পাশাপাশি অন্তত দুটি মৌলিক নাটক রচিত হয়। অনূদিত সংস্কৃত প্রহসন/নাটক হাস্যার্নব (১৮২২) প্রবোধচন্দ্রোদয়, শকুন্তলা, রত্নাবলী প্রভৃতি। তারাচরণ শিকদারের 'ভদ্রার্জুন' ও জি. সি. গুপ্তের 'কীর্তিবিলাস' দুটি মৌলিক নাটকের প্রকাশ ১৮৫২। মহাভারতের অর্জুন-সুভদ্রা বিবাহ ঘটনা অবলম্বনে রোমান্টিক কমেডি ধরনের রচনা 'ভদ্রার্জুন', রূপকথার, শীত বসন্ত জাতীয় কাহিনী অবলম্বনে 'কীর্তিবিলাস' য়ুরোপীয় ধরনের ট্রাজেডী রচনার ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। এতৎসত্ত্বেও প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে নাটক দুটির ঐতিহাসিক মূল্য

স্বীকার করতে হয়। বিচিত্র বিষয় ভাবনা নিয়ে কতকগুলি নাটক রচিত হয়, যেমন—সেক্স্‌পীয়রের অনুসরণে হরচন্দ্র ঘোষের 'ভানুমতী চিত্ত বিলাস' (১৮৫২), কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বাবু নাটক' (১৮৫৪), উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবাবিবাহ নাটক' (১৮৫৬) প্রভৃতি। কিন্তু এ পর্বের অন্যতম খ্যাতিমান নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন। অনেকে এঁকে বাংলার প্রথম নাট্যকার রূপে অভিহিত করেন। কারণ তাঁর প্রথম নাটক 'কুলীনকুলসর্বস্ব' (১৮৫৪), বাংলার কতকগুলি সামাজিক সমস্যা তিনি যেভাবে চিত্রিত করেছেন তা পূর্বে দেখা যায় নি। *নাটকটিতে তিনি কৌলীন্যপ্রথার কুফলগুলি লঘু হাস্য পরিহাসের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করে বাংলা নাট্যসাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছেন। রামনারায়ণ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক, ইংরিজির সঙ্গে তাঁর বিশেষ পরিচয় ছিল না। তাই তার প্রধান বিচরণ ক্ষেত্র হয়েছে পুরাণমিশ্রিত সংস্কৃত নাটকের অনুবাদ। 'বেণীসংহার' (১৮৫৬), 'রত্নাবলী' (১৮৫৮), 'মালতীমাধব' (১৮৬৭), 'রুক্মিণীহরণ' (১৮৭১) প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য নাট্যানুবাদ। অনুবাদগুলি পুরনো আদর্শ ও বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত হলেও, মধুসূদনপূর্ব বাঙালী জনসাধারণের রুচিকে নাট্যাভিনয়ের দিকে আকৃষ্ট করতে পেরেছিল।

নবজাগৃতির মর্মসত্য আপন সত্তার মধ্যে আত্মস্থ করে যুগন্ধর মধুসূদন বাংলা কাব্যে ও নাটকে আধুনিকতার সূচনা করেন। নাট্য সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব অনেকটা আকস্মিক। বেলগাছিয়ায় মঞ্চে অভিনয় সূত্রে রামনারায়ণের 'রত্নাবলী' ইংরেজিতে অনুবাদ ও দুর্বল অভিনয় দেখে মধুসূদন নাটকের শিল্পরূপ বাংলা সাহিত্যে তুলে ধরতে প্রয়াসী হলেন। রচিত হল 'শর্মিষ্ঠা' (১৮৫৯)। নাটকটি মহাভারতের শর্মিষ্ঠা-দেবযানী-যযাতি উপাখ্যান আশ্রয়ে সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য নাট্যশৈলী অনুসরণে রচিত। মধুসূদন বিশ্বাস করতেন নাটকের উপজীব্য হোল ঃ Stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment. শর্মিষ্ঠার ঘটনাপ্রবাহ এদিক থেকে যথাযথ নাট্যরস সঞ্চারিত করতে পারেনি। তাঁর 'পদ্মাবতী' (১৮৬০) আখ্যান, চরিত্র, সংলাপ ও নাটকীয়তার দিক থেকে অনেকটা স্বাভাবিক। 'পদ্মাবতী'র কাহিনী গ্রীক পুরাণাশ্রয়ী হলেও গল্পটিকে মধুসূদন সুকৌশলে ভারতীয় জীবনাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' (১৮৬১) ইতিহাসাশ্রিত কাহিনী টডের 'রাজস্থান' থেকে সংগৃহীত। য়ুরোপীয় নাট্যরীতির আদর্শে রচিত। এই নাটকের পটভূমিতে রাজ্যের ভাঙা-গড়া, ব্যক্তি চরিত্রের পাঠ্য, চাতুর্য, অর্থলোভ, কামনা-বাসনা, অর্ধস্ফুট স্নিগ্ধপ্রেম প্রভৃতি বিচিত্র প্রকৃতির আলোড়ন ফুটে উঠেছে। কৃষ্ণার আত্মহত্যা ট্রাজেডির মর্মগূঢ় তীব্রতাকে ফুটিয়ে তুলেছে। মধুসূদন এই নাটকে গ্রীক অদৃষ্টবাদকে জয়ী করেছেন।

মধুসূদন দু'খানি প্রহসন লিখেছিলেন—'একেই কি বলে সভ্যতা' ও 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'। এ দুটি অদ্যাবধি বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ প্রহসনের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী। প্রহসন দুটি সংস্কৃত প্রহসন ও প্রকরণের অনুসারী নয়। এতে মধুসূদনের সমাজ বাস্তবতা বোধের পরিচয় আছে। প্রথমোক্তটিতে

———————————

* পাদটীকা—বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ রহিত হওয়া সংক্রান্ত পুস্তিকা তখনও প্রকাশিত হয়নি। পুস্তিকাদুটি ১৮৭১ ও ১৮৭৩ এ প্রকাশের পর বহুবিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল।

নব্যপন্থীদের উল্লাস-উদ্বেলতার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খলতা এবং শেষোক্ত প্রাচীনপন্থীদের অতি বর্বরতা বর্ণিত হয়েছে। নাট্যকার প্রহসনের চরিত্রগুলি অল্প পরিসরে অত্যন্ত জীবন্ত করে এঁকেছেন। এঁদের মুখের সংলাপে চলিত ভাষা ব্যবহার করায় চরিত্রগুলি প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে।

নবযুগের শিল্পভাবনায় উদ্বুদ্ধ মধুসূদন তাঁর বৈদগ্ধ্যে, মননে সংস্কৃত ও ইংরিজি নাট্যধারার পার্থক্য উপলব্ধি করে ইংরেজি নাট্যাদর্শ অনুসরণে প্রয়াসী হয়েছেন।

তিনি স্বকীয় প্রতিভায় বাংলা সাহিত্যের পরিধিকে ব্যাপ্ত ও সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁর নাটক পূর্বসুরীদের তুলনায় বিস্ময়কর সমুন্নতির অধিকারী। তিনি প্রহসনে নব্য সমাজ ও গণজীবনের যে রূপ চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ রচনার মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন তা দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' সহ কয়েকটি লঘু নাট্য রচনার প্রেরণা মনে করা যেতে পারে।

সমাজ বাস্তবতা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, মানুষের সম্বন্ধে একান্ত মমত্ববোধ, জগৎ ও জীবনের প্রতি প্রসন্ন রসদৃষ্টি প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের যে বৈশিষ্ট্য, তার অনেকগুলিই দীনবন্ধু মিত্রের ছিল। এ দেশের নাট্য ঐতিহ্যের ব্যাপকতা না থাকায়, ব্যক্তিগত জীবনে ইংরেজি নাট্যশৈলীর সম্যক অনুশীলনের অভাবে শিল্পগতভাবে সর্বত্র সফল নন। দীনবন্ধুর শিল্পবোধের কেন্দ্রে ছিল বস্তুনিষ্ঠা। তিনি বাস্তববাদী শিল্পী। তিনি ছিলেন তাঁর সময়ের ভাষ্যকার।

দীনবন্ধুর প্রথম নাটক 'নীলদর্পণ' (১৮৬০)। নীলকর কর্তৃক নীলচাষীদের সীমাহীন দুঃখ দুর্দশার মর্মান্তিক কাহিনী। ২৪ পরগণা, নদীয়া, যশোহরের সাধারণ প্রজা ও সম্পন্ন গৃহস্থ নীলকরদের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে, সংঘবদ্ধ হয়ে নীলকরদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করেছিলেন, তারই বাস্তব প্রেক্ষাপটে দীনবন্ধু 'নীলদর্পণ' নাটক রচনা করেছেন। নাটকটিতে তৎকালীন পল্লীজীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য অত্যাচার পীড়নের বাস্তব চিত্র পাওয়া যায় তা বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। জনজীবনের আশ্চর্য বাস্তব জীবনালেখ্য নাটকটিতে এমন সত্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছিল যে, অভিনয়ের দিক থেকে নাটকটি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। কিন্তু 'সাহিত্য' হিসেবে নীলদর্পণ যথার্থ সফল ও ত্রুটিমুক্ত নয়। কারুণ্য সঞ্চারের জন্য একাধিক মৃত্যুদৃশ্যের অবতারণা নাটকীয় রসসৃষ্টিতে অন্তরায় হয়েছে। ভদ্র চরিত্রগুলি কৃত্রিম ও ব্যর্থ সৃষ্টি। কিন্তু ভদ্রেতর চরিত্র ও তাদের সংলাপ, আচরণ বাস্তবসম্মত ও অনেকাংশে সার্থক।

'নীলদর্পণের' পরে রচিত দুটি নাটক—'নবীন তপস্বিনী' (১৮৬৩) ও 'কমলে কামিনী' (১৮৭৩) রোমান্টিক প্রেমোপাখ্যান, প্রাণহীন ও দুর্বল রচনা। 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) ও 'জামাই বারিক' (১৮৭২) দুখানি প্রহসন বৃদ্ধের বিবাহ ও 'ঘরজামাই' থাকার বিড়ম্বনার চিত্র হাসি-ঠাট্টা ও ব্যঙ্গাবিদ্রূপের মধ্য দিয়ে বর্ণিত হয়েছে। 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রহসনটি দীনবন্ধুর কালজয়ী রচনা। এর কাহিনী ঘননিবদ্ধ নয়। এই প্রহসনের বক্তব্য বিষয়কে ছাপিয়ে উঠেছে অসামান্য কতগুলি চরিত্র চিত্রণ। নিমচাঁদ, অটল, কেনারাম, ডেপুটি প্রভৃতি প্রত্যেকটি চরিত্রই নাট্যকারের অনন্য সৃষ্টি, স্বীকার করতে হয়। প্রহসনের সংলাপ রচনায়, ভাষা শৈলীতে দীনবন্ধু অনেক সাফল্য অর্জন করেছেন। অপর দিকে 'নীলদর্পণ' বাংলা নাট্য সাহিত্যে প্রথম নাটক, যার প্রচার দেশের সামাজিক রাজনৈতিক পটভূমিকায় যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করেছিল।

বাঙলা নাটকের এই প্রেক্ষাপট স্মরণে রেখে আপনাকে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটক পড়তে হবে। দেশকালের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিত একাধারে যেমন তাঁকে নাটক রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে, তেমনি তিনি কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। কারণ বিশেষ স্মরণীয় বাংলা নাটকের এ সময়ে অভাব ছিল। অধিকন্তু নাটক রচনার উপযুক্ত আদর্শ বাংলা গদ্য পদ্য ভাষার অনুপস্থিতি ও সীমাবদ্ধতা নিয়েও দীনবন্ধু অপটু হাতে তাঁর প্রথম নাটকটি লিখেছিলেন। স্বভাবতই তাঁর রচনার মধ্যে অনেক দুর্বলতা থাকা অসম্ভব নয়। তথাপি দেশের দরিদ্র মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতি সীমাহীন মমতায় তাদের সমস্যা তুলে ধরবার গুরুভার তিনি তুলে নিয়েছিলেন বলেই তিনি আজও স্মরণীয় হয়ে আছেন। আপনি পরবর্তী দুটি এককে এ সম্পর্কে আরও বিস্তৃতভাবে জানবেন।

৮১.৯ সারাংশ

ষোড়শ সপ্তদশ শতকে লৌকিক দেবদেবীকে নিয়ে রচিত পাঁচালী, নাচগানের মাধ্যমে দেবোপাসনার উদ্দেশ্য রচিত মঙ্গলগান ক্রমশ পরিবর্তিত হয়ে নাট্যনীতি অষ্টাদশ শতকে এসে ভিন্নতর নামরূপ পেল। কবিগান এবং সংগীত বহুল লোকাভিনয়ের নাম হল যাত্রা। নব্য শিক্ষিত বাঙালির রুচি যাত্রার পরিবর্তে ইংরেজি মঞ্চাভিনয়ের প্রেরণায় ইংরেজি নাট্যাদর্শে রচিত বাংলা নাটকের, প্রতি আকৃষ্ট হল। সূত্রপাত ঘটল বাংলা নাটক রচনার। লেবেডফ এদিকে পথ দেখিয়েছিলেন। বাংলা গদ্যের অনুশীলনপর্ব শেষে জি সি গুপ্ত, তারাচরণ শিকদার যথাক্রমে 'কীর্তিবিলাস' ও 'ভদ্রার্জুন' নাটক লিখলেন। পরের বছর হরচন্দ্র ঘোষ সেক্সপীয়রের একটি নাটক অনুবাদ করলেন। নাটক রচনার এই সূচনা পর্বে 'কুলীনকুলসর্বস্ব' নাটক নিয়ে আবির্ভাব ঘটল রামনারায়ণ তর্করত্নের। সমাজের বাস্তব সমস্যা যেভাবে তিনি নাটকটিতে তুলে ধরলেন, তা আগে কখনও দেখা যায়নি। সংস্কৃতজ্ঞ রামনারায়ণ কতকগুলি সংস্কৃত নাটক অনুবাদ ছাড়াও পুরাণাশ্রিত মৌলিক নাটক ও সামাজিক সমস্যামূলক নাটক রচনা করেছিলেন। শৌখিন রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হওয়ায় তিনি নাট্যকার হিসেবে জনপ্রিয়তা অর্জন করে 'নাটুকে' রামনারায়ণ নামে খ্যাত হয়েছেন।

প্রাক্-মধুসূদন পর্বের বাংলা নাটক যাত্রারীতিকে বহন করলেও সর্বতোভাবে ইংরেজী রীতি আশ্রয় করতে পারে নি। সংস্কৃত নাট্যাদর্শের অনুসরণ বেশি, যদিও ক্বচিৎ ইংরেজি রীতি অনুকরণের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

'শর্মিষ্ঠা' নাটক নিয়ে নাট্যকার মধুসূদনের যাত্রা শুরু। এর গঠনে সংস্কৃত নাটকের প্রভাব প্রবলতর। পদ্মাবতীতেও তাই। এর কাহিনি গ্রীক পুরাণ থেকে নেওয়া। দুটি প্রহসন ও 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে ইংরেজি আদর্শের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন। প্রহসনের ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ব্যাঙ্গাত্মক উপস্থাপনা আজও অনন্য। ইতিহাসাশ্রিত কৃষ্ণকুমারী নারীচরিত্র সৃষ্টি ও বিয়োগান্তক নাট্যরস সৃষ্টিতে সফল।

দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' বাংলার সামাজিক রাজনৈতিক ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। নাটকটি ইংরেজি রীতি অনুসরণে রচিত হলেও শিল্প সৌকর্যে দুর্বল। দরিদ্র শ্রেণির সংলাপ বাস্তবানুগ হলেও, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবারের সংলাপে সংস্কৃতানুগ্য সংলাপ রচনায় লেখকের দ্বিধাগ্রস্ততার পরিচয়

আছে। কয়েকটি রোমান্টিক নাটক লিখেছেন যেগুলি সার্থক নয়। ব্যঙ্গরসে স্থূলতা সত্ত্বেও ব্যাঙ্গাত্মক প্রহসনগুলিতে বিশিষ্টতা আছে। সমাজের নিচু স্তরের মানুষদের চরিত্রায়ণে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৮১.১০ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর করা হয়ে গেলে ১৯ পৃষ্ঠায় উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় প্রাসঙ্গিক মূলপাঠ আবার পড়ে উত্তর ঠিক করুন।

(১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

ক) নাটক আনন্দ দেয় বটে, কিন্তু যে ——— ও ——— উদ্বোধন করে।

খ) নাটক জাতির —— ——।

গ) ব্যয়সাপেক্ষ আধুনিক —— থিয়েটারের —— অভিনয়ের —— ও —— আবেদন সেখানে সীমিত।

ঘ) বাংলা নাটক ইংরেজি ——— ও ——— অনুকরণ প্রয়াসী হলেও সম্পূর্ণ —— —— শিল্পকলার প্রভাব কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

ঙ) হরচন্দ্র ঘোষের নাটকের নাম—
এবং উমেশচন্দ্র মিত্রের নাটক।

২) নাটক একমতে 'চিত্ত রঞ্জনের উপাদান', অপর মতে 'জীবনের সমস্যা-সঙ্কট প্রকাশের' মাধ্যম, অন্যমতে 'সংগ্রামের হাতিয়ার'—তিনটি মত বিচার করে আপনার বক্তব্য সংক্ষেপে লিখুন।

৩) 'ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্যে নাটকের আদিমতম রূপের উল্লেখ আছে।'—মন্তব্যটির যৌক্তিকতা বুঝিয়ে দিন।

৪) সংস্কৃত নাটকের তিনজন প্রধান নাট্যকারের নাম উল্লেখ করুন।

৫) শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের মূল বক্তব্য উল্লেখ করুন।

৬) 'লোকনাট্য' কাকে বলে? বাংলা লোকনাট্যের বিষয়বস্তু ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭) 'যাত্রাভিনয়' সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করে যাত্রা ও থিয়েটারের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

৮) মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন।

৯) 'দীনবন্ধু মিত্রের মধ্যে নাট্যকারের অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল'—নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

৮১.১১ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১, ২)

অনুশীলনী—১

১) (ক) এককটি পাঠ করে নাটকের সংজ্ঞা ও লক্ষণ জানা যায়।

(খ) বাংলা নাটকের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে জানা যায়।

২) (ক) দর্পণ, (খ) মিশ্রকলা, পাঠ্য, অভিনেয়।
(গ) নাট্যকার, পাঠ করে, চরিত্র।
(ঘ) ট্র্যাজেডিকে, অনুকরণ, নাট্যক্রিয়ার।

৩) নাটকের সংজ্ঞা ও লক্ষণ (১.৩) অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

৪) (ক) ১৮৫২, (খ) দীনবন্ধু মিত্র, (গ) গণনাট্য।

৫) নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থের রচয়িতা 'ভরতমুনি'।
নাট্য শাস্ত্রানুসারে নাট্য শব্দের অর্থ নৃত্য, গীত ও বাদ্য-এর সমবায়। পরে এই তিনের সহযোগে অভিনয় অর্থে নাট্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী—২

১) (ক) জনজাগরণ, গণচেতনার
(খ) জীবনের, প্রতিচ্ছায়া
(গ) প্রসেনিয়ম, শিল্পিত, ভাষা, উপস্থাপনার
(ঘ) নাট্য সাহিত্য, নাট্যকলার, দেশজ, লোকায়ত
(ঙ) ভানুমতীচিত্তবিলাস, বিধবাবিবাহ নাটক

২) ১.৬ অংশে 'নাটকের উদ্ভব ও বিকাশ' পর্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা আছে। ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

৩) ১.৬ অংশে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে প্রাসঙ্গিক আলোচনার সাহায্যে উত্তর করুন।

৪) শূদ্রক, কালিদাস, ভবভূতি

৫) ১.৬ অংশের শেষ অনুচ্ছেদের সাহায্যে উত্তর তৈরী করুন।

৬) ১.৭ অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদ অবলম্বনে উত্তর করুন।

৭) ১.৭ অংশের শেষ চারটি অনুচ্ছেদের সাহায্যে উত্তর লিখুন।

৮) ১.৮ অংশের তৃতীয় অনুচ্ছেদ পড়ে উত্তর করুন।

৮১.১২ গ্রন্থপঞ্জি

১) ড. অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।
২) ড. ক্ষেত্র গুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস।
৩) ড. অজিত ঘোষ—বাংলা নাটকের ইতিহাস।
৪) ড. বৈদ্যনাথ শীল—বাংলা সাহিত্যে নাটকের ধারা।

একক ৮২ ❑ দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর নীলদর্পণ

গঠন

৮২.১উদ্দেশ্য

৮২.২প্রস্তাবনা

৮২.৩দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর 'নীলদর্পণ'

৮২.৪সারাংশ

৮২.৫অনুশীলনী—১

৮২.৬নীলদর্পণ মূলপাঠ—১

৮২.৭সারাংশ

৮২.৮প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮২.৯মূলপাঠ—২ (নীলদর্পণ)

৮২.১০ সারাংশ

৮২.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮২.১২ মূলপাঠ—৩

৮২.১৩ সারাংশ

৮২.১৪ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮২.১৫ মূলপাঠ—৪ (নীলদর্পণ)

৮২.১৬ সারাংশ

৮২.১৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮২.১৮ নীলদর্পণ মূলপাঠ—৫

৮২.১৯ সারাংশ

৮২.২০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

৮২.২১ অনুশীলনী—২

৮২.২২ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১.২)

৮২.২৩ গ্রন্থপঞ্জি

৮২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- উনিশ শতকের এমন একটি নাটকের পরিচয় পাবেন যা সমকালীন দেশকালের পরিচয় তুলে ধরেছে।
- নাটকটি পাঠ করে আপনি উনিশ শতকের মধ্যভাগে নীলকরদের অত্যাচার এবং পরিণতিতে নীল বিদ্রোহের পরিচয় পাবেন।
- পঠিত নাটকটি সমকালে অনুরূপ কয়েকটি নাটক রচনার প্রেরণা জুগিয়েছে।
- নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের এমন একটি নাটকের সঙ্গে আপনি পরিচিত হবেন, যেটি তাঁর প্রথম নাটক রচনা হলেও, বিষয়বস্তু ও উপস্থাপনায় শুধু অভিনব নয়, যুগান্তকারী।
- নাটকটি পাঠ করে আপনি নাট্যকারের কৃতির পরিচয় পাবেন। লক্ষ করবেন, একটি সমসাময়িক ঘটনাকে চিরন্তন বন্ধনে আবদ্ধ করতে হলে, তাকে কেমনভাবে একটি শাশ্বত জীবন-সমস্যা বা অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে যুক্ত করে দিতে হয়—যা চিরন্তন সর্ব দেশে ও কালে এবং অপরিবর্তনীয়।

৮২.২ প্রস্তাবনা

এই পর্যায়ের প্রথম এককটিতে আপনি নাটক, নাটকের উৎস ও আদিযুগের কয়েকজন নাট্যকারের সাধারণ পরিচয় জেনেছেন। বর্তমান এককে আপনি দীনবন্ধু মিত্রের এমন একটি নাটকের সঙ্গে পরিচিত হবেন, যে নাটক শিল্পগুণে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ না হলেও দেশের সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহকে বিষয়বস্তু করে পরিবেশন করা হয়েছে। একসময় উদ্ভিজ্জ উপাদান থেকে নীল রং তৈরী প্রচলন ছিল। এদেশে নীলের আবাদ ও নীল রং তৈরী করা লাভজনক হওয়ায় নীলকররা জমির মালিক ও কৃষকদের বলপূর্বক দাদন দিয়ে, ফসলের প্রাপ্য মূল্য থেকে শুধু বঞ্চিতই নয়, নানারকম উৎপীড়ন করতেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের পটভূমিকায় এই বাস্তব ঘটনা বিদ্যমান। নাটকটি সে যুগ তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। রচনাটির গুরুত্ব সমধিক। সাহিত্যিক মূল্য কিঞ্চিৎ ন্যূন হলেও সমাজ মানসের অভীপ্সা পূরণে সক্ষম হওয়ায় নাটকটি স্মরণীয় হয়ে আছে।

দীনবন্ধুর জীবনবৃত্তান্ত ও নাটক পড়ে আপনি সমকালে রচিত অন্যান্য নাটকের পাশাপাশি তাঁর 'নীলদর্পণ' নাটকের সাহিত্যমূল্যের সঙ্গে নাটকটির রাজনৈতিক সামাজিক গুরুত্ব বুঝতে পারবেন। এই নাটক পাঠের মধ্য দিয়ে উনিশ শতকে বাংলাদেশের কৃষকের দুরবস্থার পরিচয়, সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী হিসেবে দীনবন্ধুর অবদান উপলব্ধি করবেন।

৮২.৩ দীনবন্ধু মিত্র ও তাঁর 'নীল-দর্পণ'

দীনবন্ধু মিত্রের জন্ম (ইং ১৮৩০ ; সাল ১২৩৬) নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে। যমুনা নদী গ্রামটিকে চতুর্দিকে বেষ্টন করে থাকায় নাম হয়েছে চৌবেড়িয়া। দীনবন্ধুর পিতা কালাচাঁদ মিত্র। গন্ধর্বনারায়ণ তাঁর পিতৃদত্ত নাম। গ্রামের পাঠশালায় পাঠ শেষ করে, মাত্র দশ বৎসর বয়সে জমিদারী সেরেস্তায় ৮ টাকা বেতনে কাজে নিযুক্ত হন। লেখাপড়ার প্রতি ঝোঁক থাকায় পাঁচবছর পর উচ্চশিক্ষা লাভের আশায় কোলকাতায় চলে আসেন। সেখানে পিতৃব্য নীলমণি মিত্রের বাসায় বাসনমাজা ও অন্যান্য কাজের বিনিময়ে আশ্রয় পান। দীনবন্ধু এই নামে তিনি লঙ্ সাহেবের অবৈতনিক স্কুল থেকে ১৮৫০-এর শেষ পরীক্ষায় বৃত্তি পেয়ে পাশ করেন। অতঃপর হিন্দু কলেজে ভর্তি হন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে সর্বোচ্চ নম্বর পেতেন। হিন্দু কলেজের জুনিয়ার ও সিনিয়ার বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শেষ পরীক্ষা না দিয়েই তিনি ১৫০ টাকা বেতনে পাটনায় পোস্টমাস্টার পদে যোগ দেন। অল্প দিনের মধ্যেই তিনি ডাকবিভাগের পরিদর্শক পদে উন্নীত হন। এসময় তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার নানা জায়গায় এবং ১৮৭০-এ লুসাই যুদ্ধের সময় ডাক ব্যবস্থা তদারকির জন্য কাছাড়ে যান। যুদ্ধ চলাকালে সুষ্ঠু ডাক ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ভারত সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন (১৮৭১)। বছর খানেক তিনি কোলকাতায় পোস্টমাস্টার জেনারেলের সহকারী ছিলেন (১৮৬৯-৭০)। সর্বত্র দক্ষতার পরিচয় দিলেও ডাকবিভাগের ডিরেক্টর জেনারেলের বিরাগভাজন হওয়ায় তিনি অপমানিত হন এবং ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলওয়ের পরিদর্শক পদে যোগ দেন (১৮৭২)। সরকারী কাজে অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর ভেঙে যায় ও ১৮৭৩-এর ১লা নভেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের মৃত্যু হয়।

কলেজ জীবনে দীনবন্ধু 'সংবাদ প্রভাকরে' কবিতা লিখতেন এবং এই সূত্রে তাঁর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সঙ্গে পরিচয় হয়। গুপ্ত কবির প্রেরণায় 'সংবাদ প্রভাকর' ছাড়াও 'সংবাদ সাধুরঞ্জন' পত্রিকায় কবিতা লিখতেন। সৃষ্টিশীল এই সব রচনার সঙ্গে সরকারী কাজে গ্রাম শহরে পরিভ্রমণ সূত্রে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা, নাটকের চরিত্র সৃষ্টির কাজে সাহায্য করেছিল। সমকালীন অনেক ঘটনা ও ব্যক্তিজীবনের বহুবিধ অসঙ্গতি দীনবন্ধুর নাটকের উপজীব্য হয়েছে। তাই কবিতা দিয়ে তাঁর সাহিত্য জীবন শুরু হলেও নাটকেই তাঁর যথার্থ সিদ্ধি। তাঁর প্রথম নাটকে (নীলদর্পণ) তিনি অসামান্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। নাটকটি সৌখীন মঞ্চ থেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে সগৌরবে বহুবার অভিনীত হয়েছে।

'নীলদর্পণ' নাটকটির ঐতিহাসিক ভূমিকা আছে। বাংলাদেশের উর্বরা জমি নীলচাষের অনুকূল। বাংলার গ্রামে গ্রামে ইংরেজরা কুঠি স্থাপন করে নীলচাষ শুরু করেন ও এর থেকে প্রভূত অর্থ মুনাফা করতেন। নীলচাষে অনিচ্ছুক চাষীদের নীলচাষে বাধ্য করবার জন্য নানারকম উৎপীড়ন করা শুরু হোল। এই পীড়ন সবচেয়ে বেশী হয়েছে নদীয়া, যশোহর, ২৪ পরগণা, ফরিদপুর এবং মুর্শিদাবাদ জেলায়। সেখানে নীলকরদের অত্যাচার সীমাহীন নৃশংসতা ও বর্বরতার পর্যায়ে পৌঁছায়। কৃষকদের বলপূর্বক দাদন দিয়ে ধানী জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করা হোত। চাষীরা এর প্রতিবাদ করলে তাদের কুঠির

লাঠিয়ালের সাহায্যে ধরে এনে নির্মম অত্যাচার করা হোত। 'শ্যামচাঁদ' এবং 'রামকান্ত' নামক চাবুকের আঘাতে অনিচ্ছুক চাষীকে প্রহার করে ক্ষত বিক্ষত করা হোত। অসহায় কৃষককূল আদালতে বিচার প্রার্থনা করেও ইংরেজ বিচারকের কাছ থেকে কোন ফল পেত না। অনেক কৃষককে দূরান্তের কোন কুঠিতে চালান দিয়ে, অন্ধকার ঘরে আটক রাখা হোত। কৃষকের স্ত্রী-কন্যাদের জৈবিক প্রকৃতির আগুনে পুড়িয়ে বর্বরতার পরিচয় দিতে দ্বিধা করতো না। ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার কল্পিত ঘটনা নয়। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় প্রকাশিত হরমণির কাহিনি তার সাক্ষ্য।

নদীয়া, যশোহর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন জায়গায় বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ গড়ে ওঠে। বিশ্বনাথ সর্দার ওরফে বিশে ডাকাত নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ফলে তারা সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে ধরে বিচারের প্রহসন করে ফাঁসি দেওয়া হয়। কিন্তু এতেও আন্দোলন থামেনি। চৌগাছার বিষ্ণুচরণ বিশ্বাস, পোড়াগাছার দিগম্বর বিশ্বাস নীলচাষীদের সংগঠিত করেন। নীলকররা এই বিদ্রোহ দমনের জন্য সমস্ত রকম পীড়ন জারি রাখে—আগুনে গ্রাম গ্রামান্তরের বাড়ীঘর পোড়ানো, নরহত্যা, নারীধর্ষণ ও লুঠ-তরাজ করে নারকীয় পরিস্থিতি তৈরী করে।

বাংলার গ্রামে গঞ্জে নীলকরদের সদম্ভ বিচরণের কালে যে অগণিত মানুষ শোষণ-পীড়নের শিকার হয়েছে, তারই বাস্তবসম্মত চিত্র 'নীলদর্পণ' নাটকে প্রতিফলিত। বলা যেতে পারে বাংলার এক দুর্যোগপূর্ণ ইতিহাসের নিষ্ঠুর নির্মম ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে নীলদর্পণ নাটকটি রচিত হয়েছে। এই ঐতিহাসিক পটভূমিকাই নাটকটিকে অমরতার গৌরব দান করেছে। নাটকের যত দোষ ত্রুটি থাকুক না কেন, এই ঐতিহাসিক তাৎপর্য নাটকটিকে মহিমান্বিত করেছে।

৮২.৪ সারাংশ

দীনবন্ধু মিত্র ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে নদীয়া জেলার চৌবেড়িয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা কালাচাঁদ মিত্র। তাঁর পিতৃদত্ত নাম গন্ধর্বনারায়ণ। গ্রামের পাঠশালায় তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপন করে কোলকাতার লঙ সাহেবের অবৈতনিক স্কুলে, পরে হেয়ার স্কুল ও হিন্দু কলেজে পড়েন। ১৮৫৫ খ্রীঃ ডাকবিভাগে চাকুরী নিয়ে পাটনায় যান, পরে ডাকবিভাগের পরিদর্শকের পদে উন্নীত হন। চাকুরী সূত্রে তাঁকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা এমনকি আসামের কাছারেও যেতে হয়েছে। ব্যাপক পরিভ্রমণের ফলে বহু লোকের সংস্পর্শে আসেন, ফলে লোকচরিত্র সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। ১৮৭২ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধি দেন। ১৮৭৩ সালের ১লা নভেম্বর তাঁর দেহান্ত ঘটে।

দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশ ১৮৬০ খ্রীঃ। এই নাটকটি সৌখিন ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চে বহুবার অভিনীত হয়েছে। নীলচাষকে কেন্দ্র করে ইংরেজ কুঠিয়ালদের সীমাহীন অত্যাচার ও তার পরিণতিতে পীড়িত মানুষের সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটি রচিত। নাটক রচনা ও প্রকাশের সময় দীনবন্ধু সরকারী চাকরী করতেন। তাই নিজের নাম ব্যবহার না করে 'কস্যচিৎ পথিকস্য' নামে প্রকাশ করেন। মধুসূদন দত্ত 'A Native' ছদ্মনামে 'নীলদর্পণ'-এর ইংরেজি অনুবাদ করলে সেটির মুদ্রাকর

সি. এইচ. মানুয়েলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু হলে রেভারেন্ড লঙ্ নিজেকে প্রকাশক ঘোষণা করেন। তাঁর কারাদন্ড ও হাজার টাকা জরিমানা হয়। 'নীলদর্পণ' এদিক থেকেও ইতিহাস সৃষ্টি করেছে।

বাংলার দুর্যোগপূর্ণ ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে 'নীলদর্পণ' নাটকটি রচিত, তাই নাটকের কিছু দোষত্রুটি সত্ত্বেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য রচনাটিকে মহিমান্বিত করেছে।

৮২.৫ অনুশীলনী—১

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে ৯৫ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন। অন্যথায় প্রাসঙ্গিক অংশগুলি আর একবার পড়ে সঠিক উত্তর করতে সচেষ্ট করুন।

(১) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) (নীলদর্পণ) নাটকটিকে বলা যেতে পারে —— নাটক —— নাটক।

(খ) দীনবন্ধু মিত্রের পিতা —— ——, তার পিতৃদত্ত নাম ——।

(গ) কলেজ জীবনে দীনবন্ধু ——— কবিতা লিখতেন।

(ঘ) দীনবন্ধু মিত্রের ছাত্রজীবন ও কর্মজীবন সম্পকে সংক্ষেপে পরিচয় দিন।

৮২.৬ নীল-দর্পণ মূলপাঠ—১

নীল-দর্পণ

প্রথম অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর—গোলোকচন্দ্র বসুর গোলাঘরের রোয়াক

(গোলোকচন্দ্র বসু এবং সাধুচরণ আসীন)

সাধু। আমি তখনি বলেছিলাম, কর্তা মহাশয়, আর এ দেশে থাকা নয়, তা আপনি শুনিলেন না। কাঙ্গালের কথা বাসী হলে খাটে।

গোলাক। বাপু, দেশ ছেড়ে যাওয়া কি মুখের কথা? আমার এখানে সাত পুরুষ বাস। স্বর্গীয় কর্তারা যে জমিজমা কর‍্যে গিয়াছেন, তাতে কখন পরের চাকরিস্বীকার করিতে হয় নি। যে ধান জন্মায়, তাতে সংবৎসরের খোরাক হয়, অতিথি সেবা চলে, আর পূজার খরচ কুলায় ; যে সরিষা পাই, তাহাতে তেলের সংস্থান হইয়া ৬০/৭০ টাকার বিক্রি হয়। বল কি বাপু, আমার সোনার স্বরপুর, কিছুরি ক্লেশ নাই। ক্ষেতের চাল, ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের তেল, ক্ষেতের গুড়, বাগানের তরকারি, পুকুরের মাচ। এমন সুখের বাস ছাড়তে কার হৃদয় না বিদীর্ণ হয়? আর কে-ই বা সহজে পারে?

সাধু। এখন তো আর সুখের বাস নাই। আপনার বাগান গিয়েছে, গাঁতিও যায় যায় হয়েছে। আহা! তিন বৎসর হয় নি সাহেব পত্তনি নিয়েছে, এর মধ্যে গাঁথান ছারক্ষার কর্য়ে তুলেছে। দক্ষিণপাড়ার মোড়লবাড়ির দিকে চাওয়া যায় না, আহা! কি ছিল কি হয়েছে। তিন বৎসর আগে দুবেলায় ৬০ খান পাত পড়তো, ১০ খান লাঙ্গল ছিল, দামড়াও ৪০/৫০ টা হবে। কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ! আহা যখন আসধানের পালা সাজাতো, বোধ হতো যেন চন্দনবিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়। গেল সন, গোয়াল সারিতে না পারায় উঠানে হুমড়ি খেয়ে পড়ে রয়েছে। ধানের ভুঁয়ে নীল করে নি বল্যে মেজো সেজো দুই ভাইকে ধরে সাহেব বেটা আর বৎসর কি মারটাই মেরেছিল ; উহাদের খালাস কর্য়ে আনতে কত কষ্ট ; হাল, গোরু বিক্রি হয়ে যায়। ঐ চোটেই দুই মোড়ল গাঁ-ছাড়া হয়।

গোলোক। বড় মোড়ল না তার ভাইদের আনতে গিয়েছিল?

সাধু। তারা বলেছে, ঝুলি নিয়ে ভিক্ষা করে খাব, তবু ও গাঁয়ে আর বাস করবো না। বড় মোড়ল এখন একা পড়েছে। দুইখান লাঙ্গল রেখেছে, তা নীলের জমিতেই যোড়া থাকে। এও পালাবার যোগাড়ে আছে। কর্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়াছে, এইবারে মান যাবে।

গোলক। মান যাওয়ার আর বাকি কি? পুষ্করিণীটির চার পাড়ে চাষ দিয়াছে, তাহাতে এবার নীল করবে, তা হলেই মেয়েদের পুকুরে যাওয়া বন্ধ হলো। আর সাহেব বেটা বলেছে, যদি পূর্বমাঠের ধানি জমি কয়খানায় নীল না বুনি, তবে নবীনমাধবকে সাত কুটির জল খাওয়াইবে।

সাধু। বড়বাবু না কুটি গিয়েছেন?

গোলোক। সাধে গিয়েছেন, প্যায়দায় লয়ে গিয়াছে।

সাধু। বড়বাবুর কিন্তু ভ্যালা সাহস। সে দিনে সাহেব বল্লে "যদি তুমি আমিন খালাসীর কথা না শোনো, আর চিহ্নিত জমিতে নীল না কর, তবে তোমার বাড়ি উঠাইয়ে বেত্রবতীর জলে ফেলাইয়া দিব এবং তোমাকে কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব।" তাহাতে বড়বাবু কহিলেন, "আমার গত সনের ৫০ বিঘা নীলের দাম চুকাইয়ে না দিলে এ বৎসর এক বিঘাও নীল করিব না, এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ি কি ছার!"

গোলোক। তা না বলেই বা করে কি। দেখ দেখি, ৫০ বিঘা ধান হইলে আমার সংসারের কিছু কি ভাবনা থাকতো! তাই যদি নীলের দামগুলো চুকিয়ে দেয়, তবু অনেক কষ্ট নিবারণ হয়।

[নবীনমাধবের প্রবেশ]

কি বাবা কি করে এলে?

নবীন। আজ্ঞে জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সঙ্কুচিত হয়? আমি অনেক স্তুতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন,

৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়ে দেওয়া যাবে।

গোলোক। ৬০ বিঘা নীল কত্তে হলো অন্য ফসলে হাত দিতে হবে না! অন্ন বিনাই মারা যেতে হলো।

নবীন। আমি বলিলাম, সাহেব, আমাদিগের লোকজন লাঙ্গল গোরু সকলি আপনি নীলের জমিতে নিযুক্ত রাখুন, কেবল আমাদিগের সম্বৎসরের আহার দিবেন, আমরা বেতন প্রার্থনা করি না। তাহাতে উপহাস করিয়া কহিলেন, "তোমরা তো যবনের ভাত খাও না।"

সাধু। যারা পেটভাতায় চাকরি করে, তারাও আমাদিগের অপেক্ষা সুখী।

গোলোক। লাঙ্গল প্রায় ছেড়ে দিয়াছি, তবু তো নীল করা ঘোচে না। নাছোড় হইলে হাত কি? সাহেবের সঙ্গে বিবাদ তো সম্ভবে না, বেঁধে মারে সয় ভাল, কাজে কাজেই কত্তে হবে।

নবীন। আপনি যেমন অনুমতি করিবেন, আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু আমার মানস, একবার মোকদ্দমা করা।

[আদুরীর প্রবেশ]

আদুরী। মাঠাকুরুণ যে বক্‌তি লেগেচে, কত বেলা হলো, আপনারা নাবা খাবা করবেন না? ভাত শুকিয়ে যে চাল হইয়ে গেল।

সাধু। (দাঁড়াইয়া) কর্তা মহাশয়, এর একটা বিলি ব্যবস্থা করুন নতুবা আমি মারা যাই। দেড়খানা লাঙ্গলে নয় বিঘা নীল দিতে হলে, হাঁড়ি শিকের উঠবে। আমি আসি, কর্তা মহাশয় অবধান, বড়বাবু নমস্কার করি গো।

[সাধুচরণের প্রস্থান]

গোলোক। পরমেশ্বর এ ভিটায় স্নান আহার করিতে দেন, এমত বোধ হয় না, যাও বাবা, স্নান কর গে।

[সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের বাড়ি

(লাঙ্গল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ)

রাই। (লাঙ্গল রাখিয়া) আমিন সুমুন্দি য্যান বাগ্, যে রোক করে মোর দিকি আসচিলো, বাবা রে! মুই বলি মোরে বুঝি খালে। শালা কোন মতেই শোন্‌লে না। জোর করিই দাগ মারলে। সাঁপোলতলার ৫ কুড়ো ভুঁই যদি নীলি গ্যাল, তবে মাগ ছ্যালেরে খাওয়াব কি? কাঁদাকাটি কর‍্যে দ্যাকবো, যদি না ছাড়ে তবে মোরা কাজিই দ্যাশ্ ছাড়ে যাব।

[ক্ষেত্রমণির প্রবেশ]

দাদা বাড়ি এয়েচে?

ক্ষেত্র। বাবা বাবুদের বাড়ি গিয়েছে, আলেন, আর দেরি নাই। কাকিমারে দেখ্‌তি যাবা না? তুমি বক্‌চো কি?

রাই। বক্‌চি মোর মাতা। একটু জল আন্ দিনি খাই, তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গ্যাল। সুমুন্দিরি অ্যাত করি বল্লাম, তা কিছুতেই শোন্‌লে না।

[সাধুচরণের প্রবেশ এবং ক্ষেত্রমণির প্রস্থান]

সাধু। রাইচরণ, এত সকালে যে বাড়ি এলি?

রাই। দাদা, আমিন শালা সাঁপোলতলার জমিতি দাগ মেরেচে। খাব কি, বচ্ছোর যাবে কেমন করে। আহা, জমি তো না য্যান সোনার চাঁপা। এক কোণ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম। খাব কি, ছ্যালেপিলে খাবে কি, এতডা পারিবার না খাতি পেয়ে মারা যাবে, ও মা! রাত পোয়ালি যে দু কাটা চালের খরচ, না খাতি পেয়ে মর্‌বো, আরে পোড়া কপাল, আরে পোড়াকপাল, গোডার নীলি কল্লে কি? অ্যাঁ! অ্যাঁ!

সাধু। ঐ ক বিঘা জমির ভরসাতেই থাকা, তাই যদি গ্যালো, তবে আর এখানে থেকে করবো কি। আর যে দুই এক বিঘা নোনা ফেনা আছে, তাতে তো ফলন নাই, আর নীলের জমিতে লাঙ্গল থাকবে, তা কারিকিতি বা কখন করবো। তুই কাঁদিস নে, কাল হাল গরু বেচে গাঁর মুখে ঝ্যাঁটা মেরে বসন্তবাবুর জমিদারিতে পাল্‌য়ে যাব।

[ক্ষেত্রমণি ও রেবতীর জল লইয়া প্রবেশ]

জল খা, জল খা, ভয় কি, জীব দিয়েচে যে, আহার দেবে সে। তা তুই আমিনকে কি বলে এলি?

রাই। মুই বলবো কি, জমিতে দাগ মার্‌তি নাগ্‌লো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়্‌য়ে দিতি নাগ্‌লো। মুই পায় ধল্লাম, ট্যাকা দিতে চালাম, তা কিছুই শোন্‌লে না। বলে, যা তোর বড়বাবুর কাছে যা, তোর বাবার কাছে যা, মুই ফোজদুরি করবো বল্যে সেঁস্‌য়ে এইচি। (আমিনকে দূরে দেখিয়া) ঐ দ্যাগ শ্যালা আস্‌চে, প্যায়দা সঙ্গে করে এনেচে, কুটি ধর্যে নিয়ে যাবে।

[আমিন এবং দুইজন পেয়াদার প্রবেশ]

আমিন। বাঁদ্, রেয়ে শালাকে বাঁদ্। (পেয়াদাদ্বয় দ্বারা রাইচরণের বন্ধন)

রেবতী। ও মা, ই কি, হ্যাঁগা বাঁদো ক্যান্? কি সর্বনাশ, কি সর্বনাশ। (সাধুর প্রতি) তুমি দেঁড়্‌য়ে দ্যাক্‌চো কি, বাবুদের বাড়ি যাও, বড় বাবুকে ডেকে আনো!

আমিন। (সাধুর প্রতি) তুই যাবি কোথা, তোরও যেতে হবে। দাদন লওয়া রেয়ের কর্ম নয়। ঢ্যারা সইতে অনেক সইতে হয়। তুই লেখাপড়া জানিস, তোকে খাতায় দস্তখৎ কর্যে দিয়ে আসতে হবে।

সাধু। আমিন মহাশয়! একে কি নীলের দাদন বলো, নীলের গাদন বল্লে ভাল হয় না? হা পোড়া অদৃষ্ট, তুমি আমার সঙ্গে আছ, যে ঘার ভয়ে পাল্‌য়ে এলাম, সেই ঘায় আবার পড়লাম। পত্তনির আগে এ তো রামরাজ্য ছিল, তা হাবাতেও ফকির হলো, দেশেও মন্বন্তর হলো।

আমিন। (ক্ষেত্রমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্বগত) এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন মাল পেলে লুপে নেবে—আপনার বুন দিয়ে বড় পেশকারি পেলাম, তা এরে দিয়ে পাব—মালটা ভাল, দেখা যাক্।

রেবতী। ক্ষেত্র, মা তুই ঘরের মধ্যে যা। [ক্ষেত্রমণির প্রস্থান]

আমিন। চল্ সাধু, এই বেলা মানে মানে কুটি চল। [যাইতে অগ্রসর হইল]

রেবতী। ও যে এট্টু জল খ্যাতি চেয়েলো, ও আমিনমশাই তোমার কি মাগ ছেলে নেই, কেবল লাঙ্গল রেখেছে আর এই মারপিট। ও মা ও যে ডব্‌কা ছেলে, ও যে এতক্ষণ দুবার খায়, না খেয়ে সাহেবের কুটি যাবে কেমন করে, সে যে অনেক দূর। দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও—আহা, আহা, মাগ ছেলের জন্যেই কাতর, এখনো চকি জল পড়্‌চে, মুখ শুইকে গেছে—কি করবো, কি পোড়া দেশে এলাম, ধনে প্রাণে গ্যালাম, হায়, হায়, হায়, ধনে প্রাণে গ্যালাম (ক্রন্দন)।

আমিন। আরে মাগী, তোর নাকিসুর এখন রাখ, জল দিতে হয় তো দে, নয় ওমনি নিয়ে যাই।
[রাইচরণের জলপান ও সকলের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বেগুণবেড়ের কুটি, বড় বাঙ্গালার বারেন্দা

(আই, আই, উড সাহেব এবং গোপীনাথ দাস দেওয়ানের প্রবেশ)

গোপী। হুজুর, আমি কি কসুর করিতেছি, আপনি স্বচক্ষেই তো দেখিতেছেন। অতি প্রত্যুষে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়া তিন প্রহরের সময় বাসায় প্রত্যাগমন করি, এবং আহারের পরেই আবার দাদনের কাগজপত্র লইয়া বসি, তাহাতে কোন দিন রাত্র দুই প্রহরও হয়, কোন দিন বা একটাও বাজে।

উড। তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। স্বরপুর, শামনগর, শান্তিঘাটা এ তিন গাঁয় কিছু দাদন হলো না। শ্যামাচাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত হোগা নেই।

গোপী। ধর্মাবতার, অধীন হুজুরের চাকর, আপনিই অনুগ্রহ করিয়া পেস্কারি হইতে দেওয়ানি দিয়াছেন। হুজুর মালিক, মারিলেও মারিতে পারেন, কাটিলেও কাটিতে পারেন। এ কুটির কতকগুলিন প্রবল শত্রু হইয়াছে, তাহাদের শাসন ব্যতীত নীলের মঙ্গল হওয়া দুষ্কর।

উড। আমি না জানিলে কেমন কর্য়ে শাসন করিতে পারে। টাকা, ঘোড়া, লাঠিয়াল, শুড়কি-ওয়ালা আমার অনেক আছে, ইহাতে শাসন হইতে পারে না? সাবেক দেওয়ান শত্রুর কথা আমাকে জানাইতো—তুমি দেখি নি, আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়াছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি, জরু কয়েদ করিয়াছি, জরু কয়েদ করিলে শালা লোক বড় শাসিত হয়। বজ্জাতিকা বাত হাম কুচ শুনা নেই—তুমি বেটা লক্ষিছাড়া আমারে কিছু বলি নি—তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে। দেওয়ানি কাম কায়েট্‌কা হায় নেই বাবা—তোমকো জুতি মারকে নেকাল ডেকে হাম্ এক আদ্‌মি ক্যাওটকো এ কাম দেগা।

গোপী। ধর্মাবতার, যদিও বন্দা জাতিতে কায়স্থ, কিন্তু কার্যে ক্যাওট, ক্যাওটের মতই কর্ম দিতেছে। মোল্লাদের ধান ভেঙে নীল করিবার জন্য এবং গোলোক বসের সাতপুরুষে লাখেরাজ বাগান ও রাজার আমলের গাঁতি বাহির করিয়া লইতে আমি যে সকল কাজ করিয়াছি, তাহা ক্যাওট কি চামারেও পারে না, তা আমার কপাল মন্দ, তাই এত করে যশ নাই।

উড। নবীনমাধব শালা সব টাকা চুক্‌য়ে—চায় ওস্‌কো হাম্‌ এক কৌড়ি নেহি দেগা, ওস্‌কো হিসাব দোরস্ত করকে রাখ—বাঞ্চৎ বড়া মাম্‌লাবাজ, হাম্‌ দেখেগা শালা কেস্তারে রূপেয়া লেয়।

গোপী। ধর্মাবতার, ঐ একজন কুটির প্রধান শত্রু। পলাশপুর জ্বালান কখনই প্রমাণ হইত না, যদি নবীন বস ওর ভিতরে না থাকিত। বেটা আপনি দরখাস্তের মুসাবিদা করিয়া দেয়, উকিল মোক্তারদিগের এমন সলাপরামর্শ দিয়াছিল যে, তাহার জোরেই হাকিমের রায় ফিরিয়া যায়। এই বেটার কৌশলেই সাবেক দেওয়ানের দুই বৎসর মেয়াদ হয়। আমি বারণ করিয়াছিলাম, "নবীন বাবু, সাহেবের বিরুদ্ধাচারণ করো না। বিশেষ সাহেব তো তোমার ঘর জ্বালান নাই।" তাতে বেটা উত্তর দিল, "গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি, নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব, আর দেওয়ানজিকে জেলে দিয়ে বাগানের শোধ লব।" বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে। বেটা এবার আবার কি যোটাযোট করিতেছে, তার কিছুই বুঝিতে পারি না।

উড। তুমি ভয় পাইয়াছ, হাম বোলা কি নেই, তুমি বড় না-লায়েক আছে, তোম্‌ছে কাম্‌ হোগা নেই।

গোপী। হুজুর, ভয় পাওয়ার মত কি দেখিলেন, যখন এ পদবীতে পদার্পণ করেছি, তখন ভয়, লজ্জা, শরম মান, মর্যাদার মাথা খাইয়াছি, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রীহত্যা, ঘর জ্বালান অঙ্গের আভরণ হইয়াছে, আর জেলখানা শিওরে করে বসে আছি।

উড। আমি কথা চাইনে, আমি কাজ চাই।

[সাধুচরণ, রাইচরণ, আমিন ও পেয়াদাদ্বয়ের সেলাম করিতে করিতে প্রবেশ]

এ বজ্জাতের হস্তে দড়ি পড়িয়াছে কেন?

গোপী। ধর্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

সাধু। ধর্মাবতার, নীলের বিরুদ্ধাচরণ করি নাই, করিতেছি না, এবং করিবার ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছায় করি আর অনিচ্ছায় করি নীল করিছি, এবারেও করিতে প্রস্তুত আছি। তবে সকল বিষয়ের সম্ভব অসম্ভব আছে, আদ আঙ্গুল চুঙ্গিতে আট আঙ্গুল বারুদ পুরিলে কাজেই ফাটে। আমি অতি ক্ষুদ্র প্রজা, দেড়খানি লাঙ্গাল রাখি, আবাদ হদ্দ ২০ বিঘা, তার মধ্যে যদি ৯ বিঘা নীলে গ্রাস করে তবে কাজেই চটতে হয়। তা আমার চটায় আমিই মরবো, হুজুরের কি!

গোপী। সাহেবের ভয়, পাছে তুমি সাহেবকে তোমাদের বড়বাবুর গুদামে কয়েদ কর্‌্যে রাখ।

সাধু। দেওয়ানজি মহাশয়, মড়ার ওপর আর খাঁড়ার ঘা কেন দেন। আমি কোন্ কীটস্য কীট যে সাহেবকে কয়েদ কর্‌বো, প্রবলপ্রতাপশালী—

গোপী। সাধু, তোর সাধুভাষা রাখ, চাসার মুখে ভাল শুনায় না, গায়ে যেন ঝাঁটার বাড়ি মারে—

উড। বাঞ্চৎ বড় পণ্ডিত হইয়াছে।

আমিন। বেটা রাইয়তদিগের আইন পরোয়ানা সব বুঝাইয়া দিয়া গোল করিতেছে, বেটার ভাই মরে লাঙ্গল ঠেলে, উনি বলেন "প্রতাপশালী—"

গোপী। ঘুঁটেকুড়ানীর ছেলে সদরনায়েব।—ধর্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপন হওয়াতে চাসালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।

উড। গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।

আমিন। বেটা মকদ্দমা করিতে চায়।

উড। (সাধুচরণের প্রতি) তুমি শালা বড় বজ্জাত আছে। তোমার যদি ২০ বিঘার ৯ বিঘা নীল করিতে বলেছে তবে তুমি কেন আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধান কর না।

গোপী। ধর্মাবতার, যে লোকসান জমা পড়ে আছে তাহা হইতে ৯ বিঘা কেন ২০ বিঘা পাট্টা করিয়া দিতে পারি।

সাধু। (স্বগত) হা ভগবান্ শুঁড়ির সাক্ষী মাতাল! (প্রকাশ্যে) হুজুর, যে ৯ বিঘা নীলের জন্যে চিহ্নিত হইয়াছে, তাহা যদি কুটির লাঙ্গল, গোরু ও মাইন্দার দিয়া আবাদ হয়, তবে আমি আর ৯ বিঘা নূতন করিয়া ধানের জন্যে লইতে পারি। ধানের জমিতে যে কারকিত করিতে হয়, তার চার গুণ কারকিত নীলের জমিতে দরকার করে, সুতরাং যদিও ৯ বিঘা আমার চাস দিতে হয়, তবে বাকী ১১ বিঘাই পড়ে থাকবে, তা আবার নূতন জমি আবাদ করবো।

উড। শালা বড় হারামজাদা, দাদনের টাকা নিবি তুই, চাস দিতে হবে আমি, শালা বড় বজ্জাত (জুতার গুঁতা প্রহার), শ্যামচাঁদকা সাৎ মালাকাৎ হোনেসে হারামজাদ্‌কি সব ছোড় যাগা। (দেয়াল হইতে শ্যামচাঁদ গ্রহণ)

সাধু। হুজুর, মাছি মেরে হাত কাল করা মাত্র, আমরা—

রাই। (সক্রোধে) ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্চে ন্যাকে দে; ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ে পড়লো, সারা দিন্‌ডে গ্যাল, নাতিও পালাম না, খাতিও পালাম না।

আমিন। কই শালা, ফৌজদারি করলিনে? (কান মলন)

—রাই। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) মলাম, মাগো! মাগো!

উড। ব্লাডি নিগার, মারো বাঞ্চৎকো (শ্যামচাঁদাঘাত)

[নবীনমাধবের প্রবেশ]

রাই! বড়বাবু, মলাম গো! জল খাব গো! মেরে ফ্যাল্লে গো।

নবীন। ধর্মাবতার, উহাদিগের এখন স্নানও হয় নাই আহারও হয় নাই। উহাদের পরিবারেরা এখন বাসী মুখে জল দেয় নাই। যদি শ্যামচাঁদ আঘাতে রাইয়ত সমুদায় বিনাশ করিয়া ফেলেন তবে আপনার নীল বুনবে কে? এই সাধুচরণ গত বৎসর কত ক্লেশে ৪ বিঘা নীল দিয়াছে। যদি উহাকে এরূপ নিদারুণ প্রহারে এবং অধিক দাদন চাপাইয়া ফেরার করেন তবে আপনারই লোকসান। উহাদের অদ্য ছাড়িয়া দেন, আমি কল্য প্রাতে সমভিব্যাহারে আনিয়া আপনি যেরূপ অনুমতি করিবেন সেইরূপ করিয়া যাইব।

উড। তোমার নিজের চরকায় তেল দেহ। পরের বিষয়ে কথা কহিবার কি আবশ্যক অছে?—সাধু ঘোষ, তোর মত কি তা বল? আমার খানার সময় হইয়াছে।

সাধু। হুজুর, আমার মতের অপেক্ষা আছে কি? আপনি নিজে গিয়া ভাল ২ চার বিঘাতে মার্ক দিয়া আসিয়াছেন, আজ আমিন মহাশয় আর যে কয়খান ভাল জমি ছিল তাহাতেও চিহ্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমার অমতে জমি নির্দিষ্ট হইয়াছে, নীলও সেইরূপ হইবে। আমি স্বীকার করিতেছি বিনা দাদনে নীল কর্‌্যে দিব।

উড। আমার দাদন সব মিছে, হারামজাদা, বজ্জাত, বেইমান (শ্যামচাঁদ প্রহার)।

নবীন। (সাধুচরণের পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া আবরণ) হুজুর, গরিব ছাপোষা লোকটাকে একেবারে মেরে ফেলিলেন। আহা! উহার বাড়িতে খাইতে অনেকগুলিন। এ প্রহারে এক মাস শয্যাগত হইয়া থাকিতে হইবে। আহা! উহার পরিবারের মনে কি ক্লেশ হইতেছে, সাহেব, আপনারও পরিবার আছে, যদি আপনাকে খানার সময় কেহ ধৃত করিয়া লইয়া যায় তবে মেমসাহেবের মনে কেমন পরিতাপ জন্মে।

উড। চপরাও, শালা, বাঞ্চৎ, পাজি, গোরুখোর। এ আর অমর নগরের ম্যাজিস্ট্রেট নয় যে কথায় কথায় নালিশ কর্‌বি, আর কুটির লোক ধর‌্যে মেয়াদ দিবি। ইন্দ্রাবাদের মাজিস্ট্রেট তোমার হইয়াছে। র‍্যাসকেল—এই দিনের মধ্যে তুই ৬০ বিঘা দাদন লিখিয়া দিবি তবে তোর ছাড়ান, নচেৎ এই শ্যামচাঁদ তোর মাথায় ভাঙ্গিব। গোস্তাকি! তোর দাদনের জন্যে দশখানা গ্রামের দাদন বন্ধ রহিয়াছে।

নবীন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবী! তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মেধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ।

গোপী। নবীন বাবু, বাড়াবাড়ি কাজ কি, আপনি বাড়ি যান।

নবীন। সাধু, পরমেশ্বরকে ডাক, তিনিই দীনের রক্ষক। [নবীনমাধবের প্রস্থান]

উড। গোলামকি গোলাম! দেওয়ান, দপ্তরখানায় লইয়া যাও, দস্তুর মোতাবেক দাদন দেও।

[উড়ের প্রস্থান]

গোপী। চল সাধু, দপ্তরখানায় চল। সাহেব কি কথায় ভোলে।

বাড়া ভাতে ছাই তব বাড়া ভাতে ছাই।
ধরেছে নীলের যমে আর রক্ষা নাই।।

[সকলের প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর দরদালান

(সৈরিন্ধ্রী চুলের দড়ি বিনাইতে নিযুক্ত)

সৈরিন্ধ্রী। আমার হাতে এমন দড়ি একগাছিও হয় নি। ছোট বউ বড় পয়মন্ত। ছোট বয়ের নাম কর্‌যে যা করি তাই ভাল হয়। এক পণ ছুট করেছি কিন্তু মুটোর ভিতর থাকবে। যেমন একঢাল চুল তেমনি দড়ি হয়েছে। আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্বদাই হাস্যবদন। লোকে বলে যা-কে যায় দেখতে পারে না, আমি তো তার কিছুই দেখি নে। ছোটবয়ের মুখ দেখলে আমার তো বুক জুড়য়ে যায়। আমার বিপিনও যেমন ছোট বউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।

[শিকাহস্তে সরলতার প্রবেশ]

সর। দিদি, দ্যাখ দেখি, আমি শিকের তলাটি বুন্‌তে পেরেছি কি না!—হয়নি?

সৈরিন্ধ্রী। (অবলোকন করিয়া) হ্যাঁ, এইবার দিব্বি হয়েছে। ও বোন্ এই খান্‌টি যে ডুবিয়েছো, লালের পর জরদ তো খোলে না।

সর। আমি তোমার শিকে দেখে বুন্‌ছিলাম—

সৈরি। তাতে কি লালের পর জরদ আছে?

সর। না, তাতে লালের পর সবুজ আছে। কিন্তু আমার সবুজ সুতা ফুরয়ে গেছে, তাই আমি ওখানে জরদ দিয়েছি।

সৈরি। তোমার বুঝি আর হাটের দিন পর্যন্ত তর সইল না। তোমার বোন্ সকলি তাড়াতাড়ি, বলে

বৃন্দাবনে আছেন হরি।
ইচ্ছা হলে রইতে নারি।।

সর। বাহবা—আমার কি দোষ, হাটে কি পাওয়া যায়? ঠাকুরুণ গেলহাটে মহাশয়কে আনতে বলেছিলেন, তা তিনি পান নি।

সৈরি। তবে ওঁরা যখন ঠাকুরপোকে চিঠি লিখিবেন সেই সময় পাঁচ রঙ্গের সুতার কথা লিখে দিতে বলবো।

সর। দিদি এ মাসের আর কদিন আছে গা—

সৈরি। (হাস্যবদনে) যার যেখানে ব্যথা, তার সেখানে হাত। ঠাকুরপোর কালেজ বন্দ হলে বাড়ি আস্‌বের কথা আছে—তাই তুমি দিন গুনচো—আর বোন্, মনের কথা বেরয়ে পড়েছে!

সর। মাইরি দিদি, আমি তা ভেবে জিজ্ঞাসা করি নি—মাইরি।

সৈরি। ঠাকুরপোর আমার কি সুচরিত্র, কি মধুমাখা কথা! ওঁরা যখন ঠাকুরপোর চিটিগুলিন পড়েন

যেন অমৃত বর্ষণ হইতে থাকে! দাদার প্রতি এমন ভক্তি কখন দেখিনি। দাদারি বা কি স্নেহ, বিন্দুমাধবের নামে মুখে লাল পড়ে, আর বুকখান পাঁচ হাত হয়। আমার যেমন ঠাকুরপো তেমনি ছোট বউ - (সরলতার গাল টিপে) সরলতা তো সরলতা—আমি কি তামাক-পোড়ার কটোটা আনিনি, যেমন একদন্ড তামাকপোড়া নইলে বাঁচি নে তেমনি কটোটা যেন আগে ভুলে এসেছি।

[আদুরীর প্রবেশ]

ও আদর, তামাকপোড়ার কটোটা আন্ না দিদি।

আদুরী। মুই অ্যাকন কনে খুঁজে মর্‌বো?

সৈরি। ওরে, রান্নাঘরের রকে উঠ্‌তে ডান দিকে চালের বাতায় গোঁজা আছে।

আদুরী। তবে খামাত্তে মইখানি আনি, তা নলি চালে ওটবো ক্যামন কর্য়ে।

সর। বেশ বুঝেছে।

সৈরি। কেন, ও তো ঠাকুরুণের কথা বেশ বুঝতে পারে? তুই রক কারে বলে জানিস নে, তুই ডান বুঝিস নে?

আদুরী। মুই ডান হতি গ্যালাম ক্যান। মোগার কপালের দোষ, গোরিব নোকের মেয়ে যদি বুড়ো হলো আর দাঁত পড়লো, তবেই সে ডান হয়ে ওটলো। মা ঠাকুরুণিরি বলবো দিনি, মুইকি ডান হবার মত বুড়ো হইচি।

সৈরি। মরণ আর কি! (গাত্রোত্থান করিয়া) ছোট বউ বসিস, আমি আস্‌চি, বিদ্যাসাগরের বেতাল শুন্‌বো।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান]

আদুরী। সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা—নাকি দুটো দল হয়েছে, মুই আজাদের দলে।

সর। হ্যাঁ আদুরী, তোর ভাতার তোরে ভাল বাস্‌তো?

আদুরী। ছোট হালদার্নি, সে খ্যাদের কথা আর তুলিস নে! মিন্‌সের মুখখান মনে পড়লি আজো মোর পরাণডা ডুকরে ক্যাঁদে ওটে। মোরে বড়্‌ডি ভালবাসতো। মোরে বাউ দিতি চেয়েলো।

পুঁইচে কি এত ভারি বে প্রাণ, পুঁইচে কি এত ভারি।
মনের মত হলি পরে বাউ পরাতি পারি।।

দেখাদিনি খাটে কি না, মোরে ঘুমুতি দিত না, ঝিমুলি বল্‌তো, "ও পরান, ঘুমুলে।"

সর। তুই ভাতারের নাম ধরে ডাক্‌তিস্!

আদুরী। ছি, ছি, ছি, ভাতার যে গুরুলোক, নাম ধত্তি আছে?

সর। তবে তুই কি বল্যে ডাকতিস?

আদুরী। মুই বল্‌তাম, হ্যাদে ওয়ো শোন্‌চো—

[সৈরিন্ধ্রীর পুনঃপ্রবেশ]

সৈরি। আবার পাগলীকে কে খ্যাপালে?

আদুরী। মোর মিন্‌সের কথা সুদুচ্চেন তাই মুখ বল্‌তি লেগিচি।

সৈরি। (হাস্যবদনে) ছোট বয়ের মত পাগল আর দুটি নাই, এত জিনিস থাক্‌তে আদুরীর ভাতারের গল্প ঘাঁটিয়ে শোনা হচ্চে।

[রেবতী ও ক্ষেত্রমণির প্রবেশ]

আয় ঘোষদিদি আয়, তোকে আজ ক দিন ডেকে পাঠাচ্চি, তো তোর আর বার হয় না। ছোট বউ এই নাও, তোমার ক্ষেত্রমণি এসেছে, আজ ক দিন আমারে পাগল করেছে, বলে—দিদি, ঘোষদের ক্ষেত্র শ্বশুর বাড়ি হতে এসেছে তা আমাদের বাড়ি এল না?

রেবতী। তা মোদের পত্তি এম্‌নি কের্‌পা বটে। ক্ষেত্র, তোর কাকিমাদ্দের পর্‌ণাম কর। (ক্ষেত্রমণির প্রণাম)

সৈরি। জন্মায়তি হও, পাকাচুলে সিঁদুর পর, হাতে না ক্ষয় যাক, ছেলে কোলে করে শ্বশুড়বাড়ি যাও।

আদুরী। মোর কাছে ছোট হালদার্নির মুখি খোই ফুট্‌তি থাকে, মেয়েড়া গড় কল্লে, তা বাঁচো মরো একটা কথাও কলে না।

সৈরি। বালাই, ষেটের বাছা—আদুরী, যা ঠাকুরণকে ডেকে আন্‌গে। [আদুরিষ প্রস্থান]

পোড়াকপালি কি বলিতে কি বলে তা কিছু বোঝে না,—ক মাস হলো?

রেবতী। ও কথা কি আজো দিদি পর্‌কাশ করিছি। মোর যে ভাঙ্গা কপাল, সত্যি কি মিথ্যে তাই বা কেমন করে জানবো? তোমরা আপনার জন তাই বলি—এই মাসের কডা দিন গেলি চার মাসে পড়্‌বে।

সর। আজো পেট বেরোয় নি।

সৈরি। এই আর এক পাগল, আজো তিন মাস পুবি নি, ও এখনি পেট ডাগর হইয়াছে কি না তাই দেখ্‌চে।

সর। ক্ষেত্র, তুমি ঝাপটা তুলে ফেলেছ কেন?

ক্ষেত্র। মোর ঝাপটা দেখে মোর ভাশুর বড় খাপা হয়েলো, ঠাক্‌রুণিরি বল্লে ঝাপটা কাটা কস্‌বিদের আর বড়নোকের মেয়েগার সাজে। মুই শুনে নজ্জায় মর্‌য়ে গ্যালাম, সেই দিনি ঝাপটা তুলে ফ্যাল্‌লাম।

সৈরি। ছোট বউ, যাও দিদি কাপড়গুনো তুলে আন গে, সন্ধ্যা হলো।

[আদুরীর পুনঃপ্রবেশ]

সর। (দাঁড়ায়ে) আয় আদুরী ছাদে গিয়ে কাপড় তুলি।

আদুরী। ছোট হালদার আগে বাড়িই আসুক, হা, হা, হা, হা। [সরলতার জিব কেটে প্রস্থান।]

সৈরি (সরোষে এবং হাস্যবদনে) দূর পোড়াকপালি, সকল কথাতেই তামাসা—ঠাকুরুণ কই লো—
[সাবিত্রীর প্রবেশ]

এই যে এসেছেন।

সাবি। ঘোষবউ এইচিস্, তোর মেয়ে এনিচিস্ বেশ করিচিস্—বিপিন আবদার নিচলো তাকে শান্ত কর্য়ে বাইরে দিয়া এলাম।

রেবতী। মাঠাকুরুণ পর্ণাম করি। ক্ষেত্র তোর দিদিমারে পরণাম কর। [ক্ষেত্রমণির প্রণাম]

সাবি। সুখে থাক, সাত বেটার মা হও—(নেপথ্যে কাশি) বড় বউ মা ঘরে যাও, বাবার বুঝি নিদ্রা ভেঙ্গেছে—আহা! বাছার কি সময়ে নাওয়া আছে না সময়ে খাওয়া আছে, ভেবে ভেবে নবীন আমার পাতখানি হয়ে গিয়েছে—(নেপথ্যে “আদুরী”) মা যাও গো জল চাচ্চেন বুঝি।

সৈরি। (জনান্তিকে আদুরীর প্রতি) আদুরী দেখ, তোরে ডাক্চে।

আদুরী। ডাক্চেন মোরে, কিন্তু চাচ্চেন তোমারে।

সৈরি। পোড়ার মুখ—ঘোষদিদি আর একদিন আসিস।
[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান]

রেবতী। মাঠাকুরণ, আর তো এখানে কেউ নেই—মুই তো বড় আপদে পড়িছি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ী এয়েলো—

সাবি। রাম রাম রাম, ও নচ্ছার, বেটীকেও কেউ বাড়ী আস্তে দেয়—বেটীর আর বাকি আছে কি, নাম লেখানেই হয়।

রেবতী। মা, তা মুই করবো কি, মোর তো আর ঘেরা বাড়ী নয়, মর্দেরা ক্ষ্যাতে খামারে গেলি বাড়ী বল্লিই বা কি আর হাট বল্লিই বা কি—গস্তানি বিট বলে কি—মা মোর গাডা কাঁটা দিয়ে ওট্চে—বিটী বলে, ক্ষেত্রকে ছোট সাহেব ঘোড়া চেপে যাতি যাতি দেখে পাগল হয়েচে, আর তার সঙ্গে একবার কুটির কামরাঙ্গার ঘরে যাতি বলেছে।

আদুরী। থু, থু, থু!—গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!—সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি, গোন্দো থু থু! প্যাজির গোন্দো!—মুই তো আর একা বেরোব না, মুই সব সইতি পারি প্যাঁজির গোন্দো সইতি পারিনে—থু, থু, গোন্দো! প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা, তা গোরিবের ধর্ম্ম কি ধর্ম্ম নয়? বিটী বলে, টাকা দেবে, ধানের জমি ছেড়ে দেবে, আর জামাইরি কর্ম্ম কর্য়ে দেবে—পোড়া কপাল টাকার! ধর্ম্ম কি ব্যাচ্বার জিনিস, না এর দাম আছে। কি বল্বো, বিটী সাহেবের নোক, তা নইলি মেয়েনাতি দিয়ে মুখ ভেঙ্গে দেতাম। মেয়ে আমার অবাক হয়েছে, কাল থেকে ঝম্কে ২ ওট্চে।

আদুরী। মাগো, যে দাড়ি! কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লি মুইতো কখনুই যাতি পার্বো না, থু, থু, থু! গোন্দো, প্যাঁজির গোন্দো!

রেবতী। মা সর্বনাশী বলে, যদি মোর সঙ্গো না পেট্য়ে দিস, তবে নেটেলা দিয়ে ধর্য়ে নিয়ে যাবে।

সাবি। মগের মুল্লুক আর কি!—ইংরেজের রাজ্যে কেউ না কি ঘর ভেঙ্গো মেয়ে কেড়ে নিয়ে যেতে পারে।

রেবতী। মা, চাসার ঘরে সব পারে। মেয়েলোক ধরে মরদ্দের কায়দা করে, নীল দাদনে এ কত্তি পারে, নজোরে ধল্লি কত্তি পারে না? মা, জান না, নয়দারা রাজিনামা দিতি চানি বল্যে ওদের মেজো বউরি ঘর ভেঙ্গো ধর্য়ে নিয়ে গিয়েলো।

সাবি। কি অরাজক! সাধুকে এ কথা বলেছ?

রেবতী। না, মা, সে অ্যাকিই নীলির ঘায় লাগল, তাতে এ কথা শুনে কি আর রক্ষে রাখ্‌বে, রাগের মাথায় আপনার মাথায় আপনি কুডুল মেরে বসবে।

সাবি। আচ্ছা, আমি কত্তাকে দিয়ে এ কথা সাধুকে বলবো, তোমার কিছু বল্‌বার আবশ্যক নেই—কি সর্বনাশ! নীলকর সাহেবেরা সব কত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।

রেবতী। ময়রাণী বিটী আর এক কথা বল্যে গ্যাল, তা বুঝি বড়বাবু শুনিন্‌নি—কি একটা নতুন হুকুম হয়েছে, তাতে নাকি কুটেল সাহেবরা মাচেরটক্ সাহেবের সঙ্গো যোগ দিয়ে যাকে তাকে ৬ মাস ম্যাদ দিতি পারে। তা কর্তা মশাইরি নাকি এই ফাঁদে ফ্যালবার পথ কচ্চে।

সাবি। (দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া) ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে, হবে।

রেবতী। মা, কত কথা বল্যে গ্যাল, তা কি আমি বুঝ্‌তি পারি, নাকি এ ম্যাদের পিল্ হয় না।

আদুরী। ম্যাদেরে বুঝি পেটপোড়া খেব্‌য়েচে।

সাবি। আদুরী, তুই একটু চুপ কর বাছা।

রেবতী। কুটির বিবি এই মকদ্দমা পাকাবার জন্যি ম্যাচেরটক্ সাহেবকে চিঠি ন্যাকেচে, বিবির কথা হাকিম নাকি বড়্ডো শোনে।

আদুরী। বিবিরি আমি দেখিছি, নজ্জাও নেই, শরমও সেই—জ্যালার হাকিম মাচেরটক্ সাহেব, কত নাঙ্গা পাক্‌ড়ি, তেরোনাল ফির্‌তি থাকে, মা গো, নাম কল্লি প্যাটের মধ্যি হাত পা সেঁদোয়—এই সাহেবের সঙ্গি ঘোড়া চেপে ব্যাড়াতি এয়েলো। বউ মান্‌সি ঘোড়া চাপে!—কেশের কাকি ঘরের ভাশুরির সঙ্গি হেঁসে কথা কয়েলো, ভাই নোকে কত নজ্জা দেলে, এতো জ্যালার হাকিম।

সাবি। তুই আবাগী কোন্ দিন মজাবি দেক্‌চি। তা সন্ধ্যা হলো, ঘোষবউ তোরা বাড়ী যা, দুর্গা আছেন।

রেবতী। যাই মা, আবার কলুবাড়ী দিয়ে তেল নিয়ে যাব, তবে সাজ জ্বলবে।

[রেবতী ও ক্ষেত্রমনির প্রস্থান]

সাবি। তোর কি সকল কথায় কথা না কইলে চলে না।

[সরলতার কাপড় মাথায় করিয়া প্রবেশ]

আদুরী। এই যে ধোপাবউ কাপড় নিয়ে আলেন।

(সরলতার জিব কেটে কাপড় রাখন)

সাবি। ধোপাবউ কেন হতে গেল লা, আমার সোনার বউ, আমার রাজলক্ষ্মী। (পৃষ্ঠে হস্ত দিয়া) হ্যাঁগা মা, তুমি বই কি আর আমার কাপড় আনিবার মানুষ নাই—তুমি কি এক জায়গায় ১ দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাক্‌তে পার না—এমন পাগ্‌লীর পেটেও তোমার জন্ম হয়েছিল—কাপড়ডায় ফালা দিলে কেমন করে, তবে বোধ করি গায়েও ছড় গিয়েছে—আহা! মার আমার রক্তকমলের মত রং, একটু ছড় লেগেছে যেন রক্ত ফুটে বেরোচ্চে। তুমি মা আর অন্ধকার সিঁড়ি দিয়ে অমন কর্‍্যে যাওয়া আসা করো না।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ]

সৈরি। আয় ছোটবউ ঘাটে যাই।

সাবি। যাও মা, দুই যায়ে এই বেলা থাকতে ২ গা ধুয়ে এস। [সকলের প্রস্থান।]

৮২.৭ সারাংশ

গ্রামের নাম স্বরপুর। গোলোকচন্দ্র বসু গ্রামের সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত পরিবার। তাঁর স্ত্রীর সাবিত্রী পতিব্রতা, আদর্শ গৃহিনী। তাঁর দুই ছেলে নবীনমাধব ও বিন্দুমাধব। পুত্রদ্বয় বিবাহিত—তাঁদের স্ত্রী সৈরিন্ধ্রী ও সরলতা। জ্যেষ্ঠ নবীন পরোপকারী—সহৃদয় ও বলিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষ—গ্রামেই থাকেন, বিষয়সম্পত্তি দেখাশোনা করেন। ছোট বিন্দুমাধব কোলকাতায় কলেজে পড়ে।

সাধুচরণ ও রাইচরণ দুই ভাই—গোলোকের অনুগত প্রতিবেশী রায়ত। রেবতী সাধুচরণের স্ত্রী, ক্ষেত্রমণি তাদের একমাত্র সন্তান—সে বিবাহিতা।

স্বরপুরের অদূরে বেগুনবেড়ের নীলকুঠী। আই. আই. উড ও পি. পি. রোগ দুই ইংরেজ কুঠির মালিক। তারা সরকারের কাছ থেকে পত্তনি নিয়ে দেশীয় দেওয়ান, আমিন ও পেয়াদাদের সাহায্যে আশপাশের গ্রামের জোতদার গাঁতিদার ও প্রজাদের ওপর নির্বিচারে অত্যাচার চালাচ্ছে। মুনাফার লোভে, কর্মচারীদের সাহায্যে প্রজাদের ভাল ভাল জমি চিহ্নিত করে সামান্য দাদন দিয়ে নীলচাষে বাধ্য করছে। বিপন্ন প্রজারা নীলচাষে অনিচ্ছা প্রকাশ করলে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগাল ও নির্মমভাবে চামড়ার চাবুক 'শ্যামকান্ত' দিয়ে প্রহারে জর্জরিত করে, কুঠির অন্ধকার গুদামে আটকে রাখে।

স্বরপুর গ্রামের গরীব চাষীদের উপর নীলচাষের জন্য জুলুম ও নিপীড়ন করলে নবীনমাধব তাদের সাহায্য করেন। এজন্য বসু পরিবারের প্রতি নীলকরদের চরম আক্রোশ। বসু পরিবারকে বিগত বছর ৫০ বিঘা জমিতে নীলচাষ করতে বাধ্য করলে, তাঁদের পাওনা মিটিয়ে দেয়নি, পরন্তু এবছর ৬০ বিঘা জমিতে নীল চাষের জন্য চাপ দেয়। এ অবস্থায় বসু পরিবারকে প্রায় অনাহারে কাটাতে হবে, শত অনুনয় বিনয়েও কোন ফল হয়নি। বরং অপমানিত হয়ে ফিরে আসতে হয়েছে।

সাধুচরণ রাইচরণ সঙ্গতিপন্ন কৃষক পরিবার। রাইচরণ সাধুকে জানায় তাদের সবচেয়ে ভাল জমিতে নীলকরের আমিন দাগ দিয়েছে। এ জমি তো জমি নয় সোনার চাঁপা। এ জমি গেলে সম্বচ্ছরের খাওয়া চলবে কি করে? রাইচরণ আমিনকে বাধা দেওয়ায় পেয়াদা নিয়ে এসে তাদের দু-ভাইকে ধরে নিয়ে যায়। সাধুর মেয়ে ক্ষেত্রমণিকে দেখে তাকে ছোট সাহেবকে উপঢৌকন দেবে ঠিক করে। সে ইতোমধ্যে তার বোনকে উপহার দিয়ে পেস্কারি পেয়েছে।

সাধু ছোট সাহেবের কাছে শত অনুনয় করেও কোন ফল পেল না। প্রত্যুত্তরে তার ওপর নির্যাতন শুরু হোল। নবীনমাধব তাদের পক্ষে সুপারিশ করলে, উড অশিষ্ট ভাষায় অপমানিত করেন। গোপীনাথ নবীনকে বলে, 'আপনি বাড়ী যান। বসুদের পারিবারিক জীবন সুখের, শাশুড়ীর সঙ্গো পুত্রবধূদের সম্পর্ক মধুর। দাসী আদুরীর কথাবার্তা প্রীতি রসসিক্ত। সাধুর স্ত্রী রেবতী এসে জানায় পদী ময়রাণী জানিয়েছে ছোট সাহেব ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যেতে বলেছে, শুনে ক্ষেত্র ঝম্‌কে ঝম্‌কে (চম্‌কে চম্‌কে) উঠছে। শুনে আদুরী বলে সাহেবের মুখে 'প্যাঁজির গোন্দা' মুই সব সইতি পারি, প্যাঁজি গোন্দা সইতে পারি নে।" রেবতী আরও জানায় কুঠীর সাহেবেরা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গো যোগসাজসে কর্তামশায়ের দু মাসের জেলের ব্যবস্থা করেছে। সাবিত্রীর এ সব শুনতে ভাল লাগছিল না, তাই রেবতীকে বিদায় দিলেন।

৮২.৮ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গ্রীক নাট্যশাস্ত্রী অ্যারিস্টটল নাটকের গঠন বিন্যাস প্রসঙ্গো চারটি পর্যায়ের কথা বলেছেন। পর্যায়গুলি হোল ঃ প্রথম, প্রবেশক (Protasis) সংস্কৃত নাটকে একেই বলা হয় মুখসন্ধি, দ্বিতীয়, ঘটনার বিকাশ (Epitasis), তৃতীয়, চরম উৎকর্ষ (catastasis) এবং চতুর্থ, পর্যায় (catastrophe)—এখানেই আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সংস্কৃত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ, তাঁর সাহিত্য দর্পণে নাটকের গঠন আলোচনায় বলেছেন মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ ও উপসংহৃতি বা নির্বহন—এই পঞ্চসন্ধির কথা। ইংরেজি নাটকে একেই পাঁচটি অঙ্ক (Act)-এ বিভাজিত করা হয়েছে। যথা—Exposition, Rising action, Climax, Falling action এবং Catastrophe।

বর্তমান মূলপাঠটি প্রথম অঙ্ক, চারটি গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য (scene)–এ উপস্থাপিত। নাটকীয় ঘটনার কতকগুলি বীজ এই গর্ভাঙ্ক বা দৃশ্য সহযোগে উপস্থিত করা হয়েছে।

প্রথম অঙ্কে গোলোক বসু ও সাধুচরণের কথোপকথন থেকে মুনাফালোভী নীলকরদের রায়ত বা প্রজাদের পীড়নের বিবরণ জানতে পারা যায়। পরে সাধুচরণ ও তার ভাই রাইচরণকে নীলকুঠীর আমিন পেয়াদাসহ এসে বেগুনবেড়ের কুঠীতে ধরে নিয়ে যায়। তারা নয় বিঘা জমিতে নীল চাষে অক্ষমতা জানালে পীড়ন শুরু করে। নবীন বসু তাদের বক্তব্যের সত্যতা জ্ঞাপন করে সহানুভূতির সঙ্গো বিচারের অনুরোধ জানালে, তিনি অপমানিত হন। সাধুচরণের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণির ওপর রোগ সাহেবের দৃষ্টি পড়ে এবং নবীন বসুকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য গোলোক বসুকে জেলে পাঠাবার ষড়যন্ত্র চলে।

এই অঙ্কের মূল প্রতিপাদ্য হোল ঃ অত্যাচারী নীলকরদের কার্যকলাপ প্রদর্শন, নিপীড়িতদের অসহায়তা ও নায়ক চরিত্রের প্রতিরোধ রচনা করবার অভিপ্রায় প্রকাশ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক

কতিপয় অপ্রচলিত শব্দ ও তার অর্থ ঃ

খোরাক—খাদ্য। মাচ—মাছ। গাঁখান—গ্রামখান। দামড়া—বদল। ভ্যালা—ভাল। অবধান—প্রণাম। আজাদের—রাজাদের (রাধাকান্তদেব প্রসঙ্গ)। আবাগী—অভাগী। আসধান—আউসধান। অ্যাকন—এখন। এট্টু—একটু। এতডা—এতটা। একবাল চুল—একরাশ চুল/ একমাথা চুল। কবুল—স্বীকার, সম্মত। কয়েদ—আটক, কস্‌বি—নাগরী বেশ্যা। কসুর—দোষ। কয়েটবা—কায়স্থের। বারবিতি—কৃষিকাজ। কেস্তাবে—কেমন করে। কৌড়ি—বড়ি। ক্যাওটকে—কেওটজাতির লোকের। ক্যান—কেন। খালে—খেলে। খ্যাতি—খেতে। খ্যাদের—খেদের। গড়—প্রণাম। গস্তানি—কুলটা। গাঁতি—জামিদারের অধীন জমি। গেঁজেছো—পচিয়েছ। গোডার—গু-খেকোটার। গোন্দো—গন্ধ। গোস্তাকি—অপরাধ। ঘা—বিপদ। চুঙ্গি—চোঙা, নল। চেয়েলো—চেয়েছিলো। ছুপ্‌দে—চুপ কর। জরু-স্ত্রী। ডবকা—উঠতি বয়স। ডান—দক্ষিণ, ডাইনি। ডুকরে—চিৎকার করে। ঢাল (চুল)—লম্বা, ঘন, গোছা (চুল)। ঢ্যারা সই—টিপ সই। তর্—দেরি। দস্তুর—নিয়ম। দাদন—অগ্রিম। নছিবির—অদৃষ্টের। নয়দারা—নয় ধারা। নাঙ্গা—রাঙ্গা, লাল। নাতি—নাইতে, স্নান। নীলি—নীলে। নেটেলো—লেঠেল। নোনা ফেনা—অনুর্বর (লবণাক্ত)। পালা—ধানের গাদা। বন্দ—জমির খন্ড। বন্দা—বান্দা, ক্রীতদাস। বিদেকাটি—ঘাস, আগাছা তোলবার চিরুণী আকৃতি যন্ত্র নাম 'বিদে'। ভাতার—ভর্তা শব্দের অপভ্রংশ, স্বামী। ভ্যালা—ভাল। মাদ্দের—মাদের। মুসাবিদা—খস্‌ড়া। মেয়ে নাতি—স্ত্রী লোকের লাথি। মেয়েগার—মেয়েদের। মোতাবেক—অনুসারে। ম্যাদ—মেয়াদ, জেল। রোক্—ঝোঁক। সইতে—সই করতে। যেটের বাছা—ষষ্ঠীর পুত্র। সাবেক—পূর্বতন। সেঁস্‌য়ে—শাসিয়ে, হদ্দ—সীমা।

গাঁতি যায় যায়—তালুক ধ্বংস হওয়ার পথে।

কুটির গুদামে ধান খাওয়াইব—নীল কুটির গুদামে অনির্দিষ্ট কালের জন্য আটকে রেখে অত্যাচারের ভয় দেখান।

'প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছাড়'—জীবনপণ করে প্রতিরোধের অভিপ্রায় জ্ঞাপন। দৃঢ়চেতা নবীনমাধবের অত্যাচারীর অত্যাচার প্রতিরোধ করবার দৃঢ় সঙ্কল্প জ্ঞাপন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

জমিতো না, য্যান সোনার চাঁপা—সাঁপোলতলার জমি এত উর্বরা যে তাঁর সোনালি ফসলের প্রাচুর্য সাধু রাইচরণের পরিবারের সম্পদ। মহার্ঘ সম্পদের এই পরিচয় তুলে ধরতে 'সোনার চাঁপা'—এই অলঙ্কৃত উপমা ব্যবহার করেছে।

এক কোন্ কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম—জমির ফসলের একটা অংশ বিক্রী করলে মহাজনের দেনা শোধ হোত।

কারকিতী—জমির যত্ন। ফসল উৎপাদনের জন্য জমিতে যে যত্ন করতে হয়।

নীলের গাদন—বলপূর্বক দাদন বা অগ্রিম দিয়ে বিনিময়ে নীলচাষ করতে বাধ্য করানকে গাদন বলে ব্যঙ্গ করা হয়েছে। গাদন—জোর করে বা ঠেসে বা চেপে ভর্ত্তি করা।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

না-লায়েক—অনুপযুক্ত। ফার্সী শব্দ।

শ্যামচাঁদ বেগোর তোম্ দোরস্ত্ হোগা নেই—অর্থাৎ শ্যামচাঁদ ছাড়া তুমি ঠিক হবে না। শ্যামচাঁদ-চামড়ার চাবুক। এটি ব্যবহার করত লারমুর নামে জনৈক কুঠিয়াল।

বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে—গোপীনাথ-এর কাজে অপটুতায় ক্ষুব্ধ উড সাহেব একথা বলেছেন। গোপীনাথ, তাঁর ত্রুটি ধরা পড়তেই নবীন মাধবের ওপর সব দোষ চাপিয়ে দেয়, দেখে উড এ কথা বলেছেন।

চতুর্থ গর্ভা

শ্যামা ঠাকুরুণের কেশ—সরলতার মাথায় চুলের প্রাচুর্য দেখে সৈরিন্ধ্রী কালী ঠাকুরের চুলের সঙ্গো তুলনা করেছে।

খামাত্তে—খামার হতে। পাতখানি হয়ে গিয়েছে—পাতার মত রোগা হয়ে গিয়েছে। এরা সাহেবদের চণ্ডাল—সাবিত্রী এতদিন সাহেবদের সুবিচার ও গুণাবলীর পরিচয় জেনে এসেছে। নীলকরদের বৃত্তান্ত শুনে তিনি মন্তব্য করেছেন—এঁরা সাহেবদের মধ্যে কুলাঙ্গার। চণ্ডালদের মত হীন ও অধঃপতিত।

নেটেলা—লাঠিয়াল, মাচের টক্ সাহেব—ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। তেরো নাল ফিরতি থাকে—তরোয়ালধারীরা ঘুরতে থাকে।

বউ মান্সি ঘোড়া চাপে—কুঠির বিধি ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গো ঘোড়ায় চাপে দেখে আদুরির গ্রামীণ সংস্কার আহত বোধ করে। ঘরের বৌ পর পুরুষের সঙ্গো ঘোড়ায় চেপেছে, এটি সে বরদাস্ত করতে পারে না।

তুই আবাগি কোন দিন মজাবি—আদুরি তার প্রগলভ উক্তির দ্বারা কোন দিন বিপদ ডেকে আনবে। সাবিত্রী এই আশঙ্কা থেকে কথাটি বলেছে। ধোপা বউ কাপড় নিয়ে আলেন—কথাটি রঙ্গপ্রিয় আদুরির। সে ঘোমটা পরা সরলতাকে দেখে রসিকতা করে একথা বলেছে।

['নীলদর্পণ' নাটকের প্রথম অংশে নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে। বাংলার সাধারণ গ্রাম্যচাষী ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থ পরিবার ইংরেজদের সংগঠিত অত্যাচারের বিরুদ্ধে তখনও সংঘবদ্ধ ছিল না, মাঝেমধ্যে কোন কোন অঞ্চলে বিচ্ছিন্ন প্রতিবাদ জানিয়ে নিপীড়িত হচ্ছে তার পরিচয় এই অঙ্কটি থেকে জানা যাচ্ছে। এ পর্বে পল্লী বাংলায় সাধারণ নরনারী অর্থনৈতিক ও পারিবারিক জীবনে যে কতটা বিপন্ন ছিল, তার পরিচয় পাওয়া যায়।

Exposition হিসাবে নাটকের প্রধান প্রধান কুশীলবদের সঙ্গো পর্যায়ক্রমে চারটি দৃশ্যে পরিচয় ঘটেছে। চরিত্রগুলির পারিবারিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপট সহজ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

দীনবন্ধুর সংলাপ রচনার ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় দিকই এই সঙ্গে সঙ্গে আভাসিত হয়েছে। দীনবন্ধুর প্রথম নাট্যপ্রয়াস হিসেবে তাঁর মনন ও সমাজ হিতৈষণার পরিচয় এই অঙ্ক-দৃশ্যে প্রতিফলিত।]

৮২.৯ নীলদর্পণ মূলপাঠ—২

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির গুদামঘর

(তোরাপ ও আর চারি জন রাইয়ত উপবিষ্ট)

তোরাপ। ম্যারে ক্যান ফ্যালায় না, মুই নেমোখ্যারামি কত্তি পার্‌বো না—ঝে বড়বাবুর জন্যি জাত বাঁচেচে, ঝার হিল্লেয় বস্‌তি কত্তি নেগিচি, ঝে বড়বাবু হাল গোরু বেঁচ্‌য়ে নে ব্যাড়াচ্ছে, মিত্যে সাক্ষি দিয়ে সেই বড়বাবুর বাপকে কয়েদ করে দেব? মুই তো কখনুই পারবো না—জান্ কবুল।

প্রথম রাই। কুঁদির মুখি বাঁক্ থাক্‌বে না, শ্যামাচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা। মোদের চকি কি আর চামড়া নেই, না মোরা বড়বাবুর নুন খাইনি—তা করবো কি, সাক্ষি না দিলি যে আস্ত রাখে না—উট সাহেব মোর বুকি দেঁড়্‌য়ে উটেলো—দ্যাদিনি অ্যাকন তবাদি অক্ত ঝোজানি দিয়ে পড়চে—গোডার পা য্যান বলদে গোরুর খুর।

দ্বিতীয়। প্যারেকের খোঁচা—সাহেবেরা যে প্যারেকমারা জুতো পরে জানিস নে!

তোরাপ। (দন্ত কিড়্‌মিড়্ করিয়া) দুত্তোর প্যার্যেকের মার প্যাট কর্যে, লৌ দেখে গাডা মোর ঝাঁকি মেরে ওট্‌চে। উঃ, কি বলবো, সমিন্দিরি অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এম্‌নি থাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়্‌য়ে দেই, ওর গ্যাড্ ম্যাড্ করা হের ভেতর দে বার করি।

তৃতীয়। মুই টিকিরি—জোন খাটে খাই। মুই কত্তা মশার সলা শুনে নীল কল্লাম না, বল্লি তো খাটবে না, তবে মোরে গুদোমে পোর্‌লে ক্যান্—তানার সেমন্‌তোনের দিন ঘুন্‌য়ে এস্‌তেচে, ভেবেলাম এই হিড়িকি খাটে কিছু পুঁজি করবো, কর্যে সেমন্‌তোনের সমে পাঁচ কুটুম্বর খবর নেব, তা গুদোমে ৫ দিন পচ্‌তি লেগিচি, আবার ঠ্যাল্‌বে সেই আন্দারবাদ।

দ্বিতীয়। আন্দারবাদে মুই অ্যাকবার গিয়েলাম—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সক্‌লি ভাল বলে—ঐ সমুন্দি মোরে অ্যাকবার ফোজদুরিতি ঠেলেলো। মুই সেরের কেচ্‌রির ভেতর অনেক তাম্‌সা দেখেলাম। ওয়াঃ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্ সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, দুই সুমুন্দি মোক্তায় ওম্‌নি র, র, কর্যে অ্যাসেছে, হেড়া হিড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমাদ্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ুই বেদ্‌লো!

তোরাপ। তোর দোষ পেয়েলো কি? ভাবনাপুরীর সাহেবতো মিছে হ্যাংনামা করে না। সাচা কথা

কবো, ঘোড়া চড়ে যাব। সব সমিন্দি যদি ঐ সমিন্দির মতে হতো, তা হলি সমিন্দিগার এত বদনাম নট্‌তো না।

দ্বিতীয়। আহ্লাদে যে আর বাচিনে গা—

ভাল ২ করে গ্যালাম কেলোর মার কাছে।

কেলোর মা বলে আমার জামার সঙ্গে আছে।।

এব্‌রে ও সুনিন্দির ইক্‌সুল করা বেইরে গেছে, সুমিন্দির গুদোম্‌তে সাতটা বেয়েত বেইরেছে। অ্যাকটা নিচু ছেলে। সুমিন্দি গাই বাচুর গুদোমে ভরেলো—সুমিন্দি যে ঘোঁটা মাত্তি লেগেছে, বাবা।

তোরাপ। সমিন্দিরে ভাল মানুষ পালি খ্যাতি আসে, মাচেরটক্‌ সাহেবডারে গাংপার করবার কোমেট কত্তি লেগেছে।

দ্বিতীয়। এ জেলার মাচেরটক্‌ না—ও জেলার মাচেরটকের দোষ পালে কি তাও তো বুঝ্‌তি পারচি নে।

তোরাপ। কুটি খাতি যাই নি। হাকিমডেরে গাঁতবার জন্যি খানা পেক্‌য়েলো, হাকিমডে চোরা গোরুর মত পেল্‌য়ে রলো, খাতি গেল না—ওডা বড় নোকের ছাবাল, নীল মামদোর বাড়ী যাবে ক্যান। মুই ওর অন্‌তেরা পেইচি, এ সমিন্দিরে বেলাতের ছোটনোক।

প্রথম। তবে এগোনের গারনাল সাহেব কুটি কুটি আইবুড়ো ভাত খেয়ে বেড়্‌য়েলে ক্যামন করে? দেখিস্‌ নি, সুমুন্দিরে গোঁট বেঁদে তাঁনারে বর সেজ্‌য়ে মোদের কুটিতে এনেলো?

দ্বিতীয়। তানার বুঝি ভাগ ছেল।

তোরাপ। ওরে না, লাট সাহেব কি নীলির ভাগ নিতি পারে। তিনি নাম কিন্‌তি এয়েলেন। হালের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচ্‌য়ে নাকে, মোরা প্যাটের ভাত করো খাতি পার্‌বো, আর সমিন্দির নীল মামদো ঘাড়ে চাপতি পারবে না—

তৃতীয়। (সভয়ে) মুই তবে মলম, মামদো ভূতি পালি নাকি ঝক্কোতে ছাড়ে না? বউ যে বলেলো।

তোরাপ। এ মান্নির ভাইরি আনেচে ক্যান? মান্নির ভাই নচা কথা সোমোজ কত্তি পারে না—সাহেবগার ডরে নোক সব গাঁছাড়া হতি নেগলো, তাই বচোরদ্দি নানা নচে দিয়েলো—

ব্যারালচোকো হাঁদা হেম্‌দো!
নীলকুটির নীল মেম্‌দো।।

বচোরদ্দি নানা কবি নচ্‌তি খুব।

দ্বিতীয়। নিতে আতাই একটা নচেচে শুনিস্‌নি।

“জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।।

তোরাপ। এগুল নচন নচেচে ; “জাত মাল্লে” কি?

দ্বিতীয়। “জাত মাল্লে পাদ্‌রি ধরে।
ভাত মাল্লে নীল বাঁদরে।।”

চতুর্থ। হা! মোর বাড়ী যে কি হতি নেগেচে তা কিছুই জানতি পাল্লাম না—মুই হলাম ভিনগাঁর রেয়েত, মুই স্বরপুর আলাম কবে, তা বস মশার সলায় পড়ে দাদন ঝ্যাড়ে ফ্যাল্লাম? মোর কোলের ছেলেডার গা তেতো করোলো, তাইতি বস মশার কাছে মিচ্রি নিতি অ্যাকবার ভরপুর আয়েলাম। আহা কি দয়ার শরীল, কি চেহারার চটক, কি অরপুরুব রুপী দেখেলাম, বসে আছেন য্যান গজেন্দ্রগামিনী।

তোরাপ। এবার ক কুড়ো ঢুক্য়েচে?

চতুর্থ। গ্যাল বার দশ কুড়ো করেলাম, তার দাম দিতি আদাখ্যাচড়া কল্লে—এবারে ১৫ বিঘের দাদন গতিয়েছে, ঝা বল্‌চে তাই কচ্চি তবু তো ব্যাভ্রম কত্তি ছাড়ে না।

প্রথম। মুই দু বচ্ছোর ধরে নাঙ্গাল দিয়ে এক বন্দ জমি তোল্লাম, এই বারে যো হয়েলো, তিলির জন্যিই জমিডে রেখেলাম, সে দিন ছোট সাহেব ঘোড়া চাপে অ্যাসে দেঁড়্য়ে থেকে জমিডেয় মার্গ মারালে। চাসার কি আর বাঁচন আছে?

তোরাপ। এডা কেবল আমীন সমিন্দির হির্‌ভিতি। সাহেব কি সব জমির খবর নাকে। ঐ সমিন্দি সব ঢুঁড়ে বার করে দেয়। সমিন্দি য্যান হন্নে কুকুরের মত ঘুরে ব্যাড়ায়, ভাল জমিডে দ্যাখে, ওমনি সাহেবের মার্গ মারে। সাহেবের তো ট্যাকার কমি নি, ওর তো আর মহাজন কত্তি হয় না, সুমিন্দি তবে ওমন করে মরে ক্যান—নীল কর্‌বি, তা কর, দামড়া গোরু কেন, নাঙ্গাল বেন্য়ে নে, নিজি না চস্‌তি পারিস মেইন্দার রাখ, তোর জমির কমি কি, গাঁকে গাঁ ক্যান্ চসে ফ্যাল না, মোরা গাঁতা দিতি তো নারাজ নই, তা হলি দু সনে নীল যে ছেপ্‌য়ে উট্‌তি পারে, সমিন্দি তা করবে না, মান্নির ভার নেয়েতের হেই বড় মিষ্টি নেগচে, তাই চোস্‌চেন, তাই চোসচেন—(নেপথ্যে হা, হো, হো, মা, মা) গাজিসাহেব, গাজিসাহেব, দরগা, দরগা, তোরা আম নাম কর, এডার মদ্দি ভূত আছে। চুপ দে চুপ দে—

(নেপথ্যে—হা নীল! তুমি আমারদিগের সর্বনাশের জন্যই এদেশে এসেছিলে—আহা! এ যন্ত্রণা যে আর সহ্য হয় না, এ কানসারণের আর কত কুটি আছে না জানি, দেড় মাসের মধ্যে ১৪ কুটির জল খেলেম, এখন কোন্ কুটিতে আছি, তাও তো জানিতে পারিলাম না, জানিবই বা কেমন করে, রাত্রিযোগে চক্ষু বন্ধন করিয়া এক কুটি হইতে অন্য কুটি লইয়া যায়, উঃ মাগো তুমি কোথায়।)

তৃতীয়। আম, আম, আম, কালী, দুর্গা, গণেশ, অসুর!—

তোরাপ। চুপ, চুপ।

(নেপথ্যে। আহা! ৫ বিঘা হারে দাদন লইলেই এ নরক হইতে ত্রাণ পাই—হে মাতুল! দাদন লওয়াই কর্তব্য। সংবাদ দিবার তো আর উপায় দেখি নে প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়েছে, কথা কহিবার শক্তি নাই, মা গো! তোমার চরণ দেড় মাস দেখিনি।

তৃতীয়। বউরি গিয়ে এ কথা বলবো—শুন্‌লি তো মর্য়ে ভুত হয়েচে তবু দাদনের হাত ছাড়াতি পারি নি।

প্রথম। তুই মিনসে এমন হেব্‌লো।—

তোরাপ। ভাল মান্‌সির ছাবাল—মুই কথায় জান্‌তি পেরিছি—পরাণে চাচা, মোরে কাঁদে কত্তি পারিস মুই ঝরকা দিয়ে ওরে পুচ করি ওর বাড়ী কনে—

প্রথম। তুই নে নেড়ে।

তোরাপ। তবে তুই মোর কাঁদে উটে দ্যাক্—(বসিয়া) ওট—(কান্ধে উঠন) দ্যাল ধরিস্‌, ঝরকার কাছে মুখ নিয়ে যা—(গোপীনাথকে দূরে দেখিয়া) চাচা লাব, চাচা লাব, গুপে সুমিন্দি আস্‌চে। (প্রথম রাইয়তের ভূমিতে পতন)

[গোপীনাথ ও রামকান্ত হস্তে করিয়া রোগ সাহেবের প্রবেশ]

তৃতীয়। দেওয়ানজী মশাই, এই ঘড়ডার মধ্যি ভুত আছে। এত বেল কান্ত নেগেলো।

গোপী। তুই যদি যেমন শিখাইয়া দেই তেমনি না বলিস তবে তুই ওমনি ভূত হবি। (জনান্তিকে রোগের প্রতি) মজুমদারের বিষয় এরা জানিয়েছে, এ কুটিতে আর রাখা নয়। ও ঘরে রাখাই অবিধি হইয়াছিল—

রোগ। ও কথা পরে শোনা যাবে। নারাজ আছে কে, কোন্ বজ্জাত নষ্ট? (পায়ের শব্দ)

গোপী। এরা সব দোরস্ত হয়েছে। এই নেড়ে বেটা ভারি হারামজাদা, বলে নেমক্‌হারামি করিতে পারিব না।

তোরাপ। (স্বগত) বাবা রে! যে নাদ্‌না, অ্যাকন্ তো নাজি হই, ত্যাকন ঝা জানি তা কর্‌বো। (প্রকাশ্যে) দোই সাহেবের, মুইও সোদা হইচি।

রোগ। চপরাও, শূয়ারকি বাচ্চা! রামকান্ত বড় মিষ্টি আছে। (রামকান্তাঘাত এবং পায়ের গুঁতা)

তোরাপ। আল্লা! মাগো গ্যালাম, পরাণে চাচা, একটু জল দে, মুই পানি তিসেয় মলাম্, বাবা, বাবা, বাবা—

রোগ। তোর মুখে পেসাব করে দেবে না? (জুতায় গুঁতা)

তোরাপ। মোরে ঝা বল্‌বা মুই তাই করবো—দোই সাহেবের, দোই সাহেবের, খোদার কসম।

রোগ। বাঞ্চতের হারামজাদ্‌কি ছেড়েছে। আজ রাত্রে সব চালান দেবে। মুক্তিয়ারকে লেখ, সাক্ষ্য আদায় না হোলে কেউ বাইরে যেতে না পায়। পেস্কার সঙ্গে যাবে—(তৃতীয় রাইয়তের প্রতি) তোম রোতা হায় কাহে? (পায়ে গুঁতা)

তৃতীয়। বউ তুই কনে রে, মোরে খুন কর্যে ফ্যালালে, মা রে, বউ রে, মা রে, মেলে রে, মেলে রে (ভূমিতে) চিত হইয়া পতন)

রোগ। বাঞ্চৎ বাউরা হায়।

গোপী। কেমন তোরাপ, প্যাঁজ পয়জার দুই তো হলো।

তোরাপ। দেওয়ানজি মশাই, মোরে এট্টু পানি নি দিয়ে বাঁচাও, মুই মলাম।

গোপী। বাবা নীলের গুদাম, ভাবরার ঘর, ঘামও ছোটে, জলও খাওয়ায়। আয় তোরা সকলে আয়, তোদের একবার জল খাইয়ে আনি।

[সকলের প্রস্থান।]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

বিন্দুমাধবের শয়নঘর

(লিপিহস্তে সরলতা উপবিষ্ট)

সর।   সরলা ললনা জীবন এল না।
        কমল হৃদয় দিবরদ দলনা।

বড় আশায় নিরাশ হলেম। প্রাণেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় নবসলিলশীকরাকাঙ্ক্ষিণী চাতকিনী অপেক্ষাও ব্যাকুল হয়েছিলাম। দিন গণনা করিতেছিলাম যে দিদি বলেছিলেন, তা তো মিথ্যা নয়, আমার এক এক দিন এক এক বৎসর গিয়েছে। (দীর্ঘ নিশ্বাস) নাথের আসার আশা তো নির্মূল হইল, এক্ষণে যে মহৎ কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছেন তাহাতে সফল হইলেই তাঁর জীবন সার্থক—প্রাণেশ্বর, আমাদের নারীকুলে জন্মে, আমরা পাঁচ বয়স্যায় একত্রে উদ্যানে যাইতে পারি না, আমরা নগরভ্রমণে অক্ষম, আমাদিগের মঙ্গলসূচক সভা স্থাপন সম্ভবে না, আমাদের কালেজ নাই কাছারী নাই, ব্রাহ্মসমাজ নাই—রমণীর মন কাতর হইলে বিনোদনের কিছুমাত্র উপায় নাই, মন অবোধ হইলে মনের তো দোষ দিতে পারি না। প্রাণনাথ আমাদের একমাত্র অবলম্বন—স্বামীই ধ্যান, স্বামীই জ্ঞান,স্বামীই অধ্যয়ন, স্বামীই উপার্জন, স্বামীই সভা, স্বামীই সমাজ, স্বামীরত্নই সতীর সর্বস্বধন। হে লিপি, তুমি আমার হৃদয়বল্লভের হস্ত হইতে আসিয়াছ, তোমাকে চুম্বন করি (লিপিচুম্বন)। তোমাতে আমার প্রাণকান্তের নাম লেখা আছে, তোমাকে তাপিত বক্ষে ধারণ করি (বক্ষে ধারণ)। আহা! প্রাণনাথের কি অমৃত বচন, পত্রখানি যত পড়ি ততই মন মোহিত হয়, আর একবার পড়ি (পঠন) ঃ

প্রাণের সরলা।

তোমার মুখারবিন্দু দেখিবার জন্য আমার প্রাণ যে কি পর্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছে, তাহা পত্রে ব্যক্ত করা যায় না। তোমার চন্দ্রানন বক্ষে ধারণ করিয়া আমি কি অনির্বচনীয় সুখ লাভ করি। মনে করিয়াছিলাম সেই সুখের সময় আসিয়াছে, কিন্তু হরিষে বিষাদ, কালেজ বন্ধ হইয়াছে, কিন্তু বড় বিপদে পড়িয়াছি, যদি পরমেশ্বরের আনুকূল্যে উত্তীর্ণ হইতে না পারি, তবে আর মুখ দেখাইতে পারিব না। নীলকর সাহেবেরা গোপনে গোপনে পিতার নামে এক মিথ্যা মোকদ্দমা করিয়াছে, তাহাদের বিশেষ যত্ন তিনি কোনরূপে কারাবদ্ধ হন। দাদা মহাশয়কে এ সংবাদ আনুপূর্বিক লিখিয়া আমি এখানকার তদবিরে রহিলাম। তুমি কিছু ভাবনা করো না, করুণাময়ের কৃপায় অবশ্যই সফল হইব। প্রেয়সি, আমি তোমার বঙ্গভাষার সেক্সপিয়ারের কথা ভুলি নাই, এক্ষণ বাজারে পাওয়া যায় না, কিন্তু প্রিয়বয়স্য বঙ্কিম তাঁহার খান দিয়াছেন, বাড়ী যাইবার সময় লইয়া যাইব—বিধুমুখি, লেখাপড়ার সৃষ্টি কি সুখের আকর, এত দূরে থাকিয়েও

তোমার সহিত কথা কহিতেছি। আহা! মাতাঠাকুরাণী যদি তোমার লিখনের প্রতি আপত্তি না করিতেন তবে তোমার লিপিসুধা পান করে আমার চিত্তচকোর চরিতার্থ হইত ইতি।

তোমারি বিন্দুমাধব।

আমারি—তাতে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে, প্রাণেশ্বর, তোমার চরিত্রে যদি দোষ স্পর্শে তবে সুচরিত্রের আদর্শ হবে কে?—আমি স্বভাবতঃ চঞ্চল, এক স্থানে এক দণ্ড স্থির হয়ে বসিতে পারি নে বলে ঠাকুরুণ আমাকে পাগ্‌লির মেয়ে বলেন। এখন আমার সে চাঞ্চল্য কোথায়। যে স্থানে বসে প্রাণপতির পত্র খুলিয়াছি সেই স্থানেই এক প্রহর বসে আছি। আর উপরের চঞ্চলতা অন্তরে প্রবেশ করিয়াছে। ভাত উথলিয়া ফেনাসমূহে আবৃত হইলে উপরিভাগ স্থির হয়, কিন্তু ভিতরে ফুটিতে থাকে আমি এখন সেইরূপ হইলাম। আর আমার সেই হাস্যবদন নাই। হাঁসি সুখের রমণী, সুখের বিনাশে হাঁসির সহমরণ। প্রাণনাথ, তুমি সফল হইলেই সকল রক্ষা, তোমার বিরস বদন দেখিলে আমি দশ দিক্ অন্ধকার দেখি। এ অবোধ মন! তুমি প্রবোধ মানিবে না? তুমি অবোধ হইলে পার আছে, তোমার কান্না কেহ দেখিতে পায় না, কেহ শুনিতেও পায় না। কিন্তু নয়ন, তুমিই আমাকে লজ্জা দেবে ; (চক্ষু মুছিয়ে) তুমি শান্ত না হইলে আমি ঘরের বাহিরে যেতে পারি নে—

[আদুরীর প্রবেশ]

আদুরী। তুমি কত্তি লেগেচো কি? বড় হালদার্নি যে ঘাটে যাতি পাচ্চে না, কল্লে কি, ঝার পানে চাই তানারি মুখ তোলো হাঁড়ি—

সর। (দীর্ঘনিশ্বাস) চল যাই।

আদুরী। তেলে দেক্‌চি অ্যাকন হাত দেউনি। চুলগল্লাডা কাদা হতি লেগেচে, চিঠিখান অ্যাকন ছাড়নি—ছোট হালদার ঝ্যাত চিটিতি মোর নাম ন্যাকে দেয়।

সর। বড় ঠাকুর নেয়েছেন?

আদুরী। বড় হালদার যে গাঁয় গ্যাল, জ্যালায় যে মকদ্দমা হতি লেগেছে, তোমার চিটিতি ন্যাকি নি—কত্তামশাই যে কানতি নেগলো।

সর। (স্বগত) প্রাণনাথ, সফল না হইলে যথার্থই মুখ দেখাইতে পারিবে না। (প্রকাশ্যে) চল, রান্না ঘরে গিয়ে তেল মাখি। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

স্বরপুর, তেমাথা পথ

(পদী ময়রাণীর প্রবেশ)

পদী। আমিন আঁটকুড়ির বেটাই তো দেশ মজাচ্চে। আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবেরে ধরে দিয়ে আপনার পায় আপনি কুড়ুল মারি—রেয়ে যে খেঁটে এনেছিল, সাধুদাদা না ধরলিই জন্মের মত ভাত কাপড় দিত—আহা! ক্ষেত্রমণির মুখ দেখলে বুক ফেটে যায়—উপপতি করিছি বলে কি আমার শরীরে

দয়া নেই—আমারে দেখে ময়রা পিসি, ময়রা পিসি, বলে কাছে আসে। এমন সোনার হরিণ মা না কি প্রাণ ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে।—ছোট সাহেবের আর আগায় না, আমি রয়েছি, কলিবুনো রয়েছে—মা গো, কি ঘৃণা, টাকার জন্যে জাত জন্ম গেল, বুনোর বিছানা ছুতে হলো, বড় সাহেব ড্যাক্‌রা আমারে দ্যাকমার করেছে, বলে নাক কান কেটে দেবে—ড্যাক্‌রার ভীমরতি হয়েছে, ভাতারখাগীর ভাতার মেয়েমানুষ ধরে গুদোমে রাখতে পারে, মেয়েমানুষের পাছায় নাতি মারতে পারে, ড্যাকবার সে রকম তো একদিন দেখলাম না। যাই আমিন কালামুখরে বলি গে, আমারে দিয়ে হবে না—আমার কি গাঁয় বেরোবার যো আছে, পাড়ার ছেলে আঁটকুড়ির বেটারা আমারে দেখলে যেন কাকের পিছনে ফিঙ্গে লাগে।

(নেপথ্যে গীত)

যখন ক্ষ্যাতে, ক্ষ্যাতে বসে ধান কাটি।
মোর মনে জাগে, ও তার লয়ান দুটি ।।

(একজন রাখালের প্রবেশ)

রাখাল। সায়েব, তোমার নীলির চারায় নাকি পোকা ধরেছে?

পদী। তোর মা বনের গে ধরুক, আঁটকুড়ির বেটা, মার কোল ছেড়ে যাও, যমের বাড়ী যাও, কলমিঘাটায় যাও—

রাখাল। মুই দুটো নিড়িন গড়াতি দিউচি—

[একজন লাঠিয়ালের প্রবেশ]

বাবারে! কুটির নেটেলা। [রাখালের বেগে পলায়ন।]

লাঠি। পদ্মমুখি, মিশি মাগ্‌গি কর্‌য়ে তুল্যে যে।

পদী। (লাঠিয়ালের গোটের প্রতি দৃষ্টি করে) তোর চন্দ্রহারের যে বাহার ভারি।

লাঠি। জান না প্রাণ, প্যায়দার পোশাক, আর নটীর বেশ।

পদী। তোর কাছে একটা কাল বক্‌না চেয়েছিলুম তা তুই আজও দিলি নে। আর কখন তো ভাই তোর কাছে কিছু চাব না।

লাঠি। পদ্মমুখি, রাগ করিস্ নে। আমরা কাল শ্যামনগর লুট্‌তে যাব, যদি কাল বক্‌না পাই, সে তোর গোয়ালঘরে বাঁদা রয়েছে। আমি মাচ নিয়ে যাবার সময় তোর দোকান দিয়ে হয়ে যাব।

[লাঠিয়ালের প্রস্থান।]

পদী। সাহেবদের লুট বই আর কাজ নাই। কম্‌য়ে জময়ে দিলে চাসারাও বাঁচে, তোদেরও নীল হয়। শামনগরের মুন্সীরে ১০ খান জমি ছাড়্‌বার জন্যে কত মিনতি কল্যে। "চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী।" বড় সায়েব পোড়ারমুখো পোড়ার মুখ পুড়েয়ে বসে রলো।

[চারি জন পাঠশালার শিশুর প্রবেশ]

চারি জন শিশু। (পাততাড়ি রেখে করতালি দিয়া)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।

পদী। ছি বাবা কেশব, পিসি হই এমন কথা বলে না।

৪জন শিশু। (নৃত্য করে)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।

পদী। ছি দাদা অম্বিকে, দিদিকে ও কথা বলতে নাই—

৪ জন শিশু। (পদী ময়রাণীকে ঘুরে নৃত্য)

ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।
ময়রাণী লো সই। নীল গেঁজোছো কই।।

[নবীনমাধবের প্রবেশ]

পদী। ও মা, কি লজ্জা! বড়বাবুকে মুখখান দেখালাম। [ঘোম্‌টা দিয়া পদীর প্রস্থান।

নবীন। দুরাচারিণী, পাপীয়সী—(শিশুদের প্রতি) তোমরা পথে খেলা করিতেছ, বাড়ী যাও, অনেক বেলা হইয়াছে— [৪ জন শিশুর প্রস্থান।]

আহা! নীলের দৌরাত্ম্য যদি রহিত হয়, তবে আমি পাঁচ দিবসের মধ্যে এই সকল বালকদের পাঠের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়া দিতে পারি। এ প্রদেশের ইনিস্পেক্টর বাবুটি অতি সজ্জন, বিদ্যা জন্মিলে মানুষ কি সুশীল হয়, বাবুজি বয়সে নবীন বটেন, কিন্তু কথায় বিলক্ষণ প্রবীণ। বাবুজির নিতান্ত মানস, এখানে একটি স্কুল স্থাপন হয় আমি এ মাঙ্গলিক ব্যাপারে অর্থব্যয় করিতে কাতর নই, আমার বড় আটচালা পরিপাটি বিদ্যামন্দির হইতে পারে, দেশের বালকগণ আমার গৃহে বসিয়া বিদ্যার্জন করে, এর অপেক্ষা আর সুখ কি, অর্থের ও পরিশ্রমের সার্থকতাই এই। বিন্দুমাধব, ইনিস্পেক্টর বাবুকে সমভিব্যাহারে আনিয়াছিল, বিন্দুমাধবের ইচ্ছা, গ্রামের সকলেই স্কুলস্থাপনে সমোদ্যোগী হয়। কিন্তু গ্রামের দুর্দশা দেশে ভায়ার মনের কথা মনেই রহিল—বিন্দু আমার কি ধীর, কি শান্ত, কি সুশীল, কি বিজ্ঞ, অল্প বয়সের বিজ্ঞতা চারাগাছের ফলের ন্যায় মনোহর। ভায়া লিপিতে যে খেদোক্তি করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে পাষাণ ভেদ হয়, নীলকরেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়।—বাড়ী যাইতে পা উঠে না, উপায় আর কিছু দেখিনে, পাঁচ জনের একজনও হস্তগত করিতে পারিলাম না, তাহাদের কোথায় লইয়া গিয়াছে কেহই বলিতে পারে না। তোরাপ বোধ করি কখনই মিথ্যা বলিবে না। অপর চারিজন সাক্ষ্য দিলেই সর্বনাশ, বিশেষ আমি এপর্যন্ত কোন যোগাড় করিতে পারি না, তাহাতে আমরা ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব উড সাহেবের পরম বন্ধু।

[একজন রাইয়ত, দুইজন ফৌজদারির পেয়াদা এবং কুটির তাইদ্‌গিরের প্রবেশ]

রাইয়ত। বড়বাবু, মোর ছেলে দুটোরে দেখো, তাদের খাওয়াবার আর কেউ নেই—গেল সন আট গাড়ী নীল দেলাম তার একটা পয়সা দেলে না, আবার বকেয়াবাকি বলে হাতে দড়ি দিয়েছে, আবার আন্দারবাদ নিয়ে যাবে—

তাইদ। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা, এক বার লাগলে আর ওঠে না—তুই বেটা চল্, দেওয়াঞ্জির কাছ দিয়ে হোয়ে যেতি হবে। তোর বড়বাবুরও এম্‌নি হবে।

রাইয়ত। চল্ যাব, ভয় করি নে, জেলে পচে মরবো, তবু গোড়ার নীল করবো না—হা বিদেতা, হা বিদেতা, কাঙ্গালেরে কেউ দেখে না (ক্রন্দন)। বড়বাবু মোর ছেলে দুটোরে খাতি দিও গো, মোরে মাটেত্তে ধরে আন্‌লে তাদের একবার দেক্‌তি পালাম না। [নবীনমাধব ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নবীন। কি অবিচার! নবপ্রসূতি শশারু কিরাতের করগত হইলে শাবকগণ যেমন অনাহারে শুষ্ক হইয়া মরে, সেইরূপ এই রাইয়তের বালকদ্বয় অন্নাভাবে মরিবে। [রাইচরনের প্রবেশ]

রাই। দাদা না ধল্লিই গোড়ার মেয়েরে দাম টাসা করেলাম, মেরে তো ফ্যাল্‌তাম, ত্যাকন না হয়, ৬ মাস ফাঁসি য্যাতাম, শালি।—

নবীন। ও রাইচরণ, কোথায় যাস?

রাই। মাঠাকুরুণ পুটঠাকুরকে ডেকে আন্‌তি বল্লে—পদী গুড়ি বল্লে তলপের প্যায়দা কাল আস্‌বে। [রাইচরণের প্রস্থান।]

নবীন। হা বিধাতঃ এ বংশে কখন যা না হইয়াছিল তাই ঘটিল—পিতা আমার অতি নিরীহ, অতি সরল, অতি অকপটচিত্ত, বিবাদ বিসংবাদ কারে বলে জানেন না, কখন গ্রামের বাহির হন না, ফৌজদারির নামে কম্পিত হন, লিপি পাট করে চক্ষের জল ফেলিয়াছেন, ইন্দ্রাবাদে যাইতে হইলে ক্ষিপ্ত হইবেন, কয়েদ হলে জলে ঝাঁপ দিবেন হা! আমি জীবিত থাকিতে পিতার এই দুর্গতি হবে। মাতা আমার পিতার ন্যায় ভীতা নন, তাঁহার সাহস আছে, তিনি একেবারে হতাশ হন না, তিনি একাগ্রচিত্তে ভগবতীকে ডাকিতেছেন। কুরঙ্গনয়না আমার দাবাগ্নির কুরঙ্গিণী হয়েছেন, ভয়ে ভাবনায় পাগলিনীপ্রায়, নীলকুটির গুদামে তাঁর পিতার পঞ্চত্ব হয়, তাঁর সতত চিন্তা, পাছে পতির সেই গতি ঘটে। আমি কত দিকে সান্ত্বনা করিব, সপরিবারে পলায়ন করা কি বিধি, না, পরোপকার পরম ধর্ম, সহসা পরাঙ্মুখ হব না,—শ্যামনগরের কোন উপকার করিতে পারিলাম না, চেষ্টার অসাধ্য ক্রিয়া কি, দেখি কি করিতে পারি—

[দুইজন অধ্যাপকের প্রবেশ]

প্রথম। ওহে বাপু, গোলোকচন্দ্র বসুর ভবন কি এই পল্লীতে বটে—পিতৃব্যের প্রমুখাৎ শ্রুত আছি বসুজ বড় সাধু ব্যক্তি, কায়স্থকুলতিলক।

নবীন। (প্রণিপাত করিয়া) ঠাকুর, আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র।

প্রথম। বটে, বটে, আহা হা, সাধু সাধু, এবং বিধ সুসন্তান সাধারণ পুণ্যের ফল নয়, যেন অংশ—

"অস্মিংস্তু নির্গুণং গোত্রে নাপাত্যমুপজায়তে।
আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।।"

শাস্ত্রের বচন ব্যর্থ হয় না, তর্কালঙ্কার ভায়া শ্লোকটা প্রণিধান করিলে না, হঃ হঃ, হঃ (নস্য গ্রহণ)।

দ্বিতীয়। আমরা সৌগন্ধ্যার অরবিন্দ বাবুর আহূত, অদ্য গোলোকচন্দ্রের আলয়ে অবস্থান, তোমারদিগের চরিতার্থ করিব।

নবীন। পরম সৌভাগ্যের বিষয়, এই পথে চলুন। [সকলের প্রস্থান]

৮২.১০ সারাংশ

বেগুনবেড়ের কুঠির গুদাম ঘরে তোরাপ সহ চারজন রায়তকে বন্দী করে রাখা হয়েছে। তাঁদের নিজেদের মধ্যে যে কথাবার্তা হচ্ছে, তা থেকে জানা যায়, গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য তাদের আনা হয়েছে। কিন্তু পরোপকারী গোলোকের বিরুদ্ধে তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে চায় না, অথচ নীলকরদের নির্মম অত্যাচারের ভয়ও আছে, তাই বিরুদ্ধাচরণের সাহসও পায় না। এই পরিস্থিতিতেও তোরাপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, সে নেমকহারামি করতে পারবে না। পরম রায়ত তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেয় 'শ্যামচাঁদের ঠ্যালা বড় ঠ্যালা'। সে বলে, তার বুকের ওপর উড সাহেব পেরেক মারা জুতো পরে উঠে যে রক্ত ঝরিয়ে দিয়েছে, তা এখনও 'ঝোজানি দিয়ে পড়চে'। দ্বিতীয় রায়তও তার ভূয়োদর্শনের সাহায্যে বুঝেছে, সাক্ষ্য না দিলে অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই নেই। চতুর্থ প্রথমে নীলের দাদন না নিলেও, অবশেষে বাধ্য হয়েছে পনের বিঘায় নীল বোনবার জন্য দাদন নিতে, এতেও তার পরিত্রাণ ঘটেনি। আবদ্ধ অবস্থায় জানা গেল, জনৈক নীল চাষী দাদনের বিরোধিতা করায় তাকে দেড় মাসের মধ্যে পনরোটি কুঠীতে ঘোরান হয়েছে। রাতে চোখ বেঁধে তাঁকে একজায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। এ অত্যাচার যে আর সহ্য করতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে দেওয়ান গোপীনাথসহ রোগ সাহেব তোরাপ ও অন্যান্য সকলের ওপর নির্যাতন করতে থাকে। তৃষ্মার্ত তোরাপ জল চাইলে কটূক্তি করা হয়। পরিশেষে সে সাময়িক আত্মরক্ষার জন্য সাহেবের কথা শুনবে, এই প্রতিশ্রুতি দেয়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিন্দুমাধবের চিঠি পাঠরতা সরলতাকে আশা-নিরাশায় দোলায়িত দেখা যায়। গোলোক বসুকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করবার চক্রান্তের বিরুদ্ধে তদ্বিরের প্রয়োজনে শহরে থেকে যেতে বাধ্য হচ্ছে জানালে, সাময়িকভাবে বিরহ বেদনা ভারাক্রান্ত হলেও সে মানিয়ে নেয়। বিন্দু তাঁকে আশ্বাস দিয়েছে সরলতায় প্রার্থিত বই সে অবশ্যই নিয়ে আসবে।

তৃতীয় গর্ভাঙ্কে, পদীময়রাণী, তাঁর স্থূল রসিকতা, তাকে নিয়ে শিশুদের ছড়া গান, প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। নবীন শিশুদের বাড়ী পাঠিয়ে দেন। বিন্দু গ্রামে লেখাপড়ার জন্য স্কুল করবার প্রস্তাব দিয়েছিল। বর্তমানে গোলোককে নিয়ে বিব্রত থাকায় হয়ে ওঠেনি, পরে অবশ্যই শুভ প্রস্তাবটি কার্য্যকর করতে হবে। নবীন এখন পিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত। তিনি কয়েদ হলে আর বাঁচবেন না। অথচ নবীন তাঁদের পক্ষে কোন সাক্ষী জোগাড় করতে পারছেন না। তাঁর বিশ্বাস তোরাপ মিথ্যা কথা বলবে না। কিন্তু অপর চারজন রায়ত যদি সাহেবদের নির্দ্দেশ মত সাক্ষ্য দেয়, তবে তো সর্বনাশ। বিচারক ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট তো নীলকর সাহেবদের বন্ধু, তাই বিচার যে প্রহসন মাত্র, এটা তিনি বুঝেছেন। নবীন এই সব নানা কথা ভেবে অত্যন্ত ব্যাকুল। তিনি এতদিন যা ভাবেননি, তাই ভাবছেন—সপরিবারে তিনি গ্রাম ত্যাগ করবেন। তবে পরোপকার ধর্ম পরিহার করবেন না।

[প্রথম অঙ্কের বীজ, বর্তমান অঙ্কে ঘটনা প্রবাহকে ক্রমশঃ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে দেখা যাচ্ছে—

একেই বলা যায় Rising Action। রায়তদের ওপর নীলকরদের অত্যাচার, বাবার কথা ভেবে নবীন মাধবের মানসিক যন্ত্রণা ঘটনায় গতি সঞ্চার করেছে।]

৮২.১১ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

অবিধি-অন্যায়, অসঙ্গাত, অরপুরুব-অপরূপ, আম আম - রাম রাম ; আম নাম - রাম নাম ; আয়েলাম - এসেছিলাম ; ইক্‌সুল - আইন অনুযায়ী আটক এব্‌রে - এবার ; এনেলো - এনেছিল, কম্‌য়ে জম্‌য়ে - কমিয়ে সমিয়ে ; কসম্‌ - দিব্যি, শপথ ; কুড়ো - বিঘা, জমির মাপ, কুঁদির -কাঠ চেঁছে নানারকম আকার দিবার যন্ত্র। কুঁদির মুখি বাঁক থাকবে না—কুঁদ যন্ত্রে - কাঠ বা ধাতুর কোন জিনিস লাগিয়ে দিয়ে পালিশ করা হয়, ফলে কোনরকম বাঁকা-চোরা থাকে না। এখানে তোরাপ কোনভাবেই মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না, বললে প্রথম রায়ত, তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, দৈহিক নির্যাতন হলে তার এ সঙ্কল্প আর থাকবে না।

খেটে - খাটো মোট লাঠি। হিরভিতি - কারচুপি, কারসাজি, চালাকি, হেড়াহিরি - হুড়োহুড়ি, অতি ব্যস্ততা, ছুটোছুটি। হেমদো - বিরাট দেহ, নিরেট ব্যক্তি। কেচরি - কাছারি, চাবালি - চোয়াল, ঝোজানি - অবিরল ধারায়, টিকিরি - ঠিকামজুর, সেরেব - স্রেফ, শুধু ; হেড়াহেড়ি - হুড়োহুড়ি। হ্যাংনামা - হাঙ্গামা ; ইক্‌সুল - আইন অনুযায়ী, ঘোঁটা মাত্তি - গোলমাল, তোলপাড়। গাংপার করবার কোমেট্‌ কত্তি লেগেচে - ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে দেশ থেকে বিদায় করবার জন্য কমিটি গঠন করছে (ষড়যন্ত্র করছে)। কারণ নীলকররা নিরপেক্ষ প্রজাহিতৈষী শাসক সহ্য করতে পারে না। হানের গারনাল সাহেবডারে যদি খোদা বেঁচয়ে রাখে - বর্তমান গভর্নরকে (স্যার পীটার গ্রান্ট) যদি ঈশ্বর দীর্ঘজীবী করেন। হাঁদা হেম্‌দো - হেম্‌দো শব্দটি 'উজবুক' অর্থে ব্যবহৃত — বুদ্ধিহীন দেহসর্বস্ব।

সুখের বিনাশে হাসির সহমরণ - মানসিক সুখ নষ্ট হলে, হাসিও হারিয়ে যায়। হাসি অন্তরের আনন্দকে প্রকাশ করে। বড় হালদার্নি - বড়বৌ অর্থাৎ সৈরিন্ধ্রী। ড্যাকরা - অশিষ্ট, দুষ্ট। প্যায়দার পোষাক, আর নটীর বেশ—পেয়াদা যতদিন বড়লোকের চাকরী করে ততদিন তার সাজপোষাকের ঔজ্জ্বল্য থাকে, তেমনি যতদিন যৌবন ততদিনই নটীর সমাদর। তাইদ্‌গির-তাগিদকারী, যে তাগাদা করার কাজে নিযুক্ত। নীলের দাদন ধোপার ভ্যালা ধোপা 'ভ্যালা'র রস দিয়ে কাপড়ে দাগ দেয়, সে দাগ ওঠে না। তেমনি নীলের দাদন একবার নিলে রায়তের আর মুক্তি নেই। নবপ্রসূতি শশারু ..... অন্নাভাবে মরিবে - ব্যাধ শশক জননীকে ধরে নিয়ে গেলে, তার শাবকদের যেমন অনাহার মৃত্যুবরণ করতে হয়, তেমনি ধৃত রায়তের সন্তানদেরও অন্নাভাবে মৃত্যু হবে।

[দ্বিতীয় অঙ্কে প্রথম অঙ্কের বীজ অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। একদিকে ক্ষেত্রমণিকে প্রলুব্ধ করতে পদী ময়রাণী উদ্যোগী হয়েছে, অপরদিকে গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু করে কারাগারে নিক্ষেপের আয়োজন চলছে, এইভাবে ঘটনার গতি ক্রমশঃ জটিলতর হতে শুরু করেছে দেখা যায়।

দুটি অঙ্কপাঠে লক্ষ্য করা যাচ্ছে নাটকের সংলাপ দুটি ভিন্ন খাতে বইছে—বসু পরিবারের কুশীলবরা অনেকটা রামমোহন - বিদ্যাসাগরের গদ্য ভাষা আশ্রয় করে তাঁদের মনোভাব ব্যক্ত করছে। অপর দিকে গ্রাম্য কৃষকদের (রায়ত) ভাষা, অকৃত্রিম, সহজও চরিত্রানুগ, অনেকটা জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য এবং বাস্তবসম্মত]

৮২.১২ নীল-দর্পণ মূলপাঠ—৩

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

[গোপীনাথ ও এক খালাসীর প্রবেশ]

গোপী। তোদের ভাগে কম্ না পড়িলে তো আমার কানে কোন কথা তুলিস্ নে।

খালাসী। ও গু কি অ্যাকা খ্যায়ে হজোম করা যায়? মুই বল্লাম, যদি খাবা তবে দেওয়ানজিরি দিয়ে খাও। তা বল্লে, "তোর দেওয়ানের মুরদ বড়, এ ত আর সে ক্যাওটের পুত নয়, যে সাহেবেরে বাঁদর খ্যাল্য়ে নে বেড়াবে।"

গোপী। আচ্ছা তুই এখন যা, কায়েতবাচ্চা কেমন মুগুর তা আমি দেখাব। [খালাসীর প্রস্থান]

ছোটসাহেবের জোরে ব্যাটার এত জোর। বোনাই যদি মনিব হয়, তবে কর্ম করিতে বড় সুখ, ও কথাও বল্‌বো—বড়সাহেব ওকথায় আগুন হয়, কিন্তু ব্যাটা আমার উপর ভারি চটা, আমারে কথায় ২ শ্যামচাঁদ দেখায়। সেদিন মোজা সহিত লাতি মারলে। কয়েকদিন কিছু ভাল ভাল দেখিতেছি। গোলোক বসের তলব হওয়া অবধি আমার প্রতি সদয় হইয়াছে। লোকের সর্বনাশ করিতে পারিলেই সাহেবের কাছে পটু হওয়া যায়।

"শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ।"

(উডকে দর্শন করিয়া)

এই যে আসিতেছেন, বসেদের কথা বলিয়া অগ্রে মন নরম করি।

[উডের প্রবেশ]

ধর্মাবতার, নবীন বসের চক্ষে এইবার জল বাহির হইয়াছে। বেটার এমন শাসন কিছুতেই হয় নাই। বেটার বাগান বাহির করিয়া লওয়া গিয়াছে, গাঁতি গদাই পোদকে পাটা করিয়া দেওয়া গিয়াছে, আবাদ এক প্রকার রহিত করা গিয়াছে, বেটার গোলা সব খালিপড়ে রহিয়াছে, বেটাকে ফৌজদারিতে সেপর্দ্দ করা গিয়াছে, এত ক্লেশেও বেটা খাড়া ছিল, এইবারে একেবারে পতন হইয়াছে।

উড। শালা শামনগরে কিছু কত্তে পারি নি।

গোপী। হুজুর, মুন্‌সীরে ওর কাছে এসেছিল তা বেটা বল্লে, “আমার মন স্থির নাই, পিতার ক্রন্দনে অঙ্গ অবশ হইয়াছে, আমারে ঘোল বলাইয়াছে।” নবীন বসের দুর্গতি দেখে শ্যামনগরের ৭/৮ ঘর প্রজা ফেরার হইয়াছে আর সকলে হুজুর যেমন হুকুম দিয়াছেনতেমনি করিতেছে।

উড। তুমি আচ্ছা দেওয়ান আছে, ভাল মতলব বার করেছিলে।

গোপী। আমি জানতাম, গোলোক বস্ বড় ভীত মানুষ ফৌজদারিতে যাইতে হইলে পাগল হইবে। নবীন বসের যেমন পিতৃভক্তি, তাহা হইলে বেটা কাজে কাজেই শাসিত হইবে, এই জন্যে বুড়োকে আসামী করিতে বল্লাম, হুজুর যে কৌশলবাহির করিয়াছেন তাহাও মন্দ নয়, বেটার পুষ্করিণীর পাড়ে চাস দেওয়া হইয়াছে, উহার অন্তঃকরণে সাপের ডিম পড়িয়াছে।

উড। এক পাথরে দুই পক্ষী মরিল ; দশ বিঘা নীল হইল, বাঞ্চতের মনে দুঃখ হইল। শালা বড় কাঁদাকাটি করেছিল, বলে পুকুরে নীল হইলে আমার বাস উঠিবে, আমি জবাব দিয়াছি, ভিটা জমিতে নীল বড় ভাল হল।

গোপী। ঐ জবাব পেয়ে বেটা নালিশ করিয়াছে।

উড। মোকদ্দমা কিছু হইবে না, এ মাজিস্ট্রেট বড় ভাল লোক আছে। দেওয়ানি করলে পাঁচবচোরে মোকদ্দমা শেষ হোবে না। মাজিস্ট্রেট আমার বড় দোস্ত। দেখ তোমার সাক্ষী মাটোবুর কর্‌্যে নতুন আইনে চার বজ্জাতকে ফাটক দিয়াছে ; এই আইনটা শ্যামচাঁদের দাদা হইয়াছে।

গোপী। ধর্মাবতার, নবীন বস ঐ চারি জন রাইয়তের ফসল লোকসান হবে বলিয়া আপনার লাঙ্গল গোরু মাইন্দার দিয়া তাহাদের জমি চসিয়া দিতেছে এবং উহাদিগের পরিবারদিগের যাহাতে ক্লেশ না হয় তাহারি চেষ্টা করিতেছে।

উড। শালা দাদনের জমি চসিতে হইলে বলে আমার লাঙ্গল গোরু কমে গিয়েছে, বাঞ্চৎ বড় বজ্জাত, আচ্ছা জব্দ হইয়াছে। দেওয়ান তুমি আচ্ছা কাম করিয়াছ, তোমছে কাম বেহতার চলেগা।

গোপী। ধর্মাবতারের অনুগ্রহ। আমার মানস বৎসর ২ দাদন বৃদ্ধি করি ; এ কর্ম একা করিবার নয়, ইহাতে বিশ্বাসী আমিন খালাসী আবশ্যক করে ; যে ব্যক্তি দু টাকার জন্য হুজুরের ৩ বিঘা নীল লোক্‌সান করে তার দ্বারা কর্মের উন্নতি হয়?

উড। আমি সম্‌জিয়াছি, আমীন শালা গোলমাল করিয়াছে।

গোপী। হুজুর, চন্দ্র গোলদারের এখানে নূতন বাস, দাদন কিছু রাখে না, আমিন উহার উঠানে রীতিমত এক টাকা দাদনবলিয়া ফেলিয়া দেয়, টাকাটি ফেরত দিবার জন্যে অনেক কাঁদাকাটি করে এবং মিনতি করিতে ২ রততলা পর্যন্ত আমিনের সঙ্গে আইসে, রথতলায় নীলকণ্ঠ বাবুর সহিত সাক্ষাৎ হয়, যিনি কলেজ হইতে এবারে উকিল হইয়া বাহির হইয়াছেন।

উড। আমি ওকে জানি, ঐ বাঞ্চৎ আমার কথা খবরের কাগজে লিখিয়া দেয়।

গোপী। আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ দাঁড়াইতে পারে না, তুলনা হয় না, ঢাকাই

জালার কাছে ঠাণ্ডাজলের কুঁজো। কিন্তু সংবাদপত্রটি হস্তগত করিতে হুজুরদিগের অনেক ব্যয় হইয়াছে, যেমন সময়,

সময়ের গুণে আপ্ত পর।
খোঁড়া গাধা ঘোড়ার দর।।

উড। নীলকণ্ঠ কি করিল?

গোপী। নীলকণ্ঠ বাবু আমিনকে অনেক ভর্ৎসনা করেন, আমি তাহাতে লজ্জিত হইয়া গোলদারের বাড়ী ফিরিয়া গিয়া দুই টাকার সহিত দাদনের টাকাটি ফেরত লইয়া আসিয়াছে। চন্দ্র গোলদার সাতান, ৩৪ বিঘা নীল অনায়াসে দিতে পারিত, এই কি চাকরের কাজ? আমি দেওয়ানি আমিনি দুই করিতে পারি তবেই এ সব নিকমহারামি রহিত হয়।

উড। বড় বজ্জাতি, ছাফ, নেমকহারামি।

গোপী। ধর্ম্মাবতার, বেয়াদপি, মাফ্, হয়—আমিন আপনার ভগিনীকে ছোট সাহেবের কামরায় আনিয়াছিল।

উড। হাঁ হাঁ আমি জানি, ঐ বাঞ্চৎ পডী ময়রাণীছোট সাহেবকে খারাপ করিয়াছে। বজ্জাৎকো হাম জরূর শেখলায়েঙ্গে, বাঞ্চৎকো হামারা বট্‌নেকা ঘরমে ভেজ ডেয়। [উডের প্রস্থান]

গোপী। দেখ দেখি বাবা, কার হাতে বাঁদর ভাল খেলে। কায়েত ধূর্ত আর কাক ধূর্ত।

ঠেকিয়াছে এইবার কায়েতের ঘায়।
বোনাই বাবার বাবা হার মেনে যায়।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

(নবীনমাধব এবং সৈরিন্ধ্রী আসীন)

সেরিন্ধী। প্রাণনাথ, অলঙ্কার আগে না শ্বশুর আগে—তুমি যে জন্যে দিবানিশি ভ্রমণ কর্য্যে বেড়াইতেছ, যে জন্যে তুমি আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়াছ, যে জন্যে তোমার চক্ষু হইতে অবিরল জলধারা পড়িতেছে, যে জন্যে তোমার প্রফুল্ল বদন বিষন্ন হইয়াছে, যে জন্যে তোমার শিরঃপীড়া জন্মিয়াছে, হে নাথ, আমি সেই জন্যে কি অকিঞ্চিৎকর আভারণগুলিন দিতে পারি নে?

নবীন। প্রেয়সি, তুমি অনায়াসে দিতে পার কিন্তু আমি কোন্ মুখে লই। কামিনীকে অলঙ্কারে বিভূষিতা করিতে পতির কত কষ্ট, বেগবতী নদীতে সন্তরণ, ভীষণ সমুদ্রে নিমজ্জন, যুদ্ধে প্রবেশ, পর্ব্বতে আরোহণ, অরণ্যে বাস, ব্যাঘ্রের মুখে গমন,—পতি এত ক্লেশে পত্নীকে ভূষিতা করে, আমি কি এমন মূঢ় সেই পত্নীর ভূষণ হরণ করিব। পঙ্কজনয়নে, অপেক্ষা কর। আজ দেখি যদি নিতান্তই টাকার সুযোগ করিতে না পারি তবে কল্য তোমার অলঙ্কার গ্রহণ করিব।

সৈরিন্ধ্রী। হৃদয়বল্লভ! আমাদের অতি দুঃসময়, এখন কে তোমাকে পাঁচ শত টাকা বিশ্বাস কর্য়ে ধার দেবে? আমি পুনর্বার মিনতি করিতেছি, আমার আর ছোট বয়ের গহনাপোদ্দারের বাড়ীতে রেখে টাকার যোগাড় কর, তোমারক্লেশ দেখে সোনার কমল ছোট বউ আমার মলিন হয়েছে।

নবীন। আহা! বিধুমুখি! কি নিদারণ কথা বলিলে, আমার অন্তঃকরণে যেন অগ্নিবাণ প্রবেশ করিল—ছোট বধূমাতা আমার বালিকা, উত্তম বসন, উত্তম অলঙ্কারেই তাঁর আমোদ। তাঁর জ্ঞান কি, তিনি সংসারের বার্তা কি বুঝেছেন? কৌতুক-ছলে বিপিনের গলার হার কেড়ে লইলে বিপিন যেমন ক্রন্দন করে, বধূমাতার অলঙ্কার লইলে তেমনি রোদন করবেন। হা ঈশ্বর! আমাকে এমন কাপুরুষ করিলে! আমি এমন নির্দয় দস্যু হইলাম! আমি বালিকাকে বঞ্চিত করিব? জীবন থাকিতে হইবে না—নরাধম নিষ্ঠুর করেও এমন কর্ম করিতে পারে না। প্রণয়িনি! এমন কথা আর মুখে আনিও না।

সৈরি জীবনকান্ত, আমি যে কষ্টে ও নিদারণ কথা বলিয়াছি, তাহা আমিই জানি আর সর্বান্তর্যামী পরমেশ্বরই জানেন। ও অগ্নিবাণ, তার সন্দেহ কি—আমার অন্তঃকরণ বিদীর্ণ করেছে, জিহ্বা দগ্ধ করেছে, পরে ওষ্ঠ ভেদ করে তোমার অন্তঃকরণে প্রবেশ করিয়াছে। প্রাণনাথ, বড় যন্ত্রণাতেই ছোট বয়ের গহনা লইতে বলিয়াছি—তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস বদন, জ্ঞাতি বান্ধবের হেঁটমুখ, রাইয়তজনের হাহাকার, এ সকল দেখে কি আমোদ-আনন্দ মনে আছে? কোনরূপে উদ্ধার হইতে পারিলে সকলের রক্ষা। হে নাথ, বিপিনের গহনা দিতেও আমার যে কষ্ট, ছোট বয়ের গহনা দিতেও সেই কষ্ট ; কিন্তু ছোটবয়ের গহনা দেওয়ার পূর্বে বিপিনের গহনা দিলে ছোট বয়ের প্রতি আমার নিষ্ঠুরাচরণ করা হয়, ছোট বউ ভাবিতে পারে, দিদি বুঝি আমায় পর ভাবিলেন। আমি কি এমন কাজ করে তার সরল মনে ব্যথা দিতে পারি, এ কি মাতৃতুল্য বড় জায়ের কাজ?

নবীন। প্রণয়িনি, তোমার অন্তঃকরণ অতি বিমল, তোমার মত সরল নারী নারীকূলে দুটি নাই—আহা! আমার এমন সংসার এমন হইল। আমি কি ছিলাম, কি হলাম। আমার ৭ শত টাকা মুনাফার গাঁতি, আমার ১৫ গোলা ধান, ১৬ বিঘার বাগান, আমার ২০ খান লাঙ্গল, ৫০ জন মাইন্দার পূজার সময় কি সমারোহ ; লোকে বাড়ী পরিপূর্ণ, ব্রাহ্মণভোজন, কাঙ্গালীকে অন্নবিতরণ, আত্মীয়গণের আহার, বৈষ্ণবের গান, আমোদজনক যাত্রা, আমি কত অর্থ ব্যয় করিয়াছি, পাত্র বিবেচনায় এক শত টাকা দান করিয়াছি। আহা! এমন ঐশ্বর্যশালী হইয়া এখন আমি স্ত্রী ভাদ্রবধূর অলঙ্কার হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কি বিড়ম্বনা! পরমেশ্বর! তুমিই দিয়াছিলে, তুমিই লইয়াছ, আক্ষেপ কি—

সৈরি। প্রাণনাথ, তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে। (সজলনেত্রে) আমার কপালে এত যাতনা ছিল, প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো—আর বাধা দিও না। (তাবিজ খুলন)

নবীন। তোমার চক্ষে জল দেখিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয় ; (চক্ষের জল মোচন করিয়া) চুপ কর, শশিমুখি, চুপ কর, (হস্ত ধরিয়া) রাখ, আর এক দিন দেখি।

সৈরি। প্রাণনাথ, উপায় কি—আমি যা বলিতেছি তাই কর, কপালে থাকে অনেক গহনা হবে। (নেপথ্যে হাঁচি) সত্যি সত্যি—আদুরী আসছে।

[দুইখান লিপি লইয়া আদুরীর প্রবেশ]

আদুরী। চিঠি দুখান কন্‌তে আসেচে মুই কতি পারিনে,মাঠাকুরণ তোমায় দিতে বল্লে।

[লিপি দিয়া আদুরীর প্রস্থান]

নবীন। তোমাদের গহনা লইতে হয়, এই দুই লিপিতে জানিতে পারিব—(প্রথম লিপি খুলন)

সৈরি। চেঁচিয়ে পড়।

নবীন। (লিপি পাঠ)

"রোকায় আশীর্বাদ জানিবেন—

আপনাকে টাকা দেওয়া প্রুত্যপকার করা মাত্র, কিন্তু আমার মাতা ঠাকুরানীর গতকল্য গঙ্গালাভ হইয়াছে ; তদাদ্যকৃত্যের দিন সংক্ষেপ, এ সংবাদ মহাশয়কে কল্যই লিখিয়াছি—তামাক অদ্যপি বিক্রয় হন নাই। ইতি

শ্রীঘনশ্যাম মুখোপাধ্যায়"

কি দুর্দৈব! মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মাতৃশ্রাদ্ধে আমার এই কি উপকার। দেখি, তুমি কি অস্ত্র ধারণ করিয়া আসিয়াছ। (দ্বিতীয় লিপি খুলন)

সৈরি। প্রাণনাথ, আশা করি নিরাশ হওয়া বড় ক্লেশ—ও চিটি ওমনি থাক—

নবীন। (লিপি পাঠ)।

"প্রতিপাল্য শ্রীগোকুলকৃষ্ম পালিতস্য—

বিনয়পূর্বক নমস্কারা নিবেদনঞ্চ বিশেষ। মহাশয়ের মঙ্গালে নিজ মঙ্গাল পরং লিপি প্রাপ্তে সমাচার অবগত হইলাম। আমি ৩০০ টাকার যোগাড় করিয়াছি, কল্য সমভিব্যাহারে নিকট পৌঁছিব, বক্রী একশত টাকা আগামী মাসে পরিশোধ করিব। মহাশয় যে উপকার করিয়াছেন, আমি কিঞ্চিৎ সুদ দিতে ইচ্ছা করি ইতি।"

সৈরি। পরমেশ্বর বুঝি মুখ তুলে চাইলেন—যাই, আমি ছোটবউকে বলিগে।[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান]

নবীন। (স্বগত) প্রাণ আমার সারল্যের পুত্তলিকা, এত ভীষণ প্রবাহে তৃণমাত্র—এই অবলম্বন করিয়া পিতাকে ইন্দ্রাবাদে লইয়া যাই, পরে অদৃষ্টে যাহা থাকে তাই হবে। দেড়শত টাকা হাতে আছে—তামাক কয়েকখান আর এক মাস রাখিলে ৫০০ টাকা বিক্রয় হইতে পারি, তা কি করি, সাড়ে তিন শত টাকাতেই ছাড়িতে হইল, আমলা খরচ অনেক লাগিবে—যাওয়া-আসাতে বিস্তর ব্যয়—এমন মিথ্যা মোকদ্দমায় যদি মেয়াদ হয়, তবে বুঝিলাম যে, এ দেশে প্রলয় উপস্থিত। কি নিষ্ঠুর আইন প্রচার হইয়াছে। আইনের দোষ কি, আইন কর্তাদিকেরই বা দোষ কি—যাহাদিকের হস্তে আইন অর্পিত হইয়াছে, তাহারা যদি নিরপেক্ষ হয়, তবে কি দেশের সর্বনাশ ঘটে? আহা এই আইনে কত ব্যক্তি বিনাপরাধে কারাগারে ক্রন্দন করিতেছে—তাহাদের স্ত্রী-পুত্রের দুঃখ দেখিলে বক্ষঃ বিদীর্ণ হয়—উনানের হাঁড়ি উনানেই রহিয়াছে, উঠানের ধান উঠানেই শুকাইতেছে, গোয়ালের গোরু গোয়ালেই রহিয়াছে, ক্ষেত্রের চাষ সম্পূর্ণ হল না, সকল ক্ষেত্রে বীজবপন হল না, ধানের ক্ষেত্রের ঘাস নির্মূল হল না, বৎসরের উপায় কি? কোথা নাথ, কোথা তাত শব্দে ধুলায় পতিত হইয়া রোদন করিতেছে। কোন ম্যাজিস্ট্রেট সুবিচার করিতেছেন, তাঁহাদের হস্তে এ

আইন যমদণ্ড হয় নাই। আহা! যদি সকলে আমরনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের ন্যায় ন্যায়বান হইতেন, তবে কি রাইয়তের পাকা ধানেই পড়ে, শস্যপূর্ণ ক্ষেত্রে শলভপতন হয়? তা হলে কি আমায় এই দুস্তর বিপদে পতিত হইতে হয়? হে লেফটেনান্ট গভরনর! যেমন আইন করিয়াছিলে, তেমনি সজ্জন নিযুক্ত করিতে, তবে এমন অমঙ্গল ঘটিত না। হে দেশপালক। যদি এমত একটি ধারা করিতে যে, মিথ্যা মোকদ্দমা প্রমাণ হইলে ফরিয়াদির মেয়াদ হইবে, তাহা হইলে অমরনগরের জেল নীলকরে পূর্ণ হইত এবং তাহার এমন প্রবল হইতে পারিত না। আমাদিগের ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হইয়াছে, কিন্তু এ মোকদ্দমা শেষ পর্যন্ত এখানে থাকিবে, তাহা হইলেই আমাদিগের শেষ।

[সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবি। নবীন, সব লাঙ্গাল যদি ছেড়ে দাও তা হলেও কি দাদন নিতে হবে? লাঙ্গাল গোরু সব বিক্রি কর্য়ে ব্যবসা কর, তাতে যে আয় হবে সুখে ভোগ করা যাবে, এ যাতনা আর সহ্য হয় না।

নবীন। মা, আমারও সেই ইচ্ছা। কেবল, বিন্দুর কর্ম হওয়া অপেক্ষা করিতেছি। আপাততঃ চাস ছাড়িয়া দিলে সংসারনির্বাহ হওয়া দুষ্কর, এই জন্য এত ক্লেশেও লাঙ্গাল কয়েকখান রাখিয়াছি।

সাবি। এই শীরঃপীড়া লয়ে কেমন করে যাবে বল দেখি? হা পরমেশ্বর! এমন নীল এখানে হয়েছিল! (নবীনের মস্তকে হস্তামর্ষণ)

[রেবতীর প্রবেশ]

রেবতী। মা ঠাকুরণ, মুই কনে যাব, কি করবো, কল্লে কি, ক্যান্ মত্তি এনেলাম? পরের জাত ঘরে আনে সামাল দিতি পাল্লাম না। বড়বাবু, মোরে বাঁচাও, মোর পাষাণ ফাটে বার হোলো—মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানেদাও, মোর সোনার পুতুল অ্যানে দাও।

সাবি। কি হয়েচে, হয়েচে কি?

রেবতী। ক্ষেত্র মোর বিকেল বেলা পেঁচোর মার সঙ্গো দাসদিগিতি জল আন্তি গিয়েলো। বাগান দিয়ে আসবার সমে চারজন নেটেলাতে বাছারে ধর্য়ে নিয়ে গিয়েছে। পদী সর্বনাশী দেখয়্যে দিয়ে পেলয়েচে। বড়বাবু, পরের জাত, কি কল্লাম, কেন এনেলাম, বড় সাধে সাদ দেবো ভেবেলাম।

সাবি। কি সর্বনাশ! সর্বনেশেরা সব কত্তে পাবে—লোকের জমি কেড়ে নিচ্ছিস্, ধান কেড়ে নিচ্চিস্, গোরু-বাচুর কেড়ে নিচ্চিস্, লাটির আগায় নীল বুনয়ে নিচ্চিস্,—তা লোক কেঁদেই হোক্, কোকিয়েই হোক্ কচ্চে-এ কি! ভাল মানুষের জাত খাওয়া?

রেবতী। মা! আদাপেটা খেয়ে নীল কত্তি নেগিচি, যে ক কুড়োয় দাগ মারলি তাই বোনলাম—রেয়ে ছোড়া জমি চসে আর ফুলে ২ কেঁদে ওঠে—মাটেত্তে অ্যাসে এ কথা শুনে পাগল হয়ে যাবে অ্যানে।

নবীন। সাধু কোথায়?

রেবতী। বাইরি বসে কান্তে নেগেচে।

নবীন। সতীত্ব, কুলমহিলার অয়স্কান্তমণি, সতীত্বভূষণে বিভূষিতা রমণীয়া। পিতার স্বরপুর-বৃকোদর

জীবিত থাকিতে কুলকামিনী অপহরণ! এই মুহূর্তেই যাইব—কে মন দুঃশাসন দেখিব, সতীত্ব শ্বেত উৎপলে নীলমণ্ডুক কখনই বসিতে পারিবে না। [নবীনের প্রস্থান]

সাবি। সতীত্ব সোনার নিধি বিধিদত্ত ধন।
কাঙ্গালিনী পেলে রাণী এমন রতন।।

যদি নীল বানরের হস্তে হইতে পবিত্র মাণিক্য অপবিত্র না হইতে হইতেই আনিতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে স্থান দিয়াছিলাম। এমন অত্যাচার বাপের কালেও শুনি নাই—চল ঘোষ-বউ, বাইরের দিকে যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

রোগসাহেবের কামরা

[রোগ আসীন। পদী ময়রাণী এবং ক্ষেত্রমণির প্রবেশ]

ক্ষেত্র। ময়রিপিসি। মোরে এমন কথা বল না, মুই পরাণ দিতি পারবো, ধর্ম দিতি পারবো না, মোরে কেটে কুচি ২ কর, মোরে পুড়য়ে ফেল, ভেসয়ে দাও, পুঁতে রাখ, মুই পরপুরুষ ছুঁতি পারবো না, মোর ভাতার মনে কি ভাববে?

পদী। তোর ভাতারকোথায়, তুই কোথায়, এ কথা কেউ জান্তে পারবে না—এই রাত্রেই আমি সঙ্গে করে তোর মায়ের কাছে দিয়ে আসবো।

ক্ষেত্র। ভাতারই যেন জানতি পারলে না—ওপরের দেবতা তো জান্তি পারবে, দেবতার চকি তো ধূলো দিতি পার্‌বো না। আমার প্রাণের ভিতর তো পাঁজার আগুন জ্বলবে, মোর স্বামী সতী বল্যে মোরে যত ভাল বাসবে তত মোর মন তো পুড়তি থাকবে, জানাই হোক্, আর অজানাই হোক্, মুই উপপতি কত্তি কখনই পারবো না।

রোগ। পদ্দ, খাটের উপরে আন্ না।

পদী। আয় বাচা, তুই সাহেবের কাছে আয়, তোর যা বলতেহয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

রোগ। আমার কাছে বলা শূয়ারের পায়ে মুক্ত ছড়ানো। হা হা হা, আমরা নীলকর, আমরা যমের দোসর হইয়াছি, দাঁড়ায়ে থেকে কত গ্রাম জ্বালাইয়া দিয়াছি, পুত্রকে স্তন ভক্ষণ করাইতে ২ কত মাতা পুড়ে মরিল, তা দেখে কি আমরা স্নেহ করি, স্নেহ করিলে কি আমাদের কুটি থাকে। আমরা স্বভাবতঃ মন্দ নই, নীলকর্মে আমাদের মন্দ মেজাজ বৃদ্ধি হইয়াছে। একজন মানুষকে মারিতে মনে দুঃখ হইত, এখন দশ জন মেয়ে মানুষকে নিদ্দম করিয়া রামকান্ত পেটা করিতে পারি, তখনি হাসিতে ২ খানা খাই—আমি মেয়ে মানুষকে অধিক ভাল বাসি, কুটির কর্মে ওকর্মের বড় সুবিধা হইতে পারে ; সমুদ্রে সব মিশয়ে যাইতেছে। তোর গায় জোর নাই—পদ্ম, টানিয়া আন।

পদী। ক্ষেত্রমণি! লক্ষ্মী মা আমার, বিছানায় এস, সাহেব তোরে একটা বিবির পোশাক দেবে বলেচে।

ক্ষেত্র। পোড়া কপাল বিবির পোশাকের—চট পর্‌যে থাকি সেও ভাল, তবু যেন বিবির পোশাক পরতি না হয়। ময়রা পিসি, মোর বড় তেষ্টা পেয়েচে, মোরে বাড়ী দিয়ে আয়, মুই জল খেয়ে শেতল হই—আহা, আহা! মোর মা এত বেল গলায় দড়ি দিয়েছে, মোর বাপ মাথায় কুড়ুল মেরেচে, মোর কাকা বুনো মষির মত ছুটে ব্যাড়াচ্চে। মোর মার আর নেই, বাবা কাকা দু জনের মধ্যি মুই অ্যাক সন্তান। মোরে ছেড়ে দে, মোরে বাড়ী রেখে আয়, তোর পায়ে পড়ি, পদি পিসি, তোর গু খাই—মা রে মলাম, জল তেষ্টায় মলাম।

রোগ। কুজোঁয় জল আছে খাইতে দেও।

ক্ষেত্র। মুই কি হিদুঁর মেয়ে হয়ে সাহেবের জল খাতি পারি—মোরে নেটেলায় ছুঁয়েচে, মুই বাড়ী গিয়ে না নেয়ে তো ঘরে যাতি পারবো না।

পদী। (স্বগত) আমার ধর্মও গেচে, জাতও গেচে, (প্রকাশ্যে) তা, মা, আমি কি করবো, সাহেবের খপ্পরে পড়িলে ছাড়ান ভার—ছোট সাহেব, ক্ষেত্রমণি আজ বাড়ী যাক্, তখন আর এক দিন আসবে।

রোগ। তুমি তবে আমারসঙ্গে থেকে মজা কর। তুই ঘর হইতে যা, আমার শক্তি থাকে আমি নরম করবো, নচেৎ তোর সঙ্গে বাড়ী পাটাইয়ে দিব—ড্যামনেড্ হোর, হামার বোধ হইতেছে তুই বাধা করেছিলি, আসিতে দিস নি, তাই তো ভদ্রলোকের মেয়েকে লাটিয়াল দিয়া আনা হইল, আমি সহজে নীলের লাটিয়াল এ কার্যে কখন দিয়াছি? হারামজাদী পদী ময়রাণী!

পদী। তোমার কলিকে ডাকো, সেই তোমার বড় প্রিয় হয়েছে, আমি তা বুঝিয়াছি।

ক্ষেত্র। ময়রা পিসি, যাস নে, ময়রা পিসি, যাস নে। [পদী ময়রাণীর প্রস্থান]

মোরে কার সাপের গত্তের মধ্যি একা রেখে গেলি, মোর যে ভয় করে, মুই যে কাঁপতি লেগিচি, মোর যে ভয়তে গা ঘুরতি লেগেচে, মোর মুখ যে তেষ্টায় ধুলো বেটে গেল।

রোগ। ডিয়ার, ডিয়ার, (দুই হস্তে ক্ষেত্রমণির দুই হস্ত ধরিয়া টানন) আইস, আইস—

ক্ষেত্র। ও সাহেব তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, মোরে ছেড়ে দেও, পদী পিসির সঙ্গে দিয়ে মোরে বাড়ী পেটয়ে দাও, আঁদার রাত, মুই একা যাতি পারবো না—(হস্ত ধরিয়া টানন) সাহেব, তুমি মোর বাবা, ও সাহেব, তুমি মোর বাবা, হাত ধল্লি জাত যায়, ছেড়ে দাও—তুমি মোর বাবা।

রোগ। তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে, আমি কোন কথায় ভুলিতে পারি না, বিছানায় আইস, নচেৎ পদাঘাতে পেট ভাঙ্গিয়া দিব।

ক্ষেত্র। মোর ছেলে মরে যাবে, দই সাহেব, মোর ছেলে মরে যাবে—মুই পোয়াতী।

রোগ। তোমাকে উলঙ্গ না করিলে তোমার নজ্জা যাইবে না।

[বস্ত্র ধরিয়া টানন]

ক্ষেত্র। ও সাহেব, মুই তোমার মা, মোরে ন্যাংটো করো না, তুমি মোর ছেলে, মোর কাপড় ছেড়ে দাও—

[রোগের হস্তে নখ বিদারণ]

রোগ। ইনফরন্যাল বিচ্। (বেত্র গ্রহণ করিয়া) এইবার তোর ছেনালি ভঙ্গ হবে।

ক্ষেত্র। মোরে অ্যাকবারে মেরে ফ্যাল, মুই কিছু বলবো না। মোর বুকি অ্যাকটা তেলোনালের খোঁচা মার্, মুই স্বগ্‌গে চলে যাই—ও গুখেগোর বেটা, আটকুড়ির ছেলে, তোর বাড়ী জোড়া মরা মরো, মোর গায়ে যদি আবার হাত দিবি, তোর হাত মুই এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো ২ করবো, তোর মা-বুন নেই, তাদের গিয়ে কাপড় কেড়ে নিগে না, দেঁড়য়ে রলি কেন, ও ভাইভাতারীর ভাই, মার না, মোর প্রাণ বার কর্য়ে ফ্যাল না, আর যে মুই সইতি পারি নে।

রোগ। চুপরাও, হারামজাদী, ক্ষুদ্র মুখে বড় কথা।

[পেটে ঘুষি মারিয়া চুল ধরিয়া টানন]

ক্ষেত্র। কোথায় বাবা, কোথায় মা, দেখ গো তোমাদের ক্ষেতর মলো গো। (কম্পন)

[জানেলার খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া নবীনমাধব ও তোরাপের প্রবেশ]

নবীন। (রোগের হস্ত হইতে ক্ষেত্রমণির কেশ ছাড়াইয়া লইয়া) রে নরাধম, নীচবৃত্তি নীলকর, এই কি তোমার খ্রীষ্টানধর্মের জিতেন্দ্রিয়তা? এই কি তোমার খ্রীষ্টানের দয়া, বিনয়, শীলতা, আহ, আহা, বালিকা, অবলা, অন্তর্বত্মী কামিনীর প্রতি এইরূপ নির্দয় ব্যবহার!

তোরাপ। সমিন্দি দেঁড়য়ে যেন কাটের পুতুল—গোড়ার বাক্যি হরে গিয়েচে—বড় বাবু, সমিন্দির কি এমান আছে তা ধরম কথা শোনবে, ও ঝ্যামন কুকুর, মুই তেমনি মুগুর, সমিন্দির ঝ্যামান চাবালি, মোর তেমনি হাতের পোঁচা (গলদেশ ধরিয়া গালে চপেটাঘাত), ডাকবি, তো জোরার বাড়ী যাবি, (গাল টিপে ধর্য়ে) পাঁচ দিন চোরের এক দিন সেদের, পাঁচ দিন খাবালি এক দিন খা। (কান মলন)

নবীন। ভয় কি, ভাল কর্য়ে কাপড় পর। (ক্ষেত্রমণির বস্ত্র পরিধান) তোরাপ, তুই বেটার গাল টিপে রাখিস, আমি ক্ষেত্রকে পাঁজা কর্য়ে লইয়া পালাই—আমি বুনোপাড়া ছাড়য়ে গেলে তবে ছেড়ে দিয়ে তুই দৌড় দিবি। নদীর ধার দিয়া যাওয়া বড় কষ্ট, আমার শরীর কাঁটায় ছড়্যে গিয়েছে, এতক্ষণ বোধ করে বুনোরা ঘুময়েছে, বিশেষতঃ এ কথা শুনিলে কিছু বলবে না, তুই তার পর আমাদের বাড়ী যাস, তুই কিরূপে ইন্দ্রাবাদ হইতেপালাইয়ে এলি এবং এখন কোথায় বাস করিতেছিস্ তাহা আমি শুনতে চাই।

তোরাপ। মুই এই নাতি নদীডে সেঁৎরে পার হয়্যে ঘরে যাব—মোর নছিবির কথা আর কি শোনবা—মুই মোক্তার সমিন্দির আস্তাবলের ঝরকা ভেঙ্গে পেলয়ে একেবারে বসন্তবাবুর জমিদারিতে পেলয়ে গ্যালাম, তার পর নাত করো জরু ছাবাল ঘর পোরলাম। এই সমিন্দিই তো ওটালে, নাঙ্গল কর্য়ে কি আর খাবার যো নেকেচে, নীলের ঠ্যালাটি কেমন—তাতে আবার নেমোখারামি কত্তি বলে—কই শালা, গ্যাড ম্যাড করো জুতার গুঁতা মারিস নে? [হাঁটুর গুঁতা]

নবীন। তোরাপ, মারবার আবশ্যক কি, ওরা নির্দয় বল্যে আমাদের নির্দয় হওয়া উচিত নয় ; আমি চলিলাম। [ক্ষেত্রকে লইয়া নবীনমাধবের প্রস্থান]

তোরাপ। এমন বসগারও বেছাপ্পর কত্তি চাস—তোর বড় বাবারে বল্যে মেনয়ে জুনয়ে কাজ মেরে নে, জোর জোরাবতি কদিন চলে, পেলয়ে গেলি তো কিছু কত্তি পার্‌বা না, মরার বাড়া তো গাল নেই। ও সমিন্দি, নেয়েত ফেরার হরি ঝে কুটি কবরের মধ্যি ঢোক্‌বে। বড়বাবুর আর বচুরে টাকাগুনো চুকয়ে দে, আর এ বচোর ঝা বুনতি চাচ্চে তাই নিগে, তোদের জন্যিই ওরা বেপালটে পড়চে, দাদন গাদলিই তো হয় না, চসা চাই—ছোট সাহেব, স্যালাম, মুই আসি।[চিত করিয়া ফেলিয়া পলায়ন]

রোগ। বাই জোভ! বিটেন টু জেলি। [প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর ভবনের দরদালান

[সাবিত্রীর প্রবেশ]

সাবিত্রী। (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক) রে নিদারুণ হাকিম, তুই আমাকেও কেন তলব দিলি নে—আমি পতি-পুত্রের সঙ্গে জেলায় যেতাম। এ শ্বশানে বাস অপেক্ষা আমার সে যে ছিল ভাল। হা! কর্তা আমার ঘরবাসী মানুষ—কখন গাঁ অন্তরে নিমন্ত্রণ খেতে যান না, তাঁর কপালে এত দুঃখ, ফৌজদুরিতে ধর্য়ে নে গেল, তাঁর জেলে যেতে হবে ; ভগবতি! তোমার মনে এই ছিল মা? আহা হা! তিনি যে বলেন আমার এড়ো ঘরে না শুলে ঘুম হয় না, তিনি যে আতপচালের ভাত খান, তিনি যে বড় বউমার হাতে নইলে খান না, আহা! বুক চাপড়ে ২ রক্ত বার করেছেন, কেঁদে ২ চক্ষু ফুলয়েছেন, যাবার সময়ে বলেন, গিন্নি, এই যাত্রা আমার গঙ্গাযাত্রা হলো—(ক্রন্দন) নবীন বলেন, মা, তোমার ভগবতীকে ডাক, আমি অবশ্য জয়ী হয়ে ওঁরে নিয়ে বাড়ী আসবো—বাবার আমার কাঞ্চনমুখ কালি হয়ে গিয়েছে ; টাকার জোগাড় করিতেই যা কত কষ্ট, ঘুরে ঘুরে ঘুর্ণি হয়েছে, পাছে আমি বউদের গহনা দিই, তাই আমারে সাহস দেন, মা টাকার কমি কি, মোকদ্দমায় কতই খরচ হবে। গাঁতির মোকদ্দমায় আমার গহনা বন্দক পড়লে বাবার কতই খেদ—বলেন, কিছু টাকা হাতে এলিই মার গহনাগুলিন আগে খালাস কর্য়ে আনবো-বাবার আমার মুখে সাহস, চক্ষে জল—বাবা আমার কাঁদিতে ২ যাত্রা করলেন—আমার নবীন এই রোদে ইন্দ্রাবাদ গেল, আমি ঘরে বসে রলাম—মহাপাপিনি! এই কি তোর মার প্রাণ।

সৈরি। ঠাকুরুণ, অনেক বেলা হয়েচে, স্নান কর। আমাদের অভাগা কপাল, তা নইলে এমন ঘটনা হবে কেন।

সাবিত্রী। (ক্রন্দন করিতে ২) না মা, আমার নবীন বাড়ী না ফিরে এলে আমি আর এ দেহে অন্ন-জল দেব না, বাছারে আমার খাওয়াবে কে?

সৈরি। সেখানে ঠাকুরপোর বাসা আছে, বামন আছে, কষ্ট হবে না। তুমি এস, স্নান করবে।

[তৈলপাত্র লইয়া সরলতার প্রবেশ]

ছোটবউ, তুমি ঠাকুরুণকে তৈল মাখায়ে স্নান করায়ে রান্নাঘরে নিয়ে এস, আমি খাওয়ার জায়গা করিগে।

[সৈরিন্ধ্রীর প্রস্থান, সরলতার তৈলমর্দন]

সাবিত্রী। তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই, মা আমার বাসী ফুলের মত মলিন হয়েছেন। আহা আহা! বিন্দুমাধবকে কত দিন দেখি নাই, বাবার কালেজ বন্ধ হবে, বাড়ী আসবেন আশা কর্‌য়ে রইচি, তাতে এই দায় উপস্থিত। (সরলতার চিবুকে হস্ত দিয়া) বাছার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, এখনো বুঝি কিছু খাউ নি? ঘোর বিপদে পড়ে রইচি, তা বাছাদের খাওয়া হলো কি না দেখিব কখন? আমি আপনি স্নান করিতেছি, তুমি কিছু খাও গে মা, চল আমিও যাই। [উভয়ের প্রস্থান]

৮২.১৩ সারাংশ

গোলোক বসুকে ফৌজদারিতে সোপর্দ করার সংবাদ গোপীনাথ উড সাহেবকে জানিয়েছে। তার সংবাদ মত এর ফলে গোলোক বসু পরিবার অনেকটা বিব্রত হয়ে পড়েছে। নবীনমাধব সাহেবের কাছে আবেদন করেও কোন ফল পায়নি। এদিকে মোকর্দ্দমার জন্য নবীনের পাঁচশত টাকা প্রয়োজন, কিন্তু সংগ্রহ করা যাচ্ছে না। বড়বৌ ও ছোট বৌ তাদের গয়না নেবার জন্য নবীনকে অনুরোধ করলে তিনি সম্মত হননি। নবীন অতীতের স্বচ্ছল অবস্থা, বর্তমানের দুর্ভাগ্যের জন্য বেদনা বোধ করেন। এমন পরিস্থিতিতে একটি চিঠিতে তিনশত টাকা পাওয়ার সম্ভাবনায় আশ্বস্ত বোধ করেন। অকস্মাৎ রেবতী, তার কন্যা ক্ষেত্রমণির অপহরণের সংবাদ দেয়। নবীন শপথ নেন, সতীর শ্বেতপদ্ম নীলমন্ডুককে তিনি যেতে দেবেন না। সাবিত্রীও তাকে মাণিক্য অপবিত্র হবার পূর্বে নীলবানরদের হাত থেকে রক্ষা করবার আদেশ দেন।

পদী ক্ষেত্রকে রোগ সাহেবের কামরায় ব্যবসায় নানা ভাবে প্রলুব্ধ করতে চেষ্টা করেছে। ক্ষেত্র কোনক্রমে ধর্মকে বিসর্জন দিতে সম্মত হয়নি। বারবার নানা ভাবে প্রতিরোধ রচনা করতে সচেষ্ট হয়েছে। রোগ বলপূর্বক তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করলে ক্ষেত্রমণি, তার হাত আঁচড়িয়ে গ্রাম্য ভাষায় কটূক্তি করতে থাকে। ব্যর্থকাম রোগ তখন উত্তেজিত হয়ে গর্ভবতী ক্ষেত্রমণির পেটে ঘুষি ও মাথার চুল ধরে টানতে থাকে। এমন সময় নবীনমাধব ও তোরাপ রোগের কামরায় প্রবেশ করে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে। তোরাপ সাহেবকে আঘাত করে চলে যায়।

বসু পরিবারে হতাশার পরিবেশ বিরাজ করছে। নবীন ইন্দ্রাবাদে গিয়েছে গোলোককে মামলা থেকে মুক্ত করবার আশা নিয়ে।

(ইংরেজি নাট্য শাস্ত্রমতে তৃতীয় অঙ্কে নাটকীয় চরমোৎকর্ষ বা Climax থাকে। দ্বিতীয় অঙ্কে বর্ণিত ঘটনা প্রবাহ এখানে সূচীমুখে প্রবেশ করে। সংঘর্ষের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বর্তমান তৃতীয় অঙ্ক চারটি গর্ভাঙ্কে বিন্যস্ত। এখানে চতুর্থ গর্ভাঙ্ক বসু পরিবারের প্রতিবেশ সৃষ্টির সহায়ক। মূল সংঘাত

কার্যত দেখতে পাওয়া যায় তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রোগ সাহেবর অত্যাচারের চরম দশ্য ও তার যথোচিত প্রত্যুত্তর নাটকটির চরমোৎকর্যের উজ্জ্বল উদাহরণ।)

৮২.১৪ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

গাঁতি—জমিদারের অধীনস্থ জোত-জমি। অন্তঃকরণে সাপের ডিম পাড়িয়াছে—হতাশ ও বিষাদে পূর্ণ নবীনের মন অনেকটা বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। এই কথাটি বোঝাতে গোপীনাথ বিষধর সাপের উপমা দিয়ে উডকে বোঝাতে চেয়েছে। বেহেতার চলেগা—ভাল ভাবেই চলবে।

আপনাদের কাগজের কাছে উহাদের কাগজ—ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর', অক্ষয়কুমার দত্তের 'তত্ত্ববোধিনী', এবং হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু প্যাট্রিয়ট', 'ভারত ভাস্কর' পত্রিকার সংবাদ ওসম্পাদকীয়তে নীলকরদের অত্যাচারের ভূরি ভূরি সংবাদ প্রকাশিতহোত। নীলকরেরাও 'ইংলিশম্যান' ও 'হরকরা' পত্রিকাদ্বয়কে অর্থে বশ করে তাঁদের পক্ষে লেখাত। গোপীনাথ ইংরেজদের কাগজই শ্রেষ্ঠ তা বোঝাতে চেয়েছে।

সমজিয়াছি—বুজিয়াছি। শলভ পতন—ধান খেতে পঙ্গাপালের আবির্ভাব। নীল বানরের হস্ত হইতে........ ক্ষেত্রমণির অপহরণ বৃত্তান্তে সাবিত্রী অত্যন্ত বিচলিত হয়ে নবীনমাধবকে তাকে উদ্ধারের জন্য আদেশ দেন। তিনি বলেন ক্ষেত্রমণির সতীত্ব নাশের পূর্বেই তাকে উদ্ধার করে আনতে পারলে বুঝবেন তিনি সত্যই বীর-প্রসবিনী জননী। বাংলার চিরন্তন মাতৃমূর্তি সাবিত্রীতে নাট্যকার তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন।

আমার ধর্মও গেচে জাতও গেচে—উক্তিটি পদীময়রাণীর। তৃষ্মার্ত সত্ত্বেও ক্ষেত্রমণি সাহেবের জল পান করবে না কারণ লাঠিয়ালরা তাকে ছুঁয়েছে। তাই স্নান না করে সে ঘরে যাবে না। এই কথা শুনে পদীর অন্তরের ধর্ম সংস্কার জেগে ওঠে। সে রোগ সাহেবের উপপত্নী, তদুপরি, পল্লীর সুন্দরীযুবতীদের ধরে এনে সাহেবদের ঘরে তুলে দিয়ে যে পাপ করছে, তার তো আর অন্ত নেই। তাই কতকটা অন্তরের গ্লানিবোধ থেকে এ কথাগুলি বলেছে।

জোরার বাড়ি যাবি আঁ -জবরা বা কঁসাইখানা অর্থাৎ কসাইখানায় পাঠান হবে। বেপালটে—বেকায়দায়। বিটেন টু জেলি—মেরে সপাট্ করা। এড়ো ঘরে না শুলে—বড় সর ঘরে না শুলে (ঘুম আসে না), ঘূর্ণি হয়েছে —মাথা ব্যথা করছে।

তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে—পরিবারে বিপর্যয় নেমে আসায়, কলভাষিনী সরলতাও স্তব্ধ হয়ে গেছে। প্রাণ চঞ্চল তরুণী আজ মলিন বদন এবং নীরব।

৮২.১৫ নীল-দর্পণ মূলপাঠ—৪

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারি কাছারি

(উড, রোগ, ম্যাজিস্ট্রেট, আমলা আসীন। গোলোকচন্দ্র, নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, বাদী-প্রতিবাদীর মোক্তার, নাজির, চাপরাসী, আরদালী, রাইয়ত প্রভৃতি দণ্ডায়মান)

প্র মোক্তার। অধীনের এই দরখাস্তের প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। (সেরেস্তাদারের হস্তে দরখাস্ত দান)

মাজি। আচ্ছা পাঠ কর। (উড সাহেবের সহিত পরামর্শ এবং হাস্য)

সেরেস্তা। (প্র মেক্তারের প্রতি) রামায়ণের পুথি লিখেছ যে, দরখাস্ত চুম্বক না হইলে কি সকল পড়া গিয়া থাকে? (দরখাস্তের পাতা উল্‌টায়ন)।

মাজি। (উড সাহেবের সহিত কথোপকথনানন্তর হাস্য সংবরণ করিয়া) খোলোসা পড়।

সেরেস্তা। আসামীর এবং আসামীর মোক্তারের অনুপস্থিতিতে ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে—প্রার্থনা, ফরিয়াদীর সাক্ষিগণের পূনর্বার হাজির আনা হয়।

বা মোক্তার। ধর্মাবতার, মোক্তারগণ মিথ্যা শঠতা প্রবঞ্চনায় রত বটে, অনায়াসে হলোপ লইয়া মিথ্যা বলে, মোক্তারেরা অবিরত অপ্রকৃষ্ট কার্যে রত, বিবাহিত কামিনীকে বিসর্জন দিয়া তাহারা তাহাদের অমরালয় বারমহিলালয়ে কালযাপন করে, জমিদারেরা ফলতঃ মোক্তারগণকে বিশেষ ঘৃণা করে, তবে স্বকার্যসাধন হেতু তাহারদিগের ডাকে এবং বিছানায় বসিতে দেয়। ধর্মাবতার, মোক্তারগণের বৃত্তিই প্রতারণা। কিন্তু নীলকরের মোক্তারদিগের দ্বারা কোনরূপে কোন প্রতারণা হইতে পারে না। নীলকর সাহেবরা খ্রীষ্টিয়ান—খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে মিথ্যা অতি উৎকট পাপ বলিয়া গণ্য হইয়াছে ; পরদ্রব্য-অপহরণ, পরনারীগমন, নরহত্যা প্রভৃতি জঘন্য কার্য খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে অতিশয় ঘৃণিত, খ্রীষ্টিয়ান ধর্মে অসৎ কর্ম নিষ্পন্ন করা দূরে থাক্, মনের ভিতরে অসৎ অভিসন্ধিকেস্থান দিলেই নরকানলে দগ্ধ হইতেহয়। করুণা, মার্জনা, বিনয়, পরোপকার খ্রীষ্টিয়ান ধর্মের প্রধান উদ্দেশ্য, এমন সত্য সনাতন ধর্মপরায়ণ নীলকরগণ কর্তৃক মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া কখনই সম্ভবে না। ধর্মাবতার, আমরা এই নীলকরের বেতনভোগী মোক্তার, আমরা তাঁহারদিগের চরিত্র অনুসারে চরিত্র সংশোধন করিয়াছি, আমারদিগের ইচ্ছা হইলেও সাক্ষীকে তালিম দিতে সাহস হয় না, যেহেতু সত্যপরায়ণ সাহেবেরা সূচ্যাগ্রে চাকরের চাতুরী জানিতেপারিলে তাহার যথোচিত শাস্তি করেন—প্রতিবাদীর মানিত সাক্ষী কুটির আমিন মজুকুর তাহার এক দৃষ্টান্তের স্থল, —রাইয়তের দাদনের টাকা রাইয়তকে বঞ্চিত করিয়াছিল বলিয়া দয়াশীল সাহেব উহাকে কর্মচ্যুত করিয়াছে এবং গোরিব ছাঁপোষা রাইয়তের ক্রন্দনে রোষপরবশ হইয়াছে প্রহারও করিয়াছেন।

উড। (ম্যাজিস্ট্রেটের প্রতি) একসট্রিম প্রোভোকেশান, একসট্রিম প্রোভোকেশান।

বা মোক্তার। হুজুর ; হুজুর হইতে আমার সাক্ষিগণের প্রতি অনেক সোয়াল হইয়াছিল, যদ্যপি তাহারা তালিমি সাক্ষী হইত, তবে সেই সোয়ালেই পড়িত, আইন-কারকেরা বলিয়াছেন, "বিচারকর্তা আসামীর আডভোকেট স্বরূপ", সুতরাং আসামীর পক্ষে যে সকল সোয়াল, তাহা হুজুর হইতেই হইয়াছে, অতএব সাক্ষিগণকে পুনর্বার আনয়ন করিলে আসামীর কিছুমাত্র উপকার দর্শাইবার সম্ভাবনা নাই, কিন্তু সাক্ষিগণের সমূহ ক্লেশ হইতে পারে। ধর্মাবতার, সাক্ষিগণ চাস-উপজীবী দীন প্রজা, তাহারা স্বহস্তে লাঙ্গল ধরিয়া স্ত্রী-পুত্রের প্রতিপালন করে, তাহারদিগের সমস্ত দিবস ক্ষেত্রে না থাকিলে তাহারদিগের আবাদ ধ্বংশ হইয়া যায়, বাড়ীতে ভাত খাইতে আইলে চাসের হানি হয় বলিয়া তাহারদের মেয়েরা গামছা বান্ধিয়া অন্নব্যঞ্জন ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া তাহারদের খাওয়াইয়া আইসে ; চাসারদিগের একদিন ক্ষেত্র ছাড়িয়া আইলে সর্বনাশ উপস্থিত হয়, এ সময়ে এত দূরস্থ জেলায় রাইয়তদিগের তলব দিয়া আনিলে তাহারদিগের বৎসরের পরিশ্রম বিফল হয়, ধর্মাবতার, ধর্মাবতার যেমন বিচার করেন।

মাজি। কিছু হেতুবাদ দেখা যায় না। (উডের সহিত পরামর্শ) আবশ্যক হইতেছে না।

প্র মোক্তার। হুজুর, নীলকরের দাদন কোন গ্রামের কোন রাইয়তে স্বেচ্ছাধীন গ্রহণ করে না, আমিন খালাসীর সমভিব্যাহারে নীলকর সাহেব, অথবা তাঁহার দেওয়ান, ঘোড়া চড়িয়া ময়দানে গমনপূর্বক উত্তম ২ জমিতে কুটির মার্ক দিয়া রাইয়তদিগকে নীল করিতে হুকুম দিয়া আইসেন, পরে জমিয়াতের মালিকান রাইয়তদিগের কুটিতে ধরিয়া আনিয়া বেওরাওয়ারি করিয়া দাদন লিখিয়া লয়েন, দাদন লইয়া রাইয়তেরা কাঁদিতে ২ বাড়ী যায়, যে দিবস যে রাইয়ত দাদন লইয়া আইসে সে দেবস সে রাইয়তের বাড়ীতে মরাকান্না পড়ে। নীলের দ্বারা দাদন পরিশোধ করিয়া ফাজিল পাওনা হইলেও রাইয়তদের নামে দাদনের বকেয়া বাকি বলিয়া খাতায় লেখা থাকে। একবার দাদন লইলে রাইয়তেরা সাত পুরুষ ক্লেশ পায়। রাইয়তেরা নীল করিতে যে কাতর হয়, তাহা তাহারাই জানে আর দীনরক্ষক পরমেশ্বর জানেন। রাইয়তেরা পাঁচ জন একত্রে বসিলেই পরস্পর নিজ ২ দাদনের পরিচয় দেয় এবং ত্রাণের উপায় প্রস্তাব করে, তাহারদিগের সলা-পরামর্শের আবশ্যক করে না, আপনারাই মাথার ঘায়ে কুক্কুর পাগল, এমন রাইয়তে সাক্ষী দিয়া গেল যে তাহাদিগের নীল করিতে ইচ্ছা ছিল, কেবল আমার মক্কেল তাহারদিগের পরামর্শ দিয়া এবং ভয় দেখাইয়া তাহারদের নীলের চাষ রহিত করিয়াছে, এ অতি আশ্চর্য এবং প্রত্যক্ষ প্রতারণা। ধর্মাবতার, তাহারদিগের পুনর্বার হুজুরে আনান হয়, অধীন দুই সোয়ালে তাহারদিগের মিথ্যা সাক্ষ্য প্রমাণ করিয়া দিবে। আমার মক্কেলের পুত্র নবীনমাধব বসু করাল নীলকর নিশাচরের কর হইতে উপায়হীন চাসাদিগকে রক্ষা করিতে প্রাণপণে যত্ন করিয়া থাকেন, এ কথা স্বীকার করি, এবং তিনি উড সাহেবের দৌরাত্ম্য নিবারণ করিতে অনেকবার সফলও হইয়াছেন তাহা পলাশপুর জ্বালান মোকদ্দমার নথিতে প্রকাশ আছে। কিন্তু আমার মক্কেল গোলোকচন্দ্র বসু অতি নিরীহ মনুষ্য, নীলকর সাহেবদের ব্যাঘ্র অপেক্ষা ভয় করে, কোন গোলের মধ্যে থাকে না, কখন কাহারো মন্দ করে না, কাহাকে মন্দ হইতে উদ্ধার করিতেও সাহসী হয় না ; ধর্মাবতার, গোলোকচন্দ্র বসু যে সুচরিত্রের লোক, তাহা জেলার সকল লোকে জানে, আমলাদিগের জিজ্ঞাসা হইলে প্রকাশ হইতে পারে—

গোলোক। বিচারপতি, আমার গত বৎসরের নীলের টাকা চুক্‌য়ে দিলেন না, তবু আমি ফৌজদারির

ভয়েতে ৬০ বিঘা নীলের দাদন চাহিয়াছিলাম। বড়বাবু বলিলেন, "পিতা, আমারদিগের অন্য আয় আছে, এক বৎসর কিংবা দুই বৎসরের নীলের লোকসানে কেবল ক্রিয়াকলাপি বন্ধ হবে, একেবারে অন্নাভাব হবে না, কিন্তু যাহারদের লাঙ্গালের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর, তাহারদের উপায় কি? আমরা এই হারে নীল করিলে সকলেরি তাই করিতে হইবে।" বড়বাবু এ কথা বিজ্ঞের মত বলিলেন, আমি কাজে কাজেই বলিলাম, তবে সাহেবের হাতে পায়ে ধরে ৫০ বিঘায় রাজি করগে। সাহেব হাঁ, না, কিছুই কলেন না, গোপনে ২ আমাকে এই বৃদ্ধ দশায় জেলে দেবার যোগাড় করিলেন। আমি জানি, সাহেবদিগের রাজি রাখিতে পারিলেই মঙ্গল। সাহেবদের দেশ, হাকিম ভাই-ব্রাদার, সাহেবদের অমতে চলিতে আছে? আমাকে খালাস দেন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যদিও হাল গোরু অভাবে নীল করিতে না পারি, বৎসর ২ সাহেবকে একশত টাকা নীলের বদলে দিব। আমি কি রায়তদের শেখাইবার মানুষ? আমার সঙ্গে কি তাহাদের দেখা হয়?

প্র মোক্তার। ধর্মাবতার, যে ৪ জন রাইয়ত সাক্ষ্য দিয়াছে তাহার একজন টিকিরি, তার কোন পুরুষে লাঙ্গাল নাই, তার জমি নাই, জমা নাই, গোরু নাই, গোয়ালঘর নাই, সারেজমিতে তদারক হইলে প্রকাশ হইবে। কানাই তরফদার ভিন্ন গ্রামের রাইয়ত, তাহার সহিত আমার মক্কেলের কখন দেখা নাই, সে ব্যক্তি সেনাক্ত করিতে অশক্ত। এই ২ কারণে আমি তাহারদের পুনর্বার কোর্টে আননের প্রার্থনা করি—ব্যবস্থাকর্তরা লিখিয়াছেন, নিষ্পত্তির অগ্রে আসামীকে সকলপ্রকার উপায়ের পন্থা দেওয়া কর্তব্য, ধর্মাবতার, আমার এই প্রার্থনা মঞ্জুর করিলে আমার মনে আক্ষেপ থাকে না।

বা মোক্তার। হুজুর—

মাজি। (লিপি লিখন) বল, বল, আমি কর্ণ দিয়া লিখিতেছি না।

বা মোক্তার। হুজুর, এসময় রাইয়তগণকে কষ্ট দিয়া জেলায় আনিলে তাহাদের প্রচুর ক্ষতি হয়, নচেৎ আমিও প্রার্থনা করি, সাক্ষীদিগকে আনান হয়, যেহেতু সোয়ালের কৌশলে আসামীর সাব্যস্ত অপরাধ আরো সাব্যস্ত হইতে পারে। ধর্মাবতার, গোলোক বসের কুচরিত্রের কথা দেশ-বিদেশ রাষ্ট্র আছে, যে উপকার করে তাহারই অপকার করে। অপার সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া নীলকরেরা এদেশে আসিয়া গুপ্তনিধি বাহির করিয়া দেশের মঙ্গাল করিতেছেন, রাজকোষের ধনবৃদ্ধি করিতেছেন এবং আপনারা উপকৃত হইতেছেন। এমত মহাপুরুষদিগের মহৎ কার্যে যে ব্যক্তি বিরুদ্ধাচরণ করে,তাহার কারাগার ভিন্ন আর স্থান কোথায়?

মাজি। (লিপির শিরোনামো লিখন) চাপরাসী!

চাপ। খোদাবন্দ্। (সাহেবের নিকট গমন)

মাজি। (উডের সহিত পরামর্শ) বিবি উড্‌কা পাস্ দেও—খানসামাকো বোলো, বাহারকা সাহেবলোক আজ যাগা নেই।

সেবেস্তা। হুজুর, কি হুকুম লেখা যায়?

মাজি। নথির সামিল থাকে।

সেরেস্তা। (লিখন) হুকুম হইল যে নথির সামিল থাকে। (ম্যাজিস্ট্রেটের দস্তখত) ধর্মাবতার, আসামীর জবাবের হুকুমে হুজুরের দস্তখত হয় নাই—

মাজি। পাঠ কর।

সেরেস্তা। হুকুম হইল যে আসামীর নিকট হইতে ২০০ শত টাকা তাইনে ২ জন জামিন লওয়া হয় এবং সাফাই সাক্ষীদিগের নামে রীতিমত সাফিনা জারী হয়।

(ম্যাজিস্ট্রেটের দস্তখত)

মাজি। মিরগাঁর ডাকাতি মোকদ্দমা কাল পেশ কর।

[ম্যাজিস্ট্রেট, উড, রোগ, চাপরাসী ও আরদালীর প্রস্থান]

সেরেস্তা। নাজির মহাশয়, রীতিমত জামানতনামা লেখাপড়া করিয়া নাও।

[সেরেস্তাদার, পেশকার, বাদীর মোক্তার ও রাইয়তগণের প্রস্থান]

নাজির। (প্রতিবাদীর মোক্তারের প্রতি) অদ্য সন্ধ্যাকালে জামানতনামা লেখাপড়া কিরূপে হইতে পারে, বিশেষ আমি কিছু ব্যস্ত আছি—

প্র মোক্তার। নামটা খুব বড় বটে, কিন্তু কিছু নাই, (নাজিরের সহিত পরামর্শ) গহনা বিক্রি করিয়া এই টাকা দিতে হইবে।

নাজির। আমার তালুকও নাই, ব্যবসায়ও নাই, আবাদও নাই। এই উপজীবিকা। কেবল তোমার খাতিরে এক শত টাকায় রাজী হওয়া, চল আমার বাসায় যাইতে হইবে। দেওয়ানজি ভায়া না শোনেন, ওদের পূজা আলাহিদা হয়েছে কিনা। [সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদ, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী

(নবীনমাধব, বিন্দুমাধব এবং সাধুচরণ আসীন)

নবীন। আমার কাজে কাজেই বাড়ী যাইতে হইল। এ সংবাদ জননী শুনিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন। বিন্দু, তোমারে আর বলবো কি, দেখ পিতা যেন কোন মতে ক্লেশ না পান। বাস পরিত্যাগ করা স্থির করিয়াছি, সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া আমি টাকা পাঠাইয়া দিব, যে যতটাকা চাহিবে তাহাকে তাহাই দিবা।

বিন্দু। জেলদারগা টাকার প্রয়াসী নহে, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের ভয়ে পাচক ব্রাহ্মণ লইয়া যাইতে দিতেছে না।

নবীন। টাকাও দেও মিনতিও কর। আহা! বৃদ্ধ শরীর! তিনদিন অনাহার! এত বুঝাইলাম, এত মিনতি করিলাম—বলে, "নবীন! তিন দিন গত হইলে আহার করি না করি বিবেচনা করিব, তিন দিনের মধ্যে এ পাপমুখে কিছুমাত্র দিব না।"

বিন্দু। কিরূপে পিতার উদরে দুটি অন্ন দিব তাহার কিছুই উপায় দেখিতেছি না। নীলকর-ক্রীতদাস

মূঢ়মতি ম্যাজিস্ট্রটের মুখ হইতে নিষ্ঠুর কারাবাসানুমতি নিঃসৃত হওয়াবধি পিতা যে চক্ষে হস্ত দিয়াছেন, তাহা এখন পর্যন্ত নামাইলেন না। পিতার নয়নজলে হস্ত ভাসমান হইয়াছে, যে স্থানে প্রথম বসাইয়াছিলাম সেই স্থানেই উপবিষ্ট আছেন। নীরব, শীর্ণকলেবর, স্পন্দনহীন, মৃতকপোতববৎ কারাগার-পিঞ্জরে পতিত আছেন। আজ চার দিন, আজ তাঁহাকে অবশ্যই আহার করাইব। আপনি বাড়ী যান, আমি প্রত্যহ পত্র প্রেরণ করিব।

নবীন। বিধাতঃ! পিতাকে কি কষ্টই দিতেছ। বিন্দু, তোমাকেরাত্র-দিন জেলে থাকিতে দেয় তাহা হইলেই আমি নিশ্চিন্ত হইয়া বাড়ী যাইতে পারি।

সাধু। আমি চুরি করি, আপনারা আমাকে চোর বল্যে ধরে দেন, আমি একবার করিব, তা হলেই আমাকে জেলে দেবে, আমি সেখানে কর্তা মশায়রে চাকর হয়ে থাকিব।

নবীন। সাধু, তুমি এমনি সাধুই বটে। আহা! ক্ষেত্রমণির সাংঘাতিক পীড়ার সমাচারে তুমি যে ব্যাকুল তোমাকে যত শীঘ্র বাড়ী লইয়া যাইতে পারি ততই ভাল।

সাধু। (দীর্ঘনিশ্বাস) বড়বাবু, মাকে গিয়ে কি দেখিতে পাব? আমার যে আর নাই।

বিন্দু। তোমাকে যে আরোক্ দিয়াছি উহা খাওয়াইলে অবশ্যই নির্ব্যাধি হইবে, ডাক্তারবাবুর আদ্যোপান্ত শ্রবণ কর্য্যে ঐ ঔষধ দিয়াছেন।

[ডেপুটী ইনস্পেকটারের প্রবেশ]

ডেপু। বিন্দুবাবু আপনার পিতার খালাসের জন্য কমিসনর সাহেব বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন।

বিন্দু। লেফটেনান্ট গবর্ণর নিষ্কৃতি দিবেন সন্দেহ নাই।

নবীন। নিষ্কৃতির সমাচার কত দিনে আসিতে পারে?

বিন্দু। পোনের দিবসের অধিক হইবে না।

ডেপু। অমরনগরের আসিস্টান্ট ম্যাজিস্ট্রট একজন মোক্তারকে এই আইনে ৬ মাস ফাটক দিয়াছিল, তাহার ১৬ দিন জেলে থাকিতে হয়।

নবীন। এমন দিন কি হবে, গবর্ণর সাহেব অনুকূল হইয়াপ্রতিকূল ম্যাজিস্ট্রটের নিকৃষ্ট নিষ্পত্তি খণ্ডন করবেন?

বিন্দু। জগদীশ্বর আছেন, অবশ্যই করিবেন। আপনি যাত্রা করুন, অনেক দূর যাইতে হইবে।

[নবীনমাধব, বিন্দুমাধব ও সাধুচরণের প্রস্থান]

ডেপু। আহা, দুই ভাই দুঃখে দগ্ধ হইয়া জীবন্মৃত হইয়াছেন। লেফটেনান্ট গবর্ণরের নিষ্কৃতি অনুমতি সহোদরদ্বয়ের মৃতদেহ পুনর্জীবিতকরিবে। নবীনবাবু অতি বীর পুরুষ, পরোপকারী, বদান্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতৈষী, কিন্তু নির্দয় নীলকর-কুজ্ঝটিকায় নবীন বাবুর সদগুণসমূহ মুকুলেই ম্রিয়মাণ হইল।

[কালেজের পণ্ডিতের প্রবেশ]

আসতে আজ্ঞা হয়।

পণ্ডিত। স্বভাবতঃ শরীর আমার কিঞ্চিৎ উষ্ম, রৌদ্র সহ্য হয় না। চৈত্র বৈশাখ মাসে আতপতাপে উন্মত্ত হইয়া উঠি। কয়েক দিন শিরঃপীড়ায় সাতিশয় কাতর, বিন্দুমাধবের বিষম বিপদের সময় একবার আসিতে পারি নাই।

ডেপু। বিষ্ণুতৈলে আপনার উপকার দর্শিতে পারে। বিষ্ণু বাবুর জন্যে বিষ্ণুতৈল প্রস্তুত করা গিয়াছে, আপনার বাসায় আমি কল্য কিঞ্চিৎ প্রেরণ করিব।

পণ্ডিত। বড় বাধিত হলেম। ছেলে পড়ালে সহজ মানুষ পাগল হয়, আমার তাহাতে এই শরীর।

ডেপু। বড় পণ্ডিত মহাশয়কে আর যে দেখিতে পাই নে?

পণ্ডিত। তিনি এ স্ববৃত্তি ত্যাগ করিবারপন্থা করিতেছেন—সোনার চাঁদ ছেলে উপার্জন করিতেছে, তাঁহার সংসার রাজার মত নির্বাহ হইবে। বিশেষ বৃষকাষ্ঠ গলায় বন্ধন কর্য়ে কালেজে যাওয়া-আসা ভাল দেখায় না, বয়স তো কম হয় নাই।

[বিন্দুমাধবের পুনঃপ্রবেশ]

বিন্দু। পণ্ডিত মহাশয় এসেছেন—

পণ্ডিত। পাপাত্মা এমন অবিচার করেছে। তোমরা শুনিতে পাও না, বড় দিনের সময় ঐ কুটিতে একাদিক্রমে দশ দিবস যাপন করে আসিয়াছে। উহার কাছে প্রজার বিচার। কাজির কাছে হিন্দুর পরোব।

বিন্দু। বিধাতার নির্বন্ধ।

পণ্ডিত। মোক্তার দিয়াছিলে কাহাকে?

বিন্দু। প্রাণধন মল্লিককে।

পণ্ডিত। ওকেও মোক্তারনামা দেয়? অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে উপকার দর্শিত ; সকল দেবতাই সমান, ঠক বাচতে গাঁ উজোড়।

বিন্দু। কমিসনার সাহেব পিতার নিষ্কৃতির জন্য গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়াছেন।

পণ্ডিত। এক ভস্ম আর ছার, দোষগুণ কব কার। যেমন মাজিস্ট্রেট, তেমনি কমিসনার।

বিন্দু। মহাশয় কমিসনারকে বিশেষ জানেন না, তাই এ কথা বলিতেছেন। কমিসনার সাহেব অতি নিরপেক্ষ, নেটিবদের উন্নতি-আকাঙ্খী।

পণ্ডিত। যাহা হউক, এক্ষণ ভগবানের আনুকূল্যে তোমার পিতার উদ্ধার হইলেই সকল মঙ্গল। জেলে কি অবস্থায় আছেন?

বিন্দু। সর্বদা রোদন করিতেছেন এবং গত তিনদিন কিছুমাত্র আহার করেন নাই। আমি এখনি জেলে যাইব, আর এই সুসংবাদ বলিয়া তাঁহার চিত্তবিনোদন করিব।

[একজন চাপরাসীর প্রবেশ]

তুমি জেলের চাপরাসী না?

চাপ। মশাই, এটটু জলদি করে আসেন। দারগা ডেকেচেন।

বিন্দু। আমার বাবাকে তুমি আজ দেখেছ?

চাপ। আপনি আসেন। আমি কিছু বলতে পারি নে।

বিন্দু। চল বাপু (পণ্ডিতের প্রতি) বড় ভাল বোধ হইতেছে না, আমি চলিলাম।

[চাপরাসী ও বিন্দুমাধবের প্রস্থান]

পণ্ডিত। চল আমরাও জেলে যাই, বোধহয়, কোন মন্দ ঘটনা হইয়া থাকিবে। [উভয়ের প্রস্থান]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ইন্দ্রাবাদের জেলখানা

(গোলকচন্দ্রের মৃতদেহ উড়ানি পাকান দড়িতে দোদুল্যমান। জেল দারোগা এবং জমাদার আসীন)

দারো। বিন্দুমাধব বাবুকে কে ডাকিতে গিয়াছে?

জমা। মনিরদ্দি গিয়েছে। ডাক্তার সাহেব না এলে তো নাবান হইতে পারে না।

দারো। মাজিস্ট্রট সাহেবের আজ আসিবার কথা আছে না?

জমা। আজ্ঞে না, তাঁর আর চারদিন দেরি হবে। শনিবারে শচীগঞ্জের কুটিতে সাহেবদের সাম্পিন পার্টি আছে, বিবিদের নাচ হবে। উড সাহেবের বিবি আমারদিকের সাহেবের সঙ্গে নইলে নাচিতে পারেন না, আমি যখন আরদালি ছিলাম দেখিয়াছি। উড সাহেবের বিবির খুব দয়া, একখান চিটিতে এ গোরিবকে জেলের জমাদ্দার করিয়া দিয়াছেন।

দারো। আহা! বিন্দুবাবু পিতা আহার করেন নাই বলিয়া কত বিলাপ করিয়াছেন, এ দশা দেখলে প্রাণত্যাগ করিবেন।

[বিন্দুমাধবের প্রবেশ]

সকলি পরমেশ্বরের ইচ্ছা।

বিন্দু। এ কি, এ কি, আহা! আহা! পিতার উদ্বন্ধনে মৃত্যু হইয়াছে। আমি যে পিতার মুক্তির সম্ভাবনা ব্যক্ত করিতে আসিতেছি, কি মনস্তাপ। (নিজ মস্তক গোলোকের বক্ষে রক্ষা করিয়া মৃতদেহ আলিঙ্গানপূর্বক ক্রন্দন) পিতা, আমাদিগের মায়া একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। বিন্দুমাধবের ইংরাজী বিদ্যার গৌরব আর লোকের কাছে করবেন না? নবীনমাধবকে "স্বরপুর-বৃকোদর" বলা শেষ হইল? বড় বধুকে "আমার মা, আমার মা" বলিয়া বিপিনের সহিত যে আনন্দ-বিবাদ, তাহার সন্ধিকরিলেন। হা! আহারান্বেষণে ভ্রমণকারী বকদম্পতির মধ্যে বক ব্যাধ কর্তৃক হত হইলে শাবকবেষ্টিত বকপত্নী যেমন সঙ্কটে পড়ে জননী আমার তোমার উদ্বন্ধন সংবাদে সেইরূপ হইবেন—

দারো। (হস্ত ধরিয়া বিন্দুমাধবকে অন্তরে আনিয়া) বিন্দুবাবু, এখন এত অধীর হইবেন না। ডাক্তার সাহেবের অনুমতি লইয়া অমৃতঘটের ঘাটে লইয়া যাইবার উদ্যোগ করুন।

[ডেপুটী ইনস্পেকটার এবং পণ্ডিতের প্রবেশ]

বিন্দু। দারগা মহাশয়! আমাকে কিছু বলবেন না। যে পরামর্শ উচিত হয় পণ্ডিত মহাশয় এবং ডেপুটীবাবুর সহিত করুন, আমার শোকবিকারে বাক্যরোধ হইয়াছে, আমি জন্মের মত একবার পিতার চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বসি।

[গোলোকের চরণ বক্ষে ধারণপূর্বক উপবিষ্ট]

পণ্ডিত। (ডেপুটি ইনস্পেকটরের প্রতি) বিন্দুমাধবকে ক্রোড়ে করিয়া রাখি, তুমি বন্ধন উন্মোচন কর—এ দেবশরীর এ নরকে ক্ষণকালও রাখা নয়—

দারো। মহাশয়, কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা করিতে হইবে—

পণ্ডিত। আপনি বুঝি নরকের দ্বারপাল? নতুবা এমত স্বভাব হইবে কেন?

দারো। আপনি বিজ্ঞ, আমাকে অন্যায় ভর্ৎসনা করিতেছেন—

[ডাক্তার সাহেবের প্রবেশ]

ডাক্তার। হো, হো, বিন্দুমাধব। গডস্ উইল—পণ্ডিত মহাশয় আসিয়াছেন, বিন্দুকে কালেজ ছাড়া হয় না।

পণ্ডিত। কালেজ ছাড়া বিধি হয় না।

বিন্দু। আমাদের বিষয়-আশয় সব গিয়াছে, অবশেষে পিতা আমাদিগকে পথের ভিক্ষারি করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন (ক্রন্দন) অধ্যয়ন আর কিরূপে সম্ভবে?

পণ্ডিত। নীলকর সাহেবেরা বিন্দুমাধবদিগের সর্বস্ব লইয়াছে—

ডাক্তার। পাদরি সাহেবদের মুখে আমি প্লানটার সাহেবদের কথা শুনিয়াছি এবং আমিও দেখিল। আমি মাতঙ্গনগরের কুটি হইতে আসিল, একটি গ্রামে বসিয়াছে, আমার পাল্কির নিকট দিয়া দুইজন রাইয়ত বাজারে যাইল, এক জনের হস্তে দুগ্‌দো আছে, আমি দুগ্‌দো কিনিতে চাহিল, এক রাইয়ত এক রাইয়তকে কিঞ্চিৎ করে বলিল "নীলমামদো, নীলমামদো", দুগ্‌দো রাখিয়া দৌড় দিল। আমি আর একজন রাইয়তকে জিজ্ঞাসা করিল, সে কহিল, রাইয়ত দুইজন দাদনের ভয়েপলাইয়াছে। আমি দাদন লইয়াছি আমার গুদামে যাইতে কি কারণ হইতে পারে। আমি বুঝিলাম আমাকেপ্লানটার লইয়াছে।রাইয়তের হস্তে দুগ্‌দো দিয়া আমি গমন করিলাম।

ডেপু। ভ্যালি সাহেবের কান্সারণের এক গ্রাম দিয়া পাদরি সাহেব যাইতেছিলেন। রাইয়তেরা তাঁহাকে দেখিয়া "নীলভূত বেরিয়েছে, নীলভূত বেরিয়েছে' বলিয়া রাস্তা ছাড়িয়া স্ব স্ব গৃহে পলায়ন করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ পাদরিসাহেবের বদান্যতা, বিনয় এবং ক্ষমা দর্শনকরিয়া রাইয়তেরা বিস্ময়াপন্ন হইল এবং নীলকর-পীড়নাতুর প্রজাপুঞ্জের দুঃখে পাদরি সাহেব যত অন্তরিক বেদনা প্রকাশ করিতে লাগিলেন তাহারা

তাঁহাকে ততই ভক্তি করিতে লাগিল, এখন রাইয়তেরা পরস্পর বলাবলি করে "একে ঝাড়ের বাঁশ বটে—কোনখানায় দুর্গাঠাকুরণের কাঠাম, কোনখানায় হাড়ির ঝুড়ি।"

পণ্ডিত। আমরা মৃত শরীরটী লইয়া যাই।

ডাক্তার। কিঞ্চিৎ দেখিতে হইবে। আপনারা বাহিরে আনিতে পারেন।

[বিন্দুমাধব এবং ডেপুটী ইনস্পেকটার বন্ধনমোচনপূর্বক
মৃতদেহ লইয়া যাওন এবং সকলের প্রস্থান]

৮২.১৬ সারাংশ

নাটকের ঘটনার কেন্দ্রবিন্দু ইন্দ্রাবাদ—ফৌজদারি কাছারি, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী এবং জেলখানা—তিনটি গর্ভাঙ্কে সন্নিবিষ্ট। প্রথমেই দেখা যায়, গোলোক বসু পরিবারের মোক্তার বিচারকের কাছে এই প্রার্থনা রেখেছে যে, আসামী (গোলোক বসু) ও তার মোক্তারের অনুপস্থিতিতে যাদের সাক্ষী নেওয়া হয়েছে, তাদের পুনর্বার হাজির করা হোক। নীলকরদের বেতনভোগী মোক্তার অযথা নীলকরদের স্তুতি করে এর প্রতিবাদ করে। তাঁর অন্যতম বক্তব্য দয়াশীল, ধর্মজ্ঞানী নীলকররা এদেশের গুপ্তনিধি বের করে এনে দেশের মঙ্গলসাধন ও রাজকোষ বৃদ্ধি করছে। সুতরাং এর যারা বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের কারাবাস করা উচিত। মোক্তার চরম হীনতার পরিচয় দিয়ে ধার্মিক নিরীহ গোলোক বসুর চরিত্র সম্বন্ধেও কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ করে। প্রতিবাদী মোক্তারের কোন তথ্য যুক্তিই তারা মানেনি।বিচারকের আসনের পাশে উড ও রোগ বসে থেকে সময়োচিত মত ও মন্তব্য প্রকাশ করে বিচারককে পক্ষপাতদুষ্ট করে তোলে। পরিশেষে তিনি আদেশ দিলেন—দুশ টকা জামিনে গোলোক বসুকে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। অতঃপর ডেপুটি ইনস্‌পেক্টরের কাছ থেকে জানা গেল কমিশনার সুপারিশ করেছেন গভর্নর সাহেবের অনুমোদনক্রমে গোলোক বসুর মুক্তির ব্যবস্থা করবার নির্দেশ দিয়েছেন।

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ধর্মভীরু, নিরীহ বৃদ্ধ গোলোক বসুর পক্ষে এই বিচার চরম লাঞ্ছনা বিশেষ। কারাবাসে থাকবার বিড়ম্বনা তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। সৎ, ন্যায়পরায়ন এই মানুষটি বিচারের এই প্রহসন মেনে নিতে পারেননি। অপমানিত বৃদ্ধের হৃদয় মন এর ফলে বিদীর্ণ হয়েছে । তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নবীনমাধবের কাছেও এ এক চরম সঙ্কটকাল। তিনি স্থির করেছেন, প্রয়োজনে সর্বস্ব বিক্রী করে পিতার মুক্তির ব্যবস্থা করবেন। বিন্দুমাধবের বাড়ীতে ইতোমধ্যে সংবাদ আসে জেল দারোগা তাকে সত্বর উপস্থিত হবার জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। বিন্দুমাধব জেলে গিয়ে দেখেন গোলোক অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে ঔদ্ধন্ধান আত্মহত্যা করেছেন বিন্দুমাধব গভীর শোকে আপ্লুত হলেন।

৮২.১৭ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

মজুকুব—কর্মচারী। হেতুবাদ দেখা যায় না—উক্তিটি ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের। হেতু অর্থাৎ কারণ বা প্রয়োজন—অর্থাৎ সাক্ষীদের আনার প্রয়োজন নেই। আসামী ও তার মোক্তারের অনুপস্থিতি সাক্ষ্য নেওয়ায় প্রতিবাদী মোক্তার সাক্ষীদের পুনরায় আদালতে হাজির করবার কথা বলায়, উডের পরামর্শে ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট একথা বলেছেন। বিচারের প্রহসনের এটি এ কটি উদাহরণ। উহার কাছে প্রজার বিচার—যেখানে বিচারক নিজেই নীলকরদের বশীভূত সেখানে নীলকরের বিরুদ্ধে অভিযোগের সুবিচার হতে পারে না।

আপনি বুঝি নরকের দ্বারাপাল—উক্তিটি পণ্ডিত মহাশয়ের। পণ্ডিত ডেপুটি ইনসপেকটরকে উদ্বন্ধন থেকে গোলোকচন্দ্রকে বন্ধন মুক্ত করতে অনুরোধ করলে জেল দারোগা ডাক্তারের অনুমতি ব্যতিরেকে নামান যাবে না বলেন। পণ্ডিত মহাশয় তাকে নীলকরদের পক্ষভু ক্ত মনে করে একথা বলেছেন।

কোনখানায় দুর্গাঠাকুরুণের কাঠামো...........হাড়ির ঝুরি—উক্তিটি ডেপুটি ইনসপেক্টরের। সাধারণ প্রজারা সকলেই সাহেব মাত্রেই দুরাচারী—'নীলভূত', নীল মামদো' মনে করে। কিন্তু জনৈক সাহেব পাদরীর বদান্যতা, বিনয়, ক্ষমাসুন্দর আচরণ রাইয়তদের বিস্ময়াপন্ন করে। পাদরিদের প্রতি শ্রদ্ধায় মানত হয়। এ থেকেই তারা পারস্পরিক আলোচনায় আলোচ্য মন্তব্যটি করেছে। যার 'মূল অর্থ, এক ঝাড় থেকে বাঁশ কাটলেও, তা নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। কোনটি দিয়ে দূর্গা প্রতিমার কাঠামো যেমন হয় তেমনি কোনটি দিয়ে হাড়ি-বাগদীরা ঝুড়ি বানাবার কাজে লাগায়। পাদরী ও নীলকরেরা ইংরেজ হলেও, তাদের স্বভাবে ও আচরণের পার্থক্য জনিত কারণে একজন হয় ভক্তির পাত্র ওপর জন হয় ঘৃণা, নিন্দার যোগ্য।

৮২.১৮ নীল-দর্পণ মূলপাঠ—৫

পঞ্চমাঙ্ক

প্রথম গর্ভাঙ্ক

বেগুনবেড়ের কুটির দপ্তরখানার সম্মুখ

[গোপীনাথ দাস এবং একজন গোপের প্রবেশ]

গোপী। তুই এত খবর পেলি কেমন করে?

গোপ। মোরা হলাম পত্তিবাসী, সারাক্ষুণ্ডি যাওয়া আসা কত্তি লেগেচি, নুন না থাকলি নুন চেয়ে

আনচি, তেলপলাড়া তেলপলাডাই আনলাম, ছেলেডা কান্তি লাগলো গুড় চেয়ে দেলাম—বসিগার বাড়ী সাত পুরুষ খেয়ো মানুষ, মোরা আর ওনাদের খবর আকি নে?

গোপী। বিন্দুমাধবের বিবাহ হয় কোথায়?

গোপ। ঐ যে কি গাঁড়া বলে, কলকাতার পচ্চিমি, যারা কায়েদগার পইতে কত্তি চেয়লো—যে বামুন আচে ইদিরি খেবয়ে ওটা যায় না আবার বামুন বেড়য়ে তোলে— ছোটবাবুর শ্বশুরগার মান বড়, গারনাল সাহেব টুপি না খুলে এসতি পারে না। পাড়াগাঁয় ওরা কি মেয়ে দেয়? ছোট বাবুর ন্যাকাপড়া দেখে চাসাগাঁ মানলে না। নোকে বলে সউরে মেয়েগুনো কিছু ঠমক মারা, আর ঘরো বাজারে চেনা যায় না, কিন্তু বসিগার বৌর মত শান্ত মেয়ে তো আর চোকি পড়ে না, গোমার মা পত্যই ওনাদের বাড়ি যায়, তা এই পাঁচ বচ্চোর বে হয়েচে, এক দিন মুখখান দ্যাখতি প্যালে না। যে দিন বে করে আনলে মোরা সেই দিন দেখেলাম—ভাবলাম, সউরে বাবুরো র‍্যাংরাজ-ঘ্যাঁসা, তাইতে বিবির ন্যাকাৎ মেয়ে পয়দা করেচে।

গোপী। বউটী সর্বদাই শ্বাশুড়ীর সেবার নিযুক্ত আছে।

গোপ। দেওয়ানজী মশাই, বলবো কি, গোমার মা বল্লে, মোগার পাড়াতেও আষ্ট, ছোট বউ না থাকলি, যে দিনি গলায় দড়ির খবর শুনেলো, সেই দিনিই মাঠাকুরণ মরতো—শুনেলেম সউরে মেয়েগুলো মিন্‌সেগার ভ্যাড়া কর্য়ে আখে, আর মা-বাপেরি না খ্যাতি দিয়ে মারে, কিন্তু ও বউডোরে দেখে জানলাম, এডা কেবল গুজোব কথা।

গোপী। নবীন বসের মাও বোধ করি বউটিকে বড় ভাল বাসে।

গোপ। মাঠকুরণ যে পিরতিমির মধ্যে কারে ভাল না বাসেন, তাও তো দেখ্‌তি পাইনে। আ! মাগী যেন অন্নপুন্নো, তা তোমরা কি আর অন্ন একেচ যে তিনি পুন্নো হবেন—গোড়ার নীলি বুড়বে খেয়েচে, বুড়ীরিও খাবে ২ কত্তি নেগেচে।—

গোপী। চুপ কর গুওডা, সাহেব শুনলে এখনই অমাবস্যা বার করবে।

গোপ। মুই কি করবো,তুমি তো খুঁচিয়ে ২ বিষ বার কত্তি নেগেচো, মোর কি সাধ, কুটিতে বসি গোডার শালারে গালাগালি করি।—

গোপী। আমার মনেতে কিছু দুঃখ হয়েছে—মিথ্যা মোকদ্দমা কর্য়ে মানী মানুষটোরে নষ্ট করলাম। নবীনের শিরঃপীড়া আর নবীনের মার এই মলিন দশা দেখে আমি বড় ক্লেশ পাইয়াছি।—

গোপ। ব্যাঙ্গের সর্দি—দেওয়ানজী মশাই খাপা হবেন না, মুই পাগল-ছাগল আছি, একটা তামাক সাজে আনবো?

গোপী। গুয়োজা নন্দর বংশ, ভোগোলের শেষ।—

গোপ। সাহেবেরাই সব কত্তি নেগেচে, সাহেবেরা কামার, আপনারা খাঁড়া, যেখানে পড়ায় সেখানে পড়ে। গোডার কুটিতে দ পড়ে, গেরামের নোক নেয়ে বাঁচে।—

গোপী। তুই গুওড়া বড় ভেমো, আমি আর শুনতে চাই না—তুই যা, সাহেবের আসবার সময় হইয়েছে।—

গোপ। মুই চল্লাম, মোর দুদির হিসেবডা কর্য়ে মোরে কাল একটা টাকা দিতি হবে, মোর গঙ্গাচ্ছানে যাব।—

[প্রস্থান]

গোপী। বোধ করি, ঐ শিরঃপীড়ার উপরই কাল বজ্রাঘাত হবে। সাহেব তোমার পুষ্করিণীর পাড়ে নীল বুনবে, তা কেহ রাখিতে পারিবে না—সাহেবদের কিঞ্চিৎ অন্যায় বটে, গত বৎসরের টাকা না পেয়েও ৫০ বিঘা নীল করিতে একপ্রকার প্রবৃত্ত হয়েছে, তাতেও মন উঠিল না। পূর্ব মাঠের ধানি জমি কয়েকখানার জন্যেই এত গোলমাল, নবীন বসের দেওয়াই উচিত ছিল—শেতলাকে তুষ্ট রাখিতে পারিলেই ভাল। নবীন মরেও এক কামড় কামড়াবে। — (সাহেবকে দূরে দেখিয়া) এই যে শুভ্রকান্তি নীলাম্বর আসিতেছেন। আমাকে হয় তো বা সাবেক দেওয়ানের সঙ্গে কতক দিন থাকতে হয়।

[উডের প্রবেশ]

উড। এ কথা যেন কেহ না জানতে পারে, মাতঙ্গনগরের কুটিতে দাঙ্গা বড় হবে, লাটিয়াল সব সেখানে থাকবে। এখানকার জন্যে দশজন পোদ সুড়্কিওয়ালা জোগাড় কর্য়ে রাখবে—আমি যাব, ছোট সাহেব যাবে, তুমি যাবে। শালা কাচা গলায় বেঁধে বাড়াবাড়ি কত্তে পারবে না, বেমো আছে, কেমন করিয়া দারোগার মদৎ আন্তে পারবে—

গোপী। ব্যাটারা যে কাতর হয়েছে, সড়কিওয়ালার আবশ্যক হবে না। হিন্দুর ঘরে গলায় দড়ি দিয়ে, বিশেষ জেলের ভিতরে মরা বড় দোষ এবং ধিক্কারাস্পদ। এই ঘটনাতে ব্যাটা বড় শাসিত হইয়াছে।

উড। তুমি বুঝিতেছ না, বাপের মরাতে রাস্কেলের সুখ হইল—বাপের ভয়েতে নীলের দাদন লইত, এখন বাঞ্চতের সে ভয় গেল, যেমন ইচ্ছা তেমনি করবে। শালা আমার কুটির বদনাম কর্য়ে দিয়াছে। হারামজাদাকে কাল আমি গ্রেপ্তার করবো, মজুমদারের সহিত দোস্ত করিয়া দিব। অমরনগরের ম্যাজিস্ট্রেটের মত হাকিম, আইলে বজ্জাত সব কত্তে পারবে।

গোপী। মজুমদারের মোকদ্দমার যে সূত্র করিয়াছে, যদি নবীন বসের এ বিভ্রাট না হতো, তবে এতদিন ভয়ানক হইয়া উঠিত—এখনও কি হয় বলা যায় না, বিশেষ যে হাকিম আসিতেছেন, তিনি শুনিয়াছি, রাইয়তের পক্ষ আর মফস্বলে আইলে তাঁবু আনেন। ইহাতে কিছু গোল বোধ হয়, ভয়ও বটে—

উড। তোম্ ভয় ভয় কর্কে হাম্কো ডেক্ কিয়া, নীলকর সাহেবকো কোই কামমে ডর হ্যায়? গিধ্বড়কি শালা, তোমারা মোনাসেফ না হোয়্ কাম ছোড় দো।

গোপী। ধর্মাবতার, কাজেই ভয় হয়—সাবেক দেওয়ান কয়েদ হলে তার পুত্র ৬ মাসের বাকী মাহিনা লইতে আসিয়াছিল, তাহাতে আপনি দরখাস্ত করিতে বল্লেন, দরখাস্ত করিলে পর আপনি হুকুম দিলেন, কাগজ নিকাশ ব্যতীত মাহিয়ানা দেওয়া যাইতে পারে না। ধর্মাবতার, চাকর কয়েদ হলে বিচার এই?

উড। আমি জানি না? ও শালা, পাজি নেমকহারাম বেইমান। মাহিনার টাকায় তোমাদের কি হইয়া

থাকে? তোমরা যদি নীলের দামের টাকা ভক্ষণ না কর তবে কি ডেডলি কমিশন হইত? তা হইলে কি দুঃখী প্রজারা কাঁদিতে ২ পাদরি সাহেবের কাছে যাইত? তোমরা শালারা সব নষ্ট করিয়াছি, মাল কম পরিলে তোমার বাড়ী বেচিয়া লইব—অ্যারান্ট কাউয়ার্ড, হেলিশ নেভ।

গোপী। আমরা হুজুর, কসায়ের কুকুর—নাড়ী ভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি। ধর্মাবতার, আপনারা, যদি মহাজনেরা যেমন খাতকের কাছে ধান আদায় করে, সেইরূপে নীল গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে নীলকুটির এত দুর্নাম হইত না, আমীন খালাসীরও প্রয়োজন থাকিত না, আর আমাকে 'গুপে গুওটা, গুপে গুওটা" বলিয়া সকল লোকে গাল দিত না।

উড। তুমি গুওটা। ব্লাইন্ড, তোমার চক্ষু নাই—

[একজন উমেদারের প্রবেশ]

আমি এই চক্ষে দেখিয়াছি. (আপন চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে যায় এবং রাইয়তদিগর সঙ্গে বিবাদ করে। তুমি এই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা কর।

উমে। ধর্মাবতার, আমি এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত দিতে পারি। রাইয়তেরা বলে, নীলকর সাহেবদের দৌলতে মহাজনের হাত হইতে রক্ষা পাইতেছি।

গোগী। (উমেদারের প্রতি জনান্তিকে) ওহে বাপু, বৃথা খোসামোদ। কর্ম কিছু খালি নেই। (উডের প্রতি) মহাজনেরা ধানের ক্ষেত্রে গমন করে এবং নিজ খাতকের সহিত বাদানুবাদ করে, এ কথা যথার্থ বটে, কিন্তু এরূপ গমনের এবং বিবাদের নিগূঢ় মর্ম অবগত, হইলে শ্যামচাঁদ-শক্তিশেলে অনাহারী প্রজারূপ সুমিত্রা-নন্দন-নিচয়ের নিপতন, খাতকের শুভাভিলাষী মহাজন—মহাজনের ধান্যক্ষেত্রে ভ্রমণের সহিত তুলনা করিতেন না—আমাদের সঙ্গে মহাজনদের অনেক ভিন্নতা।

উড। আচ্ছা, আমারে বুঝাও। কিছু কারণ থাকিতে পারে, শালা লোক আমাদিগের সব কথা বলিতেছে মহাজনের কথা কিছু বলে না।

গোপী। ধর্মাবতার, খাতকদিগের সংবৎসরের যত টাকা আবশ্যক, সকলি মহাজনের ঘর হইতে আনে এবং আহারের জন্য যত ধান্য প্রয়োজন, তাহা মহাজনের গোলা হইতে লয়, বৎসরান্তে তামাক ইক্ষু তিল ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া মহাজনের সুদ সমেত টাকা পরিশোধ করে অথবা বাজারদরে ঐ সকল দ্রব্য মহাজনকে দেয় এবং ধান্য যাহা জন্মে, তাহা হইতে মহাজনের ধান্য দেড়া বাড়িতে অথবা সাড়ে সইয়ে বাড়িতে ফিরিয়া দেয়, ইহার পর যাহা থাকে, তাহাতে ৩/৪ মাস ঘরখরচ করে। যদি দেশে অজন্মাবশতঃ কিংবা খাতকের অসঙ্গত ব্যয় জন্য টাকা কিংবা ধান্য বাকি পড়ে, তাহা বকেয়া বলিয়া নতুন খাতায় লিখিত হয়, বকেয়া বাকি ক্রমে ২ উসুল পড়িতে থাকে, মহাজনেরা কদাপিও খাতকের নামে নালিশ করে না, সুতরাং যাহা বাকি পড়ে, তাহা মহাজনদিগের আপাততঃ লোকসান বোধ হয় এই জন্য মহাজনেরা কখন ২ মাঠে যায়, ধানের কারকীত রীতিমত হইতেছে কি না দেখে, খাজানা বলিয়া যত টাকা খাতকে চাহিয়াছে, তদুপযুক্ত জমি বুনন হইয়াছে কি না, তাহা অনুসন্ধান করিয়া জানে। কোন ২ অদূরদর্শী খাতক প্রতারণা করিয়া অধিক টাকা লইয়া সর্বদাই ঋণে বিরত হইয়া মহাজনের লোকসান করে এবং আপনারাও

কষ্ট পায়, সেই কষ্ট নিবারণের জন্যেই মহাজনেরা মাঠে যায়, "নীলমামদো" হইয়া যায় না (জিব কেটে) ধর্মাবতার, এই নেড়ে হারামখোর বেটারা বলে।

উড। তোমার ছাড়ন্তো শনি ধরিয়াছে, নচেৎ তুমি এত অনুসন্ধান করিতেছ কি কারণ, নইলে তুই এত বেয়াদব হইয়াছিস কেন? বজ্জাত, ইন্‌সেস্‌চিউয়স ব্রুট।

গোপী। ধর্মাবতার, গালাগালি খেতেও আমরা, পয়জার খেতেও আমরা, শ্রীঘর যেতেও আমরা, কুটিতে ডিসপেনসারি স্কুল হইলেই আপনারা, খুব-গুমি হইলেই আমরা। হুজুরের কাছে পরামর্শ করিতে গেলে রাগত হন, মজুমদারের মোকদ্দমায় আমরা অন্তঃকরণ যে উচাটন হইয়াছে, তা গুরুদেবই জানেন।

উড। বাঞ্চৎকে একটা সাহসী কার্য করিতে বলি, শালা ওমনি মজুমদারের কথা প্রকাশ করে—আমি বরাবর বলিয়া আসিতেছি তুমি শালা বড় না-লায়েক আছে—নবীন বসকে শচীগঞ্জের গুদামে পাঠাইয়া কেন তুমি স্থির হও না?

গোপী। আপনি গরিবের মা বাপ, গরিব চাকরের রক্ষার জন্য একবার নবীন বস্‌কে এ মোকদ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভাল হয়।

উড। চপরাও, ইউ ব্যাসটার্ড অভ হোরস বিচ্‌। তেরা ওয়াস্তে হাম কুত্তাকা সাৎ মুলাকাৎ করেগা, শালা কাউয়ার্ড কায়েতবাচ্ছা (পদাঘাতে গোপীর ভূমিতে পতন) কমিস্যনে তোকে সাক্ষী দিতে পাঠাইলে তুই হারামজাদা সর্বনাশ কত্তিস, ডেভিলিষ নিগার। (আর দুই পদাঘাত) এই মুখে তোম কাওটকা মাফিক কাম্‌ ডেগা—শালা কায়েত—কালকো কাম দেখ্‌কে হাম তোম্‌কা আপ্‌সে জেলমে ভেজ দেগা।

[উড এবং উমেদারের প্রস্থান

গোপী। (গাত্র ঝাড়িতে ২ উঠিয়া) সাতশত শকুনি মরিয়া একটি নীলকরের দেওয়ান হয়, নচেৎ অগণনীয় মোজা হজম হয় কেমন করো্যে? কি পদাঘাতই করিতেছে, বাপ্‌। বেটা যেন আমার কালেজ আউট-বাবুদের গৌনপরা মাগ।

(নেপথ্যে) ডেওয়ান্‌, ডেওয়ান!

গোপী। বন্দা হাজির। এবার কার পালা—

"প্রেমসিন্ধু নীরে বহে নানা তরঙ্গ।"

[গোপীর প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

নবীনমাধবের শয়নঘর

(আদুরী বিছানা করিতে করিতে ক্রন্দন)

আদুরী। আহা! হা হা, কনে যাব, পরাণ ফ্যাটে বার হলো, এমন করো্যেও ম্যারেচে, কেবল ধুক ধুক কত্তি নেগেচে, মা ঠাকুরণ দেখে বুক ফ্যাটে মরে যাবে। কুটি ধরো্যে নিয়ে গিয়েচে ভেবে তানারা

গাচ্‌তলায় আঁচড়া-পিচড়ি করি কান্তি নেগেচেন, কোলে করে যে মোদের বাড়ী পানে আনলে তা দেখতি পালন না।

(নেপথ্যে) আদুরী, আমরা ঘরে নিয়ে যাব।

আদুরী। তোমরা ঘরে নিয়ে এস, তানারা কেউ এখানে নেই।

[মূর্ছাপন্ন নবীনমাধবকে বহন করতঃ সাধু এবং তোরাপের প্রবেশ]

সাধু। (নবীনমাধবকে শয্যায় শয়ন করাইয়া) মাঠাকুরুণ কোথায়?

আদুরী। তানারা গাছতলায় দেঁড়য়্যে দেখতি নেগেলেন, (তোরাপকে দেখায়ে) ইন যখন নে পেলয়্যে গ্যালেন, মোরা ভাবলাম, কুটি নিয়ে গেল, তানারা গাছতলায় আঁচ্‌ড়া-পিচ্‌ড়ি কত্তি নেগ্‌লো, মুই নোক ডাক্‌তি বাড়ী আলাম। মরা ছেলে দেখে মাঠাকুরণ কি বাচবে? তোমরা এট্ট দাঁড়াও, মুই তানাদের ডাকে আনি।

[আদুরীর প্রস্থান]

[পুরোহিতের প্রবেশ]

পুরো। হা বিধাতঃ! এমন লোককেও নিপাত করিলে! এত লোকের অন্ন রহিত হইল। বড় বাবু যে আর গাত্রোস্থান করেন, এমন বোধ হয় না।

সাধু। পরমেশ্বরের ইচ্ছা, তিনি মৃত মনুষ্যকেও বাঁচাইতে পারেন।

পুরো। শাস্ত্রমতে তেরাত্রে বিন্দুমাধব ভাগীরথীতীরে পিণ্ডদান করিয়াছেন, কেবল কর্ত্রীঠাকুরাণীর অনুরাধে মাসিক শ্রাদ্ধের আয়োজন। শ্রাদ্ধের পর এ স্থান হইতে বাস উঠাইবার স্থির হইয়াছিল এবং আমাকে বলিয়াছিলেন, আরও দুর্দান্ত সাহেবদিগের সহিত দেখাও করিবেন না, তবে অদ্য কি জন্য গমন করিলেন?

সাধু। বড় বাবুর অপরাধ নাই, বিবেচনারও ত্রুটি নাই। মাঠাকুরুণ এবং বউঠাকুরুণ অনেকরূপ নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, "যে কএক দিন এখানে থাকা যায়, আমরা কুআর জল তুলিয়া স্নান করিব, অথবা আদুরী পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া দিবে, আমাদিগের কোন ক্লেশ হইবে না।" বড় বাবু বলিলেন, "আমি ৫০ টাকা নজর দিয়া সাহেবের পায় ধরিয়া পুষ্করিণীর পারে নীল করা রহিত করিব, এ বিপদে বিবাদের কোন কথা কহিব না।" এই স্থির করিয়া বড় বাবু আমাকে আর তোরাপকে সঙ্গে লইয়া নীলক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং কাঁদিতে ২ সাহেবকে বলিলেন, "হুজুর, আমি আপনাকে ৫০ টাকা সেলামি দিতেছি, এ বৎসর এ স্থানটায় নীল করিবেন না, আর যদি এই ভিক্ষা না দেন, তবে টাকা লইয়া গোরিব পিতৃহীন প্রজার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গের দিন পর্যন্ত বুনন বহিত করুন।" নরাধম যে উত্তর দিয়াছিল, তাহা পুনরুক্তি করিলেও পাপ আছে, এখনও শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে, বেটা বল্যে, "যবনের জেলে চোর-ডাকাইতের সঙ্গে তোর পিতার ফাঁস হইয়াছে, তার শ্রাদ্ধে অনেক ষাঁড় কাটিতে হইবে, সেই নিমিত্তে টাকা রাখিয়া দে" এবং পায়ের জুতা বড়বাবুর হাঁটুতে ঠেকাইয়া কহিল, "তোর বাপের শ্রাদ্ধে ভিক্ষা এই।"

পুরো। নারায়ণ! নারায়ণ! (কর্ণে হস্ত দান)

সাধু। অমনি বড়বাবুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল, অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, দন্ত দিয়া ঠোঁট কামড়াইতে লাগিলেন এবং ক্ষণেক কাল নিস্তব্ধ হয়ে্য থেকে সজোরে সাহেবের বক্ষঃস্থলে এমন একটি পদাঘাত করিলেন, বেটা বেনার বোঝার ন্যায় ধপাৎ করিয়া চিত হইয়া পড়িল। কেশে ঢালী, যে এখন কুটির জমাদার হইয়াছে, সেই বেটা ও আর দশজন সুড়কীওয়ালা বড়বাবুকে ঘেরাও করিল, ইহাদিগকে বড়াবাবু একবার ডাকাতি মকদ্দমা হতে বাঁচাইয়াছেন, বেটারা বড় বাবুকে মারিতে একটু চক্ষুলজ্জা বোধ করিল। বড়সাহেব উঠিয়া জমাদ্দারকে একটা ঘুষি মারিয়া তাহার হাতের লাঠি লইয়া বড়বাবুর মাথায় মারিল, বড়বাবুর মস্তক ফাটিয়া গেল এবং অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িলেন, আমি অনেক যত্ন করিয়াও গোলের ভিতরে যাইতে পারিলাম না, তোরাপ দূরে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, বড়াবাবুকে ঘেরাও করিতেই একগুঁয়ে মহিষের মত দৌড়ে গোল ভেদ কর্য়ে বড়বাবুকে কোলে লইয়া বেগে প্রস্থান করিল।

তোরাপ। মোরে বল্লেন, "তুই এট্টু তফাৎ থাক্, জানি কি ধরা পাকড়া করে নে যাবে।" মোর উপর সুমিন্দিদের বড় গোসা, মারা মারি হবে জানলি মুই কি নুকয়ে থাকি? এট্টু আগে যাতি পাল্লে বড়বাবুকে বেঁচয়ে আনতি পাত্তাম, আর দুই সমিন্দিরি বরকোৎ বিবির দরগায় জবাই কত্তাম। বড় বাবুর মাতা দেখে মোর হাত পা প্যাটের মদ্যে গেল, তা সমিন্দিগার মারবো কখন—আল্লা! বড়বাবু মোরে এত বার বাঁচালে, মুই বড়বাবুরি অ্যাকবার বাঁচাতি পাল্লাম না। (কপালে ঘা মারিয়া রোদন।)

পুরো। বুকে যে একটা অস্ত্রের ঘা দেখিতেছি।

সাধু। তোরাপ গোলের মধ্যে পৌঁছিবামাত্র ছোট সাহেব পতিত বড়বাবুর উপর এক তলোয়ারের কোপ মারে, তোরাপ হস্ত দিয়া রক্ষা করে, তোরাপের বাম হস্ত কাটিয়া যায়, বড়াবাবুর বুকে একটু খোঁচা লাগে।

পুরো। (চিন্তা করিয়া)

"বন্ধুস্ত্রীভৃত্যবর্গস্য বুদ্ধেঃ সত্ত্বস্য চাত্মনঃ।
আপন্নিকষপাষাণে নরো জানাতি সারতাম্।।"

বড়বাড়ীর জনপ্রাণী দেখিতেছি না, কিন্তু অপর গ্রামনিবাসী ভিন্নজাতি তোরাপ বড়াবাবুর নিকটে বস্যে রোদন করিতেছে। আহা! গোরিব খেটে খেগো লোক, হস্তখানি একেবারে কাটিয়া দিয়াছে—উহার মুখ রক্তমাখা কিরূপে হইল?

সাধু। ছোট সাহেব উহার হস্তে তরোয়াল মারিলে পর, নেজ মাড়িয়ে ধরিলে বেঁজি যেমন ক্যাচ ক্যাচ করিয়া কামড়ে ধরে, তোরাপ জ্বালার চোটে তেমনি বড় সাহেবের নাক কাম্ড়ে লইয়া পালাইয়াছিল।

তোরাপ। নাকটা মুই গাঁটি গুঁজে নেকিচি, বড়বাবু বেঁচে উটলি দ্যাখাবো, এই দেখ (ছিন্ন নাসিকা দেখাওন)। বড়বাবু যদি আপনি পালাতি পাত্তেন, সমিন্দির কান দুটো মুই ছিঁড়ে আনতাম, খোদার জীব পরাণে মাত্তাম না।

পুরো। ধর্ম আছেন, শূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদে দেবগণ রাবণের অত্যাচার হইতে ত্রাণ পাইয়াছিল, বড় সাহেবের নাসিকাচ্ছেদে প্রজারা নীলকরের দৌরাত্ম্য হইতে মুক্তি পাইবে না?

তোরাপ। মুই এখন ধানের গোলার মধ্যি নুক্য়ে থাকি, নাত কর‍্যে পেল্য়্যে যাব, সমিন্দি নাকের জন্যি গাঁ নসাতলে পেট্য়ে দেবে।

[নবীনমাধবের বিছানার কাছে মাটিতে দুইবার সেলাম করিয়া প্রস্থান]

সাধু। কর্তা মহাশয়ের গঙ্গালাভ শুনে মাঠাকুরুণ যে ক্ষীণ হয়েছেন, বড়বাবুর এ দশা দেখিবামাত্র প্রাণত্যাগ করিবেন সন্দেহ নাই—এত জল দিলাম, বুকে হাত বুলালাম, কিছুতেই চেতন হইল না, আপনি একবার ডাকুন দিকি।—

পুরো। বড়বাবু! বড়বাবু! নবীনমাধব! (সজল নয়নে) প্রজাপালক! অন্নদাতা!—চক্ষু নাড়িতেছেন। আহা! জননী এখনি আত্মহত্যা করিবেন। উদ্বন্ধনবার্তা শ্রবণে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, দশদিবস পাপ পৃথিবীর অন্ন গ্রহণ করিবেন না, অদ্য পঞ্চম দিবস, প্রত্যুষে নবীনমাধব জননীর গলা ধরিয়া অনেক রোদন করিলেন এবং বলিলেন, "মাতঃ, যদি অদ্য আপনি আহার না করেন, তবে মাতৃ-আজ্ঞা-লঙ্ঘন-জনিত নরক মস্তকে ধারণপূর্বক আমি হবিষ্য করিব না, উপবাসী থাকিব।" তাহাতে জননী নবীনের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন, "বাবা, আমি রাজমহিষী ছিলেম, রাজমাতা হলেম, আমার মনে কিছু খেদ থাকিত না, যদি মরণকালে তাঁর চরণ একবার মস্তকে ধারণ করিতে পরিতাম, এমন পুণ্যাত্মার অপমৃত্যু হইল? এই কারণে আমি উপবাস করিতেছি। দুঃখিনীর ধন তোমরা, তোমার এবং বিন্দুমাধবের চেয়ে আমি অদ্য পুরোহিত ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করিব, তুমি আমার সম্মুখে চক্ষের জল ফেল না।" বলিয়া নবীনকে পঞ্চম বর্ষের শিশুর ন্যায় ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

[নেপথ্যে বিলাপসূচক ধ্বনি]

আসিতেছে।

(সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী, সরলতা, আদুরী, রেবতী, নবীনের খুড়ী এবং অন্যান্য প্রতিবাসিনীর প্রবেশ) ভয় নাই, জীবিত আছেন—

সাবিত্রী। (নবীনের মৃতবৎ শরীর দর্শন করিয়া) নবীনমাধব! বাবা আমার, বাবা আমার, বাবা আমার, কোথায়, কোথায়,—উহুহু!

[মূর্চ্ছিত হইয়া পতন]

সৈরি। (রোদন করিতে করিতে) ছোটবউ, তুমি ঠাকুরুণকে ধর, আমি প্রাণকান্তকে একবার প্রাণ ভর‍্যে দর্শন করি। (নবীনমাধবের মুখের নিকট উপবিষ্টা)

পুরো। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) মা, তুমি পতিব্রতা সাধ্বী সতী, তোমার শরীর সুলক্ষণে মণ্ডিত, পতিরতা সুলক্ষণা ভার্যার ভাগ্যে মৃত পতিও জীবিত হয়, চক্ষু নাড়িতেছেন, নির্ভয়ে সেবা কর। সাধু, কর্ত্রী ঠাকুরাণীর জ্ঞানসঞ্চার হওয়া পর্যন্ত তুমি এখানে থাক।

[প্রস্থান]

সাধু। মাঠাকুরুণের নাকে হাত দিয়া দেখ দেখি, মৃত শরীর অপেক্ষাও শরীর স্থির দেখিতেছি।

সর। (নাসিকায় হস্ত দিয়া রেবতীর প্রতি মৃদুস্বরে) নিশ্বাস বেশ বহিতেছে, কিন্তু মাথা দিয়া এমন আগুন বাহির হতেচে, যে আমার গলা পুড়ে যাচ্যে।

সাধু। গোমস্তা মহাশয় কবিরাজ আন্‌তে গিয়ে সাহেবদের হাতে পড়লেন নাকি? আমি কবিরাজের বাসায় যাই।

[প্রস্থান]

সৈরি। আহা! আহা! প্রাণনাথ’ যে জননীর অনাহারে এত খেদ করিতেছিলে, যে জননীর ক্ষীণতা দেখিয়া রাত্রিদিন পদসেবায় নিযুক্ত ছিলে, যে জননী কয়েক দিবস তোমাকে ক্রোড়ে না করিয়া নিদ্রা যাইতে পারিতেন না, সেই জননী তোমার নিকটে মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত আছেন, একবার দেখিলে না! (সাবিত্রীকে অবলোকন করিয়া) আহা! হা! বৎসহারা হাম্মারবে ভ্রমণকারিণী গাভী সর্পাঘাতে পঞ্চত্বপ্রাপ্ত হইয়া প্রান্তরে যেরূপ পতিত হইয়া থাকে, জীবনাধার পুত্রশোকে জননী সেইরূপ ধরাশায়িনী হইয়া আছেন—প্রাণনাথ। একবার নয়ন মেল্যে দেখ, একবার দাসীরে অমৃতবচনে দাসী বল্যে ডেকে কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর—মধ্যাহ্নসময় আমার সুখ-সূর্য অস্তগত হইল— আমার বিপিনের উপায় কি হইবে? (রোদন করিতে ২ নবীনমাধবের বক্ষের উপর পতন)

সর। ওগো, তোমরা দিদিকে কোলে করেব ধর।

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আমি অতি শিশুকালে পিতৃহীন হয়েছিলাম, আহা। এই কাল নীলের জন্যেই পিতাকে কুটিতে ধর্যে নিয়ে যায়, পিতা আর ফিরিলেন না। নীলকুটি তাঁর যমালয় হইল। কাঙ্গালিনী জননী আমায় নিয়ে মামার বাড়ী যান, পতিশোকে সেইখানে তাঁর মৃত্যু হয়, মামারা আমাকে মানুষ করেন, আমি মালিনীর হস্ত হইতে হঠাৎ পতিত পুষ্পের ন্যায় পথে পতিত হইয়াছিলাম, প্রাণনাথ আমাকে আদর কর্যে তুলে লয়্যে গৌরব বাড়াইয়াছিলেন, আমি জনক-জননীর শোক ভুলে গিয়েছিলাম, প্রাণকান্তের জীবনে পিতামাতা আমার পুনর্জীবিত হইয়াছিলেন, (দীর্ঘনিশ্বাস) আমার সকল শোক নূতন হইতেছে, আহা! সর্বাচ্ছাদক স্বামিহীন হইলে আমি আবার পিতামাতাবিহীন পথের কাঙ্গালিনী হইব।

(ভূতলে পতন)

খুড়ী। (হস্তধারণপূর্বক উত্তোলন করিয়া) ভয় কি? উতলা হও কেন, মা! বিন্দুমাধবকে ডাক্তার আন্‌তে লিখে দিয়াছে, ডাক্তার আইলেই ভাল হবেন।

সৈরি। সেজো ঠাকুরূণ, আমি বালিকাকালে সেঁজোতির ব্রত করিয়াছিলাম, আলপনায় হস্ত রাখিয়া বল্যেছিলাম, যেন রামের মত পতি নাই, কৌশল্যার মত শাশুড়ী পাই, দশরথের মত শ্বশুর পাই, লক্ষ্মণের মত দেবর পাই। সেজোঠাকুরণ, বিধাতা আমাকে সকলি আশার অধিক দিয়াছিলেন, আমার তেজঃপুঞ্জ প্রজাপালক রঘুনাথ স্বামী, অবিরল অমৃত্-মুখী বধূপ্রাণা কৌশল্যা শাশুড়ী, স্নেহপূর্ণ-লোচন প্রফুল্লবদন বধূমাতা বধুমাতা বলেই চরিতার্থ, দশ দিক্ আলো-করা শ্বশুর ; শারদকৌমুদীবিনিন্দিত বিমল বিন্দুমাধব আমার সীতাদেবীর লক্ষ্মণ দেবর অপেক্ষাও প্রিয়তর। মা গো! সকলি মিলেছে, কেবল একটি ঘটনার অমিল দেখেতেছি—আমি এখনও জীবিত আছি, রাম বনে গমন করিতেছেন, সীতার সহগমনের কোন

উদ্যোগ দেখিতেছি না। আহা! আহা! পিতার অনাহারে মরণশ্রবণে সাতিশয় কাতর ছিলেন, পিতার পারণের জন্যই প্রাণনাথ কাচা গলায় থাকিতে থাকিতেই স্বর্গধামে গমন করিতেছেন। (একদৃষ্টিতে মুখাবলোকন করিয়া) মরি, মরি, নাথের ওষ্ঠাধর একেবারে শুষ্ক হইয়া গিয়াছে—ওগো, তোমরা আমার বিপিনকে একবার পাঠশালা হতে ডেকে এনে দাও, আমি একবার (সাশ্রুনয়নে) বিপিনের হাত দিয়া স্বামীর শুষ্কমুখে একটু গঙ্গাজল দি। (মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি)

সকলে। আহা! হা!

খুড়ী। (গাত্র ধরিয়া তুলিয়া) মা, এখন এমন কথা মুখে এনো না, (ক্রন্দন) মা, যদি বড়দিদির চেতন থাক্‌তো, তবে এ কথা শুনে বুক ফেটে মর্‌তেন।

সৈরি। মা, স্বামী আমার ইহলোকে বড় ক্লেশ পেয়েছেন, তিনি পরলোকে পরম সুখী হন এই আমার বাসনা। প্রাণনাথ! দাসী তোমার যাবজ্জীবন জগদীশ্বরকে ডাক্‌বে, প্রাণনাথ? তুমি পরম ধার্মিক, পরোপকারী, দীনপালক, তোমাকে অনাথবন্ধু বিশ্বেশ্বর অবশ্যই স্থান দিবেন। আহা! হা! জীবনকান্ত! দাসীকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার দেবারাধনার পুষ্প তুলিয়া দেবে।

আহা, আহা, মরি মরি এ কি সর্বনাশ!
সীতা ছেড়ে রাম বুঝি যায় বনবাস।।
কি করিব কোথা যাব কিসে বাঁচে প্রাণ।
বিপদ্‌-বান্ধব কর বিপদে বিধান।।
রক্ষ রক্ষ রমানাথ! রমণী-বিভব।
নীলানলে হয় নাশ নবীনমাধব।।
কোথা নাথ দীননাথ। প্রাণনাথ যায়।
অভাগিনী অনাথিনী করিয়ে আমায়।।
(নবীনের বক্ষে হস্ত দিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস)
পরিহরি পরিজন পরমেশ-পায়।
লয় গতি দিয়ে পতি বিপদে বিদায়।।
দয়ার পয়োধি তুমি পতিতপাবন।
পরিণামে কর ত্রাণ জীবন-জীবন।।

সর। দিদি, ঠাকুরুণ চক্ষু মেলিয়াছেন, কিন্তু আমার প্রতি মুখ বিকৃত করিতেছেন। (রোদন করিয়া) দিদি, ঠাকুরুণ আমার প্রতি এমন সকোপ নয়নে কখন তা দৃষ্টি করেন নাই।

সৈরি। আহা, আহা ঠাকুরুণ সরলতাকে এমনি ভাল বাসেন যে এ অজ্ঞানবশতঃ একটু রুষ্ট চক্ষে চাহিয় সরলতা-চাঁপাফুল বালির খোলায় ফেলিয়া দিয়াছেন—দিদি, কেঁদো না, ঠাকুরুণের চৈতন্য হইলে তোমায় আবার চুম্বন করবেন এবং আদরে পাগ্‌লীর মেয়ে বলবেন।

(গাত্রোত্থান করিয়া নবীনের নিকটে উপবিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ আহ্লাদ প্রকাশ করিয়া নবীনকে একদৃষ্টিতে অবলোকন করিতে ২)

সাবি। প্রসববেদনার মত আর বেদনা নাই—কিন্তু যে অমূল্যরত্ন প্রসব করিয়াছি, মুখ দেখে সব দুঃখ গেল। (রোদন করিতে ২) আরে দুঃখ! বিবি যদি যমকে চিঠি লিখে কত্তারে না মার্‌তো, তবে সোনার খোকা দেখে কত আহ্লাদ কত্তেন। (হাত তালি)

সকলে। আহা! আহা! পাগল হয়েচেন।

সাবি। (সৈরিন্ধ্রীর প্রতি) দাইবউ—ছেলে একবার আমার কোলে দাও, তাপিত অঙ্গ শীতল করি, কত্তার নাম কর্য্যে খোকার মুখে একবার চুমো খাই। (নবীনের মুখচুম্বন)

সৈরি। মা, আমি যে তোমার বড়বউ, মা দেখতে পাচ্চ না—তোমার প্রাণের রাম অচৈতন্য হয়্যে পড়ে রয়েচেন, কথা কহিতে পাচ্যেন না।

সাবি। ভাতের সময় কথা ফুট্‌বে। আহা, হা! কত্তা থাক্‌লে আজ কত আনন্দ, কত বাজ্‌না বাজ্‌তো। (ক্রন্দন)

সৈরি। সর্বনাশের উপর সর্বনাশ। ঠাকুরূণ পাগল হলেন?

সর। দিদি, জননীকে বিছানা-ছাড়া করিয়া দাও, তাঁরে আমি শুশ্রুষা দ্বারা সুস্থ করি।

সাবি। এমন চিটিও লিখেছিলেন, এমন আহ্লাদের দিন বাজ্‌না হলো না!

(চারিদিকে অবলোকন করিয়া সকলে গাত্রোত্থানপূর্বক সরলতার নিকটে গিয়া)

তোমার পায়ে পড়ি বিবি ঠাক্‌রুণ, আর একজন চিটি লিখে যমের বাড়ী থেকে কত্তারে ফিরে এনে দাও, তুমি সাহেবের বিবি, তা নইলে আমি তোমার পায়ে ধত্তাম।

সর। মা গো, তুমি আমাকে জননী অপেক্ষাও স্নেহ কর, মা, তোমার মুখে এমন কথা শুনে আমি যমযন্ত্রণা হইতেও অধিক যন্ত্রণা পাইলাম। (দুই হস্তে সাবিত্রীকে ধরিয়া) মা, তোমার এ দশা দেখে আমার অন্তঃকরণে অগ্নিবৃষ্টি হইতেছে।

সাবি। খান্‌কি বিটি, পাজি বিটি, মেলেচ্ছো বিটি, আমাকে একাদশীর দিন ছুঁয়ে ফেল্লি। (হস্ত ছাড়ায়ন)

সর। মা গো, আমি, তোমার মুখে এ কথা শুনে আর পৃথিবীতে থাকিতে পারি নে। (সাবিত্রীর পদদ্বয় ধারণপূর্বক ভূমিতে শয়ন) মা, আমি তোমার পাদপদ্মে প্রাণ ত্যাগ করিব। (ক্রন্দন)

সাবি। খুব হয়েচে, গস্তানিবিটি মরে গিয়েচে, কত্তা আমার স্বর্গে গিয়েছেন, তুমি আবাগী নরকে যাবি। (হাস্য করিতে ২ করতালি)

সৈরি। (গাত্রোত্থান করিয়া) আহ! আহা! সরলতা আমার অতি সুশীলা, আমার শাশুড়ীর সাত আদরের বউ, জননীর মুখে কুবচন শুনে অতিশয় কাতর হয়েছে। (সাবিত্রীর প্রতি) মা, তুমি আমার কাছে এস।

সাবি। দাইবউ, ছেলে এক রেখে এলে বাছা, আমি যাই। (দৌড়ে নবীনের নিকট উপবেশন)

রেবতী। (সাবিত্রীর প্রতি) হ্যাঁগা মা, তুমি যে বল্যে থাক, ছোট বউর মত বউ গাঁয় নেই, ছোটবউরি না খেব্‌য়ে তুমি যে খাও না, তুমি সেই ছোটবউরি খান্‌কি বল্যে গাল দিলে। হ্যাঁগা মা, তুমি মোর কথা শোন্‌চো না—মোরা যে তোমাগার খায়ে মানুষ, কত যে খাতি দিয়েচো।

সাবি। আমার ছেলের আট্‌কৌড়ের দিন আসিস্‌, তোরে জলপান দেব।

খুড়ী। বড়দিদি, নবীন তোমার বেঁচে উটবে, তুমি পাগল হইও না।

সাবি। তুমি জান্‌লে কেমন করে? ও নাম তো আর কেউ জানে না, আমার শ্বশুর বল্যেছিলেন, বউমার ছেলে হোলে "নবীনমাধব" নাম রাখ্‌বো, আমি খোকা পেয়েচি, ঐ নাম রাখ্‌বো। কত্তা বলতেন, কবে খোকা হবে, "নবীনমাধব" বলে ডাক্‌বো। (ক্রন্দন) যদি বেঁচে থাক্‌তেন, আজ সে সাধ পুর্‌তো।

(নেপথ্যে শব্দ)

ঐ বাজ্‌না এয়েছে। (হাততালি)

সৈরি। কবিরাজ আসিতেছেন, ছোট বউ, উঠে ওঘরে যাও।

[কবিবাজ ও সাধুচরণের প্রবেশ]

[সরলতা, রেবতী এবং প্রতিবাসিনীদের প্রস্থান]

(সৈরিন্ধ্রী অবগুণ্ঠনাবৃতা হইয়া একপার্শ্বে দণ্ডায়মান)

সাধু। এই যে মাঠাকুরূণ উঠে বসিয়াছেন।

সাবি। (রোদন করিয়া) আমার কত্তা নেই বল্যে কি তোমরা আমার এমন দিনে ঢোল্‌-বাড়ী রেখে এলে?

আদুরী। ওনার ঘটে কি আর জ্ঞেন আছে, উনি অ্যাকেবারে পাগল হয়েচেন। উনি ঐ বড় হালদারের বল্‌চেন "মোর কচি ছেলে" আর ছোট হালদারনিরি বিবি বল্যে কত গালাগালি দেলেন, ছোট হালদার্নি খেঁদে ককাতি নেগেলো। তোমাদের বল্‌চেন বাজন্দেরে।

সাধু। এমন দুর্ঘটনা ঘটিয়েছে।

কবি (নবীনের নিকট উপবিষ্ট হইয়া) একে পতিশোকে উপবাসী, তাহাতে নয়নানন্দ নন্দনের ঈদৃশী দশা—সহসা এরূপ উন্মত্তা হওয়া সম্ভব এবং নিদানসঙ্গত। নাড়ীর গতিকটা দেখা আবশ্যক, কর্ত্রী ঠাকুরূণ, হস্ত দেন। (হাত বাড়াইয়া)

সাবি। তুই আঁটকুড়ীর বেটা কুটির নোক্‌, তা নইলে ভাল মানুষের মেয়ের হাত ধত্তে চাচ্চিস্‌ কেন? (গাত্রোত্থান করিয়া) দাইবউ, ছেলে দেখিস্‌ মা, আমি জল খেয়ে আসি, তোরে একখান চেলির শাড়ী দেব। [প্রস্থান]

কবি। আহা! জ্ঞানপ্রদীপ আর প্রজ্বলিত হইবে না, আমি হিমসাগর তৈল প্রেরণ করিব, তাহাই সেবন করা এক্ষণকার বিধি। (নবীনের হস্ত ধরিয়া) ক্ষীণতাধিক্যামাত্র, অপর কোন বৈলক্ষণ্য দেখিতেছি না। ডাক্তার ভায়ারাও অন্য বিষয়ে গোবৈদ্য বটেন, কিন্তু কাটাকুটির বিষয়ে ভাল ; ব্যয় বাহুল্য, কিন্তু একজন ডাক্তার আনা কর্তব্য—

সাধু। ছোট বাবুকে ডাক্তারের সহিত আসিতে লেখা হইয়াছে।

কবি। ভালই হইয়াছে।

[চারজন জ্ঞাতির প্রবেশ]

প্রথম। এমন ঘটনা হইবে, তাহা আমরা স্বপ্নেও জানি না। দুই প্রহরের সময়, কেহ আহার করিতেছে, কেহ স্নান করিতেছে, কেহ বা আহার করিয়া শয়ন করিতেছে। আমি এখন শুনিতে পাইলাম।

দ্বিতীয়। আহা! মস্তকের আঘাতটি সাংঘাতিক বোধ হইতেছে, কি দুর্দৈব। অদ্য বিবাদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, নচেৎ রাইয়তেরা সকলেই উপস্থিত থাকিত।

সাধু। দুইশত রাইয়তে লাঠি হস্তে করিয়া মার ২ করিতেছে, এবং "হা বড়বাবু! হা বড়বাবু!" বলিয়া রোদন করিতেছে। আমি তাহারদিগের স্ব ২ গৃহে যাইতে কহিলাম ; যেহেতু একটু পন্থা পাইলেই, সাহেব নাকের জ্বালায় গ্রাম জ্বালাইয়া দিবে।

কবি। মস্তকটা ধৌত করিয়া আপাততঃ তার্পিন তৈল লেপন কর ; পশ্চাৎ সন্ধ্যাকালে আসিয়া অন্য ব্যবস্থা করিয়া যাইব। রোগীর গৃহে গোল করা ব্যাধ্যাধিক্যের মূল—কোনরূপ কথাবার্তা এখানে না হয়।

[কবিরাজ, সাধুচরণ এবং জ্ঞাতিগণের এক দিকে এবং আদুরীর অন্য দিকে প্রস্থান, সৈরিন্ধ্রীর উপবেশন। যবনিকা পতন।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

সাধুচরণের ঘর

(ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি, এক দিকে সাধুচরণ, অপরদিকে রেবতী উপবিষ্ট)

ক্ষেত্র। বিছেনা ঝেড়ে পাত, ও মা, বিছেনা ঝেড়ে দে।

রেবতী। যাদু মোর, সোনার চাঁদ মোর, ওমন ধারা কেন কচ্চো মা? বিছানা ঝেড়ো দিইচি মা, বিছানায় তো কিছু নেই রে মা, মোদের ক্যাঁতার ওপরে, তোমার কাকিমারা যে নেপ দিয়েচে, তাই তো পেড়ে দিয়েচি মা।

ক্ষেত্র। স্যাঁকুলির কাঁটা ফোট্‌চে, মরি গ্যালাম, মা রে মলামরে বাবার দিগি ফির্‌য়ে দে।

সাধু। (আস্তে আস্তে ক্ষেত্রমণিকে ফিরায়ে, স্বগত) শয্যাকন্টকি মরণের পূর্বলক্ষণ। (প্রকাশ্যে) জননী আমার দরিদ্রের রতনমণি, মা, কিছু খাও না মা, আমি যে ইন্দ্রাবাদ হইতে তোমার জন্যে বেদানা কিনে এনেচি মা, তোমার যে চুনুরি শাড়ীতে বড় সাধ মা, তাও তো আমি কিনে এনেচি মা, কাপড় দেখে তুমি আহ্লাদ করিলে না মা।

রেবতী। মার মোর কত সাধ, বলে সোমোন্‌তোনের সমে মোরে সাঁক্‌তির মালা দিতে হবে— আহা হা! মার মোর কি রূপ কি হয়েছে, কর্‌বো কি, বাপোরে বাপোঃ'। (ক্ষেত্রমণির মুখের উপর মুখ দিয়া অবস্থিতি) সোনার ক্ষেত্র মোর কয়লাপানা হয়ে গিয়েচে, দেখ, দেখ, মার চকির মণি কনে গ্যাল।

সাধু। ক্ষেত্রমণি, ক্ষেত্রমণি ভাল করে চেয়্যে দেখ্ না মা।

ক্ষেত্র। খোন্তা, কুড়ুল, মা! বাবা! আ! (পার্শ্বপরিবর্তন)

রেবতী। মুই কোলে তুলে নেই, মার বাছা মার কোলে ভাল থাক্‌বে।

[অঙ্কে উত্তোলন করিতে উদ্যত]

সাধু। কোলে তুলিস্‌নে, টাল্ যাবে।

রেবতী। এমন পোড়া কপাল করেলাম, আহা হা! হারান যে মোর মউর-চড়া কাত্তিক, মুই হারানের রূপ ভোল্‌বো ক্যামন করে, বাপো! বাপো! বাপো!

সাধু। রেয়ে ছোঁড়া কখন গিয়েছে, এখনও এল না।

রেবতী। বড়বাবু মোরে বাগের মুখথে ফিরে এনে দিয়েলো। আঁটকুড়ির বেটা এমন কিলও মেরিলি, বাছার পেট খসে গেল, তার পর বাছারে নিয়ে টানাটানি। আহা! হা! দৌউ ত্র হয়েলো, রক্তোর দলা, তবু সব গড়ন দেখা দিয়েলো, আঙ্গুলগুলো পর্যন্ত হয়েলো। ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্ররে খালে, বড় সাহেব বড়াবাবুরি খালে। আহা হা! কাঙ্গালের কেউ রক্কে করে না।

সাধু। এমন কি পুণ্য করিছি যে, দৌহিত্রের মুখ দর্শন করিব।

ক্ষেত্র। গা কেটে গেল—মাজা—ট্যাংরা মাচ্‌ হু—হু—হু—

রেবতী। নমীর আৎ বুঝি পোয়ালো, মোর সোনার পিত্তিমে জলে যায়, মোর উপায় হবে কি। মোরে মা বল্যে ডাক্‌বে কেডা, ই কত্তি নিয়ে এইলে? (সাধুর গলা ধরিয়া ক্রন্দন)

সাধু। চুপ্‌ কর্‌, এখন কাঁদিসনে, টাল্‌ যাবে।

[রাইচরণ এবং কবিরাজের প্রবেশ]

কবি। এক্ষণকার উপসর্গ কি? সে ঔষধ খাওয়ান হইয়াছিল?

সাধু। ঔষধ উদরস্থ হয় নাই—যাহা কিছু পেটের মধ্যে গিয়াছিল, তাহাও তৎক্ষণাৎ বমন হইয়া গিয়াছে—এখন একবার হাতটা দেখুন দিকি, বোধ হইতেছে, চরমকালের পূর্বলক্ষণ।

রেবতী। কাঁটা কাঁটা কত্তি নেগেচে, এত পুরু কর্যে বিছানা কর্যে দেলাম তবু মা মোর ছট্‌ফট্‌ কচ্চেন—আর একটু ভাল ওষুধ দিয়ে পরাণ দান দিয়ে যাও—মোর সাধের কুটুম্ব গো। (রোদন)

সাধু। নাড়ী পাওয়া যায় না।

কবি। (হস্ত ধরিয়া) এ অবস্থায় নাড়ী ক্ষীণ থাকা মঙ্গল লক্ষণ—"ক্ষীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণঘাতিকা।"

সাধু। ঔষধ এ সময় খাওয়ান না খাওয়ান সমান, পিতা-মাতার শেষ পর্যন্ত আশ্বাস, দেখুন যদি কোন পন্থা থাকে।

কবি। আতপ তণ্ডুলের জল আবশ্যক, পূর্ণমাত্রা সুচিকাভরণ সেবন করাই এক্ষণকার বিধি।

সাধু। রাইচরণ, ও ঘরে স্বস্ত্যয়নের জন্য বড় রাণী যে আতপ চাল দিয়াছেন, তাহাই লইয়া আয়।

[রাইচরণের প্রস্থান]

রেবতী। আহা! অন্নপুন্নো কি চেতন আছেন, তা আপ্‌নি আলোচাল হাতে কর্যে মোর ক্ষেত্রমণির দেক্‌তি আস্‌বেন, মোর কপাল হতিই মাঠাকুরূণ পাগল হয়েচেন।

কবি। একে পতিশোকে ব্যাকুলা, তাহাতে পুত্র মৃতবৎ ক্ষিপ্ততার ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে, বোধ হয়, কর্ত্রী ঠাকুরুণের নবীনের অগ্রে পরলোক হইবে, অতিশয় ক্ষীণা হইয়াছেন।

সাধু। বড়বাবুকে অদ্য কিরূপ দেখিলেন? আমার বোধ হয়, নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্বাপিত করিলেন। কমিসনে প্রজার উপকার সম্ভব বটে, কিন্তু তাহাতে ফল কি? চৈতন বিলের একশত কেউটে সর্প আমার অঙ্গাময় একেবারে দংশন করে, তাহাও আমি সহ্য করতে পারি ; ইটের গাঁথনি উনানে সুঁদ্‌রি কাষ্ঠের জ্বালে প্রকাণ্ড কড়ায় টগবগ্ করিয়া ফুটিতেছে যে গুড়, তাহাতে অকস্মাৎ নিমগ্ন হইয়া খাবি খাওয়াও সহ্য করিতে পারি, অমাবস্যার রাত্রিতে হারে রে হৈ হৈ শব্দে নির্দয় দুষ্ট ডাকাইতেরা সুশীল, সুবিদ্ধান্ একমাত্র পুত্রকে বধ করিয়া সম্মুখে পরমাসুন্দরী পতিপ্রাণা দশমাসগর্ভবতী সহধর্মিণীর উদরে পদাঘাত দ্বারা গর্ভপাতন করিয়া সুপ্তপুরুষার্জিত ধনসম্পত্তি অপহরণপূর্বক আমার চক্ষু তলোয়ার-ফরকায় অন্ধ করিয়া দিয়া যায়, তাহাও সহ্য করিতে পারি ; গ্রামের ভিতরে একটা ছাড়িয়া দশটা নীলকুটি স্থাপিত হয়, তাহাও সহ্য করিতে পারি, কিন্তু এক মুহূর্তের নিমিত্তেও প্রজাপালক বড়বাবুর বিরহ সহ্য করিতে পারি না।

কবি। যে আঘাতে মস্তকের মস্তিষ্ক বাহির হইয়াছে, ঐ সাংঘাতিক। সান্নিপাতিকের উপক্রম দেখিয়া আসিয়াছি, দুই প্রহর অথবা সন্ধ্যাকালে প্রাণত্যাগ হইবে। বিপিনের হস্ত দিয়া একটু গঙ্গাজল দেওয়া গেল, তাহা দুই কস বহিয়া পড়িল। নবীনের কায়ন্তিনী পতিশোকে ব্যাকুলা, কিন্তু পতির সদ্‌গতির উপায়াগুরক্তা।

সাধু। আহা! আহা! মাঠাকুরুণ যদি ক্ষিপ্ত না হইতেন, তবে এ অবস্থা দর্শন করিয়া বুক ফেটে মরিতেন। ডাক্তারবাবুও মাথার ঘা সংঘাতিক বলিয়াছেন।

কবি। ডাক্তারবাবুটি অতি দয়াশীল, বিন্দুবাবু টাকা দিতে উদ্যোগী হইলে বলিলেন, “বিন্দুবাবু, তোমরা যে বিব্রত, তোমার পিতার শ্রাদ্ধ-সমাধা হওয়ার সম্ভব নাই, এখন আমি তোমার কাছে কিছু লইতে পারি না, আমি যে বেহারায় আসিয়াছি, সেই বেহরায় যাইব, তাহাদের আপনার কিছু দিতে হবে না।” দুঃশাসন ডাক্তার হল্যে কর্তার শ্রাদ্ধের টাকা লইয়া যাইত। বেটাকে আমি দুইবার দেখিছি, বেটা যেমন দুর্মুখো, তেমনি অর্থপিশাচ।

সাধু। ছোটবাবু ডাক্তারবাবুকে সঙ্গে কর্য়ে ক্ষেত্রমণিকে দেখিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু কোন ব্যবস্থা করিলেন না। আমার নীলকর অত্যাচারে অন্নাভাবে দেখে ক্ষেত্রমণির নাম কর্য়ে ডাক্তার বাবু আমারে দুই টাকা দিয়া গিয়েছেন।

কবি। দুঃশাসন ডাক্তার হল্যে হাত না ধর্য়ে বল্‌তো বাঁচবে না, আর তোমার গোরু বেচে টাকা লইয়া যাইত।

রেবতী। মুই সর্বস্ব বেচে টাকা দিতি পারি, মোর ক্ষেত্রকে যদি কেউ বেঁচ্‌য়ে দেয়।

[চাল লইয়া রাইচরণের প্রবেশ]

কবি। চালগুলিন প্রস্তরের বাটিতে ধৌত করিয়া জল আনয়ন কর।

(রেবতীর তণ্ডুল গ্রহণ)

জল অধিক দিও না—এ বাটিটি তো অতি পরিপাটি দেখিতেছি।

রেবতী। মাঠাকুরুণ গয়ায় গিয়েলেন, অনেক বাটি এনেলেন, মোর ক্ষেত্রকে এই বাটিডে দিয়েলেন। আহা! সেই মাঠাকুরুণ মোর ক্ষেপে উটেচেন, গাল চেপড়ে মরেন বল্যে হাত দুটো দড়ি দিয়ে বেঁধে এখেচে।

কবি। সাধু, খল আনয়ন কর, আমি ঔষধ বাহির করি।

(ঔষধের ডিপা খুলন)

সাধু। কবিরাজ মহাশয়, আর ঔষধ বাহির করিতে হইবে না, চক্ষের ভাব দেখুন দিকি ; রাইচরণ, এদিকে আয়।

রেবতী। ও মা, মোর কপালে কী হলো। ও মা, মুই হারানের রূপ ভোল্‌বো কেমন কর্য়ে, বাপো, বাপো, ও ক্ষেত্র, ও ক্ষেত্র , ক্ষেত্রমণি, মা—আর কি কথা কবা না, মা মোর, বাপো, বাপো, বাপো! [ক্রন্দন]

কবি। চরমকাল উপস্থিত।

সাধু। রাইচরণ, ধর্‌ ধর্‌।

[সাধুচরণ ও রাইচরণ দ্বারা শয্যাসহিত ক্ষেত্রকে বহিরে লইয়া যাওন]

রেবতী। মুই সোনার নক্কি ভেস্‌য়ে দিতি পার্‌বো না মা রে, মুই কনে যাব রে—সাহেবের সঙ্গি থাকা সে মোর ছিল ভাল মা রে, মুই মুখ দেখে জুড়োতাম মা রে, হো, হো, হো।

[পাছা চাপড়াইতে ২ ক্ষেত্রমণির পশ্চাৎ ধাবন]

কবি। মরি, মরি, মরি, জননীর কি পরিতাপ—সন্তান না হওয়াই ভাল। [প্রস্থান]

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

গোলোক বসুর বাটীর দরদালান

(নবীনমাধবের মৃত শরীর ক্রোড়ে করিয়া সাবিত্রী আসীনা)

সাবি। আয় রে আমার জাদুমণির ঘুম আয়—গোপাল আমার বুক জুড়ানে ধন, সোনার চাঁদের মুখ দেখ্‌লে আমার সেই মুখ মনে পড়ে। (মুখচুম্বন) বাছা আমার ঘুমায়ে কাদা হয়েচে। (মস্তকে হস্তামর্ষণ) আহা মরি, মরি, মশায় কাম্‌ড়ে করেচে কি?—গর্‌মি হয় বল্যে কি কর্‌বো, আর মশারি না খাট্‌য়ে শোব না। (বক্ষঃস্থলে হস্তামর্ষণ) মরে যাই, মার প্রাণে কি সয়, ছারপোকায় এমনি কামড়েচে, বাছার কচি গা দিয়ে রক্ত ফুটে বেরুচ্চে। বাছার বিছানাটা কেউ করে দেয় না ; গোপালেরে শোয়াই কেমন কর্য়ে? আমার কি আর কেউ আছে, কর্তার সঙ্গে সব গিয়েছে। (রোদন) ছেলে কোলে কর্য়ে কাঁদিতেছি, হা পোড়াকপালি। (নবীনের মুখাবলোকন কর্য়ে) দুঃখিনীর ধন আমার দেয়ালা করিতেছে। (মুখ-চুম্বন করিয়া) না বাবা, তোমারে দেখ্যে আমি সব দুঃখ ভুলে গিয়েচি, আমি কাঁদিতেছি না, (মুখে স্তন দিয়া) মাই খাও, গোপাল আমার, মাই খাও—গস্তানি বিটির পায় ধর্‌লাম, তবু কত্তারে একবার এনে দিলে

না। গোপালের দুদ যোগান কর্যে দিয়ে আবার যেতেন ; বিটির সঙ্গে যে ভাব, চিটি লিখ্লিই যমরাজা ছেড়ে দিত। (আপনার হস্তের রজ্জু দেখিয়া) বিধবা হয়্যে হাতে গহনা রাখিলে পতির গতি হয় না—চীৎকার কর্যে কাঁদিতে লাগ্লাম, তবু আমারে শাকা পব্য়্যে দিলে—প্রদীপে পড়ুয়্যে ফেলিচি, তবু আছে। (দন্ত দ্বারা হস্তের রজ্জু ছেদন) বিধবা হয়্যে গহনা পরা সাজেও না, সয়ও না, হাতে ফেস্কা হয়েচে। (রোদন) আমার শাকা পরা যে ঘুচুয়েচে, তার হাতের শাকা যেন তেরাত্রের মধ্যে নাবে ; (মাটিতে অঙ্গুলি মট্কায়ন) আপনিই বিছানা করি। (মনে ২ শয্যাপাতন) মাজুরটো কাচা হয় নাই। (হস্ত বাড়াইয়া) বালিশ্টে নাগাল পাইনে—কাঁতাখানা ময়লা হয়েচে, (হস্ত দিয়া ঘরের মেজে ঝাড়ন) বাবারে শোয়াই। (আস্তে আস্তে নবীনের মৃত শরীর ভূমিতে রাখিয়া) মার কাছে তোমার ভয় কি বাবা, সচ্চন্দে শুয়ে থাক, থুথকুড়ি দিয়ে যাই। (বুকে থুথু দেওন) বিবি বিটি আজ যদি আসে, আমি তার গলা টিপে মেরে ফেল্বো—বাছারে চোকছাড়া কর্বো না, আমি গণ্ডি দিয়ে যাই। (অঙ্গুলি দ্বারা নবীনের মৃত শরীর বেড়ে ঘরের মেঝের দাগ দিতে ২ মন্ত্রপঠন) ঃ

সাপের ফেণা বাঘের নাক।
ধুনোর আগুন চরোক্ পাক।।
সাত সতীনের সাদা চুল।
ভাঁটির পাতা ধুত্রো ফুল।।
নীলের বিচি মরিচ পোড়া।
মড়ার মাথা মাদার গোড়া।।
হন্নে কুকুর চোরের চণ্ডী।
যমের দাঁতে এই গণ্ডি।।

[সরলতার প্রবেশ]

সর। এঁরা সব কোথায় গেলেন—আহা! মৃত শরীর বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছেন—বোধ করি, প্রাণকান্ড পথশ্রান্তে নিতান্ত ক্লান্তিবশতঃ ভূমিতে পতিত হইয়া শোকদুঃখবিনাশিনী নিদ্রা-দেবীর শরণাপন্ন হইয়াছেন। নিদ্রে। তোমার কি লোকাতীত মহিমা! তুমি বিধবা সধবা কর, বিদেশীকে দেশে আন, তোমার স্পর্শে কারাবাসীদের শৃঙ্খল ছেদ হয়, তুমি রোগীর ধন্বন্তরি, তোমার রাজ্যে বর্ণভেদে ভিন্নতা নাই, তোমার রাজনিয়ম জাতিভেদে ভিন্ন হয় না ; তুমি আমার প্রাণকান্তকে তোমার নিরপেক্ষ রাজ্যের প্রজা করিয়াছ, নচেৎ তাঁহার নিকট হইতে পাগলিনী জননী মৃতপুত্রকে কিরূপে আনিলেন? জীবিতনাথ পিতা-ভ্রাতা-বিরহে নিতান্ত অধীর হইয়াছেন। পূর্ণিমার শশধর যেমন কৃষ্ণপক্ষে ক্রমে ২ হ্রাসপ্রাপ্ত হয়, জীবিতনাথের মুখলাবণ্য সেইরূপ দিন দিন মলিন হইয়া একেবারে দূর হইয়াছে। মা গো, তুমি কখন্ উঠিয়া আসিয়াছ? আমি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সতত তোমার সেবায় রত আছি, আমি কি এত অচৈতন্য হয়্যে পড়েছিলাম? তোমাকে সুস্থ করিবার জন্যে আমি তোমার পতিকে যমরাজার বাড়ী হইতে আনিয়া দিব স্বীকার করিয়াছি, তুমি কিঞ্চিৎ স্থির রহিয়াছিলে। এই ঘোর রজনী, সৃষ্টিসংহারে প্রবৃত্ত প্রলয়কালের

ভীষণ অন্ধতামসে অবনী আবৃত ; আকাশমণ্ডল ঘনতর ঘনঘটায় আচ্ছন্ন ; বহ্নিবাণের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণপ্রভা প্রকাশিত ; প্রাণিমাত্রেই কালনিদ্রানুরূপ নিদ্রায় অতিভূত ; সকলি নীরব ; শব্দের মধ্যে অরণ্যাভ্যন্তরে অন্ধকারাকুল শৃগালকুলের কোলাহল এবং তস্করনিকরের অমঙ্গলকর কুক্কুরগণের ভীষণ শব্দ ; এমত ভয়াবহ নিশীথ-সময়ে জননি, তুমি কীরূপে একাকিনী বহির্দ্বারে গমন করিয়া মৃত পুত্রকে আনয়ন করিলে?

[মৃত শরীরের নিকট গমন]

সাবি। আমি গণ্ডি দিইচি, গণ্ডির ভেতর এলি।

সর। আহা! এমত দেশবিজয়ী জীবনাধিক সহোদর-বিচ্ছেদে প্রাণনাথের প্রাণ থাকবে না। (ক্রন্দন)

সাবি। তুই আমার ছেলে দেখে হিংসে কচ্চিস, ও সর্বনাশি, রাঁড়ি আঁটকুড়ীর মেয়ে, তোর ভাতার মরে—বার্ হ, এখান থেকে বার্ হ, নইলে এখনি তোর গলায় পা দিয়ে জিব টেনে বার্ কর্‌বো।

সর আহা। আমার শ্বশুর-শাশুড়ীর এমন সুবর্ণষড়ানন জলের মধ্যে গেল!

সাবি। তুই আমার ছেলের দিকে চাস্ নে, তোরে বারণ কচ্চি—ভাতারখাগি। তোর মরণ ঘুন্‌য়্যে এয়েচে দেখচি।

[কিঞ্চিৎ অগ্রে গমন]

সর। আহা! কৃতান্তের করাল কর কি নিষ্ঠুর। আমার সরল শাশুড়ীর মনে তুমি এমন দুঃখ দিলে, হা যম!

সাবি। আবার ডাক্‌চিস্, আবার ডাক্‌চিস (দুই হস্তে সরলতার গলা টিপে ধরিয়া ভুমিতে ফেলিয়া) পাজি বিটি, যমসোহাগি, এই তোরে মেলে ফেলি। (গলায় পা দিয়ে দণ্ডায়মান) আমার কত্তারে খেয়েচ, আবার দুদের বাছাকে খাবার জন্যে তোমার উপপতিকে ডাক্‌চো—মর্ মর্ মর্ মর্। (গলার উপর নৃত্য।)

সর। গ্যা—অ্যা, অ্যা, অ্যা। (সরলতার মৃত্যু)

[বিন্দুমাধবের প্রবেশ]

বিন্দু। এই যে এখানে পরিয়া রহিয়াছেন—ও মা, ও কি! আমার সরলতাকে মেরে ফেলিলে জননি! (সরলতার মস্তক হস্তে লইয়া) আমার প্রাণের সরলা যে এ পাপ-পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছেন।

[রোদনানন্তর মুখচুম্বন]

সাবি। কাম্‌ড়ে মেরে ফেল্ নচ্ছার বিটিকে—আমার কচি ছেলে খাবার জন্যে যমকে ডাক্‌ছেল, আমি তাই গলায় পা দিয়ে মেরে ফেলিচি।

বিন্দু। হে মাতঃ, জননী যেমন যামিনীযোগে অঙ্গাচালনা দ্বারা স্তনপানাসক্ত বক্ষঃস্থলস্থ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে বধ করিয়া নিদ্রাভঙ্গে বিলাপে অধীরা হইয়া আত্মঘাত বিধান করে, আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখবিস্মারিকা ক্ষিপ্ততার অপগম হয়, তবে আপনিও আপনার জীবনাধিক সরলতা বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন। মা, তোমার জ্ঞানদীপের কি আর উন্মেষ হইবে না? আপনার জ্ঞানসঞ্চার

আর না হওয়াই ভাল। আহা মৃতপতিপুত্রা নারীর ক্ষিপ্রতা কি সুখপ্রদ। মনোমৃগ ক্ষিপ্ততা-প্রস্তর-প্রাচীরে বেষ্টিত, শোক-শার্দুল আক্রমণ করিতে অক্ষম। মা, আমি তোমার বিন্দুমাধব।

সাবি। কি, কি বলো?

বিন্দু। মা, আমি যে আর জীবন রাখিতে পারিনে—জননি, পিতার উদ্বন্ধনে এবং সহোদরের মৃত্যুতে আপনি পাগল হইয়া আমার সরলতাকে বধ করিয়া আমার ক্ষত হৃদয়ে লবণ প্রদান করিলেন।

সাবি। কি? নবীন আমার নেই, নবীন আমার নেই?—মরি মরি বাবা আমার! সোনার বিন্দুমাধব আমার, আমি তোমার সরলতাকে বধ করিয়াছি—ছোট বউমাকে আমি পাগল হয়্যে মেরে ফেলিচি। (সরলতার মৃত শরীর সঙ্গে ধারণ করিয়া আলিঙ্গান) আহা! হা! আমি পতিপুত্রবিহীন হয়্যেও জীবিত থাকিতে পারিতাম, কিন্তু তোমাকে স্বহস্তে বধ কর্যে আমার বুক ফেটে গেল—হো, ও, মা। (সরলতাকে আলিঙ্গনপূর্বক ভুতলে পতনানন্তর মৃত্যু)।

বিন্দু। (সাবিত্রীর গাত্রে হস্ত দিয়া) যাহা বলিলাম, তাহাই ঘটিল। মাতার প্রাণসঞ্চারে প্রাণনাশ হইল। কি বিড়ম্বনা! জননী আর ক্রোড়ে লয়্যে মুখচুম্বন করিবেন না! মা, আমার মা বলা কি শেষ হইল! (রোদন) জন্মের মত জননীর চরণধুলি মস্তকে দি! (চরণের ধুলি মস্তকে দেওন) জন্মের মত জননীর চরণরেণু ভোজন করিয়া মানবদেহ পবিত্র করি। (চরণের ধুলি-ভক্ষণ)

[সৈরিন্ধ্রীর প্রবেশ]

সৈরি। ঠাকুরপো, আমি সহমরণে যাই, আমারে বাধা দিও না। সরলতার কাছে বিপিন আমার পরমসুখে থাকবে—এ কি! এ কি' শাশুড়ীবয়ে এরূপ পড়ে কেন!

বিন্দু। বড় বউ, মাতাঠাকুরাণী সরলতাকে বধ করিয়াছেন, তৎপরে সহসা প্রাণঞ্চার হওয়াতে, আপনিও সাতিশয় শোকসন্তপ্তা হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।

সৈরি। এখন? কেমন কর্যে? কি সর্বনাশ! কি হলো! কি হলো! আহা! আহা! ও দিদি, আমার যে বড় সাধের চুলের দড়ি, তুমি যে যে আজো খোঁপায় দেউ নি। আহা! আহা! আর তুমি দিদি বলে ডাকবে না! (রোদন) ঠাকুরূণ, তোমার রামের কাছে তুমি গেলে, আমার যেতে দিলে না। ও মা, তোমায় পেয়ে আমি মায়ের কথা যে একদিনও মনে করিনি।

[আদুরীর প্রবেশ]

আদু। বিপিন ডর্য়্যো উটেছে, বড়হালদার্নি, তুমি শীগ্‌গির এস।

সৈরি। তুই সেইখান হতে ডাক্‌তে পারস্‌নি, একা রেখে এয়েচিস।

[আদুরী সহিত বেগে প্রস্থান]

বিন্দু। বিপিন আমার বিপদসাগরে ধ্রুবনক্ষত্র! (দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) বিনশ্বর অবনীম্‌ণ্ডলে মানবলীলা, প্রবলপ্রবাহসমাকুল্য গভীর স্রোতস্বতীর অত্যুচ্চ কুলতুল্য ক্ষণভঙ্গুর। তটের কি অপূর্ব শোভা। লোচনানন্দপ্রদ নবীন দুর্বাদলাবৃত ক্ষেত্র, অভিনব পল্লবসুশোভিত মহীরুপু, কোথাও সন্তোষসঙ্কুলিত ধীবরের পর্ণকুটীর বিরাজমান, কোথাও নবদুর্বাদল-লোলুপা সবৎসা ধেনু আহারে বিমুগ্ধা ; আহা! তথায়

ভ্রমণ করিলে বিহঙ্গমদলের সুললিত ললিত তানে এবং প্রস্ফুটিতবনপ্রসূনসৌরভামোদিত মন্দ ২ গন্ধবহে পূর্ণানন্দ আনন্দময়ের চিন্তায় চিত্ত অবগাহন করে। সহসা ক্ষেত্রোপরি রেখার স্বরূপ চিড়দর্শন, অচিরাৎ শোভাসহ কুল ভগ্ন হইয়া গভীর নীরে নিমগ্ন। কি পরিতাপ। স্বরপুরনিবাসী বসুকূল-নীল-কীর্তিনাশায় বিলুপ্ত হইল—আহা! নীলের কি করাল কর।

নীলকর বিষধর বিষপোড়া মুখ।
অনলশিখায় ফেলে দিল যত সুখ।।
অবিচারে কারাগারে পিতার নিধন।
নীলক্ষেত্রে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হলেন পতন।।
পতিপুত্রশোকে মাতা হয়ে পাগলিনী।
স্বহস্তে করেন বধ সরলা কামিনী।।
আমার বিলাপে মার জ্ঞানের সঞ্চার।
একেবারে উথলিল দুঃখ-পারাবার।।
শোকশূলে মাখা হলো বিষ-বিড়ম্বনা।
তখনি মলেন মাতা কে শোনে সান্ত্বনা।।
কোথা পিতা কোথা পিতা ডাকি আনিবার।
হাস্যমুখে আলিঙ্গন কর একবার।।
জননী জননী বলে চারিদিকে চাই।
আনন্দময়ীর মূর্তি দেখতে না পাই।।
মা বলে ডাকিলে মাথা অমনি আসিয়ে।
বাছা বলে কাছে লন মুখ মুছাইয়ে।।
অপার জননীস্নেহ কে জানে মহিমা।।
রণে বনে ভীতমনে বলি মা, মা, মা, মা।।
সুখাবহ সহোদর জীবনের ভাই।
পৃথিবীতে হেন বন্ধু আর দুটি নাই।।।
নয়ন মেলিয়া দাদা দেখ একবার।
বাড়ী আসিয়াছে বিন্দুমাধব তোমার।।
আহা! আহা! মরি মরি বুক ফেটে যায়।
প্রাণের সরলা মম লুকালো কোথায়।।
রূপবতী গুণবতী পতিপরায়ণা।
মরালগমনা কান্তা কুরঙ্গনয়না।।
সহাস বদনে সতী সুমধুর স্বরে।

বেতাল করিতে পাঠ মম করে ধরে।।
অমৃত পঠনে মন হতো-বিমোহিত।
বিজন বিপিনে বনবিহঙ্গ-সঙ্গীত।।
সরলা সরোজকান্তি কিবা মনোহর।
আলো কর্য়ে ছিল মম দেহসরোবর।।
কে হরিল সরোরুহ হইয়া নির্দয়।
শোভাহীন সরোবর অন্ধকারময়।।
হেরি সব শবময় শ্মশান সংসার।
পিতা মাতা ভ্রাতা দারা মরেছে আমার।।

আহা! এরা সব দাদার মৃতদেহ অন্বেষণ করিতে কোথায় গমন করিল—তাহারা আইলে জাহ্নবীযাত্রার আয়োজন করা যায়—যায় —আহা! পুরুষসিংহ নবীনমাধবের জীবননাটকের শেষ অঙ্ক কি ভয়ঙ্কর!

(সাবিত্রীর চরণ ধরিয়া উপবেশন)

যবনিকা পতন

সমাপ্তমিদং নীলদর্পণং নাম নাটকম্।

৮২.১৯ সারাংশ

বেগুনবেড়ের কুঠিতে গোপীনাথ ও একজন উমেদারের কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, বসু পরিবার যথার্থই সম্ভ্রান্ত, উদার ও পরোপকারী। সাবিত্রী সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণা। দেওয়ান গোপীনাথ নীলকরদের সীমাহীন শোষণ নির্যাতনের অন্যতম সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। গোলোক বসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যুর পর গোপীনাথের কিঞ্চিৎ অনুশোচনা হয়েছে। গোপীনাথ দুঃখ করে বলেছে যে, তার জন্য মিথ্যা মামলায় মানী মানুষটির মর্যাদা নষ্ট হয়েছে। সে তাই উডকে সরকিওয়ালা নিয়ে নবীনমাধবদের পুকুর পাড়ের জমিতে নীল বোনা থেকে নিরস্ত করতে চেয়েছে। উড নবীনমাধবের অশৌচের সুযোগ নিতে আগ্রহী। সে বাধা দিতে এলে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরতে চান। প্রথম গর্ভাঙ্কে নীলকরদের অর্থ লালসা ও নবীনমাধবের ওপর ক্রোধ প্রকাশ পেয়েছে।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে উড-রোগ লেঠেল সরকিওয়ালাদের সঙ্গে নিয়ে বসু বাড়ীর পুকুর পাড়ে নীল বুনতে এলে নবীন ৫০ টাকা নজরানা দিয়ে তাদের অনুরোধ করে এ বছর এ জমিতে নীল বোনা স্থগিত রাখতে, অন্যথায়, অন্ততঃ শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্যন্ত ‘বূনন’ রহিত রাখতে। উত্তরে উড অসঙ্গত মন্তব্য করলে, নবীন ক্ষণকালের জন্য স্তব্ধ হয়ে যান। পরে তার বুকে পদাঘাত করেন। উড সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নবীনের মাথায় লাঠি দিয়ে সজোরে আঘাত করে ফাটিয়ে দেয়। সে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। অদূরে প্রতীক্ষমান তোরাপ বড় সাহেব উডের নাক কামড়ে নেয়। ওদিকে দু'শত রায়ত লাঠি হাতে বড়বাবুর প্রতি অন্যায় আচরণের জন্য প্রতিহিংসার প্রতিশোধ নেবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে। সাবিত্রী, সৈরিন্ধ্রী

ও সরলতা নবীনমাধবের অবস্থা দেখে হাহাকার করে ওঠে। আদুরী শোকে অভিভূত হয়ে কেঁদে ওঠে। স্বামীর অপমৃত্যু এবং অচিরেই পুত্রের এই রক্তাক্ত অচৈতন্য অবস্থা দেখে সাবিত্রী অকস্মাৎ উন্মাদিনী হয়ে গেলেন।

সাধুচরণের বাড়ীতে রোগের অত্যাচারে ক্ষেত্রমণির গর্ভপাত হয়। দীর্ঘ অসুস্থতার জন্য শয্যাশ্রয়ী ক্ষেত্রমণির শয্যাকণ্টকি দেখা দেয়। রেবতী কন্যার কষ্ট সহ্য করতে পারে না—দিনরাত কাঁদে। কন্যা আর জামাতাকে হারাবার আশঙ্কায় বিচলিত হয়। ওদিকে কবিরাজ জানান কর্তৃঠাকুরূণ সম্ভবতঃ নবীনমাধবের আগেই পরলোক গমন করবেন। সাধুচরণের ধারণা নবীনমাধবের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নীলকরদের অত্যাচারের অবসান ঘটবে। ক্ষেত্রমণিরও চরমকাল দেখা দিল। সাধু ও রাইচরণ তাকে ধরাধরি করে বাইরে নিয়ে যায়।

নবীনমাধবের মৃতদেহ উন্মাদিনী সাবিত্রী আগলে রাখেন। তিনি মন্ত্র পাঠ করে দেহের চতুর্দিকে গণ্ডী তৈরী করেন। ছোট বৌ সরলতা ভাসুরের মৃতদেহ ও শাশুড়ীর উন্মত্ততা দেখে কাঁদতে লাগলেন। সাবিত্রী সরলতাকে সর্বনাশিনী মনে করে তার গলায় পা দিয়ে হত্যা করেন। বিন্দুমাধবের উপস্থিতি ও ডাকে সাবিত্রীর চেতনা ফিরল। তিনি নবীনের মৃত্যু ও তাঁর কৃতকার্যের জন্য অনুশোচনায় প্রাণ ত্যাগ করেন। সৈরিন্ধ্রী এসব দৃশ্য দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তথাপি পুত্র বিপিনের কথা স্মরণ করে তাকে বাঁচতেই হয়। বিন্দুমাধব ও সৈরিন্ধ্রী বিপিনের জীবনের আশার প্রদীপটি ধ্রুবতারার মত উজ্জ্বল করে রাখে।

(পঞ্চমাঙ্কে তিনটি মৃত্যুর বর্ণনা আছে। একমাত্র নবীন মাধবের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকটি শেষ হলে শিল্পসম্মত হত। নাটকীয় বিষয়বস্তু ও তার গতিপ্রবাহ নবীনমাধবকে কেন্দ্র করে চতুর্থ অঙ্কে চরমোৎকর্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই পঞ্চমাঙ্কের সূচনাতেই নাটকীয় গতিবেগের অবরোহ প্রত্যাশিত ছিল। পাশ্চাত্য আলংকারিকদের ভাষায় এখানেই ঘটেছে Denovement, সাহিত্য দর্পনের মতে উপসংহৃতি বা নির্বহন।)

৮২.২০ প্রাসঙ্গিক আলোচনা

ঠকমারা—ছলাকলায় পারদর্শী ; ভেমো—নির্বোধ ; মদৎ আন্তে পারবে—সহানুভূতি আকর্ষণ করতে পারবে। ডেক-রিয়া—জ্বালাতন করা, মোনাসেফ—মনঃপূত। ডেডলি কমিশন—নীলকরদের অত্যাচারের স্বরূপ পর্যালোচনার জন্য স্যার জন গ্রান্ট কমিশন নিযুক্ত করেন। নীলকরেরা একেই 'ডেডলি' (Deadly) বা ভয়ঙ্কর কমিশন বলেছে।

বেনার বোঝার ন্যায়—উলুখড় বা বিন্না ঘাসের বোঝার মত।

ডাকাতি মাদ্দা—ডাকাতির মোকর্দমা

সেঁজোতির ব্রত—কুমারীগণ মনোমত স্বামীলাভের জন্য সন্ধ্যায় দ্বীপ জ্বালিয়ে এই ব্রত পালন করে।

সেঁজোতি < সন্ধ্যাবর্তিকা। কার্তিক মাসের সংক্রান্তি থেকে অগ্রহায়ণ মাসের সংক্রান্তি পর্যন্ত এই ব্রত পালন করা হয়। চার বছ্র পর এই ব্রত উদযাপন করা হয়।

গস্তানি বিটি—ভ্রষ্টা। সাবিত্রী উন্মাদগ্রস্ত হয়ে সরলতা সম্পর্কে; এই মন্তব্য করেছেন।

৮২.২১ অনুশীলনী - ২

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন। পরে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।
   (ক) "টাকা ঘোড়া, লাঠিয়াল, সুড়কিওয়ালা আমার অনেক আছে।"—বক্তা ঃ (উড সাহেব/ রোগ সাহেব / নবীনমাধব)।
   (খ) "গোড়ার পা য্যান বলদে গোরুর খুর।"—বক্তা ঃ তোরাপ / প্রথম রায়ত / গোপীনাথ)।
   (গ) 'ঝরকা' অর্থ ঃ (ঝরণা / জানালা / ঝড়)।
   (ঘ) গারনীল অর্থ ঃ (জনৈক নীলকর / গর্ভার / মালী)।
২। "বেটা যেন পাদরি হয়ে বসেছে।" কে কার সম্বন্ধে এ কথা বলেছেন? মূল প্রসঙ্গটি কী?
৩। "মোরে বড়্ডি ভাল বাস্‌তো।"—বক্তা কে? কাকে বলেছে? কার সম্পর্কে বলেছে?
৪। "দাদন গাদনিই তো হয় না, চসা চাই।"—বক্তা কে? কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? বক্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।
৫। দীনবন্ধু মিত্রের 'সর্বব্যাপিনী সহানুভূতির' দুটি উদাহরণ দিন।
৬। দীনবন্ধু মিত্র দু'ধরনের নাট্য সংলাপ ব্যবহার করেছেন। নবীনমাধব ও তোরাপের দুটি করে সংলাপের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে বুঝিয়ে দিন।

৮২.২২ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১, ২)

অনুশীলনী — ১

১। (ক) আন্দোলনের, বিপ্লবাত্মক।
   (খ) কালাচাঁদ মিত্র, গন্ধর্ব নারায়ণ।
   (গ) সংবাদ প্রভাকরে।
   (ঘ) লুসাই যুদ্ধের, ডাক ব্যবস্থা, কাছার।
২। (ক) সংকেত নিষ্প্রয়োজন। ২.৪ অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর করুন।

অনুশীলনী—২

১। (ক) উড, (খ) প্রথমরায়ত, (গ) জানালা (ঘুলঘুলি), (ঘ) গভর্ণর.
২। গোপী, নবীনমাধব সম্পর্কে বলেছে। কথাটি হোল, 'গোরিব প্রজাগণের রক্ষাতে দীক্ষিত হইয়াছি,

নিষ্ঠুর নীলকরের পীড়ন হইতে যদি একজন প্রজাকেও রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলেই আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিব। (১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)।

৩। বক্তা আদুরী, সরলতাকে বলেছে। বলেছে তার স্বামী সম্পর্কে। (১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক)

৪। বক্তা তোরাপ। তৃতীয় অঙ্কের, তৃতীয় গর্ভাঙ্কে রোগ সাহেবের কামরায় পদী ময়রাণী ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে গেলে সে তার শ্লীলতাহানি করতে উদ্যত হয়। ক্ষেত্র নানাভাবে তার প্রতিরোধ করে। এমনি সময় নবীনমাধব ও তোরাপ জানলার খড়খড়ি ভেঙ্গে রোগের কামরায় প্রবেশ করে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। তোরাপ মারমুখী হয়ে উঠলে—নবীন রোগ সাহেবের প্রতি নির্দয় ব্যবহার করতে নিষেধ করেন। ফলে তোরাপ আলোচ্য মন্তব্য করে ছোট সাহেবকে চিৎ করে ফেলে চলে যায়।

৫/৬ নির্দেশ নিষ্প্রয়োজন। মূল নাটক থেকে উপযুক্ত দৃষ্টান্ত আহরণ করুন।

৮২.২৩ গ্রন্থপঞ্জি

১। নীলদর্পণ ঃ দীনবন্ধু মিত্র রচনাবলী। সংসদ সংস্করণ।

২। নীলদর্পণ ঃ দীনবন্ধু মিত্রের রচনাবলী। বসুমতী সংস্করণ।

৩। নীলদর্পণ ঃ দীনবন্ধু মিত্র রচনাবলী। সাক্ষরতা প্রকাশন।

এছাড়াও 'নীলদর্পণ' নাটকের যে কোন সম্পাদিত গ্রন্থ।

একক ৮৩ ❑ নীল-দর্পণ ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ

গঠন

৮৩.১ উদ্দেশ্য

৮৩.২ প্রস্তাবনা

৮৩.৩ নীল-দর্পণ ঃ দেশ, কাল ও নাটক রচনা

৮৩.৪ সারাংশ

৮৩.৫ নীল-দর্পণ নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৮৩.৬ নীল-দর্পণ নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ ও আলোচনা

৮৩.৭ সারাংশ

৮৩.৮ নাটকের রস বিচার ঃ রস পরিণতি-ট্র্যাজেডি-মেলোড্রামা

৮৩.৯ নীল-দর্পণ নাটকের সংলাপ ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ

৮৩.১০ সারাংশ

৮৩.১১ নীল-দর্পণের নাটকের দোষগুণ বিচার

৮৩.১২ নীল-দর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পর্যালোচনা

৮৩.১৩ সারাংশ

৮৩.১৪ অনুশীলনী

৮৩.১৫ উত্তর সংকেত

৮৩.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৮৩.১ উদ্দেশ্য

দীনবন্ধু মিত্র নীল-দর্পণ রচনা করেন ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে। এটি তাঁর প্রথম নাটক। প্রথম রচিত নাটকে দীনবন্ধু মিত্র অনেকগুলি ক্ষেত্রে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

আপনি বর্তমান এককটি পাঠ করে নীল-দর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক অবদান সম্পর্কে জানতে পারবেন।

- নাটক পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি বাংলাদেশে নীলচাষ ; ইংরেজ কুঠিয়ালদের শোষণ ও নির্যাতনের

পরিচয় পেয়েছেন। সেইসঙ্গো নীলচাষী বা রায়তদের কুঠিয়ালদের অত্যাচারের বিরুধে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ রচনার চেষ্টাও যে পাশাপাশি চলছিল সে পরিচয়ও পেয়েছেন।

- এই এককটি পড়ে আপনি নাটক রচনার সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট জানতে পারবেন।
- এককের পর্যায়ক্রমিক আলোচনা থেকে আপনি নীল-দর্পণ নাটক হিসাবে কতটা সার্থক এবং রচনাটির নাটকীয় রসপরিণতির স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারবেন।
- নাটকের কুশীলবদের শ্রেণী ভিত্তিক পরিচয়ের সঙ্গো সঙ্গো তাদের সংলাপের বৈচিত্র্যও লক্ষ্য করতে পারবেন।
- নাট্যকার নীল-দর্পণে যে হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন, তার পরিচয় পাবেন।
- বাংলা ট্র্যাজেডি নাটক সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

৮৩.২ প্রস্তাবনা

নীল-দর্পণ নাটকের পাঁচটি অঙ্ক স্বতন্ত্রভাবে পাঠ করে আপনি নাটকটি যে বিশেষ দেশকালের প্রেক্ষাপটে রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল সেটি উপলব্ধি করতে পারবেন। দীনবন্ধু মিত্র ডাকবিভাগে চাকরী করতেন। তাই নাটকটির তিনি রচয়িতা হলেও স্বনামে প্রকাশ করতে পারেন নি। কারণ নাট্যকার দরিদ্র নীল চাষীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি নাটকে ইংরেজ কুঠিয়ালদের শোষণ ও নির্মম আচরণের স্বরূপ তুলে ধরেছেন। সে সময় ইংরেজ শাসক ও ইংরেজ কুঠিয়ালরা পারস্পরিক যোগাযোগ রেখে কাজ করতেন। সাধারণ প্রজা ইংরেজ কোন কুঠিয়ালের বিরুধে অভিযোগ করে সুবিচার পেত না। বিচারের নামে প্রহসন হোত। বর্তমান এককে এই নাটকটির সাহিত্যিক অবদান ও বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাসে নীল-দর্পণের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতটা তা প্রাসঙ্গিক আলোচনা থেকে উপলব্ধি করতে পারবেন। সুতরাং নীল-দর্পণ নাটক পড়বার সময় তার সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক বাতাবরণটি জানা প্রয়োজন। পরবর্তী বিভাগে তার সূচনা করা হোক।

৮৩.৩ নীল-দর্পণ ঃ দেশ, কাল ও নাটক রচনা

দীনবন্ধু মিত্র ডাক বিভাগের পরিদর্শক পোস্টমাস্টার হিসেবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করেন। বাংলাদেশের নদীয়া, ফরিদপুর, পাবনা, যশোহর, খুলনার গ্রামাঞ্চলের ব্যাপক এলাকা পরিক্রমার সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা নিয়ে নীলদর্পণ রচনা করন। এ সময় নীলচাষ ও রঞ্জকদ্রব্য হিসেবে নীল প্রস্তুত লাভজনক ছিল। ইংরেজ নীলকরেরা গ্রামাঞ্চলে কুঠি স্থাপন করে রায়তদের বলপূর্বক দাদন দিয়ে নীলচাষে বাধ্য করত। দীনবন্ধু নীলচাষীদের দুরবস্থা নিজে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই নীলকরদের পীড়ন সম্পর্ক সবিস্তারে অবগত ছিলেন। তাঁর স্বাভাবিক সহানুভূতি সূত্রে পীড়িত প্রজাদের দুঃখ তাঁর হৃদয়কে বিচলিত করত। তিনি তাঁর একান্ত অভিজ্ঞাতালব্ধ কাহিনীসমূহ অবলম্বনে 'নীল-দর্পণ' লেখেন।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত গুয়াতেলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা তাঁর বর্তমান নাট্যকাহিনীর প্রেক্ষাপট। নাটকে বর্ণিত ক্ষেত্রমণির কাহিনীও বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে আহৃত। নদীয়ার গ্রামাঞ্চলের সুন্দরী চাষী-কন্যা হরমণি ক্ষেত্রমণি চরিত্রের উৎস। নীলকর আর্চিবল্ড হিলস্ তাকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত আটকে রাখে। পরিকল্পনার প্রধান অমর নগরের ম্যাজিস্ট্রেট (১ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক) বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী হারসেলের পুত্র ডাবলু জে. হারসেল।

জনৈক ফরাসী লুই বোনার ভারতবর্ষে প্রথম নীল চাষ করেন বলে জানা যায়। তিনি হুগলী জেলার তালডাঙ্গায় প্রথম নীলকুঠি স্থাপন করেন। সেটি পরে চন্দননগরের গোদলাপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়। লর্ড কর্নওয়ালিসের মিনিটস্ থেকে জানা যায়, অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশে নীলচাষের ব্যাপক প্রচলন হয়েছিল। উনিশ শতকের প্রথমপাদেও নীলচাষ হোত। এসময়ে বাংলার নীল চাষীরাই তাদের জমিতে নীলচাষ করে দেশে বিদেশে নীলের চাহিদা মেটাত। ধূর্ত ইংরেজ ও দেশীয় কতিপয় নীলকর এটা বোঝামাত্র অতি মুনাফার লোভে নীল চাষীদের ওপর শোষণ ও সীমাহীন পীড়ন করতে শুরু করে। প্রজাদের বলপূর্বক নীলচাষে বাধ্য করা, বিনা পারিশ্রমিকে বেগার খাটান, কুঠিতে কয়েদ রাখা—এই জাতীয় মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার দেশের মধ্যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের ভাব পুঞ্জীভূত হয়। অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে দৈহিক উৎপীড়ন অর্থদণ্ড, পারিবারিক সম্ভ্রম হানি করা হোত। বাংলাদেশের বেশ কিছু সংবাদ সাময়িকপত্রে এর বিরুদ্ধে এ সময় মন্তব্য লেখা হতে থাকে। অক্ষয়কুমার দত্ত ‘তত্ত্বোধিনী’তে মন্তব্য করেন (১৮৫৮), জমিদারদের থেকে নীলকরদের অত্যাচার অনেক বেশী, ফলে প্রজারা নির্মূল হবার উপক্রম হয়েছে। ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরে লেখেন (১৮৫৪), নীলকররা দরিদ্র প্রজাদের বলপূর্বক বেগার ধরে নীলবীজ বোনান ও জলসেচ করান আর লাঠির বলে ফসল কেটে নেন। ইংরেজ বিচারকরা কুঠিয়ালদের অতিথি হয়ে কুঠীতে পান-ভোজন ও তাদের পরিবারের সঙ্গে আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হন। ফলে, নীলকরদের বিরুদ্ধে কোন মামলায় বিচার পাওয়া যায় না।—“নীলকুঠী সংক্রান্ত নিষ্ঠুরতা ও হত্যাঘটিত মোকদ্দমা কতবার সুপ্রীম কোর্টে উপস্থিত হইল ..... তাহাতেএ এ পর্যন্ত কোন উপকার হইল না।” অমৃতবাজার পত্রিকার শিশিরকুমার ঘোষ এবং ‘হিন্দু প্যাট্রিয়ট’ পত্রিকার হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রায়তদের পক্ষে তথ্য সমৃদ্ধ নানা প্রবন্ধ নিবন্ধ ও সম্পাদকীয় রচনার মধ্য দিয়ে সর্বাত্মক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন।

কোম্পানীর শাসনে জমিদার-মহাজনদের নিপীড়নে দেশের সাধারণ কৃষক ও খেটে খাওয়া মানুষ বিচ্ছিন্নভাবে হলেও বারবার প্রতিবাদ প্রতিরোধ রচনা করতে প্রয়াসী হয়েছে। সে প্রকাশ অনেক সময় শক্তিশালী শাসকদের অত্যাচারে সফল না হলেও, এটা বুঝিয়ে দিয়েছে বঙ্গপ্রদেশের মানুষ, মাথা নত করে সব মেনে নেয় না—প্রতিবাদ করতে পারে ও প্রতিবাদ করে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৭৮৩-১৮০০), ওয়াহবী বিদ্রোহ (১৮২৪-৭০) সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-৫৭) এবং পরিশেষে ১৮৫৭-র সিপাহী বিদ্রোহ তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ভারতজোড়া সিপাহী বিদ্রোহের আগুন ১৮৫৯-৬০ সালে নিভে এলেও নিম্নমধ্যবিত্ত কিছু মানুষের সহায়তায় নীলচাষীরাও সংঘবদ্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। শেষে বাধ্য হয়েই

প্রতিবাদ প্রতিরোধের জন্য লাঠি ও বল্লম নিয়ে নীলকুঠির মালিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়েছিলেন (১৮৫৯-৬০)।

দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক এই পটভূমিকায় রচিত (১৮৬০)। নীলকররাও অবশেষে বুঝেছিলেন, চাষীদের এই সংঘবদ্ধ শক্তির সঙ্গে লড়াই করে নীলচাষ আর সম্ভব হবে না। নীলচাষ প্রথমে স্তিমিত হয়ে একদিন বন্ধ হয়ে গেল। জার্মানীর রাসায়নিক নীল উদ্ভাবনের পর নীলচাষও আর লাভজনক হোল না, তাই বাংলাদেশ থেকে ক্রমান্বয়ে নীলচাষ উঠে গেল। আজ পড়ে আছেন জীর্ণ নীলকুঠির পরিত্যক্ত প্রাঙ্গন।

৮৩.৪ সারাংশ

বাংলাদেশে নীল আবাদ ও নীল রং প্রস্তুত করা, রঞ্জক হিসেবে তার ব্যবহার অত্যন্ত লাভজনক ছিল। নীলকররা রায়ত ও চাষীদের তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে প্রচুর উপার্জন করতো। দীনবন্ধু মিত্র নাটকের ভূমিকায় এ সম্পর্কে আভাস দিয়েছেন। লিখেছেন, “তোমরা দশমুদ্রা ব্যয় করে প্রজাদের ক্লেশ দিয়ে শতমুদ্রার দ্রব্য গ্রহণ করো।” নীলকরদের ধনস্পৃহা ও ক্ষমতার গর্ব ক্রমশ বেড়ে ওঠায় তারা ইজারা বহির্ভুত ব্যাপক এলাকায় প্রজাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে দাদন দিয়ে চুক্তিপত্র লিখিয়ে নিত। পরে দেওয়ান, আমিন, পাইক লেঠেলদের দ্বারা বলপ্রয়োগ করে জমিতে নীল চাষ করতে বাধ্য করতে লাগল। এর অন্যথা ঘটলে অবাধ্য রায়তদের যে কোন ধরনের পীড়ন করতে দ্বিধা করত ন। পাইক লাঠিয়ালদের সাহায্যে ধরে এনে মারধর, গুদামঘরে বন্দী করে রাখা, চামড়ার তৈরী চাবুক (শ্যাঁমচাঁদ) দিয়ে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা, লুঠতরাজ এমন কি গ্রামের ঘরবাড়ী পুড়িয়ে দিত। এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়ে ইংরেজ শাসককুলের কাছ থেকে কোন সুবিচার পাওয়া যেত না। পরিণামে কুঠিয়ালদের আক্রোশ শতগুণ বৃদ্ধি পেত—রায়তদের ভিটে মাটি থেকে উৎখাত করা হোত।

এইসব অবিচারের জন্য সাধারণ প্রজা দাদন নিতে অনিচ্ছুক ছিল। একবার দাদন নিলে, তা হিসাবের কারচুপিতে কখনো পরিশোধ হোত না। প্রজারাও তাদের ফসলের ন্যায্য মূল্য পেত না। তথাপি নানা অছিলায় বলপূর্বক উর্বর ধানী জমিতে নীলচাষে বাধ্য করা হোত। একে কুঠিয়ালদের অত্যাচারে প্রজারা জর্জরিত, তদুপরি কুঠির কর্মচারীদের অত্যাচার এ পীড়নকে শতগুণে বাড়িতে দিত। কর্মচারীরা একদিকে প্রজাদের অর্থ আত্মসাৎ করত, উৎকোচ না দিলে নানা ধরনের বিপদে ফেলত বা ফেলবার ভয় দেখাত। ফলে নীলচাষীরা সর্বস্বান্ত হতে লাগল।

দীনবন্ধু ডাকবিভাগের কর্মসূত্রে বহু জায়গায় পরিভ্রমণ করেছেন। বাংলার নদীয়া, যশোর, খুলনা ২৪ পরগণায় নানা প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়েছেন। সেখানকার মানুষের বিশেষতঃ নীলচাষীদের দুঃখ-দুর্দশা বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে অসহায় দরিদ্র চাষীদের জন্য তার হৃদয় ব্যথিত হওয়ায় ‘নীল-দর্পণ নাটক’ রচনার সুত্রপাত। নদীয়ার গুয়াতোলির মিত্র পরিবারের দুর্দশা নীল-দর্পণ নাট্যকাহিনীর প্রাথমিক ভিত্তি। নীলদর্পণে

নীলকরদের স্বৈরাচারী ভূমিকা সম্পর্কে শাসককুলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য মধুসূদন সেটি ইংরাজিতে অনুবাদ করেন। পাদ্রী লঙ্ সেটির প্রকাশত হতে স্বীকৃত হেন। ইংরাজী সংস্করণ প্রকাশের পর মানহানির দায়ে লঙ্-এর এক হাজার টাকা জরিমানা ও কারাদণ্ডের আদেশ হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহ সেটাকা আদালতে জমা দেন।

এইসব ঘটনা পরম্পরা দীনবন্ধু ও তাঁর নীল-দর্পণ, মধুসূদন ও পাদ্রী লঙ্-কে বাঙালী জনগণের কাছে স্মরণীয় করেছে।

৮৩.৫ নীল-দর্পণ নাটকের কাহিনী বিশ্লেষণ ও আলোচনা

জীবন-নাটকের কাহিনী কালানুক্রম অনুসরণ করলেও, নাট্যরস সৃষ্টির জন্য নাট্যকার কাহিনীটিকে কতকগুলি কার্যকারণ সুত্রে বিধৃত করেন। ফলে সরলরৈখিক কাহিনী সূত্রকে নাটকীয়তার জন্য অগ্রপশ্চাৎ ক্রমে সজ্জিত করা হয়। এই বিন্যাসযুক্ত কাহিনী প্লট বা নাট্যবৃত্ত নামে পরিচিত। বস্তুত নাট্যবৃত্ত ঘটনার সৃষ্টি—এরা যুক্তি সংগত কার্য-কারণ সূত্রে পরস্পর আবদ্ধ। দৃঢ়পিনদ্ধ ঘটনাপঞ্জী ফুটিয়ে তোলে এক একটি নাট্যবৃত্তকে। এর ব্যতিক্রম ঘটলে নাটকের গঠন বিন্যাস বিপর্যস্ত হয়।

সুগঠিত নাট্যবৃত্তে আরম্ভ, মধ্যস্তর ও পরিণতি দেখা যায়। নাট্যবৃত্ত তাই ইচ্ছামত শেষ করা যায় না। নাট্যবৃত্তটি সুষম ও সুগঠিত না হলে ঘটনার আবর্ত নাটকীয় বিভিন্ন চরিত্রে ঘাত-প্রতিঘাত স্বাভাবিক পরিণতি লাভ করতে পারে না। তাই সার্থক নাটকের জন্য প্রয়োজন সুসম্বদ্ধ নাট্যবৃত্ত যা যথার্থ ভাবগত সংহতির মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত নাট্যরস সৃষ্টি করতে সক্ষম।

গ্রীক নাটকে নাট্য কাহিনীর একমুখীনতা সূচনা, মধ্যস্তর, পরিণতি ক্রমে বিন্যস্ত। এগুলি যথাক্রমে পাঁচটি অঙ্কে বিভক্ত করে উপস্থাপিত হয়। ভারতীয় নাট্য চিন্তাতেও পঞ্চসন্ধির কথা বলা হয়। এ বিষয়ে অন্যত্র আলোচনা করা হয়েছে। প্রসঙ্গাত স্মরণ করা যেতে পারে দীনবন্ধু তাঁর নাটকটি ইংরেজি নাট্যাদর্শ অনুসরণে রচনা করেছেন। নীল-দর্পণ পঞ্চাঙ্ক নাটক। প্রত্যেকটি অঙ্ক নাট্যবৃত্তকে কয়েকটি গর্ভাঙ্ক পর্যায়ে বিন্যস্ত করেছে।

প্রথম অঙ্কে চারটি গর্ভাঙ্ক আছে। অঙ্ক-গর্ভাঙ্ক পরম্পরায় নাটকীয় ঘটনা, নাট্যদ্বন্দ্বের আভাস, নাটকীয় চরিত্রগুলির সঙ্গে শুধু পরিচয় ঘটেছে তাই নয়, নাটকীয় দ্বন্দ্বের সূত্রটিও পাওয়া গিয়েছে। গোলোক বসু-সাধুচরণের সংলাপ থেকে নীলকরদের অত্যাচারের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে সাধু-রাইচরণদের সবচেয়ে ভাল জমিতে নীলের দাগ দিলে, তারা প্রতিবাদ করে। নীলকরদের পেয়াদা আমিন এসে তাদের ধরে নিয়ে যায়। তৃতীয় গর্ভাঙ্কে ধৃত দুই রায়তের উপর নির্যাতন দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে। সেখানে নবীন মাধব গিয়ে সাহেবদের কাছে দুই ভাইয়ের পক্ষে সওয়াল করলে সেও লাঞ্ছিত হয়। চতুর্থে গোলোক বসু পরিবারের সহজ স্নেহময় পরিবেশটি বর্ণিত হয়েছে।

প্রথম অঙ্কে স্বরপুরের গৃহস্থজীবন কিভাবে বেগুনবেড়ের নীলকুঠিয়ালদের দ্বারা বিপন্ন হচ্ছিল তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় অঙ্কে নাট্যঘটনায় ক্রমশ গতিবেগ সঞ্চারিত হয়েছে। এখানে তিনটি গর্ভাঙ্ক স্থান পেয়েছে। তোরাপ বসু পরিবারের অনুগত, তাকে আটক করে গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তার সঙ্কল্প 'জান কবুল'—তবু মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে পারবে না। দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে বিন্দু মাধবের চিঠি থেকে জানা গেল গোলাক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা রুজু হয়েছে। চারটি গর্ভাঙ্কসহ তৃতীয় অঙ্কে ঘটনা প্রবাহ চরমোৎকর্ষে পৌঁছেছে। রোগ সাহেবের ঘর থেকে ক্ষেত্রমণির উদ্ধার ও নবীনমাধবের ইন্দ্রাবাদ যাত্রায় দু একদিন অতিবাহিত হয়েছে।

তৃতীয় অঙ্কের দৃশ্যগুলি বেগুনবেড়ের কুঠি, নবীনমাধবের বাড়ী ও রোগ সাহেবের কামরায় সন্নিবিষ্ট। তিনটি গর্ভাঙ্ক চতুর্থ অঙ্কের ঘটনাপ্রবাহ ক্রমশঃ করুণ পরিণামের দিকে ধাবিত হয়েছে। ইন্দ্রাবাদে আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্যর সাহায্যে গোলোক বসুর হাজত বাসের আদেশ, জেল হাজতে আত্মাবমাননা হেতু তিনদিন অনশনে থাকার পর 'উদ্বন্ধনে' গোলোকের আত্মহত্যা। নীলকরদের চক্রান্তের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি চতুর্থ অঙ্কের বিষয়।

নীলকরদের সঙ্গে বসু পরিবারের সংঘাতের শেষে গোলোকের মৃত্যুর ঘটনার মধ্য দিয়ে এই পরিণতি, নাটকের ঘটনাপ্রবাহের অবরোহ (falling action) রূপে বর্ণিত হয়েছে। এই অঙ্কের বর্ণিতব্য স্থান হোর ইন্দ্রাবাদের আদালত, বিন্দুমাধবের বাসাবাড়ী এবং জেলখানা।

পঞ্চম অঙ্কে বসুপরিবার ও সাধুচরণের পরিবারের করুণ পরিণতির পর, পিতৃশ্রাদ্ধের পর নবীন গ্রাম ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছে। কিন্তু পিতৃশ্রাদ্ধও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে নীলকরেরা বাধা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হোল। তারা নীল চাষের জন্য, নবীনের পিতৃশ্রাদ্ধ ও নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজী হোল না। পরিবর্তে নবীনকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা হয়, ফলতঃ সে সাহেবের বুকে আঘাত করে। নীলকরের সড়কিওয়ালারা নবীনের মাথা ফাটিয়ে দেয়, পরিশেষে তার মৃত্যু ঘটে। ওদিকে ক্ষেত্রমণির গর্ভপাত ঘটে, শেষে শয্যাকণ্টকিতে তার মৃত্যু হয়।

নাটক পড়ে সাধারণ পাঠকের 'নীল-দর্পণ' নাটকের' বিষয়বস্তু সম্পর্কে যে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মায়, তা হোল ক্ষমতা গর্বোদ্ধত অত্যাচারী ইংরেজদের সঙ্গে বাংলাদেশের সাধারণ কৃষক মধ্যবিত্ত মানুষ, শত অত্যাচার সত্ত্বেও প্রতিরোধ শক্তিহীন হওয়ায়, মর্মন্তুদ পরিণামের শিকার হয়েছে। নাট্যাকার নীলকরদের অত্যাচারের স্বরূপ তুলে ধরার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বর্ণনা পদ্ধতির সাহায্য নিয়েছেন। ক্ষেত্রমণির শ্লীলতাহানির মত প্রত্যক্ষ ঘটনার পাশাপাশি বেগুনবেড়ের কুঠিতে অবরুদ্ধ রায়তদের কথোপকথনের এবং মিথ্যা মামলায় হারিয়ে গোলোক বসুর মর্যাদা হানি করার মত ঘটনা থেকে সপ্রমাণিক। এইসব ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রতিকার অসমর্থ চাষীদের ক্ষোভ ও নবীন মাধবের নেতৃত্বে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের আয়োজন নাটকীয় সংঘাতের তীব্রতাকে বাড়িয়ে দিয়েছে। নাট্যকারের ঘটনা বিন্যাসের চাতুর্যে সূচনা থেকে পরিণতি পর্যন্ত নাটকীয় গতি কোথাও ব্যাহত হয়নি। অসম শক্তির সঙ্গে মূল দ্বন্দ্বের পরিণতির জন্য দর্শক উৎকণ্ঠা শেষাবধি বজায় ছিল।

নীলদর্পণ উদ্দেশ্যমূলক নাটক। দীনবন্ধুর নীলকরদের অত্যাচার সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল। তিনি আশা করেছিলেন, এই নাটকের মধ্যে দিয়ে নীলকরদের স্বরূপ তুলে ধরতে পারবেন, প্রজারা একদিন

যথার্থ সুবিচার পাবে। তাই তিনি নাটকে নীলকরদের মনুষ্যত্ব-বর্জিত শোষণ-পীড়নের রূপটি তুলে ধরেছিলেন। নীলকররা জোর করে দাদন নিতে বাধ্য করে, ভাল জমিতে নীল চাষের জন্য মার্কা করে, উৎপন্ন নীলের ন্যায় সঙ্গত দাম দেয় না। বিষয়টি যথাযথ উপস্থাপনার জন্য নাট্যকার নাট্যকাহিনীটি গোলোক বসু ও সাধুচরণের পারিবারিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে দিয়েছেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তোরাপ ও অন্যান্য রায়তরা। গোলক বসু পরিবারের কাহিনীর প্রাধান্যই পাঠক দর্শকের শেষে উপলব্ধির বিষয় হয়ে উঠেছে। নবীনমাধব নিপীড়ন উপেক্ষা করে প্রজাদের দুঃখ দুর্গতি থেকে মুক্তির চেষ্টা করেছে, এইসব বিবেচনায় নাট্যকার তাকে নায়ক হিসেবে গড়ে তুলতে চেয়েছেন। কিন্তু নীলকরদের সঙ্গে তাঁর সংঘাতের দৃশ্য পরোক্ষভাবে বর্ণিত হওয়ায় নাটকের পরিণতির দৃশ্যটি দুর্বল হয়েছে। আর আখ্যানের মধ্যভাগে গোলোক বসুর আত্মহত্যা, ক্ষেত্রমণির মৃত্যু, আর আখ্যানের শেষভাগে নবীন বসু, নবীনের মা সাবিত্রী, নবীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ সরলতার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে করুণ রসকে প্রগাঢ় করে তুলতে চাওয়া হয়েছে। ফলতঃ নাটকটিতে ট্র্যাজেডির উদাত্তরূপ প্রকটিত হতে পারেনি।

৮৩.৬ নীল-দর্পণ নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ ও আলোচনা

নাটকীয় চরিত্রের যথাযথ বিকাশ ও পরিণতির মধ্য দিয়ে নাটকের সাফল্য অনেক সময় নির্ভর করে। আধুনিক নাটক চরিত্রপ্রধান। দীনবন্ধু মিত্রের নাটকের বিশেষতঃ নীলদর্পণের রসগত সাফল্য, পরিস্ফুট হয়েছে নাটকের নিম্নগোষ্ঠীর মানুষদের চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে এবং সেটি বাস্তব হয়েছে দীনবন্ধুর তন্নিষ্ঠ জীবনদৃষ্টির জন্য। এই শ্রেণীর চরিত্রগুলির প্রতি নাট্যকারের গভীর সহানুভূতির জন্যই এটি সম্ভব হয়েছে। তাঁর তোরাপ শুধু নয়—সাধুচরণ, ক্ষেত্রমণি, রাইচরণ ও অন্যান্য রায়ত, গুপীর মতো দেওয়ান, বিশেষ করে আদুরী, পদী ময়রাণী প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টিতে দীনবন্ধুর নিরাসক্ত মানব সত্যবোধ ও নাটকীয় বস্তুর বাস্তবতা বোধ যে অতি উচ্চস্তরের ছিল তা বোঝা যায়। নীলদর্পণে কৃষকশ্রেণীর একটি চরিত্রগত ঐক্য সত্ত্বেও, তাদের স্বাতন্ত্র্যগুলিও নাট্যকার তুলে ধরতে ভোলেন নি।

দীনবন্ধু মিত্র কর্মজীবনে বাংলা, বিহার, আসাম অঞ্চলে পরিভ্রমণ সুত্রে তাঁর সমাজের নানা শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ ঘটেছিল। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত সমাজ সম্বন্ধেও তাঁর ধ্যানধারণা এবং মধ্যশ্রেণীর চরিত্রগুলির সীমাবদ্ধতা সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। তিনি বাস্তবে যা দেখতেন তা তাঁর প্রাণে সাড়া দিত, বিশেষ অত্যাচারিতের সঙ্গে তাঁর প্রাণের যোগ ছিল। তাই সাধুচরণের পরিবারের বিপর্যয়, বসু পরিবারের দুর্দশা—নবীনমাধবের পারিবারিক ট্রাজেডির বিষয়টি উপেক্ষিত হয়নি।

বসু পরিবারের গৃহকর্তা গোলোকচন্দ্রকে এই নাটকে তিনবার দেখা গেছে। নাটকের সূচনায় প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কে তিনি প্রতিবেশী রায়ত সাধুচরণের সঙ্গে কথোপকথনে রত। তাঁদের পারস্পরিক সংলাপের মধ্য থেকে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের আভাস দেওয়া হয়েছে। নাট্যকার এভাবে সুকৌশলে নাটকের প্রস্তাবনার কাজটি সেরে নিয়েছেন। দ্বিতীয় বার গোলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে, ইন্দ্রাবাদের ফৌজদারী কাছারিতে। মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে তাকে বিচারকের

সামনে দাঁড় করান হয়েছে। তৃতীয় ও শেষবার তাঁকে দেখা যায় চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় গর্ভাঙ্ক—জেলখানায়, যেখানে তিনি উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেছেন। এই আকস্মিক শোকাবহ পরিণতি অত্যন্ত রূঢ়ভাবে আঘাত করে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর শান্ত স্বভাব ও ধীরস্থির সংযত জীবনযাপন, ধর্মভীরু ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, আকস্মিক মানসিক ধৈর্য্যচুতি এবং আত্মহত্যার মত ধর্মবিগর্হিত কাজ বরং অনেকটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে এই নাটকে বস্তুতঃ গোলোকচন্দ্রকে কোথাও কোনরকম প্রত্যক্ষ নাট্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত করা হয়নি। নবীনচন্দ্রের উক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্র মহিমা পরোক্ষে তুলে ধরা হয়েছে। এ হেন গোলোকচন্দ্রের শেষ পরিণতির দৃশ্যটির মাধ্যমে নাট্যকার উৎপীড়নের স্বরূপ তুলে ধরে পাঠক দর্শকের মনকে প্রতিবাদ মুখর করে তুলতে প্রয়াসী হয়েছেন।

নবীনমাধব—নীল-দর্পণ নাটকের নায়ক হিসেবে কল্পিত। তিনি সৎ, ন্যায়নিষ্ঠ, বলিষ্ঠ চরিত্র, সঙ্কল্প সাধনে, অন্যায়ের প্রতিবাদে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর সমস্ত চিন্তা ও কর্মধারা দুর্গত প্রজাদের মঙ্গল সাধনে নিয়োজিত। তিনি অত্যন্ত দৃঢ় মনোবল নিয়ে সাধারণ প্রজাদের ওপর শোষণ পীড়নের প্রতিবাদ করতে নীলকরদের মুখোমুখী হতে দ্বিধা করেন না। নীলকররা তাদের ব্যক্তিগত চাষের জমিতে অন্যায়ভাবে নীল চাষের জন্য চিহ্নিত করলে তিনি প্রতিবাদ করতে দ্বিধা করেন নি। নবীন দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, তাঁর গত সনের নীলের দাম না দিলে, কিছুতেই এক বিঘাও নীল চাষ করবেন না—"এতে প্রাণ পর্যন্ত পণ, বাড়ী কি ছাড়।" নবীনের এই দৃঢ়তা নায়কোচিত বলা যায়।

দীনবন্ধু মিত্র সম্ভবতঃ নীল-দর্পণের নায়ক হিসেবে নবীনমাধবকে উপস্থাপিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি। নবীন তথাকথিত মধ্যবিত্ত চরিত্রের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করলেও নাটকের ঘটনা প্রবাহকে নাটকের পরিণতির দিক নিয়ে যেতে পারেননি। নবীনকে 'স্বরপুর-কেশরী' বা তার "ভ্যালা সাহসের" উল্লেখ সত্ত্বেও তাঁর সাহসিকতার পরিচয় আচরণে, কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠেনি। সাধুচরণ ও রাইচরণের মুক্তির জন্য উড সাহেবের কাছে আবেদন এবং তোরাপকে সঙ্গে নিয়ে বেগুনবেড়ের কুঠীতে রোগ সাহেবের ঘরের জানালা ভেঙ্গে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করার দুটি মাত্র দৃশ্য ছাড়া কোথাও নবীনকে সক্রিয় ও বাস্তব ভূমিকায় দেখা যায়নি। বরং নবীনের দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ সংলাপ নাট্যক্রিয়া ও নাট্যরস পরিস্ফুটনে অন্তরায় হয়েছে।

নাটকের শেষ পর্যায়ে পিতা গোলোক বসু জেলে উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করলে নবীন হৃদয়হীন নীলকরদের পঞ্চাশ টাকা সেলামী দিয়ে সকরুণ আবেদন জানায়—শ্রাদ্ধের নিয়মভঙ্গ পর্যন্ত যেন তারা পুকুর পাড়ের জমিতে নীলচাষ স্থগিত রাখে। দুবৃত্তদের কাছে নবীনের এই আবেদন তাঁর দুর্বল চিত্ততার পরিচায়ক। তাই নীলকর সাহেব তাঁর বুকে পায়ের জুতা ঠেকিয়ে অপমানিত লাঞ্ছিত করার সাহস পায়। ক্রোধান্ধ নবীন সাহেবের বুকে লাথি মারলে, সাহেবের লাঠিয়ালরা তার মাথায় লাঠি দিয়ে আঘাত করায় নবীনের অকাল জীবনাবসান হয়। নবীনের এই আচরণ পৌরুষব্যঞ্জক নয়। দুর্বৃত্তের কাছে আবেদনের যে কোন মূল্য নেই, আর অসম সংঘাতের পরিণতি সম্পর্কে নবীনের বোধের অভাব, তাঁর বাস্তবজ্ঞানের দৈন্যকেই প্রকাশ করেছে।

সাধুচরণ বসু পরিবারের একান্ত ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, গৃহস্থ চাষী। চাষী পরিবারের সন্তান, তার কথাবার্তায়, আচারে-ব্যবহারে সৌজন্যে-সৌহার্দ্য অনেকটা গ্রাম্যতামুক্ত—কখনো কখনো তার আচরণ মনে হয় কৃত্রিম। মার্জিত রুচি ও রীতিনীতির প্রতি তার একান্ত আকর্ষণ লক্ষণীয়ভাবে প্রকট।

গাঁয়ের স্কুলে সামান্য লেখাপড়া শিখেছে, তাই তার আচরণে কিছুটা সংযমের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ভাষা ব্যবহারে 'সাধু' ভাষার প্রতি তার একান্ত আসক্তি, তাঁকে অনেকক্ষেত্রে হাস্যাস্পদ করেছে। পাঠ্য বইয়ে ব্যবহৃত সাধু গদ্যে সে কথাবার্তা বলে। তার চরিত্রে একটি সহজাত, সারল্য, অসহায়তা জীবন জটিলতা সম্পর্কে অজ্ঞতা দৃশ্যমান।

সাধু সামান্য লেখাপড়া শিখে এবং বসু পরিবারের সান্নিধ্যে নীলের দাদনের বিষময় ভূমিকা সম্পর্কে বুঝে নীল চাষীদের দাদন না নেবার পরামর্শ দিয়েছে। নীলকররা এজন্য তার প্রতি রুষ্ট হয়ে, কুঠীতে ধরে এনে চরম নিগ্রহ করেছে। শ্যামচাঁদের শত প্রহারেও সে কাতরোক্তি করেনি। নীলকরেরা তাঁর ন-বিঘে জমি নীল চাষের জন্য চিহ্নিত করলে, আক্ষেপ করে বলেছে, "দেড় খানা লাঙলে" চাষ করতে গেলে "হাঁড়ি শিকেয় উঠবে।"

সাধু নবীনমাধবের মতো আদর্শবাদী বিধায় চাষীসুলভ আদিম বলিষ্ঠতার পরিচয় কোথাও পাওয়া যায়নি। সে পরিবারের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য প্রয়োজনীয় ও অপরিহার্য কৃষিকাজটুকুও কখনো করেনি। ছোট ভাই রাইচরণের ওপর সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে ভারমুক্ত থেকেছে। নীলকরদের সীমাহীন জুলুমে পরিবারের সমূহ ক্ষতি সত্ত্বেও সামান্য দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া তাকে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে দেখা যায়নি। নবীনমাধব নীলকরদের দ্বারা প্রহৃত হলে, সাধুচরণ বড়বাবুর জন্য ব্যাকুল হয়েছে, কিন্তু একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণির শোচনীয় মৃত্যুতে রেবতীর হাহাকারের মধ্যে সাধুচরণকে বিচলিত হতে দেখা যায়নি। নাট্যকার চরিত্রটিকে আদর্শবাদী করে আঁকতে চেয়েছেন, ফলে সে নাটকের উপযোগী বাস্তবসম্মত ও জীবন্ত হয়ে ওঠেনি।

রাইচরণ—সাধুচরণের ছোট ভাই, একেবারে বস্তুনিষ্ঠ ও জীবন্ত চরিত্র। সে প্রকৃত চাষী, তার মাটির সঙ্গে নাড়ীর যোগ, কঠিন পরিশ্রমী ও বাস্তববাদী। তাদের সাঁপোলতার জমি নীলচাষের জন্য চিহ্নিত হয়েছে, তাই বিচলিত হয়ে বলেচে, "আহা জমি তো নয়, য্যান সোনার চাঁপা। এক কোন কেটে মহাজন কাৎ কত্তাম।" এই "সোনার চাঁপা" জমিতে আমিন দাগ দিয়েছে বলে তার মনে যে দুঃসহ মর্মবেদনা হয়েছে, তা বুঝাতে সে যে উপমা ব্যবহার করেছে তা একান্তভাবেই গ্রাম্য কৃষকের "মুই বলবো কি, জমিতি দাগ মারতি লাগলো, মোর বুকি য্যান বিদে কাটি পুড়য়ে দিতে লাগলো।" "গোবার নীলি'র হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য সে আমিনের কাছে অনুনয় বিনয় করে ব্যর্থ হয়ে, টাকা দিতে চেয়েও যখন কোন সুরাহা হোল না তখন ক্ষোভে যে ফৌজদারী করার হুমকি দিয়েছে। ফলতঃ পেয়াদাসহ আমিন এসে রাইচরণ ও সাধুচরণকে কুঠিতে ধরে নিয়ে যায়। সাধু উড সাহেবের সঙ্গে যুক্তি তর্কের অবতারণা করল, সাহেব তাকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য শ্যামচাঁদ তুলে নেন। দাদা সাধুচরণের ওপর সম্ভাব্য পীড়নের আশঙ্কায় ও ক্ষুধার তাড়নায় রাইচরণ বলে, "ও দাদা, তুই চুপ দে, ঝা ন্যাকে নিতি চাচ্ছে ন্যাকে দে, ক্ষিদের চোটে নাড়ী ছিঁড়ি পড়লো।' রাইচরণ বলিষ্ঠ, পরিশ্রমী, দাদা সাধুচরণের অনুগত,

দুঃসাহসী না হলেও, নিতান্ত ভীরু স্বভাবের নয়। তার সংলাপে সাধারণ, ভাষা-ভঙ্গী ও আচরণ রক্তমাংসের সাধারণ গ্রাম্য রায়তের সঙ্গে বাস্তবানুগ।

তোরাপ—দীনবন্ধু মিত্রের অন্যতম স্মরণীয় চরিত্র সৃষ্টি। এই মুসলমান কৃষকের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা, প্রাণশক্তির উচ্ছলতা, হিন্দু মনিবের প্রতি আনুগত্য বোধ, অবিচল কৃতজ্ঞতা এবং ধর্মপ্রাণতার পরিচয় চরিত্রটিকে অনন্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। তোরাপ নবীনমাধবের আশ্রিত। তাকে প্রথমে দেখা গেছে বেগুনবেড়ের গুদামঘরের কয়েদখানায়। তারপর ক্ষেত্রমণিকে বেগুনবেড়ের কুঠিতে ধরে নিয়ে গেছে, এই সংবাদে সে নবীনমাধবের সঙ্গে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধারের জন্য গিয়েছে। এই দ্বিতীয়বার সে রাত্রিতে জানালার খড়খড়ি ভেঙে নবীনমাধবের সঙ্গে সাহেবের ঘরে অতর্কিতে প্রবেশ করে ক্ষেত্রকে উদ্ধার করেছে। শেষবার তাকে দেখা গেছে উড সাহেবের লাঠির আঘাতে সংজ্ঞাহীন নবীনমাধবের গৃহাঙ্গনে। 'শ্রাদ্ধের নিয়ম ভঙ্গের দিন পর্যন্ত বুনন' বন্ধের অনুরোধ করেও যখন নবীন অপমানিত হয়ে সাহেবের বক্ষস্থলে পদাঘাত করলে, উড সাহেবের লাঠির আঘাতে অচৈতন্য, তোরাপ তখন "একগুঁয়ে মহিষের মত" সমস্ত বাধা ভেদ করে নবীনকে কোলে নিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় বড় সাহেবের নাক কামড়ে নিয়ে পালিয়েছিল।

তোরাপের কৃতজ্ঞতাবোধ সীমাহীন। বড়বাবুর কাছে সে এতই উপকৃত যে গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে বললে, সে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে, "খুই কখনুই পারবো না—জান কবুল।" অন্যত্র দেখি নবীনমাধবকে বাঁচাতে না পেরে অনুতপ্ত তোরাপ কপালে করাঘাত করে কেঁদে বলেছে—"আল্লা, বড়বাবু মোরে এতবার বাঁচালে, মুই বাবুকে একবার বাঁচাতে পাল্লাম না।" এ হেন তোরাপের মুখে ব্যবহৃত নাট্য সংলাপ গ্রামবাংলার অশিক্ষিত ধর্ম বিশ্বাসী, সরল অথচ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি বলিষ্ঠ ব্যক্তির মুখের সংলাপ। তোরাপ যথার্থ অর্থেই পল্লী বাংলার একান্ত বিশ্বস্ত চরিত্র।

সাবিত্রী-সৈরন্ধ্রী-সরলতা—এই তিনটি নারীচরিত্র বাংলার ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় আদর্শ গৃহবধূ রূপে চিহ্নিত হবার যোগ্য। স্বচ্ছল পরিবারের গৃহিণী সাবিত্রী দেবসেবা, অতিথি সৎকার, আত্মীয় স্বজন পালন, সংসারের নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে সতত দৃষ্টি, তাঁর নারী ব্যক্তিত্বকে উজ্জ্বল করে তুলেছে। তাঁর কর্তব্য পরায়ণতা, পতিব্রতা, পুত্র বাৎসল্য, পুত্রবধূদের প্রতি সদা স্নেহ পারবশ্য এবং প্রতিবেশীদের প্রতি সতত মমতা ও তাদের আপদে বিপদে একান্ত করুণাময়ী আপনজনের মত অংশগ্রহণ করায় তাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছে।

ছোট সাহেবের নির্দেশে পদীময়বাণীর ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাবে বিচলিত রেবতী সাবিত্রীর কাছে তার সঙ্কটের কথা জানালে ধর্মপরায়ণা সাবিত্রী বলেছে, "ভগবতীর মনে যদি তাই থাকে হবে"—সাবিত্রী মনে করে ঈশ্বরে বিশ্বাস ব্যতীত এ সংসারে বিপদমুক্তির কোন পথ নেই। কিন্তু এ হেন সাবিত্রীও ক্ষেত্রমণি অপহরণের সংবাদে কর্তব্যবোধের প্রেরণায় পুত্র নবীন মাধবকে বলেছেন, যদি নীল বানরের হাত থেকে 'পবিত্র মাণিক্য' অপবিত্র না হতেই আনতে পার, তবেই তোমাকে সার্থক গর্ভে ধারণ করেছি জানব। (৩/২)

সাবিত্রী কোমল হৃদয়া কর্তব্য পরায়ণা গোলোক বসুর আদর্শ সহধর্মিনী। স্বামীকে মিথ্যা মামলায় জড়িত করে ইন্দ্রাবাদে জেলে আটক করলে পরিবারের সকলেই যখন বিব্রত বোধ করেছে, সাবিত্রী তাঁর

স্থিতধী প্রজ্ঞায় সকলকে সংযত থাকতে বলেছেন, প্রয়োজনে গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। অপমান ও লাঞ্ছনায় গোলোক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করলে তিনি পুত্রদ্বয়ের কথা ভেবে সে শোকভার সংযতভাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু নীলকরদের লাঠির আঘাতে নবীন রক্তাক্ত। পরে মৃত্যু ঘটলে সাবিত্রী উন্মাদ হয়ে পুত্রবধূ সরলতাকে হত্যা করে, পরে জ্ঞানলাভে মানসিক আঘাত ও অনুশোচনায় প্রথমে মূর্চ্ছা ও পরে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। পর পর তিনটি মানুষের এভাবে মৃত্যু খুব স্বাভাবিক মনে না হলেও যেমন ভয়াবহ, তেমনি আকস্মিকতা সত্ত্বেও শোকাবহ।

সৈরিন্ধ্রী বসু পরিবারের জ্যেষ্ঠ পুত্রবধূ। নবীনের স্ত্রী। শ্বশুর শাশুড়ীর প্রতি সেবা, স্বামীর প্রতি গভীর ভালবাসা, দেবর বিন্দু ও ছোট জা-র প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ তাঁর চরিত্রকে বিশিষ্ট করেছে। ছোট বৌ তার মতে "বড় পয়মন্ত, (তার) নাম করে যা করি তাই ভাল হয়।" সরলতার প্রশংসায় বড় বৌ পঞ্চমুখ—"আহা চুল তো নয়, শ্যামা ঠাকুরণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্বদা হাস্য বদন।" সৈরিন্ধ্রী বলেছে, "লোকে বলে যাকে যায় দেখতে পারে না।...........ছোট ব'য়ের মুখ দেখ্‌লে আমার তো বুক জুড়য়ে যায়।" সে আরও বলেছে "আমার বিপিনও যেমন ছোটবউও তেমন। ছোট বউ তো আমাকে মায়ের মত ভালবাসে।" দেবরের প্রতিও তাঁর স্নেহ মমতার অন্ত নেই। দাদার প্রতি তাঁর ভক্তি, চিঠিপত্রের ভক্তিপূর্ণ ভাষা, তাঁর মনকে ভরিয়ে রেখেছে। পরিচারিকা আদুরীও তাঁর স্নেহের পাত্রী। নীলকরদের মিথ্যা মামলায় গোলোক বসু জেলে আটক। নবীনমাধব মামলা পরিচালনার জন্য যে সময় অর্থচিন্তায় বিব্রত, সেই সময় পতিব্রতা বধু সৈরিন্ধ্রী তাঁর সমস্ত অলঙ্কার স্বামীর হাতে তুলে দিতে দ্বিধা করেনি। নবীনকে সৈরিন্ধ্রী বলেছে—"তোমার পাগলের ন্যায় ভ্রমণ, শ্বশুরের ক্রন্দন, শাশুড়ীর দীর্ঘ নিশ্বাস, ছোট বয়ের বিরস বদন,..........রায়তদের হাহাকার" এসব দেখে কি মনে আনন্দ থাকে? বড় বৌ-এর এ আচরণ তাঁর চরিত্রের মাধুর্য, কর্তব্যজ্ঞান ও যথার্থ সাংসারিক জ্ঞানের পরিচায়ক। নবীন নীলকরের লাঠিয়ালের লাঠির ঘায়ে শয্যাশায়ী হলে এহেন সৈরিন্ধ্রীকে ভেঙ্গে পড়তে দেখতে পাওয়া যায়। নবীনের মৃত্যু তাকে শোকাকূল করে তোলে।" সর্বাচ্ছাদক স্বামী" হীন হলে সে যে আবার পথের কাঙালিনী হবে। তবু বিপিনের মুখ চেয়ে তাঁকে তো বাঁচতেই হবে। দীনবন্ধু মিত্র সৈরিন্ধ্রী চরিত্রাঙ্কনে আদর্শবাদিতার পরিচয় দিলেও, তাঁর একটি বাস্তব ভিত্তি পাওয়া সম্ভব, কিন্তু তাঁর মুখে ব্যবহৃত সংলাপে বাস্তবের কোন সংস্পর্শ নেই। তাঁর কথাগুলি হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ নয়, গ্রন্থে আরোপিত কৃত্রিম ভাষা প্রাণের কথা প্রকাশের ভাষা নয়। তাঁর সংলাপের দুর্বলতা স্বীকার করে নিলেও, সৈরিন্ধ্রী চরিত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত।

সরলতা—বসু পরিবারের ছোট বৌ, বিন্দুমাধবের স্ত্রী। রক্ত কমলের মত তার রং, মুখখানি যেন পদ্মফুল, সর্বদাই হাস্যবদন। সে সবসময় প্রাণরসে উচ্ছল, তাঁর মুখে কথার খৈ ফোটে, হাসিতে ঝর্ণা বয়। সরলতা লেখা পড়া জানে। বড় জা তার কাছে বিদ্যাসাগরের বেতালের গল্প শুনতে চান। বিন্দুর কাছে সে সেক্‌সপীয়রের বঙ্গানুবাদ, বঙ্কিমের উপন্যাস নিয়ে আসবার আবেদন জানায়। গোলোক বসুকে মিথ্যা মামলায় ইন্দ্রাবাদের জেলে নিয়ে গেলে, এ হেন সরলতার উচ্ছলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। শাশুড়ী সাবিত্রী বলেছেন, 'তোতাপাখী আমার নীরব হয়েছে, মার মুখে আর কথা নাই............বাসীফুলের মত

মলিন হয়েছেন।” নবীনের মৃত্যু পরিবারে নতুনতর বিপর্যয় নিয়ে এলে, সরলতা এই আকস্মিক বেদনার আঘাতে ম্লানমুখী ও বিষণ্ণ হয়ে পড়েছে।

শাশুড়ী সাবিত্রী সরলতার প্রাণরসে পরিপূর্ণ আনন্দোচ্ছলতায় মুগ্ধ, তিনিই নবীনের শোকে উন্মাদ হয়ে গেলে সরলতা তাঁর সেবা করেছে, তথাপি বিকৃত মস্তিষ্ক সাবিত্রী তার গলায় পা দিয়ে তাকে হত্যা করেছে। সরলতার এই মৃত্যু মর্মান্তিক। পাঠক-দর্শক এই দৃশ্যে বেদনাতুর হয়ে পড়ে। সরলতা নাট্যকারের অভিনব সৃষ্টি।

রেবতী-ক্ষেত্রমণি—সাধুচরণের স্ত্রী ও কন্যা। রেবতী চাষী পরিবারের গৃহিণী। স্নেহশীলা, কর্তব্যপরায়ণা, বাস্তববোধ সম্পন্ন নারী। কুঠির আমিনের নির্দেশে মাঠ থেকে সদ্য প্রত্যাগত, ক্ষুধার্ত রাইচরণকে বেঁধে নিয়ে যাবার উদ্যোগ করলে, সাধুচরণ বিপদে হাল ছেড়ে দিয়ে শুধু আক্ষেপই করেছে। রেবতী এই বিপদে তাদের ভরসাস্থল, নবীনমাধবের কথা স্মরণ করে, সাধুচরণকে তাঁর কাছে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। অপর দিকে আমিনের কাছে অনুরোধ করেছে, “দোহাই সাহেবের, ওরে চাড্ডি খেইয়ে নিয়ে যাও।” রেবতীর এই ব্যাকুলতা, দেবরের প্রতি তার স্নেহার্দ্র হৃদয়ের পরিচায়ক।

গোপীনাথ রোগ সাহেবকে ক্ষেত্রমণির রূপযৌবনের কথা বলেছে। পদীময়রাণীকে রোগ সাহেব ক্ষেত্রমণিকে কুঠিতে নিয়ে যাবার জন্য দূতী হিসেবে পাঠিয়েছে। বিচলিত রেবতী সাবিত্রীর পরামর্শের জন্য দ্বারস্থ হয়েছে। সাবিত্রী আশ্বাস দিলেও রেবতী স্বস্তি পায়নি। সে বাস্তববোধ থেকে জানে, “মেয়েদের ধরে নিয়ে গিয়ে পুরুষদের নীলের দাদনে বাধ্য করা হয়।” রেবতী চাষীবধূ হলেও অনেক সংবাদ রাখে। গোলোক বসু মহাশয়কেও ফাঁদে ফেল বার চেষ্টা হচ্ছে। গর্ভবতী ক্ষেত্রমণিকে ধরে নিয়ে গেলে রেবতী নবীনমাধবের কাছে আবেদন করেছে, “মোর ক্ষেত্রমণিরি অ্যানে দাও”। নবীন ও তোরাপ তাকে উদ্ধার করে আনে। ছোট সাহেবের অত্যাচারে ক্ষেত্রর শয্যাকণ্টকি হয়েছে এবং তার গর্ভপাত হয়। ক্ষেত্রর জন্য ব্যাকুলতার সঙ্গে রেবতী জামাইকে হারাবার ভীতিতে আকুল হয়ে ওঠে। রেবতী নীলকরদের এই অত্যাচারে শোকাপ্লুত হয়ে বলেছে “ছোট সাহেব মোর ক্ষেত্রকে .... কাঙ্গালেরে কেউ রক্কে করে না।” রেবতীর এই আকুল আবেদন সর্বকালের অসহায় দরিদ্রের মর্মবেদনা তুলে ধরেছে।

নাট্যকার রেবতীর চরিত্র একটানা দুঃখের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। রেবতী বেদনার প্রতিমূর্তি রূপেই চিত্রিত। অসহায় দুর্বলের উপর শক্তিমদমত্ত দুর্বৃত্তের হৃদয়হীন অত্যাচারের শাশ্বত করুণ-কাহিনী রেবতীকে আশ্রয় করে রূপ পরিগ্রহ করেছে। স্বামী, দেবর কন্যার ওপর অত্যাচার ও পরিশেষে একমাত্র কন্যার মৃত্যু এই অসহায় জননী হৃদয়কে কি পরিমাণ বিচলিত করতে পারে তা সাধারণভাবে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। একমাত্র মেয়েকে হারিয়ে রেবতী যখন শোকে বিলাপ করে বলে, “সাহেবের সঙ্গি থাকা যে মোর ছিল ভাল, ... মুখ দেখে জুড়োতাম ....।” রেবতীর মাধ্যমে গ্রাম বাংলার অসহায় জননীর এ যেন আর্ত-কান্না। দীনবন্ধু রেবতীর বাস্তবচিত্র এঁকেছেন।

ক্ষেত্রমণি—সাধুচরণ রেবতীর একমাত্র সন্তান। পিতামাতার একান্ত স্নেহ ও আদরের পাত্রী। সুন্দর

স্বাস্থ্যের অধিকারিণী শ্রী ও কান্তিমণ্ডিত চেহারা। সে বিবাহিতা, সন্তান-সম্ভবা। নীলকুঠীর আমিন সাধুচরণ রাইচরণের "সোনার চাপা-র মতো জমিতে দাগ দিতে এসে ক্ষেত্রমণির সুঠাম সুশ্রী চেহারায় আকৃষ্ট হয়ে ভাবল" "এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়। ছোট সাহেব এমন জিনিস পেলে লুপে নেবে।" তদুপরি পদী জানিয়েছে, ছোট সাহেব নিজেও তাকে দেখে পাগল হয়েছে। এভাবে ক্ষেত্রমণির ওপর নীলকর ছোট সাহেবের লুব্ধ দৃষ্টি এসে পড়ায় সে সৃষ্টির আগুনে সাধুচরণ-রেবতীর ঘর-সংসার পুড়ে ছারখার হয়ে গেল।

দীঘিতে জল আনতে গেলে কুঠির লেঠেলরা ক্ষেত্রকে জোর করে নিয়ে যায়। ক্ষেত্র কৃষক পরিবারের সাধারণ মেয়ে হলেও নাট্যকার চরিত্রটির মধ্যে অসাধারণ দৃঢ়তা সঞ্চারিত করেছেন। দেহলোলুপ রোগ সাহেব তাকে স্পর্শ করতে গেলে তার মধ্যে যে কাঠিন্য লক্ষ্য করা যায়, তা এই নিরক্ষর নারীটির, সহজাত প্রতিরোধ শক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। তার এই শক্তি জননীর আদিম স্বভাবত প্রবৃত্তি থেকে প্রাপ্ত, তার নিশ্বাসবায়ুর মতই স্বাভাবিক। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সতীধর্মের প্রতি তার অবিচল নিষ্ঠা, যাকে সে ধ্রুবতারার মত একান্ত লক্ষ্য হিসাবে আশ্রয় করেছে—শত প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শনেও তাকে বিচলিত ও বিচ্যুত করতে পারেনি। রোগ সাহেবের লোলুপ দৃষ্টি ও বলপ্রয়োগ সত্বেও সে সতীত্ব রক্ষার সঙ্কল্পে অটল থেকেছে। পদী ময়রানী প্রদত্ত প্রলোভন, তাকে বিচলিত করতে পারেনি, "চট পরে থাকি সে-ও ভাল তবু য্যান বিবির পোষাক পরতি না হয়।"

রোগ ক্ষেত্রর শ্লীলতা নষ্ট করতে উদ্যত হলে, গ্রাম্য মেয়েটি বলেছে, "ও সাহেব, তুমি মোর বাবা", উত্তরে কামোন্মত্ত নীলকর উত্তর দিয়েছে, "তোর ছেলিয়ার বাবা হইতে ইচ্ছা হইয়াছে।" ক্ষেত্রমণি গর্ভের সন্তানের দোহাই দিয়ে একান্ত মিনতি জানিয়েছে—"মোর ছেলে মরে যাবে........... মুই পোয়াতি।" দৈহিক শুচিতা রক্ষার জন্য ক্ষেত্রমণি তার সমস্ত শক্তি দিয়ে সাহেবকে বাধা দিয়েছে, বলেছে, "মোর গায়ে যদি হাত দিবি তোর হাত মুই, এঁচড়ে কেমড়ে টুকরো টুকরো করবো।" পরিশেষে গর্ভপাতের ফলে ক্ষেত্রমণির অকালে মৃত্যু হয়েছে। তথাপি, ক্ষেত্রমণি চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সতীধর্মে সুগভীর আস্থার জন্য স্মরণীয়তা লাভ করেছে। আরও একটি কারণে ক্ষেত্রমণি চরিত্রটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। নীলদর্পণ নাটকে একমাত্র ক্ষেত্রমণি চরিত্রটি নানা রকম নাটকীয় ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হওয়ায় জীবন্ত ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে।

আদুরী ও পদীময়রাণী—আদুরী বসু পরিবারের পরিচারিকা, পদীময়রাণী দুরাচারিণী, রোগ সাহেবের রক্ষিতা। আদুরী বসু পরিবারের সুখ দুঃখের সঙ্গে জড়িত। সে প্রাণোচ্ছল ও রঙ্গ পরিহাস প্রিয়তার গুণে সকলের প্রিয়। তার স্বতোৎসারিত রসিকতা সর্বত্র শালীনতার মাত্রা রক্ষা করতে না পারলেও, স্বাভাবিক গণ্ডী অতিক্রম করেনি। আদুরী যৌবন অতিক্রান্তা। বয়োধর্মে কানে কম শোনে এবং দাঁত পড়লেও "ডান" হতে রাজী নয়। ডান হওয়ার মতো সে বৃদ্ধ হয়নি বলে তার বিশ্বাস। বয়স তার যাই হোক, প্রাণের সহজ, স্বাচ্ছন্দ্য বোধ কিছুমাত্র নষ্ট হয়নি। তার কথাবার্তায় সরলতা ও প্রগলভতা দুই-ই লক্ষ্য করা যায়। তার স্বামীর কথা উঠলেই প্রতিশ্রুত বাউটি-পৈঁছার জন্য শোক করে। আদুরী মনে

দাম্পত্যজীবনের স্মৃতি অন্তরে লালন করে চলেছে। তার স্বামী তাকে ভালোবাসতো কিনা পরিহাস ছলে সরলতা এই প্রশ্ন করলে তার মনে এক কোমল অনুভূতি সঞ্চারিত হয়। দাম্পত্য জীবনের মধুর স্মৃতি তার হৃদয়কে আবেগে আচ্ছন্ন করে ফেলে। সে ঘুমে ঝিমুলে তার স্বামী বলতো "ও পরাণ ঘুমুলে।"

বসু পরিবারের বধূদের প্রতি সে অপরিসীম স্নেহপরায়ণ। ননদসুলভ সরল রসিকতা করতে সে কখনো ছাড়েনি। বিদ্যাসাগরের প্রসঙ্গ উঠতেই আদুরী তার সংস্কার বশে বলেছে, "সেই নগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা......মুই আজাদের দলে।" আদুরী সাধারণ সংস্কারবশতঃ বিধবা বিবাহ আপাত সমর্থন না করলেও, সে যে মনে মনে বিদ্যাসাগরের পক্ষপাতিনী তা বোঝা যায় কতিপয় সংলাপ থেকে। তাঁর হৃদয়ের অন্তস্তলে অপরিতৃপ্ত জীবনাকাঙ্খী সুপ্ত ছিল, সামান্য সুযোগেই তা অকস্মাৎ বিদ্যুত চমকের মতো বেরিয়ে আসে, তার প্রমাণ পাওয়া যায় রোগ-ক্ষেত্রমণি প্রসঙ্গ উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে। আদুরী বলেছে, "থু থু থু—গোন্দো। প্যাজির গোন্দো। সাহেবের কাছে কি মোর যাতি পারি, গোন্দো থু থু।" একথা থেকে এটুকু বোঝা যায় পেঁয়াজের গন্ধটুকু ছাড়া আর কিছুতে যেন তার আপত্তি নেই। পুনরায় সে বলেছে, "মা গো যে দাড়ি। কথা কয় যেন বোকা ছাগলে ফ্যাবা মারে। দাড়ি প্যাঁজ না ছারলি মুই তো কখনুই যাতি পারবো না, থু থু থু।" অর্থাৎ দাড়ি পেঁয়াজ ছাড়লে সে সাহেবের কাছে যেতেও রাজী।

আঁদুরী দীনবন্ধুর অনন্য সৃষ্টি, অন্যতম সার্থক চরিত্র সৃষ্টি, আদুরী জীবন্ত, প্রাণোচ্ছল ও বাস্তবানুগ।

পদী ময়রাণীর জাতও গেছে ধর্মও নষ্ট হয়েছে। কলঙ্কিত তার জীবন। সে রোগ সাহেবের উপপত্নী এটিই একমাত্র পরিচয় নয়, সে অর্থের জন্য আঁড় কাঠির কাজ করে। কামাতুর রোগ সাহেবকে গ্রামের অল্পবয়স্কা মেয়েদের জোগান দেয়। সে নিজ দেহটি বিক্রি করেইছে, সরলা গ্রাম্য মেয়েদেরও সর্বনাশ করে চলেছে। রোগ-এর আকাঙ্খা পূরণের জন্য ক্ষেত্রমণিকে উপহার দিতে গিয়ে বলেছে, "এমন সোনার হরিণ কি প্রাণে ধরে বাঘের মুখে দিতে পারে।" মানুষ অনেক নীচে নামলেও তার মনুষ্যত্ববোধ বিসর্জন দিতে পারে না। তাই পথে নবীন বসুকে দেখে সে লজ্জা পায়—"ও মা কি লজ্জা! বড় বাবুকে মুখ দেখালাম!—বলে মাথার ঘোমটা টেনে দেয়। পদী দুশ্চরিত্রা, পাপীয়সী, সে কেবল তার একার দোষে নয়। পদীর এই খলন তার স্বভাব ধর্মে নয় দারিদ্র্যের কারণে অর্থের প্রতি দুর্নিবার আকর্ষণ ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির তার এই পরিণতির জন্য দায়ী। পদী অধঃপতিত হলেও স্ত্রীধর্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি। রোগ সাহেবের ঘরে ক্ষেত্রমণিকে নিয়ে যাবার পর, ক্ষেত্রমণি ধর্ম রক্ষার জন্য ব্যাকুল হয়ে যখন পদীর সাহায্য চাইছে, অনুতপ্ত পদী বলেছে—"আমার জাতও গেছে, ধর্মও গেছে।" এই উক্তির মধ্যে যেন পদীর দীর্ঘ নিশ্বাস শুনতে পাওয়া যায়। সে পাপীয়সী কিন্তু ঘৃণার পাত্রী নয়। তারও যেন সামান্য করুণা প্রাপ্য।

নাট্যকার এছাড়াও তার নারী সুলভ মমতার আর একটি দিক তুলে ধরেছেন। পদী বলেছে, "আমিন.......বেটাই তো দেশ মজাচ্ছে। তা না হলে, আমার কি সাধ, কচি কচি মেয়ে সাহেবদের ধরে দিয়ে নিজের পায়ে কুড়ুল মারি।"

দীনবন্ধু পদী চরিত্র সৃষ্টিতে সমাজবাস্তবতার সঙ্গো সহানুভূতির মিশ্রণ ঘটিয়েছেন।

গোপীনাথ নীলকুঠির দেওয়ান, কুঠীর স্বার্থে কিছু অন্যায় কাজ করলে, ছয়মাস কারাদন্ড হলেও কাজে বহাল থাকে। সব ধরনের কুকর্মে গোপীনাথ পারঙ্গম। নীলকরদের লাভের জন্য প্রজাদের কয়েদ করা, গুদামে আটকে রাখা, অযথা পীড়ন, সামান্য দাদনের বিনিময়ে ভাল ভাল জমি নীলের জন্য চিহ্নিত করা—এ সবই তার কাজ। এতৎ সত্ত্বেও নীলকর সাহেবরা তাকে বিশ্বাস করে না। উডের ধারণা কুঠির কর্মচারীরা নীলের দাদনের টাকা চুরি করে, তাই নীল কমিশন বসেছে। এক্ষেত্রে গোপীনাথ সাহেবকে বুঝতে চেষ্টা করে যে তারা 'কসায়ের কুকুর'—সামান্য নাড়ীভুঁড়িতেই পেটের ক্ষুধা মেটায়। গোপীনাথ কারণে অকারণে লাঞ্ছিত হলেও তাকে সহজভাবে গ্রহণ করে। সাহেবের পদাঘাত সত্ত্বেও চটুল মন্তব্য করতে ছাড়ে না—"বেটা যেন আমার কলেজ আউট বাবুদের গৌণ পরা মাগ।"

সাহেবদের শত অত্যাচার সহ্য করেও কর্মে পারদর্শীতার জন্য পেস্কারি থেকে দেওয়ান পদে উন্নীত হয়েছে। যে কোন হীন কাজে তার দক্ষতা সীমাহীন হলেও, নাট্যকার চরিত্রে সামান্য সমবেদনার স্থান রেখেছেন। নবীন উড সাহেবের কুঠিতে গিয়ে সাধুচরণকে ছেড়ে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে অপমানিত হন। গোপীনাথ এতে অস্বস্তি বোধ করে নবীনকে বাড়ী চলে যেতে অনুরোধ করে। গোলোক বসুর অস্বাভাবিক মৃত্যু, সাবিত্রীর দুর্দশা গোপীনাথকে ব্যথিত করে। সে অনুশোচনা করে বলেছে, 'মিথ্যা মোকদ্দমা করে মানী মানুষটারে নষ্ট করলাম।

দীনবন্ধু মিত্র গোপীনাথকে শুধু দুষ্কর্মের প্রতীক রূপে আঁকেন নি, তার একটি সহানুভুতিশীল ও সামান্য সদগুণের পরিচয়ও তুলে ধরেছেন।

রোগ-উড দুজনই নীলকর। একই কুঠির বড় ও ছোট সাহেব। উড নীলের মুনাফা সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন—এ জন্য প্রজাপীড়ন, মিথ্যা মামলা, বিচারব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ প্রভৃতির মাধ্যমে কুঠির মুনাফার জন্য যে কোন ব্যবস্থা নিতে দ্বিধাহীন। তার নিজের ভাষায় "আমি বজ্জাতদের চাবুক দিয়েছি, গোরু কেড়ে আনিয়াছি জরু কয়েদ করিয়াছি"—কারণ এতে রায়তেরা সবচেয়ে বেশি জব্দ হয়। উডের মধ্যে কোন শালিনতাবোধ, মানবিকতাবোধ, ধর্মবোধ নেই। গোলোকের মৃত্যুর পর বসু পরিবারের অশৌচ অবস্থায় তাঁদের পুকুর পাড়ে নীলচাষের ব্যবস্থা করে। এ একমাত্র প্রতিহিংসা পরায়ণ মুনাফালোভী শ্বেতাঙ্গ-এর পক্ষেই সম্ভব। তোরাপের ভাষায়, "বেলাতের ছোটলোক।"

রোগ সাহেবও উডের মত অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক, মুনাফালোভী, স্বার্থপর, দুর্বিনীত নিম্নশ্রেণীর শেতাঙ্গ সমাজের উপযুক্ত—যে কোন সভ্য সমাজের কলঙ্ক স্বরূপ। পিপাসার্ত তোরাপ জল চাইলে বুটের গুঁতো দিয়ে বলেছে—"তোর মুখে পেসাব করে দেব।" তার অপর স্খলন স্ত্রীলোকের প্রতি তীব্র আসক্তি—সেখানে কোন বাছবিচার বা ধর্মবোধ নেই। অন্তঃসত্ত্বা ক্ষেত্রমণিকে বশে আনতে না পেরে তার পেটে লাথি মেরেছে। কুঠির লাঠিয়ালদের আঘাতে নবীন অচৈতন্য হয়ে পড়লে, রোগ তার ওপর তলোয়ার দিয়ে আঘাত করতে উদ্যত হয়েছে।

দীনবন্ধু হীন নীলকর চরিত্র অঙ্কনে এদিক থেকে সার্থক। এখানেও তার নির্লিপ্ত বস্তুনিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের প্রতি একান্ত সহৃদয়তার পরিচয় দিয়েছেন।

৮৩.৭ সারাংশ

দীনবন্ধুর নীল-দর্পণ নাটকের চরিত্র সৃষ্টির পেছনে নাট্যকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিদ্যমান। তিনি স্বশ্রেণীর চারিত্র্যধর্ম সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। কিন্তু তার অসামান্য কৃতিত্ব সমাজের নিম্নশ্রেণীর দরিদ্র চাষী ও তার পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনুপুঙ্খ অভিজ্ঞতা। নীলচাষীদের আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে নাটকটিতে সমান্তরালভাবে মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা যুক্ত হয়ে যাওয়ায় নাট্য ঘটনা বর্ণনায় অস্বাচ্ছন্দ অনুভব না করলেও, দুটি শ্রেণী চরিত্রের মধ্যে সম্যক সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি মধ্যবিত্ত থেকে অনেকাংশে বাস্তবসম্মত ও জীবন্ত। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন—'জীবন্ত আদর্শ মামনে রেখে চিত্রকরের মত তিনি ছবি আঁকতেন। কিন্তু এ ছবি সেখানেই সার্থকতার রূপ পেয়েছে, যেখানে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা প্রসূত।' এ নাটকের দরিদ্র কৃষক ও নিম্ন শ্রেণীর চরিত্র—তোরাপ, রাইচরণ-এর মত দৃঢ়চেতা কৃষক এবং আদুরীর মত দাসী, বাংলা সাহিত্যে বিরল।

তোরাপ সহায় সম্বলহীন দরিদ্র কৃষক হলেও, তার চারিত্রিক দৃঢ়তা যে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে অকুতোভয়ে রুখে দাঁড়াতে পরোয়া করে না। সে সুনিশ্চিত বিপদ সত্ত্বেও কুঠিতে প্রবেশ করে ক্ষেত্রমণি ও নবীনমাধবকে উদ্ধার করে এনেছে। সে আদিম আইনে বিশ্বাসী—দাঁতের বদলে দাঁত, চোখের বদলে চোখ—এটি সে একমাত্র বোঝে। কিন্তু এরও মধ্যে অন্তঃসলিলা প্রস্রবণের মত, তার হৃদয়ে শ্রেষ্ঠ মনুষ্যধর্ম বিরাজ করে—তারই বলে সে নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, অকৃত্রিম প্রভুভক্তি ও একান্ত মানবিক প্রীতির পরিচয় নাটকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি লাভ করেছে। চরিত্র আলোচনায় এ সবই সম্যক ব্যাখ্যাত।

সাধুচরণ ও রাইচরণ-দু'ভাইয়ের মধ্যে রাইচরণই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সাধুচরণ অনেকটাই আদর্শায়িত—হিসাবী, সাবধানী, সহিষ্ণু ও আপোষপন্থী, তার সংলাপ নাট্যসৃষ্ট ভদ্র চরিত্রগুলির সংলাপের মত আড়ষ্ট ও কৃত্রিম। পক্ষান্তরে, রাইচরণ একজন খাঁটি চাষা—গোয়ার, বেপরোয়া ও চিন্তালেশহীন, পেটের জ্বালার কাছে তার বিষয়চিন্তা বড় হয়ে ওঠেনি।

আদুরী নাট্যকারের অনবদ্য সৃষ্টি। বসু পরিবারের দাসী হলেও, সর্বত্র সে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে। নাটকের বিষাদঘন পরিবেশে সদা কৌতুকরস ধারার স্পর্শে সকলকে সঞ্জীবিত রেখেছে। তার রসাল ছড় ও সরস মন্তব্য স্ত্রীমহলকে হাসির ফোয়ারায় অবগাহন করিয়েছে। সব বিষয়েই তার নিজস্ব মত প্রকাশ করতে বিলম্ব করেনি। যেমন, নাড়ের বিয়ে দেয় যে সাগর, সে তার দলে নেই; দাড়ি প্যাঁজ না ছাড়লে সে কখনোই সাহেবের কাছে যাবে না, কুঠির বিবির পরপুরুষের সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে যাওয়া পছন্দ করে না—প্রভৃতি মন্তব্য অন্তঃপুরিকা মহলে তার গুরুত্ব বাড়াবার প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে। প্রভু পরিবারের

সঙ্গো আদুরীর আন্তরিক সম্পর্ক, তাঁদের দুঃখ বেদনায়, একান্ত একাত্মতা বোধ তার চরিত্রকে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য করে তুলেছে।

দীনবন্ধু তাঁর সর্বব্যপী সহানুভুতির গুণে গোপীনাথ পদীময়রাণীর চরিত্র তাঁর সমস্ত আন্তরিকতা নিয়ে এঁকেছেন। তাদের প্রতি নাট্যকার ঘৃণা প্রকাশ করেননি। গোপীনাথ নীলকর পদলেহী, লোভী, নীচ স্বার্থপর কর্মচারী বিশেষ। নাট্যকার তাঁর মধ্যেও একটি বেদনা করুণ সংবেদনশীল মনের পরিচয় তুলে ধরেছেন। পদীময়রাণী নষ্ট চরিত্রা কুট্টিনী, অনেকের সর্বনাশ করলেও একেবারে যে হৃদয়হীন হয়ে পড়েনি, নাট্যকার তা দেখিয়েছেন। সকলের কাছ থেকে ঘৃণা ও পরিহাস কুড়িয়েও সে নিজের কলঙ্কিত মুখটি সমাজের দৃষ্টি থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছে। নবীনমাধবকে দেখে সে বলেছে, ‘ও মা, কি লজ্জা বড়বাবুকে মুখখানা দেখালাম।’ পদী নিজের কাজ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন বলেই, নিজের প্রতি সে ধিক্কার দিতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। সে নিজে সাহেবের উপপত্নী হয়েও সাহেবের লালসা চরিতার্থের জন্য কচি কচি মেয়েদের ধরে এনে দেওয়া যে কত ঘৃণ্য তা সে অনুভব করে।

বসু পরিবারের মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলির মধ্যে নবীনমাধবই অপেক্ষাকৃত সক্রিয়, সে উৎপীড়নের প্রতিরোধ করতে গিয়ে সবংশে ধ্বংস হয়েছে। নীলকরের চক্রান্তে গোলোক বসু কারারুদ্ধ হন, সেখানে তিনি অপমানে আত্মহত্যা করেন। নীলকরদের প্রতিরোধ করতে গিয়ে নবীন কুঠির লেঠেলদের লাঠির ঘায়ে চরম শারীরিক আঘাতে মৃত্যুবরণ করেন। স্বামী পুত্রকে হারিয়ে সাবিত্রী শোকোন্মত্ত হয়ে ছোট বৌ-এর গলা টিপে হত্যা করেন, পরে হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নিজের কৃতকর্মের অনুশোচনায় মৃত্যুবরণ করেন।

৮৩.৮ নাটকের রস বিচার ঃ রস পরিণতি—ট্র্যাজেডি-মেলোড্রামা

নীল-দর্পণ নাটকের পরিণতি বিষাদান্তক হলেও নাট্যকার এটিকে যথার্থ অর্থে ট্র্যাজেডি নাটকের রূপ দিতে পারেন নি। নাটকে বেশ কয়েকটি মৃত্যু দৃশ্য আছে, এগুলি সাময়িক বেদনা সৃষ্টি করলেও করুণরস সঞ্চায়ক হয়নি। ট্রাজেডি করুণ রসাত্মক নাটক। এই নাটকে গোলোক বসুর উদ্বন্ধনে মৃত্যুসহ পরিবারের নানা বিপর্যয় চিত্র যা দৃশ্যমান হয়েছে, তার সবটাই প্রায় অন্ধ অমোঘ নিয়তি তাড়িত ঘটনা। এক্ষেত্রে নায়কের কোন প্রত্যক্ষ দোষ—তাঁর চরিত্রগত বিশেষ সীমাবদ্ধতা নাট্যকার তুলে ধরেননি। বস্তুতঃ এই নাটকে নবীনমাধব অন্যতম প্রধান চরিত্র হলেও, প্রকৃত নায়ক হয়ে ওঠেনি। তাই নায়ক চরিত্রের যে ছিদ্রপথ দিয়ে নায়কের তথা নাটকের ট্রাজেডি বা বিষাদান্তক পরিণতি ঘটে, তা বাস্তবে পরিস্ফুট হয়নি।

য়ুরোপীয় নাটকে ট্র্যাজেডি দুই রকম—(১) গ্রীক ট্র্যাজেডি ও (২) সেক্সপীরীয় বা রোমান্টিক ট্র্যাজেডি। ট্র্যাজেডির উদ্ভব গ্রীসদেশে ডায়োনিসাস, দেবতার তুষ্টি বিধানের জন্য, সমবেত কণ্ঠে যে স্তোত্র আবৃত্তি করা হোত তা থেকে ট্র্যাজেডির উদ্ভব। এই ট্র্যাজেডিতে স্থান-কাল ও গঠনগত ঐক্য—এই তিনটির প্রাধান্য

ছিল। তিনজন গ্রীক নাট্যশিল্পী—ঈস্কাইলাস, সফোক্লিস ও ইউরিপিদিস। পরবর্তীকালে অ্যারিস্তোতল, তাঁর পোয়েটিকস্' গ্রন্থে সবিস্তারে ট্র্যাজেডি বা বিষাদান্তক নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেন।

পরবর্তীকালে ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগে মানুষ সম্পর্কে আগ্রহ, বস্তুবিশ্ব সম্পর্কে চেতনা ও উচ্চ কাব্যরস সমৃদ্ধ প্রকাশভঙ্গী ট্র্যাজেডির ধারার পরিবর্তন ঘটায়। সেক্সপীয়র এই পরিবেশে আবির্ভূত হন। সেক্সপীয়রের নাটকের নায়ক-নায়িকাদের স্বকীয়তা আছে, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির প্রতীক তাঁরা, শৌর্য-বীর্য সম্পন্ন হৃদয়বোধের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও, চরিত্রের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কোন আতিশয্য বা ত্রুটির জন্য, পরিণামে বিষাদান্তক পরিণতির শিকার হন। পক্ষান্তরে, গ্রীক নাটকের নায়কেরা অকারণে বা দৈববশে, আকস্মিক কোন ঘটনার আবর্তে অজ্ঞেয় অন্ধ-ক্রুর নিয়তির দ্বারা আক্রান্ত হন। নায়ক এখানে নিয়তির হাতে ক্রীড়ণক মাত্র, তাঁর পৌরুষ তাঁর শৌর্য-বীর্য এখানে সবই ব্যর্থ। কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকের নায়ক অসাধারণ বলবীর্যের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তাঁর চরিত্রের রন্ধ্রপথে কতকগুলি দোষ-ত্রুটির প্রবেশ করে, যার ফলে সর্বনাশা বিষাদান্তক পরিণাম অনিবার্য হয়ে ওঠে। নায়ক নিজেই ফলতঃ তাঁর পরিণতির জন্য দায়ী হন।

'নীল-দর্পণে' ট্রাজেডির উপকরণ আছে। অসহায় প্রজাদের ওপর ইংরেজ নীলকরদের নির্মম অত্যাচার নাটকের বর্ণনীয় বিষয়। বসু ও সাধুচরণ রাইচরণ পরিবারের বিপর্যয় নাটকের মূল বিষয়বস্তু। নীলকরদের চক্রান্ত ও মিথ্যা মামলায় গোলোক বসুর হাজত বাস ও উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা, উডের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে নীলকরদের লাঠিয়ালদের আঘাতে নবীনমাধবের মাথায় আঘাত, রক্তক্ষরণ, মৃত্যু। স্বামীপুত্রের এই আকস্মিক মৃত্যুতে জননী সাবিত্রীর মানসিক ভারসাম্যের অভাব, পুত্রবধু সরলতাকে হত্যা, পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে স্বকৃত কর্মের জন্য অনুশোচনা ও মৃত্যু। বসু পরিবারের এই শোকাবহ ঘটনার পাশাপাশি সাধুচরণের একমাত্র কন্যা ক্ষেত্রমণি রোগ সাহেব কর্তক ধর্ষিতা ও লাঞ্ছনার ফলস্বরূপ গর্ভপাত হেতু অকাল মৃত্যু—এই পাঁচটি মৃত্যুর ঘটনা নাটকটিকে গভীর কারুণ্যে ভারাক্রান্ত করলেও, যথার্থ ট্র্যাজেডি হতে পারেনি। কারণ মৃত্যু ট্র্যাজেডির শেষ কথা নয়, জীবনের সকল সম্ভাবনার শোকাবহ অপচয়ের কারুণ্য ট্র্যাজেডির উৎস।

নীল-দর্পণ নাটকের অন্যতম প্রধান চরিত্র নবীনমাধবের মধ্যে ট্র্যাজেডির নায়কের যে অনমনীয় সংলাপ ও দৃঢ়তা পরিলক্ষিত হয়, তার একান্ত অভাব আছে। তাঁর চরিত্রে নৈতিক ও অপরাপর গুণাবলী বিদ্যমান। তিনি প্রজাহিতৈষী, তাদের দুঃখ বেদনায় পাশে দাঁড়ান। নীলকরদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য তিনি চলে যেতে পারেননি, প্রজাদের কথা ভেবে। সাধু রাইচরণের ফসলের জমিতে উড দাগ দিয়ে দাদন নেবার জন্য বাধ্য করতে উদ্যত হলে, নবীন তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। সাধুর কন্যা ক্ষেত্রমণিকে তোরাপের সাহায্যে রোগ সাহেবের কুঠি থেকে উদ্ধার করেছে প্রভৃতি ঘটনা থেকে নবীনের মহানুভবতার, নির্ভীকতা ও দৃঢ়তার পরিচয় পাওয়া গেলেও ট্র্যাজেডির নায়কের অনমনীয় সংকল্পদৃঢ় মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়নি। ফলে নাটকের অঙ্গীরস করুণ হলেও ট্র্যাজেডি হয়নি। পরিবর্তে নাটকের পাঁচ পাঁচটি অবাঞ্ছিত মৃত্যুদৃশ্য কার্যতঃ কোন কার্যকারণ সূত্রে বিধৃত নয়। পাঁচটি জীবনের অপচয় মর্মান্তিক হলেও,

তা নায়ক চরিত্রের কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা জনিত, কার্যকারণ সুত্রে আবদ্ধ ঘটনার পরিণতি নয়। তাই নীল-দর্পণ রোমক নাট্যকার সেনেকার নাটকের লোমহর্যক বিভীষিকা (horror) ও অতি নাটকীয় ঘটনার বাহুল্যে মেলোড্রামা বা অতিনাটকীয় হয়ে উঠেছে। মৃত্যুর সমারোহে করুণরসের আতিশয্য নাট্যকারের শিল্পবোধের সীমাবদ্ধতাকে তুলে ধরেছে। ফলে অতিনাটকীয় পরিণতি অনিবার্য হয়েছে। ট্র্যাজেডির সঙ্গে মেলোড্রামার পার্থক্য হোল "It tended to become increasingly more sensational" নাটকের শেষ দৃশ্যে অঙ্কিত চরিত্রগুলির আচরণ ও সংলাপ কারুণ্য সঞ্চারী হলেও অযথা অসংযত ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে।

৮৩.৯ নীলদর্পণ নাটকের সংলাপ ঃ আলোচনা ও বিশ্লেষণ

সংলাপ নাটকের প্রকাশ মাধ্যম, নাটকের প্রাণ। সংলাপ নাটকীয় চরিত্রগুলিকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। বাস্তবানুগ সংলাপ জীবন্ত চরিত্র সৃষ্টির যেমন সহায়ক তেমনি নাটকে গতিবেগ সঞ্চারের অনুকুল। সংলাপ আড়ষ্ট ও মন্থর হলে নাট্যরস সঞ্চারে বাধার সৃষ্টি হয়। সংলাপ আবেগ, জীবনের নানা ভাবমূর্তি প্রকাশে, চরিত্রানুগ সঙ্গতি রক্ষা করে রচিত হলে নাটক শিল্পসমৃদ্ধ হয়। সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যম ভাষা। দীনবন্ধুর সময়েও গদ্য সুনির্দিষ্ট ভাব প্রকাশক হয়ে ওঠেনি। তাই দীনবন্ধু নাট্যসংলাপ রচনায় কিছুটা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। এই দ্বিধার কারণেই তিনি সমাজের দুটি স্তরের মানুষের সংলাপ রচনায় দুটি ধারার প্রবর্তনা ঘটিয়েছেন। নাটকের উচ্চশ্রেণীর চরিত্রগুলি, সামান্য আলোকপ্রাপ্ত বিধায় তাঁদের মুখে সমকালীন সন্ধি-সমাসবহুল সাধু গদ্য ভাষার প্রয়োগ করেছেন। আর দরিদ্র নিরক্ষর রায়তদের মুখে আঞ্চলিক দোষদুষ্ট অমার্জিত গ্রাম্য ভাষা ব্যবহার করেছেন। বসু পরিবার এবং তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রে স্বল্প শিক্ষিত সাধুচরণ তৎকালে প্রচলিত সাহিত্যিক গদ্য রচনায় ব্যবহৃত সংস্কৃত ঘেঁষা সাধুভাষা ব্যবহার করেছেন, যা কোন অঞ্চলেরই সজীব মুখের ভাষা নয়। যেমন—

নবীন। (দীর্ঘ নিশ্বাস) হে মাতঃ পৃথিবী। তুমি দ্বিধা হও, আমি তন্মধ্যে প্রবেশ করি। এমন অপমান আমার জন্মেও হয় নাই—হা বিধাতঃ। (১/৩)

সৈরিন্ধ্রী। প্রাণনাথ তোমাকে কাতর দেখিলে আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে। আমার কপালে এত যাতনা প্রাণকান্তের এত দুর্গতি দেখিতে হলো..............। (৩/২)

সাধুচরণ। নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিত দ্বারা নির্বাপিত করিলেন। (৪/৩) বিকৃত মস্তিষ্ক সাবিত্রী পুত্রবধু সরলতাকে গলা টিপে হত্যা করার পর সরলতার স্বামী বিন্দুমাধব মাকে সম্বোধন করে বলেছে, "আপনার যদি এক্ষণে শোকদুঃখ বিস্মারিকা ক্ষিপ্তপর অপগম হয়, তবে আপনিও সরলতা বধজনিত মনস্তাপে প্রাণত্যাগ করেন।"(৫/৪)

এই কৃত্রিম সাধুভাষা ব্যবহারের ফলে, সাহিত্যের সত্যকে যথার্থভাবে প্রকাশ করা যায়নি। ফলে বসু পরিবারের মর্মান্তিক পরিণাম আমাদের মনকে কোনভাবেই প্রভাবিত করেনি।

অথচ ভদ্রেতর চরিত্রগুলির সংলাপ অনেকটা বাস্তবোচিত হওয়ায় চরিত্রগুলিও জীবন্ত ও বিশ্বাসযোগ্য হয়েছে। তোরাপ, আদুরী, ক্ষেত্রমণি, রাইচরণ প্রভৃতির নাট্যসংলাপ অনেকটা বস্তুনিষ্ঠ ও সজীব। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় দীনবন্ধুর ভাষার বাস্তবধর্মের জন্য একটা আস্ত তোরাপ...................আদুরী ও ক্ষেত্রমণিকে পেয়েছি। দৃঢ়চেতা তোরাপ গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেবে না। এজন্য তাকে বেগুনবেড়ের কুঠিতে অন্যান্য রায়তদের সঙ্গে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উড সাহেবের শ্যামচাঁদের আঘাতে সকলেই জর্জরিত, কেউ বা সাহেবের 'প্যারেক মারা' জুতোর আঘাতে রক্তাক্ত। তোরাপ এ সব অভিজ্ঞতার কথা শুনে বলেছে, 'সমিন্দিরে অ্যাকবার ভাতারমারির মাটে পাই, এমনি বাপ্পোর ঝাঁকি, সমিন্দির চাবালিডে আসমানে উড়য়ে দেই, ওর গ্যাডম্যাড করা হের ভেতর দে বার করি'। এই ভাষা রুচির দিক থেকে আপত্তিকর বোধ হলেও গ্রাম্য চাষার প্রাণের ভাষা। তোরাপ পল্লীবাংলার রায়ত সমাজের প্রতিনিধি।

আদুরী বর্ষীয়সী পরিচারিকা। তার স্থূল গ্রাম্য পরিহাস শালীনতার গণ্ডী মেনে চলে নি। একে রুচির দোহাই দিয়ে নিন্দা করলে, বাস্তবজীবন বোধের পরিচায়ক হোত না। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় "কাটা আদুরীকে' পেতাম। সৈরিন্ধ্রী রান্নাঘরের ডানদিকে গেলে, সে ভিন্নার্থে সেটিকে গ্রহণ করে বলেছে, 'মুই ভাল হতে গ্যালাম ক্যান। মোপার কপালের দোষ। ক্ষেত্রমণিকে ছোট সাহেবের কুঠিতে নিয়ে যাবার কথা শুনে আদুরী বলেছে, "থু, থু, থু, গোন্দো। প্যাজির গোন্দো। সাহেবের কাছে কি মোরা যাতি পারি। থু, থু,! আদুরীর এই ভাষা গ্রাম জীবন থেকে স্বতোৎসারিত নিখাদ জীবনবোধের নিবিড়তায় দর্শক, পাঠকের মনকে সহজেই স্পর্শ করেছে। 'নীল-দর্পণ নাটকে' দীনবন্ধু মিত্র ব্যবহৃত ভাষা কোন বিশেষ জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, কিন্তু তাঁর নাট্যসংলাপ নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলিকে জীবন্ত ও স্বাভাবিক করে তুলতে সাহায্য করেছে।

৮৩.১০ সারাংশ

সেক্সপীয়রের নাটক থেকে বাংলা নাটকে ট্র্যাজেডির ধারণা গড়ে উঠেছে। সেখানে জীবনের সুখ দুঃখ বেদনার নানা ঘাত প্রতিঘাত, নিয়তির বিরুদ্ধে পৌরুষের সংগ্রাম ও তার পরিণতি নাট্যকার যুক্তিযুক্তভাবে উপস্থিত করেন। এক্ষেত্রে দৈবের সঙ্গে পুরুষকারের সংগ্রাম প্রায়ই বিষাদান্ত পরিণতিতে শেষ হয়।

দীনবন্ধু মিত্র তাঁর নাটকে সেক্সপীয়রীয় রীতি আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রচনা করেছেন। 'নীল-দর্পণ' করুণ রসাত্মক নাটক হলেও ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠেনি।

গ্রীক নাট্যাদর্শে নিয়তির অমোঘ শক্তি, মান্যতা পেয়েছে। দুর্ভাগ্য অকস্মাৎ এসে মানুষকে বিপর্যস্ত করেছে। কিন্তু সেক্সপীয়রীয় নাটকে ট্র্যাজেডির বীজ নায়ক চরিত্রে উপ্ত থাকে। বহুগুণের আধার হয়েও সামান্য ত্রুটির জন্য তার জীবনে বিপর্যয় ঘটে।

নীল-দর্পণে ট্র্যাজেডির উপকরণ থাকা সত্ত্বেও যথার্থ ট্র্যাজেডি হয়ে ওঠেনি। দুই প্রতিপক্ষ সমশক্তির অধিকারী নয়, বিষম এ সংগ্রামে দুর্বলের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। ফলতঃ এই নাটকের সংঘাত একান্তই অসম হওয়ায় পাঠকের মনে করুণার সঞ্চার হয়, গভীর উৎকণ্ঠা বা ভীতি-বিহ্বলতা সঞ্চার করে না। বরং পাঁচ পাঁচটি মৃত্যুর ঘনঘটা দর্শক পাঠককে বিমর্ষ ও কারুণ্যে ভারাক্রান্ত করলেও, মৃত্যুদৃশ্যের বাহুল্য বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি, ফলে ট্র্যাজেডি হয়নি। মৃত্যু দৃশ্যের আতিশয্য রোমাঞ্চকর পরিবেশ রচনা করেছে, ফলে নীল-দর্পণ অসংযত ঘটনা ভারাক্রান্ত হয়ে মেলোড্রামা বা অতিনাটকীয় হয়েছে।

'নীল-দর্পণ নাটকের' ভাষা স্পষ্টতঃ দুভাগে বিভক্ত। সম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবার আর রায়ত এবং গ্রাম্য নিরক্ষর নারী সমাজের ভাষা সবদিক থেকে স্বতন্ত্র। মধ্যবিত্ত চরিত্রগুলি মাটির সংস্পর্শহীন, সংস্কৃত প্রভাবিত কৃত্রিম সাধুভাষা ব্যবহার করায় তাদের সংলাপ হয়েছে নিষ্প্রাণ ও আড়ষ্ট। অপরদিকে তোরাপ, রাইচরণ, ক্ষেত্রমণি, আদুরী প্রভৃতির মুখে নাট্যকার যে ভাষা ব্যবহার করেছেন, তা বাস্তবোচিত ও স্বভাবধর্মে জীবন্ত। ফলতঃ নিম্নশ্রেণীর চরিত্রগুলি প্রাণধর্মে সজীব ও স্বাভাবিক হয়েছে।

৮৩.১১ নীলদর্পণ নাটকের দোষগুণ বিচার

নীলদর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই নাটকের মাধ্যমে নীলকুঠির অত্যাচারী সাহেবদের শোষণ-পীড়নের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রচেষ্টা একটি রাজনৈতিক আন্দোলনের বাতাবরণ তৈরি করেছিল। যশোর, খুলনা, নদীয়ার নীলচাষীদের সম্মিলিত প্রতিবাদ নীল কমিশনের মাধ্যমে নীলকরদের সংযত করতে প্রয়াস পেয়েছিল। সমাজকল্যাণ সাধনায় এই নীল-দর্পণ নাটকের সবিশেষ গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও, নাটকটি দোষ-ত্রুটি মুক্ত নয়।

নীলকরদের অত্যাচার ও অন্যায় শোষণের স্বরূপ তুলে ধরবার জন্য নাট্যকার দুটি পরিবারের বিপর্যয়ের চিত্র আঁকতে গিয়ে নীলকর সাহেবদের অসংগত অর্থলোভের চিত্র নিপুনতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। গোলোক বসু ও সাধুচরণের পরিবারের প্রতি নীলকরদের অন্যায় নিপীড়নের বর্ণনা দিতে গিয়ে গোলোকের ধানজমি গ্রাস করা, পুকুরপাড়ের জমি নীলচাষের জন্য চিহ্নিতকরণ, সাধুচরণের সাঁপোলতলার জমিতে দাগ দেওয়া, প্রভৃতি ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। নীলদর্পণ নাটক এই দুই পরিবারের ওপর নিপীড়ন ও অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে গড়ে উঠেছে। কিন্তু দুটি কাহিনী সর্বতোভাবে একান্ত হয়ে ওঠেনি— স্বতন্ত্র রয়ে গেছে।

এই নাটকে সাধুচরণ পরিবারের সঙ্গে বসু পরিবারের মমতার সম্পর্ক থাকলেও, নাট্য কাহিনী দুইয়ের মধ্যে সংহতি সাধন করতে পারেনি। গোলোক বসু ও সাধুচরণের পারিবারিক কাহিনী নিজ নিজ গতিপথ অনুসরণ করে চলেছে। ক্ষেত্রমণির ওপর রোগ সাহেবের নিপীড়ন ও গর্ভপাতে তার মৃত্যু বসু পরিবারের কাহিনীর সঙ্গে অন্বিত হয়নি। এর ফলে নাটকের মূল কাহিনীর সঙ্গে একাধিক উপকাহিনী যুক্ত হওয়ায় ঘটনায় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা গেলেও, কোন রকম সংহতির পরিচয় পাওয়া যায়নি। তাই বলা যায় নীল-

দর্পণের বর্হিঘটানাধীন, কেন্দ্রীয় চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত না হওয়ায় কাহিনী বিন্যাসে শিথিলতার পরিচয় আছে।

যে কোন শিল্পকর্ম সৃষ্টির পেছনে, স্রষ্টার একটি বক্তব্য প্রচ্ছন্ন থাকে। দীনবন্ধুর এই নাটক রচনার প্রধান প্রেরণা নীলকরদের অত্যাচারের রূপটি সবিস্তারে তুলে ধরা। প্রজাপুঞ্জের প্রতি তাঁর সর্বব্যাপিনী সহানুভুতি নীলকরদের অত্যাচার অনাচারের মাত্রাতিরিক্ত বর্ণনায়, শিল্পীসুলভ কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। সে সংযম, পরিমিতি বোধ ও বিচার-বিশ্লেষণ ক্ষমতা থাকলে দৃশ্যমান জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার উপাদানগুলি গ্রহণ- বর্জনের মধ্য দিয়ে আঁকা যা, দীনবন্ধুর সে শক্তি ছিল না। তিনি সংঘটিত ঘটনাবলীর বাস্তব চিত্র আঁকতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তাকে শিল্পসম্মত উপস্থাপনার দ্বারা রসসঞ্চার করতে পারেননি। তিনি বস্তুতঃ নাট্যক্রিয়া ও নাট্যরসের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ফলে নীল-দর্পণ হয়েছে মুখ্যতঃ প্রচার ও উদ্দেশ্যমূলক রচনা। রসসমৃদ্ধ নাটক না হয়ে, হয়েছে কতকগুলি খণ্ডিত নাট্যচিত্রের সমাহার।

নীল-দর্পণের অপর ত্রুটি মধ্যবিত্ত ভূস্বামী শ্রেণীর চরিত্র চিত্রণে ব্যর্থতা। দীনবন্ধুর মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম, লালন ও শিক্ষা। কর্মসুত্রেও তিনি মধ্যবিত্ত জীবন যাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। তথাপি তাঁর আঁকা বসু পরিবারের চিত্র বাস্তবতার স্পর্শবর্জিত ও তাঁদের সংলাপ কৃত্রিম সাধুভাষা প্রভাবিত। পক্ষান্তরে, দরিদ্র রায়ত শ্রেণীর চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ দীনবন্ধুর, অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল অসহায়, শোষিত মানুষগুলি তাঁর সহানুভূতি বেশি করে আকর্ষণ করেছে এবং এঁদের সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাও ছিল ব্যাপক ও গভীর। কিন্তু সে তুলনায় প্রাগসর নবোদ্ভুত মধ্যবিত্ত সমাজ অসহায় ছিল না, দীনবন্ধুর সহানুভুতি তাঁদের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি, ফলে চরিত্র সৃষ্টিতেও সীমাবদ্ধতা প্রকট হয়েছে।

দীনবন্ধু নাট্য সংলাপ রচনায় যে রীতিমত দ্বিধাগ্রস্থ ছিলেন, তা বোঝা যায় সমাজের দুটি শ্রেণীর সংলাপের ভাষা প্রয়োগ থেকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী চরিত্র সৃষ্টিতে তিনি কিছু উন্নত আদর্শ আরোপ করতে গিয়ে চরিত্রগুলির স্বাভাবিকতার সীমা লঙ্ঘন করেছেন। নবীনমাধব, বিন্দুমাধব, সৈরিন্ধ্রী, সাবিত্রী চরিত্রগুলি আদর্শায়িত হওয়ায় এরা বাস্তবজীবনের সংস্পর্শহীন আদর্শলোকে বিচরণ করেছে। ফলতঃ এঁদের মুখের ভাষা বাস্তববর্জিত কৃত্রিম সাহিত্যিক সাধু গদ্য ব্যবহারে ভারাক্রান্ত হয়েছে। নাটকে ব্যবহৃত ভাষা একদিকে যেমন ভাবপ্রকাশ করে, অপরদিকে নাটকের গতি সঞ্চারে সহায়তা করে। ভদ্র চরিত্রের ভাষায় প্রবাহমানতা না থাকায়, তা স্বাভাবিক হয়নি।

নীল-দর্পণ নাটকে ক্রোধান্ধ তোরাপ বা পরিহাসপ্রিয় আদুরী সরলতার সঙ্গে রঙ্গাচ্ছলে যে ভাষা ব্যবহার করেছে, তা সর্বত্র শালীনতা রক্ষা করেনি, অনেক সময় কুরুচিপূর্ণ গ্রাম্যতায় আচ্ছন্ন। আধুনিক মার্জিত রুচিবোধের মাপকাঠিতে এগুলি অশ্রাব্য মনে হলেও, দীনবন্ধুর সমকালে রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের স্থূলরুচির যুগে, অনেকটা স্বাভাবিক ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, “আগেকার লোক

কিছু মোটা কাজ ভালবাসিত, এমন সরুর উপর লোকের অনুরাগ। তাই একালের পাঠকের কাছে নীল-দর্পণ নাটকের ভাষা স্বভাবতই স্থূলরুচির পরিচায়ক মনে হতে পারে।

৮৩.১২ নীলদর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব পর্যালোচনা

অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে বাংলাদেশে রঞ্জক দ্রব্য হিসাবে নীলচাষের প্রবর্তন হয়। নীলকুঠির ইংরেজ কুঠিয়ালরা মুনাফার লোভে প্রথমে চাষীদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে পরে ছলেবলে কৌশলে বা বলপ্রয়োগে নীল চাষে বাধ্য করত। মাত্রাতিরিক্ত অর্থসামর্থ্যে বেপরোয়া মনোভাব নিয়ে পাইক বরকন্দাজ, লাঠিয়াল নিয়োগ করে কুঠিগুলিকে দুর্গে পরিণত করেছিল। দীনবন্ধুর ডাকবিভাগের পরিদর্শক হিসাবে বাংলাদেশের জেলাগুলির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগ ছিল। নীলচাষীদের সীমাহীন দুরবস্থা দেখে তিনি আন্তরিক বেদনা অনুভব করেন। ইতিমধ্যে দেশের সংবাদ-সাময়িক পত্রিকায় ইতঃস্তত প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' এই প্রেক্ষাপটে রচিত। নীল-দর্পণ সমকালীন ঘটনাবলীর জীবন্ত চিত্র কিন্তু ঐতিহাসিক নাটক নয়। ইতিহাসের কোন বিশেষ পাত্রপাত্রী এ নাটকের নায়ক বা নায়িকা নয়। কাহিনীর একটি বাস্তব ভিত্তি আছে; পূর্বাপর কাল্পনিক নয়। দীনবন্ধু সংবাদপত্রে প্রকাশিত নদীয়ার গুয়াতোলির মিত্র পরিবারের দুর্দশাকাহিনী অবলম্বনে তাঁর নাটক রচনা করেন। এর মধ্য দিয়ে তিনি প্রজাকুলের অর্থনৈতিক শোষণ-পীড়নের রূপটি তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছেন। এদিক থেকে নাটকটি সমকালীন সমাজজীবনের দলিলরূপে গৃহীত হতে পারে। একদা আমেরিকার কালা মানুষদের দাসত্বমোচনের অভিপ্রায়ে 'টমকাকার কুটি'র রচিত হয়েছিল, নীল-দর্পণ দাদন গ্রহণে অনিচ্ছুক মধ্যবিত্ত ও দরিদ্র রায়তদের পক্ষে দাঁড়িয়েছিল। 'নীল-দর্পণ' কুঠিয়ালদের অত্যাচারের স্বরূপ তুলে ধরে অত্যাচার পীড়িত বাঙালির সমাজজীবনের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাটক শান্তিপূর্ণ অথচ জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলবার প্রেরণা জুগিয়েছে। নীল-দর্পণ অভিনয়ের সাফল্যে দেশবাসী সকল ঘটনার প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়ে সমগ্র দেশকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। রেভারেণ্ড লঙ্ প্রকাশিত নীল-দর্পণের ইংরেজি অনুবাদ, নীল আন্দোলনকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরেছে। এখানেই নাট্যকার ও নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব।

৮৩.১৩ সারাংশ

নীল-দর্পণ নাটকে ইংরেজ কুঠিয়ালদের মাত্রাতিরিক্ত অত্যাচার ও অনাচারের পরিচয় দিতে নাট্যকার শিল্পীসুলভ উচ্চাঙ্গের কল্পনাশক্তির পরিচয় দিতে পারেননি। যা ঘটে, তাই সত্যি নয়। দৃশ্যমান জগতের অগণিত ঘটনা প্রবাহের মধ্য থেকে গ্রহণ-বর্জন প্রক্রিয়ায় জীবনসত্যকে প্রকাশ করতে হয়। দীনবন্ধু বাস্তব অভিজ্ঞতাজাত ঘটনার চিত্র এঁকেছেন, তা যথার্থ শিল্পরূপ লাভ করতে পারেনি। ফলে নীল-দর্পণ প্রচারধর্মী ও উদ্দেশ্যমূলক হয়েছে।

এই নাটকের কোন একটি চরিত্রকে নায়ক বলা যায় না। কোন একটি ব্যক্তি বা নায়কের জীবনের অন্তর্দ্বন্দ্ব মূল ঘটনাকে নিয়ন্ত্রিত করেনি। নাটকীয় ঘটনা সংঘাতও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ফলে 'নীল-দর্পণ' প্রয়োজনীয় সংহতি ও গাঢ়বন্ধরূপ পায়নি। কতকগুলি নাটকীয় খণ্ডচিত্রের সমাহারে পরিণত হয়েছে।

নীল-দর্পণ নাটকে মধ্যবিত্ত বসু পরিবারের চরিত্রচিত্রন ও তাদের মুখের ভাষা ব্যবহারে স্বাভাবিকতা রক্ষা করতে পারেননি। অঙ্কিত চরিত্রগুলি এরফলে নিষ্প্রাণ ও অস্বাভাবিক হয়েছে। প্লট গঠনের ক্ষেত্রেও ঘটনা পরম্পরা সর্বত্র কার্যকারণসূত্রে আবদ্ধ হয়নি। নীল-দর্পণে বর্ণিত নীলকর সাহেবদের অত্যাচার, অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা সর্বদেশের ও সর্বকালের ঘটনা। দীনবন্ধু এই ঘটনা পরম্পরাকে সার্থক ট্র্যাজেডির রূপ দিতে পারেন নি। নাটকীয় ঘটনাকে কার্যকারণ সূত্রে বিষাদান্ত পরিণতি অনিবার্য করে তোলে, দীনবন্ধু, তা সাফল্যের সঙ্গে তুলে ধরতে পারেননি। নাটকে পাঁচটি মৃত্যু কার্যকারণসূত্রে গ্রথিত হয়নি। ফলে নীল-দর্পণের ট্র্যাজেডির উপাদান থাকলেও বাস্তবে অতিনাটকীয় (মেলোড্রামা) হয়েছে।

তথাপি, নীল-দর্পণ নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। নীলকরদের স্বেচ্ছাচারিতা, অসংযত আচরণ, দীনবন্ধুর নীল-দর্পণ নাটক রচনা ও মধুসূদনকৃত অনুবাদ, প্রকাশক হিসেবে পাত্রী লঙ্ সাহেবের অনমনীয় দৃঢ়তায় বহুল প্রচারের সুযোগ পেয়েছিল। এরফলে নীলকরদের আচরণ অনেকটা সংযত হয়েছিল। এই নাটকের মাধ্যমে শোষণ নির্যাতনক্লিষ্ট বাঙালী মধ্যবিত্ত ও কৃষক সম্প্রদায় প্রতিবাদী মনোভাব নিয়ে কোথাও কোথাও সংঘবদ্ধভাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিল। সমকালীন লেখকদের মধ্যে একমাত্র দীনবন্ধুই এই যুগান্তকারী ঘটনার অবতারণা করে ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

৮৩.১৪ অনুশীলনী

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তরশেষে ১১১ পৃষ্ঠার উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

১) **নীচের শব্দগুলির অর্থ লিখুন ঃ**
কবুল, কসম, কসুর, কুড়ো, গস্তানি, গিধ্বড়, চাবালি, ঝরকা, টিকিরি, ডর্‌কা, তেরোনাল, নোনাফেনা, পয়জার।

২) "আমাদের কালেজ নাই, কাছারী নাই, ব্রাহ্ম সমাজ নাই," —বক্তা কে? কি প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছেন?

৩) "দাদন গাদালিই তো হয় না, চসা চাই।" —বক্তা কে? কাকে বলেছেন? প্রসঙ্গটি কি?

৪) "আহা জমি তো না, য্যান সোনার চাঁপা"। —কে, কোন প্রসঙ্গে এ কথা বলেছে?

৫) "সেই সাগর নাড়ের বিয়ে দেয়, ছ্যা!" বক্তার নাম উল্লেখ করে মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

৬) "আমরা হুজুর, কসায়ের কুকুর,—নাড়ীভুঁড়িতেই উদর পূর্ণ করি।" বক্তা কে কাকে বলেছেন? মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৭) “নীল-দর্পণ বিষাদান্তক নাটক।” আলোচনা করুন।

৮) “নীল-দর্পণ” নাটকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।

৯) নীলদর্পণ নাটকের দোষ-গুণ বিচার

১০) নীল-দর্পণের নাট্য সংলাপ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮৩.১৫ উত্তর সংকেত

১) স্বীকার, সম্মত; দিব্যি, শপথ; দোষ; অপরাধ; বিঘা, জমির মাপ; কুলটা, দুশ্চরিত্রা; শকুন, শেয়াল চোয়াল; জানালা; ঠিকা মজুর; উঠতি বয়সের (ছেলে বা মেয়ে); তরোয়াল; অনুর্বর, চটি জুতা বা জুতা।

২) বিরহকাতর সরলতা, বিন্দুমাধবের প্রতীক্ষায় ছিল। শহরে জরুরী কাজের জন্য সে আসতে পারবে না। সরলতা এই পরিস্থিতিতে তাঁর হৃদয় বেদনার কথা প্রকাশ করতে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। তাঁর কথায় তাঁরা একান্তই অন্তঃপুরিকা, বাইরের জগতের সঙ্গে সম্পর্ক রহিত, ফলে মনের ভাব কমাবার ন্যূনতম আয়োজনও তাঁদের নেই।

৩) ৩য় অঙ্ক ৩য় দৃশ্যে তোরাপ নবীনবসুর সঙ্গে রোগ সাহেবের কামরায় জানলার খড়খড়ি ভেঙে প্রবেশ করে ক্ষেত্রমণিকে উদ্ধার করতে যায়। সেখানে রোগ সাহেব তাদের দেখে স্তম্ভিত। তোরাপ রোগের গলা ও গাল টিপে ধরে, কাল মলে ওহাঁটু দিয়ে গুঁতো দেয়। পরিশেষে রোগ সাহেবকে স্মরণ করিয়ে দেয় নীলবোনার জন্য বলপূর্বক দাদন দিলেই হয় না, চাষীর চাষ করবার ক্ষমতা আছে কিনা সেটাও দেখা দরকার।

৪) ১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্কে রাইচরণ, তাদের সোনার চাপা সদৃশ্য চাষের জমিতে নীলবোনার জন্য চিহ্নিত করায় ক্ষুব্ধ হয়ে এ মন্তব্য করেছে।

৫) ১ম অঙ্ক ৪র্থ গর্ভাঙ্কে আদুরীর মন্তব্য। মূল প্রসঙ্গ হোল সৈরিন্ধ্রী ছোট বৌ সরলতাকে বিদ্যাসাগরের বেতাল পঞ্চবিংশতি পড়ে শোনাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করে। আদুরী বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গ উত্থাপনেই, তাঁর বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গ স্মরণে, তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে।

৬) ৫ম অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্কে গোপীনাথ দেওয়ান উড সাহেবের উদ্দেশ্যে বলেছে। সাহেবের উচ্ছিষ্টে তাদের জীবন যাপন। সাধারণ জমিদারের মত প্রজার কাছ থেকে প্রাপ্য খাজনা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকলে, আমীন খালসার প্রয়োজন হোত না। নীলকুঠিরও দুর্নাম হোত না। তাদের নানারকম হেনস্তা হতে হোত না।

৭) ৩.৮ অংশের আলোচনা অনুসরণে উত্তর তৈরী করুন।

৮) ৩.১২ অংশের আলোচনা ভালো করে পড়ে উত্তর তৈরী করুন।

৯) ৩.১১ অংশের আলোচনা পড়ে উত্তর করুন।

১০) ৩.৯ অংশের সংলাপ আলোচনা ও বিশ্লেষণ অবলম্বনে উত্তর তৈরী করুন।

৮৩.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১) ড. **আশুতোষ ভট্টাচার্য**—বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস।

২) ড. **অজিত কুমার ঘোষ**—বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৩) ড. **সুশীল কুমার দে**— দীনবন্ধু মিত্র।

৪) ড. **মিহির কুমার দাস**—দীনবন্ধু ঃ কবি ও নাট্যকার।

ই. বি. জি — ৬
বাংলা বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
২৩ (ক) এবং ২৩ (খ)

একক ৮৪ ❒ নাটক ঃ রবীন্দ্রনাথ

গঠন

৮৪.১ উদ্দেশ্য
৮৪.২ প্রস্তাবনা
৮৪.৩ মূলপাঠ ১ ঃ রবীন্দ্রনাটকের সূচনা ঃ রুদ্রচণ্ড থেকে প্রায়শ্চিত্ত
৮৪.৪ সারাংশ
৮৪.৫ অনুশীলনী ১
৮৪.৬ মূলপাঠ ২ ঃ রবীন্দ্র নাট্য সাহিত্যের বৈচিত্র্য ঃ নাট্যকাব্য কৌতুকনাট্য, রূপকনাট্য ও নৃত্যনাট্য
৮৪.৭ সারাংশ
৮৪.৮ অনুশীলনী ২
৮৪.৯ উত্তর-সংকেত
৮৪.১০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৮৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটিতে আপনি রবীন্দ্রনাথের 'রথের রশি' নাটকের পূর্বে রচিত নাটকসমূহের একটি ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে জানবেন। সেইসঙ্গো জানতে পারবেন রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যায়ে যে রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলি রচনা করেছেন, তার রূপগত ও স্বরূপগত বৈশিষ্ট্য। এইসব জানার সূত্রে আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন, কোন্ কোন্ প্রেক্ষাপটে কি ধরনের উপস্থাপনা রীতি এবং কি উপাদানে রবীন্দ্রনাথ 'রথের রশি' ক্ষুদ্র নাটকটি রচনা করেছেন। এককটি পাঠের মূল লক্ষ্য হল—

- রথের রশি রচনার প্রেক্ষাপট জানা ;
- নাটকটির উপস্থাপনা রীতির অভিনবত্ব উপলব্ধি করা।
- এছাড়াও রূপক ও সাংকেতিক নাটকের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি জানতে ও বুঝতে পারবেন।

৮৪.২ প্রস্তাবনা

বাঙালির নিজস্ব লোকপ্রিয় অভিনয়-কলা যাত্রা ক্রমশ মঞ্চাভিনয়ের দ্বারা প্রভাবিত হওয়ায় যাত্রার গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায়। আবার কোলকাতার নাগরিক জীবনে ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত মঞ্চে ইংরেজি নাটকের অভিনয় আধুনিক বাঙালিকে আকৃষ্ট করে। শহুর কোলকাতায় মঞ্চাভিনয়ের প্রতি আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গো পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সমাজ ভাবনা মধ্যবিত্ত বাঙালি জীবনকে প্রভাবিত করায় বাঙালি ক্রমশ ইংরেজি নাটক ও নাট্য সাহিত্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়। এরই সূত্র ধরে পূর্ববর্তী পর্যায়ে 'নীলদর্পণ' নাটকটি রচিত হয়েছিল। সে সম্পর্কে আপনারা বিস্তৃতভাবে জেনেছেন।

বর্তমান এককে রবীন্দ্রনাট্য প্রসঙ্গে আলোচনায় দীনবন্ধু উত্তরকালে যে নাট্যকাররা বিচিত্র ধারায় তাঁদের নাট্য সাধনাকে বিস্তৃত করেছিলেন তার সাধারণ ধারণা নেওয়া একান্ত বাহুল্য হবেনা। ঈশ্বর গুপ্তের ভাবশিষ্য মনোমোহন বসু পুরনো যাত্রাভিনয়ের সঙ্গে আধুনিক নাট্যরীতির মিশ্রণে গীতাভিনয় রচনা করেছিলেন। করুণরস, ভক্তিরস ও কিঞ্চিৎ হাস্যরস পরিবেশিত হওয়ায় তাঁর রচনা সাধারণ বাঙালির কাছে কিছুটা জনপ্রিয়তা পেয়েছিল।

গিরিশচন্দ্র অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। অভিনেতা, অভিনয় শিক্ষা, নটগুরু, নাট্য পরিচালক ও স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের পোকা। তিনি বাংলা রঙ্গমঞ্চ ও নাট্যসাহিত্যকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। আগমনী (১৮৭৭), অকালবোধন (১৮৭৭), প্রভৃতি গীতিনাট্য নিয়ে মঞ্চে অবতীর্ণ হন গিরিশচন্দ্র। ভাবালুতা, ভক্তিবাদ, কারুণ্য সঞ্চারের মাধ্যমে সাধারণ পাঠক দর্শকের দ্বারা অভিনন্দিত হলেও তাঁর নাটক উচ্চস্তরের নাট্য প্রতিভার পরিচায়ক ছিলনা। তবে তাঁর রচনার অকৃত্রিম সারল্য, চরিত্রসৃষ্টি ও সংলাপ রচনায় সহজ স্বাচ্ছন্দ্যতার পরিচয় আছে। তিনি কতকগুলি সামাজিক, পৌরাণিক ও ভক্তিরসাত্মক নাটকের পাশাপাশি দেশপ্রেমমূলক কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করে যুগের দাবি মিটিয়েছিলেন। কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাটক হল প্রফুল্ল, বলিদান, জনা, চৈতন্যলীলা, সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশিম। দর্শকচিত্ত বিনোদনের জন্য তিনি রঙ্গব্যঙ্গমূলক কতকগুলি নাটিকা রচনা করেছিলেন। তাঁর 'আবুহোসেন' গীতিনাট্যটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল।

নট, নাট্যকার, পরিচালক অমৃতলাল বসু উনিশ শতকের শেষ থেকে বিশ শতকের গোড়ায় সুদক্ষ অভিনেতা এবং সামাজিক নাটক ও রঙ্গনাট্য রচয়িতা হিসাবে সবিশেষ খ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর বিবাহবিভ্রাট (১৮৮৫), খাসদখল (১৩১২), ব্যাপিকাবিদায়, তিলাঞ্জলি আজও জনপ্রিয়তা হারায়নি।

ক্ষীরোদপ্রসাদ, দ্বিজেন্দ্রলাল, পূর্বসুরীদের মত ঐতিহাসিক পৌরাণিক নাটক ও গীতিনাট্য রচনা করে যেমন খ্যাত হয়েছেন, তেমনি পাশাপাশি নৃত্যগীত সমন্বিত, রোমান্টিক কল্পনামধুর নাটক রচনাতেও সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের আলিবাবা (১৮৯৭) গান ও সংলাপের সুষ্ঠু মিশ্রণে একটি সফল গীতিনাট্যের মর্যাদা দাবি করতে পারে। 'কিন্নরী' নৃত্য ও নাট্যের সমন্বয়ে মঞ্চে অসামান্য চমক সৃষ্টি করেছিল।

বাংলা নাটক ও মঞ্চের এই প্রেক্ষিতে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ নাট্যাভিনয় ও নাট্য সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ করেছিলেন।

৮৪.৩ মূলপাঠ ১ ঃ রবীন্দ্রনাটকের সূচনা ঃ বুদ্রচণ্ড থেকে প্রায়শ্চিত্ত

রবীন্দ্রনাথ জোড়াসাঁকোর পারিবারিক নাট্যাভিনয়ের আবহাওয়ায় বড়ো হয়েছেন। এ বাড়িতে এক সময় গীতিপ্রধান যাত্রাভিনয় যেমন হয়েছে, পাশাপাশি বিদেশি রীতিতে একাধিক নাটকের অভিনয়ও হয়েছে। জোড়াসাঁকোর এই পারিবারিক ঐতিহ্য তাঁর বাল্যস্মৃতির বিষয় হলেও রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংস্কার গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে। রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক নাট্য প্রয়াসে কাব্যধর্ম-নাট্যধর্ম-গীতিধর্ম মিলে মিশে অনেকটা একাকার হয়ে গেছে। 'বুদ্রচণ্ড' (১৮৮১) তাঁর প্রথম রচিত গীতিনাট্য—প্রকৃতপক্ষে চৌদ্দটি দৃশ্যে বিভক্ত একটি ক্ষুদ্র কাব্য বিশেষ। নাটকটির বিশেষত্ব হল এর কথোপকথন আদ্যোপান্ত অমিত্র পয়ার

ছন্দে রচিত। এর বিষয় কাব্যের উপাদানে রচিত বাহ্যতঃ নাট্য লক্ষণাক্রান্ত। ইতোপূর্বে রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি আখ্যানমূলক গাথা রচনা করেছিলেন। 'রুদ্রচণ্ড' অপরিণত নাট্যিক গঠন কৌশল আশ্রিত অনেকটা আখ্যায়িকামূলক রচনা। নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও এটি রবীন্দ্রনাথের নাট্য আঙ্গিক আশ্রয়ী প্রথম রচনা। কাহিনীমূলক এই রচনা বর্ণনাপ্রধান, বিষয়বস্তু অতিনাট্যিক।

'রুদ্রচণ্ড' কাব্যনাট্য প্রকাশকালেই রবীন্দ্রনাথ 'বাল্মীকি প্রতিভা' (১৮৮১) গীতিনাট্যটি রচনা করেন। ঠাকুরবাড়িতে 'বিদ্বজ্জন সমাগম সভা' উপলক্ষ্যে বাল্মীকি প্রতিভা রচনার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ প্রথমবার বিলেত প্রবাসে বিদেশি গানের সুরের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দেশে ফিরে দেশীয় সুরচর্চার পাশাপাশি বিদেশি সুরের চর্চাও করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'য়ুরোপীয় ভাষায় যাহাকে অপেরা বলে, বাল্মীকি প্রতিভা তাহা নহে ; ইহা সুরের নাটিকা।' নাটকটি প্রথম অভিনীত হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮১। এই অভিনয় সেকালের বিদ্বজ্জন কর্তৃক ও পত্রপত্রিকায় অভিনন্দিত হয়েছিল। 'কালমৃগয়া' (১৮৮২) তাঁর দ্বিতীয় নাটক। 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১৮৮৪) নাটকের ঘটনা সংস্থান দুর্বল ও কিছুটা অসংলগ্ন। মায়ার বন্ধনমুক্ত সন্ন্যাসীর অন্তর্দ্বন্দ্ব মানবিক কিন্তু এর রূপায়ণ অনেকটা আখ্যানধর্মী হয়েছে। 'নলিনী' (১৮৮৪) দুর্বল চরনা। কবি কর্তৃক পরবর্তীকালে উপেক্ষিত। 'মায়ার খেলা'তে (১৮৮৮) 'নাট্য মুখ্য নহে, গীতিই মুখ্য'। সংগীতের উচ্ছ্বলিত আবেগ মনকে আবিষ্ট করায় ঘটনার গতির প্রতি কোন আকর্ষণ থাকেনি। নাটক শেষে সংগীতের সুর মনকে অনেকক্ষণ আচ্ছন্ন করে রাখে। রবীন্দ্র গীতিনাট্যের মধ্যে 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা' অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় রচনা ও প্রয়োজনা। যদিও 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও মায়ার খেলা'র প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথমটি গানের সূত্রে নাট্যের মালা, অপরটি নাট্যের সূত্রে গানের মালা। এদের মঞ্চসাফল্য রবীন্দ্র নাট্যপ্রয়োজনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হিসেবে স্বীকৃত।

রবীন্দ্রনাটকে প্রথম পর্বের রচনা সঙ্গীত আশ্রয়ী। নাটকের ভাববস্তু, রসসম্পদের ওপর গানের প্রভাব প্রবল। পরবর্তী পর্যায়ে নাটকে প্রচলিত আঙ্গিক অনুসরণ করে সৃষ্ট চরিত্রগুলির মানস দ্বন্দ্বের রূপ দিতে সচেষ্ট হয়েছেন। প্রথাগত নাট্যরীতি অনুসরণে 'রাজা ও রানী' (১৮৮৯) প্রথম পূর্ণাবয়ব পঞ্চাঙ্ক নাটক। চারিত্রিক দৃঢ়তা ও সংকল্পে কঠোর দুটি নর ও নারীর প্রণয়ের অতৃপ্তি ও আদর্শের পার্থক্য নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টির কারণ হয়েছে। নায়ক বিক্রম প্রেমে বাস্তবের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গিয়ে সত্যকে হারিয়েছে। সুমিত্রার মৃত্যুতে প্রচণ্ড আসক্তির অবসানে বিক্রমের সত্য উপলব্ধি। 'রাজা ও রানী'তে কুমার ইলা-র সূত্র ধরে অনুপ্রবিষ্ট 'লিরিকের প্লাবন' থেকে মুক্তি পাওয়ার তাড়নায় রবীন্দ্রনাথ ১৯২৯-এ মহুয়া কাব্য পর্বে 'তপতী' নাটকটি রচনা করেন। তপতীর মূল উপাদান 'রাজা ও রানী'র কাহিনীর পরিবর্তিত রূপ হলেও এটিকে স্বতন্ত্র নাটক হিসেবে গণ্য করা উচিত। 'রাজা ও রাণী' নাটকে রাজা চরিত্রে দুর্বার অন্তঃপ্রকৃতির দুষ্প্রতিরোধ্য তাড়না তাঁর নিদারুণ ট্রাজিক পরিণতিকে নিয়ে এসেছে। ফলে তাঁর অন্তরে যে আগুন জ্বলে উঠেছিল, তা যখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে, তিনিও তা থেকে মুক্তি পাননি। ইলার ত্যাগনিষ্ঠ পুণ্য জ্যোতিতে তিনি অবশেষে ক্ষমা ও করুণায় সিক্ত হয়েছেন। 'তপতী' নাটকে অতিরিক্ত ভাবাবেগকে সংযত এবং কুমার ইলা-র প্রসঙ্গ বর্জন করা হয়েছে। এ নাটকে রানী সুমিত্রার দিব্যরূপকে প্রাধান্য দেওয়ায় নাট্যরসের হানি ঘটেছে। 'রাজা ও রানী'র পরবর্তী নাটক 'বিসর্জন' (১৮৮০)-এ নাটকীয় সংঘাত পৌর্বাপর্ব রক্ষা করে শেষ পরিণতিকে বাস্তবায়িত করেছে। রাজা এখানে ন্যায় ও আদর্শের প্রতীক। রাজপুরোহিত প্রচলিত রীতির ব্যত্যয় বিরোধী—তাঁর অধিকারের ক্ষেত্র মন্দিরে। রাজাদেশ মানতে তিনি অস্বীকার করেন। তিনি

শাস্ত্রাচার ও সংস্কারের মূর্তিমান প্রতীক। রাজ্যে রাজাদেশ প্রাধান্য পেলেও মন্দিরে পুরোহিতের মতই প্রধান বলে তিনি মনে করেন। ফলত দুই বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্ব ও সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে। পরিণতিতে একটি নিরীহ প্রাণের আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে নাটকের সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে।

ইউরোপীয় নাট্যাদর্শ অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ যে নাটকগুলি রচনা করেছেন 'মালিনী' (১৯৯৬) এই পর্বে তার শেষ নিদর্শন। কবি রবীন্দ্রনাথ হৃদয়ধর্ম, কল্যাণধর্ম তথা মানবধর্মে বিশ্বাসী। তিনি কোনো বিশেষ অনুষ্ঠান করে মুক্তিলাভ করা যায়, বিশ্বাস করতেন না। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে সর্বভূতে করুণা ও মৈত্রীর বিস্তার করে অন্তরের বাসনাকে ক্ষয় করতে পারলেই মুক্তি সম্ভব। সকল আনুষ্ঠানিক, সকল পৌরাণিক ধর্মজটিলতার সঙ্গে সত্য উপলব্ধিজাত মানবধর্মের সংঘাত 'মালিনী' নাটকের দ্বন্দ্বকেন্দ্রে অবস্থিত। 'মালিনী' নাটকে মালিনী প্রেমের অলৌকিক মহিমা অন্তরে অনুভব করে প্রিয়জনের চিত্তকেও প্রেমের স্বর্গীয় প্রভায় উদ্দীপিত করেছিলেন। একেই রবীন্দ্রনাথ উক্ত—নবধর্ম—শাশ্বত মানবধর্ম বলা যায়। মালিনী নাটকে এটি মূল প্রতিপাদ্য। নাট্যশিল্পের দিক থেকে মালিনীর নাটকীয় মুহূর্ত রচনা 'রাজা ও রানী' ও বিসর্জন' থেকে অনেকাংশে সংহত। 'মালিনী' বৌদ্ধ সাহিত্যের অন্তর্গত 'মহাবস্তু অবদান' গ্রন্থের 'মালিন্যাবস্তু' থেকে গৃহীত হলেও বিষয়বস্তু উপস্থাপনায় 'বিসর্জন' নাটকের সঙ্গে অনেকটা সঙ্গতিপূর্ণ। এই নাটকে রবীন্দ্রনাথ অঙ্ক ও দৃশ্য বিভাগ সম্বন্ধে অভিনব পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রচলিত নাট্য গঠনরীতির ব্যতিক্রম ঘটিয়ে শুধু চারটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ দৃশ্যের অবতারণা করেছেন। পরবর্তী নাট্য রচনায় এর ব্যাপক প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বক্তব্য ও উপস্থাপনায় কতকগুলি মৌলিক উপাদান থাকা সত্ত্বেও 'মালিনী' বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি। 'মালিনী' নাটকটি খুব ভাল। এর চরিত্রগুলোর ডেভেলপমেন্ট বেশ ন্যাচারাল।'—এ রকমের প্রশস্তি জানিয়েও শিশিরকুমার 'মালিনী' মঞ্চস্থ করার চেষ্টা করেননি। 'বালক' পত্রিকায় প্রকাশিত 'মুকুট' গল্পের নাট্যরূপ 'মুকুট' (১৯০৮) আর 'বৌঠাকুরানির হাট' উপন্যাসের নাট্যরূপ 'প্রায়শ্চিত্ত' (১৯০৯) শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আশ্রমিকদের অভিনয়ের জন্য রচিত হয়। প্রায়শ্চিত্তে ঘটনার বহির্বিপ্লব ও শক্তি সংঘাতের থেকে পারিবারিক অন্তর্বিপ্লব প্রাধান্য পেয়েছে। ধনঞ্জয় বৈরাগীর মাধ্যমে গানে-কথায় অহিংস অসহযোগের আদর্শ প্রকাশ পেয়েছে নাটকে। এর পরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত প্রথা পরিহার করে তাঁর নাটকের গতিপথ পরিবর্তন করে নতুন নাট্যরীতি অবলম্বন করেছেন।

আলোচনার উপসংহারে লক্ষণীয় বিষয় হল রবীন্দ্র নাটকের সূচনা হয় গীতিপ্রবণতা দিয়ে। এবং তার পরে প্রচলিত ইউরোপীয় নাট্যাদর্শ অনুসরণে কাব্যনাট্য রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ সেখানেও স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেননি। তাঁর নাট্য পরিক্রমা এক একটি পর্ব থেকে পর্বান্তরে অভিযান করেছে।

৮৪.৪ সারাংশ

উনিশ শতকের বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রচলিত ধারা থেকে রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্য অনেকটাই স্বতন্ত্র। বাংলা মঞ্চাভিনয়ের ওপরে তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাবও কম। তিনি নাটককে জনমনোরঞ্জনের স্তর থেকে উৎকৃষ্ট সাহিত্যস্তরে উন্নীত করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাটক সুর-সংগীত নির্ভর গীতিনাট্য 'রুদ্রচণ্ড', 'বাল্মীকি প্রতিভা' প্রভৃতিতে তাঁর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ সম্ভব ছিলনা। পরবর্তী রচনা 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'মালিনী' প্রভৃতি

অনেকাংশে নাট্যগুণে সমৃদ্ধ। এই শ্রেণির নাটকে কবিতার আবেগোচ্ছ্বাস এবং নাটকের দ্বন্দ্ব সমন্বিত হয়। কাব্য আঙ্গিকে দ্বন্দ্ব সমৃদ্ধ ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে নাট্যরস সঞ্চার এর অভীষ্ট। এই শ্রেণির নাটকের সংখ্যা খুবই সীমিত হলেও রবীন্দ্রনাথ নাট্য-কাহিনী ও চরিত্রের মাধ্যমে একটি বিশেষ জীবনাদর্শকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' তার উজ্জ্বল উদাহরণ। তিনি নাটকের প্রচলিত শিল্পরূপে সন্তুষ্ট থাকতে পারেননি বলেই এক রূপ থেকে অন্য রূপে, এক আঙ্গিক থেকে অন্যতর, ভিন্নতর আঙ্গিকে নাট্যরচনায় প্রয়াসী হয়েছেন। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা লক্ষ্য করেছি তিনি 'গীতিনাট্য' দিয়ে শুরু করলেও অনতিবিলম্বে প্রচলিত ধারায় একাধিক 'কাব্যনাট্য' রচনা করেছেন।

৮৪.৫ অনুশীলনী ১

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের নাম —রুদ্রচণ্ড/অশ্রুমতী/সরোজিনী।

(খ) রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রথম নাটক—মায়ার খেলা/রুদ্রচণ্ড/প্রকৃতির প্রতিশোধ।

(গ) বাল্মীকি প্রতিভা—গীতিনাট্য/কাব্যনাট্য/নৃত্যনাট্য

২। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'মায়ার খেলা'র প্রকতিগত স্বাতন্ত্র্য আছে। প্রথমটি —— সূত্রে —— মানা, অপরটি —— সূত্রে —— মানা।

(খ) রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের রচনা —— আশ্রয়ী। নাটকের —— , —— ওপর —— প্রভাব প্রাচুর্য।

(গ) কবি রবীন্দ্রনাথ ——, —— তথা —— বিশ্বাসী।

৩। রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের নাটক সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। সংক্ষেপে আলোচনা করুন ঃ

(ক) বাল্মীকি প্রতিভা, মায়ার খেলা।

(খ) রবীন্দ্র-পূর্ববর্তী দুটি গীতিনাট্যের পরিচয় দিন।

৫। বাংলা নাটকে অমৃতলাল বসুর অবদান সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৬। রবীন্দ্রনাথের দুটি পূর্ণাঙ্গ ট্র্যাজিডি নাটকের পরিচয় দিন।

৮৪.৬ মূলপাঠ ২ ঃ রবীন্দ্র নাট্যসাহিত্যের বৈচিত্র্য ঃ নাট্যকাব্য, কৌতুকনাট্য, রূপকনাট্য ও নৃত্যনাট্য

এ পর্বে রবীন্দ্র নাট্যধারায় অভাবনীয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কবিতা তাঁর জীবনে, মননে, স্বপ্নে, কল্পনায়, ফলে, কাব্যেই তিনি স্বচ্ছন্দ। তাঁর নাট্যরচনাতেও তাই বার বার কাব্য উঁকি দিয়েছে। এবার দেখা গেল নাটকের আঙ্গিক অনুসরণে তিনি প্রাণধর্মে কিছু কাব্য রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। নাট্যকাব্য

আপাতদৃষ্টে নাটক মনে হলেও বাস্তবে কাব্যগুণান্বিত। বিদায় অভিশাপ (১৮৯২) এবং কাহিনী (১৯০০) কাব্যের অন্তর্ভুক্ত গান্ধারীর আবেদন (১৮৯৭), সতী (১৮৯৭), নরকবাস (১৮৯৭), লক্ষ্মীর পরীক্ষা (১৮৯৭), কর্ণ-কুন্তী সংবাদ (১৯০০) এই শ্রেণিভুক্ত। এগুলি প্রধানত মহাভারতের কাহিনী অবলম্বনে রচিত হলেও সৃষ্ট চরিত্রগুলি মনুষ্য মহিমার দিক থেকে অত্যুজ্জ্বল শুধু নয়, একটি বিশেষ ভাবাদর্শ তুলে ধরেছে। এর কোনো কোনো চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ নতুনতর ব্যাখ্যা উপস্থিত করেছেন, ফলে কাব্যগুলি তার মৌল বৈশিষ্ট্য না হারিয়েও হয়ে উঠেছে অভিনব নির্মাণ। এখানে অন্তর্দ্বন্দ্বদীর্ণ ধৃতরাষ্ট্র সু-অঙ্কিত, আদর্শবাদী গান্ধারী দুঃখের আগুনে পুড়ে স্বর্ণাভ, নিয়তি লাঞ্ছিত কর্ণের জন্য হাহাকার বিশ্বকেও ছাড়িয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু নাটক আছে, যেগুলিকে প্রচলিত অর্থে প্রহসন বলা যায়না। এরা অনেকটা ভিন্ন স্বাদের রচনা, মানস প্রকৃতিতেও ভিন্নতর। ইতোপূর্বে বাংলায় কিছু রঙ্গ ব্যঙ্গমূলক রচনা লেখা ও অভিনীত হয়েছে, যার মধ্যে স্থূলতা লক্ষ্য করা গেছে। লঘু হাস্য পরিহাস, ভাঁড়ামি, কোনো ব্যক্তি চরিত্রকে লক্ষ্য করে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, অশালীন অমার্জিত সংলাপ পরিবেশিত হয়েছে। আর কিছু প্রহসন রচিত হয়েছে, যার আশ্রয় সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক কিছু প্রসঙ্গ স্থূল হাস্য ও ব্যঙ্গ যার অবলম্বন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কৌতুক নাট্যগুলিতে স্মিত হাস্য, ব্যঙ্গের ঈষৎ পরিচয় থাকলেও এতে কোনো রকম তীব্র তীক্ষ্ণ আক্রমণ নেই। ব্যক্তি চরিত্রের কিছু দুর্বলতা বা আতিশয্য এই রচনাগুলিতে তুলে ধরা হলেও একটি ভদ্র, সুমার্জিত রুচি ও সৌজন্যের মাত্রা কোথাও অতিক্রম করেনি। এই শ্রেণির নাটকগুলিতে তিনি উইট নির্ভর কৌতুক রসাত্মক সংলাপ রচনা ও কৌতুকজনক পরিস্থিতির ওপর জোর দিয়েছেন। উল্লেখযোগ্য রচনাগুলি হল—গোড়ায় গলদ (১৮৯২) এবং এর পরিমার্জিত রূপ শেষ রক্ষা (১৮৯৮), বৈকুণ্ঠের খাতা (১৮৯৭), রঙ্গাত্মক নাটিকার সংকলন হাস্য কৌতুক (১৯০৭), ব্যঙ্গকৌতুক (১৯০৭), চিরকুমার সভা (১৯২৬)।

নৃত্যনাট্য ঃ 'সুরে নাটিকা' নয়—সেখান থেকে দীর্ঘপথ পরিক্রমার শেষে গানের সুর ও নৃত্যের ভঙ্গির অন্যোন্যতায় সমগ্র নাটক বিধৃত হয়ে নৃত্যনাট্যের আঙ্গিকে প্রতিভাত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের নাট্য ও মঞ্চপ্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ শেষ জীবনে কতিপয় নাট্যকাব্য ও গীতিনাট্যকে নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন। নাটকগুলি যথাক্রমে নাট্যকাব্য চিত্রাঙ্গাদা (১৯২৬), নৃত্যনাট্য চিত্রাঙ্গাদা (১৯০৬), গীতিনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৩), নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা (১৯৩৮) এবং শ্যামা (১৯৩৯)। এ ক্ষেত্রে কবি সম্ভবত নৃত্যের মাধ্যমে নাটকের একটি দৃশ্যরূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। নাটকের ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য ভারতীয় নৃত্যকলার সাহায্য নেওয়া ঘটনার দিক থেকে বিরল দৃষ্ট। এই নাটক উপস্থাপনায় যে বিশেষ দৃশ্যপট, আলো ও নৃত্যনৈপুণ্য প্রয়োজন, তারই ওপর নাটকীয় বিষয়বস্তুর মূল্যায়ন ঘটে থাকে। তবে রবীন্দ্র প্রতিভার বহুমুখী প্রকাশের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হিসাবে একে গ্রহণ করা যায়। নৃত্যনাট্য বাংলা নাটকের প্রচলিত ধারায়, এ ধরনের প্রয়োগ বৈচিত্র্য নতুনতর পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরজা খুলে দিয়েছে।

বিশ শতকের প্রথম দশকে রবীন্দ্রনাথ এক অভিনব নাট্যরীতির সূচনা করেন। রূপক সংকেত আশ্রয়ী এই নাটকগুলি তাঁর নাট্যপ্রতিভার খ্যাতি দেশে বিদেশে পরিব্যাপ্ত করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে রূপক নাটক

আছে। রূপকে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। সাংকেতিক নাটকে অরূপ রহস্যকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। ইয়েটস্ অনুসরণে ডঃ অজিত ঘোষ সাংকেতিক ও রূপকের ব্যাখ্যা করেছেন—"অরূপকে রূপের মধ্যে ধরবার চেষ্টা সাঙ্কেতিক রচনায় কিন্তু রূপকে রূপান্তরে দেখাইবার ইচ্ছা রূপক রচনায়। ......সাঙ্কেতিক রীতিতে অপ্রকাশ্য শেষ পর্যন্ত অপ্রকাশ্যই থাকিয়া যায়, কিন্তু রূপক রীতিতে অপ্রকাশিত ভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়।" এই শ্রেণির প্রথম নাটক 'শারদোৎসব' (১৯০৮)। পরবর্তীকালে রচিত হয় রাজা (১৯১০) (পরিবর্তিত রূপ অরূপরতন, (১৯২০), অচলায়তন (১৯১২) (পরিবর্তিত সংস্করণ গুরু, ১৯১৮) রচনার পর তাঁর পরিণত সৃষ্টি ডাকঘর (১৯১২), ফাল্গুনী (১৯১৬), মুক্তধারা (১৯২২), রক্তকরবী (১৯২৬), কালের যাত্রা (১৯৩২) (রথের রশি ও কবির দীক্ষা দুটি রচনা অন্তর্ভুক্ত)। রথের রশিতে শ্রমজীবী মানুষের জয়যাত্রাকে তুলে ধরা হয়েছে। এই নাটকে নাট্যকার সমাজ ও জীবন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ও গভীর উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন।

সব মানুষের সম্মিলিত শক্তি ও সাধনায় বিশ্বচক্রের আবর্তন ঘটে। সেখানে উচ্চ-নীচ ভেদ নেই। মানুষে মানুষের এই আন্তর সম্পর্ক সূত্রটি হল বন্ধন রজ্জু। ধনী-দরিদ্র, উচ্চ-নীচ বর্ণভেদ একে শিথিল করছে। বন্ধন রজ্জু শিথিল হলে, মানুষের খণ্ডিত শক্তি কখনও বিশ্বচক্রে গতি সঞ্চার করতে পারবে না। 'রথের রশি' নাটক রচনার এ হল প্রেক্ষাপট। বস্তুত মুক্তধারা, রক্তকরবী এবং রথের রশির মূল ভরকেন্দ্রে আছে সভ্যতার সংকট। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতায় মানুষ ও যন্ত্রের সংঘাত মানুষের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি, রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকগুলির অন্যতম উপজীব্য। 'রথের রশি' পাঠ পরিক্রমায় এ বিষয়টি আরও বিশদভাবে জানা ও বোঝা যাবে।

রূপক, সাংকেতিক নাটক ও রথের রশি ঃ ইংরেজি Allegory ও Symbol দুটি শব্দ মূলত গ্রীক ভাষা থেকে এসেছে। বাংলায় এর প্রতিশব্দ রূপক ও সংকেত। Allegory-র অর্থ হল একটি বিষয় বলতে গিয়ে অন্য একটি বিষয় বলা। রূপকে ভিতরে ও বাইরে দুটি কাহিনী থাকে। বাইরের কাহিনীটি প্রকৃত অভিপ্রেত নয়, এর ভিতরের কাহিনীকে বা তত্ত্বকে জানা, বোঝা মূল লক্ষ্য। এ জন্য পাঠক একটু চিন্তা বা বুদ্ধির প্রয়োগ করলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু সংকেত বা প্রতীক ব্যঞ্জনা নির্ভর বাস্তব ব্যবহারিক অর্থের অতীত কোন কিছুর ইশারা করে—যা সব সময় স্পষ্ট নয়। অপরিচিত, অপরিজ্ঞাত ইন্দ্রিয়াতীত কোনো 'সত্য'। এই সত্যকে বোঝাতে প্রতিদিনের পরিচিত ভাষায় কাজ হয়না। — প্রয়োজন হয় কোনো প্রতীক বা সংকেত-এর। সংকেত বা বস্তু বা ভাবকে আভাসিত করে, তার বাইরের বা ভিতরের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে যোগ থাকে। তখন বাইরের প্রতীকের সাহায্যে ভিতরের অর্থের তাৎপর্য বোঝা যায়।

সংক্ষেপে রূপক হল রূপ থেকে রূপের সঞ্জাত। রূপকের একটি স্পষ্টার্থ আর একটি ব্যঞ্জার্থ থাকে।

সংকেত থেকে সাংকেতিক শব্দটি এসেছে। সংকেত বলতে ইঙ্গিত বা চিহ্নকে বোঝায়। অপরিজ্ঞাত, অনির্বচনীয়, ইন্দ্রিয়াতীত কোনো সত্যকে প্রকাশ করতে সংকেত বা প্রতীকের ব্যবহার করা হয়। ড় সাধন ভট্টাচার্যের ভাষায়, "সঙ্কেত অরূপ সত্তার সম্ভাব্য রূপ—আধ্যাত্মিক রশ্মির চতুর্দিকে একটি স্বচ্ছ দীপাবরণ ; আর রূপক কোনো শরীরী পদার্থের অথবা পরিচিত তত্ত্বের একাধিক সম্ভাব্য রূপের একটি। ..... রূপক এক ধরনের রচনারীতি, সঙ্কেত বর্ণনা-কৌশল। সঙ্কেতের মাধ্যমে অল্প বর্ণনা করে অনেকটা বোঝানো

যায়।" সাংকেতিক হল অতীন্দ্রিয়, অপার্থিব ; এখানে রূপ বড় না হয়ে বিমূর্ত অনুভূতির প্রকাশই আসল হয়ে দাঁড়ায়। কোলরিজ রূপক ও সঙ্কেতের পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন— "an allegory is but a translation on notions into a picture–language ..... a symbol is charactrised by transference of the special in the individual or a general in the special, or of universal in the general." প্রতীক সাংকেতিক নাটক আর প্রতীক নাটকের মধ্যে পার্থক্য খুব স্পষ্ট নয়। অনেকে পার্থক্য স্বীকারও করেননা। Symbol-এর প্রতিশব্দ সংকেত ও প্রতীক সমার্থক মনে করেন। কিন্তু প্রতীক ও সংকেতের মধ্যে অতি সূক্ষ্ম হলেও পার্থক্য আছে। প্রতীক হল চিহ্ন। "একএকটি ভাব যখন এক একটি চিহ্নের দ্বারা অভিব্যক্ত হয়, তখন সেই চিহ্নের নাম হয় প্রতীক, আর সংকেতে থাকে অনির্বচনীয়তা। প্রতীককে ব্যাখ্যা করা যায়, সাংকেতিকের কোনো ব্যাখ্যা দান সম্ভব নয়, ধরেও যেন তাকে সম্পূর্ণ ধরা যায়না—এমনই ভাব থাকে থাকে সংকেতে।" প্রতীক নাটকে নাট্যকার কোনো বক্তব্যকে চিহ্নের সাহায্যে ব্যঞ্জিত করেন। ব্যঞ্জনা সৃষ্টির জন্য যখন চিহ্নকে ভর করা হয়, তখনই তা প্রতীক ; আর যখন সেই চিহ্ন অনির্বচনীয়তার ইঙ্গিতবহ হয়, তখন তা হয়ে পড়ে সাংকেতিক। একই নাটকে এই দুই-এর ব্যবহার যুগ্মভাবেও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বর্তমান পর্যায়ে নাটকে সে পরিচয় আছে।

'রথের রশি' রূপক-সাংকেতিক নাটক। মহাকালের 'রথ' এবং রথের 'রশি' ; মূল বক্তব্য ব্যঞ্জা নির্ভর। এ নাটকের কুশীলবরা হলেন যন্ত্রী, সৈনিক, ধনপতি, পুরোহিত, সন্ন্যাসী এবং শূদ্র। রাজশক্তির ও বর্ণভেদবুদ্ধির চাপে মহাকালের রথ অচল হয়ে পড়েছে। কাল গতিশীল, তা যদি স্তব্দ হয়ে যায়, তাহলে ধ্বংস তো অনিবার্য। কালের যাত্রায় প্রাণ-প্রবাহের—উচ্চনীচ নির্বিশেষে আপামর জনগণের অবিচ্ছিন্ন প্রাণশক্তিতেই এতদিন মহাকালের রথ চলেছে। গোষ্ঠী স্বার্থ বুদ্ধি বাধা রচনা করেছে। এ সময় প্রয়োজন অবহেলিত জনগণের জাগরণ। এরাই হবেন বলরামের চেলা—হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে। হীনপতিত শূদ্রদের হস্তক্ষেপে সংসারটা পুনরায় গতি পাবে। কবিচিত্তে যে সাম্যবাদী মানসিকতা সক্রিয় ছিল, তার তত্ত্বরূপটি সংকেতের ব্যঞ্জনায় এখানে কবি প্রকাশ করেছেন।

৮৪.৭ সারাংশ

প্রথম পর্যায়ে গীতিনাট্য ও ইউরোপীয় ধারায় কয়েকটি নাটক রচনা ও অভিনয়ের পর রবীন্দ্রনাথের নাট্যশিল্প বহু বিচিত্র পথে অভিব্যক্তি পেতে থাকে। নাট্য আঙ্গিকে কাব্য ও গীতিপ্রধান রচনা উপহার দিয়েছেন। আবার প্রচলিত প্রহসনের পথ পরিহার করে তিনি বেশ কয়েকটি অনাবিল হাস্যরস প্রধান কৌতুক নাটক এবং নৃত্যনাট্য রচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে যুগান্তকারী রূপক ও সাংকেতিক নাটক রচনায় তিনি একাধারে যেমন পথিকৃৎ অপর দিকে আজও অনন্য। ভারতীয় নৃত্যকলার অসামান্য দৃশ্যায়নের মধ্যে নাটকীয় ভাববস্তু পরিবেশন করেছেন তিনি। 'রথের রশি' রূপক সাংকেতিক ধারার অন্তর্ভুক্ত। এখানে তিনি দেখিয়েছেন মানুষের সঙ্গে মানুষের ঐকান্তিক মানবিক সম্পর্কই বিশ্বসংসারকে গতিশীল রাখতে সক্ষম। এই সম্পর্কের ব্যত্যয় ঘটলে মহাকালের রথের গতি স্তব্ধ হয়ে যায়।

পরবর্তী পর্যায়ে রূপক ও সাংকেতিক নাটকের প্রকৃতিলক্ষণ বিচার করা হয়েছে। রূপক তত্ত্বগর্ভ কোনো একটি ভাবাশ্রয়ী রচনা। এর ভিতরে ও বাইরে দুটি স্বতন্ত্র কাহিনী থাকে, কিন্তু বাহ্য কাহিনীর অন্তর্নিহিত অর্থই প্রধান। সংকেত অরূপ সত্তার সম্ভাব্য রূপ। মানুষের বিচিত্র ভাবরাশি যা বাক্যে বোঝান যায়না, অনির্বচনীয়, ইন্দ্রিয়াতীত সেই নাটকীয় ভাবসত্যকে কোনো বিশেষ সংকেতের সাহায্যে অনুভূতি জগতে সঞ্চারিত করা হয়, তাকে সাংকেতিক নাটক বলা হয়। কালের যাত্রা গ্রন্থের 'রথের রশি'তে কবি নাট্যকার মানুষের প্রতি মানুষের হৃদয়হীন জাতিবৈর, বৃহৎ মনুষ্য সমাজের অন্তর্গত শূদ্র বলে চিহ্নিত শ্রমজীবী মানুষের প্রতি অবজ্ঞা, মানবতাবাদী কবিকে পীড়া দিয়েছিল বলেই সমকালীন সমাজ-রাজনৈতিক বাতাবরণে নাটকটি রচনা করেছিলেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জনজাগরণ, সামাজিক অবিচারের একদিন অবসান ঘটবে। 'রথের রশি' সেই বার্তাই বহন করছে।

৮৪.৮ অনুশীলনী ২

১। সঠিক উত্তরে টিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) গান্ধারীর আবেদন — কাব্যনাট্য/নাট্যকাব্য/গীতিনাট্য।

(খ) Symbolic শব্দটির উৎস — লাতিন/গ্রীক/ফরাসী।

(গ) 'রাজা' নাটকের পরিবর্তিত সংস্করণ — রক্তকরবী/গুরু/অরূপরতন।

২। কাব্যনাট্য ও নাট্যকাব্যের মধ্যে পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

৩। রবীন্দ্রনাথ রচিত কৌতুকনাট্য ও প্রচলিত প্রহসনের মধ্যে পার্থক্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। সংক্ষেপে আলোচনা করুন ঃ

নৃত্যনাট্য, রূপকনাট্য, সাংকেতিক নাটক।

৮৪.৯ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ ঃ

১। (ক) অশ্রুমতী (খ) রুদ্রচণ্ড (গ) গীতিনাট্য।

২। (ক) গানের, নাট্যের, নাট্যের, গানের।

(খ) সংগীত, ভাববস্তু, রসসম্পদের, গানের।

(গ) হৃদয়ধর্মী, কল্যাণধর্ম, মানবধর্ম, আচার, অনুষ্ঠানগত, বুদ্ধদেব, বিদ্রোহ।

৩। ও ৪। 'রবীন্দ্রনাটকের সুচনা' অংশ অবলম্বনে প্রাসঙ্গিক উত্তর তৈরি করুন।

৫। 'প্রস্তাবনা' অংশের প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুসরণে আপনার উত্তর লিখুন।

৬। 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন' ও 'মালিনী' সম্পর্কে আলোচনা করুন।

অনুশীলনী ২ ঃ

১। (ক) নাট্যকাব্য (খ) গ্রীক (গ) অরূপরতন।

২। মূলপাঠ ২-এর প্রথম অংশ ভালো করে পড়ে উত্তর দিন।

৩। 'কৌতুক নাটক' প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুসরণে উত্তর দিন।

৪। মূলপাঠ ২-এর দ্বিতীয় অংশ ভালো করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৮৪.১০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। আশুতোষ ভট্টাচার্য — রবীন্দ্র নাট্যধারা।

২। পুলিন দাস — মঞ্চ অভিনয় নাট্যকলা ও রবীন্দ্রনাথ।

৩। ড. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

৪। ড. অজিতকুমার ঘোষ — বাংলা নাটকের ইতিহাস।

৫। ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রনাট্য সমীক্ষা : রূপক সাংকেতিক।

৬। ড. দিলীপকুমার নন্দী ও ড. নবকুমার মণ্ডল — প্রসঙ্গ : কালের যাত্রা।

৭। অশোক সেন — রবীন্দ্রনাট্য পরিক্রমা।

একক ৮৫ ❒ রূপক-সাংকেতিক নাটক ঃ রথের রশি

গঠন

৮৫.১ উদ্দেশ্য
৮৫.২ প্রস্তাবনা
৮৫.৩ মূলপাঠ ১ ঃ রথের রশি
৮৫.৪ সারাংশ
৮৫.৫ মূলপাঠ ২ ঃ রথের রশি
৮৫.৬ সারাংশ
৮৫.৭ অনুশীলনী ১
৮৫.৮ রথের রশি ঃ রচনা, দেশকাল, নামকরণ
৮৫.৯ সারাংশ
৮৫.১০ অনুশীলনী ২
৮৫.১১ রথের রশি নাটকের রচিত্র বিশ্লেষণ
৮৫.১২ সারাংশ
৮৫.১৩ রথের রশি নাটকের ভাষা
৮৫.১৪ নাটকের মঞ্চপরিকল্পনা
৮৫.১৫ সারাংশ
৮৫.১৬ অনুশীলনী ৩
৮৫.১৭ উত্তর-সংকেত
৮৫.১৮ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ
৮৫.১৯ অতিরিক্ত পাঠ

৮৫.১ উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটিতে আপনি রবীন্দ্রনাথের একটি উল্লেখযোগ্য রূপক-সাংকেতিক নাটক পড়বেন। পূর্ববর্তী এককে রবীন্দ্রনাট্যধারার সাধারণ পরিচয় লাভের পর রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্পর্কে জেনেছেন। সেই সঙ্গে রূপক-সাংকেতিক নাটকের সংজ্ঞা ও পরিচয় সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। এবার মূলনাটক পড়ে

'আপনার রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্পর্কে অভিজ্ঞতা আরও সম্পূর্ণ ও দৃঢ় হবে। 'রথের রশি' পড়ার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি—

- অপরাপর নাটকের পাশাপাশি রূপক ও সাংকেতিক নাটকের পার্থক্য বুঝতে পারবেন।
- রূপক-সাংকেতিক নাটক সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলা নাট্যধারায় রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক যে পথিকৃৎ এটা উপলব্ধি করবেন।
- এই শ্রেণির নাটক অন্যান্য নাটক থেকে বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা ও চরিত্রায়ণে স্বতন্ত্র বুঝতে পারবেন।
- এই শ্রেণির নাটকের সংলাপ অন্য নাটক থেকে ভিন্ন সেটি অনুধাবন করবেন।

৮৫.২ প্রস্তাবনা

রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাংলা নাট্যসাহিত্যে সাংকেতিক নাটক ছিলনা, পরেও আর কেউ লেখেননি। তাঁর এই শ্রেণির নাটকের ভাববস্তু, নাট্যদ্বন্দ্ব ও ভাষাশৈলী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অনির্বচনীয়, ইন্দ্রিয়াতীত বিষয় সাধারণত সাংকেতিক ভাষায় প্রকাশ করা হয়। বাহ্য প্রতীকের সাহায্যে অনির্দেশ্য অপরিচিত বস্তুকে আভাষিত করা হয়। 'রথের রশি'তে রথযাত্রার দিন পথচলতি নরনারী সকলেই দেখতে পেল মহাকালের রথ চলছে না। এই গতিহীনতা মানবসমাজের সবচেয়ে বড় দুর্গতি। এর হেতু সন্ধানে দেখা যাবে মানুষে মানুষে যে সম্পর্কের বন্ধন, তা যদি বাধা পায়, মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়, সভ্যতার রথচক্র তখনই স্তব্ধ হয়ে যায়। মনুষ্যত্বের অবমাননার অবসান ঘটবে, সম্বন্ধের অসাম্য দূর হলে, তবেই রথ চলবে। 'রথের রশি' নাটকে রথ, রশির রূপকে বিশ্বসংসার মানববন্ধন, মনুযত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার অর্থাৎ মনুষ্যত্বের মর্যাদার পুনরুদ্ধার ব্যঞ্জিত হয়েছে। এ নাটকে এভাবে একটি বিশেষ তত্ত্ব রূপকে ও সংকেতের ব্যঞ্জনায় নাটকীয় বিষয়বস্তুতে তুলে ধরেছে, দেখা যাবে।

৮৫.৩ মূলপাঠ ১ ঃ রথের রশি

রথের রশি

রথযাত্রার মেলায় মেয়েরা

প্রথমা

এবার কী হল, ভাই!
উঠেছি কোন্ ভোরে, তখন কাক ডাকে নি।
কঙ্কালিতলার দিঘিতে দুটো ডুব দিয়েই
ছুটে এলুম রথ দেখতে, বেলা হয়ে গেল ;
রথের নেই দেখা। চাকার নেই শব্দ।

দ্বিতীয়া

চারি দিকে সব যেন থম্‌থমে হয়ে আছে,
ছম্‌ছম্‌ করছে গা।

তৃতীয়া

দোকানি-পসারিরা চুপচাপ বসে,
কেনাবেচা বন্ধ। রাস্তার ধারে ধারে
লোক জটলা করে তাকিয়ে আছে
কখন আসবে রথ। যেন আশা ছেড়ে দিয়েছে।

প্রথমা

দেশের লোকের প্রথম যাত্রার দিন আজ ;
বেরবেন ব্রাহ্মণঠাকুর শিষ্য নিয়ে—
বেরবেন রাজা, পিছনে চলবে সৈন্যসামন্ত—
পণ্ডিতমশায় বেরবেন, ছাত্ররা চলবে পুঁথিপত্র হাতে।
কোলের ছেলে নিয়ে মেয়েরা বেরবে,
ছেলেদের হবে প্রথম শুভযাত্রা—
কিন্তু কেন সব গেল হঠাৎ থেমে!

দ্বিতীয়া

ঐ দেখ্‌. পুরুতঠাকুর বিড়্‌বিড় করছে ওখানে।
মহাকালের পাণ্ডা ব'সে মাথায় হাত দিয়ে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
বাধবে যুদ্ধ, জ্বলবে আগুন, লাগবে মারী,
ধরণী হবে বন্ধ্যা, জল যাবে শুকিয়ে।

প্রথমা

এ কী অকল্যাণের কথা ঠাকুর !
উৎসবে এসেছি মহাকালের মন্দিরে—
আজ রথযাত্রার দিন।

সন্ন্যাসী

দেখতে পাচ্ছ না— আজ ধনীর আছে ধন,
তার মূল্য গেছে ফাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো।
ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস।
যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।
দেখতে পাচ্ছ না—লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র,
তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে—
ফলছে না কোনো ফল!

তৃতীয়া

হাঁ ঠাকুর, তাই তো দেখি।

সন্ন্যাসী

তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,
কিছুই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত।
তাই নড়ে না আজ আর রথ—
ঐ-যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।

প্রথমা

তাই তো, বাপ্ রে, গা শিউরে ওঠে—
এ-যে অজগর সাপ, খেয়ে খেয়ে মোটা হয়ে আর নড়ে না।

সন্ন্যাসী

ঐ তো রথের দড়ি, যত চলে না ততই জড়ায়।
যখন চলে, দেয় মুক্তি।

দ্বিতীয়া

বুঝেছি আমাদের পুজো নেবেন ব'লে
হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা।
পুজো পেলেই হবেন তুষ্ট।
ও ভাই, পুজো তো আনি নি। ভুল হয়েছে।

তৃতীয়া

পুজোর কথা তো ছিল না—

ভেবেছিলেম রথের মেলায় কেবল বেচব কিনব,
বাজি দেখব জাদুকরের,
আর দেখব বাঁদর-নাচ।
চল-না শিগগির, এখনো সময় আছে,
আনিগে পুজো।

[সকলের প্রস্থান]

নাগরিকদের প্রবেশ

প্রথম নাগরিক

দেখ্ দেখ্ রে, রথের দড়িটা কেমন করে পড়ে আছে।
যুগযুগান্তরের দড়ি, দেশদেশান্তরের হাত পড়েছে ঐ দড়িতে,
আজ অনড় হয়ে মাটি কামড়ে আছে
সর্বাঙ্গ কালো করে।

দ্বিতীয় নাগরিক

ভয় লাগছে রে। সরে দাঁড়া, সরে দাঁড়া।
মনে হচ্ছে ওটা এখনই ধরবে ফণা, মারবে ছোবল।

তৃতীয় নাগরিক

একটু একটু নড়ছে যেন রে! আঁকুবাঁকু করছে বুঝি

প্রথম নাগরিক

বলিস্ নে অমন কথা। মুখে আনতে নেই।
ও যদি আপনি নড়ে তা হলে কি আর রক্ষে আছে।

তৃতীয় নাগরিক

তা হলে ওর নাড়া খেয়ে সংসারের সব জোড়গুলো
বিজোড় হয়ে পড়বে। আমরা যদি না চালাই—
ও যদি আপনি চলে, তা হলে পড়ব যে চাকার তলায়।

প্রথম নাগরিক

ঐ দেখ্ ভাই, পুরুতের গেছে মুখ শুকিয়ে,
কোণে বসে বসে পড়ছে মন্তর।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেদিন নেই রে

যেদিন পুরুতের মন্তর-পড়া হাতের টানে চলত রথ।
ওরা ছিল কালের প্রথম বাহন।

তৃতীয় নাগরিক

তবু আজ ভোরবেলা দেখি ঠাকুর লেগেছেন টান দিতে—
কিন্তু একেবারেই উল্টো দিকে, পিছনের পথে।

প্রথম নাগরিক

সেটাই তো ঠিক পথ, পবিত্র পথ, আদি পথ।
সেই পথ থেকে দূরে এসেই তো কালের মাথার ঠিক থাকছে না।

দ্বিতীয় নাগরিক

মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠলি দেখি! এত কথা শিখলি কোথা।

প্রথম নাগরিক

ঐ পণ্ডিতেরই কাছে। তাঁরা বলেন—
মহাকালের নিজের নাড়ীর টান পিছনের দিকে,
পাঁচজনের দড়ির টানে অগত্যা চলেন সামনে।
নইলে তিনি পিছু হটতে হটতে একেবারে পৌঁছতেন
অনাদি কালের অতল গহ্বরে।

তৃতীয় নাগরিক

ঐ রশিটার দিকে চাইতে ভয় করে।
ওটা যেন যুগান্তের নাড়ী—
সান্নিপাতিক জ্বরে আজ দব্‌দব্‌ করছে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

সর্বনাশ এল।
গুরুগুরু শব্দ মাটির নীচে।
ভূমিকম্পের জন্ম হচ্ছে।
গুহার মধ্য থেকে আগুন লক্‌লক্‌ মেলছে রসনা।
পূর্বে পশ্চিমে আকাশ হয়েছে রক্তবর্ণ।
প্রলয়দীপ্তির আংটি পরেছে দিকচক্রবাল।

[প্রস্থান]

প্রথম নাগরিক

দেশে পুণ্যাত্মা কেউ নেই কি আজ।
ধরুক-না এসে দড়িটা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এক-একটি পুণ্যাত্মাকে খুঁজে বের করতেই
এক-এক যুগ যায় বয়ে—
ততক্ষণ পাপাত্মাদের হবে কী দশা।

তৃতীয় নাগরিক

পাপাত্মাদের কী হবে তা নিয়ে ভগবানের মাথাব্যথা নেই।

দ্বিতীয় নাগরিক

সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই।
তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়।
পুণ্যাত্মা কালেভদ্রে দৈবাৎ আসে,
আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জঙ্গলে গুহায়।

প্রথম নাগরিক

দড়িটার রঙ যেন এল নীল হয়ে।
সামলে কথা কোস।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

বাজা ভাই, শাঁখ বাজা—
রথ না চললে কিছুই চলবে না।
চড়বে না হাঁড়ি, বুলবুলিতে খেয়ে যাবে ধান।
এরই মধ্যে আমার মেজো ছেলের গেছে চাকরি,
তার বউটা শুষছে জ্বরে। কপালে কী আছে জানি নে।

প্রথম নাগরিক

মেয়েমানুষ, তোমরা এখানে কী করতে।
কালের রথযাত্রায় কোনো হাত নেই তোমাদের।
কুটনো কোটোগে ঘরে।

দ্বিতীয়া

কেন, পুজো দিতে তো পারি।
আমরা না থাকলে পুরুতের পেট হত না এত মোটা।
গড় করি তোমায়, দড়ি-নারায়ণ! প্রসন্ন হও।
এনেছি তোমার ভোগ। ওলো, ঢাল্ ঢাল্ ঘি,
ঢাল্ দুধ, গঙ্গাজলের ঘটি কোথায়,
ঢেলে দে না জল। পঞ্চগব্য রাখ্ ঐখানে,
জ্বালা পঞ্চপ্রদীপ। বাবা দড়ি-নারায়ণ,
এই আমার মানত রইল, তুমি যখন নড়বে
মাথা মুড়িয়ে চুল দেব ফেলে।

তৃতীয়া

এক মাস ছেড়ে দেব ভাত, খাব শুধু রুটি।
বলো-না ভাই, সবাই মিলে—জয় দড়ি-নারায়ণের জয়।

প্রথম নাগরিক

কোথাকার মূর্খ তোরা—
দে মহাকালনাথের জয়ধ্বনি।

প্রথমা

কোথায় তোমাদের মহাকালনাথ। দেখি নে তো চক্ষে।
দড়ি-প্রভুকে দেখছি প্রত্যক্ষ—
হনুমান-প্রভুর লঙ্কা-পোড়ানো লেজখানার মতো—
কী মোটা, কী কালো, আহা দেখে চক্ষু সার্থক হল।
মরণকালে ঐ দড়ি-ধোওয়া জল ছিটিয়ে দিয়ো আমার মাথায়।

দ্বিতীয়া

গালিয়ে নেব আমার হার, আমার বাজুবন্দ।
দড়ির ডগা দেব সোনা-বাঁধিয়ে।

তৃতীয়া

আহা, কী সুন্দর রূপ গো !

প্রথমা

যেন যমুনা নদীর ধারা!

দ্বিতীয়া

যেন নাগকন্যার বেণী।

তৃতীয়া

যেন গণেশঠাকুরের শুঁড় চলেছে লম্বা হয়ে,
দেখে জল আসে চোখে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথমা

দড়ি-ঠাকুরের পুজো এনেছি, ঠাকুর।
কিন্তু পুরুত যে নড়েন না, মন্তর পড়বে কে।

সন্ন্যাসী

কি হবে মন্তরে।
কালের পথ হয়েছে দুর্গম।
কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, কোথাও গভীর গর্ত।
করতে হবে সব সমান, তবে ঘুচবে বিপদ।

তৃতীয়া

বাবা, সাতজন্মে শুনি নি এমন কথা।
চিরদিনই তো উঁচুর মান রেখেছে নিচু মাথা হেঁট করে।
উঁচু-নিচুর সাঁকোর উপর দিয়েই তো রথ চলে।

সন্ন্যাসী

দিনে দিনে গর্তগুলোর হাঁ উঠছে বেড়ে।
হয়েছে বাড়াবাড়ি, সাঁকো আর টিঁকছে না।
ভেঙে পড়ল ব'লে।

[প্রস্থান]

প্রথমা

চল্ ভাই, তবে পুজো দিইগে রাস্তা-ঠাকুরকে।
আর গর্ত-প্রভুকেও তো সিন্নি দিয়ে করতে হবে খুশি,
কী জানি ওঁরা শাপ দেন যদি। একটি-আধটি তো নন,
আছেন দু-হাত পাঁচ-হাত অন্তর।

নমো নমো দড়ি-ভগবান, রাগ কোরো না ঠাকুর,
ঘরে আছে ছেলেপুলে।

[মেয়েদের প্রস্থান]

সৈন্যদলের প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

ওরে বাস্ রে! দড়িটা যেন পড়ে আছে পথের মাঝখানে—
যেন একজটা ডাকিনীর জটা।

দ্বিতীয় সৈনিক

মাথা দিল হেঁট করে।
স্বয়ং রাজা লাগালেন হাত, আমরাও ছিলুম পিছনে।
একটু ক্যাঁচকোঁচও করলে না চাকাটা!

তৃতীয় সৈনিক

ও যে আমাদের কাজ নয়, তাই।
ক্ষত্রিয় আমরা, শূদ্র নই, নই গোরু।
চিরদিন আমরা চড়েই এসেছি রথে।
চিরদিন রথ টানে ঐ ওরা—যাদের নাম করতে নেই।

প্রথম নাগরিক

শোনো ভাই, আমার কথা।
কালের অপমান করেছি আমরা, তাই ঘটেছে এ-সব অনাসৃষ্টি।

তৃতীয় সৈনিক

এ মানুষটা আবার বলে কী।

প্রথম নাগরিক

ত্রেতাযুগে শূদ্র নিতে গেল ব্রাহ্মণের মান—
চাইলে তপস্যা করতে, এত বড়ো আস্পর্ধা—
সেদিনও অকাল লাগল দেশে, অচল হল রথ।
দয়াময় রামচন্দ্রের হাতে কাটা গেল তার মাথা,
তবে তো হল আপদ শান্তি।

দ্বিতীয় নাগরিক

সেই শূদ্ররা শাস্ত্র পড়ছেন আজকাল,
হাত থেকে কাড়তে গেলে বলেন, আমরা কি মানুষ নই।

তৃতীয় নাগরিক

মানুষ নই! বটে! কতই শুনব কালে কালে।
কোন্‌দিন বলবে, ঢুকব দেবালয়ে।
বলবে, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়ের সঙ্গে নাইব এক ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

এর পরেও রথ যে চলছে না, সে আমাদের প্রতি দয়া করে।
চললে চাকার তলায় গঁড়িয়ে যেত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।

প্রথম সৈনিক

আজ শূদ্র পড়ে শাস্ত্র,
কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ !

দ্বিতীয় সৈনিক

চল্‌-না ওদের পাড়ায় গিয়ে প্রমাণ করে আসি—
ওরাই মানুষ না আমরা।

দ্বিতীয় নাগরিক

এ দিকে আবার কোন বুদ্ধিমান বলেছে রাজাকে—
কলিযুগে না চলে শাস্ত্র, না চলে শস্ত্র,
চলে কেবল স্বর্ণচক্র। তিনি ডাক দিয়েছেন শেঠজিকে।

প্রথম সৈনিক

রথ যদি চলে বেনের টানে
তবে গলায় অস্ত্র বেঁধে জলে দেব ডুব।

দ্বিতীয় সৈনিক

দাদা, রাগ কর মিছে, সময় হয়েছে বাঁকা।
এ যুগে পুষ্পধনুর ছিলেটাও
বেনের টানেই দেয় মিঠে সুরে টংকার।

তার তীরগুলোর ফলা বেনের ঘরে শানিয়ে না আনলে
ঠিক জায়গায় বাজে না বুকে।

তৃতীয় সৈনিক

তা সত্যি। এ কালের রাজত্বে রাজা থাকেন সামনে,
পিছনে থাকে বেনে। যাকে বলে অর্ধ-বেনে-রাজেশ্বর মূর্তি।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

প্রথম সৈনিক

এই-যে সন্ন্যাসী, রথ চলে না কেন আমাদের হাতে।

সন্ন্যাসী

তোমরা দড়িটাকে করেছ জর্জর।
যেখানে যত তীর ছুঁড়েছ, বিঁধেছে ওর গায়ে।
ভিতরে ভিতরে ফাঁক হয়ে গেছে, আলগা হয়েছে বাঁধনের জোর।
তোমরা কেবল ওর ক্ষত বাড়িয়েই চলবে,
বলের মাতলামিতে দুর্বল করবে কালকে।
সরে যাও, সরে যাও ওর পথ থেকে।

[প্রস্থান]

ধনপতির অনুচরবর্গের প্রবেশ

প্রথম ধনিক

এটা-কী গো, এখনি হুঁচট খেয়ে পড়েছিলুম।

দ্বিতীয় ধনিক

ওটাই তো রথের দড়ি।

চতুর্থ ধনিক

বীভৎস হয়ে উঠেছে, যেন বাসুকি মরে উঠল ফুলে।

প্রথম সৈনিক

কে এরা সব।

দ্বিতীয় সৈনিক

আংটির হীরে থেকে আলোর উচ্চিংড়েগুলো
লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে চোখে।

প্রথম নাগরিক

ধনপতি শেঠির দল এরা।

প্রথম ধনিক

আমাদের শেঠজিকে ডেকেছেন রাজা।
সবাই আশা করছে, তাঁর হাতেই চলবে রথ।

দ্বিতীয় সৈনিক

সবাই বলতে বোঝায় কাকে বাপু?
আর তারা আশাই বা করে কিসের।

দ্বিতীয় ধনিক

তারা জানে, আজকাল চলছে যা-কিছু
সব ধনপতির হাতেই চলছে।

প্রথম সৈনিক

সত্যি নাকি! এখনই দেখিয়ে দিতে পারি,
তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে।

তৃতীয় ধনিক

তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে।

প্রথম সৈনিক

চুপ, দুর্বিনীত!

দ্বিতীয় ধনিক

চুপ করব আমরা বটে!
আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে
জলে স্থলে আকাশে।

প্রথম সৈনিক

মনে ভাবছ, আমাদের শতঘ্নী ভুলেছে তার বজ্রনাদ!

দ্বিতীয় ধনিক

ভুললে চলবে কেন। তাকে যে আমাদেরই হুকুম

ঘোষণা করতে হয় এক হাট থেকে আরেক হাটে
সমুদ্রের ঘাটে ঘাটে।

প্রথম নাগরিক

ওদের সঙ্গে পারবে না তর্কে।

প্রথম সৈনিক

কী বল, বারব না !
সব চেয়ে বড়ো তর্কটা ঝন্‌ঝন্ করছে খাপের মধ্যে।

প্রথম নাগরিক

তোমাদের তলোয়ারগুলোর কোনোটা খায় ওদের নিমক,
কোনোটা খেয়ে বসেছে ওদের ঘুষ।

প্রথম ধনিক

শুনলেম, নর্মদাতীরের বাবাজিকে আনা হয়েছিল
দড়িতে হাত লাগাবার জন্য। জান খবর?

দ্বিতীয় ধনিক

জানি বৈকি।
রাজার চর পৌঁছল গুহায়,
তখন প্রভু আছেন চিৎ হয়ে বুকে দুই পা আটকে।
তূরী ভেরী দামামা জগঝম্পের চোটে ধ্যান যদিবা ভাঙল,
পা-দুখানা তখন আড়ষ্ট কাঠ!

নাগরিক

শ্রীচরণের দোষ কী, দাদা!
পঁয়ষট্টি বছরের মধ্যে একবারও নাম করে নি চলাফেরার।
বাবাজি বললেন কী।

দ্বিতীয় ধনিক

কথা কওয়ার বালাই নেই।
জিবটার চাঞ্চল্যে রাগ ক'রে গোড়াতেই ফেলেছেন কেটে।

ধনিক

তার পরে?

দ্বিতীয় ধনিক

তার পরে দশ জোয়ানে মিলে আনলে তাঁকে রথতলায়।
দড়িতে যেমনি তাঁর হাত পড়া,
রথের চাকা বসে যেতে লাগল মাটির নীচে।

ধনিক

নিজের মনটা যেমন ডুবিয়েছেন
রথটাকেও তেমনি তলিয়ে দেবার চেষ্টা।

দ্বিতীয় ধনিক

একদিন উপবাসেই মানুষের পা চায় না চলতে—
পঁয়ষট্টি বছরের উপবাসের ভার পড়ল চাকার 'পরে।

মন্ত্রী ও ধনপতির প্রবেশ

ধনপতি

ডাক পড়ল কেন, মন্ত্রীমশায়?

মন্ত্রী

অনর্থপাত হলেই সর্বাগ্রে তোমাকে স্মরণ করি।

ধনপতি

অর্থপাতে যার প্রতিকার, আমার দ্বারা তাই সম্ভব।

মন্ত্রী

মহাকালের রথ চলছে না।

ধনপতি

এ পর্যন্ত আমরা কেবল চাকায় তেল দিয়েছি,
রশিতে টান দিই নি।

মন্ত্রী

অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন,
তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।

ধনপতি

চেষ্টা করা যাক।
দৈবক্রমে চেষ্টা যদি সফল হয়, অপরাধ নিয়ো না তবে

দলের লোকের প্রতি

বলো সিদ্ধিরস্তু!

সকলে

সিদ্ধিরস্তু!

ধনপতি

লাগো তবে ভাগ্যবানেরা। টান দেও।

ধনিক

রশি তুলতেই পারি নে। বিষম ভারি !

ধনপতি

এসো কোষাধ্যক্ষ, ধরো তুমি কষে।
বলো সিদ্ধিরস্তু! টানো, সিদ্ধিরস্তু!
টানো, সিদ্ধিরস্তু!

দ্বিতীয় ধনিক

মন্ত্রীমশায়, রশিটা যেন আরো আড়ষ্ট হয়ে উঠল,
আর আমাদের হাতে হল যেন পক্ষাঘাত!

সকলে

দুয়ো দুয়ো!

সৈনিক

যাক, আমাদের মানরক্ষা হল।

পুরোহিত

আমাদের ধর্মরক্ষা হল।

সৈনিক

যদি থাকত সেকাল, আজ তোমার মাথা যেত কাটা।

ধনপতি

ঐ সোজা কাজটাই জান তোমরা।
মাথা খাটাতে পার না, কাটতেই পার মাথা।
মন্ত্রীমশায়, ভাবছ কী।

মন্ত্রী

ভাবছি, সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল—
এখন উপায় কী।

ধনপতি

এবার উপায় বের করবেন স্বয়ং মহাকাল।
তাঁর নিজের ডাক যেখানে পৌঁছবে
সেখান থেকে বাহন আসবে ছুটে।
আজ যারা চোখে পড়ে না
কাল তারা দেখা দেবে সব চেয়ে বেশি।
ওহে খাতাঞ্চি, এইবেলা সামলাওগে খাতাপত্র—
কোষাধ্যক্ষ, সিন্ধুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।

[ধনপতি ও তার দলের প্রস্থান]

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

হাঁ গা, রথ চলল না এখনো, দেশসুদ্ধ রইল উপোস করে।
কলিকালে ভক্তি নেই যে।

মন্ত্রী

তোমাদের ভক্তির অভাব কী বাছা,
দেখি-না তার জোর কত।

প্রথমা

নমো নমো,
নমো নমো বাবা দড়ি-ঠাকুর, অন্ত পাই নে তোমার দয়ার।
নমো নমো।

দ্বিতীয়া

তিনকড়ির মা বললে, সতেরো বছরের ব্রাহ্মণের মেয়ে—
ঠিকদুক্কুর বেলা, বোম ভোলানাথ ব'লে
তালপুকুরে—ঘাটের থেকে তিন হাতের মধ্যে—
একডুবে তিন গোছা পাট-শিয়ালা তুলে
ভিজে চুল দিয়ে বেঁধে দড়ি-প্রভুর কাছে পোড়ালে
প্রভুর টনক নড়বে! জোগাড় করেছি অনেক যত্নে,
সময়ও হয়েছে পোড়াবার।
আগে দড়ি-বাবার গায়ে সিঁদুর চন্দন লাগা।
ভয় কিসের, ভক্তবৎসল তিনি—

মনে মনে শ্রীগুরুর নাম করে গায়ে হাত ঠেকালে
অপরাধ নেবেন না তিনি।

প্রথমা

তুই দে-না ভাই চন্দন লাগিয়ে, আমাকে বলিস কেন।
আমার দেওরপো পেটরোগা,
কী জানি কিসের থেকে কী হয়।

তৃতীয়া

ঐ তো ধোঁয়া পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে।
কিন্তু জাগলেন না তো!
দয়াময়!
জয় প্রভু, জয় দড়ি-দয়াল প্রভু, মুখ তুলে চাও।
তোমাকে দেব পরিয়ে পঁয়তাল্লিশ ভরির সোনার আংটি—
গড়াতে দিয়েছি বেণী স্যাকরার কাছে।

দ্বিতীয়া

তিন বছর থাকব দাসী হয়ে, ভোগ দেব তিন বেলা।
ওলো বিনি, পাখাটা এনেছিস তো বাতাস কর্-না—
দেখছিস্ নে রোদ্দুরে তেতে উঠেছে ওঁর মেঘবরন গা !
ঘটি করে গঙ্গাজলটা ঢেলে দে।
ঐখানকার কাদাটা দে তো ভাই আমার কপালে মাখিয়ে।
এই তো আমাদের খেঁদি এনেছে খিচুড়ি-ভোগ।
বেলা হয়ে গেল, আহা কত কষ্ট পেলেন প্রভু।
জয় দড়ীশ্বর, জয় মহাদড়ীশ্বর, জয় দেবদেবদড়ীশ্বর,
গড় করি তোমায়, টলুক তোমার মন।
মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন।
পাখা কর্ লো ; পাখা কর্, জোরে জোরে।

প্রথমা

কী হবে গো, কী হবে আমাদের—
দয়া হল না যে! আমার তিন ছেলে বিদেশে,
তারা ভালোয় ভালোয় ফিরলে হয়।

চরের প্রবেশ

মন্ত্রী

বাছারা, এখানে তোমাদের কাজ হল—
এখন ঘরে গিয়ে জপতপ ব্রতনিয়ম করোগে।
আমাদের কাজ আমরা করি।

প্রথমা

যাচ্ছি, কিন্তু দেখো মন্ত্রীবাবা,
ঐ ধোঁয়াটা যেন শেষ পর্যন্ত থাকে—
আর ঐ বিল্বিপত্রটা যেন পড়ে না যায়।

[মেয়েদের প্রস্থান]

৮৫.৪ সারাংশ

নাটকের প্রথমেই দেখা যাচ্ছে অসংখ্য নরনারী মেলায় এসেছে রথযাত্রা দেখতে। কিন্তু রথ চলছে না, 'চারিদিকে সব যেন থম্‌থমে হয়ে আছে'। পথের পাশে রথের মেলা বসেছে। কিন্তু 'দোকানি-পসারিরা চুপচাপ বসে, কেনা-বেচা বন্ধ। সকলে বিহ্বল, বিচলিত। সন্ন্যাসী তাদের ভয়কে আরো বাড়িয়ে তোলে, রথ চলছে না মানে মহাধ্বংস নেমে আসবে। 'পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে অসাড় দড়িটা'। মেয়েরা ভয় পেয়ে দড়ি দেবতার পূজোর আয়োজন করে। নাগরিকবৃন্দ ঘটনাস্থলে এসে দড়ি সম্পর্কে নানা কল্পনা করতে থাকে, ভয়ও পায়। তারা অজ্ঞানতাবশে ভাবল মহাকালের নাড়ীর টান বোধ করি পিছনের দিকে। তারা সিদ্ধান্তে এলো রথের চাকায় গতি সঞ্চার করতে পারেন একমাত্র কোনো পুণ্যাত্মা ব্যক্তি। এমন সময় সন্ন্যাসী জানিয়ে দিলেন 'কালের গতিকে পথ হয়েছে দুর্গম, উঁচু-নিচু, গভীর গর্ত, তাকে করতে হবে সমান, তবে ঘুচবে বিপদ'। সন্ন্যাসীর এ তত্ত্বকথা সাধারণে বুঝল না, তারা মনে করল মানবসমাজে হয়েছে মহাসংকট। এরপর একে একে এলো সৈনিকবৃন্দ—রাজশক্তি রক্ষক, ক্ষত্রিয় শক্তির প্রতীক। শক্তির দম্ভে তারা উদ্ধত। ধনিকেরা ভাবল বিত্ত বৈভবে তারা সবার সেরা। তারা অর্থশক্তিতে রথকে সচল করবে। তাদের হাতের স্পর্শে রথতো চললই না বরং অনড় হয়ে গেল। পরিশেষে তারা বুঝতে পেরেছিল, পুরোহিত তন্ত্র নয়, ক্ষত্রিয় বা রাজতন্ত্র নয়, এমনকি ধনতন্ত্রও নয়, মহাকালই তার রথচক্রে গতি সঞ্চার করবেন তাদের দিয়ে যারা এতদিন ধরে পড়ে আছে নিচে—নিষ্পেষিত শূদ্রশক্তি। তাদের জাগতে আর দেরী নেই। ধনিকেরা তাই আপন ঘর সামলাবার হুঁশিয়ারী দেয়—

ওহে খাতাঞ্চি, এইবেলা সামলাওগে খাতাপত্র—
কোষাধ্যক্ষ, সিন্ধুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।

এদিকে অনভিজ্ঞ মেয়েরা সকলে মিলে পুজোর আয়োজন করে। এমনি সময় চর এলো বার্তা নিয়ে।

৮৫.৫ মূলপাঠ ২ ঃ রথের রশি

চর

মন্ত্রীমশায়, গোল বেধেছে শূদ্রপাড়ায়।

মন্ত্রী

কী হল!

চর

দলে দলে ওরা আসছে ছুটে, বলছে, রথা চালাব আমরা।

সকলে

বলে কী! রশি ছুঁতেই পাবে না।

চর

ঠেকাবে কে তাদের, মারতে মারতে তলোয়ার যাবে ক্ষয়ে।
মন্ত্রীমশায়, বসে পড়লে যে!

মন্ত্রী

দল বেঁধে আসছে বলে ভয় করি নে—
ভয় হচ্ছে পারবে ওরা।

সৈনিক

বল কী মন্ত্রীমহারাজ, শিলা জলে ভাসবে?

মন্ত্রী

নীচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়,
বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।

সৈনিক

আদেশ করুন কী করতে হবে, ভয় করি নে আমরা।

মন্ত্রী

ভয় করতেই হবে, তলোয়ারের বেড়া তুলে বন্যা
ঠেকানো যায় না।

চর

এখন কী আদেশ বলুন।

মন্ত্রী

বাধা দিয়ো না ওদের।
বাধা পেলে শক্তি নিজেকে নিজে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায় না।

চর

ঐ-যে এসে পড়েছে ওরা।

মন্ত্রী

কিছু কোরো না তোমরা, থাকো স্থির হয়ে।

শূদ্রদলের প্রবেশ

দলপতি

আমরা এলেম বাবার রথ চালাতে।

মন্ত্রী

তোমরাই তো বাবার রথ চালিয়ে আসছ চিরদিন।

দলপতি

এতদিন আমরা পড়তেম রথের চাকার তলায়,
দ'লে গিয়ে ধুলোয় যেতুম চ্যাপটা হয়ে।
এবার সেই বলি তো নিল না বাবা!

মন্ত্রী

তাই তো দেখলেম।
সকাল থেকে চাকার সামনে ধুলোয় করলে লুটোপুটি—
ভয়ে উপরে তাকালে না, পাছে ঠাকুরের দিকে চোখ পড়ে—
তবু তো চাকার মধ্যে একটুও দেখা গেল না ক্ষুধার লক্ষণ!

পুরোহিত

একেই বলে অগ্নিমান্দ্য,
তেজ ক্ষয় হলেই ঘটে এই দশা।

দলপতি

এবার তিনি ডাক দিয়েছেন তাঁর রশি ধরতে।

পুরোহিত

রশি ধরতে! ভারি বুদ্ধি তোমাদের! জানলে কী করে।

দলপতি

কেমন করে জানা গেল সে তো কেউ জানে না।
ভোরবেলা উঠেই সবাই বললে সবাইকে,
ডাক দিয়েছেন বাবা। কথাটা ছড়িয়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
পেরিয়ে গেল মাঠ, পেরিয়ে গেল নদী,
পাহাড় ডিঙিয়ে গেল খবর—
ডাক দিয়েছেন বাবা।

সৈনিক

রক্ত দেবার জন্যে।

দলপতি

না, টান দেবার জন্যে।

পুরোহিত

বরাবর সংসার যারা চালায়, রথের রশি তাদেরই হাতে।

দলপতি

সংসার কি তোমরাই চালাও ঠাকুর!

পুরোহিত

স্পর্ধা দেখো একবার! কথার জবাব দিতে শিখেছে—
লাগল ব'লে ব্রহ্মশাপ।

দলপতি

মন্ত্রীমশায়, তোমরাই কি চালাও সংসার।

মন্ত্রী

সে কী কথা। সংসার বলতে তো তোমরাই।
নিজগুণেই চল, তাই রক্ষে।
চালাক লোকে বলে আমরাই চালাচ্ছি।
আমরা মান রাখি লোক ভুলিয়ে।

দলপতি

আমরাই তো জোগাই অন্ন, তাই তোমরা বাঁচ ;
আমরাই বুনি বস্ত্র, তাতেই তোমাদের লজ্জারক্ষা।

সৈনিক

সর্বনাশ! এতদিন মাথা হেঁট করে বলে এসেছে ওরা—
তোমরাই আমাদের অন্নবস্ত্রের মালিক।
আজ ধরেছে উল্টো বুলি, এ তো সহ্য হয় না।

মন্ত্রী

সৈনিকের প্রতি

চুপ করো!
সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই,
তোমরা নারায়ণের গরুড়।
এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।
তার পরে আসবে আমাদের কাজের পালা।

দলপতি

আয় রে ভাই, লাগাই টান, মরি আর বাঁচি।

মন্ত্রী

কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো।
বরাবর যে-রাস্তায় রথ চলেছে, যেয়ো সেই রাস্তা ধরে।
পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।

দলপতি

কখনো বড়ো রাস্তায় চলতে পাই নি, তাই রাস্তা চিনি নে।
রথে আছেন যিনি তিনিই সামলাবেন।
আয় ভাই, দেখছিস রথচূড়ায় কেতনটা উঠছে দুলে।
বাবার ইশারা। ভয় নেই আর, ভয় নেই।
ঐ চেয়ে দেখ্ রে ভাই,
মরা নদীতে যেমন বান আসে
দড়ির মধ্যে তেমনি প্রাণ এসে পৌঁচেছে।

পুরোহিত

ছুঁলো, ছুঁলো দেখছি ছুঁলো শেষে, রশি ছুঁলো পাষণ্ডেরা!

মেয়েদের ছুটিয়া প্রবেশ

সকলে

ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, দোহাই বাবা—
ও গদাধর, ও বনমালী, এমন মহাপাপ কোরো না।
পৃথিবী যাবে যে রসাতলে!
আমাদের স্বামী ভাই বোন ছেলে
কাউকে পারব না বাঁচাতে.
চল রে চল, দেখলেও পাপ আছে।

[প্রস্থান]

পুরোহিত

চোখ বোজো, চোখ বোজো তোমরা।
ভস্ম হয়ে যাবে ক্রুদ্ধ মহাকালের মূর্তি দেখলে।

সৈনিক

একি, একি, চাকার শব্দ নাকি—
না আকাশটা উঠল আর্তনাদ করে?

পুরোহিত

হতেই পারে না—কিছুতেই হতে পারে না—
কোনো শাস্ত্রেই লেখে না।

নাগরিক

নড়েছে রে, নড়েছে, ঐ তো চলেছে!

সৈনিক

কী ধুলোই উড়ল—পৃথিবী নিশ্বাস ছাড়ছে.
অন্যায়, ঘোর অন্যায়! রথ শেষে চলল যে—
পাপ, মহাপাপ,

শূদ্রদল

জয় জয়, মহাকালনাথের জয়!

পুরোহিত

তাই তো, এও দেখতে হল চোখে!

সৈনিক

ঠাকুর, তুমিই হুকুম করো, ঠেকাব রথ-চলা।
বৃদ্ধ হয়েছেন মহাকাল, তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হল—
দেখলেম সেটা স্বচক্ষে!

পুরোহিত

সাহস হয় না হুকুম করতে।
অবশেষে জাত খোয়াতেই বাবার যদি খেয়াল গেল
এবারকার মতো চুপ করে থাকো, রঞ্জুলাল।
আসছে বারে ওঁকে হবেই প্রায়শ্চিত্ত করতে।
হবেই, হবেই, হবেই।
ওঁর দেহ শোধন করতে গঙ্গা যাবে শুকিয়ে।

সৈনিক

গঙ্গার দরকার হবে না.
ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে,
ঢালব ওদের রক্ত।

নাগরিক

মন্ত্রীমশায়, যাও কোথায়।

মন্ত্রী

যাব ওদের সঙ্গে রশি ধরতে।

সৈনিক

ছি ছি, ওদের হাতে হাত মেলাবে তুমি!

মন্ত্রী

ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ।
স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন।
এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদেরই সঙ্গো সমান হয়ে।

সৈনিক

তাই বলে ওদেরই একসারে রশি ধরা !
ঠেকাবই আমরা, রথ চলুক আর নাই চলুক।

মন্ত্রী

এবার দেখছি চাকার তলায় পড়বার পালা তোমাদেরই

সৈনিক

সেও ভালো। অনেককাল চন্ডালের রক্ত শুষে
চাকা আছে অশুচি,
এবার পাবে শুদ্ধ রক্ত। স্বাদ বদল করুক।

পুরোহিত

কী হল মন্ত্রী, এ কোন্ শনিগ্রহের ভেলকি?
রথটা যে এরই মধ্যে নেমে পড়েছে রাজপথে।
পৃথিবী তবু তো নেমে গেল না রসাতলে!
মাতাল রথ কোথায় পড়ে কোন্ পল্লীর ঘাড়ে, কে জানে।

সৈনিক

ঐ দেখো, ধনপতির দল আর্তনাদ করে ডাকছে আমাদের।
রথটা একেবারে সোজা চলেছে ওদেরই ভান্ডারের মুখে।
যাই ওদের রক্ষা করতে।

মন্ত্রী

নিজেদের রক্ষার কথা ভাবো।
দেখছ না, ঝুঁকেছে তোমাদের অস্ত্রশালার দিকে.

সৈনিক

উপায়?

মন্ত্রী

ওদের সঙ্গো মিলে ধরো-সে রশি।

বাঁচবার দিকে ফিরিয়ে আনো রথটাকে—
দো-মনা করবার সময় নেই।

[প্রস্থান]

সৈনিক

কী করবে ঠাকুর, তুমি কী করবে।

পুরোহিত

বীরগণ, তোমরা কী করবে বলো আগে।

সৈনিক

কী করতে হবে বলো-না ভাইসকল!
সবাই যে একেবারে চুপ করে গেছ!
রশি ধরব, না লড়াই করব?
ঠাকুর, তুমি কী করবে বলোই-না।

পুরোহিত

কী জানি, রশি ধরব, না শাস্ত্র আওড়াব?

সৈনিক

গেল, গেল সব। রথের এমন হাঁক শুনি নি কোনো পুরুষে।

দ্বিতীয় সৈনিক

চেয়ে দেখ্-না, ওরাই কি টানছে রথ
না রথটা আপনিই চলেছে ওদের ঠেলে নিয়ে!

তৃতীয় সৈনিক

এতকাল রথটা চলত যেন স্বপ্নে—
আমরা দিতেম টান আর ও পিছে পিছে আসত
দড়িবাঁধা গোরুর মতো।
আজ চলেছে জেগে উঠে। বাপ্ রে, কী তেজ।
মানছে না আমাদের বাপদাদার পথ—
একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতো।
পিঠের উপরে চড়ে বসেছে যম।

দ্বিতীয় সৈনিক

ঐ-যে আসছে কবি, ওকে জিজ্ঞাসা করি ব্যাপারটা কী।

পুরোহিত

পাগলের মতো কথা বলছ তোমরা।
আমরাই বুঝলেম না মানে, বুঝবে কবি?
ওরা তো বানিয়ে বানিয়ে বলে কথা— শাস্ত্র জানে কী।

কবির প্রবেশ

দ্বিতীয় সৈনিক

এ কী উল্টো-পাল্টা ব্যাপার কবি!
পুরুতের হাতে চলল না রথ, রাজার হাতে না—
মানে বুঝলে কিছু?

কবি

ওদের মাথা ছিল অত্যন্ত উঁচু,
মহাকালের রথের চূড়ার দিকেই ছিল ওদের দৃষ্টি—
নীচের দিকে নামল না চোখ,
রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ।
মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে-বাঁধন তাকে ওরা মানে নি।
রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে—
দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।

পুরোহিত

তোমরা শূদ্রগুলোই কি এত বুদ্ধিমান—
ওরাই কি দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে।

কবি

পারবে না হয়তো।
একদিন ওরা ভাববে, রথী কেউ নেই, রথের সর্বময় কর্তা ওরাই
দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাতলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।

পুরোহিত

তখন যদি রথ আর—একবার অচল হয়
বোধ করি তোমার মতো কবিরই ডাক পড়বে—
তিনি ফুঁ দিয়ে ঘোরাবেন চাকা!

কবি

নিতান্ত ঠাট্টা নয়, পুরুতঠাকুর!
রথযাত্রার কবির ডাক পড়েছে বারে বারে।
কাজের লোকের ভিড় ঠেলে পারে নি সে পৌঁছতে।

পুরোহিত

রথ তারা চালাবে কিসের জোরে। বুঝিয়ে বলো।

কবি

গায়ের জোরে নয়, ছন্দের জোরে।
আমরা মানি ছন্দ, জানি একঝোঁকা হলেই তাল কাটে।
মরে মানুষ সেই অসুন্দরের হাতে
চাল-চলন যার একপাশে বাঁকা ;
কুম্ভকর্ণের মতো গড়ন যার বেমানান,
যার ভোজন কুৎসিত,
যার ওজন অপরিমিত।
আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মান কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।
বাইরে ঠেলা-মারার উপর বিশ্বাস,
অন্তরের তালমানের উপর নয়।

সৈনিক

তুমি তো লম্বা উপদেশ দিয়ে চললে,
ও দিকে যে লাগল আগুন।

কবি

যুগাবসানে লাগেই তো আগুন।
যা ছাই হবার তাই ছাই হয়,
যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।

সৈনিক

তুমি কি করবে, কবি!

কবি

আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।

সৈনিক

কী হবে তার ফল।

কবি

যারা টানছে রথ তারা পা ফেলবে তালে তালে।
পা যখন হয় বেতালা
তখন খুদে খুদে খালখন্দগুলো মারমূর্তি ধরে।
মাতালের কাছে রাজপথও হয়ে ওঠে বন্ধুর।

মেয়েদের প্রবেশ

প্রথমা

এ হল কী ঠাকুর!
তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিয়েছিলে।
দেবতা মানলে না পুজো, ভক্তি হল মিছে।
মানলে কিনা শুদ্দুরের টান, মেলেচ্ছের ছোঁওয়া!
ছি ছি, কী ঘেন্না।

কবি

পুজো তোমরা দিলে কোথায়।

দ্বিতীয়া

এই তো এইখানেই।
'ঘি ঢেলেছি, দুধ ঢেলেছি ঢেলেছি গঙ্গাজল—
রাস্তা এখানো কাদা হয়ে আছে।
পাতায় ফুলে ওখানটা গেছে পিছল হয়ে।

কবি

পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছ মাটি!
রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে।
সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা ; দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে।
সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।

তৃতীয়া

আর ওরা— যাদের নাম করতে নেই?

কবি

ওদের দিকেই ঠাকুর পাশ ফিরলেন—
নইলে ছন্দ মেলে না। একদিকটা উঁচু হয়েছিল অতিশয় বেশি,
ঠাকুর নীচে দাঁড়ালেন ছোটোর দিকে,

সেইখান থেকে মারলেন টান, বড়োটাকে দিলেন কাত করে।
সমান করে নিলেন তাঁর আসনটা

প্রথমা

তার পরে হবে কী।

কবি

তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না ;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

সন্ন্যাসীর প্রবেশ

সন্ন্যাসী

জয়, মহাকালনাথের জয়!

৮৫.৬ সারাংশ

ধনিকদের আশঙ্কা অনতিবিলম্বে বাস্তবায়িত হয়। 'চর' এসে জানায় 'গোল বেধেছে শূদ্রপাড়ায়'—অর্থাৎ ওরা জেগেছে। শাস্ত্রবিশ্বাসীরা এ জাগরণকে বিশ্বাস করতে পারেনা। কিন্তু মন্ত্রীমশায় এ উত্থান অবধারিত মেনে একে 'প্রলয়' এবং 'যুগান্তর' আখ্যায়িত করে বলেন—"নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়। বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।" অর্থাৎ প্রতিষ্ঠিত শক্তির একাধিপত্য ধ্বংস করে নতুন ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাই হল প্রলয় বা বিপ্লব। পুরোহিত (ব্রাহ্মণতন্ত্র), ক্ষত্রিয় (রাজতন্ত্র) ও বণিক (ধনতন্ত্র)-এর শাসন অবসানের জন্যই শূদ্র (শ্রমজীবী)-দের জাগরণ। এটাই বিপ্লব, এটাই যুগান্তর।

পুরোহিত-সৈনিকরা মানতে চাইলনা। তাদের সমস্ত বাধা অস্বীকার করে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে শূদ্রেরা মহাকালনাথের জয়ধ্বনি দিয়ে রশি ধরে টান দেওয়া মাত্র রথ চলতে থাকে তার প্রচলিত পথ ধরে নয়। রাজপথ ছেড়ে এবার জনপদের দিকে এগিয়ে চলে—অসমতলকে সমতল করে দেবার লক্ষ্যে।

শঙ্কিত, বিপর্যস্ত পুরোহিত, ক্ষত্রিয় ও ধনিকের দল নিজ নিজ শক্তির আধার মন্দির, অস্ত্রাগার ও ধনভাণ্ডার রক্ষার জন্য রথের গতিরোধ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে।

এমনি সময় কবি উপস্থিত হলেন। সত্যদ্রষ্টা কবির কাছে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনার মূল কারণ জানবার জন্য সকলে ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন। কবি যা বললেন তা হল—এতদিন সমাজ যারা চালাতেন তাঁরা অভিজাত শ্রেণির, তাঁরা রথের চূড়োর দিকটাই দেখতেন। নিচের দিকে তাকিয়ে দড়ি অর্থাৎ মানুষে মানুষে সে সম্পর্ক বন্ধন সেটি দেখতেন না। ফলে দড়ির বাঁধন হয়েছে আল্‌গা, টানে জোর আসেনি, রথও চলেনি। আজ শূদ্রের মিলিত শক্তি মহাকালের রথ চলাকে বাস্তবায়িত করেছে।

কবির কথা শুনে পুরোহিত সন্দেহ প্রকাশ করে বললেন ওরা তো এতদিন ছিল অপাংক্তেয়, ওরা দড়ির নিয়ম মেনে চলতে পারবে কী? কবি জানান ওঁরা আত্মশক্তির প্রকাশের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে, তবে যতদিন ওদের শক্তির প্রকাশে সংযম ও সুষমা থাকবে ততদিন গতি হবে স্বচ্ছন্দ। ব্যতিক্রম ঘটলে আসবে উল্টোরথের পালা। তখন আবার 'নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া'।

৮৫.৭ অনুশীলনী ১

১। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) "ভরা ফসলের খেতে বাসা বেধেছে উপবাস"
বলেছেন— প্রথম নাগরিক/সন্ন্যাসী/মন্ত্রী।

(খ) "মহাকালের পাণ্ডা ব'সে মাথায় হাত দিয়ে।"
বক্তা—দ্বিতীয়/প্রথম সৈনিক/দ্বিতীয় নাগরিক।

(গ) "চিরদিন রথ টানে ঐ ওরা—যাদের নাম করতে নেই।"
বক্তা—সন্ন্যাসী/পুরোহিত/তৃতীয় সৈনিক।

(ঘ) "কখনো বড়ো রাস্তায় চলতে পাই নি, তাই রাস্তা চিনি নে।"
বলেছেন—সৈনিক/দলপতি /নাগরিক।

(ঙ) "আমরা মানি সুন্দরকে। তোমরা মান কঠোরকে—
অস্ত্রের কঠোরকে, শাস্ত্রের কঠোরকে।"
বক্তা—কবি/সৈনিক/পুরোহিত।

২। "যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে।"—'যক্ষরাজ'-এর পরিচয় দিন। 'প্রায়োপবেশন' কথার অর্থ লিখুন।

৩। "তোমরা কেবলই করেছ ঋণ,
কিছুই কর নি শোধ,
দেউলে করে দিয়েছ যুগের বিত্ত। —বক্তা কে? উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৪। “নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।” —বক্তা কে? ‘প্রলয়’ ও ‘যুগান্তর’-এর অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৮৫.৮ রথের রাশি ঃ রচনা, দেশকাল, নামকরণ

রচনা ও দেশকাল ঃ

‘কালের যাত্রা’ গ্রন্থে ‘রথের রশি’ ও ‘কবির দীক্ষা’ দুটি রচনা সংকলিত। ‘কবির দীক্ষা’, ‘শিবের ভিক্ষা’ রচনার রূপান্তরিত রূপ। শেষোক্ত রচনার বক্তব্য শিবের ভিক্ষার মধ্য দিয়েই এসেছে “নব নব সম্পদ” শূন্যতার মধ্যেই আছে প্রাচুর্য। ‘রথের রশি’তে এর আভাস আছে—সামান্যের মধ্যেই আছে অসামান্য।

‘রথের রশি’ সাংকেতিক নাটক। ‘রথ’ হল কালপ্রবাহ মহাকাল, ‘রশি’ মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বন্ধন। সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষের ঐকান্তিক সম্বন্ধ বন্ধনেই মহাকালের রথ চলে। এর ব্যত্যয়ে মহাকালের রথচক্র অচল। তাই সমাজে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের বাদ দিয়ে তথাকথিত উচ্চবর্ণের শক্তি আজ অসহায় ও পঙ্গু। এই পরিস্থিতিতে কেউ বলছে মন্ত্র পড়ো, কেউ বলছে জোর করো, কেউবা বলছে ধনিকদের ডাকো, টাকায় সব হবে। এলো পুরোহিত— মন্ত্র পড়লেন, সৈনিক চোখ রাঙালো, বণিকের স্বর্ণচক্র এলো। কিন্তু কিছু হল না। সবাই উদ্বিগ্ন। অবশেষে সমাজের যত অচ্ছুৎ শূদ্রের দল এলো, তাদের হাতের ছোঁয়ায় রথের দড়ি নড়ে উঠল। রথ চলল গড়গড়িয়ে, বাধা পথ ছাড়িয়ে নতুন পথে। নাটকে এইভাবে সমাজের অন্ত্যজ শ্রেণির আনুকূল্যে রথের গতিলাভের ঘটনা, সমকালীন রাজনৈতিক বাতাবরণটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

‘কালের যাত্রা’র প্রকাশ ৩১শে ভাদ্র ১৩৩৯, শরৎচন্দ্রের ৫৭তম জন্মদিনে। কবি তাঁকেই নাটকটি উৎসর্গ করেছেন। পুস্তিকার প্রথম রচনা ‘রথের রশি’র পূর্বসূরী আছে—নাম ‘রথযাত্রা’ প্রকাশ প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩০ সাল। সুতরাং রথযাত্রা ও রথের রশির সময়ের ব্যবধান ১৩৩০-১৩৩৯, ইং ১৯২৩—১৯৩২—৯ বৎসর। এই সময় ভারতবর্ষের রাজনীতি অসহযোগ আন্দোলনে উত্তাল। দেশের আপামর জনসাধারণকে নিয়ে সার্বিক আন্দোলনের যুগ। এসময় দেশে অর্থনৈতিক অসাম্য, শিক্ষা বিস্তারের অভাবে মধ্যযুগীয় জাতপাতের ধারণা শাসকশক্তির প্রবর্তনায় প্রবল হয়ে ওঠে। দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে (১৯৩১) ভাবী শাসননীতি ও সংবিধান নিয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় ইংরেজ সরকার বর্ণ ও ধর্ম ভিত্তিক সাম্প্রদায়িক ভেদমূলক নির্বাচন ব্যবস্থা সুপারিশ করে। এই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার (Communal award) বিরুদ্ধে সমস্ত দেশে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। গান্ধীজি আমরণ অনশনের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন। রবীন্দ্রনাথ এইসব ঘটনা পরম্পরায় বিচলিত বোধ করেছেন। তিনি বলেন, “যাদের আমরা অপমানিত করে পায়ের তলায় ফেলি, তারাই আমাদের সম্মুখপথে পদক্ষেপের বাধা।—ভারতবর্ষে মানুযোচিত সম্মান থেকে যাদের আমরা পঞ্চিত করেছি, তাঁদের অগৌরবে আমরা সমস্ত ভারতবর্ষের অগৌরব ঘটিয়েছি।” রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন হিন্দু মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিরোধ কিংবা অস্পৃশ্যতা-প্রথা সমাজে বিচ্ছেদকে বাড়িয়ে তুলছে। ‘ব্রত উদ্‌যাপন’ প্রবন্ধে বলেছেন, “মুক্তি সাধনার সত্যপথ, মানুষের ঐক্য সাধনায়।

রাষ্ট্রিক পরাধীনতা আমাদের সামাজিক সহস্র ভেদ বিচ্ছেদকে অবলম্বন করে পুষ্ট। জড়প্রথার সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে উদার ঐক্যের পথে মানবসভ্যতা অগ্রসর হবে, সেদিন আজ সমাগত।" দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও শেষ পর্যন্ত এটি উপলব্ধি করেছিলেন বলে সর্বসম্মত মীমাংসায় উপনীত হন (Puna Pact)।

এই পটভূমিকায় 'রথের রশি' প্রকাশ। নাটকটিতে স্বভাবতই দেশকালের ছায়াপাত ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ তথাকথিত অনুন্নতদের পক্ষে সে কথা দ্বিধাহীনভাবে এখানে ব্যক্ত করেছেন। ইতিহাসের মর্মসত্যটি বুঝেছেন, ব্রাহ্মণ্য শক্তি, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য রাজতন্ত্রের পর দেশ সমাজ নতুন যুগে শ্রমজীবী শূদ্রের দ্বারা শাসিত হবে। শূদ্র রাজতন্ত্র অনিবর্য। আজকের মতো বলো সবাই মিলে — যারা এতদিন ঘরে ছিল তারা উঠুক বেঁচে। যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে, তারা দাঁড়াক এবার মাথা তুলে।"

সোভিয়েত বিপ্লব (১৯১৭) সম্পন্ন হবার পর, সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া রবীন্দ্রনাথ ভ্রমণ (১৯৩০) করে এসেছেন। সেখানে দেখেছেন শ্রমজীবী মানুষের নেতৃত্বে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা। ধনী, দরিদ্র সমমর্যাদায় সম-অধিকারে সেখানে প্রতিষ্ঠিত। কালের যাত্রায় এর প্রভাব থাকা স্বাভাবিক।

কালের যাত্রার এই সত্যটি বিবেকানন্দের ভারত চেতনাতেও স্পষ্ট। 'বর্তমান ভারত'-এ তিনি দেশের দরিদ্র, পতিত ও নিরক্ষরের মধ্যে নূতন ভারতের সম্ভাবনা দেখেছেন। তিনি বলেছেন, "ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ বেরিয়ে আসুক চাষার পর্ণকুটীর, জেলে, মালা, মেথরের ঝুপরি, ভুনাওয়ালার উনুন, কারখানা, হাট, বাজার, ঝোপ জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের শক্তির আধার-প্রজাপুঞ্জ। যেদিন সমাজের নেতৃবৃন্দ প্রজা সাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে। সেদিন তার পরাভব অবশ্যম্ভাবী। রবীন্দ্রনাথ এই কথাটিই তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেছেন, "ইহার পরে আর একটা লড়াই সামনে রহিল, সে বৈশ্যে শূদ্রে, মহাজনে মজুরে—কিছুদিন হইতে তাহার আয়োজন চলিতেছে। সেইটে চুকিলেই বর্তমান মনুর পালা শেষ হইয়া নূতন মন্বন্তর পড়িবে।"

এ থেকে বোঝা যায় 'রথের রশি' রচনায় সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রভাব সুস্পষ্ট। এদিক থেকে রচনাটিকে 'রবীন্দ্রনাথের— পুরাপুরি পোলিটিক্যাল নাট্যরচনা' বলা যায়। এ নাটকে বর্তমান যুগের সামাজিক সাম্যের কথাটি ব্যক্ত হয়েছে।

নামকরণ ঃ

যেকোনো শিল্প সৃষ্টিই সাধারণত বিশেষ নামে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এর গৌণ উদ্দেশ্য শিল্পকর্মটিকে অন্যান্য সৃষ্টি থেকে স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করা ; কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য নিগূঢ় ও অর্থবাহী। নাটকের নামকরণে প্রচলিত ত্রিবিধ রীতির যেকোনো একটিকে প্রায়শ প্রয়োগ করতে দেখা যায়। রীতিত্রয়— বিষয়বস্তু, চরিত্র ও ভাববস্তুর ওপর নির্ভরশীল। আর নাটক যেহেতু বস্তুনিষ্ঠ শিল্পকর্ম তাই নাটকের নামকরণে প্রত্যক্ষতা, সংক্ষিপ্ততা ও স্পষ্টতা থাকা বাঞ্ছনীয়। বর্তমান নাটকের ভাববস্তুটি মুখ্য প্রতিপাদ্য এবং তা সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হওয়ায় এর নামকরণটিও ব্যঞ্জনাধর্মী।

নাট্য পুস্তিকাটির নাম 'কালের যাত্রা' হলেও, এ নামে কোনো নাটক নেই। গ্রন্থভুক্ত দুটি রচনা স্বতন্ত্র

নামাঙ্কিত— 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'। নামকরণ বিচারকালে, তাই আমাদের সমগ্র বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

বিপুলা এই পৃথিবী এবং কালও নিরবধি। মহাকালের রথচক্র নিয়ত বহমান। পৃথিবীর যা কিছু দ্যোতমান বা প্রকাশমান তার সমস্তই কালের সঙ্গে একটি নিত্য সম্পর্কে আবদ্ধ। কোনো খণ্ড দৃষ্টি দিয়ে দৃশ্যমান জগতের কোনো কিছুকে সমগ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করলে মহাকাল তাকে গ্রহণ করে না। কালের রথচত্র স্তব্ধ হয়ে যায়। 'কালের যাত্রা'র দুটি রচনায় রথচক্রের চলার মর্ম সত্যটি উচ্চারিত হয়েছে। বলা হয়েছে— সমাজের গরিষ্ঠ জনদের উপেক্ষা করলে সংসারের রথ চলে না, তাঁদের শুভ সম্মেলনে 'কালের যাত্রা' পথ সচল হয়। এই বক্তব্য রবীন্দ্রনাথ তাঁর নানা প্রবন্ধে, গল্পে, নাটকে ইতোপূর্বে উপস্থিত করেছেন, এখানেও তারই পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করতে পারি। 'কালর যাত্রা' বস্তুত নবযুগের বার্তাবহ—'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা' তারই ভাষ্যকার।

'রথের রশি'র একটি পূর্বসূরী আছে, নাম 'রথযাত্রা'। শেষোক্ত রচনাটি সাধারণ গদ্যে লেখা। দুটি রচনার বিষয়বস্তু এক হলেও পরিবর্তনের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যঞ্জনার পার্থক্য আছে। 'রথযাত্রা'য় রথের গুরুত্ব ছিল বেশি, আর 'রথের রশি'তে 'রশি' কথাটির ব্যঞ্জনাই মুখ্য। রবীন্দ্রনাথ নিজে বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে—"রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেল মহাকালের রথ অচল। মানবসমাজের সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি, কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ বন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষ ভাবে পীড়িত করেছে, অপমানিত করেছে ; মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে। তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।" অর্থাৎ মহাকালের রথ চলবার পূর্বশর্ত মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বন্ধনের প্রসার। এ মানুষ ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সমাজের সর্বস্তরের মানুষ—এখানে, এতদিন যারা অপমানিত অবহেলিত শুদ্রজন বলে উপেক্ষিত হয়ে আসছিল, তাঁদেরও সবার নিমন্ত্রণ। মহাকালনাথের আনুকূল্য ওই গরিষ্ঠজনদের প্রতি। 'কালের যাত্রা'য় ব্যঞ্জিত এই বার্তাটি 'রথের রশি'তে মূর্ত ; সেদিক থেকে এ নামকরণটি সঙ্গতিপূর্ণ।

'কবির দীক্ষা' 'শিবের ভিক্ষা' নামে পূর্বে প্রকাশিত। রচনাটি নাট্য রসসিক্ত কাব্য হলেও উপস্থাপিত বক্তব্য ব্যঞ্জনায় 'কালের যাত্রা'র সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। 'শিব' কল্যাণের মঙ্গলের দেবতা ; শিবের ভিক্ষায় মঙ্গলের সত্যাদর্শটি উপস্থাপিত করতে চাওয়া হয়েছিল। 'কবির দীক্ষা'র কবি সেই শৈব মন্ত্রে বিশ্বাসী— 'কালিদাস ছিলেন শৈব। সেই পথের পথিক কবিরা।' এ কবি ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষা দেন, যার আদর্শ ভিক্ষুক সন্ন্যাসী শিব—যিনি মহত্ত্ব দিলেন, জগতের দরিদ্রকে—'দারিদ্র্য তারই মহত্ত্ব মহৎ যিনি ঐশ্বর্য্যে।' কবির দীক্ষায় এই ভাবে ত্যাগ ভোগ ঐশ্বর্য মহত্ত্ব মৃত্যু ও প্রাণের বার্তা সমগ্রের কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে। এদিক থেকে রচনাটি 'কালের যাত্রা'র মন্ত্রধ্বনির সগোত্র। কেন না বক্তব্য তো সর্বত্রই এক—জনশক্তি ও আত্মশক্তির উদ্বোধনেই 'কালের যাত্রা' সম্ভব ও সার্থক। 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'র ব্রাত্যজনের

প্রতিভূ কবি এই বার্তা সকলকে পৌঁছে দিয়েছেন। বক্তব্য সাম্যে চরণাদ্বয় 'কালের যাত্রা'য় অন্তর্ভুক্তি সঙ্গত ও মূল পুস্তিকাটির নামকরণ সার্থকতর করে তোলবার পক্ষে সহায়ক।

৮৫.৯ সারাংশ

১৩৩০-এ শরৎকালে 'রথযাত্রা' রচনা প্রকাশ প্রবাসী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ইংরাজি ১৯৩০-এ প্রকাশিত। 'রথযাত্রা'র পরিবর্তিত রূপ 'রথের রশি' ১৩৩৯ সালে 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে 'কবির দীক্ষা সহ সংকলিত। ১৩৩০-এর প্রবাসীতে 'রথযাত্রা' প্রকাশের সমকালে 'সমস্যা' এবং 'সমাধান' নামে দুটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন। সেখানে তিনি সামাজিক ভেদবুদ্ধি সামাজিক মঙ্গালের প্রধান বাধা মনে করেছেন। 'রথের রশি' নাটকটিতে কবির সমাজ-মানসের উপরোক্ত ধারণাটি ব্যক্ত হয়েছে। তিনি দেখিয়েছেন সমাজ যখন ব্রাহ্মণ পুরোহিত, ক্ষত্রিয় ও ধনিক শ্রেণি শাসন করছে তখন তারা নিজের ক্ষমতার আধার রূপ মন্দির অস্ত্রাগার ও ধনভাণ্ডার রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্যই ব্যস্ত থেকেছে। প্রজা সাধারণ যাঁরা সম্পদ সৃষ্টি করে, যাঁদের সংখ্যাধিক্য, যাঁরা সমাজ-সংসার যাত্রাকে নির্বিঘ্ন করে, তাঁদের দিকে তাকিয়েও দেখে না। এই যে হৃদয় সম্পর্কের শৈথিল্য, এটিই কালক্রমে সমাজের চলার পথকে করে দুর্গম ও দুর্বহ। মহাকালের রথচক্র অচল হয়ে পড়ে। 'রথের রশি'কে এদিক থেকে মানবসমাজ প্রবাহের অগ্রগতির কাহিনী বলা যেতে পারে।

'রথের রশি' রচনার প্রেরণা রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া দর্শনের (১৯৩০) অভিজ্ঞতার সঙ্গো সমকালীন জীবন, সমাজ ও সময়-চেতনাও সক্রিয় ছিল মনে হয়। ভারতের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সে সময় হিন্দু মুসলমান ভেদ ছাড়াও বর্ণহিন্দু, অনুন্নত সম্প্রদায় ভেদব্যবস্থা তীব্র দ্বন্দ্ব চলছে। সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারার বিরুদ্ধে দেশময় প্রতিবাদের ঝড় বইছে। এসময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর মত যে কবিতায়, প্রবন্ধে ও নাটকে প্রকাশ করেছেন 'রথের রশি' তার মধ্যে অন্যতম। 'রথের রশি' নামকরণ প্রসঙ্গো রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—মানবসমাজের সবচেয়ে বড় দুর্গতি কালের গতিহীনতা। মানুষে মানুষে সম্বন্ধ বন্ধন রূপ রশিতে ভর করে কালের রথ চলে। সেই বন্ধনে গ্রন্থি পড়ায় মানব সম্বন্ধ দুর্বল হওয়ায় রথ চলছেনা। আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন, যাঁরা এতদিন মনুষ্যত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত থেকেছে। তাদের অসম্মান ঘুচলে, সমাজের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে। মানব সমন্বয়ের এই রূপটি 'রথের রশি' নামকরণের সাহায্যে নাট্যকার বোঝাতে চেয়েছেন।

৮৫.১০ অনুশীলনী ২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) 'কালের যাত্রা' গ্রন্থে —— ও —— দুটি রচনা।

(খ) 'রথের রশি'র পূর্বসূরী আছে —— নাম ——, প্রকাশ —— সাল।

(গ) তিনি বুঝেছেন ব্রাহ্মণ্য শক্তি, —— ও বৈশ্য রাজতন্ত্রের পর দেশ —— নতুন যুগে শ্রমজীবী —— দ্বারা শাসিত হবে।

(ঘ) "যারা যুগে যুগে ছিল —— হয়ে, তারা —— একবার —— তুলে।"

২। 'রথের রশি' রচনার রাজনৈতিক-সামাজিক প্রেক্ষাপটটি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। 'রথের রশি' নামকরণের তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৮৫.১১ 'রথের রশি' নাটকের চরিত্র বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলিকে যেমন দুটো ভাগে ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ আছে তেমন তাঁর নাটকের চরিত্রগুলোকে দুভাগে সাজানো যেতে পারে। তাঁর সামাজিক নাটকগুলিতে যে সমস্ত চরিত্র, তারা প্রত্যেকে বিশেষ ব্যক্তি, সেই হিসেবে বিশেষ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বিশেষ বিশেষ নামে তারা চিহ্নিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক নাটকগুলির মধ্যে তত্ত্বমূলক (রূপক ও সাংকেতিক) নাটকগুলোতে এমন এক শ্রেণির চরিত্র আছে যারা নির্বিশেষ ; বিশেষ ব্যক্তি নয়, তাই নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্বের হদিস পাওয়াও যেমন যায়না, তেমনি নির্দিষ্ট নামের নামাবলী তাদের গায়ে চাপানো থাকেনা। আবার এই ধরনের চরিত্রেরা রবীন্দ্র নাটকে বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে মণ্ডিত নয়। তাঁর রূপক সাংকেতিক নাটকগুলি যেমন একটা তত্ত্বকে ব্যক্ত করে, বিশ্লেষণ করে, এবং রূপায়িত করে—অর্থাৎ যে আইডিয়া বা ভাব অধরা, অ-রূপ বিশিষ্ট, তাকে রূপ দেওয়ার ঐকান্তিক অভিপ্রায়টা প্রাধান্য পায়—সেটা যেমন একাধিক নাটকে এসে পড়ে, পরিবর্তিত আঙ্গিকে ঠিক তেমনই চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ঘটে যায়। তাই অনিবার্য ভাবে চরিত্র সৃষ্টির ক্ষেত্রে এসে পড়ে পৌনঃপুনিকতা। তবে তার অর্থ এই নয় যে রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টিশীল প্রতিভার সীমাবদ্ধতা এ হেতু। আসলে এটা একটা অতৃপ্তিজনিত সৃষ্টিশীল চেষ্টার অবিরত প্রক্রিয়া, একটি ভাবের শিল্পসম্মত প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে যে চরিত্রটিকে তিনি সৃষ্টি করলেন, অপর একটি ভাববিশিষ্ট নাটকে হয়ত তিনি দেখতে পেলেন, পূর্ব নাটকের চরিত্রটি সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, তাই সেই চরিত্রটি নাম বদলিয়ে বা একই নামে এসে গেল পরিপূর্ণ হয়ে ওঠবার জন্য। কিংবা তিনি যখন বুঝলেন, পূর্বের কোনো নাটকে চরিত্রটিকে যে ভাবে দেখান হয়েছে, তাতে চরিত্রের প্রতি একপেশে মনোভাবের আরোপ হয়েছে, তাই, পরবর্তী কোন নাটকে সেই চরিত্রটিকে সঙ্গতিপূর্ণ কোনো প্রসঙ্গে স্থান দিয়ে পূর্বের ফাঁকটুকু পূরণ করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন। এই কাজ বিশিষ্ট চিন্তাশীল এবং অবিরত সৃষ্টিশীল শিল্পী সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে। তাই রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকে একই চরিত্রের হদিস পাওয়া যায়। কিন্তু একথা ঘুণাক্ষরে মনে স্থান দেওয়ার অবকাশ নেই যে একই ব্যক্তি, একই ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য নিয়ে একই বক্তব্যকে ব্যক্ত করবার জন্য বিভিন্ন নাটকে বার বার এসেছে।

রবীন্দ্রনাথের আর একটা জিনিস বুঝবার আছে ; এক শ্রেণীর নাটক, যাকে আমরা আইডিয়া অর্থাৎ ভাবপ্রধান বা তত্ত্বপ্রধান নাটক বলছি, তাতে যেমন ভাবের বিমূর্ত প্রকাশ ঘটেছে বিচিত্র রকম সংলাপের অবয়বে, তেমনই সেই ধরনের নাটকের চরিত্রেরাও হয়ে গেছে বিচিত্র রকম। এরা কোনো ব্যক্তি নয়,

এক একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রতিনিধি। নামের মধ্যে ব্যক্তির পরিচয়। কিন্তু নামহীন চরিত্রের মধ্যে ব্যক্তি নয় গোষ্ঠীর পরিচয়, গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব প্রকাশিত হয়। আমরা আমাদের আলোচ্য নাটক 'রথের রশি'তে এ ধরনের চরিত্রের দেখা পাই। প্রথাভিত্তিক বা গতানুগতিক নাট্যকর্মে এধরনের চরিত্র দেখা যায়না। দুটি বা একটি 'রিপ্রেজেন্টেটিভ' চরিত্র হয়তো কোনো কোনো নাটকে থেকে থাকে, তবে গোটা একটা নাটক এই রকম চরিত্র দিয়ে রচনা করা সহজ ব্যাপার নয়। যেটা সহজ, সে পথে সকলের আনাগোনা, রবীন্দ্রপ্রতিভা সেই বহু পদক্ষেপ চিহ্নিত পথ চিরকাল পরিহার করে চলেন। নিত্যনৈমিত্তিকতার বিবর্ণ চিন্তা ভাবনার দ্বারা কখনো তিনি প্রভাবিত হননি। সহজ, অথচ বহুজনের দৃষ্টিবহির্ভূত বিষয়কে শিল্পসম্মত করে তোলবার জন্যই রবীন্দ্রপ্রতিভার নিরলস প্রয়াস। কি কাব্যে, কি গল্প উপন্যাসে, কি নাট্যসাহিত্যে সেই প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। 'রথের রশি' নাটকের চরিত্র পরিকল্পনা আমাদের এই সিদ্ধান্তের সপক্ষে রায় দেবে। নাট্যসাহিত্যে এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি নিঃসন্দেহে অভিনব।

'রথের রশি' নাটকে এগারটি প্রতিনিধিস্থানীয় চরিত্র আছে। এরা হল মেয়ের দল, সন্ন্যাসী, নাগরিকবৃন্দ, সৈনিকবৃন্দ, ধনপতি ও তার অনুচরবর্গ, মন্ত্রী, চর, শূদ্রদল, পুরোহিত ও কবি। চরিত্রগুলির নামকরণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যাচ্ছে এরা কোনো নামাঙ্কিত চরিত্র নয়, নির্বিশেষ এবং শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক। মেয়েরা সরল, স্বল্প বুদ্ধির অধিকারিণী, সংস্কারাচ্ছন্ন, প্রথাভিত্তিক পথে চলতে তারা অভ্যস্ত। মহাকালের রথচক্র গতি হারিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছে। তাতে তারা ভয়ার্ত। রথ টানে যে রশি, তাতে তারা ভক্তি উজাড় করে দিতে কুণ্ঠাবোধ করেনা। 'দ্বিতীয়া— বুঝেছি আমাদের পূজো নেবেন ব'লে হত্যে দিয়ে পড়ে আছেন দড়ি-দেবতা/পুজো পেলেই হবেন তুষ্ট।' তাই দড়ি-দেবতার উদ্দেশ্যে নানারকম ভক্তিগদগদ সংলাপ উচ্চারণ করে যায় তারা। বিচিত্র রকম মানত করে দড়ি-দেবতাকে তুষ্ট করতে চায়। দড়ি-দেবতাকে প্রসন্ন করে তুলবার জন্য দ্বিতীয়া পুনরায় বলে, 'লো, ঢাল্ ঢাল্ ঘি, ঢাল্ দুধ, গঙ্গাজলের ঘটি কোথায়, ঢেলে দে-না জল / পঞ্চগব্য রাখ্ ঐখানে, জ্বালা পঞ্চপ্রদীপ।' কিন্তু তাদের এই ভক্তি রথের চাকায় গতি সঞ্চার করতে পারেনা। তারপর তারা সন্ন্যাসীর কথায় প্রভাবিত হয়ে দড়ি ছেড়ে, রাস্তা ঠাকুরের পুজো দিতে প্রস্তুত হয়, 'চল্ ভাই, তবে পুজো দিইগে রাস্তা-ঠাকুরকে।' এই ভক্তি তাদের একান্ত সংস্কারাচ্ছন্ন মনের অভিব্যক্তি। প্রাণহীন শব্দভাণ্ডার মাত্র। দড়ির মাহাত্ম্য বুঝতে তারা অক্ষম। প্রাণের সঙ্গে বন্ধন ঘটায় যে প্রীতি রজ্জু, তার পরিচয় থেকে তারা বঞ্চিত। সমাজে একদল অচ্ছুৎ থাকে, দেবতার দরজার দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করবে এই প্রথা বা সংস্কারকে মেনে নিয়ে শুধুমাত্র কতগুলো পুজোপকরণ নিক্ষেপ করে জগতের গতিপ্রবাহ অব্যাহত রাখবার পক্ষপাতী তারা। আবার এই সংস্কারের ব্যতিক্রম ঘটবার সময়ে তারা আহত হয়। প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠে। 'এ হল কী' ঠাকুর/তোমরা এতদিন আমাদের কী শিখিয়েছিলে। দেবতা মানলে না পুজো, ভক্তি হল মিছে। মানলে কি না শুদ্দুরের টান, মেলেচ্ছের ছোঁওয়া! ছি ছি, কী ঘেন্না।'

এই হল 'রথের রশি' নাটকে অঙ্কিত মহিলা চরিত্র। আমরা বলেছি এরা প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র। এরা প্রতিনিধিত্ব করেছে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত, সংস্কারাচ্ছন্ন, প্রাণহীন ভক্তি সর্বস্ব গ্রাম্য

নারীসমাজের। রবীন্দ্র সাহিত্যে অঙ্কিত সমস্ত নারীর মূল্যায়ন এই নিরিখে করা যাবেনা একথা বলা বাহুল্য।

সন্ন্যাসী চরিত্রটি এই নাটকে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। মানুষের বোধের বন্ধ দরজায় আঘাত করে জাগ্রত করে তুলতে চেয়েছে মনুষ্যত্বকে। যে মনুষ্যত্ব অন্ধসংস্কার, শক্তি দম্ভ, অর্থের ঔদ্ধত্যের তলায় চাপা পড়ে আছে, তাকে জাগিয়ে দেওয়ার ভূমিকা পালন করেছে। মানুষ যে উপরোক্ত অমনুষ্যোচিত বৃত্তির প্রবল প্রভাবে বিচ্ছিন্ন—সংস্কার, ঔদ্ধত্য, দম্ভ, আর রীতিসর্বস্বতা যে মানুষকে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ করতে পারেনি, তাইতো আজ মহাকাল ক্রুদ্ধ হয়ে গেছেন এই ইঙ্গিতটুকু তিনি পরিবেশন করে গেছেন। চরিত্রটি প্রথাভিত্তিক ; নিয়তি বা বিবেকের পথ ধরে 'রথের রশি' নাটকে সন্ন্যাসী রূপ নিয়েছে।

বস্তুত সন্ন্যাসী বা তজ্জাতীয় চরিত্র রবীন্দ্র নাটকের অন্যতম বিশেষত্ব। অনুরূপ চরিত্রের আভাস 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' রচনার কালেই পরিস্ফুট। এ শ্রেণীর চরিত্র বিষয়নিস্পৃহ সত্যদর্শী বাউলের সমগোত্রীয়। রবীন্দ্র নাটকে এরা কখনও দ্বিধাবিভক্ত কখনও বা অখণ্ড রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। রথের রশিতে 'কবি' সন্ন্যাসীর পরিপূরক।

নাগরিকবৃন্দ কর্মীর দল। নগরবাসী সাধারণ মানুষ। নারী-পুরুষের ভেদাভেদ বজায় রেখে চলবার মানসিকতা পোষণ করে। সেই সঙ্গে সমাজে বর্ণবৈষম্য মেনে চলবার পক্ষপাতী। তাই তারা শূদ্র জাগরণকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। সমাজে যারা অচ্ছুৎ অপাঙ্‌ক্তেয় বর্ণের বিচারে নিম্ন জাতীয় তারা অন্যান্য উচ্চবর্ণের ক্রিয়াকর্ম করবে এটা মেনে নিতে এতাবৎ কালের সযত্নলালিত সংস্কারে ধাক্কা লাগে। তাই তারা বলে, 'সেই শূদ্ররা শাস্ত্র পড়ছেন আজকাল, হাত থেকে কাড়তে গেলে বলেন, আমরা কি মানুষ নই।' তারা মনে করে শূদ্রের দেবালয়ে ঢোকবার সঙ্কল্প, এক ঘাটে নাইবার বাসনা প্রভৃতি অনাসৃষ্টির কারণ। নাগরিকদের বিশ্বাস, এই সব কারণে পথ চলছে না। 'এর পরেও রথ যে চলছে না, সে আমাদের প্রতি দয়া করে। চললে চাকার তলায় গুঁড়িয়ে যেত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড।' এই শূদ্র জাগরণকে তারা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেনা, 'আজ শূদ্র পড়ে শাস্ত্র, কাল লাঙল ধরবে ব্রাহ্মণ। সর্বনাশ!' তবে বিভিন্ন লোকপরম্পরায় তারা যুগের প্রবণতাকে ধরতে পারে। বুঝতে পারে এই কলিযুগে শাস্ত্র এবং শস্ত্র দুটোই অকেজো, 'চলে কেবল স্বর্ণচক্র'। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে চলে। রবীন্দ্রনাট্যে এই নাগরিকবৃন্দ এক বিশেষ সৃষ্টি। এরা কোনো কোনো নাটকে জনতা হিসেবে এসে পড়ে। অদ্ভুত এই চরিত্র সৃষ্টি। বুদ্ধি বিবেচনাহীন এই নাগরিকবৃন্দ অর্থাৎ জনগণ—রবীন্দ্রনাথ যাদের জনগণ বলেছেন ; বিশাল দেহ, মনুষ্যোচিত সব উপকরণের অধিকারী, কিন্তু মস্তকটি মস্তিষ্কহীন ক্ষুদ্র—তাই অন্যান্য শক্তিমান, বুদ্ধিমানদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে জীবন-পথ পরিক্রমণ করে চলে।

'রথের রশি' নাটকে সৈনিকবৃন্দ ক্ষত্রশক্তির লালন-পালনকারী হিসেবে অঙ্কিত হয়েছে। এরাও শূদ্র জাগরণের বিরুদ্ধে। তাই শুদ্ররাও মানুষ এই কথা শুনবার পর তাদের ক্ষত্রবীর্যে আঘাত লাগে। আস্ফালনে ফেটে পড়ে তারা, 'চল্-না ওদের পাড়ায় গিয়ে প্রমাণ করে আসি— ওরাই মানুষ না আমরা।' তবে

ক্ষত্রসূর্য যে অস্তাচলে চলে গেছে সেটা তারা বোঝে, তার পরিবর্তে বণিক তন্ত্র মাথা তুলেছে, এবং এদের সঙ্গে একটা সমঝোতা করে না চললে টিকে থাকা যাবেনা, সে বোধ তাদের আছে। কিন্তু তাই বলে শূদ্র আধিপত্য মেনে নেওয়ার পক্ষপাতী তারা নয়। বরং এই জাগরণের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে তারা তৎপর। তার জন্য শূদ্রদের সঙ্গে যে কোনো রকম সংঘর্ষে যেতে তারা দ্বিধা করেনা। শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের কৌলিন্য বজায় রেখে চলতে চেয়েছে।

ধনপতির দল বণিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি। এরা বুঝতে পারে একটা যুগান্তর আসন্ন। যেমন ভাবে পুরোহিত তন্ত্র তার রীতি সর্বস্বতার জন্য ধ্বংস-হয়ে গেছে, যেমন ভাবে ক্ষত্রিয়রা কালের ভ্রূকুটিতে নিষ্ক্রিয় পদার্থে পরিণত হয়েছে, তেমন ভাবে তারাও কেবল চাকায় তেল দিয়েছি, রশিতে টান দিই নি।'— কিন্তু তাদের টানেও রথ চললনা। অহংবোধে ঘা লাগল। বললে 'এবার উপায় বের করবেন স্বয়ং মহাকাল।' এই মহাকালের পথ ধরেই নিম্নবৃত্তিতে নিযুক্ত শূদ্র সম্প্রদায় মাথা তুলে দাঁড়াল। বণিক সম্প্রদায় তখন বুঝতে পেরেছে, 'আজ যারা চোখে পড়ে না কাল তারা দেখা দেবে সব চেয়ে বেশি।' তাই তারা নিজেদের ঘর সামলাবার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। বলে, 'ওহে খাতাঞ্চি, এইবেলা সামলাওগে খাতাপত্র—কোষাধ্যক্ষ, সিন্ধুকগুলো বন্ধ করো শক্ত তালায়।'

মন্ত্রী এই নাটকে রাজার প্রতিনিধি। রথ চলছে না, তাই তিনি চিন্তিত। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত-ক্ষত্রিয়-সৈনিকেরা রথ চালাতে পারলনা, মেয়েদের ভক্তি ও পূজা-অর্চনা রথের চাকায় গতি সঞ্চার করতে পারলনা। সর্বশেষ ডাক পড়ল ধনিক-বণিকদের। শেঠজিকে ডেকেছেন রাজা। সবাই আশা করছে, তাঁর টানেই রথ চলবে। তাঁরা রথ চালাবার চেষ্টা করলেন। মন্ত্রীর কথায়, 'অন্য সব শক্তি আজ অর্থহীন, / তোমাদের অর্থবান হাতের পরীক্ষা হোক।' কিন্তু সে চেষ্টাও কার্যকরী হল না। মহাকালের রথচক্র একটুও নড়ল না। মন্ত্রীর কাছে ইত্যবসরে খবর এলো শূদ্রের দল আসছে রথ চালাতে। তখন তিনি বুঝতে পারলেন একটা প্রলয় অনিবার্য। যে প্রলয়ের মধ্যে দিয়ে একটা যুগান্তর ঘটে যাবে। 'নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, / বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।' তিনি স্বাগত জানালেন শূদ্রদের, 'সর্দার, মহাকালের বাহন তোমরাই, / তোমরা নারায়ণের গরুড়। / এখন তোমাদের কাজ সাধন করে যাও তোমরা।' তবে তিনি এই অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানালেও, একথা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুললেন না, যে এই অভ্যুত্থান যেন ধ্বংসাত্মক না হয়, 'কিন্তু বাবা, সাবধানে রাস্তা বাঁচিয়ে চোলো। ... পোড়ো না যেন একেবারে আমাদের ঘাড়ের উপর।' শেষ পর্যন্ত মন্ত্রীও ওদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রথের রশি টানবার জন্য প্রস্তুত হন, 'যাব ওদের সঙ্গে রশি ধরতে।' সৈনিকবৃন্দ ছি-ছি করে উঠল, মন্ত্রীমশায় সত্যকে স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেন, 'ওরাই যে আজ পেয়েছে কালের প্রসাদ। স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন। এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদেরই সঙ্গে সমান হয়ে। সত্যদ্রষ্টা মন্ত্রীমশাই-এর যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মধ্যে মহামিলনের বার্তাটি সুস্পষ্ট। সমস্ত রকমের অভিমান বিসর্জন দিয়ে সর্বহারা মানুষদের সঙ্গে মিলে এক হয়ে চলাটাই যুগধর্ম। এই যুগধর্মকে মেনে নেওয়ার মধ্যেই মন্ত্রীমশাই-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত হয়েছে।

সবশেষে এই নাটকের বিশিষ্ট চরিত্র কবি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কবি প্রজ্ঞাবান, সত্যদ্রষ্টা।

এই জগৎ সংসার একটা ছন্দে লয়ে, তালে আবর্তিত হয়ে চলেছে। এই ছন্দের পতন ঘটলে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহাপ্রলয় ঘটে যাবে। বিশ্বজনের সমবেত চেষ্টায়, সকলের সম্মিলিত ঐক্যবোধে এই জগৎ সংসারের তাল ও ছন্দ রক্ষিত হয়। কাউকে ছোট করে নয়, কাউকে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে দূরে সরিয়ে রেখে জগতের গতিছন্দকে বজায় রাখা যাবেনা। সত্যদ্রষ্টা প্রজ্ঞাবান কবি সেটা জানেন। তিনি বুঝতে পারেন রথ চলছে না। এই জন্যে যে, ওরা 'রথের দড়িটাকেই করলে তুচ্ছ। মানুষের সঙ্গে মানুষকে বাঁধে যে-বাঁধন তাকে ওরা মানেনি।' তাই 'রাগী বাঁধন আজ উন্মত্ত হয়ে লেজ আছড়াচ্ছে— দেবে ওদের হাড় গুঁড়িয়ে।' কবি বুঝতে পেরেছেন আগামী দিনে নিম্নবৃত্তিতে নিযুক্ত চাষী, তাঁতি ইত্যাদি শ্রমজীবী মানুষের জয় হবে, 'জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের। তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।'

কবি সুন্দরের পূজারী। তাই অন্তরের তালমানের ওপর বিশ্বাসী। জগতের ছন্দ ও তাল রক্ষা করার ওপর তাঁর ভরসা। তাঁর মতে যা ভয়ঙ্কর, যা দৈহিক শক্তিজাত তা অসুন্দর এবং কুৎসিত। প্রকৃতপক্ষে, বিশ্বব্যাপারে শক্তি নেহাতই গৌণ, মুখ্য বিষয় হল প্রেম প্রীতি। অস্ত্রের কঠোরতা, শাস্ত্রের কঠোরতা প্রীতি আনেনা, আনে পারস্পরিক বিচ্ছিন্নতা। তখনই জগৎটা হয়ে পড়ে তাল ছন্দহীন অসুন্দর। তখনই এসে পড়ে এক চরম সংকট। সেই সংকটের মুহূর্তে, 'যা ছাই হবার তাই ছাই হয়, যা টিঁকে যায় তাই নিয়ে সৃষ্টি হয় নবযুগের।' এই যুগ-সংকটের মুখে কবি নিজের ভূমিকা নিজেই ব্যক্ত করে, 'আমি তাল রেখে রেখে গান গাব।... যারা টানছে রথ তারা পা ফেলবে তালে তালে।' জগৎ সংসার চলবে নিয়মিত এক সুন্দর গতিছন্দে বিভোর হয়ে। তিনি মেয়েদের বুঝিয়ে দেন তাদের ভক্তিও ভক্তি নয়, নইলে পূজা-অর্চনা রথচক্রে গতি সঞ্চার করতে পারল না কেন? কবি তাদের অভিযোগের উত্তর দিলেন স্পষ্ট ভাষায়, 'পুজো পড়েছে ধুলোয়, ভক্তি করেছ মাটি! রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে। সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা; দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে। সেইখানে জমেছে অপরাধ, বাঁধন হয়েছে দুর্বল।' তাই সত্যদ্রষ্টা প্রজ্ঞাবান কবি ঘোষণা করেন, 'এইবেলা থেকে বাঁধনটাতে দাও মন... রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না; রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে। আজকের মতো বলো সবাই মিলে... যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে, যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।'

কবি চরিত্র এই নাটকে কোনো ব্যক্তি নয়, একটি তত্ত্ব। একটি প্রতীক। সম্মিলনের তত্ত্ব, মিলনের প্রতীক। যে আদর্শের মাধ্যমে জগৎ-সংসারে সমন্বয় সাধিত হবে তারই প্রতীক। এই সূত্রে আমরা বলতে পারি কবি একটি আদর্শ। রবীন্দ্রনাথ বর্তমান শতাব্দীর তিরিশের দশক থেকে এমনই একটি আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে সাহিত্যসৃষ্টি করে চলছিলেন; রথের রশি নাটকে তারই নাট্যরূপ লাভ ঘটেছে।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে নানা কারণে রবীন্দ্রনাথ বিরল দৃষ্টান্ত। সে কথা আমরা পূর্ব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছি। চরিত্রসৃষ্টির দিক থেকেও সে কথা প্রণিধানযোগ্য। চরিত্র সৃষ্টির এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ মৌলিক এবং একান্ত রাবিন্দ্রিক। 'রথের রশি' নাটিকায় নারী চরিত্রগুলি অত্যন্ত বাস্তব। তাদের হাবভাব চলন বলন তাদের রীতিনিষ্ঠতা এবং সংস্কারপ্রিয়তা সবটাই বাস্তবানুগ। একথা বললে বোধ হয় অত্যুক্তি হবে না যে তিনি গ্রাম্য পরিবেষ্টনী থেকে এই সকল চরিত্রগুলোকে নাটকে তুলে এনেছেন। একই ভাবে

নাগরিকদের সম্পর্কেও এ কথা বলা চলে। তবে একথা ভুললে চলবে না যে, রবীন্দ্রনাথের একটা নিজস্ব সৃষ্টিশৈলী আছে। যাকে রাবিন্দ্রিক ধাঁচ বলা যেতে পারে। সেই ধাঁচে পড়ে চরিত্রগুলো বাস্তবের হয়েও একটা ভাব পরিমণ্ডলের আচ্ছাদনের অন্তরালবর্তী। সৈনিকবৃন্দ সম্পর্কেও সে কথা প্রযোজ্য। শূদ্র সম্প্রদায়ের দলপতিও উপরোক্ত বিচার বিশ্লেষণ থেকে বাদ যায়না।

৮৫.১২ সারাংশ

'রথের রশি' রূপক সাংকেতিক নাটক। এই শ্রেণীর নাটকের চরিত্রগুলিও রূপক / সংকেত আশ্রয়ী। 'রথের রশি'র চরিত্রগুলির একটি করে প্রতীকী রূপ আছে। এ নাটকের মন্ত্রী, ধনপতি, পুরোহিত এবং সৈনিক যথাক্রমে রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র এবং ক্ষাত্রশক্তির প্রতীক রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এই উপস্থাপনার সাহায্যে নাট্যকার দেখিয়েছেন বিশেষ ক্ষমতা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত অভিজাত গোষ্ঠী কিভাবে তাদের বুদ্ধি, অর্থ, শস্ত্র ও শাস্ত্রবলে রাষ্ট্রশাসন করতে গিয়ে সংকট তৈরি করেন। আর এই সংকট থেকে পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল জনগণের সম্মিলিত শক্তির সাহায্য। তত্ত্বপ্রধান নাটক 'রথের রশি'তে এই চরিত্রগুলি ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হয়নি। এরা এক একটি গোষ্ঠী বা শ্রেণীর প্রতীক। মেয়ের দল, সন্ন্যাসী, নাগরিক, ধনপতি, মন্ত্রী, পুরোহিত, কবি প্রভৃতি পরিচয় থেকে চরিত্রগুলি নির্বিশেষ শ্রেণী চরিত্রের প্রতীক তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এই গোষ্ঠী চরিত্রগুলির প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্য আছে। কিন্তু সে স্বাতন্ত্র্য গোষ্ঠীগত, ব্যক্তিগত নয়। গোষ্ঠী থেকে কোনো চরিত্রই ব্যক্তিতে মুক্তি পায়নি—এটা লক্ষণীয়।

৮৫.১৩ 'রথের রশি' নাটকের ভাষা

নাটক প্রত্যক্ষ ও দর্শনযোগ্য শিল্প। বর্ণনা বা বিশ্লেষণের জায়গা এই শিল্পকর্মে নেই। পাত্র-পাত্রীর মুখের কথায় টানাপোড়েনে বক্তব্য বিষয় চলে এগিয়ে। পাত্র-পাত্রীর মুখের কথাকেই বলা হয় সংলাপ। সুতরাং নাটক সংলাপ নির্ভর। সংলাপ বিভিন্ন রকম হয়। সামাজিক, ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক নাটকের সংলাপের ভিন্নতা অনস্বীকার্য। বস্তুত বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্যই এদের সংলাপের ভিন্নতার জন্য দায়ী। উপরোক্ত যে তিন রকম নাটকের কথা বলা হল, তার সংলাপ থেকে আবার তত্ত্বনাটক অর্থাৎ রূপক, সাংকেতিক বা প্রতীক নাটকের সংলাপ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

বাংলা নাট্যসাহিত্যে রূপক-সাংকেতিক নাটকের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ। এই শ্রেণীর নাটকের সংলাপ রচনায় তাঁর মৌলিকতাও অবশ্যস্বীকার্য। প্রতীকধর্মী সংলাপ আগে এমনভাবে দেখা যায়নি। এই ধরনের সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ রাজাধিরাজ। কঠিনতম অন্তর অভিব্যক্তি, সংকটময় দ্বন্দ্বমুখর পরিস্থিতি অদ্ভুত সংলাপের সমবায়ে মাধুর্যমণ্ডিত করে তুলতে রবীন্দ্রনাথের কলম সিদ্ধহস্ত। সংলাপটি যখন নিক্ষিপ্ত হবে তখনই হয়তো তার তাৎপর্যটা ধরা পড়বে না, কিন্তু যে মুহূর্তে দর্শক বা পাঠক ভাবতে শুরু করবে তখনই

বিস্ময়াভিভূত না হয়ে পারবে না। এই মন্তব্যের স্বপক্ষে 'রথের রশি' থেকে কয়েকটা সংলাপ উদ্ধৃত করা হল,—

সৈনিক

গঙ্গার দরকার হবে না!
ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে,
ঢালব ওদের রক্ত।

... ...

সৈনিক

সেও ভালো। অনেককাল চণ্ডালের রক্ত শুষে চাকা আছে অশুচি,
এবার পাবে শুদ্ধ রক্ত। স্বাদ বদল করুক।

... ...

সৈনিক

ঐ দেখো, ধনপতির দল আর্তনাদ করে ডাকছে আমাদের।
রথটা একেবারে সোজা চলেছে ওদেরই ভাণ্ডারের মুখে।
যাই ওদের রক্ষা করতে।

... ...

তৃতীয় সৈনিক

এতকাল রথটা চলত যেন স্বপ্নে—
আমরা দিতেম টান আর ও পিছে পিছে আসত
দড়িবাঁধা গোরুর মতো।
আজ চলেছে জেগে উঠে। বাপ্ রে, কী তেজ।
মানছে না আমাদের বাপদাদার পথ—
একটা কাঁচা পথে ছুটেছে বুনো মহিষের মতো।
পিঠের উপরে চড়ে বসেছে যম।

সংলাপগুলো আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে সংঘাতবিহীন, গতির তীব্রতা নেই যেন। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে মুমূর্ষু ক্ষত্রিয়তন্ত্রের নিরুপায় আস্ফালন ও অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা ধরা না পড়ে যাবে না। চরিত্রগুলো যেমন প্রতীক, প্রতীকধর্মী সংলাপের সুন্দর প্রয়োগে তারা জীবন্ত হয়ে উঠেছে আরো অনেক বেশি।

রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটক সাধারণ নাট্যমঞ্চে অভিনয়যোগ্য নয়, এই ধারণা পঞ্চাশের দশক পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই ধারণাকে ভুল বলে প্রতিপন্ন করেছে বহুরূপী নাট্য সম্প্রদায়। বস্তুতপক্ষে বহুরূপী রবীন্দ্রনাট্য প্রযোজনা করে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাট্যাভিনয় সম্পর্কে আমাদের ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছেন। তাই রবীন্দ্রনাথের প্রতীকধর্মী নাটকের সংলাপ প্রসঙ্গ আলোচনায় বহুরূপীর প্রযোজক

পরিচালক নট ও নাট্যকার শম্ভু মিত্রের কিছু কথা এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। 'রবীন্দ্রনাথের নাটক সম্পর্কে আমাদের অনেকের অনেক রকম ধারণা আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে যে, তার নাটক নাটক নয়. কাব্য। এতে নাটকীয়তা নেই। বর্তমান লেখকের এক সময়ে ধারণা ছিল যে, নাটকীয়তা থাকতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সংলাপ এতো আড়ষ্ট, এতো অস্বাভআবিক, যে যদু মধু হরি শ্যামের মন এর মধ্যে দিয়ে প্রকাশও পায়না এবং রসও গ্রহণ করেনা। পরে কিন্তু বার বার পড়তে পড়তে একটা নতুন বোধ আস্তে আস্তে উদ্ভব হল।'

... ...

'আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথের নাটক কী পরিমাণ অনুপ্রাণিত করে আমাদের, কী ভীষণ ভালো নাটক বলে মনে হয় সেগুলোকে। —তাই তো অনেক সময় আমার মনে হয় যে আমাদের সংস্কৃতির যে গর্ভীর রূপটি আছে— সেটি যেমন সরল তেমনি Sophisticated– রবীন্দ্রনাথের বোষ্টমীর মতো— সেটা সাহেবদের পক্ষে সহজ নয়। সাহেবদের শিষ্যদের পক্ষেও।'

'কালের যাত্রা' গ্রন্থের 'রথের রশি' নাটকে বাস্তবানুসৃত যে চরিত্রাঙ্কন পদ্ধতি তা অবলম্বন করা হয়নি, অথচ নাটকটি অভিনয় করলে বুঝতে পারা যায় যে চরিত্রগুলো খুব বাস্তব। চরিত্রাভিনয় ও সংলাপ উচ্চারণ সম্পর্কে শম্ভু মিত্র বলেছেন— 'একটা কৌশল হল ভাষা। এ ভাষাটা বাজারচলতি ভাষা নয়। এই ভাষা বলে অভিনয় করতে আমাদের বহু অভিনেতারই বিশেষ অসুবিধা হয়। মনে হয়, এটা অনুভব হয় তো 'কিশোর ' করতে পারে, কিন্তু সে কথাটা এমন করে বলতে পারে কি কেউ' অর্থাৎ অন্তরের অনুভূতির প্রকাশ হিসেবে এটা ঠিক, কিন্তু উচ্চারিত সংলাপ হিসেবে ঠিক নয়। এভাবে কথা বলতে গেলে যেন ন্যাকা ন্যাকা শোনায়।— এই চিন্তা মনের মধ্যে থাকে বলেই রবীন্দ্রনাথের নাটকের ভাষা বলতে আমাদের কষ্ট হয়।'

রবীন্দ্রনাথের প্রতীকধর্মী নাটকগুলোর সংলাপ অভিনয়যোগ্য নয় বলে অনেকে মনে করে থাকেন এবং এ অভিমতও অনেক সময় তারা ব্যক্ত করে থাকেন যে এই সব নাটকের সংলাপ ন্যাকা ন্যাকা। একথা ঠিক এই সমস্ত নাটকে যে সব সংলাপ আছে তা আমরা দৈনন্দিন জীবনে বলিনা। মহাকালের রথ স্তব্ধ হয়ে যাওয়াতে দেশে আকাল নেমে এসেছে সেটা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথ যে সংলাপ ব্যবহার করেছেন তা এখানে উদ্ধৃত করলে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে। 'দেখতে পাচ্ছ না— আজ ধনীর আছে ধন, তার মূল্য গেছে পাঁক হয়ে গজভুক্ত কপিত্থের মতো। ভরা ফসলের খেতে বাসা করেছে উপবাস। যক্ষরাজ স্বয়ং তার ভাণ্ডারে বসেছে প্রায়োপবেশনে। দেখতে পাচ্ছ না— লক্ষ্মীর ভাণ্ড আজ শতছিদ্র, তাঁর প্রসাদধারা শুষে নিচ্ছে মরুভূমিতে— ফলছে না কোনো ফল!' এ ভাষা প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহারের দ্বারা জীর্ণ ভাষা নয়। ক্ষণজন্মা বিরলদৃষ্ট পুণ্যাত্মা ব্যক্তিদের সম্পর্কে দ্বিতীয় নাগরিকের সংলাপ, 'সে কী কথা। সংসার তো পাপাত্মাদের নিয়েই। তারা না থাকলে তো লোকনাথের রাজত্ব উজাড়। পুণ্যাত্মা কালেভদ্রে দৈবাৎ আসে, আমাদের ঠেলায় দৌড় মারে বনে জঙ্গালে গুহায়।' গ্রাম্য সংস্কারাচ্ছন্ন স্ত্রালোকেরা যে পথ দিয়ে রথ চলবে সে পথের দুরবস্থা দূর করতে চায় 'রাস্তা ঠাকুর'কে পূজো দিয়ে,

যাতে রাস্তার উঁচু নিচু আর গর্ত সংকুলতা রথের গতি রুদ্ধ করতে না পারে। এই মর্মে প্রথমা রমণী যে সংলাপ উচ্চারণ করেছে তা এখানে উদ্ধৃত করা গেল, 'চল্ ভাই, তবে পুজো দিইগে রাস্তা-ঠাকুরকে। আর গর্ত-প্রভুকেও তো সিন্নি দিয়ে করতে হবে খুশি, কী জানি ওঁরা শাপ দেন যদি। একটি-আধটি তো নন, আছেন দু-হাত পাঁচ-হাত অন্তর। নমো নমো দড়ি-ভগবান, রাগ কোরো না ঠাকুর, ঘরে আছে ছেলেপুলে।' এই যে সংলাপ এখানে উদ্ধৃত করা হল, এ সংলাপ যথার্থ বাজার চলতি সংলাপ নয়। এ সংলাপে আমাদের ঘরের মেয়ে পুরুষেরা কথা বলেনা। এই সংলাপের বুননটাই স্বতন্ত্র। এর স্বাদটাও আলাদা। এই সংলাপের শব্দগুলো কিন্তু আটপৌরে ঘর গৃহস্থালীর আবরণ ঝেড়ে ফেলে চাঁচাছোলা হতে পারেনি, লৌকিক জীবনের প্রত্যয়ঘন উপলব্ধি স্পষ্ট। কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় গ্রাম্যতা দোষে দুষ্ট নয়। 'তিন বছর থাকব দাসী হয়ে, ভোগ দেব তিন বেলা। ওলো বিনি, পাখাটা এনেছিস তো বাতাস কর-না—দেখছিস্ নে রোদ্দুরে তেতে উঠেছে ওঁর মেঘবরন গা! ঘটি করে গঙ্গাজলটা ঢেলে দে। ঐখানকার কাদাটা দে তো ভাই আমার কপালে মাখিয়ে। ওই তো আমাদের খেঁদি এনেছে খিচুড়ি-ভোগ। বেলা হয়ে গেল, আহা কত কষ্ট পেলেন প্রভু। ... মাথা কুটছি তোমার পায়ে, টলুক তোমার মন। পাখা কর্ লো; পাখা কর্, জোরে জোরে' উপরোক্ত মন্তব্যের সম্‌র্থন পাওয়া যাবে উদ্ধৃত সংলাপের শব্দ সমষ্টির মধ্যে।

এই নাটকে সৈনিকবৃন্দের ভাষা লক্ষ্য করবার বিষয়। সাধারণত, আমরা ধরে নেই, সৈনিকের ভাষা হবে পৌরুষদৃপ্ত, তেজোময়, জোরালো। সৈনিকরা ক্ষত্রিয় বা রাজশক্তির প্রতিনিধি। সুতরাং শৌর্যবীর্যময় মনোভাবনার জারকরসে জারিত হয়ে উঠবে তাদের মুখ নিঃসৃত সংলাপগুলি। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় তাদের সংলাপগুলো সব অন্য রকম। সংলাপগুলোকে কাঁটাছেঁড়া করলে দেখা যাবে অর্থটা কিন্তু মোটেই ক্ষত্রিতেজবিহীন নয়। কিন্তু সংলাপটির গঠন পদ্ধতিটা তেজটাকে পেলব করে তোলে। যেমন, 'চল্-না ওদের পাড়ায় গিয়ে প্রমাণ করে আসি— ওরাই মানুষ না আমরা।' কিংবা 'গঙ্গার দরকার হবে না। ঘড়ার ঢাকনার মতো শূদ্রগুলোর মাথা দেব উড়িয়ে, ঢালব ওদের রক্ত।' তেজ ও শৌর্য বীর্যের আস্ফালন সবটাই আছে, অথচ শব্দ চয়ন ও গঠনগুণে কাব্যরসে জারিত হয়ে কি এক অদ্ভুত লাবণ্যে মাধুর্য মণ্ডিত হয়ে উঠেছে।

এই নাটকে ধনিক সম্প্রদায়ের সংলাপটাও লক্ষ্য করবার মতো। অর্থের দম্ভ প্রকাশের জন্য রবীন্দ্রনাথ যে শব্দ সমন্বয়ে গঠিত সংলাপ ব্যবহার করেন, অন্য কোনো নাট্যকারের হাতে পড়লে তা আরো উৎকট আরো ঝাঁঝাল হয়ে উঠতো। 'তারা জানে, আজকাল চলছে যা-কিছু সব ধনপতির হাতেই চলছে।' প্রথম সৈনিক তার প্রতিবাদ করে, 'সত্যি নাকি! এখনি দেখিয়ে দিতে পারি, তলোয়ার চলে আমাদেরই হাতে। তার উত্তরে তৃতীয় ধনিক বলে, 'তোমাদের হাতখানাকে চালাচ্ছে কে।' —প্রথম সৈনিক : 'চুপ, দুর্বিনীত! ' দ্বিতীয় ধনিক : 'চুপ করব আমরা বটে! আজ আমাদেরই আওয়াজ ঘুরপাক খেয়ে বেড়াচ্ছে জলে স্থলে আকাশে।' অদ্ভূত, অভাবনীয় বুদ্ধিদৃপ্ত সংলাপ। স্পষ্ট হয়েও স্পষ্ট নয়। অথচ ধনতন্ত্রের দাম্ভিক রূপটা আচ্ছাদিত থাকেনি।

আলোচ্য নাটকে মন্ত্রীর সংলাপগুলো বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত। অনেক সময় হেঁয়ালী বলে ভুল

হতে পারে। কিন্তু তা যে কত বাস্তবতার ওপর প্রতিষ্ঠিত তা একটু বিশ্লেষণ করলেই ধরা পড়বে। উদাহরণ হিসেবে একটি সংলাপ এখানে উদ্ধৃত করা গেল, 'নিচের তলাটা হঠাৎ উপরের তলা হয়ে ওঠাকেই বলে প্রলয়, বরাবর যা প্রচ্ছন্ন তাই প্রকাশ হবার সময়টাই যুগান্তর।' সংলাপটি শুধু তাৎপর্যমণ্ডিত নয়, গভীর ইঙ্গিতবহ। সাধারণভাবে সংলাপটির অর্থ সাজালে দাঁড়ায় নিচের তলার মানুষরা ওপরে উঠতে গেলে দরকার বিপ্লবের। আর এই বিপ্লবের মধ্যে দিয়েই ঘটে যায় যুগান্তর। 'রথের রশি' নাটকে মূল বক্তব্যের ইঙ্গিত নিহিত আছে সংলাপটির প্রচ্ছদে। কত সহজ করে সমাজবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্বটি ব্যক্ত করলেন রবীন্দ্রনাথ। কত কম শব্দ খরচ করে বৈজ্ঞানিক মতাদর্শের সুনিপুণ ব্যাখ্যা দিলেন তিনি। এ সংলাপ সৃষ্টি কেবল মাত্র রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব। স্বল্প শব্দ সমন্বয়ে বাক্যের মাণিক্য রচনার যাদুকর রবীন্দ্রনাথ। পূর্বেই বলা হয়েছে প্রতীকধর্মী সংলাপ রচনায় তিনি ছিলেন রাজাধিরাজ, সে কথার সমর্থন মিলবে উপরোক্ত সংলাপে। শুধু তাই নয়, এই নাটকে কবির সংলাপ উদ্ধৃত করলে রবীন্দ্রনাথের সংলাপ রচনা নৈপুণ্য প্রাঞ্জলভাবে ধরা পড়বে। আটপৌরে শব্দে সংলাপ রচনা করে অনেক নাট্যকার যশস্বী হয়েছেন। আবার কাব্যরসাক্রান্ত সংলাপে ওজস্বিতা আনয়ন করে কতিপয় নাট্যকার নাট্যসাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন সংরক্ষিত করেছেন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ। তিনি বিরল দৃষ্ট শিল্পী। তাই সম্ভবত শ্রীশম্ভু মিত্র মন্তব্য করেছেন, 'এইটাই রবীন্দ্রনাথের একটা শিল্প কৌশল যে জীবন প্রতীক বলে চিনতে পারার মতো সমস্ত বিশিষ্টতা আরোপ করেও সাধারণ প্রতীকী চেহারাটা তিনি অক্ষুণ্ণ রাখতে পারতেন।' আর প্রতীক নাটকগুলো সংলাপ প্রধান, তবে সংলাপ হয়ে উঠেছে চরিত্রের দর্পণ।

তবে রবীন্দ্রনাথের প্রতীক নাটকের সংলাপ সম্পর্কে যে এত কথা তার একটাই কারণ, অভিনেতার অভিনয়ে প্রায়শ অক্ষমতা। বস্তুত সংলাপে কোনো ত্রুটি নেই। অভিনয়টা এমন হওয়া দরকার যাতে অন্তরের আবেগের কাব্য-অবলীলায় প্রকাশ পায়। আর সেটা বাস্তবভঙ্গিতে চেষ্টা করলে চলবেনা। 'এই বোধ নিয়ে যদি আমরা রবীন্দ্রনাটক অভিনয়ের চেষ্টা করি তাহলে দেখবো যে আধা-বিয়ালিস্টিক ছাঁচে লেখা নাটকগুলো আমরা যেভাবে অভিনয় করি সেভাবে রবীন্দ্রনাথের নাটকে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা যায়না। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাটকের সংলাপ উচ্চারণে, একটা মুন্সীয়ানা থাকা চাই, যা না হলে সংলাপ তথা নাট্যরসই ব্যাহত হবে। কাব্যের মর্মার্থ প্রকাশ করতে গেলে ঝঙ্কার থাকা চাই কণ্ঠে। কবিতায় যেমন প্রত্যেকটি কথা কী একটা রসে টস টস করে, যাতে সে নিজেকে ছাড়িয়ে আরো অনেক কিছু যেন প্রকাশ করে, এ কণ্ঠও সেই' রকম রসাভিষিক্ত হওয়া চাই, তা না হলে নাটকের অভিব্যঞ্জনাটি থেকে যাবে অনায়ত্ত।

শম্ভু মিত্রের সঙ্গে একমত হয়ে পুনরায় বলব রবীন্দ্রনাথের নাটকের সংলাপ অসাধারণ, ব্যঞ্জনাময়, গভীর তাৎপর্যে মণ্ডিত ইঙ্গিতবহ। 'রথের রশি' নাটকের সংলাপও তাই।

'রথের রশি' নাটকের সংলাপ গদ্যছন্দে রচিত সংলাপ। তবে এ গদ্য নেহাৎ আটপৌরে গদ্য নয়। কবির কলমে লেখা গদ্য। লাইনগুলোকে ভেঙে ভেঙে চরণবন্ধ করে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে নয়। শব্দগুলোকে সাজাবার রীতিও অলঙ্কার সমৃদ্ধ এবং ব্যঞ্জনাধর্মী করে তুলবার মধ্যে নিহিত রয়েছে এর কাব্যত্ব। অতএব আমরা বলব 'রথের রশি'র ভাষা গদ্য নয়। গদ্যকবিতা। সমসাময়িক কালে রবীন্দ্রনাথ

যে গদ্য কবিতা রচনার প্রবর্তন করেছিলেন, 'রথের রশি' সেই ভাষাতেই রচিত। উদাহরণ দিলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে।—

কবি

তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
আসবে উল্টোরথের পালা।
তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।
এইবেলা থেকে বাঁধনাটাতে দাও মন—
রথের দড়িটাকে নাও বুকে তুলে, ধুলোয় ফেলো না;
রাস্তাটাকে ভক্তিরসে দিয়ো না কাদা করে।
আজকের মতো বলো সবাই মিলে—
যারা এতদিন মরেছিল তারা উঠুক বেঁচে,
যারা যুগে যুগে ছিল খাটো হয়ে
তারা দাঁড়াক একবার মাথা তুলে।

সংলাপটির পরতে পরতে ঝংকৃত হয়েছে ছন্দ, নিঃসৃত হয়েছে অপূর্ব কাব্যরস। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় 'রথের রশি' নাটকে ভাষার বাগ্‌বৈদগ্ধ পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। সংলাপের ভাষা ক্ষুরধার, বুদ্ধিদীপ্ত। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য প্রকাশে সংলাপের কাব্যধর্মিতা অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি।

৮৫.১৪ নাটকের মঞ্চপরিকল্পনা

জোড়াসাঁকো ও পাথুরেঘাটা ঠাকুরবাড়ি বাংলাদেশে নাট্যাভিনয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিল। প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রথম রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করে (১৮৩১) নাটক অভিনয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন। মহর্ষির মধ্যমভ্রাতা গিরীন্দ্রনাথ ও তাঁর দুই পুত্র বলেন্দ্র ও গুণেন্দ্রনাথ নাটক সম্পর্কে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। জ্যোতি ঠাকুর এবং পাঁচজনের কমিটি উদ্যোগে জোড়াসাঁকো বাড়ির দোতলার হলঘরে স্টেজ বেঁধে নাটক অভিনয়ে. ব্যবস্থা হয় (১৮৬৩)। মঞ্চ ও দৃশ্য পরিকল্পনায় অভিনবত্বের সমারোহ ছিল। সে যুগের শ্রেষ্ঠ পটুয়া ডেকে দৃশ্য আঁকা, স্টেজ সুদৃশ্য ও সুন্দর করে সাজান এবং বনদৃশ্য বাস্তবায়িত করবার জন্য জীবন্ত জোনাকীপোকা এঁটে দিয়ে সুন্দর সুশোভন বনের রূপ দেওয়া হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ, বাল্মীকি প্রতিভা, শারদোৎসব অভিনয়কালে মঞ্চ নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। পাশ্চাত্য নাট্যাভিনয়ে মঞ্চসজ্জা ও অভিনয় সমান গুরুত্ব পেত। কিন্তু বাংলার লোকায়ত নাট্যশিল্পে মঞ্চের কোনো বিশেষ ভূমিকা ছিল না। রবীন্দ্রনাথের পরবর্তীকালের নাট্যভাবনায় পাশ্চাত্য ভাবধারা পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চ ভাবনাতেও আমূল পরিবর্তন সংগঠিত হয়। তখন দেখা গেল তাঁর নাটকে মঞ্চ পরিকল্পনার কোনো নির্দেশ দেওয়া হচ্ছেনা। এ ক্ষেত্রে তিনি মঞ্চ নয়, অভিনয় কলার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ

শেষদিকে তাঁর মঞ্চ পরিকল্পনায় লোকযাত্রা. গাজন, চড়ক, গোষ্ঠ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের কুশীলবরা যেমন লোকের বাড়ির দোরগোড়ায় পথের ওপর নানা গান ও অভিনয় প্রদর্শন করতো, সেই অভিনয় রীতিকে নাট্যকলায় ব্যবহার করেছেন। তাই দেখা যায় তাঁর অনেক নাটকের অভিনয় মঞ্চোপকরণ ছাড়াই পথের ওপরই ঘটছে। একটা পথ, পথের ওপর অভিনেতারা আসছেন, সংলাপের মাধ্যমে নাটকের বক্তব্য বা তত্ত্বকে তুলে ধরে অতি সাধারণভাবেই সরে দাঁড়াচ্ছেন। রক্তকরবী, মুক্তধারা ও রথের রশির ঘটনা সংগঠনস্থল পথ। রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটকে তাঁর মঞ্চ সম্পর্কে এই ধ্যানধারণার ব্যবহারিক প্রয়োগ করে যে আদর্শ সৃষ্টি করেছেন, আধুনিক নাট্য প্রযোজনায় এর বহুল প্রয়োগ ঘটছে।

'রথের রশি' নাটকে দৃশ্যবিভাগ নেই। যাত্রার আসরের মত মঞ্চে কুশীলবেরা যাওয়া আসা করেছে। বস্তুত এই নাটকের ঘটনা সংঘটনস্থল হল পথ। মঞ্চের পিছনের দিকে একটা রথের চিত্র। সামনের দিকে পড়ে আছে সেই রথের দড়ি। এই দড়িকে কেন্দ্র করে সব ঘটনা ঘটছে, সব চরিত্রেরা প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমিকা পালন ক'রে যাচ্ছে। দড়িটা যে পথের ওপর সে সম্পর্কে কোনো সংশয়ের অবকাশ থাকেনা, কারণ রথ পথের ওপর দিয়েই চলে। তাছাড়া ঘটনা যে ঘটছে পথের ওপর সে সম্পর্কে তিনটি সংলাপ আমরা এখানে তুলে দিচ্ছি। প্রথম সংলাপ নাটকের প্রথমাংশে তৃতীয়া রমণীর, 'রাস্তার ধারে ধারে / লোক জটলা করে তাকিয়ে আছে / কখন আসবে রথ।' দ্বিতীয়টা সন্ন্যাসীর 'ঐ-যে, পথের বুক জুড়ে পড়ে আছে তার অসাড় দড়িটা।' তৃতীয়টা প্রথমা রমণীর, 'চল্ ভাই, তবে পূজো দিইগে রাস্তা-ঠাকুরকে।' এ প্রসঙ্গে উদ্ধৃতির সংখ্যা বৃদ্ধি অবান্তর বিদায় বিরত থাকা গেল।

পথ, নাট্যঘটনা বা নাট্যক্রিয়া সংঘটনস্থল হল কেবলমাত্র এই নাটকে তা নয়। রূপক-সাংকেতিক বা প্রতীক নাটক— এক কথায় তত্ত্বনাটকের প্রথম যুগেই দেখা গেছে এই পথের ভূমিকা। 'ডাকঘর'-এ অমলের ঘরের জানালার সামনে যে পথ তার ওপর ঘটনাগুলো ঘটে গেছে। 'মুক্তধারা' নাটকেও প্রায় সমস্ত ঘটনা সংঘটিত হয়েছে পথের ওপর। 'ডাকঘর' নাটকে পথের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অনন্ত জীবন ধারায় সংকেত প্রকাশ করেছেন। গীতাঞ্জলির একটি কবিতা এখানে তুলে দিয়ে পথ সম্পর্কে রবীন্দ্রমানসিকতার কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রহণ করবার প্রয়াস পাওয়া গেল—

আমার এই পথ চাওয়াতেই আনন্দ।
খেলে যায় রৌদ্রছায়া বর্ষা আনে বসন্ত।
কারা এই সমুখ দিয়ে, আসে যায় খবর নিয়ে,
খুশিরই আপন মনে, বাতাস বহে সুগন্ধ।।
সারাদিন আঁখি মেলে দুয়ারে রব একা।
শুভক্ষণ হঠাৎ এলে তখনি পাব দেখা।।

মানুষ অনন্ত জীবনপথযাত্রী, জীবনপথের শেষ নেই। অমল বুদ্ধ গৃহের জানালা খুলে পথের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে। এই পথ দিয়ে জীবনের মিছিল চলেছে ছন্দোবদ্ধ ভাবে। অমল তার মধ্যে জীবনের স্পর্শ পেয়েছে। 'মুক্তধারা' নাটকেও আত্মার অসীম সৌন্দর্যলোকে চলে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে। এই যে যাত্রা, সীমা থেকে অসীমের পথে জীবনের যাত্রা, পথের ব্যঞ্জনাময় তাৎপর্য তো

সেখানেই। সুতরাং পথ যে রবীন্দ্র মানসিকতায় একটা বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, তার প্রকাশ ঘটেছে এবম্বিধ প্রকারে। তবে পথতত্ত্ব 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা' নাটকে যে ভাবনাব্যঞ্জিত করে 'রথের রশি' নাটকে তা করেনা। 'রথের রশি' নাটকে পথের ব্যাখ্যাটা হবে অন্য রকম। রথের রশি নাটকে কালের গতিকে মুখ্যবস্তু হিসেবে দেখান হয়েছে। কালের গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। তার ইঙ্গিত হিসেবে দেখান হয়েছে মহাকালের রথ স্তব্ধ, চলছে না। তার দড়ি অসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে। দড়ি বন্ধনের প্রতীক। মানুষে মানুষে বন্ধন, প্রাণে প্রাণে বন্ধন, আত্মার সঙ্গে আত্মার বন্ধন। এই বন্ধন আলগা হয়েছে। কারণ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের মূলে যে মনুষ্যত্ববোধ তা হারিয়ে গেছে। এই নাটকে দেখান হয়েছে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ক্ষত্রিয়তন্ত্র, বণিকতন্ত্র— একে একে এসেছে। তেজ বিকীর্ণ করে চলে গেছে বিস্মৃতির গর্ভে। সময়ের পথ ধরে চলে গেছে তারা সকলে। এই পথে এবার আসবার পালা নিম্নবৃত্তিতে নিযুক্ত শুদ্রদলের। যারা যুগ যুগ ধরে উচ্চবর্ণের দ্বারা নিষ্পেষিত হয়ে আসছে। অবহেলিত হয়েছে, হয়েছে অত্যাচারিত। সমস্ত শ্রমজীবী মানুষ, চাষী, তাঁতী তাঁরা আজ জগতের স্তব্ধ রথচক্রে গতি আনয়নের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিতে চাইছে। তারপর তাদের আচরণে যখন মহাকাল ক্ষুব্ধ হবে তখন তারাও পূর্ববর্তীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এই একই পথ ধরে চলে যাবে বিস্মৃতির অতলান্ত তিমিরে।

> 'তার পরে কোন্-এক যুগে কোন্-একদিন
> আসবে উল্টোরথের পালা।
> তখন আবার নতুন যুগের উঁচুতে নিচুতে হবে বোঝাপড়া।'

সময়ের পথ ধরে এই সব ঘটনা সংঘটিত হয় বলে পথ এই নাটকে দৃশ্যপট। এই পথের ওপর দিয়ে জীবনের প্রবাহ চলে, মেয়ের দল আসে, লোকজন আসে, নানা কথাবার্তা আচার-আচরণ—নানা অভিব্যক্তি ঘটিয়ে চলমান জীবনের কথা বলতে বলতে চলে যায়। এই পথ ধরেই মানুষ চলে সেই পথে যেখানে সর্ব বর্ণ সমন্বয়টা বড় কথা।

সুতরাং শুধুমাত্র নাট্যক্রিয়া পথের ওপর সংঘটিত হয়েছে বলে পথ 'রথের রশি'র নাট্য দৃশ্যপট হয়ে উঠেছে একথা বলা যাবেনা। কিংবা রথ পথের ওপর দিয়ে চলে বলেই এই নাটকের মঞ্চপরিকল্পনায় পথের এতখানি গুরুত্ব একথা ভাবাটা আংশিক, সার্বিক নয়।

'রথের রশি' নাটকে কোনো দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাগ নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রায় প্রত্যেকটা প্রতীক নাটকে থাকেও না তা। এর কারণ রবীন্দ্রনাথ নাট্যক্রিয়াকে অখণ্ড রেখে সমাপ্তি বিন্দুতে পৌঁছুতে চান। দৃশ্য বা অঙ্ক, ভাবের প্রবাহে আনে ব্যাঘাত, রসের আস্বাদনে ঘটায় বিঘ্ন। ভাব একটা প্রবহমান বস্তু। তার আস্বাদ্যমানতায় বিঘ্ন উপস্থিত হোক রবীন্দ্রনাথের সেটি কাম্য নয়। দর্শক বা পাঠককে তিনি সরলরৈখিক পথে একটানা নিয়ে যেতে চান। দৃশ্য বা অঙ্কের প্রয়োজন তখনই যখন নাট্যকার দর্শক বা পাঠককে প্রসঙ্গান্তরে নিয়ে যেতে চান। রবীন্দ্রনাথ সে রকম মনে করেননি, তিনি তার এক একটি তত্ত্বনাটকে এক একটি তত্ত্বের নাট্যরূপ দিয়েছেন। তাই দৃশ্য বা অঙ্ক বিভাগের কোনো প্রয়োজনবোধ করেন নি। 'রথের রশি' নাটকের বক্তব্য একটাই শুদ্রশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে তার সম্মানজনক সংস্থাপনা— এই

বক্তব্যকে অঙ্কের বা দৃশ্য বিভাগের দ্বারা খণ্ডিত করলে নাটকের রসপরিবেশ বিনষ্ট হবে। তাই তিনি পথের ওপর সমস্ত ঘটনাবলী একটানা ঘটিয়ে গেছেন।

৮৫.১৫ সারাংশ

'রথের রশি' নাটকের সংলাপ রবীন্দ্রনাথ কৃত রূপপ-সাংকেতিক নাটকের সংলাপ রীতি অনুসৃত। এ সংলাপের ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির। অন্তরের গভীরতম ভাববস্তুকে ব্যঞ্জনাগর্ভ ভাষায় উপস্থাপন করা রবীন্দ্রনাথের অনন্য-কৃতি। আপাতদৃষ্টিতে সংঘাত লেশহীন মনে হলেও সামান্য ভেবে দেখলেই শ্রেণীচরিত্রগুলির অনিবার্য পরিণতির আশঙ্কায় বিচলিত বোধ ও পরিণামী অন্তর্দ্বন্দ্বের স্বরূপ ধরা পড়ে।

একসময় অভিযোগ করা হত, রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয়যোগ্য নয়। 'বহুরূপী' গোষ্ঠী সে ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণ করেছেন। বহুরূপীর নট, নাট্যপরিচালক শম্ভু মিত্রের মতে— রবীন্দ্রনাথের নাটকে "সংস্কৃতির যে গভীর রূপটি আছে, সেটি যেমন সরল তেমনি Sophisticated"। —সেটা সকলের পক্ষে বোঝা সহজ নয়। নাটকটির চরিত্রাঙ্কন প্রচলিত বাস্তবানুগ পদ্ধতিতে না রচিত হলেও, চরিত্রগুলি খুবই বাস্তব বলে বোধ হয়। এদের মুখের ভাষা বাহ্যত বাজার চলতি ভাষা না হলেও, আন্তর অনুভূতিতে বাস্তব বলে মনে হবে। গ্রাম্য সংস্কারাচ্ছন্ন স্ত্রীচরিত্রগুলি যেভাবে কথা বলেছে—'রাস্তা ঠাকুরকে পূজো দেওয়া', 'দড়ি ভগবান'কে নমস্কার জানানো কোনো কোনো ক্ষেত্রে আতিশয্য দুষ্ট মনে হলেও, আন্তরধর্মে বাস্তব। এভাবে দেখা যায় নাটকের অন্যান্য চরিত্রের সংলাপও অনুরূপে বাস্তব ধারণার পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

'রথের রশি'র মঞ্চ পরিকল্পনায় বাংলা লোকায়ত যাত্রার সহজ সরল মুক্ত মঞ্চের ইঙ্গিত আছে। যাত্রার আসরের মত কুশীলবরা আসা-যাওয়া করেছে। এদেশে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্র, রাজতন্ত্র, ধনিকতন্ত্র একে একে এসেছে। তাদের শক্তির আড়ম্বর দেখিয়ে চলে গেছে— এই সাধারণ সত্যটি তুলে ধরতে রবীন্দ্রনাথ পথকেই নাটকের দৃশ্যপট করেছেন। অধিকন্তু এই পথে জীবনের প্রবাহ চলে বলেই জীবনের কথা বলতে মানুষের সর্ববর্ণ সমন্বয়ের কথা বলতে তিনি পথকে নাটকের অন্যতম উপজীব্য করেছেন। পথই তো সব কিছু মেলায়। তাই এ নাটকে পথের এত গুরুত্ব। 'রথের রশি' নাটকে শূদ্রশক্তির জাগরণ ঘটিয়ে সমাজ-সভ্যতার মূলধারার সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন। অঙ্ক, দৃশ্য বিভাগে একে খণ্ডিত করলে নাটকের রস পরিবেশন বাধা পেত। তাই নাটকীয় ঘটনা একটানা পথেই নাট্যকার ঘটিয়েছেন।

৮৫.১৬ অনুশীলনী ৩

১। 'রথের রশি' নাটকের চরিত্রগুলি নামহীন কতকগুলি বর্গচরিত্র। —যৌক্তিকতা বিচার করুন।

২। 'রথের রশি' যেন চরিত্র চিত্রশালা। নাটকে উল্লিখিত প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রগুলির পরিচয় দিন।

৩। 'রথের রশি' নাটকের নারী চরিত্রগুলি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। 'গড় করি তোমায়, দড়ি-নারায়ণ। প্রসন্ন হও।' —বক্তা কে? এই উদ্ধৃতিটির মধ্যে বক্তার যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়, তার বর্ণনা করুন।

৫। বাধা পেলে শক্তি নিজেকে চিনতে পারে—
চিনতে পারলেই আর ঠেকানো যায়না।— বক্তা কে? মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৬। 'রথের রশি' নাটকের 'কবি' চরিত্রটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৮৫.১৭ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী—১ :

১। (ক) সন্ন্যাসী (খ) দ্বিতীয় (গ) তৃতীয় সৈনিক (ঘ) দলপতি (ঙ) কবি

২। শব্দার্থের সাহায্য নিন।

৩। প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুসরণে উত্তর তৈরি করুন।

৪। প্রাসঙ্গিক আলোচনা পড়ে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ২ :

১। (ক) রথের রশি, কবির দীক্ষা, সংকলিত

(খ) রথযাত্রা, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ, ১৩৩০

(গ) ক্ষত্রিয়, সমাজ, শূদ্রের

(ঘ) খাটো, দাঁড়াক, মাথা

২। 'দেশকাল' পর্যায়ের আলোচনার সাহায্যে উত্তর করুন।

৩। 'নামকরণ' অংশটি অবলম্বনে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

৩ :

১। 'চরিত্র বিশ্লেষণ' আলোচনার প্রথমাংশে এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে।

২। এগারটি প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্রের কথা আলোচনা করা হয়েছে, দেখুন।

৩/৪। নারী চরিত্র সম্পর্কিত আলোচনার সাহায্যে উত্তর করুন।

৫। বক্তা মন্ত্রী। মন্ত্রীর চরিত্র বৈশিষ্ট্য বুঝে মন্তব্যটি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৬। 'চরিত্র বিশ্লেষণ' পর্যায়ের শেষাংশে এ সম্পর্কে আলোচনার সাহায্যে উত্তর করুন।

৮৫.১৮ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। ড. অজিতকুমার ঘোষ — বাংলা নাটকের ইতিহাস।

২। ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায় — রবীন্দ্রনাট্য সমীক্ষা : রূপক-সাংকেতিক।
৩। ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী — রবীন্দ্রনাথের রূপকৃ-সাংকেতিক নাটক।
৪। ড. দিলীপকুমার নন্দী ও ড. নবকুমার মণ্ডল — প্রসঙ্গ : কালের যাত্রা।
৫। ড. শুদ্ধসত্ত্ব বসু — বাংলা সাহিত্যের নানা রূপ।

৮৫.১৯ অতিরিক্ত পাঠ

কালের যাত্রা
১৩৩৯ : ১৯৩২

রথের রশি এবং কবির দীক্ষা এই দুটি নাটিকার সংকলন গ্রন্থের নাম কালের যাত্রা। ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ৫৭তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ এই গ্রন্থটি তাঁকে উৎসর্গ করেন (৩১শে ভাদ্র, ১৩৩১)।

রবীন্দ্রনাথ গতি ও ছন্দের উপাসক। তিনি একথা জানেন ও মানেন যে, কালের গতিছন্দে যে সুষমা অভিব্যক্ত, এই সুষমা বৈষম্যকে বাদ দিয়ে নয়—বৈষম্যকে গ্রহণ করে এবং অতিক্রম করে। সুতরাং বিশ্বপ্রকৃতিতে যেমন, মানবসমাজের ইতিহাসেও তেমনি একটা বোঝাপড়ার প্রয়াস চিরদিনই চলবে এবং এর মাধ্যমেই কালের যাত্রা ক্রমাগতই সম্প্রসারণ ও অগ্রগতির লক্ষ্যে চলতে থাকবে।

রথের রশি ও কবির দীক্ষা একত্রে সন্নিবিষ্ট করে এবং সমগ্র গ্রন্থটিকে কালের যাত্রা নামে চিহ্নিত করে রবীন্দ্রনাথ পরস্পর সংশ্লিষ্ট দুটি ভাবসত্যের প্রতিই নাট্যরসিকদের দৃষ্টি আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন বলে মনে হয়। রথের রশি নাটকটির তাৎপর্য এবার বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

১৩৩০ সালের শারদীয়া ছুটিতে শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ রথযাত্রা নামে একটি নাট্যদৃশ্য রচনা করেন; ঐ সালেরই অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় উক্ত নাট্যদৃশ্যটি প্রকাশিত হয়।[১] ১৩৩৯ সালে এটি নূতন আঙ্গিকে এবং নূতন নামে ('রথের রশি') কালের যাত্রা পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হয়।

রথের রশির সংক্ষিপ্ত কথাবস্তু নিম্নরূপ : রাজার রাজ্যে রথযাত্রার মেলা বসেছে। ভক্তদের ধারণা, এ-দিনটি শুভ সূচনার দিন। পূণ্যার্থীরা পথের দু'পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে রথ দেখবার আশায়। বেলা বাড়ছে, রথের দেখা নেই। রথ পড়ে আছে অচল হয়ে। যারা বরাবর রথ টানে, তাদের হাতে রথ চলল না, পুরুতের শাস্ত্রবল, ক্ষত্রিয়ের শস্ত্রবল এবং ধনিকের ধনবল ব্যর্থ হল। ভক্তিমতী মেয়েদের পূজার্চনা নিষ্ফল হল। এমন সময় সমাজে অপাংক্তেয় বলে চিহ্নিত শূদ্রেরা এল রথ টানতে। পুরুত, ক্ষত্রিয় ও শেঠের দল তাদের স্পর্ধা দেখে ক্ষেপে উঠল। কিন্তু বুদ্ধিমন্ত মন্ত্রী অচল রথকে সচল করবার শেষ চেষ্টার উপায়স্বরূপ যারা রথের রশি ধরবার সামাজিক সমর্থন এতদিন পায়নি তাদেরই রথ টানবার অনুমতি দিলেন। ফল ফলল, রথ চলল। মন্ত্রীও এসে তাদের সাথে হাত মেলালেন। রথ চলল বটে,

তবে চিরাচরিত পথ ধরে নয় রাজপথ ছেড়ে রথ এবার জনপদের দিকে এগিয়ে চলল— অসমতলকে সমতল করে দেবার লক্ষ্যে। শঙ্কিত বিপর্যস্ত পুরুত ক্ষত্রিয় এবং ধনিকশ্রেণী নিজেদের শিবির অর্থাৎ নিজ নিজ ক্ষমতার আধাররূপ মন্দির, অস্ত্রাগার ও ধনাগার রক্ষা করবার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল। রথের গতি প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হতে লাগল।

এমন সময় উপস্থিত হলেন কবি। কবি যেহেতু সত্যদ্রষ্টা, সেহেতু তাঁর কাছ থেকে এমন একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপারের[২] অন্তর্নিহিত কারণটি জানবার জন্যে সকলেই উৎসুক হল। কবি এ-বিষয়ে যে-ব্যাখ্যা দিলেন, তার মর্মার্থ হচ্ছে— এতদিন সমাজের তথাকথিত অভিজাতশ্রেণীর মাথা ছিল উঁচু। রথের চূড়ার দিকেই নিবন্ধ ছিল তাদের দৃষ্টি। রথ চলে যার টানে, চোখ নামিয়ে তারা সেই দড়ির দিকে একবার চেয়েও দেখেনি, অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক সৃষ্টির যে বাঁধন, তাকেই ওরা মানেনি। এজন্যে ঘটেছে এমন একটা অভিনব ব্যাপার। কবির কথা শুনে পুরুত সন্দেহ প্রকাশ করে বলে যে, শূদ্রেরা এতকাল ছিল অপাংক্তেয়, ওরা আজ দড়ির নিয়ম মেনে চলবার মতো যোগ্যতা লাভ করল কিসের জোরে? কবি বলেন যে, তারা আত্মশক্তির সার্থক প্রকাশের মাধ্যমেই সে যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছে। তবে, একথাও ঠিক, শক্তির প্রকাশে সংযম ও সুষমা যতদিন থাকবে, ততদিনই রথের চলা থাকবে স্বচ্ছন্দ। ব্যতিক্রম ঘটলেই আবার আসবে উল্টো রথের পালা। বোঝাপড়ার মাধ্যমে আবার হবে নতুন যুগের সূচনা।

রবীন্দ্রনাথের মতে রথযাত্রার বিশেষ দিনটি সমাজ-মানসের দর্পণবিশেষ। কালের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলার দরুনই সমাজপ্রবাহ অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়েছে। যারা এতকাল সমাজচক্র চালিয়েছে, তারা বিকৃতভাবে কালের ব্যবহার করেছে। পরিবেশ-পরিস্থিতিজনিত কালপ্রেক্ষিতে, কালের অনুশাসন মানেনি। কালের প্রবাহে তাই ঘটেছে ছন্দপতন। মানবসমাজ প্রবাহের অগ্রগতির সাংকেতিক কাহিনীই রথের রশি। ভবিষ্যৎ সমাজের নাট্যিক রূপরেখায় কবি নতুন জীবনের নতুন প্রশ্ন সমাজের সামনে তুলে ধরেছিলেন। পথ এখানে নাটকের পটভূমি, কাল এর অধিনায়ক, চিরঅবহেলিত গণমানব নাটকের মুখ্য পাত্র।

রথের রশি নাট্যালোচনা প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এ-নাট্যের মূল নাটিকা রথযাত্রা ১৩৩০ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, একই সংখ্যায় কবির সমস্যা[২] এবং সমাধান[৩] নামে দুটি প্রবন্ধও বের হয়। রথের রশি নাট্যদৃশ্যের মূল বক্তব্য উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের বক্তব্যের সঙ্গে একান্ত-সম্পৃক্ত। এ-প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ্য যে, উক্ত নাট্যদৃশ্য এবং দুটি প্রবন্ধ রক্তকরবী নাট্যরচনার সমকালে লিখিত, কিন্তু আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'রক্তকরবী'তে কবির কালিক উপলব্ধির অভিব্যক্তি পরোক্ষ, কিন্তু রথের রশিতে তা প্রত্যক্ষ।

॥ ২ ॥

কালান্তরের সূচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-বীক্ষা যে কতো তীক্ষ্ম ও গভীর ছিল তার পরিচয় মেলে নৈবেদ্য কাব্যে "একের স্পর্ধারে কভু নাহি দেয় স্থান দীর্ঘকাল নিখিলের বিরাট বিধান।" গীতাঞ্জলিতেও কবি অধ্যাত্ম ভাবনার মূলতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, অহঙ্কারই হচ্ছে সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিলনের বাধা। এই বিশ্বলীলার গতিচ্ছন্দ ও একটা সামঞ্জস্য আছে, যার প্রভাবে

সমস্ত বিচ্ছিন্নতা ক্ষুদ্রতা অপূর্ণতা পুণ্যের স্পর্শে মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। কবি ভগবানের ন্যায়বিচারের দোহাই দিয়ে তথাকথিত অভিজাত গোষ্ঠীদের প্রতি সাবধানবাণী উচ্চারণ করছেন—

মানুষের পরশেরে প্রতিদিন ঠেকাইয়া দূরে
ঘৃণা করিয়াছ তুমি মানুষের প্রাণের ঠাকুরে।
তোমার আসন হতে যেথায় তাদের দিলে ঠেলে
সেথায় শক্তিরে তব নির্বাসন দিলে অবহেলে।
চরণে দলিত হয়ে ধুলায় সে যায় বয়ে—
সেই নিম্নে নেমে এসো, নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ।

—'অপমানিত' (গীতাঞ্জলি)

সুতরাং রথের রশির মূল বক্তব্য নতুন কিছু নয়। নতুন যা, তা হচ্ছে গীতাঞ্জলিতে কবি পতিতপাবনকে বিচারকরূপে সামনে রেখে সমাজের উচ্চশ্রেণীকে তাদের শাস্তির প্রতিফলস্বরূপ অপমানিত হবার ভয় দেখিয়ে অস্পৃশ্যদের সঙ্গে একই সমতলে এসে দাঁড়াবার কথা বলেছেন। আর, রথের রশিতে তিনি গণমানবের জাগরণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বলাকার যুগে সবুজপত্রে প্রকাশিত বিবিধ রচনায় কবি একথা স্পষ্ট বলেছেন যে, যার জোর আছে সে রূপ হাঁকিয়ে যাবে, আর যার জোর নেই সে পথ করে দেবে —এ ব্যবস্থা চিরদিন চলতে পারেনা। প্রভুত্ব জিনিসটাই একটা ভার, মানুষের সহজ চলাচলের সম্বন্ধের মধ্যে একটা বাধা। মানুষের সমাজকে এই প্রভুত্বের বোঝা নিয়ে বারবার কাঁধ বদল করতে হয়, বাইরের চাপেই এমন পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে (তুলনীয় : লড়াইয়ের মূল : কালান্তর)। 'রথের রশি'তে কবি রাজমন্ত্রী, ধনপতি, পুরোহিত এবং সৈনিক অর্থাৎ রাজতন্ত্র, ধনতন্ত্র, পুরোহিততন্ত্র এবং ক্ষাত্রশক্তির সঙ্কট ও সমস্যা রূপকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করে এ-সত্যই সমাজমানসে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন যে, বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সত্ত্বেও রাষ্ট্রচালনার যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিপর্যস্ত ও বিকল অবস্থা থেকে উত্তরণের কোনো পথই নেই, যদি না গণমানুষের মিলিত শক্তির সাথে তারা হাত মেলায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বুর্জোয়াগোষ্ঠী তাদের স্বার্থসংরক্ষণের প্রয়োজনে মেহনতি মানুষদের নানাবিধ সঙ্গত দাবী কিছু কিছু মেনে নিতে বাধ্য হয় এবং এই মেনে নেবার ফলে তথাকথিত বুর্জোয়াগোষ্ঠী সমাজে তাদের আত্মরক্ষা করলেও পরোক্ষে গড়ে তুলছে এক বিপুলবিস্তৃত বিপ্লবীগোষ্ঠী। তাছাড়া, ধনিকদের ধনলিপ্সা যতোই বেড়ে চলে ততোই তাদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি হয়ে ওঠে বেপরোয়া এবং এজন্যেই যন্ত্রশিল্পের অগ্রগতিও তারা সম্প্রসারিত করে চলে, যার ফলে শ্রমিক গোষ্ঠীও বেড়ে ওঠে। আর শ্রমিকদের মধ্যেও গড়ে ওঠে বিপ্লবী ঐক্য এবং বুর্জোয়াদের তখন আপোষমূলক পন্থা গ্রহণ করতেই হয়।

রথযাত্রা নাট্যদৃশ্যকে রথের রশি নাটিকায় রূপান্তরিত করবার প্রেরণার মূলে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া দর্শনের (১৯৩০ সন) প্রভাব সক্রিয় ছিল, এ ধারণা অমুলক নয়। রাশিয়ায় সমাজ দর্শনের বাস্তব অভিজ্ঞতার উপলব্ধি। জীবনকে গোড়া ঘেঁসে বদল করবার দিন যে আসন্ন এবং পরিবর্তনকে যে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ

করতেই হবে এমন একটা মানসিক প্রস্তুতিও তিনি নিয়েছিলেন।[৪] এতদসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ নিজে জীবনের চিন্তায় ও দর্শনে রাশিয়ার রাষ্ট্রতত্ত্বকে মেনে নিতে পারেননি। রাশিয়ার চিঠিতে তিনি নিজেই বলেছেন : "সোভিয়েট রাশিয়ার মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচার-বুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রবল প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ। সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সেই অপবাদটাই আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।"

"রাশিয়া যে কাজে লেগেছে এ হচ্ছে যুগান্তরের পথ বানানো ; পুরাতন বিধি বিশ্বাসের শিকড়গুলোকে তার সাবেক জমি থেকে উপড়ে দেওয়া; চিরাভ্যাসের আরামকে তিরস্কৃত করা। এরকম ভাঙ্গনের উৎসাহে যে আবর্ত সৃষ্টি করে তার মাঝখানে পড়লে মানুষ তার মাতুনির আর অন্ত পায় না—স্পর্ধা বেড়ে ওঠে; মানবপ্রকৃতিকে সাধনা করে বশ করবার অপেক্ষা আছে একথা ভুলে যায় ; মনে করে, তাকে তার আশ্রয় থেকে ছিঁড়ে নিয়ে একটা সীতাহরণ ব্যাপার করে তাকে পাওয়া যেতে পারে। তারপরে লঙ্কায় আগুন লাগে তো লাগুক। উপযুক্ত সময় নিয়ে স্বভাবের সঙ্গে রফা করবার ভর হয় না যাদের, তারা উৎপাতকে বিশ্বাস করে, অবশেষে রাতারাতি যা গড়ে তোলে তার উপরে ভরসা রাখা চলেনা, তার দীর্ঘকালের ভর সয় না (রাশিয়ার চিঠি)।

রবীন্দ্রনাথ তাই একই গ্রন্থে বলেন, "যেখানে মানুষ তৈরি নেই, মত তৈরি হয়েছে সেখানকার উচ্চণ্ড দণ্ডনায়কদের আমি বিশ্বাস করি না।" রথের রশি নাট্যে একই কথার প্রতিধ্বনি :

"দেখো, কাল থেকেই শুরু করবে চেঁচাতে—
জয় আমাদের হাল লাঙল চরকা তাঁতের।
তখন এঁরাই হবেন বলরামের চেলা—
হলধরের মাৎলামিতে জগৎটা উঠবে টলমলিয়ে।"

এবং কবির মতে, ঐ মাতুনির দিনেই আসবে উল্টো রথের পালা। তখন নতুন যুগ সৃষ্টি হবে উঁচুতে নীচুতে বোঝাপড়ার মাধ্যমে। কবিচিত্তে সাম্যবাদী নীতির যে ছবিটি চিত্রিত ছিল তা ঔপনিষদিক প্রত্যয় সূত্রে গ্রথিত তথা ভারতীয় সমাজ-জীবনধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত (তুঃ হল সমস্যা, কালান্তর)। এই নাট্যের প্রতিবেদনের মূলেও আছে জীবন, সমাজ ও সময়-সচেতনতা। লোকই শিক্ষার বাহন এ-নাট্যে কবি স্বয়ং বিবেকী আত্মার ভূমিকা নিয়েই উপস্থিত হয়েছেন এবং জনজীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সংকট ও সমস্যাকে আপোষমূলক সমাধানের মাধ্যমে কার্যকর করে সমস্বার্থভিত্তিক সহযোগিতা ও সহাবস্থানের প্রতিই স্বার্থসর্বস্ব বুর্জোয়াগোষ্ঠীর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন : "রথের দড়ি কি পড়ে থাকে বাইরে, সে থাকে মানুষে মানুষে বাঁধা।"

॥ ৩ ॥

রথের রশি নাটকের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে এবার আলোচনা করা যেতে পারে।

রথের রশি নাট্যেই রবীন্দ্রনাথ সর্বপ্রথম স্থির প্রত্যয়ের সঙ্গে গণমানুষের জয়ের কথা ঘোষণা করেছেন।

আবার এ-নাটকে কবির দার্শনিক প্রত্যয়ও অনুপস্থিত নয় ; ভগবান বা জগন্নাথ (যিনি কালের

রথের সর্বাধিনায়ক বা মহাপরিচালক) কোথায় প্রতিষ্ঠিত এ প্রশ্নের উত্তরে কেনোপনিষদ বলেছেন, সে মহিম্নি অর্থাৎ আপন মহিমায়। রবীন্দ্রনাথ উপনিষদের এ বাণীর প্রতিষ্ঠা করেছেন তাঁর বহু রচনায়। "মানুষের ধর্ম" প্রবন্ধে তিনি দেখিয়েছেন যে, মানুষেরও সত্য প্রতিষ্ঠা তার আপন মহিমায় অর্থাৎ মনুষ্যত্বের অব্যাহত প্রকাশে।[৪] 'রথের রশি' নাট্যেও কবি এ সত্যেরই প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, মনুষ্যত্বের বিকাশ ও প্রকাশ পূর্ণতা পায় গণমানুষের সামগ্রিক উজ্জীবনে এবং মানব ঐক্যের অভ্যুদয়ের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হবে সত্যিকার গণতন্ত্র।

মানুষের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার সূত্রের প্রতি ইঙ্গিত দান 'রথের রশি'র উপজীব্যে উপস্থাপিত। কবি রূপকের রূপরেখায় একথাই বলেছেন যে, স্বদেশের সঙ্গে স্বদেশবাসীর যে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি তার প্রধান কারণ এ নয় যে দেশের লোক বিদেশীর শাসনাধীনে। আসলে দেশের মানুষ নানা কালে নানারূপে বিবিধ সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর কব্জাভুক্ত অথবা শাসন-শোষণ-সংস্কার নিয়মের নিগড়ে বন্দী। দেশবাসী স্বদেশকে তাদের যৌথসেবা, ত্যাগ-মমতা ও যত্নের দ্বারা, জানা ও বোঝার দ্বারা আত্মীয়সূত্রে বাঁধতে পারেনি, দেশের হৃদয়কে অধিকার করতে পারেনি। আজকের দিনে সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন হচ্ছে—মানুষে মানুষে সামাজিক সন্ধি স্থাপন এবং সমবায় পদ্ধতির মাধ্যমে অধিকাংশ লোকের অধিকাংশ শক্তির সুষ্ঠু বিনিয়োগ, যাতে দেশের মানবিক শক্তি তথা প্রাযুক্তিক শক্তির সমন্বয়ী-সংহতি তাকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে। রাষ্ট্র বা সমাজনীতিতে ভারসাম্যরক্ষণই যে উত্তম পন্থা এবং এ পন্থা যে সভ্যতার যা কিছু বাহন—সমস্ত প্রক্রিয়ার সঙ্গেই সম্পৃক্ত, এ-বাস্তব সত্য সমাজের স্বার্থান্বেষীদেরও আত্মকল্যাণেই উপলব্ধি করতে হবে, কেননা, গণমানুষের সমর্থন নিয়েই সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি সম্ভব, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান—'রথের রশি' নাট্যে কবি বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকেই তাই মন্ত্রী (রাষ্ট্রশক্তি পরিচালনার বুদ্ধির প্রতিভূ) বাচনিক বলেছেন, "স্পষ্টই গেল দেখা, এ মায়া নয়, নয় স্বপ্ন। এবার থেকে মান রাখতে হবে ওদের সঙ্গে সমান" হয়ে।

'অচলায়তন' নাটকে ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ গুরুর আবির্ভাবের মাধ্যমে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার আভাস দিয়েছেন, 'মুক্তধারা'য় ক্ষাত্রশক্তির বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন, 'রক্তকরবী'তে ধনিক ও শ্রমিক সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ইঙ্গিত দিয়েছেন। বলাবাহুল্য, উক্ত তিনটি নাটকেই কালান্তরের আভাস স্পষ্ট কিন্তু 'রথের রশি'তে গণবিপ্লবের মাধ্যমে গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সার্থকসূচনা হয়েছে।[৫] নাটকীয় আবেগের চেয়ে কৃষক-শ্রমিক অস্পৃশ্য-অবহেলিতদের ব্রাত্যজীবনকে উজ্জ্বল মহিমায় সমাজমানসে তুলে ধরাই রথের রশির প্রধান বৈশিষ্ট্য (তুলনীয় 'জন্মদিন' কাব্যগ্রন্থের ১০ সংখ্যক কবিতা)। এদিক থেকে দেখতে গেলে বাংলার নাট্যধারাকে নতুন পথে চালনার ইঙ্গিত দিয়েছিল 'রথের রশি' এবং এ কারণেই রথের রশি সত্যিকারের প্রগতিবাদী নাটক। মানুষের প্রাণের জগৎবিচ্ছিন্ন মূল্য নিরূপণে রথের রশি রূপকনাট্য এক বাস্তব পদক্ষেপ। একান্ত রূপকধর্মী হওয়ার জন্যেই এ-নাটক তৎকালীন শাসক বা বুর্জোয়া-সমাজের শ্যেণদৃষ্টি এড়িয়ে গেছে বলে মনে হয়। তা না হলে এ-নাটিকায় গণবিপ্লবমুখী কার্য-সমর্থনের যে ইঙ্গিত বর্তমান, তা তদানীন্তন সরকারের চাঞ্চল্যের কারণ হতে পারত।[৬]

১। 'রথযাত্রা' নাট্যদৃশ্যটির রচনা সম্বন্ধে কবির মন্তব্য : "আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র শ্রীমান প্রমথনাথ বিশীর কোনো রচনা হইতে এই নাট্যদৃশ্যের ভাবটি আমার মনে হইয়াছিল।" ('রথযাত্রা', প্রবাসী, ১৩৩০ অগ্রহায়ণ, পৃঃ ২১৬-২৬)। 'বিশ্বভারতী সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনে শ্রী প্রমথনাথ বিশী 'রথযাত্রা' নামে তাঁর স্বরচিত একটি নাটক পাঠ করেছিলেন। ('শান্তিনিকেতন', ১৩৩০ ভাদ্র, পৃঃ ১৩৮)।

২। সমকালীন রচনা সমস্যায় কবি বলেছেন যে, দেশের সামাজিক ভেদবুদ্ধিই সামাজিক স্বাধীনতার পথে প্রধান সমস্যা. তাঁর নিজের কথায়' একঃ অবর্ণঃ যিনি এক এবং সকল বর্ণ-ভেদের অতীত, 'স ন বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্ত' তিনিই আমাদের শুভবুদ্ধি দিয়ে পরস্পর সংযুক্ত করুন।' সমস্যা (প্রবাসী ১৩৩০ অগ্রহায়ণ)। বলা বাহুল্য, এই এক এবং অবর্ণই জগন্নাথ বা কালের রথের সর্বাধিনায়ক, এবং রথের দেবতা জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেরই দেবতা। পুরীর জগন্নাথের মন্দিরদ্বার সর্বসাধারণের জন্যে উন্মুক্ত, কেননা মন্দিরের দেবতা যে জগতেরই নাথ, জগন্নাথ।

৩। 'সমাধান' প্রবন্ধেও কবির বক্তব্য এই যে, সামাজিক ভেদবুদ্ধি মানুষের অবুদ্ধির নামান্তর। অবুদ্ধির প্রভাবে দেশের মানুষ বিচ্ছিন্ন এবং তারা পরস্পরের বিরুদ্ধ। সুতরাং যেখানে সমাজের অধিকাংশ লোক মূঢ়তায় আচ্ছন্ন এবং অন্ধ সংস্কারের বশে সন্ত্রস্ত হয়ে গুরু পুরুত গণৎকারের দরজায় ছুটাছুটি করে মরছে, সেখানে এমন কোনো সর্বজনীন স্বাধীনতামূলক রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ব্যবসাতন্ত্র ঘটতেই পারে না, যার সাহায্যে অধিকাংশ লোক তাদের অধিকাংশ ন্যায্য প্রাপ্য পেতে পারে। এমন পরিস্থিতিতেই সেই রাষ্ট্রনীতিই উত্তম, যার মাধ্যমে সর্বজনের স্বাধীন শক্তি নিজেকে প্রকাশ করবার পথে পেতে পারে। 'সমাধান', 'কালান্তর' (বি. ভা. কলি, ১৩৪৪), পৃঃ ২১২।

৪। রাশিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথ ১৯৩০ সনের ৩১শে অক্টোবর তাঁর পুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে একটি পত্রে লিখেছিলেন, "যে রকম দিন আসছে, তাতে জমিদারির উপর কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। যে সব কথা বহুকাল ভেবেছি, এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারি ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরতলার গদি ছেড়ে নীচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।" —গ্রন্থ পরিচয়, "রাশিয়ার চিঠি', র.র ২০, (বি.ভা. কলি, ১৩৬১), পৃঃ ৪৫৩। এ-প্রসঙ্গে কবির স্ববিরোধী মনোভাবও উল্লেখ্য : 'অমিয় চক্রবর্তী যখন তাঁর (রবীন্দ্রনাথ) কাছে নিবেদন করেন যে যাবার আগে তিনি যেন জমিদারি নেশনকে দান করে দিয়ে যান তখন তিনি নারাজ হন।' —অন্নদাশংকর রায়, 'তাঁর পরেই প্লাবন', রবীন্দ্রনাথ, (কলি, ১৯৬২), পৃঃ ১১।

৫। উল্লেখ্য, চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কোনোদিনই গণান্দোলনের পুরোপুরি সমর্থক ছিলেন না। (তুলনীয়, প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্য, প্র. না. বি রবীন্দ্র নাট্যপ্রবাহ, কলি, ১৯৬৬ পৃঃ ৫০৩)। কিন্তু 'রথের রশি' নাট্যে কবির চিন্তাধারার আশ্চর্য ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়।

৬। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা অবান্তর নয় যে, ১৯৩৫ সনে (১৯৩৫ সন 'রথের রশি' নাট্যরচনার কাল) দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় রবীন্দ্রনাথকে সমাবর্তনে ভাষণ দেবার অনুরোধ জানাতে একটি প্রস্তাব পেশ করেন। দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ভারত সরকারের কাছে জানতে চাইলেন— রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ জানানো উচিত হবে কিনা। গোয়েন্দা বিভাগ তদুত্তরে মন্তব্য পাঠাল : "রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর নাইট উপাধি ব্যবহার করেন না। কবি, দার্শনিক ও ভারতীয় সংস্কৃতির বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁর আন্তর্জাতিক খ্যাতি আছে। অন্যদিকে পার্টিশন বিরোধী আন্দোলনের মুখপাত্র হিসেবে (anti-partition agitation) তিনি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। আর তখন থেকেই তিনি সরকারের বিরুদ্ধতাকরছেন। বাংলাদেশকে তিনি জাতীয় সংগীত দিয়েছেন। কলকাতাথেকে একটি সদ্য পাওয়া সংবাদে জানা যাচ্ছে যে, তিনি আগের চেয়ে ক্ষিপ্ত সরকার-বিরোধী (rabidly anti-government) হয়ে উঠেছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি উপন্যাসে একথা স্পষ্ট বোঝা গেছে। অভিযোগ এই যে, বাংলার বিপ্লববাদের গুণগান গাওয়া হয়েছে এই উপন্যাসে।... পাবলিক প্রসিকিউটর ১৯৩১ সালের প্রেস ইমারজেন্সী পাওয়ারের প্রয়োগে বইটি বাজেয়াপ্ত করতে বলেছেন... বাংলাদেশে বইটির প্রভাব অত্যন্ত ক্ষতিকর হবে।—পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ডক্টর টেগোরের রাজনৈতিক মতামতের প্রসঙ্গে বলা যায় যে, ভারতবর্ষের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই এই জাতীয় লোককে সমাবর্তনে ভাষণ দিতে আহ্বান করা উচিত নয়।" —(হোম ডিপার্টমেন্ট, ফাইল নং ৫৫-১-৩৫, সোমেন্দ্র নাথ বসু, 'পুলিশ রেকর্ডে রবীন্দ্রনাথ', আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৬শে পৌষ ১৩৭৮)। উক্ত উপন্যাসের নাম 'চার অধ্যায়'। এ উপন্যাসে কবি বিপ্লববাদীদের চরিত্র চিত্রণ করেছেন। 'রথের রশি'তে এ জাতীয় নির্দিষ্ট চরিত্র না থাকলেও সমসাময়িক রাষ্ট্র ও সমাজচিত্র এবং গণমানুষের শক্তির উদ্বোধনের চিত্র উপস্থিত।

[গ্রন্থসূত্র : রবীন্দ্রনাথের রূপক-সাংকেতিক নাটক—ড. মঞ্জুশ্রী চৌধুরী]

একক ৮৬ ❑ গণনাট্য আন্দোলন ঃ নবান্ন — বিজন ভট্টাচার্য

গঠন

৮৬.১ উদ্দেশ্য

৮৬.২ প্রস্তাবনা

৮৬.৩ বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

৮৬.৪ মূলপাঠ ১ : (ক) গণনাট্য আন্দোলন কি ও কেন?

(খ) গণনাট্য আন্দোলন এবং নবান্ন।

৮৬.৫ সারাংশ

৮৬.৬ অনুশীলনী ১

৮৬.৭ মূলপাঠ ২ : নবান্ন — প্রথম অঙ্ক

৮৬.৮ সারাংশ

৮৬.৯ মূলপাঠ ৩ : নবান্ন — দ্বিতীয় অঙ্ক

৮৬.১০ সারাংশ

৮৬.১১ মূলপাঠ ৪ : নবান্ন — তৃতীয় অঙ্ক

৮৬.১২ সারাংশ

৮৬.১৩ মূলপাঠ ৫ : নবান্ন — চতুর্থ অঙ্ক

৮৬.১৪ সারাংশ

৮৬.১৫ অনুশীলনী ২

৮৬.১৬ উত্তর-সংকেত

৮৬.১৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

৮৬.১ উদ্দেশ্য

বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন নাটকটি পাঠের মধ্য দিয়ে আপনি নতুন ধারার সৃষ্টিকারী নাটক ও নাট্যকার সম্পর্কে জানবেন। এই এককটি পাঠ করলে বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চের যুগান্তর সৃষ্টিকারী ‘নবান্ন’ নাটকের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবেন।

- পরিশেষে জানবেন, ‘নবান্ন নাটক সৃষ্টির প্রেরণা ও অভিনয়ের উদ্যোগের উৎসটি।
- ‘নবান্ন’ নাটক ও তার উপস্থাপনা শুধুমাত্র নতুনতর আর্ট হিসেবেবেই প্রশংসনীয় ছিলনা, দুঃস্থ ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি বেদনা জাগাতে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল।

- নবান্ন নাটকের মধ্য দিয়ে এটি উপলব্ধি করবেন, এটি কোন ব্যক্তি কেন্দ্রিক জীবনবৃত্ত নয়, যুগ পরিবেশজাত জীবনের কথা।
- 'নবান্ন' ব্যক্তি জীবনবৃত্ত থেকে গোষ্ঠী জীবনকথা হয়ে উঠতে পেরেছে বলেই এ নাটক গণনাট্য।
- এ নাটক ভারত তথা বাংলাদেশের এক বিশেষ রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে রচিত (১৯৪২-এর আগস্ট আন্দোলন এবং মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনায় ১৬ অক্টোবর সাইক্লোন ও বন্যা)।
- এ নাটকের পটভূমিতে আছে সন ১৩৫০-এর কুখ্যাত মন্বন্তর জনিত সঙ্কট (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) এবং তা থেকে উত্তরণের দিশা।
- নবান্ন এদিক থেকে হয়ে উঠেছে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক। নবান্ন গণনাট্যের একটি বিশিষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ নাটক।

৮৬.২ প্রস্তাবনা

ইতোপূর্বে আপনি বাংলা নাটকের ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং দুটি নাটক পাঠের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রেক্ষাপট বাংলার গ্রাম ও তার দরিদ্র অসহায় কৃষক সমাজ—তাদের জীবনযাপনে সমস্যা সঙ্কট, ইংরেজ কুঠিয়ালদের শাসনপীড়ন, তাদের নায়েব-গোমস্তা পাইকদের অত্যাচারের পরিচয় পেয়েছেন। নাটকটি বসু পরিবারের পারিবারিক সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়ায় কৃষকের সম্মিলিত শক্তি এখানে সংহত গণ আন্দোলনের পর্যায়ে পৌঁছাতে পারেনি। অতিনাটকীয় উপাদানে নাটকের শেষ পরিণতি ঘটেছে।

'রথের রশি' (১৩৩৯) নাটকে আমরা প্রথম জনজাগরণের আভাস পেয়েছি। দেখেছি সভ্যতার রথ জনতার হাতের টানে উঁচুনিচু পথকে সমান করে স্বচ্ছন্দ গতিতে চলেছে। রবীন্দ্রনাটকের রূপক সাংকেতিক নাটকের এই প্রগতি ধারণা পরবর্তীকালে গণনাট্য সংঘের বাস্তব ভিত্তিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। গণনাট্যের মূল আদর্শ ও লক্ষ্য হোল : 'People' বা 'গণ' অর্থে সমাজের বৃহত্তর অংশ—শ্রমিক কৃষক মেহনতি মানুষের স্বাধীনতা, সামাজিক অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার গণতান্ত্রিক পরিবেশ। মানুষের জীবনধারণের ন্যূনতম প্রয়োজনের কথা শিল্প সংস্কৃতি কর্মীরা তাঁদের নাটক গানে কবিতায় আলোচনা ও প্রচার করবার মঞ্চ হিসাবে গণনাট্য সংঘকে গড়ে তুলেছিলেন। 'নবান্ন', ২৪শে অক্টোবর, ১৯৪৪ গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে অভিনীত হয়। নাটকটি ১৯৪২ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে তদানীন্তনকালে দেশের শোষিত কৃষক মধ্যবিত্তের জীবনের বঞ্চনা ও শোষণের চিত্র নিয়ে হাজির হয়েছিল। নাটকটির অভিনয় চতুর্দিকে সাড়া তুলেছিল।

আপনি এ হেন ঐতিহাসিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ এই নাটকটির পূর্ণাঙ্গরূপ বর্তমান এককে পড়বেন। নাটকটি সমগ্রত পড়ার পর, আপনি নাটকটির বিষয়বস্তু, চরিত্রচিত্রণ, উপস্থাপনা নিজেই মূল্যায়ন করতে পারবেন।

৮৬.৩ বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা

'নবান্ন'-র নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্যের জন্ম ১৭ই জুলাই, ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার (বর্তমান বাংলাদেশ) খানখানপুর গ্রামে। পিতা ক্ষীরোদ বিহারী ভট্টাচার্য পেশায় শিক্ষক ছিলেন। তাঁর আদর্শ জীবনযাত্রা, সাহিত্য ও সংগীতপ্রীতি এবং শেক্সপীয়র-চর্চায় অনুরাগ বিজন ভট্টাচার্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। পিতার সঙ্গে নানা স্থানে পরিভ্রমণ কালে গ্রামের মানুষদের দৈনন্দিন জীবন ও তাঁদের আঞ্চলিক ভাষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটেছিল। এখানে যাত্রা, কথকতা ও মেলায় অংশগ্রহণ করায় বিজন ভট্টাচার্যের গ্রামজীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার ছিল অতিশয় সমৃদ্ধ। মহিষবাথানে লবণ সত্যাগ্রহে তিনি অংশগ্রহণ করেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি আশুতোষ কলেজে পরে রিপন (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ) কলেজে ভর্তি হন। ১৯৩১-৩২-এ শরীর-চর্চা, জাতীয় আন্দোলন, পরে ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয় কর্মী ছিলেন। অবসর সময়ে আলোচনা, ফিচার ও স্কেচ লিখতেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় মাতুল সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রতিষ্ঠিত 'অরণি' পত্রিকায় যোগ দিয়ে গল্প ছাড়াও নানা বিষয়ে লিখতেন। রেবতী বর্মনের সাম্যবাদ সম্পর্কিত বই পড়ে কমিউনিস্ট মতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ১৯৪২-এ কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়ে সর্বক্ষণের কর্মী হন। অনিয়মিত জীবনযাপন ও অযত্নে তিনি ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। ১৯৪২-এর 'ভারত-ছাড়' আন্দোলন, 'জনযুদ্ধ' নীতির প্রচার এবং ফ্যাসী বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ স্থাপন এবং সেখান থেকে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ ও ভারতীয় গণনাট্য সঙ্গ (IPTA) গঠন-এ তাঁর সক্রিয় ভূমিকা ছিল। তাঁর প্রথম নাটক 'আগুন' (১৯৪৩)। বিনয় ঘোষের 'ল্যবরেটরী'র তিনি নাট্যরূপ দেন। এগুলি অভিনীত হয়। এরপর তাঁর নাটক 'জবানবন্দী' অরণি'তে প্রকাশিত হয় আর দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তরের পরিপ্রেক্ষিতে রচনা করেন 'নবান্ন'। এটি ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৪-এ আই. পি. টি. এ. কর্তৃক শ্রীরঙ্গম মঞ্চে অভিনীত হয়। নাটকটিতে তিনি প্রধান সমাদ্দারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ইত্যবসরে ১৯৪৩-এ তিনি খ্যাতনামাকবি ও গল্পলেখক মনীষ ঘটকের কন্যা, লেখিকা মহাশ্বেতা দেবীকে বিয়ে করেন, তবে তা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ১৯৪৬-এর দাঙ্গায় পটভূমিকায় বিজন ভট্টাচার্য 'জীয়নবন্যা' লেখেন। 'মরাচাঁদ' নাটকে পবন বাউলের ভূমিকায় উদ্দীপনামূলক গান গেয়ে সবিশেষ খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। ১৯৪৮-এ তিনি মতান্তরের কারণে গণনাট্য সঙ্ঘ ছেড়ে বোম্বাই চলে যান জীবিকার অন্বেষণে। সেখানে তিনি কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেন এবং কয়েকটি চিত্রনাট্য রচনা করে দেন। ১৯৫০-এ কোলকাতায় ফিরে 'ক্যালকাটা থিয়েটার গ্রুপ' প্রতিষ্ঠা করে প্রায় ২০ বছর ধরে নাটক লিখে, অভিনয় করে, নাটক পরিচালনা করে জীবন ধারণ করেছেন। দেবী দুর্গার রূপকাশ্রয়ে জোতদারের বিরুদ্ধে কৃষকের সম্মিলিত প্রতিরোধ রচনার জন্য 'দেবীগর্জন', দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় 'কলঙ্ক', দেশবিভাগের দরুণ বাস্তুচ্যুত শিক্ষকের জীবন নিয়ে 'গোত্রান্তর' রচনা করেন। জীবনের শেষ অধ্যায়ে তিনি 'ক্যালকাটা থিয়েটার' ছেড়ে 'কবচকুণ্ডল' নামে একটি নাট্যপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। সেখানেও কয়েকটি নাটক অভিনীত হয়েছে—যেমন, 'কৃষ্ণপক্ষ', 'আজ বসন্ত' প্রভৃতি।

বিজন ভট্টাচার্য উৎপল দত্ত পরিচালিত লিটল থিয়েটার গ্রুপের 'তিতাস একটি নদীর নাম', দিলীপ

রায় নির্দেশিত 'রাজদ্রোহী'-তে অভিনয় করা ছাড়াও 'বাড়ী থেকে পালিয়ে', 'তথাপি', 'মেঘে ঢাকা তারা', 'সুবর্ণরেখা', 'যুক্তি তক্কো আর গপ্পো' প্রভৃতি চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছেন। বস্তুত নাটক, গান, অভিনয় ছিল বিজন ভট্টাচার্যের জীবনের সঙ্গো গভীরভাবে ওতোপ্রোত। তথাপি, বিশৃঙ্খল জীবনযাপন ও হতাশা, তাঁর অসামান্য প্রতিভা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত সফল সুন্দর জীবন উপকূলে পৌঁছে দিতে পারেনি।

৮৬.৪ মূলপাঠ—১ (ক) গণনাট্য আন্দোলন কি ও কেন? (খ) গণনাট্য আন্দোলন ও 'নবান্ন'।

(ক) ফরাসী চিন্তাবিদ ও ঔপন্যাসিক রম্যাঁ রল্যাঁ তাঁর থিয়েটার সংক্রান্ত ভাবনা কয়েকটি প্রবন্ধে লিপিবন্ধ করেন। সেটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ হলো, ইংরেজিতে অনুবাদ হয়। অনূদিত গ্রন্থের নাম 'দি পিপ্‌লস্ থিয়েটার', এ দেশে নাম দেওয়া হয়েছে 'গণনাট্য'। বিশ্বযুদ্ধোত্তর রাজনৈতিক পটভূমিকায় য়ুরোপে নাটক ও থিয়েটারের ক্ষেত্রে এই চিন্তাধারা বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে। চল্লিশের দশকে বৃটিশ-উপনিবেশ ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এটি প্রায় অমোঘ অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়। চল্লিশের এই গণনাট্য আন্দোলন বর্তমানের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের হাতিয়ার।

রল্যাঁর মূল বক্তব্য হল প্রায়োগিক শিল্প বা পারফরমিং আর্টকে জনগণের কাছে যেতে হবে, তাঁদের জীবনকে তুলে ধরতে হবে। অর্থাৎ এ থিয়েটার হবে গনগণের জন্য এবং জনগণের দ্বারা পরিচালিত থিয়েটার। তিনি এখানেই থামেননি। তিনি একে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তাঁর আস্থা, তাঁর বিশ্বাস ও নির্ভরতার কেন্দ্র জনগণ। তিনি বিপ্লবী বুদ্ধিজীবীদের মত বুঝেছিলেন যে কোন সংকট উত্তীর্ণ হ'তে হলে প্রয়োজন ব্যাপক প্রতিরোধ। এই প্রতিরোধ একক প্রচেষ্টায় নয়, ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই সম্ভব। তাই গণনাট্যের নাটক জীবনের জন্য, তার বিষয়বস্তু জনজীবন থেকে আহৃত। চরিত্র সমাবেশে থাকবে সাধারণ মানুষ, কোন বিশেষ ব্যক্তি চরিত্র নয়, সামগ্রিক অভিনয় দক্ষতার ওপর এই নাট্যাভিনয় নির্ভরশীল। সাধারণ দর্শকের মনোরঞ্জন করে, তাঁদের নতুন জীবন-ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করা। ফলত এ নাটক বস্তুত উদ্দেশ্যমূলক। তবে এর মূল বক্তব্য উপস্থাপিত হয় আনন্দময় পরিবেশে, জীবন সম্পর্কে রাজনৈতিক সামাজিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। এ নাটকের মঞ্চ দৃশ্যসজ্জা হবে অতি সাধারণ, সাধারণ মানুষের জীবনানুগ-বাস্তব।

এখন নাটক ও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গো আন্দোলন শব্দটা সংযুক্তির তাৎপর্য বুঝে নেওয়ার দরকার। আন্দোলনের দুটি পক্ষ—আন্দোলনকারী ও যাঁর বা যাঁদের বিরুদ্ধে আন্দোলন অর্থাৎ কায়েমী স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা সম্প্রদায়। এই প্রসঙ্গো অনিবার্য ভাবে এসে পড়ে আর একটি প্রশ্ন, আন্দোলন কি জন্য? এবং কার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যবস্থা যা গরিষ্ঠ জনজীবনের পরিপন্থী, তাকে ভেঙে নতুন কিছু গড়বার বা করবার জন্য আন্দোলন। কার জন্য? এ প্রশ্নের উত্তর হ'ল এই যে কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন মানুষের বাইরে যে অগণিত জনগণ শহরে গ্রামে গঞ্জে ক্ষেতে খামারে কলে

কারখানায় নানান সাধারণ বৃত্তিতে নিযুক্ত আছে, সেই সব মানুষের পক্ষে বক্তব্য তুলে ধরবার জন্য এই প্রয়াস। সেই দায়িত্ব অবিসংবাদিতভবে এসে পড়ল। তিরিশের দশকের মানুষের কাঁধে। মাঝখানের সময়টাতে দর্শকমণ্ডলী এমন কোন নাটক পায়নি যার মধ্যে নিজের মানসিকতার দুর্গতির সাযুজ্য খুঁজে পেতে পারে—কোন চরিত্রের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গো নিজের জীবন যন্ত্রণার সঙ্গো নিজের জীবন যন্ত্রণার সন্ধান পেতে পারে। বস্তুত নাটক জীবনের কাছে দায়বন্ধ। তথাপি একথা বুঝবার বা বোজাবার চেষ্টা হয়নি সমাজের কাছে, মানুষের কাছে, জীবনের কাছে—নতুনত্ব পিয়াসী জনগণের কাছে যে নাটকের দায় ও দায়িত্ব কতখানি। অথচ নাটকের কারবার তো কেবল মাত্র মানুষকে নিয়ে। মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষের সঙ্গো সমাজের জীবনের সম্পর্ক নাটকের বিষয়। নাটক মানুষের কথা বলে, জীবন যন্ত্রণা বা জীবন সংগ্রামের ভাষ্যকার সে তাই তার বক্তব্য বিষয় বস্তুত যা নিয়ে তা হ'ল জীবনের সঙ্গো জীবিকার সম্পর্ক, জীবিকার সঙ্গে বঞ্চনার, বঞ্চনার সঙ্গো প্রতিরোধের, প্রতিরোধের সঙ্গো সংগ্রামের বাস্তবসম্মত নিখুঁত চিত্রাঙ্কনের মধ্য দিয়ে জীবনের ইতিবাচক দিকটিকে জনসমক্ষে নিয়ে আসা।

বাংলা নাটকের পেশাদার মঞ্চ এই সম্পর্কের চিত্র অঙ্কন করতে পারেনি। ফলত জীবনবিমুখতা পলায়নবাদিতা, গতানুগতিকতা আর রোমান্টিসিজমের ধূম্রজালের মধ্যে নিমজ্জিত থাকল সে। ইতিমধ্যে এসে গেল আর একটা মহাযুদ্ধ। শুরু হ'ল কালোবাজারী আর মুনাফাখোর মানুষের নৃত্য। কৃষক শ্রমিক মধ্যবিত্ত শোষিত হতে হতে নিঃশেষিত প্রায় হতে লাগল। একদিকে স্বাধীনতা পাবার উদগ্র কামনা, অন্যদিকে শোষণ আর পেষণ থেকে মুক্তির আকুতি দিকে দিকে রণিত হতে লাগল। শুরু হ'ল জীবনের সপক্ষে—শুধু মধ্যবিত্ত নয়, শ্রমজীবী মানুষের অনুকূলে, নাট্য আন্দোলন।

আন্দোলনের আরো সুন্দর যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন ডঃ অজিতকুমার ঘোষ, "আজ যে দেশের মধ্যে সর্বত্র নাটক ও নাট্যাভিনয় সম্পর্কে বিপুল আগ্রহ ও উদ্দীপনা দেখা দিয়াছে, তাহা এই নাট্য আন্দোলনের জন্য সম্ভব হইয়াছে। নাট্য-আন্দোলনে 'আন্দোলন' কথাটি লইয়া অনেকে আপত্তি করিয়াছেন। কিন্তু যখন সমাজের কোনো বৃহৎ অংশ একটি বিশেষ লক্ষ্যস্থানে পৌঁছিবার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিযুক্ত হয়, তখনই তো তাহাদের মধ্যে একটি আন্দোলন দেখা যায়। 'আন্দোলন' কথার অর্থই হইল প্রচলিত অবস্থার একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ এবং কোন এক অপ্রাপ্ত অবস্থার জন্য সক্রিয় সাধনা। ...... প্রাণবান নাটক মঞ্চজগৎ এবং আশ্বাসভরা এক আদর্শ সমাজ সম্বন্ধে অদম্য সাধনাই ইহার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। সেই জন্য আন্দোলন কথাটি সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত বলিয়াই আমরা গ্রহণ করিতে পারি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু পূর্ব হইতেই সাধারণ নাট্যশালায় অবসাদ ও অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকটিত হইয়া উঠিতেছিল। ওই সব নাট্যশালাকে যে সব অসাধারণ অভিনেতা তাদের অদ্বিতীয় অভিনয়গুণে বাঁচাইয়া রাখিয়াচিলেন তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পরলোকগমন করিলেন। কেহ কেহ বা রঙ্গামঞ্চ হইতে সাময়িকভাবে অবসর লইলেন। তাহাদের অভাবে রঙ্গামঞ্চের আকর্ষণ একেবারে কমিয়া গেল। মঞ্চপরিচালকরাও আলোক ও দৃশ্যপটের ব্যবহার এবং প্রয়োগরীতির দিক দিয়া তেমন কোন নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই, সে জন্য নবাগত সিনেমা-নেশায় উন্মত্ত দর্শকগণ রঙ্গামঞ্চের অভিনয়ের প্রতি

এ সময় বিশেষ কোন আগ্রহ বোধ করেন নাই। সমাজের অবস্থাও দ্রুত পরিবর্তন হইতেছিল। থিয়েটারের নেশামত্ত জমিদার শ্রেণীর অবলোপ ঘনাইয়া আসিতেছিল এবং নূতন যে ব্যবসাদার শ্রেণীর উদ্ভব হইতেছিল, তাহারা থিয়েটার অপেক্ষা চলচ্চিত্র শিল্প অধিকতর লাভজনক দেখিয়া সেদিকে ঝুঁকিলেন। নাট্যশালাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তুলিতে পারে এমন কোনো বলিষ্ঠ ভাবাশ্রয়ী উদ্দীপনাজনক নাটকও তখন রচিত হইতেছিল না। এইসব নানা কারণে সাধারণ নাট্যশালার অবস্থা তখন শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। নাটক ও মঞ্চকে বাঁচাইবার জন্য সাধারণ নাট্যশালার বাইরে তখন নবজীবনবাদী ও অদম্য উৎসাহী একদল নাট্যামোদী যুবকের সংঘবন্ধ প্রচেষ্টায় নবনাট্য আন্দোলন গড়িয়া উঠিল।"

সমাজ সম্বন্ধে বিপ্লবী মতবাদ এবং নতুন জীবন সম্বন্ধে আশাবাদী ভাবনা প্রথম দেখা গিয়েছিল গণনাট্য সঙ্ঘে। দীর্ঘদিন ধ'রে এই আন্দোলন চলে আসছে। পেশাদারী মঞ্চগুলিও পাশাপাশি পুরাতন ঐতিহ্যকে বজায় রাখবার প্রাণপণ চেষ্টা করে চলেছে এবং দর্শক আকর্ষণের নানান কৌশল প্রয়োগ করে চলেছে। কিন্তু পৃথিবীর বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশের সুস্থ সংস্কৃতির ছিন্নপত্র সীমান্ত পেরিয়ে এসে বাংলার যুবমানসের ওপর যে তীব্র প্রভাব ফেলতে শুরু করে সেই সব নবলব্ধ চেতনা একে একে বিস্ফোরণ ঘটায়। কৃষক ও জমিদার-জোতদারের সংগ্রাম, শ্রমিক-মালিকের সংগ্রাম, শোষক ও অত্যাচারী মধ্যবিত্ত এবং খেটে খাওয়া নিম্নমধ্যবিত্ত ও দরিদ্র মানুষের সংগ্রামকে জনসাধারণের কাছে তুলে ধরে বাংলা নাটক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে থাকল বাংলার মানুষের সঙ্গে। জীবনের বিশ্বস্ত চিত্র তুলে ধরে বাংলা নাটক বাংলার মানুষের প্রাণের বস্তু হয়ে উঠতে লাগল ক্রমশ।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে দিয়ে এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। নাট্যাভিনয়ই প্রধান অংশ ছিল এই গণনাট্য সংঘের। এই সংঘের ভাবনা চিন্তা পেশাদার কোন মঞ্চের ভাবনা চিন্তার অনুসারী ছিল না, তা সম্পূর্ণ আলাদা।

সংগঠিতভাবে 'গণনাট্য' আন্দোলন শুরু হয়েছিল বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটক দিয়ে। সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে গণনাট্য সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে। তা' না হলে 'নবান্ন' নাটকের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বোঝা যাবেনা। 'নবান্ন' এবং 'গণনাট্য' সংঘ একেবারে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। দেশের ইতিহাসের একটি বিশেষ যুগে গণনাট্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের একটি স্তরে মার্কসবাদী আদর্শ এবং সংগঠন বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। রুশ বিপ্লবের পরেই এই প্রভাব সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। যেমন রাজনীতিতে তেমনই সংস্কৃতি আন্দোলনেও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের প্রয়োগ এদেশে শুরু হয়ে যায়। এরই ফলে ১৯৩৫ সালে প্রগতি লেখক সংঘ গঠিত হয়, যার মূল ঘোষণা ছিল 'ভারতবর্ষের নবীন সাহিত্যকে আমাদের বর্তমান জীবনের মূল সমস্যা ক্ষুধা-দারিদ্র্য সামাজিক পরাঙ্মুখতা, রাজনৈতিক পরাধীনতা নিয়ে আলোচনা করতেই হবে। যা কিছু আমাদের নিশ্চেষ্টতা, অকর্মণ্যতা, যুক্তিহীনতার দিকে টানে তাকে আমরা প্রগতিবিরোধী বলে প্রত্যাখ্যান করি। যা কিছু আমাদের বিচার বুদ্ধিকে উদ্বুদ্ধ করে, সমাজব্যবস্থা ও রীতিনীতিকে যুক্তিসম্মতভাবে পরীক্ষা করে, আমাদের কর্মীষ্ঠ শৃঙ্খলাপটু, সমাজের রূপান্তরক্ষম করে—তাকে আমরা প্রগতিশীল বলে গ্রহণ করব।'

এই ঘোষণায় স্পষ্ট বলা আছে—'সাহিত্যেরবিষয় বস্তু কি হবে এবং যা আরো গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে

যে কেবলমাত্র রসের বিচারের দ্বারা সাহিত্য বিচার হতে পারেনা। সেই শিল্পজাত রস আমাদের সমাজের রূপান্তর ঘটাতে সাহায্য করে কিনা সেও একটা মানদণ্ড যা তৎকালীন ভারতীয় শিল্পকলা বিচারে এমন দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ইতিপূর্বে বলা হয়নি।'

এই 'প্রগতি লেখক সংঘ' সারা ভারতে এবং বিশেষ করে বাংলার প্রায় অনেকগুলি জেলায় শাখা বিস্তার করে। নাটক সাহিত্যের এমন একটি অঙ্গ যা নতুন ভাবাদর্শ প্রচারে সক্রিয় এবং অগ্রগামী ভূমিকাপালন করে। আর যেহেতু, অভিনয় যোগ্যতা নাটকের মৌল শর্ত, সেই হেতু দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে তা সহজেই ছাপ ফেলতে পারে। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' কিংবা 'নীলদর্পণ' আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে রায় দেবে। ফলে দেশের লেখকদের সামনে একটা নতুন ঢেউ এলো। গল্প কবিতা লেখার সঙ্গে সঙ্গে দেশের ছাত্র, যুবক, অফিসের কেরানী প্রভৃতি শিক্ষিত সচেতন ব্যক্তিরা নাটক লেখা ও অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে থাকলেন।

(খ) ভারতীয় গণনাট্য সংঘ তার প্রথম বুলেটিনে 'Peoples Theatre Stars the People'— এই বাণী শিরোভূষণ করে যাত্রা শুরু করে। এই সংঘের লক্ষ্য ছিল স্তিমিতপ্রায় সংস্কৃতিকে জাগিয়ে তুলে তাকে প্রাণবন্ত করে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। প্রভাবে গণসংযোগের মাধ্যমে সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে নতুনভাবে সমৃদ্ধ করা সম্ভব হবে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ অবিচলিত দেশপ্রেম নিয়ে এভাবে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পুরোভাগে এগিয়ে এসেছে। গণনাট্যের নাটক তাই সাধারণ নাট্যভাবনা বা নাট্যতত্ত্ব দিয়ে বিচার করা ঠিক হবে না। জীবন্ত ও সচল জীবন ভাবনায় সমৃদ্ধ হয়ে এ নাটককে বিচার করতে হবে সমসাময়িক দেশকাল ও ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এগুলি লেখা বলে, বিচারও করতে হবে, সে দিকে লক্ষ্য রেখে। যেহেতু এর বিষয়বস্তু নতুন, চিন্তাধারাও স্বতন্ত্র, প্রয়োজনীয় সংঘবদ্ধ প্রয়াস, সর্বোপরি শোষিত ও নিপীড়িত মানুষকে সংগঠিত করার প্রয়োজনে মূল বক্তব্য উপস্থাপিত, এর বিচার প্রচলিত মানদণ্ডে হতে পারেনা।

প্রথম পর্বে Youth Cultural Institution (Y.C.I.) (১৯৪০), পরে গণনাট্য সংঘ যে নাটক ও গল্পের নাট্যরূপ অভিনয় করেছিল ; তা হল অঞ্জনগড় ও কেরাণী এবং ল্যাবরেটরী, আগুন, হোমিওপ্যাথী ও জবানবন্দী। এগুলিতে কৃষক-শ্রমিকের সঙ্গে অবহেলিত শেষিত সাধারণ মানুষ এবং নিম্নবিত্ত-মধ্যবিত্ত সমাজের শোষণ বঞ্চনা তুলে ধরে, তাদের মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ ও সংগঠনের মাধ্যমে বাঁচবার প্রেরণা সঞ্চার করা হয়েছে। এমনি পরিবেশ পরিস্থিতিতে 'নবান্নে'র জন্ম।

নবান্নের পটভূমিতে তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, জাপানী আক্রমণ, ভারত ছাড়ো আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিম্নবঙ্গে ফসল নষ্ট, সাধারণ মানুষের সীমাহীন দুর্দশা প্রতিকারহীন দুর্ভিক্ষ মন্বন্তর—সর্বস্ব হারিয়ে গ্রাম ছেড়ে মানুষ শহরে ক্ষুধা মেটাতে লঙ্গারখানায় লাইনে দাঁড়িয়ে। ওদিকে লোভী জোতদার মজুতদার ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ শাসক খাদ্য গুদামজাত করছে, এদিকে অস্থিচর্মসার ক্ষুধার্ত নারী-পুরুষের নগ্নমূর্তির ছবি ও সেবাশ্রমের আড়ালে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা চলছে রমরমা।

এই ক্রান্তিকালে 'নবান্ন' নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘ সমগ্র দেশে তো বটেই ইংল্যান্ডেও সাড়া ফেলেছিলো। দেশে বিদেশে সংবাদপত্রে এ নিয়ে আলোচনা সমালোচনা হ'তে থাকে। ইংল্যান্ডের

জনগণ বাংলার এই দুর্ভিক্ষের খবর জানতে পারে। তাঁদের কেউ কেউ গণনাট্য সংঘকে সক্রিয়ভাবে সাহায্যে উদ্যোগী হন।

People's Relief Committee (PRC)-র ব্যবস্থাপনায় গণনাট্য সংঘ মন্বন্তরে পীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সার্বিক সহায়তা দান শুধু করেনি, আর্ত জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে দেশেরসামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন সংঘটিত করে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেছে।

৮৬.৫ সারাংশ

বর্তমান এককের সূচনায় নাটকের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে এটি একটি অভিনব নাটক যার বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, চরিত্র পরিকল্পনা, দৃশ্যসমাবেশ আলো ও ধ্বনির সুষম বিন্যাসের সাহায্যে ব্যক্তিজীবন সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি বাস্তবসম্মত চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দোলন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ভিক্ষের, দুর্গতির ও প্রতিরোধের ছবি ফুটিয়ে তুলে গণনাট্য আন্দোলনের পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেছে।

প্রস্তাবনায় জানানো হয়েছে 'নীলদর্পণ' ও 'রথের রশি'-র অবদানের পরিচয়। ইতিহাসের ধারায় নাটক ক্রমশ পুরাণ, ইতিহাসের সীমা থেকে সাধারণ মানুষের জীবনাশ্রয়ী হয়ে উঠেছে। কালক্রমে এরই স্রোতোধারায় গণনাট্য আন্দোলনের পটভূমিকায় রচিত হয়েছে 'নবান্ন' নাটক।

বিজন ভট্টাচার্যের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা থেকে জানা যায়, তাঁর পরিবারে শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগ ছিল। গ্রামীণ যাত্রা, কথকতা, মেলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা গ্রাম্য কথ্যভাষার সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল। জাতীয় আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন তাঁকে নাড়া দিয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সাংবাদিকতায় হাতেখড়ি। এ সময়েই সাম্যবাদে আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করে সর্বক্ষণের কর্মী হন। নানা কাজের মধ্যে ভারত ছাড়ো আন্দোলন, জনযুদ্ধনীতি প্রচার, ফ্যাসিস্ট বিরোধী থেকে প্রগতি লেখক শিল্পী সংঘ ও গণনাট্য সংঘ স্থাপন। এই গণনাট্য সংঘের জন্য তাঁর 'আগুন', 'জবানবন্দী', 'নবান্ন' নাটক রচনা। শেযোক্ত নাটকটি তিনি শম্ভু মিত্রের সঙ্গে যৌথভাবে পরিচালনা এবং অভিনয় করেন। শেষ জীবনে, অভিনয়ই তাঁর জীবনধারণের একমাত্র পাথেয় ছিল। হতাশা তাঁকে ঘিরে থাকায়, শেষদিকে তিনি ভগ্ন, রিক্ত বিশৃঙ্খল জীবনযাপন করেছেন।

পরিশেষে মূলপাঠ ১-এ গণনাট্য আন্দোলন ও নবান্ন সম্পর্কে আপনারা জেনেছেন। রম্যাঁ রল্যাঁর 'পিপল্স্ থিয়েটার'-এর ধারণা থেকে এ দেশে গণনাট্যের ধারণার সূচনা চল্লিশের দশকে। এই নাটকের বিষয়বস্তু ও চরিত্র পরিকল্পনা জনজীবন থেকে আহৃত, উপস্থাপনা সহজ, সরল অনাড়ম্বর। তাই সাধারণ নাট্যতত্ত্ব দিয়ে একে বিচার করা ঠিক হবেনা। সমসাময়িক দেশকালের প্রেক্ষাপটে সচল জীবন্ত চরিত্রগুলিকে সমাজ বাস্তবতার দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে হবে।

১৯৪০-এর দশকে রচিত গণনাট্যের নাটকগুলি প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগঠন ও লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচবার প্রেরণা জুগিয়েছে। 'নবান্ন' এই ক্রান্তিকালের সৃষ্টি।

৮৬.৬ অনুশীলনী ১

১। (ক) আপনার মতে 'নবান্ন' পাঠের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য হল—
(খ) বিজন ভট্টাচার্যের প্রথম নাটক—
(গ) নবান্ন নাটকের রচনা কাল—

২। (ক) 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়—
(খ) 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপটে আছে—
(গ) বিজন ভট্টাচার্য কয়েকটি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন, যে কোন দুটি অভিনীত চিত্রের নাম করুন—

৩। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ——— তে' প্রকাশিত হয়। তাঁর অপর নাটক 'নবান্ন' —— ও ——— পরিপ্রেক্ষিতে রচিত, অভিনীত হয় ——— মঞ্চে।

৪। (ক) গণনাট্য নামকরণের উৎস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।
(খ) Y.C.I. এবং গণনাট্য সংঘ যে নাটকগুলি অভিনয় করেছিল তার যে কোন তিনটির নাম উল্লেখ করুন।

৫। প্রথম যুগের প্রগতি নাট্য আন্দোলনের বিষয়বস্তু ও মূল লক্ষ্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮৬.৭ মূলপাঠ ২ নবান্ন ঃ প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

দিবাবসানে চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্গত পল্লীর বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটি মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু-চারজন লোকের আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে, আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার এসে ঢুকল যেন আরও কারা। কী সব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামূর্তিগুলোর হাত-পা নাড়া ও কথা বলার বলিষ্ঠ ধরনে মনে হচ্ছে যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত চলছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল ; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি। আগুনের আভায় মালভূমির ওপরকার দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখের সামনে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে পৌঁছেছে ঃ আর একজনের বয়স কম—

গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠি—শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

প্রধান। (হাত তুলে রক্তিম পটভূমির দিকে ইঙ্গিত করে) তা এ সব কিছুর পর, সব কিছুর পর যে দিন আসবে, আমার শ্রীপতি-ভূপতি বলে গেছে রে কুঞ্জ, তার বরন হবে, ও কুঞ্জ তুই চেয়ে দ্যাখ, চেয়ে দ্যাখ, ওই ওই রকম। ওই রকম সোন্দর, ওই রকম নিদারুণ সোন্দর। (অনুকম্পা ও তাচ্ছিল্যভরে হেসে) তিন মরাই ধান। তিন মরাই ধান তুই আমারে কী বলিস্ কুঞ্জ! ...... জীবনটা না দিতে পারলে যে শান্তি নেই তা তো তুই দেখছিস নে। কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। আমি প্রাণ দেব। আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

[নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ]

কুঞ্জ। (ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে) চুপ। টুঁ শব্দ না। ঐ—

প্রধান। চল, চল্ কুঞ্জ আমরা এগিয়ে যাই।

কুঞ্জ। কী এগিয়ে যাই, পাগল না মাথাখারাপ!

প্রধান। মাথাখারাপ!

কুঞ্জ। মাথাখারাপ না তো কী বলব? (নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ) শুনছ ওদিকে, ঐ ঐ আবার—

প্রধান। আবার! আবার! ওরা ক'জনা?

কুঞ্জ। ক'জনা! কী করে বলব ক'জনা! চলো—

প্রধান। চল্ তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

[নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ]

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, তুমি—ঐ, ঐ আবার! চলো পালাই।

প্রধান। পালাব। পালাতে বলছিস তুই!

কুঞ্জ। আ—া—হা—া, তা খামখা জান্ দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো ঐ বনের ভেতরেই পালাই।

প্রধান। (বিলাপের সুরে) আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। (প্রধানকে হাতে ধরে টেনে) তোমারে নিয়ে হয়েছে আমার মহা জ্বালা, বুঝলে, মহা জ্বালা।

[উভয়ে দ্রুত প্রস্থান]

[ত্রস্ত পায়ে বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদিনী। (বিমূঢ়ভাবে) ওমা, এ কী বিপদ হলো, এখন যাই কোথায়।

[দ্রুত প্রস্থান]

[সন্ত্রস্তভাবে নিরঞ্জনের প্রবেশ]

নিরঞ্জন। (খালি গায়ে ছুটতে ছুটতে) তাই তো—সাংঘাতিক।

[দ্রুত প্রস্থান]

[পঞ্চাননীর প্রবেশ]

পঞ্চাননী। (লাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদে) না, শরম-ইজ্জৎ আর থাকল না মেয়েমানষির, শরম-ইজ্জৎ আর থাকল না—

[দ্রুত প্রস্থান]

এলো চুলে উন্মাদিনীর মতো ছুটতে ছুটতে সোজা মঞ্চের ওপর দিয়ে রাধিকার দ্রুত প্রস্থান। সন্ধ্যার গোধুলি আলোর মতোই পটভূমির রক্তিম আভা বিষণ্ণ হয়ে এসেছে ইতিমধ্যে। দূরে শঙ্খধ্বনি শোনা যাচ্ছে। প্রায়ান্ধকার মঞ্চের ওপর দিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্যে অনেকগুলো দ্রুত ধ্বনি দূরে মিলিয়ে গেল।

[কুঞ্জর প্রবেশ]

কুঞ্জ। (সন্তর্পণে গুঁড়ি মেরে ঢুকে) থাক্ চলে গেছে। এসো, এসো তোমরা সব।

[প্রধানের প্রবেশ]

প্রধান। (কব্জির ওপরে ক্ষতস্থানে হাত চেপে) চলে গেছে? চলে গেছে, আবার আসতে কতক্ষণ?

কুঞ্জ। ও কী, রক্ত? কাটল কিসে? দেখি!

প্রধান। (তাচ্ছিল্যভরে ক্ষোভের সুরে) হে, এ রক্তের আবার দাম? এ রক্তের জন্যে আবার মায়া। জন্তু জানোয়ারের মতো বনে জঙ্গলে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা—ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ তুই আমারে ছেড়ে দে।—আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। অন্তর কার জলেনি, আমার না?

প্রধান। (ক্ষুব্ধ স্বরে) জ্বলেছে তো এগুলি নি কেন যখন বল্লাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অন্তর যদি—আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ। শ্রীপতি-ভূপতির ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠা! তবে তুমি শুধু বারবার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শান্তি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্যে মরি, এই তফাৎ। তা মিথ্যে হা-হুতাশ আর—

[পঞ্চাননীর প্রবেশ]

পঞ্চাননী। (লাঠি ভর দিয়ে ত্বরিতপদে) না এর এট্টা বিহিত করতে হয় কুঞ্জ, বুঝলে, এর এট্টা বিহিত করতে হয়। এ কী রকম ধারা কথা? মেয়েমানুষ, লজ্জাশরম খুইয়ে বনে-জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকবে পহরের পর পহর! কেন, বিত্তান্তটা কী! দেশে পুরুষ মানুষ নেই, হ্যাঁরা কুঞ্জ?

কুঞ্জ। জেঠিমা তুমি!

পঞ্চাননী। হ্যাঁ আমি, তুই জবাব দে আগে আমার কথার।

কুঞ্জ। বলো।

পঞ্চাননী। আবার বলবে কী? দেখছিস নে, না খেয়ে বসে আছিস চোখের মাথা! বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? মেয়েমানুষ কী পাপ করেছে, য়্যাঁ।

কুঞ্জ। কী বলব।

পঞ্চাননী। কী বলবি!

প্রধান। সহ্য করতে এয়েছ সহ্য করে যাও। মুখ বুজে সহ্য করে যাও, কোনো কথা কয়ো না। কোনো কথা কয়ো না, অধর্ম হবে। মুখ বুজে.......

পঞ্চননী। তার আর বলবে কী। আজ তিন দিন দাঁতে এট্টা কুটো কাটি নি, বুঝলে! শরীরের কষ্ট আমরা সহ্য করতে পারি। সে কোনো কথা না। কিন্তু শরম!! লজ্জা!! তোমাদের দেশের মেয়েমানুষের অঙ্গের ভূষণ!! যা নিয়ে তোমরা গর্ব কর!! আর তারপর সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়েমানুষের ইজ্জৎ!! কী, কথা বলিস না যে! চুপ করে থাকিস কেন, হ্যাঁরা কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!! !! !!

কুঞ্জর দিকে স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চেয়ে থেকে পঞ্চাননীর দ্রুত প্রস্থান

কুঞ্জ। (ক্ষোভের সুরে) ইজ্জৎ!! ইজ্জৎ দেখছে! জীবনটাই যেখানে বেইজ্জতের সেখানে আবার মেয়েমানুষের ইজ্জৎ! কিন্তু কিন্তু

[নিদারুণ অস্বস্তিতে যেন হাঁপিয়ে ওঠে কুঞ্জ]

প্রধান। ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু ; (হঠাৎ উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জর) ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবার, (মরিয়াভাবে) কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে (ধস্তাধস্তি) —

কুঞ্জ। জেঠা, জেঠা, কী হচ্ছে, কী কর? জেঠা! জেঠা!!

[কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান]

প্রধান। (হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে) য়্যা)!

কুঞ্জ। জেঠা!

প্রধান। আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর জ্বলে গেছে।

কুঞ্জর দিকে তাকিয়ে হাঁপাতে থাকে প্রধান

[যুধিষ্ঠিরের প্রবেশ]

যুধিষ্ঠির। কুঞ্জ।

কুঞ্জ। (একটু লক্ষ্য করে) আপনি এলেন কবে!

যুধিষ্ঠির। এ অঞ্চলে দিনসাতেক হল এসেছি।

কুঞ্জ। জানতে পারিনি তো একেবারেই।

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, তোমরা জানতে পারোনি ঠিকই, তবে আমি এর মধ্যেই দু'বার ঘুরে গিয়েছি। দিন তিনেক আগে, এই তোমার গত বুধবার হতে, একজন কাবুলিওয়ালা ঘুরে য়ায়নি তোমাদের এখান দিয়ে।

কুঞ্জ। (মাথা চুলকে) কাবুলিওয়ালা। সকাল বেলার দিকে?

যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, এই বেলা আন্দাজ নটা নাগাদ? (একুট হেসে) আমিই সেই কাবুলিওয়ালা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) আপনি সেই কাবুলিওয়ালা?

প্রধান। আপনি!

যুধিষ্ঠির। কাঠের একটা গুঁড়ির ওপর বসে তুমি আমাকে খাচ্ছিলে না।

কুঞ্জ। ঠিক তো।

যুধিষ্ঠির। এই, আর একদিন রাত্তিরে। রতনগঞ্জ থেকে সেদিন আমি ঘোড়ায় ফিরছিলাম।

কুঞ্জ ও প্রধান বিস্মিতের ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে যুধিষ্ঠিরের দিকে

তা যাক-গে, সে সব কথা জানবার দরকার নেই তোমাদের। সময় খুব সংক্ষেপ, দূ'চারটে জরুরি কথা বলেই চলে যেতে হবে আমাকে এখান থেকে। কথাটা হচ্ছে যে, যারাই আমাদের কর্তব্যের পথে সামান্যতম অন্তরায়ের সৃষ্টি করতে চাইবে, তাদের বিরুদ্ধেও আমাদেরকে এখন থেকে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে। এ ছাড়া উপায় নেই। আমাদের আদর্শকে জয়যুক্ত করবার দিক থেকে যে-কোনো ব্যবস্থা, তা সে যতই নির্মম হোক না কেন, গ্রহণ করতে এতটুকু দ্বিধা করলে আমাদের চলবে না। আমি জানি, জয় পরিণামে হবে আমাদেরই, কিন্তু সেই বিজয় গৌরব অনায়াসলভ্য নয় কুঞ্জ, প্রতিটি পদক্ষেপ রক্তরেখায় রঞ্জিত করে জিতে নিয়ে আসতে হবে সেই বিজয়লক্ষ্মীকে।

প্রধান। (পৈশাচিক উল্লাসে) আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্, বেড়ি দিয়ে ফেলি গে ওদের ; তা কুঞ্জ শোনে না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—আজ যদি আমার শ্রীপতি-ভূপতি।

ক্ষোভে দুঃখে ভেঙে পড়ে প্রধান

কুঞ্জ। (যুধিষ্ঠিরকে একান্তে) শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটে ছেলের শোকে।

যুধিষ্ঠির। না না পাগল নয় কুঞ্জ. প্রধান পাগল নয়। এই ঠিক। প্রয়োজন আছে আজ এই উন্মত্ততার।

এ পাগলামি নয়।

প্রধান। না না।

যুধিষ্ঠির। (কুঞ্জর প্রতি) তুমি বলছ পাগল, কিন্তু বলতে পারো কুঞ্জ, কোথা থেকে আসে এই পাগলামি? কেন এই উন্মত্ততা? ভুল—

ভুল কুঞ্জ, মহা ভুল প্রধান পাগল নয়।

কুঞ্জ। পাগল নয়?

প্রধান। (অস্ফুটস্বরে) না, না, না, না।

যুধিষ্ঠির। আমাদের অন্তরের সমস্ত খর্বতাকে আজ প্রধানের অর্ন্তদাহই পরিশুদ্ধ করতে পারে।

অভিভূত হয়ে গেছে কুঞ্জ। ভাববিহ্বল চিত্তে কী যেন ব্যক্ত করতে চায়, কিন্তু পারে না।

যুধিষ্ঠির। (কুঞ্জর বুক চাপড়ে) আমার সময় হয়ে গেছে কুঞ্জ। আমি চলি এখন। (প্রধানের প্রতি) আবার আসব প্রধান।

[প্রথানুযায়ী যুধিষ্ঠির ডান হাতটা বুকে ঠেকিয়ে উর্ধ্ববাহু করে তুলে ধরে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। কুঞ্জ ও প্রধান যুধিষ্ঠিরের অনুকরণ করে .... যুধিষ্ঠিরের প্রস্থান।]

হঠাৎ নেপথ্যে একটা হট্টগোল শোনা যায় এবং ক্রমে সেই গণ্ডগোল বাড়তে থাকে। গভীর উত্তেজনায় কুঞ্জ চতুর্দিক লক্ষ্য করে। প্রধানও উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ।

কুঞ্জ। জেঠা! জেঠা! ঐ! (হাত দিয়ে অনুসরণের ইঙ্গিত করে)

[কুঞ্জর দ্রুত প্রস্থান]

প্রধান। (পৈশাচিক উল্লাসে) ঐ, ঐ আবার! ও কুঞ্জ, কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ! কুঞ্জ আমি প্রাণ দেব প্রাণ দেব প্রাণ দেব!

[দ্রুত প্রস্থান]

নেপথ্যে গণ্ডগোল ভয়াল হয়ে উঠেছে। একটু পরেই দেখা যায়, বৃদ্ধা পঞ্চাননী একটা জনতাকে পরিচালনা করে নিয়ে ঢুকছে।

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব! এগিয়ে যা।

জনতা সমবেত কণ্ঠে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি করে খানিকটা এগিয়ে আসে

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা!

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। জনতা একটু ইতস্তত করে

এগিয়ে যা, এগিয়ে চল তোরা সব! এগিয়ে যা।

নেপথ্যে বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ। জনতা থমকে দাঁড়ায়

জনৈক ব্যক্তি। (ঘা খেয়ে) আরে ব্বাস রে, বাপ রে বাপ।

সকলে সমবেত কণ্ঠে এই -ই-ই শব্দ করে পিছিয়ে যায়।

পঞ্চাননী। এগিয়ে যা, এগিয়ে যা সব।........

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কপালে হাত চেপে ধরে এগিয়ে যা, এগিয়ে যা ....

মূহ্যমান হয়ে পড়ে পঞ্চাননী। সকলে মালভূমির ওপর দিয়ে সামনের দিকে ছুটে যায়। দু একজন মাটিতে পড়ে হাত পা ছুঁড়তে থাকে

(ক্ষীণ কণ্ঠে) এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব ....

দুই একটা জ্বলন্ত মশাল মাটিতে পড়ে থাকে। হাতিয়ার সব ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গোলমাল ক্ষীণ হয়ে আসে। পঞ্চাননীর মুখে কথা সরে না, শুধু হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে—এগিয়ে যা, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা তোরা সব।

মঞ্চের উপর তিন-চারজন আহত লোক শুয়ে পড়ে ক্ষীণভাবে হাত-পা নাড়তে থাকে। পঞ্চাননীর কণ্ঠ নির্বাক হয়ে আসে। কিন্তু তখনও হাত দিয়ে ইঙ্গিতে বলতে থাকে, এগিয়ে যা, এগিয়ে যা। সুদূরের হট্টগোল ক্ষীণ হয়ে আসে। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দু-একটা মশাল তখনও জ্বলছে।

(পটক্ষেপ)

প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালি। একখানা দোচালা ঘরের দাওয়ার ওপর বসে আছে প্রধান, কুঞ্জ, কুঞ্জর ভাই নিরঞ্জন, আর কুঞ্জর ছেলে—নাম মাখন! জল ভরতি একটা মেটে কলসি কাঁখে নিয়ে কুঞ্জর স্ত্রী রাধিকা, ওরফে রাধি ঘরে গিয়ে উঠল। একটু পরেই ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়—রাধিকাকে—কাঁকালে পুরোনো একটা মেটে কলসি আর হাতে একখানা বস্তা। কলসিটা মাটিতে নামিয়ে রেখে রাধিকা প্রথমে বস্তাটা উঠোনে বিছিয়ে দেয়, তারপর কলসির ধানগুলো চটের ওপর ঢেলে ফেলে পা দিয়ে ঘুরে ঘুরে নেড়ে দেয়।

প্রধান। (পা দিয়ে ধান নাড়তে নাড়তে) নাও, এই কটাই সম্বল ছিল, কত করে রেখে দিছলাম, গেল।

কুঞ্জ। কেন, মাচাং-এর ওপরে সেই সে কালো জালার ভিতরি যে পুরোনো আউস কতকগুলো ছিল?

রাধি। (মুখ ঝামটা দিয়ে) হ্যাঁ, বসে রয়েছে এখনও তোমার জন্যে সেই ধান। রোজ ক'সের করে চাল লাগে হিসেব করে দেখেছ কোনো দিন?

কুঞ্জ। (রাগত ভাবে) না, হিসেব করে দেখিনি, এমনিই চলছে।

নিরঞ্জন। (বাধা দিয়ে) নাও, ও অভাব-অভিযোগ তো লেগেই আছে মাসের মধ্যে তিরিশ দিন সংসারে। তা বলে সকালবেলাই খামখা এট্রা অস্বরস কাণ্ড বাধিয়ে আর লাভ কী। চুপ করে যাও।

কুঞ্জ। না, তাই দ্যাখো একবার আচরণ। সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে। মোটে সহ্য করতে পারি নে। কাজে কুঁড়ে ভোজনে দেড়ে, তার আবার—

রাধি। (রাগত ভাবে) হ্যাঁ, খেয়ে খেয়ে দ্যাখো না কেমন সোন্দর হাল হয়েছে শরীরের! (মুখ ভেংচে) আর বলো না, বুঝলে? পুরুষ মানুষের কিতিত্বের কথা আর বলো না। আমরা যে মেয়েমানুষ, আমাদের পর্যন্ত লজ্জা করে।

কুঞ্জ। ও—ে া —ে াঃ, লজ্জাবতী লতা রে আমার!

[পিঁচ কাটে]

রাধি। (কটাক্ষ করে) দু'চক্ষে পেড়ে দেখতে পারি নে।

[রাধিকার প্রস্থান]

প্রধান। (আফশোসের সুরে) হায় রে ধান, হুঁঃ। এই দুটো ধানের জন্যে—

নিরঞ্জন। (বাধা দিয়ে) ন্যাও, থামো তুমি। তোমার আফশোস শুনতে আর ভালো লাগে না। পচে গেল কান।

কুঞ্জ। হ্যাঁ, সব খুইয়ে এখন ঐ আফশোসই সার হয়েছে। ভালো কাণ্ডকারখানা।

প্রধান। (আনমনে) সে কি দু'চারটে ধান! তিন তিন মরাই ধান।

কুঞ্জ। (নিরঞ্জনের প্রতি) ন্যাও সামলাও এখন ঠেলা।

[প্রধান ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে]

নিরঞ্জন। (প্রধানের প্রতি) তা সে যা করেছে তা বুঝে শুনেই করেছে।

কুঞ্জ। বুঝে শুনে মানে, নিজে তো করেইছে, আর পাঁচ জনারে পর্যন্ত বাধ্য করেছে ধান নষ্ট করে ফেলতে।

প্রধান। জোর করে প্রধান কাউকেই কিছু বলেনি।

কুঞ্জ। জোর করে মানে কি আর তুমি নিজে হাতে করে অপরের গোলার ধান নষ্ট করেছ আমি বলছি? অনুরোধ উপরোধ করে বাধ্য করেছ। উপরোধে মানুষ বলে ঢেঁকি পর্যন্ত গেলে, তার আবার—

প্রধান। উপরোধও করিনি।

নিরঞ্জন। বেশ তো তাই হল, উপরোধও করিনি। কিন্তু আচরণ করে শিক্ষে দিয়েছ।

প্রধান। হ্যাঁ তা দিইছি।

নিরঞ্জন। বিবেচনা করেই দিয়েছ?

প্রধান। (রাগতভাবে) হ্যাঁ দিইছি, বিবেচনা করেই দিইছি। যা করবার তোরা কর আমারে। য়্যাঁ, নৌকো ছিল আমি আটকে রেখেছি। চব্বিশ ঘণ্টার নোটিশ দিয়ে আমি মানষিরি সব দেশান্তরি করিছি। সব আমি করিছি। কর্ তোরা আমারে যা করবার কর।

[অস্থির হয়ে ওঠে প্রধান]

কুঞ্জ। (নিরঞ্জনকে চুপ করতে ইঙ্গিত করে) তোমাকে আবার কে কী করতে চাচ্ছে মাঝে মাঝে আপনা থেকে আফশোস কর বলেই তো এই সব কথা ওঠে। যা গিয়েছে—গিয়েছে, য়্যা। এই তো, ক'মাস পরেই আবার আমন ধান পাওয়া যাবে। তেমন একটা অঘটন যদি ঈশ্বরের ইচ্ছেয় না ঘটে তো ভাতের আবার ভাবনা! (স্ত্রী রাধিকার উদ্দেশ্যে) কই, গেলে কোথায়? (মাখনের প্রতি) ডাক দিকিন মাখ তোর মা-রে।

মাখন। মা এসে আবার কী করবে?

কুঞ্জ। (ধমকের সুরে) কী করবে তা বুঝবখন আমি। ব্যাদড়া ছেলে কাঁহাকা, ডাক শিগ্‌গির।

মাখন। যাচ্ছি।

[মাখনের প্রস্থান]

কুঞ্জ। মুখ থেকে দুধের গন্ধ গেল না, এর মধ্যেই তক্ক করতে শিখেছে মুখে মুখে। মা-টি আবার কেমন দেখতে হবে তো।

[রাধিকার প্রবেশ]

কী, খুব তো মেজাজ দেখিয়ে চলে গেলে তখন। বলি রাগ করে বসে থাকলে কি পেট ভরবেখন সকলের?

রাধি। ওমা, রাগ আবার করলাম কখন!

কুঞ্জ। না, পা থাবড়ে যে বড়ো ঘরে গিয়ে উঠলে, সেই কথা বলছি।

রাধি। তা উঠলামই বা। কারো তো কিছু এসে যাচ্ছে না তাতে!

কুঞ্জ। তা এসে যাচ্ছে বই-কি। শুধু শুধু আর কি হাত গুটিয়ে বসে আছি? নাও, দাও দিকিন এইবার তোমার সেই—

রাধি। (আঁচ করে একটু রেগে) কী দেবে?

কুঞ্জ। (চোখ বুঁজে) আরে কী যে বলে ওর নামটা—

রাধি। আ হা হা হা, মশকরা দেখলে গলায় দড়ি দিতে ইচ্ছে যায়।

কুঞ্জ। হ্যাঁ হ্যাঁ মনে পড়েছে, মনে পড়েছে, তোমার সেই—

রাধি। —মলজোড়া, এই তো?

কুঞ্জ। হ্যাঁ।

রাধি। তা সে কি আর আমি বুঝিনি! মনে তোমার অনেকক্ষণই পড়েছে শুধু আমার বাপের বাড়ির জিনিস বলে চক্ষুলজ্জার খাতিরে একটু ভনিতে করলে। কিন্তু সে মল আমার মায়ের দেওয়া। তার কথা মনে করে তুলে রেখেছি। সে আমি কিছুতেই দেব না। আর সবই তো খেয়েছ। এখন সে মলজোড়ার ওপর টনক নড়ছে। হায় অদেষ্ট!

কুঞ্জ। না দিবি না দিবি, তা বলে হা অদেষ্ট হা অদেষ্ট করিস্‌নি, হ্যাঁ। কুঞ্জ সমাদ্দার এখনও বেঁচে আছে, মরেনি।

রাধি। বেশ তো, তারই প্রমাণ দিক্ ; সে আমার সৌভাগ্যি।

কুঞ্জ। হ্যাঁ, তাই তাই। নয়তো তুই যে ভাবছিস আমি মরে গিয়ে তোর উদোমে খাবার ব্যবস্থা করে দেব, সে গুড়ে বালি, বুঝলি, সে গুড়ে বালি।

[হঠাৎ ঘরের ভেতর ছুটে গিয়ে বাসন পত্তর সব টেনে বের করে আনে]

বাপের বাড়িওয়ালারা যে মস্ত বড়লোক, ঠ্যারেঠোরে ও শুধু আমারে সেই কথাই শোনায়। তোর দেমাক আর ঠেকারের নিকুচি করেছে!

[ঝনাৎ কর বাসনের পাঁজা নামায়। ত্বরিতপদে রাধিকার প্রস্থান]

নিরঞ্জন। তা ওগুলো নিয়ে আবার কোথায় চললে?

কুঞ্জ। দোকানে, আবার কোথায়? পেট তো ভরাতে হবে গুষ্টির!

[কাশতে কাশতে আর বক্ বক্ করতে করতে ঘরে প্রস্থান]

প্রধান। ও মাখন, মাখন।

নিরঞ্জন। দুত্তুর কলা নিকুচি করেছে তোর সংসারের। শালা আজই আমি চলে যাব।

[কলসি কাঁখে বিনোদিনীর প্রবেশ]

বিনোদিনী। কোথায় যাবে?

নিরঞ্জন। এই এলেন আবার আর এক সঙ্। যত সব হয়েছে।

বিনোদিনী। ওমা, আমি আবার কী করলাম?

নিরঞ্জন। কিচ্ছু করনি বাপু, কিচ্ছু করনি। যাও, এখান থেকে যাও। আর ভালো লাগে না। আমি আজই শালা চলে যাব।

বিনোদিনী। কোথায়?

নিরঞ্জন। কোথায় কি আর আমি ঠিক করে রেখেছি? যাব এমনিই, যেদিকে দু চোখ যায়।

বিনোদিনী। ওমা, সে কী কথা?

নিরঞ্জন। না দিনরাত তোমাদের এই সংসারের ভেতরে পড়ে ঝালা-পালা হই আর কী। আমি আজই চলে যাব।

বিনোদিনী। তাহলে আমাকেও সঙ্গে নিয়ে চলো।

নিরঞ্জন। (ভেংচি কেটে) সঙ্গে নিয়ে চলো! তুমি যাবে কোথায়?—তুমি যাবে কোথায়? নিজেরই বলে দাঁড়াবার জায়গা নেই, তার আবার,—আগে রও, আমি তো যাই!—তারপর দেখি যদি একটা কাজটাজ জোটাতে পারি তো সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে। এখন তার কী?

বিনোদিনী। একা যাবে তুমি?

নিরঞ্জন। (ভেংচি কেটে) তো দোকা পাব কোথায়?

বিনোদিনী। কেন, নাও না আমায় তোমার সঙ্গে।

নিরঞ্জন। পাগল্ না মাথা খারাপ! আমিই বলে তাই এখন কোথায় যাই কী করি তার ঠিক নেই, ঘাঁটিয়ো না মিছে হ্যাঁ, ভালো লাগে না।

বিনোদিনী। আজই তো তাই বলে চলে যাচ্ছ না?

নিরঞ্জন। কেন, যদি বলি আজই, তো বাধা কিসের?—বাধাটা কিসের?

বিনোদিনী। বাধা মনে করলেই আছে, না করলেই নেই। আমি থাকব এখানে একলা পড়ে—

নিরঞ্জন। আহা বলি একলাটা কিসের হল? যত সব প্যান্-প্যানানি এই মেয়েমানুষের।

বিনোদিনী। তা মেয়েমানুষ হয়ে জন্মেছি—

নিরঞ্জন। জন্মেছ তো বেশ করেছ। ও কোনো কথা আমি তোমার শুনতে চাইনে। আর পাঁচজনও থাকবে, তোমাকেও থাকতে হবে তাদের সঙ্গে। গোঁয়াতে পার ভালো, না পার—আমি তার কী করব? আমারে চলে যেতেই হবে,—আজ না হয় কাল।

[বিনোদিনী চোখ মোছে]

একেবারে তো অজলে অস্থলে ফেলে যাচ্ছি নে। দাদা থাকল, বৌদি থাকল, জেঠা থাকল, মাখন থাকল, আবার ভয়টা কিসের? পরলোক তো এরা কেউই নয়! দেখছ এই অবস্থা, নুন আনতে পান্তা ফুরাচ্ছে, এখন বুঝে শুনেও যদি তোমাদের আগলে বসে থাকি তো শেষকালে?—ভেবে দেখেছ কখনও পরিণামটা ? হুঁঃ, শুধু কাঁদলে হয় না। অবস্থা বিবেচনা করে দেখতে হয়। (ধরা গলায়) কাঁদছে, কাঁদতে অমন আমিও পারি। কিন্তু কী দাম আছে সেই চোখের জলের? কিছু না।

[পরিশ্রান্ত কুঞ্জর প্রবেশ]

কুঞ্জ। (উভয়ের দিকে লক্ষ্য করে নিরঞ্জনের প্রতি) ফের মেরেছিস বুঝি? (নিরঞ্জন নিরুত্তর) বলি ফের্‌ আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের?

[সাশ্রুনয়নে বিনোদিনীর প্রস্থান]

(চেঁচিয়ে) বেরো, বেরো তুই এখনই আমার বাড়ি থেকে, বেরো। ছোটলোক, চামার! অভাবে পড়ে এর মধ্যেই স্বভাব নষ্ট করে বসেছিস—বেরো, বেরো তুই এখুনি। পশু কোথাকার!!

উন্মত্ত অবস্থায় সামনের একখানা কাঠ দিয়ে নিরঞ্জনের মাথায় আঘাত করে বসে।

মেয়েমানুষের গায়ে হাত ...... বেরো, বেরো তুই, বেরো !!

[আঘাতে নিরঞ্জনের মাথাটা ফেটে যায়, সঙ্গে সঙ্গে ফিনকি দিয়ে বেরোয় রক্ত। নিরঞ্জনের প্রস্থান।]

কুঞ্জ। (বিমূঢ়ভাবে) য়্যাঁ, রক্ত! রক্ত! খুন করে ফেললাম! খুন করে ফেললাম আমি নিরঞ্জনকে! নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!!

(পটক্ষেপ)

দাওয়ার ওপর বসে প্রধান আনমনে তামাক টেনে চলেছে, আর কুঞ্জ উঠোনে দাঁড়িয়ে পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে মাটি খুঁড়ছে। দেখলেই মনে হয় আগে থেকেই যেন কী একটা আলোচনা চলছিল ওদের মধ্যে।

প্রধান। (হুঁকোয় বিলম্বিত একটা টান মেরে ধোঁয়া ছেড়ে) তা হল থাকবে? কী, কথা বলিস না যে?

কুঞ্জ। কী বলব? জমি তোমার, দ্যাখো তুমি বিবেচনা করে।

প্রধান। হ্যাঁ তা সে তুই কী বলিস?

কুঞ্জ। আমি তো বলেছি আমার কথা।

প্রধান। কী?

কুঞ্জ। কাজ নেই কবালা করে।— মগরার বিলের জমি বেচে তো খেলে? ক'দিন গেল?—তো কী হবে খামখা জলের দামে জমি বিক্রি করে? ও সে যা করেছ তা করেছ। আর বেচে কাজ নেই। য়্যাঁ-া-ঃ, আছেই আর ভারি বিঘে তিনেক!

প্রধান। তা হলে যা হয় এট্টা ঠিক করে বল খামখা—

কুঞ্জ। আবার ঠিক করে কী! বলছি তো থাক। বিশেষ ফসল যখন একবার হয়ে গেছে। রোওয়া। আর অভাব? সে তো আছেই । ও জমি বেচলেও থাকবে, না বেচলেও থাকবে। দ্যাখা যাক। দিন কি আর এমনিই যাবে!

[প্রতিবেশী দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। (গলা খাঁকারি দিয়ে প্রধানকে লক্ষ্য করে)। এই যে প্রধান।—বাড়িতেই আছো তা হলে দেখছি!

প্রধান। (চারিদিকে চেয়ে) হ্যাঁ, সকালবেলার থেকেই কেমন কেমন যেন একটু ঘোর ঘোর ভাব—

দয়াল। বিষ্টিই বোধ করি আসে।

প্রধান। তা বস। উঠে বস। তামাক খাও।

দয়াল। (বসতে বসতে) তামাক বা খাব কী?

প্রধান। কেন, যাচ্ছিলে নাকি কোথাও?

দয়াল। না এই।

প্রধান। (দয়ালকে হুঁকো এগিয়ে দিয়ে) ধরো।

কুঞ্জ। (উঠোনের এক কোণে বসে) দয়ালদা কী বল এ কথার?

দয়াল। কী বিষয়!

প্রধান। আর কি বিষয়!

দয়াল। তবু শুনি।

কুঞ্জ। বিষয়টা হচ্ছে যে জমি জায়গা বিক্রি করা নিয়ে।

দয়াল। বেশ।

কুঞ্জ। বিলের ধারে ঐ যে বিঘে তিনেক খামার জমি আছে না জেঠার? তাই বলছিল বিক্রি করে ফেলি।

দয়াল। তারপর?

কুঞ্জ। তা আমি বলি কী যে ও দুঃখ-কষ্ট যা কপালে আছে সে তো আছেই, মাঝখানে থেকে জমিটুকু খুইয়ে আর কী এমন সৌভাগ্য বাড়বে!

দয়াল। সে তো ঠিক কথাই। রুজি রোজগার না থাকলে জমি বেচে আর ক'দিন চলে।—আমি নাকি যে ভুল করেছি!

কুঞ্জ। বেচে ফেলেছ নাকি জমি তুমিও?

দয়াল। হ্যাঁ তা সে কিছু তো বেচে ফেলেইছি। কিন্তু সেই বেচেই বা হল কী? বীজ ধানগুলো পর্যন্ত রাখতে পারলাম না উঃ।

কুঞ্জ। তোমার তা হলে তো দেখি আরও সরেস অবস্থা! সব খুইয়ে বসে আছ?

দয়াল। সব, সব। কুঞ্জ, সব। একমুঠো চালের জন্যে তোর দয়ালদা তা না হলে কি আর আজ দোরে দোরে ঘুড়ে বেড়ায়! উঃ!

প্রধান। ছোট ভুলের ক্ষমা আছে, বুঝলে দয়াল। কিন্তু বড়ো ভুলের আর চারা নেই। করতেই হবে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত। এইটাই বুঝলাম।

কুঞ্জ। (দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে) হ্যাঁ বুঝলে বটে, (দয়ালের প্রতি) তবে কি না বড্ড দেরি করে বুঝলে।

দয়াল। (করুণ হেসে সঙ্গো সঙ্গো) এমন সময় বুঝলে যে শুধরে যে নেবে তার পর্যন্ত সময় থাকল না।

প্রধান। (দয়ালের হাত থেকে হুঁকো নিয়ে) তা হলে থাক জমিটুকু।

দয়াল। থাক্ থাক্, সম্বল থাক্, জমিজায়গা এমনিই বিক্রি করতে নেই, তার ওপর—

প্রধান। থাকতে তো বলছ, কিন্তু এদিকে দিনপাত চলে কী করে বলো তো? বাঁচতে তো হবে?

দয়াল। তা তোমাদেরও কি এইরকম অবস্থা নাকি?

প্রধান। তো তুমি কী ভাবছ?

দয়াল। কেন ধান তো তোমার ছিল প্রধান।

প্রধান। হ্যাঁ সে যখন ছিল তখন ছিল। এখন কী আছে তাই বলো।

দয়াল। এই রকম অবস্থা নাকি! আমি ভাবলাম যাই, প্রধানের ওখানে একবার যাই। যদি কিছু—

প্রধান। হুঁ, সে কথার আর কী বলব বলো। এই তো দ্যাখো না, সকাল বেলার থেকে এই এতক্ষণ পর্যন্ত চেঁচামেচি খুনোখুনি করে, শেষ সম্বল দু'খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের-দুয়েক চাল নিয়ে এয়েছে কুঞ্জ ; পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক'টা?

দয়াল। তা তো ঠিকই! কিন্তু আমার যে এদিকে সমস্যাই হল। ঘরে একদানা চাল নেই, প্রধান, আজ দু'দিন। রাঙার মা বলতে গেলে সে একরকম ধুঁকছে কাল বিকেল বেলা থেকে। কী করি বলো তো?

কুঞ্জ। আর কী হয়েছেই এই!

দয়াল। কুঞ্জ!

কুঞ্জ! কী বলব বল এ কথার! রাঙার মা ধুঁকছে কাল বিকালবেলা থেকে, অমুকের মা ধুঁকছে কাল দুপুরবেলা থেকে, তমুকের মা ধুঁকছে আজ সকালবেলা থেকে, এই তো এখন শুনতে হবে। (ঘর থেকে চাল নিয়ে আসে কোঁচড়ে) ন্যাও ধরো, মুঠোখানেকের বেশি কিন্তু দিতে পারব না দয়ালদা। এই আমাদের শেষ সম্বল।

দয়াল। (কোঁচড় পেতে) ঐ মুঠোখানেক হলেই চলবে বাপ আমার। জানটা তো আগে রক্ষে পাক।

কুঞ্জ। কিন্তু এই রকম করে আর কদ্দিন?

দয়াল। যদ্দিন যায়। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, এ তো থাকবেই।

প্রধান। তা শুধু আশ দিয়ে তো আর পেট ভরবে না দয়াল, ব্যবস্থা এর এট্টা করতে হয়।

দয়াল। বলো কী ব্যবস্থা করবে। আমি তাতেই আছি।

প্রধান। চলো চলে যাই।

দয়াল। কোথায়?

প্রধান। কেন শহরে? অন্নকূট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা।

কুঞ্জ। থাক তোমার বাবুদের কথা আর শুনতে চাই নে।

দয়াল। হ্যাঁঃ, ও বাবুদের কথা আর বলো না।

কুঞ্জ। যার জন্যে করি চুরি শেষকালে সে-ই বলে কি না চোর!

প্রধান। ভদ্দরনোকের নামে মুখ করছ, কিন্তু এই ভদ্দরনোক ছাড়া আবার গতিও নেই আমাদের এখন। শত হোক, সেই ঘুরে ফিরে যেতেই হবে তোমার ভদ্দরনোকের দোরে। উপায় নেই।

কুঞ্জ। তা সে ভদ্দরনোকও আছে, ভদ্দরনোকও নেই। তা বলে ফর্সা জামা-কাপড় পরে ভালো বাংলায় হ্যানা করো ত্যানা করো বললেই ভদ্দরনোক বলে তার কথা মেনে নিতে হবে? থে-ে-ে-ঃ!

প্রধান। না, তা কেন হবে?

কুঞ্জ। তো তবে?

দয়াল। যাকগে, সে যা হবার তা তো হয়েইছে, এখন বর্তমানের কর্তব্য কী তাই—

প্রধান। তা সেই কথাই তো বলছি। বলি—

কুঞ্জ। বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের মতো আমাদেরও ঐ রাস্তার নেমে দাঁড়াতে হবে।

প্রধান। তা হলে যে আশংকা করেছিলাম শেষ পর্যন্ত তাই হল।

দয়াল। আর হওয়া-হউইর তো কিছুই নেই। ঐ এক রাস্তাই খোলা আছে, ঐ এক পথেই যেতে হবে সকলকে।

প্রধান। তাই তো বলছি। বলি শহরে—

কুঞ্জ। তা সে তুমি শহরেই বলো আর নরকেই বলো, পথ ঐ এক। সরা হাতে করে গুষ্টিশুদ্ধু, পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়াতে হবে।

প্রধান। পথে নেমে দাঁড়াতে হবে? প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে দয়াল!

দয়াল। তাই তো বলছি—বলি শেষ পর্যন্ত এ-ও চোখ চেয়ে দেখতে হবে। অদেষ্ট, সব অদেষ্ট।

প্রধান। এই, তা যদি না হবে তো দ্যাখো জমিজমাই বা খোয়াতে যাব কেন আমি, আর আজ পথে নেমেই বা দাঁড়াতে হবে কেন আমায়? অদেষ্ট ছাড়া আর কী?

কুঞ্জ। নাও মিথ্যেমিথ্যি আর অদেষ্টর দোহাই পেড়ো না, হ্যাঁঃ। নিজে ইচ্ছে করে আগুনে হাত

দেবে, আর পুড়ে গেলে বলবে যে অদেষ্টর জন্যে এই দুর্ভোগ হল। .... তোমাদের এই ধরনের কথাবার্তার, সত্যি বলছি দয়ালদা, আমি কোনো মানে বুঝতে পারিনে, কোনো মানে বুঝতে পারিনে। তোমরা সব—

[ঝড়ের বেগে মাখনের প্রবেশ]

মাখন। তোমরা সব চালার ওপর ওঠো, চালার ওপর ওঠো! সাত-আট হাত উঁচু হয়ে বান আসছে, ভীষণ বান, হুই—ই—ই—ঃ।

নেপথ্যে বানের ডাক—সোঁ সোঁ

কুঞ্জ। তাই তো! [মাখনের ঘরে প্রস্থান]

দয়াল। আমি চলি প্রধান তা হলে। সকালবেলার থেকেই আজ কেমন যেন ঘোর ঘোর ভাব, গরম গরম হাওয়া দিচ্ছিল কাল রাত থেকে। কী ব্যাপার!

বাতাসের দমকা ঝাপটা

আরে ব্বাসরে! [দয়ালের প্রস্থান]

কুঞ্জ। আরে বসে যাও দয়ালদা, এর ভেতর বেরিয়ো না।

[বাতাসের ঝাপটা]

এ যেন একেবারে ফেলে দিতে চায়!

নেপথ্যে একটা বড়ো গাছ ভেঙে পড়ার শব্দ, মড় মড় মড়াৎ। প্রধান দাওয়ার ওপর থেকে উঠোনে এসে দাঁড়ায়। চোখের ওপরে হাত দিয়ে দুরে বান লক্ষ্য করতে থাকে । চুলগুলো তার সব যেন নাচতে শুরু করে দিয়েছে মাথায়। কাঁচা পাতা, পল্লব, ডাল, সব ছিঁড়ে এসে পড়ে উঠোনে। দোচালাখানা নড়তে থাকে ঘন ঘন—যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে আর কী। বান আর ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে অব্যাহত—সাই-শোঁ-সন্। আলোটা অস্পষ্ট। একটু পরেই ওঠে হাহাকার আর আর্তকণ্ঠের উপায়বিহীন আক্ষেপ। কেউ হয় তো চাপা পড়েছে, কেউ হয়তো চাপা পড়ে বেরোতে পারছে না। সুদূর পল্লী অঞ্চল থেকেও যেন সেই আক্ষেপ ঝড়ের গলা ধরে এসে প্রধানের দোচালার ওপর আছড়ে পড়েছে। দেখতে দেখতে দোচালাখানা ভেঙে পড়ে প্রধানের।

প্রধান। (ব্যাপক বিশৃঙ্খলার মাঝখানে উন্মত্ততায়) কুঞ্জ, মাখন, (চোখ-মুখের ওপর থেকে বৃষ্টির ছাঁট মুছে) এই যে এদিকে, মাখন! কুঞ্জ! মাখন!

[হন্তদন্ত হয়ে মাখনের প্রবেশ]

মাখন। এই যে দাদু। আমি, আমি এখানে।—বাবা কোথায়, বাবা? বাবা!

[রাধিকার প্রবেশ]

রাধিকা। (ছুটে এসে) মাখন! মাখন! মাখন কই! মাখন!

মাখন। এই যে আমি এই যে এখানে।

রাধিকা। কই, কোথায়! (মাখনকে জড়িয়ে ধরে) বাপ আমার!

প্রধান। কুঞ্জ কোথায়! কুঞ্জ!

কুঞ্জ। (চাপা গলায়) এই যে! এখানে। মাখন!

প্রধান। কোথায়! কুঞ্জ! মাখন! কোথায় তোর বাপ!

মাখন। এই যে দাদু! দাদু! উঁচু করে ধরো চালাটা, দাদু বেরোতে পাচ্ছে না ; ধরো তুলে ধরো! (প্রধান ছুটে গিয়ে চালাটা উঁচু করে ধরে। রাধিকা কুঞ্জকে বেরিয়ে আসতে সাহায্যে করে।)

রাধিকা। লাগেনি তো কোথাও?

কুঞ্জ। না। মাখন কই! এই যে!

প্রধান। ঠিক আছে তো আর সবাই।

রাধিকা। (উদ্বিগ্ন কণ্ঠে) বিনো কোথায়?

কুঞ্জ। সে কী, দ্যাখো, দ্যাখো শীগ্‌গির। ওর নিচে চাপা পড়েনি তো? কী—ি—ি—ি।

মাখন। এই যে এখানে। বাবা।

(সকলে বিনোদিনীর দিকে এগিয়ে যায়। বিনোদিনী অচৈতন্য। রাধিকা বিনোদিনীর মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে।)

রাধিকা। ও মা, তোমার সব দ্যাখো গো ও বিনো, বিনো—

(কুঞ্জ, রাধিকা ও মাখন বিনোদিনীকে ধরাধরি করে সামনের ফাঁকা জায়গায় এনে শুইয়ে দেয়।)

কুঞ্জ। (বিনোদিনীর চোখ টেনে) চোখে লেগেছে বোধ হয় খুব জোর।

রাধিকা। বি নো। অ বি নো—

[বিনোদিনী ক্ষীণ আর্তনাদ করে ওঠে।]

প্রধান। বেঁচে আছে তো রে কুঞ্জ।

কুঞ্জ। আ—া হা—াঃ, থামো তো তুমি।

রাধিকা। (বিনোদিনীর মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে) যত সব অলক্ষুণে কথাবার্তা। ও বিনো, বিনো। এখন এট্টু! — কী! — কোথায় লেগেছে?

কুঞ্জ। থাক্, উদ্ব্যস্ত করো না। থাক ঐ রকম।

[নেপথ্যে আর্তের হাহাকার।]

প্রধান। থাকবার মধ্যে ঘরখানাই ছিল, গেল। গেল! পথে নেমে দাঁড়াবারও তর সইল না রে কুঞ্জ, পথই ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল। ও কুঞ্জ তোর কথাই সত্যি, তোর কথাই সত্যি হল। প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে,—প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে। কুঞ্জ—তুই যে বলেছিলি—

নেপথ্যে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ ...... কুঞ্জ! .... কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ!

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (কোঁচড়ের চাল হাতে নিয়ে) এই যে কুঞ্জ, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) দয়ালদা! দয়ালদা!!

দয়াল! (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.... সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

(ঝড়ের শব্দ—সাঁই-সং)

(পটক্ষেপ)

জীর্ণ-গৃহ পরিবেশ। খসে খসে পড়েছে চালা। কোনো কোনো জায়গায় খড়টুকুও নেই, শুধু বাখারির কংকাল দেখা যাচ্ছে। পরিবারের প্রত্যেকটা লোকের চোখে মুখে দারিদ্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। উঠোনে বিনোদিনী উনুনের ধারে বসে কী যেন একটা সেদ্ধ করছে হাঁড়িতে আর জ্বাল ঠেলছে। দাওয়ার ওপর বসে আছে রুগ্‌ণ মাখন।

বিনোদিনী। (উনুনের মুখে মুখ লাগিয়ে ফুঁ দিতে গিয়ে চোখে মুখে ধোঁয়া খেয়ে চোখ রগড়াতে রগড়াতে ঘুরে বসে) বাব্বা, এ কাঁচা পাতা কি ছাই জ্বলে? ধোঁয়া খেতে খেতে প্রাণ গেল। নাঃ, বসা যায় না!

মাখন। তা সে ওখানে বসে ধোঁয়া খেয়ে মরছ ক্যানো? মোটা একটা ডাল লাগিয়ে দিয়ে দাওয়ার ওপরে এসে বসো দিকিন্! সেদ্ধ হচ্ছে তো ভারি জগড়ুমুর—গরুতেও খায় না! সরে এসো একখানা ডাল লাগিয়ে দিয়ে! যে না আমার রান্না!

বিনো। নে, বসে বসে তুই আর সব সময় ফোঁপরদালালি করিস নে তো মাখন। চুপ করে থাক। এই রান্নারই বলে দাম দেয় কে, তার আবার—

মাখন। নিত্যি, ঐ এক ডুমুরের কলা সেদ্ধ, আর কচুর নতির ঝোল ও আজ আমি কিছুতেই খাব না।—

বিনো। ওঃ, না খাস তো আমার ভারি বয়েই গেল। আনলেই পারিস ভালোমন্দ দেব্য খুঁজে পেতে।

(জীর্ণ বসনে এক-পা কাদা নিয়ে প্রধানের প্রবেশ কোঁচড়ে একগাদা খুদে কাঁকড়া)

প্রধান। (হেসে) ভালোমন্দ দেব্য খুঁজে পেতে আনা কি সহজ কথা? (কোঁচড়ের কাঁকড়া নেড়ে) এই কটা তাই কত করে, —দেখি এট্টা পাত্তর টাওর—না, তাই বা আবার পাবো কোথায়।—এই কোনো এট্টা কিছু, ঢেলে দেব।

[বিনোদিনী প্রস্থানোদ্যত]

—যা হয় এট্টা নিয়ে এসো খপ্ করে।—ওঃ, গা-হাত-পা একেবারে চুলকে মলাম। পচা কাদা!

[বিনোদিনীর প্রস্থান]

মাখন। ধরলে কোত্থেকে, অনেকগুলো তো! সে দিনকারগুলো ছিল ছোট্ট ছোট্ট। আজকেরগুলো বেশ ডাগর ডাগর।

প্রধান। (হেসে) বড় হয়ে উঠেছে সব। জলেও টান ধরেছে, আর সব এখন খাল খন্দর ভেতরে গিয়ে সিঁদুচ্ছে। ধরা কি সহজ কথা?.....

[ভাঙা একটা চুবড়ি নিয়ে বিনোদিনীর প্রবেশ]

এনেছ, রাখো। (হাসতে হাসতে) নুন লঙ্কা দিয়ে খুব খটমটে করে ভেজে নিয়ে....মাখনরে দিয়ো যেন বৌমা দুটো খানি।

[কুঞ্জর প্রবেশ]

কুঞ্জ। মাখনরে আবার কী দেবে?..... কিচ্ছু দিয়ো না ওরে খেতে টেতে। জিতেনবাবু বারণ করে গেছেন পই পই করে।

মাখন। খাব তো না, এমনি এট্টুখানি চেখে দেখব।

কুঞ্জ। ওঃ, সুখ খায় গুড় দিয়ে মুড়ি। আর চোখে দ্যাখে না। চোখে দেখব! জিনিসটা কী শুনি?

মাখন। ক্যাঁকড়া।

কুঞ্জ। য়্যাঁ, ক্যাঁকড়া! ক্যাঁকড়া খাবি তুই?..... খবরদার ও যেন ক্যাঁকড়া ফ্যাঁকড়া না খায়। হ্যাঁ, এই বলে দিলাম সবাইকে।

প্রধান। তো শাসাচ্ছিস কারে তুই তাই বলে, য়্যাঁ! আ গেল যা। তিরিক্ষে হয়েই আছে মেজাজ দেখি সব সময়।

[এক বোঝা শাক পাতা নিয়ে রাধিকার প্রবেশ]

কুঞ্জ। (ক্ষোভে ও দুঃখে) ও, মেজাজ দেখলে! এর ভেতরও মেজাজ দেখলে? আমি বলে সারাটা দুপুর এই রোদ্দুরের ভেতরে পাতি পাতি করে সন্ধান করে জোগাড় করে নিয়ে এলাম

কাওনের চাল কটা, ডাক্তার বলে গেছে, আর এসে শুনি যে ছেলে আমার ক্যাঁকড়া খাবার জন্যে ব্যাগ ধরেছেন। তোর অপত্য স্নেহের নিকুচি করেছে......(গামছা থেকে কাওনের চালগুলো ছড়িয়ে দেয়) যাগ্‌গে, দরকার নেই কাওনের চালের, যাগ্‌গে।

রাধি। তা এত কষ্ট করে না আনলেই পারতে। এনে আবার ছড়িয়ে নষ্ট করার দরকার ছিল কী?

কুঞ্জ। (দুঃখে) আমার সব কষ্টের মূল্য তো চিরকালই এই রকম। এর বেশি আর কবে কোন দিন পেয়েছি?

[রাধি করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে]

প্রধান। (উঠে গিয়ে) দে, দেখেছ কাণ্ডবাণ্ড, দেখেছ? (হাত দিয়ে চালগুলো সাপটে) সারাটি দিন এই কষ্টের কষ্ট করে কাওনের চাল কটা কুড়িয়ে বাড়িয়ে নিয়ে এল, কী না কী বলেছি—অমনি দিলে তারে ছড়িয়ে মাড়িয়ে—

কুঞ্জ। কষ্ট যা তা তো হয়েছে আমার। তার জন্যে তো আর কাউকে আফ্‌শোস করতে হবে না।

প্রধান। (চাল সাপটাতে সাপটাতে) তাই যদি বুঝবি তুই তবে আর আমার দুঃখুটা কিসের?

কুঞ্জ। থাক, আর নাকি-কান্না কাঁদতে হবে না তোমার। .... যথেষ্ট হয়েছে। কত ছলনাই জানো?

প্রধান। (স্থির দৃষ্টিতে মুহূর্তকাল চেয়ে থাকে) কী, কী বললি তুই কুঞ্জ! ছলনা! নাকি-কান্না! আমার সহানুভূতি মিথ্যে তোর কাছে? অপমান করলি তুই আমারে! আমারে অপমান করলি তুই!! তুই আমারে অপমান করলি—

[কেঁদে ফেলে]

কুঞ্জ। আমার হয়েছে মহা জ্বালা। বুঝলে, মহা জ্বালা। অপমান আবার তোমারে করলাম কখন?

প্রধান। অপমান নয়? এর চাইতে আর কী-ভাবে তুই আমারে অপমান করতে চাস? কী-ভাবে আর অপমান করতে চাস্? তোর কাছে আমার দুঃখ, সহানুভূতি সব মিথ্যে, ছলনা! তার চাইতে তুই আমার মাথায় তুলে—

(সামনের একখানা কাঠ দিয়ে নিজের মাথায় আঘাত করে বসে।
রাধিকা, মাখন চেঁচিয়ে ওঠে!)

কুঞ্জ। (ছুটে গিয়ে হাতখানা চেপে ধরে) কী হচ্ছে কী এ সব? জেঠা কী কর?

প্রধান। (ক্ষোভের সুরে) তুই আমারে খুন করে ফেল কুঞ্জ। আমার সব জ্বালা যন্ত্রণার অবসান হয়ে যাক। আমার সব জ্বালা যন্ত্রণার—

[চাপা আর্তনাদ করতে থাকে]

কুঞ্জ। (কাঠ ফেলে দিয়ে) ছি ছি ছি ছি ছি ছি। রাগের মাথায় কী না কী বলেছি, অমনি—

নাঃ একেবারে ছেলেমানুষ, হচ্ছ তুমি দিন-কে-দিন।—কথার ভেতরে তো বলেছি যে অসুখে ভুগছে, আর তারপর ডাক্তারও বারণ করে গেছে, ক্যাঁকড়া ফ্যাঁকড়া যেন না দেওয়া হয় ওরে, তাতে করে এই অনাসৃষ্টি কাণ্ড বাধিয়ে বসবার কী দরকার ছিল? ছি ছি ছি ছি।

প্রধান। অসুখ! বলি অসুখটা কী রে ওর, য়্যাঁ—

কুঞ্জ। হাত-পা ফুলে গেছে, চোখ হলদে পানা, অসুখ না?

প্রধান। বুঝলাম, সব বুঝলাম। কিন্তু অসুখটা কি খাওয়ার জন্যে, না না-খাওয়ার জন্যে, সেই কথাটা জিজ্ঞেস করি।

[কুঞ্জ নিরুত্তর]

রাধি। আজ মাসখানেক হল ও তো একরকম না-খাওয়ার ওপরেই আছে। কী খায় ও?

কুঞ্জ। তা অসুখ হলে মানুষ আবার খায় কী?

প্রধান। অসুখ! অসুখ! হেঃ, অসুখ! কুঞ্জ, আমি কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও ভুলতে পারব না, যে শুধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা শেষ হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। শুদ্ধু না খেতে পেয়ে ...

কুঞ্জ। না না, ওর ভীষণ অসুখ! ডাক্তার বলে গেছে জেঠা ওর ভয়ানক অসুখ। জেঠা তুমি জানো না ওর ....

মাখন। আমার খিদে। আমি খাব। আমায় খেতে দে। আমি খাব।

প্রধান। আমি ভুলতে পারবো, আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না যে শুদ্ধু না খেতে পেয়ে ।

কুঞ্জ। জেঠা, ওর অসুখ। তুমি ভুল করছ ভেঠো, ওর ভয়ানক অসুখ। ডাক্তার বলছে ওর ভয়ানক অসুখ।

প্রধান। আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না। ডাক্তার যাই বলুক আমি ভুলব না, আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না—

কুঞ্জ। তুমি বুঝতে পারছ না জেঠা ওর ভয়ানক অসুখ—

প্রধান। আমি ভুলব না যে শুদ্ধু না খেতে পেয়ে ছেলেটা মরে গেল।—আমারে কেউ ভুলোতে পারবে না—

(পটক্ষেপ)

(ঐ একই পরিবেশ। মহামড়কে উজাড় হয়ে যাচ্ছে সৃষ্টি। নেপথ্যে চলেছে 'বল হরি হরি-বোল' আর 'মাগো মাগো'—ধ্বনির বিরামহীন আবহ, আর্ত কণ্ঠধ্বনি। রাধিকার অসুখ। রুক্ষ এলোচুলে সে বসে আছে দাওয়ার ওপর অসুস্থ মাখনের শিয়রে। আর বিনোদিনী ঝাঁটা দিয়ে উঠোন ঝাঁট দিচ্ছে।)

বিনোদিনী। (ঝাঁটা হাতে সামনে ঝুঁকে পড়ে রাধিকাকে) আর এই ধ্বনির যেন বিরাম নেই। কান একেবারে ঝালাপালা হয়ে গেল দিবানিশি। উঃ, কি লোকটাই না মরছে!

রাধি। দেখছ কী, কিছু কি থাকল! হুঃ, উজোড় হয়ে গেল গাঁ। উত্তর পাড়ায় তো সে একেবারে, থাক আর না করব না, একেবারে ছেয়ে গেছে। এমন অবস্থা হয়েছে যে, এক বিন্দু জল যে গালে দেবে তার পর্যন্ত কেউ নেই।—কী যে হবে সব!—এমন আকালও দেখিনি এমন মৃত্যুও দেখিনি কোনো দিন।

বিনো। (বসে পড়ে, রাধিকার প্রতি) এই রকম আকাল পড়িছিল নাকি আর একবার। অবিশ্যি, আমরা কেউই দেখিনি, মায়ের মুখ থেকে শোনা কথা বলছি। তা তিনিও আবার নিজের চোখে দেখেননি, ভাব ঠাকুরমার থেকে শুনেছেন। দিদি জানো?

রাধি। ন্-ও আ।

বিনো। (উঠে দাঁড়িয়ে) সে নাকি এর চাইতেও ভীষণ।

ঝাঁট দিতে আরম্ভ করে। রাধিকা মৃদু একটা মুখ ঝাপটা দিয়ে ঘাড় বাঁকায়।

নেপথ্যে হারু দত্তের গলা খাঁকারির আওয়াজ।

হারু দত্ত। (নেপথ্যে) ই-য়ে প্রধান?

[হারু দত্তের প্রবেশ]

—ই-য়ে গে, প্রধান আছো?

(হারু দত্তকে দেখে বিনোদিনী ঘোমটা টেনে পেছনে ফিরে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। রাধিকাও হারু দত্তের অলক্ষ্যে মাথায় কাপড় তুলে দিল)

রাধি। বাড়ি নেই কো।

হারু দত্ত। আরে এই যে মাখনের মা, তা প্রধান যে আমারে বলে এলে—

রাধি। (দাওয়ার ওপর একটা বস্তা পেতে দিয়ে) হ্যাঁ, বসতে বলে গেছে।

হারু দত্ত। বসতে বলে গেছে?

রাধি। হ্যাঁ, বললে বলে এই যাব আর আসব। এলে পরে বসতে দিয়ো।

হারু দত্ত। তা ফিরবে তো তাড়াতাড়ি, না কী?

রাধি। বলে তো গেছে।

হারু দত্ত। (বসতে বসতে) বসতে বলে বেরিয়ে গেল, উঁ.... তা ও শুয়ে কেডা?

রাধি। ঐ তো মাখন। আজ কদিন হয়ে গেল, এ ছেলের হাঁ না কোনো বাক্যি নেই মুখে। চোখ মুখ সব ফুলে পড়েছে। কী যে অদৃষ্টে আছে!

হারু দত্ত। উঁ—তা তোমারও কি অসুখ নাকি? বড্ড শুকনো শুকনো মন মনে হচ্ছে যেন।

রাধি। (মাথায় হাত দিয়ে) অসুখ, আজ কদিন হল একেজ্বরি হয়ে আছি। এ জ্বরের কিছুতেই বিরাম নেই।

হারু দত্ত। উঁ, তা ওযুধ-পত্তর খাচ্ছ?

রাধি। (নাকি সুরে) ওযুধ কোথায় পাব বাবা? সামান্য এট্টু পত্যি তাই বলে.....

হারু দত্ত। নিমছাল, নিমছাল। ওযুধ বলতে কি আমি আর অন্য কিছু বলছি, হেঃ। নিমছাল। বেশ করে ধুয়ে এট্টা হাঁড়ি করে না—সে তুমি আবার তা ঠিক পারবে না। কতকগুলো প্রক্রিয়া আছে। তা এখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দিলেই পারো কাউকে এট্টা শিশি দিয়ে।

রাধি। (বিনোদিনীর প্রতি) তা দাঁড়িয়ে রইলি কেন ঠায় পেছন ফিরে? বাবাঠাকুরের কাছে তোর আবার লজ্জা কিসের এত! আয় বোস!

হারু দত্ত। (হেসে) কেডা ও, নিরঞ্জনের বউ না? আরে দ্যাখো দ্যাখো কাণ্ড দ্যাখো। আমি ভাবলাম বলি আর কেউ বা হবে। আচ্ছা বল মাখনের মা, পথে ঘাটে চলতে ফিরতে আমার বাড়ি তোমার বাড়ি দু-বার ছেড়ে অমন দশবার করে দেখা হচ্ছে রোজ বউমার সঙ্গে, তবু এত লজ্জা! হেঃ হেঃ লজ্জা, তা ভালো, লজ্জা ভালো! বউ মানুষ কি না! তা ভালো।

রাধি। (বিনোদিনীর প্রতি কটাক্ষ করে) ঐ তো ভাবই ঐ রকম। অথচ আপনি দেখেননি (বিনোদিনীর দিকে ভেংচি কেটে দত্তের দিকে এমন মুখ করল যে বিনোদিনী কতই মুখরা) তা দাঁড়িয়ে রইলি ক্যানো তল্লা বাঁশের মতো, বোস্ এখানে এসে। বাবাবাঠাকুর যে তোর বাপপিতেম'র সমতুল্য।

(চোখ দুটো মুহূর্তে চকচক করে জ্বলে ওঠে বিনোদিনীর। একটু ইতস্তত করে বিনোদিনীর দ্রুত প্রস্থান)

রাধি। (বিনোদিনীর প্রতি শ্লেষের ভঙ্গিতে দত্তকে) দেখলেন তো?

হারু দত্ত। হেঃ হেঃ ছেলেমানুষ কিনা!—তা দিয়ো যেন পাঠিয়ে এট্টা শিশি দিয়ে। একেজ্বরি হয়ে থাকা ভালো কথা না। দিনকাল বড়ো খারাপ, বড়ো খারাপ। এমনিই দেখছ তো সব চারদিকে—

রাধি। তা আর দেখছি নে! ভয়ে বলে হাত-পা পেটের ভেতর সেঁদিয়ে যাচ্ছে।

হারু দত্ত। (চোখ কপালে তুলে) উঁ—

[প্রধানের প্রবেশ]

এই যে এয়েছো।

প্রধান। (একটু ঘাবড়ে গিয়ে) এই এট্টু দেরি হয়ে গেল. আর—তা এয়েছেন কতক্ষণ?

হারু দত্ত। তা-া অনেকক্ষণ হল। বসে আছি তোমার জন্যে।

প্রধান। (মাথা চুলকে) দেখুন দিনি। বসতে বলে গিছলাম কিন্তু।

হারু দত্ত। হ্যাঁ, তা শুনেছি। .... তারপর? কী ঠিক করলে?

প্রধান। ঠিক মানে .... বলব বা কী!

হারু দত্ত। ঠিক মানে....বলব বা কী!

হারু দত্ত। সে আবার কী। তা (হাত তুলে) বলি বিক্রি তো করবে, না কি! মনোগত অভিপ্রায়টা কী তাই খুলে বল। জোর করে তো আর আমি তোমারে জমি বেচে ফেলতে বলছি নে!

প্রধান। তো রন্ এট্টু বসুন, কুঞ্জ আসুক।

হারু দত্ত। কুঞ্জ আসবে!

প্রধান। হ্যাঁ, এই এল বলে।

হারু দত্ত। তা কুঞ্জরে দিয়ে আমি কী করব? তার সঙ্গে আমার তো কোনো দরকার নেই। আর আলাপ আলোচনা, আগে কি এ সম্বন্ধে তার সঙ্গে তোমার কোনো কথাবার্তাই হয়নি?

প্রধান। কথাবার্তা—আর কী বা এমন বিশেষ, তবে হ্যাঁ বলিছি।

হারু দত্ত। বলেছ?

প্রধান। হ্যাঁ বললাম বলি জমি-জায়গা যখন—

হারু দত্ত। তা যাগ্‌গে সে তুমি বোঝোগে ; আমি আর সে কথা শুনে কী করব? তা.... কুঞ্জ কী বল্লে?

প্রধান। বললে .....

হারু দত্ত। বলো. বলো।

প্রধান। কুঞ্জ তো বারণ করে ; বলে যে না থাক দরকার নেই জমি বেচে ও দরে।

হারু দত্ত। বারণ করে, উ—উ—উ, তা তুমি কী বল?

প্রধান। আ—মি বলি, এখন কথা কী জানেন—

হারু দত্ত। দ্যাখো প্রধান, এট্টা কথা বলি। কারবার তোমার সঙ্গে আমি এই নতুন করছি নে। আর তুমিও তো জান আমারে না কী? এই যে মগরার বিলের জমি বিক্রি করলে সেদিন, হিসেব করে দ্যাখো, আর পাঁচজনই বা ঐরকম জমির কী দর দিয়েছে, আর আমিই বা তোমারে কী দর দিইছি! যাচাই করে দ্যাখো! আর এই যে কিনছি আমি, বলতে গেলে এ তো আমার একরকম লোকসান। মরলোক তো আর কিছুই আমার হাতে আসছে না। বলবে আবাদি জমি, কিন্তু এখন তো অনাবাদি-ই হয়ে রইল। হাল তো আর আমি ধরতে যাচ্ছি নে জমিতে! থাকল পড়ে এখন ঐ অবস্থায়! মাঝখান থেকে খামখা কতকগুলো টাকা আমার গাঁটগচ্চা চলে গেল। তো এর ওপর আমারে আর কত লোকসান দিতে বল তুমি?—এই যে সব সাহায্যের কথা শুনি, চাল দিচ্চে, ডাল দিচ্ছে, খিঁচুড়ি খাওয়াচ্ছে, বস্তুর দিচ্ছে সব ভদ্দরলোকেরা, সত্যি কথা বলতে গেলে এ-ও তো আমার একরকম সাহায্য ; মাটির বদলে টাকা দিচ্ছি। কী দাম আছে মাটির আজ বল তো? অবিশ্যি হ্যাঁ, ছাগল তোমার, এখন সে তুমি মাথার দিকেই কাটো, ন্যাজের দিকেই কাটো, আমি বলতে

যাব না। তবে ঐ, ওর বেশি আর আমি এখন এক আধলাও দিতে পারব না। অসম্ভব এট্টা কথা বললেই তো আর হয় না।

[কুঞ্জর প্রবেশ। মাথায় এক বোঝা ঘাস]

এই যে কুঞ্জ এয়েছো—তা ও ঘাস আনলে কোত্থেকে?

কুঞ্জ। এই পাঁচ জায়গা ঘুরে ঘুরে।

হারু দত্ত। উঁহু, এ যেন আমার ঢোলকলমি জলার ঘাস বলে মনে হচ্ছে! তা সে যা করছ করেছ, আর কেটো না। ঘাসের আজকাল বড্ড দর।

কুঞ্জ। না, এই তো দুগাছা নিইছি।

হারু দত্ত। তা সে ঐ দুগাছার দামই অতি কম এখন আটগণ্ডা পয়সা। আর কেটো না।—তা হলে আমাদের এদিকে কী হল প্রধান? কবালা করছ কবে তাই বলো। কাল সময় হয় না তোমার?

কুঞ্জ। (দত্তের দিকে কটাক্ষ করে) কিসের কবালা, ও জমি বিক্রি নেই।

হারু দত্ত। (হেসে) দ্যাখো দ্যাখো কী বলে পাগল। তা সে ঘাস জমি আমি তোরে দেবখন। জমিতে ঘাস ছাড়া এখন আর কী জন্মায় রে আহাম্মক? হেঃ, নিসকোন্ তুই ঘাস।

কুঞ্জ। না তা সে আপনি যাই বলুন, ও জমি বিক্রি নেই।

হারু দত্ত। বলি হ্যাঁ রে, জমি ধুয়ে খেয়ে কি পেট ভরবে, য়্যাঁ? য়্যাঁ-হ্যা—হ্যা—হ্যা জমি বিক্রি নেই।

কুঞ্জ। না, তা সে বললে কী হবে—

হারু দত্ত। (হেসে) তুই চুপ কর। ছেলেমানুষ তুই, জমির কী বুঝিস, রে।—তা হলে প্রধান ঐ কথাই থাকল, কী বল?

কুঞ্জ। তা ও জেঠা কী বলবে? বলছি বলি জমি বেচব না, তা আপনি সে একেবারে জোঁকের মতো লেগে আছেন সদাসর্বদা জেঠার পেছনে। ও জমি বিক্রি হবে না।

হারু দত্ত। হেঃ, হেঃ, হেঃ, তোমার ভাইপোটি, বুঝলে প্রধান, একেবারে মাথা খারাপ ; কোনো দিকে হুঁস নেই। —এই তো শুনলাম আজ কদিন থেকে ভুগছে অসুখে মাখনের মা। কেন, দু'পা এগিয়ে গিয়ে (কুঞ্জের প্রতি) আমার জ্বরঘ্ন পাঁচনটা নিয়ে আসতে তোমার কী হয়, কী হয়? যাবি বুঝলি, নয় তো আর কাউকে পাঠিয়ে দিস্ বলে গেলাম।

কুঞ্জ। অসুখ অনাহার, তা ওষুধ দিয়ে কী হবে?

হারু দত্ত। অসুখ অনাহার। হেঃ হেঃ, তোমার ভাইপোটি বুঝলে প্রধান, বড্ড রসিক তো! ভালো ভালো কথা বলে বেশ কুঞ্জ!.... তা হলে ঐ কথাই থাকল প্রধান।

[প্রস্থানোদ্যত]

প্রধান। না, থাক জমিটুকু বাবা, থাক। আর সবই তো গেছে, জমিটুকু আর বেচব না।

হারু দত্ত। আচ্ছা তো নিয়ো'খন পুরিয়েই।

প্রধান। না থাক্।

হারু দত্ত। আবার কী থাক্, পুরিয়েই নিয়ো'খন।

প্রধান। কুঞ্জ!

কুঞ্জ। টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।

প্রধান। তাই বলব—না, ও বেচব না বাবা থাক্।

হারু দত্ত। বেচব না!—কথার খেলাপ করো না হে প্রধান.....কথার খেলাপ করো না।

কুঞ্জ। বলি খেলাপের কথা ওঠে কিসে, হ্যাঁ গো মশায়? ওঠে কিসে খেলাপের কথা? দুঃস্থ অভাজনের ওপর অনাহক এরে বলে কী অত্যাচার। জমি যার সে বলছে বিক্রি করব না ; আর উনি শুধু বলছেন কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে।

প্রধান। (কুঞ্জকে বাধা দিয়ে) আ-হ-া, তুই চুপ কর, দিনি কুঞ্জ।

কুঞ্জ। (চেঁচিয়ে) কেন চুপ করার কী হয়েছে? চুপ করবে! এই চুপ করে থাকতে থাকতে একেবারে বোবা হয়ে যাবে, বোবা হয়ে যাবে এই বলে দিলাম, হ্যাঁ।

প্রধান। তা সে যাই যাব, তুই চুবো।

কুঞ্জ। কেন, কিসের জন্য। গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে, —চেঁচাও,—অন্তত আর পাঁচ জন মানুষ জানুক।

প্রধান। আ-হা-া, তুই চুপ করে দিনি কুঞ্জ।

কুঞ্জ। চুপ করবে!

হারু দত্ত। কথার যে বড় পাঁয়তাড়া দেখি, উঁ?

কুঞ্জ। তবে, এখনও ভয় করে চলতে হবে। এখনও ভয়?

হারু দত্ত। উঁ, তা সে আমারে ভয় না করে—

[ওপরে হাত তোলে]

কুঞ্জ। জানি, জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে ; ওতে আর ভয় করি নে।

হারু দত্ত। উঁ, সোজা শিরদাঁড়টা তা হলে এইবার তো দেখি এট্টুখানি বেঁকিয়ে দিতে হয় ; বেটা ছোটলোকের এত বড়ো আস্পর্ধা!

কুঞ্জ। এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।

[হারু দত্তের ছোট মেয়ে মাতির বেগে প্রবেশ]

হারু দত্ত। (মেয়েকে সামলে) ছোটলোক গালাগালি হল? বেটা হারামজাদার কথা শোনো ছোটলোক গালাগালি হল?

কুঞ্জ। এই মুখ সামলে কথা বলো কিন্তুক।

হারু দত্ত। দে-দ্যাখো একবার—

মাতি। (আর্তকণ্ঠে) বাবা!

হারু দত্ত। যা তো মাতি, ডেকে নিয়ে আয় তো তোর মামারে, আর চণ্ডীমণ্ডপ ঘরে যারা যারা আছে। যা—

[মাতির দ্রুত প্রস্থান]

প্রধান। তা আপনি যান বাবা! এক তো জমি, তা সে আমি বিক্রি করব না ফুরিয়ে গেল!

হারু দত্ত। না অত সহজে ফুরিয়ে যায় না, অত সহজে ফুরিয়ে যেতে দেব না।

প্রধান। খামখা কথা বাড়াচ্ছেন বাবু আপনি?

হারু দত্ত। কথা বাড়াচ্ছি আমি, উঁু, বুড়ো হলেও তুমি তো দেখেছি একটি কম খচ্চর নও প্রধান।

কুঞ্জ। (আস্ফালন করে) হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—

কুঞ্জর বেগে প্রস্থান। মঞ্চের অপর দিক থেকে লাঠিসহ দু তিনজন বলিষ্ঠ লোকের প্রবেশ

হারু দত্ত। দে তো রে আচ্ছা করে ঘা দু-চ্চার

(লাঠি হাতে কুঞ্জর বেগে প্রবেশ। কুঞ্জর লাঠির ওপর লাঠির ঘা পড়ে। মাথায় ঘা খেয়ে কুঞ্জ মাটিতে বসে পড়ে। একজন প্রধানকে আগলে রাখে)

১ম ব্যক্তি। (কুঞ্জের প্রতি) শালা না খেয়ে মরতে বসেছ, এখনও তেলানি গেল না!

২য় ব্যক্তি। এই পায়ে ধরে মাফ চা। চা মাফ!

(কুঞ্জ বুকে হেঁটে হারু দত্তের পা ধরবার জন্যে এগিয়ে যায়।
হারু দত্ত দু-পা পিছিয়ে দাঁতে পিচ কাটে)

হারু দত্ত। পায়ে হাত দিস নে, পায়ে হাত দিস নে, য়্যাঁ ঃ।

(বিনোদিনীর প্রবেশ। বারান্দার ওপর অসুস্থ মাখন উত্তেজনায় উঠতে গিয়ে ঘুরে পড়ে যায়।
রাধিকা ও বিনোদিনী আর্তকণ্ঠে চেঁচাতে থাকে।)

হারু দত্ত। (কুঞ্জের মুখের ওপর লাঠি ঠুকে) বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যে—। (লাঠি ঠুকে) কেন, কার সঙ্গে কী কথা বলিস্ ঠিক থাকে না? উঁ, মনে থাকে না?

[অপমানাহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশুর মত]

প্রধান। মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।

২য় ব্যক্তি। এই ওপ্। (লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে)

(কুঞ্জর কান্না আরও জোরালো হয়ে ওঠে। রুগণ মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

রাধি। হায় হায় হায় হায়, আমার সব গেল গো, সব গেল। ও মাখন, মাখন—

প্রধান। (বিনোদিনীর প্রতি) এট্টু, জল, জল আন। জল—

রাধিকা। ও মাখন, মাখন রে—

[আর্তকণ্ঠে মাখন গাঁইগুঁই শব্দ করতে থাকে]

প্রধান। মাখন, মাখন রে ে - ে -ঃ, —কুঞ্জ দ্যাখ, মাখনরে একবার তুই দ্যাখ।

(রাধিকা কেঁদে ফেটে পড়ে। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখমুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।)

কুঞ্জ। (মুখ তুলে মাখনের দিকে) য়াঁ, মাখন, মাখন...

প্রধান। মাখন চলে গেলি!

(পটক্ষেপ)

৮৬.৮ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ প্রথম অঙ্ক)

'নবান্ন' নাটকটি চার অঙ্কে পনের দৃশ্য নিয়ে পরিকল্পিত হলেও অভিনয় কালে ১৪টি দৃশ্য ব্যবস্থা করা হোত। মূল নাটক প্রথম প্রকাশকালের পাঠ (অরণি), এর সঙ্গে সম্পাদিত অভিনয় কপি (Prompter কপি) ও মুদ্রিত বইয়ের মধ্যে বেশ পার্থক্য আছে। এ সম্পর্কে শ্রীসুধী প্রধান নানা প্রবন্ধে তাঁর বক্তব্য ও প্রমাণ উদ্ধার করেছেন। তা সত্ত্বেও কাহিনীর তেমন কোন হেরফের হয়নি।

নাটকের ঘটনাস্থল আমিনপুর গ্রাম। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের প্রথম ধাক্কাটি সামলিয়ে গ্রামবাংলার নিম্নবিত্ত মানুষ একটু আত্মস্থ হয়েছে যেই, অমনি নেমে আসে এক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। সর্বগ্রাসী বন্যার তাণ্ডবে আর দুর্দান্ত ঝোড়ো হাওয়ায় গৃহস্থের মাথার উপরের চালটা যায় পড়ে। আমিনপুরের পায়ের নিচের শক্ত মাটিটা যায় সরে।—'থাকবার মধ্যে ঘরখানাই ছিল, গেল। গেল! পথে নেমে দাঁড়াবারও তর সইল না রে কুঞ্জ, পথই ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব একাকার হয়ে গেল। ও কুঞ্জ তোর কথাই সত্যি, তোর কথাই সত্যি হ'ল। প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে, —প্রধান সমাদ্দাররে আজ পথে নেমে দাঁড়াতে হবে। কুঞ্জ—তুই যে বলেছিলি—

[প্রধান ঃ প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

সমস্ত আমিনপুর সর্বনাশা বন্যার কবলে চলে গেছে। ভেসে গেছে ঘর বাড়ি, মানুষজন, —'প্রধান, সমুদ্দুর, চারিদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল....সমুদ্দুর উঠে এয়েচে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

[দয়াল ঃ প্রথম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

গোটা আমিনপুরের জীবনের শতরঞ্জিটা ছিড়ে শতছিন্ন হয়ে গেছে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দুর্দশার একচ্ছত্র রাজত্ব হয়ে গেছে আমিনপুর।—জীর্ণ গৃহ-পরিবেশ। খসে খসে পড়ছে চালা। কোনো কোনো জায়গায়

খড়টুকুও নেই, শুধু বাখারির কংকালটুকু দেখা যাচ্ছে। পরিবারের প্রত্যেকটা লোকের চোখে মুখে দারিদ্রের ছাপ সুস্পষ্ট।'

[দৃশ্য বর্ণনা, প্রথম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য]

আমিনপুরের গ্রামে এই দুর্দশাগ্রস্থ প্রধান সমাদ্দারের পরিবার বন্যার কবলে পড়ে যখন ধুঁকছিল, তবুও পড়েছিল আমিনপুরের মাটি কামড়িয়ে। কিন্তু গ্রামের পয়সাওয়ালা লোভী ধূর্ত হারু দত্ত ও তার লোকজন এসে এই অসহায় পরিবারটার ওপর চালায় নিষ্ঠুর অত্যাচার। শেষ সম্বল একটুখানি জমি অল্প দামে কিনে নেওয়ার জন্য এসে যখন কুঞ্জর কাছে বাধা পায়, তখন তার জমির লোভটা নেকড়ের আক্রোশে পরিণত হয়। লোকজন নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে কুঞ্জর ওপর। —'মাথায় ঘা খেয়ে কুঞ্জ মাটিতে বসে পড়ে। ...... লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে। ..... কুঞ্জর কান্না আরো জোরাল হয়। রুগ্ন মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।'

[প্রথম অঙ্ক, 'পঞ্চম দৃশ্য]

কিন্তু কেউ বাঁচাতে পারে না মাখনকে। কুঞ্জ রাধিকার একমাত্র সন্তান, দস্যুর হাতে বাপ ঠাকুরদার ওপর অমানুষিক অত্যাচারের আতিশয্য সহ্য করতে না পেরে ভয়ে আতঙ্কে অনতিক্ষণ পরে প্রাণ হারায়। সমাদ্দার পরিবার তার একমাত্র বংশধরকে হারিয়ে হাহাকার করে ওঠে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে। আর তখন, 'ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখ মুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।' এই ইঙ্গিতময় বিবরণটুকুর মধ্যে পরিষ্কার হয়ে যায় সমাদ্দার পরিবারের ভবিষ্যৎ। গ্রাম ছেড়ে অনিশ্চয়তার পথ বেয়ে বাঁচবার মরণান্তিক প্রয়াসের আভাসটুকু ফুটে ওঠে বিনোদিনীর ভাবনায়।

৮৬.৯ মূলপাঠ ৩ — নবান্ন ঃ দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(কালীধনের গদী। উঁচু একটা ফরাসের এক কোণে মোটা একটা তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসে আছে কালীধন। মোটা কালো নাদুস-নুদুস চেহারা, গায়ে একটা ফতুয়া—গলায় সোনার চেন, হাতে সোনার তাবিজ। মাথার উপরে সিদ্ধিদাতা গণেশের প্রতিকৃতি। নিচে দেওয়ালের গায়ে সিঁদুরের গোলা দিয়ে বিচিত্রিত শ্রীশ্রীকালীমাতার শ্রীচরণ ভরসায় এই বারবার করিতেছি।" পাশে লাল কাপড়ে বাঁধাই করা স্তূপীকৃত খাতাপত্র। ঘরের মাঝখানে বিরাট একটা দাঁড়িপাল্লা। আধমণ, দশসের, পাঁচসের, আড়াই সের ও এক সের ওজনের লোহার বাটখারাগুলি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত। গুদাম ঘরের একপাশে কতকগুলো খালি বস্তা সাজানো। কুলি ও বাবু গোমস্তা এধার-ওধার ঘুর-ঘুর করছে। সামনে দিয়ে চলেছে সব ভারবাহী কুলিরা, পিঠে তাদের সব দু-মণি চালের বস্তা। মাল সব গুদোমের চোরকুঠু রিগুলোতে চালান করে দেওয়া হচ্ছে হরদম। ক্যাশ বাক্সের ওপর উপুড় হয়ে পড়ে কালীধন মাঝে

মাঝে কী সব হিসেবপত্তর করছে, আর বিড় বিড় করছে। সামনে ফরাসের এককোণে সপ্রতিভ হয়ে বসে আছে হারু দত্ত ; পায়ের ওপর পা তুলে দিয়ে বিড়ি ফুঁকছে। বিড়ি ফুঁকছে আর কালীধনের দিকে প্যাটপ্যাট করে তাকাচ্ছে। কী একটা হিসেব কষা চলছে যেন সামনের খাতায় ; আর তারই প্রতিক্রিয়া নানা ভাবের সৃষ্টি করছে উভয়ের চোখেমুখে। ফরাসের ডানদিকের এককোণে মাছির মতো ডুবে আছে রাজীব, দোকানের বৃদ্ধ কর্মচারী, নথিপত্তরের মাঝখানে। এমন সময় একজন ছোকরা গোমস্তা, নিরঞ্জন ওরফে রাখহরি চাবির গোছা নাড়তে নাড়তে কালীধনের দিকে এগিয়ে এল।)

নিরঞ্জন। মাল সব গুদোমে উঠে গেছে।

কালীধন। ঠিক মতো তোলা হয়েছে তো?

নিরঞ্জন। হ্যাঁ সে—

কালীধন। একেবারে—

[চোরকুঠুরির দিকে আঙুল তুলে খোঁচা মারলে]

নিরঞ্জন। তিন নম্বর কামরায়।

কালীধন। তিন নম্বর। ঠিক আছে।—এইবার তুমি দ্যাখো, দ্যাখো আবার ওদিকে দ্যাখো। দ্যাখো। (হিসেবের খাতায় মন দেয়) চাবিটা—

নিরঞ্জন। হ্যাঁ এই তালাটা দিয়ে আসি!

কালীধন। দিয়ে আসি! এখনও লাগাওনি! কতবার করে বলতে হবে—নাঃ, আর চলল না কারবার।

[নিরঞ্জন প্রস্থানোদ্যত]

এদিকে শোনো। বললাম আর চললে অমনি হুড়বড় করে। ভালো করে টেনে দেখো তালা ; আর বেরিয়ে আসবার সময় দু'খানা বস্তা টেনে দিয়ো খাদের মুখে, বুঝতে পেরেছ? যাও।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান]

সব দেখে-শুনে করবে, এ সব কথা কি আর বার বার করে বলে দিতে হয়। ঝটপট সেরে এসে (নিরঞ্জনকে উদ্দেশ করে হারু দত্তের প্রতি) এদের নিয়ে কারবার চালাতে হয়। বলব কী তোমায় সে একেবারে ষাঁড়ের গোবর, কোনো কম্মেরই হোক! (নিম্নস্বরে) রেখেছি শুধু লোকটা বিশ্বাসী বলে। কেটে ফেলে দাও, এট্টা কথা তুমি বের করতে পারবে না মুখ দিয়ে।

হারু দত্ত। সে তো মস্ত গুণ।

কালীধন। রেখেছিও তো ঐ জন্যেই।

হারু দত্ত। আজকালকার দিনে একটা বিশ্বাসী লোক পাওয়া মানে—

কালীধন। (এক নজর তাকিয়ে ভু তুলে) নিশ্চয়। (সঙ্গে সঙ্গে হিসেবে মনোনিবেশ করে, ঠোঁট দু'খানা নড়তে থাকে) তা হলে তোমার হল গিয়ে একুনে—আচ্ছা একটু সবুর করো, আসুক রাখহরি। আরে কই রে....(হিসেবে মন দেয়) বিড়ি খাও।

হারু দত্ত। হ্যাঁ সে—(বিড়িতে টান মারে) আমার আবার ওদিকে একটা কাজ ছিল!

কালীধন। আরো এসো। (দেশলাই দেয়। হিসেব কষে একটু পরে) চাল কিন্তু তোমার এবার তেমন সরেস নয় দত্ত!

হারু দত্ত। আর সরেস, দুদিন বাদে আর চালই পাও কি না তাই দ্যাখো, তার আবার...। এই তাই যা অবস্থা হয়ে উঠেছে মফস্বলে.....একেবারে খুনোখুনি ব্যাপার। অ্যাঁ....

[প্যাটপ্যাট করে চেয়ে থাকে কালীধনের দিকে]

কালীধন। বুঝলাম, কিন্তু তোমার গিয়ে নন্দীদের ঘরে যে চাল দিচ্ছে সে কোত্থেকে! বেশ সরেস চাল! সে একটা চাল তুমি ভাঙা বা অন্য কিছু পাবে না।

হারু দত্ত। হ্যাঁ জানি, কিন্তু দর দিচ্ছে কত করে খবর রাখ!

কালীধন। কত!

হারু দত্ত। সাড়ে বাইশ। দেবে! দেবে!

কালীধন। সাড়ে বাইশ!

হারু দত্ত। তবে, বালাম কি আর মাঙনা হয়!

কালীধন। সাড়ে বাইশ অবিশ্যি বড্ড বেশি দর হয়ে যায়।

হারু দত্ত। তা ভালো জিনিশের ভালো দর দিতে হয়। নইলে হবে কেমন করে।—বলো তো দেখিএকবার চেষ্টা করে দু'দশ নৌকো যা পাই। তবে দর ঐ সাড়ে বাইশ, তেইশ, ওর এক আধলাও কিন্তু কম নয়। হয় তো বলো!

কালীধন। না ও দর দিতে পারব না। অনর্থক মার খেয়ে যাব।

হারু দত্ত। কী মার, লুফে নিয়ে যাবে পঁয়ত্রিশ চল্লিশে। নন্দীরা কি লোকসান দিচ্ছে!

কালীধন। না সে নন্দীরা যাই করুক, আমি ও দর দিতে পারব না। বাজারের কথা এখন কিছু বলা যায় না দত্ত, মেঘ-রোদ্দুরের খেলা চলেছে। ওরে ব্বাপ্‌রে বাপ রে....

হারু দত্ত। (খ্যাক্ খ্যাক্ করে হেসে) এই তো দ্যাখো, তোমরাই যদি এই রকম কথা বল তো আর সব কারবারিরা যায় কোথায়!

কালীধন। না না দত্ত তুমি বোঝ কী! নিদেনপক্ষে এখনও সওয়া লাখ টাকার মাল আমার এখানে-সেখানে ছড়িয়ে পড়ে আছে। অন্তত এই টাকাটা উশুল না হয়ে আসলে....

হারু দত্ত। তা সে উশুল হয়ে যাবে, হ্যাঁঃ।

কালীধন। সেই কি আর এট্টা কথা হল।—তুমি তো বলছ হয়ে যাবে, কিন্তু এই না হওয়া পর্যন্ত —রাত্তিরে ঘুমুতে পারি নে দত্ত, তুমি বল কী! খালি আজে বাজে কত কথা কত কী সে একেবারে ভীমরুলের চাকের মতো চারদিক থেকে এসে পাগল করে দেয়।

হারু দত্ত। বুঝতে পাচ্ছি ব্লাড প্রেসার হয়েছে।.... তা সে বড়ো বড়ো লোকের আবার ও সব না থাকলে চলে না।

কালীধন। (হেসে) তা যা বলেছ—

[নিরঞ্জনের প্রবেশ]

এই যে এয়োছো এতক্ষণে!

হারু দত্ত। হ্যাঁ তো ন্যাও এইবার এট্টু তাড়াতাড়ি করো। বড্ড দেরি হয়ে গেল আমার আবার ওদিকে।

কালীধন। সব টাকা কিন্তু আজ দিচ্ছি নে।

হারু দত্ত। সে কী—তো দ্যাও ; যা দেবে দ্যাও ; আমার আবার ওদিকে—

কালীধন। (হেসে) গুঁইবাবুদের ঘরে যাবে নাকি আজ! সে সব তো শুনলামই না। আর আসই একেবারে ঘোড়ায় জিন দিয়ে তার শুনব কখন! দু-দণ্ড বসে যে এট্টু বাজারের হালচাল সম্বন্ধে দুটো কথাবার্তা বলব—(নিরঞ্জনের প্রতি) কই, কী বললে, ক বস্তা হয়েছে!

নিরঞ্জন। ঐ পুরোপুরি ‘সাতশ বস্তা।

কালীধন। সাতশ’ বস্তা। এখন একগাড়ি—

হারু দত্ত। তুমি আগে আমারে যা দেবে তাও তো, তারপর সে তোমরা বসে সব হিসেব-পত্তর করোগে, হ্যাঁঃ।

কালীধন। (চাপা ধরা গলায়) আচ্ছা তা হলে তোমারেই আগে দিয়ে দেই। তোমারেই আগে দেই। ক্যাশবাক্সের ভেতর থেকে একতাড়া নোট বার করে হারু দত্তের হাতে গুনতি করে দেয়। গুণে ন্যাও।

হারু দত্ত। (গুনতি করতে করতে) আবার গুনতে হবে। পাঁচ-দশ পঞ্চাশ, পঞ্চাশ, পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার, আর.... এতে কত দিলে!

কালীধন। আর পাঁচশো —

হারু দত্ত। আর পাঁচশো। এই দিলে এখন।

কালীধন। হ্যাঁ, হিসেব সে এখন তোমার থাকল।

হারু দত্ত। (এস্তে) তো থাক, থাক, তোমার কাছে হিসেব থাকবে তাতে আর আচ্ছা আমি চললাম। (উঠতে উঠতে) বড্ড দেরি হয়ে গেল। বাজারেই বা যাব কখন, কেনাকাটারই বা কী করব! —তো চললাম, আর ও কথার কী বললে! দেখব নাকি বালাম!

কালীধন। বড্ড বেশি দর হয়ে যায়।

হারু দত্ত। রাখলে পারতে কিছু , জিনিস ভালো ছিল। আর হয় তো পাবেই না।

কালীধন। জিনিস ভালো, দরও তো ভালো। আর কথা কী জানো, ওতে তেমন কিছু থাকে না। তুমি আমার বরং এই চালটাই আরও কিছু—

হারু দত্ত। তা সে তো বলেই গেলাম, তবে এটাও কিছু রাখলে পারতে।—তা সে বোঝ গে তুমি, আমি কিছু বলতে চাইনে—আমার আবার এদিকে.........

কালীধন। তা বলছ যখন এত করে, দিয়ো কিছু।

হারু দত্ত। কত?

কালীধন। কত দেবে!

হারু দত্ত। (হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে) এই।

কালীধন। (বিস্মিত ভঙ্গিতে) অত!.... তা দিয়ো, দিয়ো।

হারু দত্ত। (প্রস্থানোদ্যত) হ্যাঁ রেখে তো দ্যাও কিছু, তারপর এখন বোঝা না হয়, আচ্ছা আমি চলি তা হলে।

কালীধন। আচ্ছা—। (চেঁচিয়ে) আরে ইয়ে দত্ত। তারপর, ভালো কথা, আমার সেই জিনিসের কী করলে। আমার সেই জিনিস!

হারু দত্ত। কোন্ জিনিস বলো তো?

কালীধন। জিনিস, আবার বলতে হবে কোন জিনিস!

[সন্দিগ্ধ দৃষ্টি মেলে এগিয়ে আসে আবার হারু দত্ত]

হারু দত্ত। (কৌতূহলী হেসে) কী বল দিনি, ও হো, মনে পড়েছে, মনে পড়েছে। তা সে হবে, হবে। ব্যবস্থা আমি সে ওদিকে একেবারে পাকাপাকি করে ফেলেছি। ঠিক হয়ে যাবে সব।

[প্রস্থানোদ্যত]

কালীধন। ঠিক তো—

হারু দত্ত। এই দেখবে হয় তো ফিরে পাকেই—

[ফিরে চেয়ে হাসল]

কালীধন। সত্যি, মাইরি

হারু দত্ত। তবে—

কালীধন। আচ্ছা-া-া-া

[হারু দত্তের প্রস্থান]

(ক্যাশবাক্সের ডালাটা তুলে ধরে কালীধন যেন কি সব নাড়াচাড়া করে, তারপর একটা

লম্বা চাবি বের করে একটু ফিরে শুয়ে পাশের লোহার সিন্দুকটা খুলে ক'তাড়া নোট ভেতরে চালান করে দেয়।)

রাজীব। (হাই তুলে তিন তুড়ি বাজিয়ে) রাধে গোবিন্দ বল মন।

কালীধন। সরকার মশাই।

রাজীব চশমার ফাঁক দিয়ে কালীধনের দিকে এক নজর তাকিয়েই নিজের কাজে মন দেয়।

ও সরকার মশাই।

রাজীব। কইয়্যা ফ্যালাও, শুনত্যাছি।

কালীধন। চালানটা পাঠিয়েছিলেন ও বেলা?

রাজীব। (একদৃষ্টে কালীধনের দিকে তাকিয়ে) বিপিনবাবুর নামে তো? চব্বিশ নম্বর!

কালীধন। (খাতা দেখে) হ্যাঁ।

রাজীব। হ হ দিছি, রাখহরিরে দিছি। তাইলেও একবার জিগাও, পাঠাইল কি না চালানটা।

কালীধন। এই তো দেখুন গণ্ডগোল বাধান।

রাজীব। গণ্ডগোলের আবার কী আছে ইয়ার মধ্যে ; হ্যাঁ হে মহে—আরে কী যে কয় ওয়ার নামটা, রাখহরি রাখহরি। রাখহরি, চালানটা নি পাঠাইছ বিপিনবাবুর?

নিরঞ্জন। (কাজ ফেলে এগিয়ে যায়) নম্বর কত চালানের?

[জনৈক ভদ্রলোকের প্রবেশ]

কালীধন। নম্বর কত চালানের! এখন জিজ্ঞেস করছ নম্বর কত চালানের! নাঃ, কাজ-কারবার আর —(সহসা ভদ্রলোকের প্রতি) আপনি—

ভদ্রলোক। আমি—

কালীধন। ও বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পেরেছি। মণ্টুবাবুর বাড়ি থেকে আসছেন তো—তা একটুখানি বসতে হবে আপনাকে ; এই বেশিক্ষণ না, একটুখানি বসুন—

[আগন্তুক ভদ্রলোক পাশের চেয়ারে বোকার মতো বসে পড়লেন।]

(নিরঞ্জনের প্রতি) তা যাও, আর হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে এখন করবে কী। যা হবার তা তো হয়েইছে। কালও যায়নি, আজও গেল না চালানটা।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান]

(রাজীবের প্রতি) আর আপনিও তেমনি দিয়েই খালাস। দিলেন যখন তখন আর একবার খোঁজ করে দেখলেই পারতেন যে চালানটা ঠিক পাঠানো হল কি না। সবাই যদি এখন—

রাজীব। আরে দিয়া তো রাখছি সেই কোন সকালে, তা সে যে পাঠায় নাই এহনতরি—

কালীধন। আহা দিছলেন তো বুঝলাম সকালবেলাই, কিন্তু জিনিসটা ঠিক পাঠানো হল কি না, মাঝে একবার খোঁজ নিয়ে দেখলেই পারতেন, চুকে যেত।

রাজীব। অহন জট তো আর নাই আমার মাথায়—

কালীধন। জট থাকা না থাকার কোনো প্রশ্ন হচ্ছে না। যাগ্‌গে, খামখা আপনার সঙ্গে তর্ক করে আর—(ভদ্রলোকের প্রতি) এইবার বলুন কী বলছিলেন আপনি। ও হ্যাঁ, আরে ওহে, সকাল বেলা আজ অনন্তধাম থেকে কোনো লোক এসেছিল কি? সরকার মশাই খবর রাখেন?

রাজীব। অনন্তধাম থাইক্যা, হ্যাঁ আইছল তো চাউলে লাইগ্যা! তা পরিমাণের কথা—

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি হেসে) ক-মণের কথা বলেছিলেন যেন আপনি?

রাজীব। আচ্ছা রও দেখি একবার খাতটা, লিখা তো রাখছিলাম।

[খাতায় মনোনিবেশ করে]

ভদ্রলোক। আমি মানে, এই গিয়ে আপনার একজন সাধারণ গেরস্ত লোক মশাই, বড্ড দায়ে পড়ে এসেছি। অবিশ্যি, আপনি দর যা চাইবেন আমি তাই দেব। তবে—এই কিছু চাল আমার চাই-ই।

কালীধন। (হাত উলটে) চাল কোথায় মশাই! দশ-বিশ বছরের বাঁধা খদ্দের তাদেরই বলে চাল দিতে পাচ্ছি নে, তার আপনি তো—না মশাই ও সুবিধে হবে না। আপনি বরং অন্য জায়গা দেখুন—কী কাণ্ড!

ভদ্রলোক। দেখুন দাম আমি—

কালীধন। আহা দামের কথা তুলছেন কেন অনর্থক ; দামের জন্যে তো আটকাচ্ছে না, আসলে চালই নেই।

ভদ্রলোক। চাল নেই তা হলে—

কালীধন। তা হলে দেখুন, অন্য জায়গা দেখুন।

ভদ্রলোক। বলুন কোথায় দেখব। এর আগে দু-পাঁচ দোকান যা দেখলাম, তাতে সবাই তো ওই এক কথাই বলে—চাল নেই। এখন আমি কী করি বলুন তো। আপনি বোধ হয় ঠিক বুঝতে পারছেন না আমার প্রয়োজনটা। গুচ্চার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে মশাই শহরে বাস। ঘরে এক দানা চাল নেই। আপনি বুঝতে পারছেন!

কালীধন। বুঝলাম মশাই, সব বুঝলাম। কিন্তু আমি তার কী করতে পারি বলুন!

ভদ্রলোক। (করজোড়ে) যা হয় একটা ব্যবস্থা করুন ; আপনি বাঙালি, আমিও বাঙালী।

কালীধন। তা দামের কথা বলছিলেন, কী দর দেবেন আপনি সেটা বলুন ; দেখি যদি অন্য কোনো দোকান থেকে বলে কয়ে জোগাড় করতে পারি।

ভদ্রলোক। দর—তা সে আপনি যা বলেন!

কালীধন। (হাতের পাঁচ আঙুল দেখিয়ে) দেখুন, দিতে পারবেন! হয় তো দেখি কারো ঘরে যদি চাল থাকে।

ভদ্রলোক। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) কত! প-ঞ্চা-শ টাকা।

রাজীব। (মুখ তুলে) অনর্থক কথা বাড়াও তুমি কালীধন। খ্যাদাইয়া দাও না, হুঁঃ।

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি) তবেই বুঝুন!

রাজীব। চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে। দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি) দেখুন, দাম শুনেই চমকে উঠলেন তো! তা সে তো আমি আপনাকে আগেই বলেছি, যে আপনি চাল নিতে পারবেন না।

ভদ্রলোক। তাই বলে মশাই পঞ্চাশ!

রাজীব। আরে ষাট টাকা দরে মশায় সাধাসাধি, বোচ্চেন সাধাসাধি। আপনে তো পঞ্চাশ টাকা শুন্নাই চম্‌কাইয়া ওঠলেন।

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি হেসে) চাল চান অথচ দেখুন—

ভদ্রলোক। আপনি হাসছেন!

রাজীব। তো কি কাঁদবে নাকি! কী আশ্চর্য!

ভদ্রলোক। আগে ত্রিশ টাকা দরে নিইছি, এখন নয় পঁয়ত্রিশ, জোর চল্লিশই নিন। সের পনেরো চাল অন্তত আমায় দিন যে করে হোক, বড্ড ঠেকে গেছি।

রাজীব। আরে দ্যাহ কয় কী, য়্যাঁ, কয় কী! মানুষের ব্যবহার দেইখ্যা, আর—

কালীধন। (ভদ্রলোকের প্রতি) মাফ্ করবেন আমি পারব না।

ভদ্রলোক। (হাত জোড় করে) সের পনেরো চাল আমায় অন্তত—

রাজীব। দে দ্যাখ্‌ছ, বসপ্যার দিলে শুইব্যার চায়। আরে কালীধন, এগুলো কী মানুষ।

ভদ্রলোক। (ক্ষুব্ধ স্বরে রাজীবের প্রতি) আপনি চুপ করুন। অনেকক্ষণ থেকে আমি দেখছি আপনি—

রাজীব। দে দ্যাখ—আবার চোখ ভ্যাট্‌কায়! দেচে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি। দেচে রাখহরি—

ভদ্রলোক। খুনে যেন কোথাকার। তোমায় আমি পুলিশে দেব, দাঁড়াও।

কালীধন। যান যান, আপনি বরং তাই ডেকে নিয়ে আসুন গিয়ে, যান যান।

ভদ্রলোক। (ক্ষোভের সুরে) অনন্তধাম থেকে লোক আসলে যত ইচ্ছে তত মণ চাল দিতে পারেন, কিন্তু

কালীধন। অনর্থক চেঁচাচ্ছেন। চাল নেই, চাল আপনি পাবেন না।

রাজীব। (খল হেসে) আরে এগুলা কি পাগল কি দ্যাখছ কালীধন, কয় বলে পুলিশ ডাকমু। (কালীধনকে উদ্দেশ করে ভদ্রলোককে) বলে পুলিশ ডাকমু। আরে কত জজ মেজিস্ট্রট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখ্‌প্যার পারে তা নি জানো। আহাম্মক কোহানকার, তুমি দ্যাখাও পুলিশের ভয়!

(নেপথ্যে 'মাগে' 'মাগো' ধ্বনি! কালীধন ভুঁড়ি নাচিয়ে শুধু খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসে।)

ভদ্রলোক। (রেগে) আচ্ছা, যাচ্ছি আমি, কিন্তু এর কোনো প্রতিকার হয় কিনা আমি একবার—(হঠাৎ অসহায়ভাবে ভেঙে পড়ে)

[কালীধন ভুঁড়ি নাচিয়ে হাসে]

কিন্তু কী-ই বা করব!

[প্রস্থান]

রাজীব। (হিসেবের খাতাটার দিকে এক নজর তাকিয়ে) দুর্ভিক্ষের কাঙ্গালি যত সব, মরবার আইস্যা পড়ছে শহরে—দোকানের ফটকটা বন্ধ কইর‍্যা দেচে রাখহরি, বন্ধ কইর‍্যা দে।

[নেপথ্যে সঙ্গে সঙ্গে ফটকের কোলাপর্সিবল্ গেট বন্ধ করার শব্দ—
ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝড়ং-ঝট]

(পটক্ষেপ)

একটা পার্কের অংশ। কোণে একখানা বেঞ্চ পাতা। ভেতরে কুড়ি-পঁচিশ জন ভিক্ষুক ভিড় করে বসে আছে। কলকণ্ঠে মুখর হয়ে আছে পরিবেশ। ভিড়ের মাঝখানে প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা ও বিনোদিনীকে দেখা যাচ্ছে। প্রধান একটা ছেঁড়া জামা সেলাই করছে। রাধিকা বসে বসে মাথার চুলে বিলি দিচ্ছে। কুঞ্জ গালে হাত দিয়ে বসে কী যেন ভাবছে। বিনোদিনীকে ফষ্টি নষ্টি করতে দেখা যাচ্ছে অন্য একজন ভিখারিনীর সঙ্গে। বস্তাবন্দী ঘর সংসার—মেটে হাঁড়ি, টিনের কৌটা—সব ছড়িয়ে পড়ে আছে ইতস্তত। বুড়ো-হাবড়া, জোয়ান, কিশোর শিশু—বিভিন্ন বয়সের নিঃস্ব জমায়েত হয়েছে এখানে, এদের ভেতরে কেউ কেউ কাঁদছে, কেউ হাসছে, কেউ বা তুমুল ঝগড়ায় মেতে উঠেছে। হৈ চৈ চেঁচামেচির মাঝখানে অডিটোরিমের ভেতর থেকে জনৈক সাহেবি পোশাক পরা প্রেস-ফটোগ্রাফার শিশু সন্তান কোলে জনৈক ভিখারিনীকে লক্ষ্য করে চেঁচিয়ে উঠল।

১ম ফটোগ্রাফার। বাঃ, ফাইন মডেল। (বন্ধুকে উদ্দেশ করে) মিস্টার মুখার্জ্জি, আরে এসো এসো, ক'খানা ছবি তুলে ফেলি। আমাদের কাগজের জন্যে। এমন মডেল তুমি চট করে পাবে না হে, এসো এসো।

(আর একজন প্রেস-ফটোগ্রাফার এগিয়ে গেল স্টেজের দিকে অডিটোরিয়াম থেকে।)

২য় ফটোগ্রাফার। দি আইডিয়া, দাঁড়াও আসছি।—দারুণ স্ট্রাইক করেছে তো হে তোমার মাথায়। আমি ভাবতেই পারিনি। ওঃ—

(দুজনে স্টেজের ওপরে গিয়ে উঠল। প্রথম ফটোগ্রাফার মঞ্চের সামনের দিকের বাঁ কোণ থেকে ক্যামেরাটা তুলে ধরে তাক করতে লাগল নিঃস্বদের দিকে।)

তুললে? ক'খানা?

১ম ফটোগ্রাফার। তুললাম, খানা দুয়েক তুললাম কিন্তু এক্সপোজারটা তেমন যেমন ভালো হল না বলে মনে হচ্ছে।

২য় ফটোগ্রাফার। কেন, ঠিক হল না?

১ ম ফটোগ্রাফার। কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে। আর শালী খালি নড়বে, খালি নড়বে, পোজিশন নিতেই দিলে না।

২য় ফটোগ্রাফার। আচ্ছা দাঁড়াও, আমি ঠিক করে দিচ্ছি। (ভিখিরিদের দিকে একটু এগিয়ে যায়) আর রয়, অনর্থক 'মব'-এর ছবি তুলে খামখা ফিলম নষ্ট করে কী হবে! তুমি বরং মডেল দেখে দেখে তোলো, আমি ঠিক করে দিচ্চি, কেমন! হ্যাঁ, তাই করো, দ্যাটস্ রাইট। (কচি ছেলে কোলে জনৈক ভিখারিনীর প্রতি) ওহে, তোমরা সব খাবার পেয়েছ, খাবার! মানে গিয়ে এই খিচুড়ি! খিচুড়ি পাওনি সব তোমরা!

ভিখারিনী। না তো!

২য় ফটোগ্রাফার। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) সে কী!

(ভিখারিনী মুখখানা করুণ করে ফটোগ্রাফারের দিকে হাত পেতে ধরে।)

১ম ফটোগ্রাফার। (ক্যামেরা ডাক করতে করতে) মুখার্জি!

২য় ফটোগ্রাফার। য়্যাঁ।

১ম ফটোগ্রাফার। একটুখানি হাসি ফোটাতে পারো, হাসি জাস্ট এ বিট অব স্মাইল্। দ্যাখো না ভাই চেষ্টা করে।

২য় ফটোগ্রাফার। হাসি!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ছবিখানার তাহলে নাম দিতে পারি 'বাংলার ম্যাডোনা'।

২য় ফটোগ্রাফার। দি আইডিয়া, কাগজের সারকুলেশন তা হলে তো কাল দ্বিগুণ হে। ওঃ, 'বস' যা খুশি হবে তোমার ওপর মাইরি।

১ম ফটোগ্রাফার। খুব চমৎকার আইডিয়া, না?

২য় ফটোগ্রাফার। তবে, মাথা কার আবার দেখতে হবে তো!—কিন্তু হাসি এ আমি ফোটাই কী করে বলো তো?

১ম ফটোগ্রাফার। দ্যাখো না দ্যাখো না একটু চেষ্টা করে, জাস্ট এ বিট অব স্মাইল, দু-চারটে পয়সা-টয়সা চায় তো দাও না।

[ক্যামেরা তাক করতে থাক, ২য় ফটোগ্রাফার ভিখারিনীর দিকে এগিয়ে যায়।]

ভিখারিনী। আমার জন্যে নয় বাবু, এই কচি ছেলেটা! দয়া করো বাবা।

২য় ফটোগ্রাফার। (দরদভরে) পয়সা নেবে, পয়সা! এই নাও।

[পয়সা দেয়। পয়সা পেয়ে ভিখারিণীর মুখটা প্রসন্ন হয়ে ওঠে।]

২য় ফটোগ্রাফার। রয়!

১ম ফটোগ্রাফার। ও. কে!

২য় ফটোগ্রাফার। কী রকম, সাক্‌সেস্‌ফুল তো?

১ম ফটোগ্রাফার। মোস্ট লাইক্‌লি, দেখা যাক। (একটু এগিয়ে গিয়ে) তুমি যাও বাছা এইবার, যাও। যাও। পয়সা-টয়সা পেয়েছ তো। আচ্ছা যাও।

[ভিখারিনী সরে যায়।]

(করুণভাবে) রিয়েলি!—আচ্ছা মুখার্জি, দ্যাখো তো ভাই, এই ধরনের আর গোটা দুচ্চার মডেল—(হঠাৎ প্রধানকে দেখে) ইয়েস্ দ্যাট্ ওল্ড ম্যান, দাঁড় করাতে পারো ভাই ওকে একবার বলে কয়ে—দ্যাখোনা একটু চেষ্টা করে।

২য় ফটোগ্রাফার। কে, কাকে মীন করছ তুমি!

১ম ফটোগ্রাফার। আরো ঐ যে, বুড়ো লোকটা, জামা না কী সেলাই করছে বসে বসে!

২য় ফটোগ্রাফার। ও, দ্যাট্ গ্রেট্ প্যাট্রিয়ার্ক!

১ম ফটোগ্রাফার। বাঃ, বেড়ে নামকরণটি করেছ তো হে। গ্রেট প্যাট্রিয়ার্কই বটে। ফাইন নামকরণ হয়েছে। চল না দু একটা কথাবর্তা কয়ে দেখি বুড়োর সঙ্গে। (এগিয়ে গিয়ে প্রধানকে) হ্যাঁ হে, বলি বাড়ি কোথায় তোমার, বাড়ি!

প্রধান। জ্ঞেঁ-এ-এ বাড়ি! বাড়ি জ্ঞেঁ-এ-এ চিনতে পারবেন!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, কেন পারব না!

প্রধান। তা হলে বলি। বাড়ি আপনার গিয়ে হুই-ই আমিনপুর।

[হে হে করে হেসে]

১ম ফটোগ্রাফার। আমিনপুর?

প্রধান। আঁজ্ঞে।

১ম ফটোগ্রাফার। তা এখানে এসে তোমাদের সব থাকবার খাবার বেশ সুবিধে হয়েছে তো!

প্রধান। সুবিধে! আমাদের বাবু সুবিধে আর অসুবিধে!

১ম ফটোগ্রাফার। কেন? আচ্ছা দ্যাখো বাপু, এই তুমি একটুখানি উঠে দাঁড়াতে পারো?

প্রধান। উঠে দাঁড়াব বলছেন!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটুখানি, মানে একটা ছবি তুলব কি না?

প্রধান। ছবি!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ ছবি, যেমন—

প্রধান। ছবি কিসের বাবু?

১ম ফটোগ্রাফার। (মুখার্জির প্রতি) ডীল উইথ্ হিম।

২য় ফটোগ্রাফার। (প্রধানের প্রতি) কেন তোমার! কেমন সুন্দর খবরের কাগজে বেরুবে। খবরের কাগজের লোক কিনা আমরা!

প্রধান। কাগজে বেরুবে। কাগজে বেরুবে। তা কী হবে তাতে করে।

২য় ফটোগ্রাফার। কী আবার হবে, লোকে দেখবে, জানবে দেশের অবস্থা!

প্রধান। দেশের অবস্থা! তা পাবে কোথায় তারা কাগজ!

২য় ফটোগ্রাফার। কেন কিনে পড়বে।

প্রধান। কিনে পড়বে?

২য় ফটোগ্রাফার হ্যাঁ।

প্রধান। আপনারা বিক্রি করবেন!

২য় ফটোগ্রাফার। বিক্রি—হ্যাঁ তা বিক্রি না করলে পাবে কোত্থেকে লোকে কাগজ!

প্রধান। ও, তাও তো বটে। তা ভালো, কঙ্কালের ছবির কারবার। কঙ্কালের ছবির ব্যবসা। তা ভালো, কিন্তু আমারে কী করতে হবে এখন?

১ম ফটোগ্রাফার। তোমাকে, এই একটুখানি উঠে দাঁড়াবে আর কী। একটুখানি উঠে—

প্রধান। এমনি উঠে দাঁড়াব!

২য় ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ, অমনি একটু দাঁড়াবে আর কী। পয়সা দেবখ'ন তোমায়। পয়সা দেবখ'ন।

প্রধান। পয়সা দেবে। তা দিয়ো। আমারে তোমরা পয়সা দিয়ো। তা এই মাটির হাঁড়িটা হাতে করে দাঁড়াব বাবু। হাতে করে দাঁড়াব মাটির হাঁড়িটা! বেশ দেখতে হবেখ'ন। বেশ ভালো দেখতে হবে'খন।

২য় ফটোগ্রাফার। হাতে নেবে—হাঁড়িটা—(প্রথম ফটোগ্রাফারের ইঙ্গিতে) তা নাও, নাও।

প্রধান। (উঠতে উঠতে) হ্যাঁ তাই নেই, তাই নেই। হাতে করে দাঁড়াই হাঁড়িটা। হাতে করে দাঁড়াই—তো ন্যাও, তোলো এইবার, ছবি তোলো। কঙ্কালের ছবি তোলো—

২য় ফটোগ্রাফার। রয়! রয়! গেট রেডি।

প্রধান। তোলো, কঙ্কালের ছবি তোলো।

১ম ফটোগ্রাফার। (ছবি তুলে হাসতে হাসতে) ব্যস, এ তো কতক্ষণ আর!

প্রধান। হয়ে গেছে!

১ম ফটোগ্রাফার। হ্যাঁ দাদা, হয়ে গেছে। এক সেকেণ্ডের তো ব্যাপার। এই নাও, তোমায় পয়সা দেব বলেছিলাম, এই নাও।

প্রধান। হ্যাঁ, পয়সা দেবে বলেছিলে, পয়সা দাও।

১ম ফটোগ্রাফার। (পয়সা দিয়ে) কেমন, খুশি তো! আচ্ছা!—দি গ্রেট প্যাটরিয়ার্ক।

[পয়সা দিয়ে ফটোগ্রাফারের প্রস্থান।]

প্রধান। যাও বেচোগে, কঙ্কালের ছবি বেচোগে। যাও যাও।

(আবার সেলাই করতে বসে।
নেপথ্যে ঢ্যাঁড়া পেটার শব্দ—কী একটা যেন ঘোষণা করে দেওয়া হচ্ছে।
একটু পরেই ঢোল শহরৎ করতে করতে জনৈক ডোমের প্রবেশ।)

ডোম। (ঢোলে তিনটি ঘা মেরে) আরে বাজারখোলামে খিচড়ি দেওয়া হোবে। ভিখারি লোগোঁ সব বাজারখোলা চলা যাও।

[ডুম, ডুম, ডুম—ঢোলে আবার তিনটি ঘা মারে।]

জনৈক ভিখারি। (কৌতুহলী হয়ে) কোথায় বাবা, কোথায় খিচুড়ি দেবে!

ডোম। বাজারখোলা বাজারখোলা। (ঢোলে তিন ঘা মেরে) বাজারখোলামে খিচুড়ি দেওয়া হোবে ভিখারি লোগোঁ সব বাজারখোলা চলা যাও। (তিন ঘা)

[ঘোষণা শুনে ভিখারিদের মধ্যে একটা সাড়া পড়ে যায়। নিজের নিজের তল্পিতল্পা গুটিয়ে সকলেই বাজারখোলার উদ্দেশ্য রওনা হয় তাড়তাড়ি।]

রাধিকা। (চিৎকার করে ডাকে) ও বিনো, বিনো রে। (কুঞ্জকে) ওগো বিনো কোথায় গেল গো! য়্যাঁ, ও বিনো—দ্যাখো গে সে হয়ত আগে ভাগে গিয়েই বসে আছে, যত সব— ওমা, তা বলে তো যাবে, কী কাণ্ড—

[দু-একজন ভিখিরি ও প্রধান ছাড়া কুঞ্জ রাধিকা প্রভৃতির দ্রুত প্রস্থান। প্রধান কাঁধের ওপর ছেঁড়া কাঁথা, জামা আর বিশ্বের আবর্জনা চাপিয়ে মুখ নিয়ে ডোমের কথার অনুকরণ করতে থাকে।]

প্রধান। বাজারখোলা খিচুড়ি দেওয়া হবে, সব বাজারখোলা চলে যাও। ডুম্, ডুম্, ডুম্। সব বাজারখোলা চলে যাও। ডুম্, ডুম্, ডুম্, ডুম্।

[অন্য ভিখারিদের পিছুপিছু প্রধানের প্রস্থান। জনৈক টাউটের প্রবেশ। লিকলিকে চেহারা। জুলজুলে দৃষ্টি। ঢুকেই পার্কের বেঞ্চের এককোণে বসে বিড়ি টানতে টানতে চারিদিকে নিরীক্ষণ করতে লাগল। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে বিনোদিনী প্রবেশ করল।]

বিনো। ওমা, এরা সব গেল কোথায় গো!

[টাউট মুচকি মুচকি হাসে।]

কী করি এখন। ওগা বাবু, বলতে পারো এরা সব গেল কোথায়? আমি বাবু একটু ভিক্ষেয় বেরিয়েছিলাম। এসে দেখি—এখন কোন দিকে যাই আমি—

টাউট। বলা-তো মুশকিল এখন কোন্ দিকে গেছে ওরা! তা—

বিনো। হায় হায় হায় হায়, কী করি এখন আমি!

টাউট। সঙ্গে কে ছিল তোমার!

বিনো। কী বললেন বাবু?

টাউট। না বলছি বলি সঙ্গে আপনার জন তোমার কারা ছিল?

[বিনোদিনী নিরুত্তর।]

স্বামী আছে তোমার?

বিনো। ছিল, ফেলে চলে গেছে।

টাউট। ফেলে চলে গেল। এই সোনার পারা মুখ তোমার বাছা, ফেলে চলে গেল এমন একলাটি। ভারি অন্যায় কথা। এখন এই শহর-বাজার, মন্দলোকের অভাব নেই—মুশকিলের কথা।

বিনো। (করুণ ভাবে) কী করি এখন বাবু আমি?

টাউট। মেয়েমানুষ তুমি বাছা, কিই বা করতে বলব তোমায়—

বিনো। আপনি বাবু এট্টু সন্ধান করি দিন, বাপ আমার।

টাউট। সন্ধান আমি এখন কোথায় করি বলো তো চট করে। কত লোকই তো এসেছে শহরে! আর তাদের মুখ চিনলেও বা কথা ছিল। সন্ধান করলেই কি আর সন্ধান মিলবে! সে অসম্ভব— আচ্ছা দ্যাখো বাছা, আমি তোমার জন্যে যেটুকু করতে পারি বলি। দ্যাখো, এখানে আমার জানা-শোনা এক ভদ্দরলোকের বাড়ি আছে। বলে কয়ে আমি হয়তো সেখানে তোমার খাবার থাকবার একটা বন্দোবস্ত করে দিতে পারি। এই আর কি টুকিটাকি কাজকর্ম করলে সংসারের, আর দুটি দুটি খেলে, বাড়ির বাবু খুব লোক ভালো, একেবারে শিবতুল্য— এখন কথা কী, যে আপাতত সেখানেই না হয় ক'দিন থাকলে, তারপর এদিকে আমিও খোঁজ পত্তর করে দেখলাম......কী বল?

বিনো। আপনি আমার মা-বাপ বাবু।

[টাউট উঠে দাঁড়ায়।]

টাউট। খাবার থাকবার সেখানে তোমার কোনো অসুবিধে হবার কথা নয়, তবে বড়লোক মানুষ, অগাধ টাকা পয়সা, মাঝে মাঝে একুট আদটু আবদার-টাবদার হয়তো করবে, এই। তা ছাড়া একেবারেই মাটির মানুষ, মন জুগিয়ে চলতে পারলে দেখবে সে তোমার একেবারে........তো নাও, এসো এসো। তোমার ভাগ্যি ভালো বুঝলে, যে, হে হে কী আর বলি, এসো এসো।

[উভয়ের প্রস্থান।]

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যাচ্ছে সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সারবন্দী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বজলি বাতির আলো চঁইয়ে পড়ছে। অন্দরমহল থেকে সানাই এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে— আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুন—বসুন।' তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই

গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিন—অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তুপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না। ডাস্টবিনের আশপাশ থেকে মাঝে মাঝে ক্ষুধ্ধ কুকুরের গোঙানি স্পষ্টভাবে শোনা যাচ্ছে। প্রধানকে খানিকটা স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে। ফটক থেকে খানিকটা দুরে দাঁড়িয়ে বড়োবাড়ির দিকে হাত তুলে কাতর আবেদন জানাচ্ছে সে দুটি ভাতের জন্য। একটু পরে রাধিকাকেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। মুখে তারও দুটি অন্নের কাতর প্রার্থনা। হঠাৎ ডাস্টবিনের কাছটার একটা কুকুর গর্জে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে কুঞ্জও চেঁচিয়ে ওঠে পাশব আক্রোশে। মুহূর্তকাল পরেই দেখা যায় কুঞ্জকে—ক্ষত বিক্ষত হাতটা তুলে ধরে আলোর দিকে এগিয়ে আসছে। দংশন ক্ষত হাত থেকে ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরে পড়ছে মাটিতে। (খন্ডদৃশ্য দুটি দেখাবার জন্য স্পটলাইটের সাহায্য নেওয়া একান্তই বাঞ্ছনীয়)।

বড়োকর্তা। (জনৈক ভদ্রবেশী আগন্তুককে একটা ফুলের মালা দিয়ে সংবর্ধনা করে) এই যে আসুন, আসুন (মুখে হাসি) হেঃ হেঃ আসুন।

[প্রতিনমস্কার জানিয়ে ১নম্বর ভদ্রলোক বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন সরাসরি। গল্প করতে দুই ও তিন নম্বর ভদ্রলোকের প্রবেশ।]

২য় ভদ্রলোক। আসল কথা কী জান ভাই, টাকা, টাকা। টাকায় সব করে। আমাদের বাঙালি বিজনেসম্যানদের টাকা কোথায়! যাও বম্বে, আমেদাবাদ, দেখবে—

[বড়োকর্তাকে দেখে একগাল হেসে]

আরে, লেট করে ফেল্‌লাম নাকি?

বড়োকর্তা। (হেসে) আরে এসো এসো, ভায়া এসো, ভায়া এসো। তারপর মুখুজ্যে কোথায়? নির্মলবাবু এলেন না?

২য় ভদ্রলোক। (হাত তুলে) আসছে, আসছে সবাই আসছে। (পেছনে তাকিয়ে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) আরে, কৈ হে, আবার পেছনে পড়লে ক্যানো! বলি, হ্যাঁ হে মুখুজ্জে।

২য় ভদ্রলোক। তারপর, বড়োবাবু যে একেবারে দেখি—উঃ—হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ।

[নেপথ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি। নির্মলবাবুর প্রবেশ।]

নির্মলবাবু। (এগিয়ে এসে) এই যে দাদা।

২য় ভদ্রলোক। আরে এসো এসো। নির্মলবাবু এসো।

৩য় ভদ্রলোক। ব্ল্যাক আউটের বাজারে চলাফেরা করাই দায়, আর.........

বড়োকর্তা। আর বোলো না ভায়া। একে ব্ল্যাক আউট, তারপর আবার এই ওয়েদার। আমারই দুরদৃষ্ট আর কী! এখন ভালোয় ভালোয় কাজটা—

২য় ভদ্রলোক। হ্যাঁ, তারপর কতজনকে নেমন্তন্ন করলে?

বড়োকর্তা। তা-ভাই হাজার খানেক হবে। ছেঁটে কেটে ওর চেয়ে আর কমতি করা গেল না।

৩য় ভদ্রলোক। পুরোপুরি এক হাজার? বল কী হে, পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজার! ভারতরক্ষাবিধানে লটকে যাবে যে বাবা।

বড়োকর্তা। হ্যাঁ ও বিধান আছে, আইন আছে, আবার আইনের ফাঁকও আছে (হাসি) আর কী করেই বা কম করি বল? এই তো ফ্রেন্ডস্ এণ্ড রিলেশন্ যা এখানে রয়ে গেছে, তাঁদের সংখ্যাই তো তোমার শ' পাঁচেকের কম নয়। তারপর—

[নেপথ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি।]

২য় ভদ্রলোক। তা তো বটেই। তা আর হবে না। এ আর একটা বেশি কথা কী হল। এই তো তোমার গিয়ে গত এপ্রেলে, আমার নাতির অন্নপ্রাশনের সময়, বিয়ে-সাদির মতন সে তো আর তেমন একটা বিরাট কায্যি নয়, তবু ছেঁটে কেটে শ আষ্টেকের কম কিছুতেই করতে পারলাম না। আর এ তো তোমার গিয়ে রীতিমত একটা বিয়ের ব্যাপার।

নির্মলবাবু। তা হলে তো রাজসিক ব্যাপার করে ফেলেছ হে দেখছি রায় মশাই, য়্যাঁ! হাজার খানেক লোক খাচ্ছে, এই বাজারে, চাড্ডিখানি কথা নয়।

১য় ভদ্রলোক। তবে!

নির্মলবাবু। তা জিনিসপত্তর ঠিক মতো জোগাড় করতে পাল্লে তো? কোনো অসুবিধে হয়নি।

বড়োকর্তা। অসুবিধে মানে, চোরাবাজার। চোরাবাজার। চোরাবাজার যদ্দিন আছে ততদিন—

২য় ভদ্রলোক। তার আর কী করবে কী করবে ভাই। সত্যি কথা বলতে গেলে এই চোরাবাজারটি ছিল বলে তাই এখনও কিছুতে আটকাচ্ছে না, নইলে—করবে কী লোকে বল? ব্ল্যাক মার্কেটের সুবিধে না নিয়ে উপায় কী? বেশি কী কথা এই ধরো না সামান্য চিনির ব্যাপারটাই! সংসারে গিন্নি বলেন মাসে অতি কম দেড় মন চিনি তাঁর চা-ই নইলে মানে ওদিকে সে একেবারে বুঝতেই পারছ, ডেডলক, কমপ্লিট ডেডলক। তা এখন কোথায় পাবে তুমি এই চিনি। ওপ্‌ন মার্কেটে যাও, নেই নেই নেই নেই, হাত উলটেই বসে আছে সব দোকানিরা। কোথাও পাবে না তুমি এই চিনি। কী করবে? তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। করব কী বল, পয়সা তো আর সঙ্গে যাবে না।

নির্মলবাবু। সে পয়সা যাদের আছে তারা বলতে পারে এ কথা! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার নেই কি-না?

২য় ভদ্রলোক। দ্যাখো নির্মলবাবু, অত কথা ভাবতে পারব না বুঝলে, অত কথা ভাবতে পারব না। সংসারে অন্যায় অবিচার দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর লাখো লাখো ঘটছে। এখন

সব কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম তো দেখি সব বন্ধ করে দিতে হয়।

নির্মলবাবু। তা দিতে হয় দেবে। তা বলে—যেটা অন্যায় তাকে প্রশয় দিতে হবে?

২য় ভদ্রলোক। দেব! ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ করে দেব! (সহাস্যে) খুব রসিকতা করতে পারো যা হোক তুমি নির্মলবাবু।

[বড়োকর্তা, তৃতীয়ভদ্রলোক সবাই হো হো করে হাসেন।]

বড়োকর্তা। চলো যাই চলো; ভেতরে চলো।

[ভদ্রলোকদের প্রস্থান।]

সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টবিনের কাছে স্পটলাইটটা জ্বলে ওঠে।
কুকুরটা গর্জে উঠে যেন কাউকে কামড়ে দিলে মনে হয় আর্তনাদ শুনে।
দেখা যায় কুঞ্জ তার ক্ষতবিক্ষত হাতখানা তুলে ধরে সামনের দিকে এগিয়ে আসছে।

প্রধান। (অন্ধকারের ভেতর থেকে) দুটো খেতে দাও বাবু। ও বাবারা........

রাধিকা। (সভয়ে) ওমা—একেবারে কামড়ে খেলে গো।

[রাধিকা কুঞ্জর দিকে ছুটে যায় ডাস্টবিনের কাছ থেকে।]

(কুকুরের প্রতি) ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা! (কুকুরকে) দুর হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো। ছাই খা, ছাই খা। দূর—থু থু—

[আক্রোশে থুথু ছিটোতে থাকে। নেপথ্যে কুকুরের গোঙানি শোনা যায়।]

ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো। ইস্—স্—স্।

[ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে একফালি ন্যাকড়া বার করে বেঁধে দেয় কুঞ্জের হাতে।]

প্রধান। (নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড়ো বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচাচ্ছে) আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্য। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু! ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটাকে এক মুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু। বাবু—তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু! ও বাবারা, বাবু—ও বাবারা—

[প্রস্থান]

রাধিকা। (কুঞ্জের হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে) খুব যন্ত্রনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?

কুঞ্জ। না।

কুঞ্জ তাকিয়ে থাকে রাধিকার দিকে সাশ্রুচোখে। রাধিকাও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে ফ্যাল ফ্যাল করে কুঞ্জর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে তারও জল ভরে আসে সব কিছু স্মরণ করে। গভীর মমতায় রাধিকা শুধু কুঞ্জর কপালের ওপর থেকে বিস্রস্ত চুলগুলো সরিয়ে দেয়। হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে ; তারপর বাঁ হাতখানা দেয় রাধিকার মাথার ওপর।

(পটক্ষেপ)

চতুর্থ দৃশ্য

(হারু দত্তের বাড়ি। দুপুরবেলা সামনের-বারান্দায় জলচৌকির ওপর উবু হয়ে বসে তামাক টানছে হারু দত্ত। খানিকটা দুরে বারান্দার এক কোণে জনতিনেক অল্প বয়সী গেঁয়ো স্ত্রীলোক গায়ে কাপড় জড়িয়ে বসে আছে। তাদের মধ্যে দুজন পেছন ফিরে বসে আছে। আর একজন, নাম খুকীর মা—বাল্য বিধবা, হারু দত্তের মুখোমুখি বসে বেশ সপ্রগলভ ভাবেই কথা বলে যাচ্ছে। আর একজন প্রৌঢ় গেঁয়ো লোক উঠোনে বসে আছে।)

হারু দত্ত। (হুঁকোয় বিলম্বিত টান মেরে) গাঁয়ের জন্যে আমি কী করেছি আর না করেছি তা জানে রাজ্যের লোক আর (ওপর তাকিয়ে) ভগবান। বেশি কী বলব। নিজের প্রশংসা নিজে করার তো অভ্যাস নেই কোনোদিন!

খুকীর মা। সে আর আপনি কী বলবেন বাবা। আমরা তো জানি। (প্রৌঢ় ব্যক্তিকে) এই তো তোমার গিয়ে সেবার খুকীর অসুখের সময়। কবেকার কথা বলছি, এই গত কার্তিক মাসের কথা। ঐ যে , যে-বার ঝাড়ের দশটা বাঁশ বিক্রি করে ফেললাম তোমারে দিয়ে হরোর বাপ্!

চন্দর। (চিন্তিত মুখে) দশটা না আটটা!

খুকীর মা। দশটা। না, সে এখনও আবার সঠিক মনে রয়েছে! দশটা বাঁশ আমি তোমারে বেচলাম। তিন টাকা দু আনা দাম হয়, তা তুমি তখন আমারে দিলে তিন টাকা, আর খুচরো ছিল না বলে দু আনা আর দিলে না। তারপর সেই দুআনা আবার কাটান্ গেল তোমার গিয়ে পাঁচ পালি ধানে।—মনে পড়ছে?

চন্দর। (ঈষৎ হেসে মাথা নেড়ে) হ্যাঁ হ্যাঁ, আমারই ভুল হইছিল বটে, ঠিক ঠিক।

হারু দত্ত। (হুঁকো থেকে মুখ তুলে) মোক্তার হলে পারতিস তুই খুকী মা জজ-কোর্টের।

খুকীর মা। (হেসে) তা আজকালকার মেয়েরা তো বাবা আপনিই বলেনযে, লেখাপড়া শিখে পুরুষ মানুষের সঙ্গে সব পাল্লা দিয়ে আপিস্ কাছারি করছে! তা সে রকম শিক্ষে দীক্ষে পেলে বাবাঠাকুর আপনার আশীর্বাদে আমি জজকোর্টের উকিল মোক্তারদের মাথা ঘুরিয়ে দিয়ে আসতাম।

হারু দত্ত। (খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে) তা তুই পারতিস খুকীর মা, তুই যা মেয়ে (স্নেহভরে দূর থেকে চড় তুলে) তোকে একেবারে.......বড্ড দুষ্টু তুই!

খুকীর মা। তা সে যাগ গে, যে কথা বলছিলাম, হ্যাঁ সেই খুকীর অসুখের সময়। পনেরো দিনের দিন মেয়ের তো ঐ অবস্থা! কী করি! গেলাম ছুটে রমানাথ ডাক্তারের কাছে। কত করে বললাম, বলি—চলুন একটুখানি, মেয়েটাকে একবার শেষ দেখা দেখে আসুন ডাক্তারবাবু, ব্যাজ্ঞাতা করি, পায়ে পড়ি! নাঃ, বললে টাকা ফেল তারপর! কী ধম্মডাকাতে লোক গো! কত করে বল্লাম, আজ দিতে পারছি নে টাকা বাবা, দুদিন পরে নেবেন। কিছুতেই না। তারপর কোথায় যাই কী করি, মনে পড়ল বাবাঠাকুর-এর কথা, ছুটে গেলাম। সামনা সামনি বলছি বলে তোমরা হয়তো ভাববে যে বড়ো বাড়িয়ে বলছে মাগী, কিন্তু বাবাঠাকুরের চরণ ছুঁয়ে আমি বলছি—যে এর ভেতরে একরত্তি মিথ্যে নাই।—সে জানেন আমার অন্তর্যামী। (চোখ বোজে) তা সে কী বলব, আমার মুখ দেখেই বাবাঠাকুর জানতে পারলেন। কিছু বলতে হল না। গেলেন; ওষুধ দিলেন, তিন দিনের দিন মরা মেয়ে আমার ঝাড়া দিয়ে উঠল। এমন কী খুকী যে দিন অন্নপত্যি করবে সে দিন নিজে বাড়ি বয়ে এনে চাল পর্যন্ত দিয়ে গেলেন। বল্লেন খুকীর মা, সে রকম পুরোনো চাল তো তোর ঘরে নেই—রাখ এই কটা, খুকীরে দিস। তাও কম করে তোমার সের দুয়েকের কম নয়। —এই রকম দায়ে পড়ে যখনই গিয়েছি, না-বাক্যি কখনও শুনিনি বাবাঠাকুরের মুখে। আর শুধু কি তোমার আমার বেলায়, যে এয়েছে, যে এয়েছে—। তা সে আপনি কী করেছেন আর না করেছেন তা জানি আমরা, আপনি কী বলবেন।

হারু দত্ত। (হুকো থেকে মুখ তুলে) কিছু না, কিছু না। আমি দেখব তোমার আপদে, তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেন!—কী বল চন্দর?

চন্দর। না, তা, সে তো যথার্থই। এর আর কথা কী!

হারু দত্ত। এই যে নিয়ে যাচ্ছি তোমাদের সব, এ কেন। কেন কী দরকার আমার নিয়ে যাবার উদ্যোগ করে! দু-চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তো! না হলে এতে করে আমার কী স্বার্থ আছে বল, য়্যাঁ! গাঁটের পয়সা খরচ করে, এরে ধরে, তারে ধরে কেন কী দরকার আমার? ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াবার দরকার কী! অবিশ্যি হ্যাঁ বলতে পার যে না করলেই পার তুমি—

চন্দর। না—তাই আর একটা কথা হল!

হারু দত্ত। না—এই কথার কথা বলছি। বলি মানুষ তো আর সকলেই তোমার আমার মতো না, মন্দলোকও তো আছে সংসারে, না কী! বলতে পারে—মানুষের মুখ চন্দর তুমি এখন ঠেকাবে কী দিয়ে? আজ্ঞে না, বলে, আস্তে আস্তে ন্যাজ নাড়ে, ঐ বাঘেই তো মানুষ মারে, হুঁ হুঁ—বলতে পারে যে, না করলেই পার তুমি এই পরোপকার। বলে কে তোমারে করতে! কী উত্তর দেবে তুমি এ কথার! অথচ দ্যাখো বোঝে না যে, সব মানুষগুলোই

যদি তাদের মতো হত তো কবে উচ্ছন্নে চলে যেত এই সমাজ সংসার, ধ্বংস হয়ে যেত সব।

চন্দর। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে হারু দত্তর চোখে চোখ রেখে) ধ্বংস হয়ে যেত সব!

হারু দত্ত। তা যেত না? (খুকীর মায়ের দিকে তাকায়)

খুকীর মা। হুঁ হুঁ। (হাসে আর মাথা নাড়ে)

হারু দত্ত। তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। (জোর দিয়ে) তারাই তো চালাচ্ছে এই জগৎটা। অনেক চন্দর, এখনও অনেক জানবার বোঝাবার আছে এই জগতে—তো ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো।

চন্দর । আবার টিপ সই দিতে হবে?

হারু দত্ত। ওরে বাবারে—তা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাই—কথা এই বললে, ফুরিয়ে গেল! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মত এট্টা ইয়ে হয়ে থাকল! তো নাও এসো এসো। আমার আবার ওদিকে—ওরে কই রে।

[চন্দর উঠে এসে হারু দত্তের সামনের কাগজে একটি টিপ সই দেয়।]

চেপে দ্যাও আঙ্গুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঁঃ। যাগগে, ও ঠিক হয়েছে। ওতে কিছু এসে যাবে না। (টিপ-সইটা কাগজ তুলে দেখে) এই তো, দিলে—ফুরিয়ে গেল!

চন্দর। (আবেগ ভরে) বাবা, দেখো আমার মেয়েটা য্যানো—

[কণ্ঠরোধ হয়ে আসে চন্দরের।]

হারু দত্ত। কিচ্ছু বলতে হবে না, কিচ্ছু বলতে হবে না। সে দায়িত্ব যখন নিইছি আমি—

চন্দর। না, তাই বলছি বাবা, তিন বছর বয়সে মা মারা গেছে, তারপর থেকে বলতে গেলে এক রকম নিজে হাতে করেই—(চোখ মোছে) তা আর আমার গর্বের কিছু থাকল না। (কেঁদে ফেলে)

হারু দত্ত। (কৃত্রিম অভিমানের সুরে জোরে) ফের্ আবার তুই মেয়ের জন্যে দুঃখ করছিস! মেয়ে তোর, মেয়ে আমার না!

খুকীর মা। (চন্দরের প্রতি) দুঃখু কর কেন? মেয়ে তোমার ভালোই থাকবে।

হারু দত্ত। য়্যাঁ—আরে কইরে!

[নেপথ্যে 'যাই বাবু'।]

দুত্তুরি তোর নিকুচি করেছে যাই বাবুর! বলি ঘাটে নৌকা এয়েছে?

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। (সপ্রতিভভাবে) তুলে ফেলব বাবু জিনিসপত্তর সব নৌকায়।

হারু দত্ত। তুলে ফেলব—এতক্ষণ কী করছিলি? গিয়েছিস তো সেই কবে।

ভৃত্য। নৌকা আনতে গিছলাম বাবু ঘাটে।

হারু দত্ত। ওঃ গিছলে তো একেবারে উদ্ধার করেছ আমাদের। ব্যাটা হারামজাদা কোথাকার! নৌকা আনতে কতক্ষণ লাগে! ক'দিনের পথ এখান থেকে? আবার মুখে মুখে তক্ক করছে দাঁড়িয়ে! চোখ নামা, চোখ নামা, ব্যাটা ছুঁচো কোথাকার চোখ নামা!—দিনে দিনে পৌঁছুতে না পারি তো দেখিস'খন তখন।

ভৃত্য। তা ভাটা পড়েছে টেনে যাব'খন।

হারু দত্ত। যাবে তো আর এখানে দাঁড়িয়ে রুপে দেখাচ্ছ কাকে, যাও!

[ভৃত্য প্রস্থানোদ্যত]

আর শোন, তিন দাঁড় করতে বলবি।

ভৃত্য। ভাটা পড়ছে, দু দাঁড়েই মেরে দেব'খন.......

হারু দত্ত। না, আর মেরে দিতে হবে না। তিন দাঁড় করতে বল-গে, এ হে-হে-হে। ভৃত্যের প্রস্থান।

[হুঁকোটি হাতে নিয়ে মেয়েদের প্রতি]

তো এগোও, এগোও তোমরা সব আস্তে আস্তে। নে যা খুকীর মা এদের সব।

[মেয়েদের প্রস্থান।]

তা হলে চন্দর, তোমার হল গিয়ে—(ট্যাঁকে কাপড়ের পুঁটলি থেকে নোট বার করে গুনে দেয়) নাও ধর—

[দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভরা চন্দর কুণ্ঠিত হাতে টাকা নেয়]

এখন এই নাও; তারপর ঘুরে আসি আমি—যা দিয়ে যা হয়—(তামাক টানে)

চন্দর। মেয়ে বিক্রি করলাম আমি! মাতিরে আমি বেঁচে ফেললাম। (কেঁদে ফেলে) মাতি, আমার মা, মাতঙ্গিনী—

[চন্দরের প্রস্থান।]

(হারু দত্ত তিন মাথা এক করে জলচৌকির উপর উবু হয়ে বসে টর টর শব্দে তামাক টানে আর চন্দরের দিকে আড়চোখে চেয়ে চেয়ে দেখে।)

(পটক্ষেপ)

পঞ্চম দৃশ্য

সেবাশ্রমের একটি কক্ষ। বিনোদিনী জানলার গরাদ ধরে বাইরের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে; আর নিরঞ্জন ঘরের মাঝখানটার মাটির দিকে মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে

যেন আক্রোশে ফুঁসছে কার ওপর। নিদারুণ একটা প্রতিহিংসা চক্ চক্ করছে নিরঞ্জনের চোখে মুখে।

বিনোদিনীর পরনে মোটামুটি একখানা আধময়লা শাড়ি। নিরঞ্জনের গায়ে ছোট ঝুলের একটা ছিটের হাফ শার্ট, পরনে ন-হাতি একখানা আধময়লা ধুতি। খালি পা, অসংস্কৃত হাবভাবের দরুণ পরিবেশের সঙ্গো মোটেই খাপ খাচ্ছে না যেন কাউকেই।

বিনোদিনী। (হঠাৎ বেগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ক্ষুব্ধ স্বরে) শুধু কি এই! সে নির্যাতনের কথা মুখে বলে বোঝানো যায় না।

নিরঞ্জন। (হাতের তালুতে ঘুষি চেপে) এর প্রতিশোধ আমি—(অস্বস্তিতে হাঁপিয়ে ওঠে) আচ্ছাঃ।

বিনোদিনী। (ভাঙা গলায়) মাখন মরণাপন্ন, দিদির অসুখ, মাঠে মাঠে পাগলের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার দাদা—

নিরঞ্জন। (স্বগত) দাদা!

বিনোদিনী। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তোমার দাদা, কোথায় একটু ওষুধ, কোথায় একটু পত্যি,—আর তোমার জ্যেঠা, তার কথা তো বলবারই না— দিনরাত চব্বিশ ঘন্টা কেবল শ্রীপতি-ভূপতির কথা। ঘুর-ঘুট্টি অন্ধকার, চারদিকে সাপখোপের ভয়, মড়কের দেবতা বাতাসের কাঁধে ভর করে কেঁদে বেড়াচ্ছে আগানে বাগানে সাঁই সোঁ—ঘরের বাইরে বেরুতে সাহস করে না মানুষ—কে কার কথা শোনে, বুড়ো অমনি চল্ল বন-বাদাড় ভেঙে, বলে এট্টু খোঁজ করে আসি আমি শ্রীপতি-ভূপতির। সে দেখাও যায় না, সওয়াও যায় না। আর এই অবস্থার ওপর দত্তর সে কী অত্যাচার! জীবনে আমি কোনোদিন সে-সব কথা ভুলব না!

নিরঞ্জন। গাঁয়ে কী কেউ মানুষ ছিল না যে তার প্রতিবাদ করে!

বিনোদিনী। ছিল, কিন্তু দত্তর ওপর কথা বলে কে? জীবন না তার চলে যাবে অপঘাতে।

নিরঞ্জন। (আক্রোশে) অপঘাতে! তো দেখি আজ কোথায় গিয়ে পড়ে সেই অপঘাত, দেখি (পায়চারি করে)

[রাজীবের প্রবেশ]

রাজীব। (নিরঞ্জনকে লক্ষ করে) আরে পাঁয়তারা ভাঁজিস নাকি রে রাখ—(হঠাৎ বিনোদিনীকে দেখে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) এইডা কী! রাখহরি! (বিনোদিনীকে) তুমি এইহানো আইছ ক্যান! বলি এইহানো তোমার কী প্রয়োজনটা, য়্যাঁ। আচ্ছা বলতো দেখি বাবু দ্যাখলে কী কইতো। যাও ভিতর যাও। যাও কইত্যাছি আমি তোমারে ভিতরে যাও। যাও।

[নতমুখে বিনোদিনীর প্রস্থান।]

রাখহরি! সুট সুট কইর‍্যা ঘরে ঢুইক্যা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ চুপ কইর‍্যা আছস্ অহন, কথা যে কস্ না বড়!

নিরঞ্জন। কী সুট সুট করে ঘরে ঢুকে!

রাজীব। কী তা জানস্ ভালো তুই, আমারে জিগাস করে আহাম্মক। কইত্যাছিলা কি তুই ওয়ারে! ভাবস্ বুইড়্যা কিছু ঠাহর পায় না, না......বেটা প্রেমালাপ করনের আর জায়গা পাইলা না!

নিরঞ্জন। চেঁচাবেন না আপনি শুকনের মতো। আমরা অন্য কথা বলছিলাম।

রাজীব। (দুটো কাঁধ একটু তুলে) কী, কী কইলি! শকুন, আমি চেঁচাই শকুনের মতো, নাকি! খারা তোর ত্যারা ত্যারা কথা আমি ছুটাইয়া দিত্যাছি; খারা। (ঘুরে দাঁড়িয়ে) সিংহের মুখের খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিচ্ছিস তাইতো! বাবু তোরে আজ করে কী দেহিসনে........বেটা ছুটলোক আস্পর্ধা পাইলে কী আর রক্ষা আছে না!

[বেগে কালীধনের প্রবেশ]

কালীধন। সরকার মশাই যাবেন না দাঁড়ান আপনি। (নিরঞ্জনকে) দাঁড়াও তুমি। (রাজীবের প্রতি) জ্ঞানদার কাছ থেকে আমি কিছু কিছু শুনতে পেয়েছি। ব্যাপার কী আমায় খুলে বলুন সরকার মশাই। বলুন, গোপন করবার দরকার নেই আমার কাছে বলুন!

রাজীব। (মাথা চুলকে) কবা বা কী! কী রে রাখহরি, কথা যে কস্ না অহন, জবাব দে!

কালীধন। (নিরঞ্জনের প্রতি) তুমি জানো এটা সেবাশ্রম!

রাজীব। আমি তো তোমারে বরাবরই কইয়্যা আসত্যাছি কালীধন যে এই ছুটলোকগুলোরে তুমি কখনই প্রশ্রয় দিবা না। তা তো শুনবা না; তা তোমার শোননের জো নাই। আরে এগুলা কি মানুষ!

[নিরঞ্জন রাজীবের প্রতি কটাক্ষ করে।]

কালীধন। (নিরঞ্জনের প্রতি) বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও তুমি এই মুহূর্তে এখান থেকে। তোমার মত কর্মচারী আমার কোনো দরকার নেই। (প্রচণ্ড ধমকের সুরে) বেরিয়ে যাও তুমি এখান থেকে।

[নিরঞ্জনের প্রস্থান। বেগে বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদিনী। আমি যাব, আমাকে ছেড়ে দাও। দাও, আমাকে ছেড়ে দাও আমি যাব।

রাজীব। (বাধা দিয়ে) আরে এইডা কী কর! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দর মহলে। বাইরে যাবা ক্যান। যাও ভিতরে যাও।—কী আশ্চর্য!

বিনোদিনী। ছেড়ে দাও, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও, আমি যাব।—যেতে দাও আমাকে।

কালীধন। জ্ঞানদা!

[জ্ঞানদার প্রবেশ।]

(ইঙ্গিত করে) ভেতরে নিয়ে যাও ওকে।

জ্ঞানদা। (বিনোদিনীর হাত ধরে) চ, আহা ও রকম করতে নেই চ, আ—য়!

[বিনোদিনীর হাত ধরে জ্ঞানদার প্রস্থান। রাজীব গমনোদ্যত]

কালীধন। সরকার মশাই! আপনি ওর পাওনা-গণ্ডা যা হয় মিটিয়ে দিন এক্ষুনি যেমন করে হোক। ওকে আর এখানে রাখা চলবে না—ঘরের লোক যদি বিশ্বাসঘাতক হয় তো—

রাজীব। আরে আমিও তো তাই কই। বলে এই ছুটলোকগুলোরে তুমি প্রশ্রয় দিবা না। কিন্তু তা তো শুনবা না, তোমার যত কারবার হইল এই সব ছুটলোকগুলার সঙ্গে। আরে এগুলো কি মানুষ!

কালীধন। আচ্ছা সে আপনাকে দেখতে হবে না, যান, যা বললাম তাই করুন গিয়ে, যান।

রাজীব। আরে যাইতেছি, আমার লাইগ্যা কি? আমি তো যাইয়াই আছি, হ-অ-অ—

[প্রস্থান।]

কালীধন। হ্যাঁ, তাই যান এখন।.........আচ্ছা কারবার যা হোক। ধীরে সুস্থে যে একটু গুছিয়ে বসব আর কাকেই বা কী বলি; হয়েছেই যত সব।

[একটা বড়ো কুশান চেয়ারে গা এলিয়ে দিল।]

এই কে আছিস্!

[জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।]

ভৃত্য। (সেলাম করে) বাবু।

কালীধন। আচ্ছা কী করিস তোরা সব ওখানে বসে বসে বলত, ডেকে ডেকে সাড়া পাওয়া যায় না!

ভৃত্য। আজ্ঞে সঙ্গে সঙ্গেই তো এসে পড়েছি!

কালীধন। সঙ্গে সঙ্গেই?

ভৃত্য। আজ্ঞে—

কালীধন। চুপ চুপ। বিকেলবেলা কে ছিল, গেটে?

ভৃত্য। বিকেলবেলা, আজ্ঞে আমিই ছিলাম।

কালীধন। রাখহরি এখানে এসেছিল কখন?

ভৃত্য। আজ্ঞে সে তিনি তো এয়েছেন সেই দিনমানে।

কালীধন।	দিনমানে!

ভৃত্য।	আজ্ঞে।

কালীধন।	হুঁ, কিন্তু আর কখনও যেন ওকে সেবাশ্রমে ঢুকতে দেওয়া না হয়!

ভৃত্য।	ঢুকতে দেব না!

কালীধন।	না, তবে আর বলছি কী, ঢুকতে দিবি নি।

ভৃত্য।	যে আজ্ঞে।

কালীধন।	আমাকে জিজ্ঞেস না করে কাউকে নি।

ভৃত্য।	আজ্ঞে হ্যাঁ।

কালীধন।	হ্যাঁ, ঠিক থাকে যেন।

ভৃত্য।	আজ্ঞে।

কালীধন।	আর রামরতনবাবু এলেই আমাকে একবার—

[নেপথ্যে ঘোড়ার খুরের শব্দ ; বাইরে তাকিয়ে ভৃত্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে যায়।]

কী দেখছিস ও দিকে!

ভৃত্য।	আজ্ঞে ঘোড়ার গাড়ি করে কারা যেন এলেন মনে হচ্ছে।

কালীধন।	ঘোড়ার গাড়ি করে!

ভৃত্য।	(একটু লক্ষ করে) আজ্ঞে ঠিক চিনতে পাচ্ছি নে। তবে তিন চারদিন আগে এই দুপুরবেলার দিকে কোট পরা একজন বাবু মতো লোক এইছিলেন, দেখতে অনেকটা তাঁরই মতো— সঙ্গে আবার দু'জন (ভালো করে তাক করে) হ্যাঁ দুজনাই তো, মেয়ে-নোকও রয়েছে দুজনা।

কালীধন।	মেয়ে লোকও আছেন! (উঠতে উঠতে) ঘোড়ার গাড়ি করে মেয়ে লোক! কে আবার এল চল্ চল্ তো দেখি।

[ভৃত্যসহ কালীধনের প্রস্থান ত্রস্তে নিরঞ্জন ও বিনোদিনীর প্রবেশ।]

বিনোদিনী।	(চাপা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে) কারা?

নিরঞ্জন।	(ঠোঁটে আঙুল ছুঁইয়ে) চুপ। দত্ত। সেই হারু দত্ত।

বিনোদিনী।	হারু দত্ত!

নিরঞ্জন।	(শব্দ করে) স্-স্-স্! এই বাবু ওর মহাজন কি না! তাই মাঝে মাঝে আসে এখানে। কিন্তু মেয়ে দুটো—

[বিস্মিতের ভঙ্গিতে তাকায়।]

বিনোদিনী। কারা ওরা?

নিরঞ্জন। ঠিক ঠাওর করতে পারছিনে, তবে দুরে থেকে মুখের আদলটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কোথায় দেখেছি দেখেছি। ঠিক স্মরণে আসছে না। তবে দত্তর সঙ্গে যখন এয়েছে তখন ও আমাদের গাঁয়ের মেয়ে না হয়ে যায় না। উঃ শালা—যাক ঠিক আছে এইবার সব কটাকে এক সঙ্গে পেঁচিয়ে —দাঁড়াও।

বিনোদিনী। (অপ্রস্তুত ভাবে) কী করবে কী?

নিরঞ্জন। কিছু না, তুই চুবো। শোন, একেবারে ভেতরে চলে যাবি, ভেতরে গিয়ে চুপ করে বসে থাকবি, বুঝলি? কারো সঙ্গে কোনো কথা কি অন্য কিছু বলবার দরকার নেই। একেবারে চুপ। আমি চল্লাম।—

[গমনোদ্যত]

বিনোদিনী। আচ্ছা......কিন্তু তুমি চললে কোথায় তুমি?

নিরঞ্জন। সে বলব'খন পরে, কিন্তু ঐ যা বললাম, যা পালা শিগগির—

[নিরঞ্জনের দ্রুত প্রস্থান]

[জ্ঞানদার প্রবেশ।]

জ্ঞানদা। ওমা আমার কী হবে গো! তুই এখানে এমন একলাটি দাঁড়িয়ে কেন লা। যা ভেতরে যা, ভেতরে যা। ভদ্দরলোকেরা আসবে এখন, যা ভেতরে যা!

[বিনোদিনীর প্রস্থান।]

(বাইরে তাকিয়ে বড়ো বড়ে চোখ করে) আবার কে এল গা, কারা? (একটু দেখে ঠাওর করতে না পেরে) যাগ্‌গে বাবা, অত কথায় কাজ কী আমার, য়্যাঃ।

[হাত-ধরাধরি করে হারু দত্ত ও কালীধনের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটা টেনে ত্রস্ত পায়ে জ্ঞানদার প্রস্থান।]

কালীধন। (হাসতে হাসতে) তাই আমি ভাবি, যে সেই যে গেল দত্ত—এ দত্তর চিঠি নেই পত্তর নেই। ওরে তামাক দে রে।

হারু দত্ত। (হেসে) আরে ভাই সে ঝামেলার কথা আর বল কেন! এই দেব দিচ্ছি করতে করতেই সকাল থেকে রাত এগারটা অবধি নিঃশ্বেস ফেলবার সময় পেইছি কোনোদিন! ওদিকে মহাজনের তাগিদ, কন্ট্রাক্টরের চাহিদা, তারপর আবার তোমার গিয়ে এই—(হেসে) একেবারে ব্যতিব্যস্ত সদা সর্বদা।

কালীধন। মহাপুরষ তুমি হারু দত্ত। এতগুলো তাল তুমি সামলাও কী করে এক হাতে। চাড্ডিখানি কথা নয়।

হারু দত্ত। সামলাতে হয় ভাই ; সামলাতে হয়। না সামলে উপায় কী বলো! খেটে যখন খেতে হবেই তখন..........

কালীধন। (সহাস্যে) উ—ঃ—ঃ বড্ড জোর বলেছ হে য়্যাঁ, আরে তা হলে আমরা দাঁড়াই কোথায়!

হারু দত্ত। (কালীধনের উরুতে ঠেলা মেরে) যাঃ, কী যে বল মাইরি.......

কালীধন। তা বেশ তো হল, এইবার শহরে একখানা বাড়ি-টাড়ি, বল তো দেখি—সস্তায়-মস্তায় করে দি। লোক আছে আমার হাতে।

[আন্তরিকতার আধিক্য হেতু হারু দত্তের গলার ঘামাচি মেরে কালীধন দত্তর মুখের দিকে চেয়ে রইল।]

হারু দত্ত। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) কী, শহরে বসবাস! না বাবা, ও আমার ধাতে সইবে না। আরে ভাই আমরা হচ্ছি তোমার যাকে বলে গিয়ে জাত গেঁয়ো লোক, ও শহরে চালচলন বরদাস্ত হবে না আমাদের ধাতে।

[ভৃত্য তামাক দিয়ে গেল।]

কালীধন। (হারু দত্তর গায়ে ঠেলা মেরে) গেঁয়ো চালচনটা কী রকম! (খ্যাক খ্যাক্ করে হাসি) গেঁয়ো চালটা শহরে চালের চেয়ে কী কম বাবা—(আরও হাসি) উ-রি বাবারি বাবারি; আশ্চর্য করে দিলে তুমি আমায়—

[সহসা মুখের হাসি মুখেই মিলিয়ে গেল।]

[দারোগা ও জনকয়েক কনস্টেবল সহ নিরঞ্জন এবং কতিপয় ভদ্রব্যক্তির প্রবেশ।]

দারোগা। আপনার নাম কালীধন ধাড়া?

কালীধন। (দারোগার দিকে তাকিয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ, কিন্তু—

[হারু দত্তের দিকে তাকায়।]

দারোগা। আশ্চর্য হলে নাকি!

কালীধন, হারু দত্ত অপ্রস্তুতভাবে উঠে দাঁড়ায়। হারু দত্তর চোখ দুটো বড় হয়ে ওঠে শঙ্কায়।

কালীধন। তা আপনারা এখানে...

দারোগা। হ্যাঁ, আমরা বুঝতে পারছেন না, (হারু দত্তকে) আপনার নাম কী?

হারু দত্ত। এই সেরেছে, (দারোগার দিকে ঘুরে অপ্রতিভভাবে) আমার নাম বলছেন?

দারোগা। হ্যাঁ হ্যাঁ, কী নাম আপনার—

হারু দত্ত। আমার নাম হারানচন্দ্র দত্ত।

১ম ভদ্রলোক। হারানচন্দ্র দত্ত! কেষ্ট ঠাকুরের শত নাম।

দারোগা। পুরানচন্দ্র দত্ত হারু দত্ত, কেমন?

হারু দত্ত। (থতমত খেয়ে) আজ্ঞে হ্যাঁ।

দারোগা। হুঁ, (কালীধন ও হারু দত্তর প্রতি) মেয়েদের কোথায় রেখেছেন?

কালীধন। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) মেয়েদের? কী বলছেন স্যার! এটা সেবাশ্রম।

দারোগা। হ্যাঁ, তা সেবাশ্রমে মেয়ে থাকবে না?—বিশেষ উদ্যোগী যখন আপনারা, য়্যাঁঃ! বলুন বলুন চট্ করে বলুন, নইলে ফ্যাসাদে পড়তে হবে বলে দিচ্ছি। বলুন।

১ম ভদ্রলোক। ধান চালের কারবারের সঙ্গো সঙ্গো সবার সাত রকম ব্যবসা ফেঁদে বসেছে দেখছি। সাংঘাতিক খুনে তো।

দারোগা। বলুন! (রাখহরির প্রতি) কই, যাও তো তুমি কনস্টেবলদের নিয়ে ভেতরে গিয়ে বার করে নিয়ে এসো সব মেয়েদের।

নিরঞ্জন। এসো তোমরা সব আমার সঙ্গো।

[কনস্টেবলগণ ও নিরঞ্জনের প্রস্থান।]

ভদ্রলোক। উঃ, একেবারে চারদিক থেকে লক্ষ্মীলাভের ব্যবস্থা আর কী। ধানচালের কারবারের সঙ্গো সঙ্গো সবার... এই লোকটাই তো সেদিন মশাই আমাকে চাল দেয়নি। অথচ গুদামজাত করে রেখেছে যে কত হাজার মণ চাল তার ইয়ত্তা নেই। কিন্তু চান, দেখবেন অমনি হাত উলটে বলবে—নেই। ঠগ কোথাকার!

[দারোগা সব নোট করে নেয়।]

কালীধন। বলুন, বলে নিন। আমাদের কথার যখন কোনো মূল্যই নেই তখন—

ভদ্রলোক। মূল্য নেই, মূল্য রেখেছ? খুনে কোথাকার! (দারোগার প্রতি) দেখুন না মশাই, মাঝে মাঝে এমন ভাব দেখায় যেন সাধু পুরুষ সব, যত অন্যায় অত্যাচার করছি আমরা ওদের ওপর। উঃ, সার্থক জোচ্চোর তোমরা বাবা। ভিটেয় ঘুঘু চরাতে তোমরাই পারো।

দারোগা। (ভদ্রালোকের প্রতি) আঃ!

[নিরঞ্জন, চন্দরের দুই মেয়ে, বিনোদিনী, জ্ঞানদা, রাজীব, কনস্টেবলদ্বয় ও ভৃত্যের প্রবেশ। এই সমস্ত লট!]

নিরঞ্জন। না, (চন্দরের দুই মেয়েকে দেখিয়ে) এই এঁরা দুজন হচ্ছেন আমাদের গাঁয়ের মেয়ে, ঐ দত্ত এদের চুরি করে নিয়ে এসেছে।

হারু দত্ত। চুরি করে আনেনি দত্ত।

দারোগা। আপনি চুপ করুন। (নিরঞ্জনকে) হ্যাঁ তারপর বল।

নিরঞ্জন। (বিনোদিনীকে দেখিয়ে) আর উনি হচ্ছেন আমার ইস্ত্রী। পেটের দায়ে শহরে এসে উঠলে পরে ঐ বাবুর লোকদের চোখে পড়ে এখানে এসে ওঠে।—আমি এখানে ঐ বাবুর দোকানেই একজন গোমস্তা—তাই হঠাৎ একদিন সাক্ষাৎ হয়ে যেতেই আমি বল্লাম বলি তুমি এখানে তা বললে—

দারোগা। যাক সে উপন্যাস পরে শোনা যাবে। আপাতত তুমি বলছ যে উনি তোমার স্ত্রী কেমন?

নিরঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, ধর্মকথা। (বিনোদিনীকে) কী গো বল না!

[বিনোদিনী নড়ে চড়ে দাঁড়ায়।]

দারোগা। (হেসে) যাকগে, তারপর, তুমি এই বাবুর গোমস্তার কাজ করতে?

নিরঞ্জন। আজ্ঞে হ্যাঁ, চালের গুদোমে কাজ করতাম।

দারোগা। গুদোমে মানে দোকানে।

নিরঞ্জন। হ্যাঁ তা, মানে আমি গুদোমেই কাজ করতাম কিনা।

দারোগা। গুদোমে, তা কী পরিমাণ চাল আছে এখনও সেখানে?

[হঠাৎ চাঞ্চল্য দেখা যায় কালীধনের চোখে-মুখে]

নিরঞ্জন। তা সে বিস্তর মণ।

ভদ্রলোক। বিস্তর মণ মানে আন্দাজ কত মণ।

নিরঞ্জন। তা সে আপনার গিয়ে সওয়া লাঘ মণটাক হবে।

দারোগা। স-ও-য়া লা-খ মণ!

নিরঞ্জন। (থতমত খেয়ে) মানে আমি এট্টা আন্দাজে বললাম কম বেশিও হতে পারে।

দারোগা। দ্যাট্‌স্ অল্ রাইট। (রাজীবকে লক্ষ্য করে, নিরঞ্জনকে) উনি কে?

নিরঞ্জন। উনি ঐ বাবুর ডান হাত, সরকার মশাই।

ভদ্রলোক। (শ্লেষভরে) উনি নাকি আবার জজ ম্যাজিস্ট্রেট সব ট্যাঁকে রাখেন বলেন।

দারোগা। আচ্ছা!

রাজীব। এই আমি ঐ কথা কই নাই।

দারোগা। চুপ করুন আপনি। (কনস্টেবলগণকে) এই তিনোকো হাতকড়ি লাগাও।

(কনস্টেবলগণ কালীধন, হারু দত্ত ও রাজীবকে হাতকড়ি পরিয়ে দিল।
হারু দত্ত ও কালীধন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আকারে ইঙ্গিতে
এমন ভঙ্গি করল যেন হাতকড়ি ছাড়িয়ে আসতে তাদের কোনোই অসুবিধে হবে না।)

৮৬.১০ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ দ্বিতীয় অঙ্ক)

যুদ্ধ বন্যা মহামারী আর এরই কোলে স্বচ্ছন্দ বর্ধিত, কালনাগ রূপ হারু দত্তের অত্যাচারে অতঃপর প্রধান সমাদ্দার হয় ঘর ছাড়া, গ্রাম ছাড়া। গোটা পরিবারটা অসহায়তার সমুদ্র সাঁতরে এসে ওঠে শহরের এক পার্কে। অসংখ্য ভিখিরিদের ভিড়ে আত্মসম্মান বোধটুকু বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছিল সকলে একসঙ্গো মিলে। সেখানেও অশমি সম্পাত ঘটে গেল। এই অশনি সম্পাতে গোটা পরিবারটা বিশ্লিষ্ট হয়ে গেল দুটি টুকরোয়। বাজার খোলায় খিচুড়ি দেওয়া হবে, অন্যান্য ভিখিরিদের সঙ্গো সেই দিকে যায় কুঞ্জ, রাধিকা। আর ঘটনার অভিঘাতে মস্তিষ্কের ভারসাম্যবিহীন সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বয়স্ক প্রধান সমাদ্দারও অন্যান্য ভিখিরিদের পিছু পিছু সেও কোথায় যায়। ক্ষুধার আতিসহ্য দুর করবার আত্যন্তিক আগ্রহে তারা সকলেই বিস্মৃত হয়ে গেছে বিনোদিনীর কথা। বিনোদিনীকে তাই পিছনে ফেলে চলে গেল তারা। ‘এমন সময় হন্দদন্ত হয়ে বিনোদিনী প্রবেশ করল।’ কুঞ্জ, রাধিকা, প্রধানকে না দেখে অবাক হ’ল। ‘ওমা এরা সব গেল কোথায় গো।’

[দ্বিতীয় অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য]

অতঃপর বিনোদিনী গিয়ে পড়ল টাউটের পাল্লায়। সে অসহায় বিনোদিনীকে খাবার থাকবার বন্দোবস্ত করে দেবার নাম করে নিয়ে এসে তুলে দিল কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রমে।

কালীধন ধাড়া একজন চালের চোরাকারবারী। সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধের অবদান। অল্প পয়সায় চাল কিনে গুদামজাত করে সে বেশি পয়সায় বিক্রি করে গুপ্তপথে। তার গুদোমে চালের যোগান দেয় দালাল হারু দত্ত। সেও টাকার লোভ দেখিয়ে গ্রাম থেকে ধান চাল সংগ্রহ করে সবিশেষ কম দামে, অভাবের সুযোগে লোককে ঠকায় আবার সুযোগমত জমি ধরে টান মারে। নিজের জন্যে মোটা মুনাফা রেখে কালীধনের গুদামে তুলে দেয় বস্তা বস্তা চাল। কালীধন তার ওপর লাভের মোটা অঙ্ক চাপিয়ে দাম বাঁধে আকাশছোঁয়া, সাধারণ মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় চাল। এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। কেবলমাত্র সস্তা হয়ে যায় মানুষের জীবন। গরীব দুঃস্থ বাবার অবিবাহিত মেয়ে বা অভাবগ্রস্ত স্বামীর অল্পবয়সী বৌ অতি সস্তায় চলে আসে কালীধনের সেবাশ্রমে। হারু দত্ত চালের চোরাকারবারের সঙ্গো এ কারবারটাও করে গুছিয়ে। সেও চালের সঙ্গো অল্পবয়সী মেয়েদের কিনে নিয়ে কালীধনের সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে।

কালীধনের এই সেবাশ্রমে হারু দত্তছাড়া মেয়ে সরবরাহ করবার জন্য অনেক দালালচক্র শহরের অলিগলিতে, পথে পার্কে ঘোরাফেরা করে। এমনি এক দালাল সমাদ্দার পরিবার থেকে বিশ্লিষ্ট বিনোদিনীকে পার্ক থেকে তুলে এলে কালীধনের সেবাশ্রমে বিক্রি করে দিয়ে যায়! এখানে বিনোদিনী অতর্কিতভাবে মিলিত হয় তার স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গো।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

নিরঞ্জন প্রধান সমাদ্দারের কনিষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র। সে সমাদ্দার পরিবারে বিপর্যয়ের পূর্বে স্ত্রী এবং অন্যান্যদের ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল উপার্জনের আশায়। বাড়ি থেকে চলে এসে কাজ নিয়েছিল কালীধন

ধাড়ার চালের গুদামে। হঠাৎ একদিন চালের গুদাম থেকে এসে উঠেছিল কালীধন ধাড়ার সেবাশ্রমে। এখানেই সে মিলিত হয় বিনোদিনীর সঙ্গে।

বিনোদিনীর কাছে সেবাশ্রমের অবৈধ এবং ন্যক্কারজনক বিবরণ শুনে সে ক্ষিপ্ত হয়। ফন্দি আঁটে বিনোদিনীর সঙ্গে। থানাতে গিয়ে সেবাশ্রমের সমস্ত নোংরা বিবরণ, কালীধনের গুদোমে গুদামজাত চালের পরিমাণ এবং কালো বাজারে সেই চাল বেশি দামে বিক্রির বিবরণ পেশ করে। সেই সঙ্গে চাল ও মেয়ে সরবরাহকারী হারু দত্তের নামও উল্লেখ করে। ঘটনাচক্রে সেই ব্যক্তিটিও থানায় এসে পড়ে, যে কালীধনের চালের দোকানে চাল কিনতে গিয়ে কালীধনের চাহিদামত অর্থ দিতে পারেনি বলে একদিন বিতাড়িত হয়েছিল।

সমস্ত বিবরণ শুনে দারোগা সাক্ষীসহ নিরঞ্জনকে নিয়ে অতর্কিতে কালীধনের গুদামে হানা দেয়। সেইদিনই হারু দত্ত দুটি কিশোরীকে তার অভাবী বাবার কাছ থেকে অল্প টাকায় কিনে এনে তুলেছিল কালীধনের সেবাশ্রমে। দারোগা বামালসমেত কালীধন এবং হারু দত্তকে ধরে ফেলে। হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যায়।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য]

নিরঞ্জন বিনোদিনী তারপরে চলে আসে তাদের গ্রামে, আমিনপুরে। বন্যা এবং দুর্যোগ তখন কেটে গেছে। গ্রামে ফিরে তারা তাদের ভাঙা ঘরখানা জুড়ে তেয়ে "আবার বাসোপযোগী করে নিয়েছে।" গ্রামে থাকা বা ফিরে আসা চাষীদের সঙ্গে মিলেমিশে মাঠে চাষ করে। ফসল কেটে ঝেড়ে ধান গোলায় তোলে।

অপরদিকে, প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা পার্ক থেকে পথে পথে ঘুরতে ঘুরতে লোকের বাড়ি উচ্ছিষ্ট ও ফ্যান ভিক্ষে করতে করতে এসে পড়ে এক বড়লোকের বিরাট বাড়ির সামনে। সেদিন সে বাড়িতে বিবাহের বিরাট উৎসবের আয়োজন। বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে একমুঠো ভাতের জন্য অনেক চিৎকার করে। কাতর প্রার্থনা জানায় একটু খাবারের জন্য। প্রধান নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড়ো বাড়ির দিকে হাত তুলে চেঁচাতে থাকে, 'আর কত চেঁচাব বাবু দুটো ভাতের জন্যে। তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু—কিছু কানে শোন না? অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু! ও বাবারা—বাবু—কত অন্ন তোমাদের রাস্তায় ছড়াছড়ি যাচ্ছে বাবু, আর এই বুড়ো মানুষটারে একমুঠো অন্ন দিতে তোমাদের মন সরে না বাবু! বাবু—তোমাদের কি প্রাণ নেই বাবু! ও বাবারা, বাবু—ও বাবারা... ' কিন্তু বিবাহের উৎসবে মত্ত মানুষদের কানে সে কাতর প্রার্থনা পৌঁছয় না।

[দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

বাড়ির বড়ো কর্তা এবং তার বড়লোক বন্ধুরা তখন পারস্পরিক বৈভব আর প্রাচুর্যের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতায় উন্মত্ত। ভিখিরিদের প্রতি একটু করুণা বিতরণের সহৃদয় অন্তঃকরণটা চোরাপথে উপার্জিত তাদের ঐশ্বর্যের চাপে বিকৃত বিকলাঙ্গ হয়ে গেছে। এখান থেকে একরাশ নৈরাশ্য আর হতাশা বুকে নিয়ে পেটভর্তি ক্ষুধায় কাতরাতে কাতরাতে কুঞ্জ আর রাধিকা এসে ওঠে এক লঙ্গারখানায়। এখানে আসবার আগে প্রধান মানসিক চাপে, অনেকটা ভারসাম্য হারিয়ে দলছুট হয়ে গিয়েছিল।

৮৬.১১ মূলপাঠ ৪ — নবান্ন ঃ তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(নিখরচার লঙ্গরখানা। ম্যারাপের থামে পোস্টার লটকানো—ফ্রি-কিচেন। মঞ্চের গভীরে বহু নিঃস্ব নিরন্ন ভিড় করে বসে আছে। চুপ করে নেই কিন্তু কেউ-ই। কথায় বার্তায় ভাবভঙ্গিতে সবাই মুখর করে তুলেছে পরিবেশ। সামনের দিকে দেখা যাচ্ছে কুঞ্জ ও রাধিকাকে। হঠাৎ নেপথ্যে থেকে জনৈক ভিখারিনীর তীব্র আর্তকণ্ঠ শোনা যায়। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উৎকর্ণ হয়ে ওঠে অঝানা শঙ্কায়। কারো কারো চোখ দুটো বড়ো বড়ো হয়ে মুখটা ফাঁকা হয়ে যায়। জনৈক রোগশীর্ণ বৃদ্ধ ভিখারী তিন মাথা এক করে বসে কাশে, কাশে আর মাঝে মাঝে মুখ তুলে বিশ্ব সংসারের পায়ের তলা থেকে মাথা পর্যন্ত চেয়ে দেখে।)

১ম ভিখারিনী। (নেপথ্যের চিৎকার ক্ষীণতর হয়ে এলে) দ্যাখো দিনি কাণ্ড হুঃ (আশেপাশের পাঁচ জনের প্রতি) আচ্ছা, নিবি তো সব একসঙ্গে করে ধরে নিয়ে যা না বাপু, য্যাঁ. সেই না কথা! তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কী রকম ধারা বে আক্কেলে কাণ্ড! (চেঁচিয়ে মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এট্টা প্রাণে এট্টা কথা বলল না!

১ম ভিখারি। (উৎকর্ণ হয়ে) তা চেঁচাচ্ছে কেন, ওরকম করে?

১ম ভিখারিনী। ওমা, ধরে নিয়ে যাচ্ছে তা চেঁচাবে না। কী বলে!... ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে সব ইনজিশন দিয়ে দিচ্ছে। আমি জানি।

জনৈক বৃদ্ধ ভিখারি। (কাশতে কাশতে) ও সব ধরে নিয়ে যাবে। কেউ থাকবে না। এইবার যে যেখানে পারো পালাও! পালিয়ে যাও সব। নইলে যে ভাবছ নঙ্গারখানার ভিতরি আছ বলে তোমাদের সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাবে, হে হে হে হে (হেসে) সে ভেবো না মনে। ও সব ধরে নিয়ে যাবে। পালিয়ে যাও এইবার। সময় থাকতে চলে যাও! সময় থাকতে চলে যাও সব।

কুঞ্জ। যাচ্ছে নিয়ে কোথায় সব নরি ভরতি করে!

২য় ভিখারি। কী জানি! কেউ বলছে ধরে ধরে নাকি সব যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ বলছে সমত্থ চাষী লোক যারা তাদের সব দেশ ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে!

১ম ভিখারিনী। ইনজিশন্ দিয়ে আবার মেরেও ফেলছে অনেক।

কুঞ্জ। দূর ও মিথ্যে কথা।

২য় ভিখারি। না তা বলা যায় না, হতে পারে।

কুঞ্জ। পাগল, না মাথা খারাপ। আরে যে ইনজিশনে মানুষ মরে, প্রাণঘাতী হলেও তো

তার নিজস্ব এট্টা দাম আছে। আর তোমার আমার জীবন—কী দাম আছে এ জীবননের? কিছু না। এমনিই বলে তাই উজোড় হয়ো গেল, য্যাঁঃ।

২য় ভিখারি। তো নরি ভরতি করে নিয়ে যাচ্ছে কোথায় সব ধরে-ধরে?

৩য় ভিখারি। শুনি তো অনেক কথাই। কেউ বলে ধান নাকি এবার এত হয়েছে যে কাটবার পর্যন্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চাষী লোকদের সব গেরামে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আবার শুনছি—

কুঞ্জ। তার চাইতে ও নিজের থেকে হেঁটে চলে যাওয়াই ভালো, একেবারে পায়দলে। কাজ কী গিয়ে মিছে অত হাঙ্গামায়।

২য় ভিখারি। হ্যাঁ, ও নরিতে করে আবার কেডা কোন্‌দিকে নিয়ে যায় তার ঠিক নেই!

কুঞ্জ। (হাত তুলে) হ্যাঁ এই বাগে একেবারে সিধে গিয়ে ওঠ উত্তরে, নেই কোনো ঝামেলা।

২য় ভিখারি। কোন্ দিকে বললে?

কুঞ্জ। (হাত দিয়ে ইঙ্গিত করে) কেন সোজা এই উত্তরে।

২য় ভিখারি। তোমাদের উত্তরে? আমাদের দক্ষিণে। পাঁচ মহল্লার নাম শুনছ!

কুঞ্জ। পাঁচ মহল্লা।

২য় ভিখারি। হ্যাঁ, তা দূর আছে এখান থেকে।

বৃদ্ধ ভিখারি। সেই কথাই তো ভাবি, যে নড়ে বসতে পারিনে, অথচ এতটা পথ এ আমি কেমন করে পাড়ি দেব? কী গতি হবে আমার? (কাশতে কাশতে) না শেষ পর্যন্ত রেখে যেতে হবে হাড় কখানা এখানেই—(আর্তকণ্ঠে) তোমরা সব চলে যাও। আমারে ছেড়ে চলে যাও, ভুলে যাও আমারে। ভোল আমারে—

[নেপথ্যে ঘন্টাধ্বনি।]

২য় ভিখারি। হোই আবার ঘন্টা দেছে, আবার ঘন্টা দেছে।

১ম ভিখারিনী। বেজেছে এতক্ষণে—বাব্বা, ঘন্টা দিতে একেবারে বেলা হেলিয়ে দেছে আজ। চ, চ। [কুঞ্জ, রাধিকা ও বৃদ্ধ ভিক্ষুক ভিন্ন অন্য সকলের মেটে হাঁড়িকুড়ি সহ ত্বরিতপদে প্রস্থান।]

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে) আমার সময় হবে না, তোমরা সব চলে যাও। (একটু সুরে) গাঁয়ে ফিরে যাও।

কুঞ্জ। (রাধিকার প্রতি) গাঁয়ে ফিরে যাব কথাটা মনে করলে সে বুকের ভেতরটা একেবারে আমার, এই দ্যাখ না, হাত দিয়ে দ্যাখ বুকে, দ্যাখ— (রাধিকার হাতখানা নিজের বুকে চেপে ধরে) দেখিছিস—!

রাধিকা। (চিন্তান্বিতা মুখে) সত্যিই তো।

কুঞ্জ। (করুণ হেসে) হেঃ, কী যে আনন্দ হয় বউ আমার, সে আমি তোরে—চল্ বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।

রাধিকা। চল না, আমার কি অসাধ। গাঁয়ে ফিরে যাব, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব? (কেঁদে ফেলে) সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে— যদি আমার মাখন থাকত—(কাঁদে)

কুঞ্জ। ও সব হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে। চল চল, বউ আমরা ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির শহরে আর থাকব না।

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে সুর করে) মিথ্যে বসে আঁকড়ে থাকা, তোমরা সব চলে যাও। তোমরা সব চলে যাও।

কুঞ্জ। বউ!

[রাধিকা কুঞ্জর দিকে জলভরা চোখে তাকায়।]

রাধিকা। কী।

কুঞ্জ। ওঠ, চল।

রাধিকা চল।

[কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।]

বৃদ্ধ ভিখারি। (আর্তকণ্ঠে সুর করে) দুরুস্তরের পথে আঁকা বাঁকা, তোমরা চলে যাও। তোমরা সব চলে যাও। তোমরা চলে যাও।

[কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।]

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

চিকিৎসাকেন্দ্র। দরদালানের মতো লম্বা একখানা ঘরের দু-পাশ দিয়ে সারবন্দী ভাবে সব খাটিয়া পাতা রয়েছে। সবগুলি বেডেই রোগী ভরতি। ঘরের মাঝখানটায় একজন নার্স একখানা চেয়ারে বসে আছে মাথায় হাত রেখে, কনুই দুটো তার সামনের টেবিলটা ছুঁয়ে আছে। টেবিলটার ওপর ওষুধপত্রের বোতল, চিকিৎসার সরঞ্জাম, খাতা-পত্র ঠাসা। দুজন রোগী শুয়ে শুয়ে অদ্ভুত শব্দ করে আর্তনাদ করছে। নার্সটি থেকে থেকে রোগীদের দিকে ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাচ্ছে।

হল-ঘরের সামনে ডানদিক স্বতন্ত্র একটু স্বল্প-পরিসর বারান্দা। বারান্দার মাঝখানে ছোট্ট একটা টেবিল; দুখানা চেয়ার ও একখানা বেঞ্চ। দেওয়ালে কাঠের র‍্যাকে কোট ঝুলছে দেখা যাচ্ছে। একজন যুবক ডাক্তারকে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে 'আউটডোরের' রোগীদের নিয়ে। বারান্দা থেকে নিচে

নেমে যাবার সিঁড়ির ওপর নিঃস্ব রোগীরা ভিড় করে বসে আছে। একজন কম্পাউণ্ডারকে ওযুধের টেবিলের কাছে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভদ্রলোক রোগীরা সব বসে আছেন ডাক্তারের টেবিলের সামনের দিকে বেঞ্চের ওপর—হাতে সব শিশি। চিকিৎসাপ্রার্থী জনৈক ভদ্রলোকের সঙ্গে রয়েছে মাথা মুখ ব্যাণ্ডেজ করা দশ বারো বছরের একটা ছেলে।

পায়ে পট্টি জড়ানো, মাথায় পাগড়ি আর গায়ে কোট পরা জনৈক জমাদার গোছের লোক খবরদারি করছে জনতাকে।

হল-ঘরের পেছন দিককার বেড়ের এক নম্বর রোগীর কাতর আর্তকণ্ঠ শুনে নার্স উঠে দাঁড়াল। এগিয়ে গেল, তুলিতে করে কী একটা ওযুধ নিয়ে। একটু পরেই আবার ফিরে এসে টেবিলের কাছে একখানা খাতায় কী যেন লিখছে, এমন সময় রোগীরা আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে। নার্স। (রোগীদের দিকে মুখ করে ধমকের সুরে) কী হচ্ছে, কী!

ধমক খেয়ে আঁই-আঁও শব্দ করতে করতে এক নম্বর রোগী চুপ করে যেতে নার্স অন্য রোগীদের দিকে এগিয়ে গিয়ে ঘড়ি মিলিয়ে নাড়ি দেখতে থাকে। হল-ঘরের ভেতরে ক্ষণকালের জন্য নেমে আসে কবরের প্রশান্তি। একেবারে চুপচাপ, একটু পরেই আবার অন্যদিক থেকে দু-নম্বর রোগী ওঁ ওঁ শব্দে আর্তনাদ করে উঠে চুপ করে গেল। নার্স একনজর তাকিয়ে নাড়ি দেখে চলে—সব রোগীদের এক এক করে। এই গেল হল-ঘরের ভিতরের অবস্থা। আর বাইরের বারান্দায় সাহেবি পোশাক পরা যুবক ডাক্তারটি রোগীদের বুকে এক এক করে স্টেথস্কোপ লাগিয়ে চোখ টেনে পিট বুকে আঙুল ঠুকে "নিঃশ্বাস নাও" "নিঃশ্বাস নাও" বলে পরীক্ষা করে চলে আর প্রেস্‌ক্রিপশন লিখে দেয়। প্রেস্‌ক্রিপশন হাতে করে রোগীরা আবার কিউ-এ গিয়ে দাঁড়াচ্ছে ওযুধ নেবে বলে। ধুতি সার শার্ট পরা কম্পাউণ্ডারটিকে ওযুধের টেবিলের কাছে ভীষণ ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে। পেট মোটা লাল, নীল সাদা ওযুধের বড়ো বড়ো বোতল থেকে তাকে হরদম ওযুধ ঢেলে দিতে দেখা যাচ্ছে রোগীদের শিশিতে।

কম্পাউণ্ডার। (একজনকে ওযুধের শিশি এগিয়ে দিয়ে অন্য একজন রোগীকে) তোমার!

ডাক্তার। (জনৈক দুঃস্থ রোগীকে পরীক্ষা করে) কাশতে লাগে, বুকে?

আট নম্বর রোগী। হ্যাঁ বাবু, বড্ড যন্তন্না!

ডাক্তার। যন্তন্না হয়! কী রকম যন্তন্না?

আট নম্বর রোগী। কী রকম যন্তন্না। যন্তনা—(প্রকাশ করতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে থাকে)

ডাক্তার। জিভ্ দেখি, জিভ্!

[রোগী জিভ দেখাল।]

বড়ো করে বড়ো করে—

উঁ! (প্রেস্‌ক্রিপশন লিখতে লিখতে) রাত্রে ঘুম হয়?

[রোগী ঘাড় নেড়ে 'না' বলে।]

	হয় না!
আট নম্বর রোগী।	আজ্ঞে না।
ডাক্তার।	(প্রেস্‌ক্রিপশনটা প্যাড থেকে ছিঁড়ে রোগীর হাতে দিয়ে) আচ্ছা ঐ ওষুধটাই আরো হপ্তাখানেক চলুক, বুঝলে?
আট নম্বর রোগী।	আজ্ঞে আজ যে ওষুধটা পাল্‌টে দেবেন বলেছিলেন ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার।	পাল্‌টে দেব বলেছিলাম নাকি! আচ্ছা, এ হপ্তাটা ঐ চলুক তো!
আট নম্বর রোগী।	কিন্তু জ্বর যে কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না!
ডাক্তার।	হবে হবে, খেয়ে যাও ওষুধ। একটা কিছু হবার সময় যত তাড়াতাড়ি হয়, সারবার সময় কি আর তত তাড়াতাড়ি সারে? অস্থির হলে চলবে কী করে। (অন্য রোগীর প্রতি) হ্যাঁ তারপর—। (আট নম্বর রোগীর প্রতি) আচ্ছা যাও তুমি তা হলে।
আট নম্বর রোগী।	জ্বরটা যে ডাক্তারবাবু কিছুতেই—। এট্টুখানি ভালো ওষুধ দিন ডাক্তারবাবু, আপনার পায়ে পড়ি।
ডাক্তার।	আরে বাবা ভালো ওষুধ কি আমি গড়াব? যা ভালো, ঐ তো দিইছি যা দেবার।
আট নম্বর রোগী।	এ ওষুধ তো এক মাস ধরেই খাচ্ছি; জ্বর তো কিছুতেই যায় না। আর এই পা ফোলাও তেমনি আছে।
ডাক্তার।	ও জ্বর-টর সব ওতেই যাবে।
আট নম্বর রোগী।	যাবে?
ডাক্তার।	হ্যাঁ যাবে, যাও—আমার এখনও অনেক রোগী দেখতে হবে।
আট নম্বর রোগী।	তবে যাই, তাই যাই।
	[কিউ-এ গিয়ে দাঁড়ায়।]
ভদ্রলোক রোগী।	(ডাক্তারের টেবিলের সামনে যিনি বসেছিলেন) সবই ম্যারেলিয়া কেস্, না ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার।	মোস্ট্‌লি তবে—এই দেখুন না, নট ওনলি ম্যালেরিয়া, শোথ হয়েছে লোকটার। প্রায় মাসাধিক কাল ভুগছে। এদিকে ওষুধ নেই, পত্তর নেই, বলুন তো কী দিয়ে কী চিকিৎসা করি।
ভদ্রলোক রোগী।	তা জানান না কেন এ সব কথা ওপরে।
ডাক্তার।	লিখে লিখে হয়রান মশাই, বলি যে ওষুধ-পত্তরই যদি সাপ্লাই করতে না পারো তো দরকার কী এই 'শ্যাম শো'-ব, বন্ধ করে দাও হাসপাতাল। হা, না—কোনো জবাব নেই তার। এখন বলুন, এ অবস্থায় আমরাই বা কতটুকুখানি কী করতে পারি। ভালো করে দেখে শুনে বিধি-ব্যবস্থা করতে দু-ঘন্টার জায়গায় নয় দশ

ঘন্টাই আমরা খাটলাম, দশখানার জায়গায় নয় দু'শখানা প্রেস্‌ক্রিপশন লিখলাম, কিন্তু ওষুধ যদি না পাওয়া যায় তো কী হবে তাতে করে বলুন!

ভদ্রলোক রোগী। তা তো বটেই।

ডাক্তার। আন্তরিকতা থাকতেও সে আন্তরিকতার কোনো মূল্য নেই। ট্রাজিডিই তো আমাদের এই। যাগ্‌গে সে সব কথা—(অন্য রোগীর প্রতি) কই দেখি তোমার কী?

[হঠাৎ হল-ঘরের ভেতর থেকে একটা রোগীর আর্তকণ্ঠ শোনা যায় আঁ-া-া নার্স একবার ত্রস্ত পায়ে রোগীর দিকে এগিয়ে যায়। তারপর রোগীকে একনজর দেখেই ছুটে যায় ডাক্তারের কাছে।]

নার্স। (ত্রস্তে) ডাঃ মুখার্জি

ডাক্তার। য়্যাঁ।

নার্স। পাঁচ নম্বর পেশেন্টের, 'হেমপ্‌টিসিস' হচ্ছে।

ডাক্তার। হেমপ্‌টিসিস্‌! কারণ?

নার্স। কারণ, আপনি একবার দেখবেন চলুন।

ডাক্তার। চলুন, চলুন।

[ডাক্তার ও নার্সের হল-ঘরে প্রস্থান। ওদিকে চলমান 'কিউ' সরে সরে যাচ্ছে। যে যার মতো ওষুধ-পত্তর নিয়ে চলে যাচ্ছে।]

(কয়েক মুহূর্ত রোগীর দিকে তাকিয়ে) চার্টটা দেখি।

[নার্স চার্ট এনে দেয়।]

(চার্ট দেখে) উঁ, টেম্পারেচারটা তো দেখছি বেশ 'রাইজ' করেছে আবার। সেই পাউডারটা দেয়া হয়েছিল?

নার্স। হ্যাঁ।

ডাক্তার। একটু বরফ আনতে বল জমাদারকে, চট করে।

[ডাক্তার নাড়ি পরীক্ষা করতে শুরু করে!]

নার্স। (বাইরের দিকে এগিয়ে গিয়ে) জমাদার!—জমাদার!

[জমাদারের প্রবেশ।]

থোড়াসে বরফ লাও।

জমাদার। লাতা হুঁ।

ডাক্তার। নেই একটা ওষুধ, নেই একটা কিছু; ধেত—

নার্স। (এগিয়ে এসে) ইনজেক্‌শন্‌ দেবেন নাকি একটা, গ্লুকোস!

ডাক্তার। গ্লুকোস ইনজেশন নেই।—নেই ইনজেকশন, নেই ওষুধ , আছে শুধু ঘর ভরতি রোগী—নন্‌সেন্স কারবার।

[হঠাৎ পাঁচ নম্বর রোগীর খিঁচুনি আরম্ভ হয়।
নার্স ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে ঘরে রোগীর দিকে।]

নার্স। ডাক্তার মুখার্জি, পেশেন্ট—

ডাক্তার। আই ‌য্যাম হেল্পলেস্‌। কিচ্ছু করবার নেই।

নার্স। (নাড়ি দেখে) কিন্তু পেশেন্ট যে সিঙ্ক্‌ করছে ডক্টর—

ডাক্তার। (চেঁচিয়ে) ও হো, আই নো রেবা হি উইল ডাই। হি, এণ্ড দি হোল লট অব দেম। দি ফিউচার ইজ বিয়িং মার্ডার্ড, ডেলিবারেটলি, মার্ডার্ড বাই থিভস্‌ অ্যাণ্ড বাংলার্স।

ডাক্তারের চিৎকার শুনে সমস্ত রোগী বিছানার উপর আধশোয়া হয়ে উঠে বসে আতঙ্কে

[আ আ আঁই শব্দ করতে থাকে।
কম্পাউণ্ডার একবার উঁকি মেরে দেখে যায়।]

(নিজেকে সামলে নিয়ে) শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো তোমরা সব। কিছু হয়নি তোমরা শোও, শুয়ে পড়ো। শোও, হ্যাঁ শোও।

[রোগীরা সব পূর্বের মতো আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে।
আর নার্স মৃত পাঁচ নম্বর রোগীর খাটিয়া ঘিরে একটা সাদা পর্দা টাঙিয়ে দিল।
আস্তে আস্তে বাইরের বারান্দায় ডাক্তারের পাশে এসে দাঁড়ায়।
রোগীদের কিউ পরিষ্কার হয়ে গেছে এতক্ষণে।
বাইরের ওষুধের টেবিলের কাছে শুধু কম্পাউণ্ডারকে কাজে ব্যস্ত দেখা যাচ্ছে।
স্টেচারসহ দুজন ধাঙ্গরের প্রবেশ।]

নার্স। (বাহকদ্বয়ের প্রতি) পাঁচ নম্বর।

জনৈক বাহক। জি।

[মৃতদেহটিকে স্ট্রেচারে তুলে নিয়ে বাহকদ্বয়ের প্রস্থান।]

ডাক্তার। (নিজ টেবিলে কাজে ব্যস্ত। হঠাৎ নার্সের দিকে মুখ তুলে করুণ হেসে) কী দেখে আশা করেছিলে যে লোকটা বাঁচবে, রেবা!

নার্স। আশা? না আশা আর কী!

[ডাক্তার কাজে মনোনিবেশ করে। প্রধানের প্রবেশ।]

(হঠাৎ নার্স দেখতে পায় যে দরজার কাছে আলু থালু বেশে বুড়ো মতো একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা পাগলের মতো। বগলে নোংরা কতকগুলো কাগজ-পত্তর,

হাতে একটা হাঁড়ি। আর কাঁধে কতকগুলো নোংরা শতছিন্ন জামা কাপড়, ছেঁড়া কম্বল।) —কী, তোমার আবার কী?

ডাক্তার। (মুখ তুলে) কে!

নার্স। কী চাই তোমার?

প্রধান। আমার, আমার এট্টু ওষুধের দরকার মাঠান।

নার্স। ওষুধ।

[কাঁচুমাচু মুখ করে প্রধান মাথা নাড়ে।]

কিসের ওষুধ?

ডাক্তার। কী বলছে কী! কে দেখি!

নার্স। দেখুন তো!

ডাক্তার। (উঠে) কি হয়েছে কী! কী বলছ তুমি।

প্রধান। (এগিয়ে এসে) আমার এট্টু ওষুধ বাবা, (পায়ের দিকে লক্ষ করে) বড্ড ব্যথা।

ডাক্তার। বড্ড ব্যথা! কোথায়, দেখি! (হাতের আবর্জনাগুলোর দিকে ইঙ্গিত করে) ওগুলো কী?

প্রধান। এই, আছে।

ডাক্তার। এমনিই আছে?

প্রধান। (অপ্রতিভ হেসে) হ্যাঁ—এমনিই আছে।

ডাক্তার। ফেলে দাও না ওগুলো! কী হবে ও দিয়ে!

প্রধান। এগুলো ফেলে দিলে আর কী থাকবে! ওগুলো কি ফেলে দেওয়া যায়। এ সব হল—

ডাক্তার। অমূল্য রতন। ফেলে দেওয়া যায় না, না?

প্রধান। না (হাসে)

ডাক্তার। (নার্সকে) বুঝতে পেরেছেন, অসুখ!

নার্স। (মুখ টিপে হেসে) একটু একটু।

ডাক্তার। এ রকম যে কত হয়েছে—হবেই কিনা!

প্রধান। (না বুঝে) নিশ্চয় হবে, কেন হবে না (হঠাৎ ব্যথা অনুভব করে) উ-হু-হু-হু, বড্ড ব্যথা।

ডাক্তার। কোথায়, দেখি ব্যথা কোথায়!

প্রধান। (হাত তুলে) এই এখানে। (হাত দিয়ে দেখিয়ে) এইখানে ব্যথা।

ডাক্তার। (পা টিপে) কই ব্যথা কই! লাগে টিপলে?

প্রধান। না।

ডাক্তার। তবে, ব্যথা কোথায়?

প্রধান। (মৃদু হেসে) ঐতো, ঐখানেই ছিল।

ডাক্তার। ঐখানেই ছিল, আরে।

প্রধান। হ্যাঁ ঐখানেই ছিল। তারপর পালিয়ে গেল। এক দৌড়ে পালিয়ে গেল—

[নার্স মুখ টিপে হাসে।]

ডাক্তার। পালিয়ে গেল দৌড়ে?

[প্রধান হাত তুলে বিজয়ীর ভঙ্গিতে।]

কোথায় গেল?

প্রধান। (বলিষ্ঠ আকার ইঙ্গিতে) ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেল; একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখন্দ পেরিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—

(হঠাৎ শরীরের কোনো অংশে ব্যথা লেগে চাপা গলায় আ-া-া শব্দ করে বুকে হাত চেপে আধবসা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। ডাক্তার নার্সের দিকে তাকায় আর প্রধান দাঁত মুখ খিঁচিয়ে ব্যথার অভিব্যক্তি জানাতে থাকে।)

ডাক্তার। (ক্ষীণ হেসে) আবার ব্যথা করছে তো?

প্রধান। (গম্ভীর ভাবে) হ্যাঁ, আবার ব্যথা করছে। এ ভয়ানক ব্যথা দারুণ যন্ত্রণা। এ ব্যথা এই আছে, এই নেই। কালবোশেখির মেঘের মতো আছে এ ব্যথা একেবারে হু হু করে উঠে আসে আমার সর্বাঙ্গ ছেয়ে—তারপর এই যে মাতন লাগে আরে ব্বাস রে বাপ্ সে একেবারে ঘর বাড়ি ভেঙে্ চুরে—

ডাক্তার। (ধমকের সুরে) থামো।

প্রধান। (সবিনয়ে) থামতে বলছেন!

ডাক্তার। হ্যাঁ থামতে বলছি—ও ব্যথা ট্যথা তোমার সব বাজে কথা, মিথ্যে।

প্রধান। (ক্ষোভের সুরে) মিথ্যে।

ডাক্তার। হ্যাঁ মিথ্যে। একদম মিথ্যে।—ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। তোমার ব্যথা নেই।

প্রধান। (বোকার মতো) ব্যথা নেই?

ডাক্তার। না ব্যথা নেই, কিছু নেই! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা।

প্রধান। (হঠাৎ নোংরা জামা-কাপড় আর আবর্জনাগুলো জোরে আঁকড়ে ধরে সোজা হয়ে

দাঁড়ায়) তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।

[নিজের আবেগে কথা বলতে বলতে প্রধানের প্রস্থান।
ডাক্তার ও নার্স বিস্মিতের ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে প্রধানের দিকে।]

(পটক্ষেপ)

৮৬.১২ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ তৃতীয় অঙ্ক)

কুঞ্জ আর রাধিকা এই লঙ্গারখানায় এসে জানতে পারে রাস্তার থেকে পুরুষ মানুষদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে যুদ্ধে। 'কেউ' বলছে ধরে ধরে নাকি সব যুদ্ধে নিয়ে যাচ্ছে। [২য় ভিখিরি] আর সোমত্থ মেয়েদের ধরে নিয়ে যাচ্ছে অন্যত্র, ...নিবি তো সব একসঙ্গে ধরে নিয়ে যা না বাপু, য়্যাঁ, সেই না কথা! তা না কেউ পড়ে থাকল, কেউ গেল, এ কীরকম ধারা বেআক্কেলে কাণ্ড! (চেঁচিয়ে) মেয়েডারে নিয়ে গেলি অথচ মা বিটিরে ফেলে রেখে গেলি রাস্তায়, এটা প্রাণে এট্টা কথা বলল না!' [১ম ভিখারিনী] সব মিলিয়ে মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে মূল্যহীন। তাই কুঞ্জ বলে, 'আর তোমার আমার জীবন—কী দাম আছে এ জীবনের? কিছু না। এমনিই বলে তাই উজোড় হয়ে গেল, য়্যাঁ।' [৩য় অঙ্ক ১ম দৃশ্য] এখান থেকে তারা আবার এও জানতে পারে,—সমত্থ চাষীলোক যারা তাদের সব দেশ ঘরে পাঠিয়ে দিচ্ছে।' কেন না. 'কেউ বলে ধান নাকি এবার এত হয়েছে যে কাটবার পর্যন্ত লোক পাওয়া যাচ্ছে না। তাই চাষী লোকদের সব গেরামে পাঠিয়ে দিচ্ছে।' [৩য় ভিখিরি]

কুঞ্জ আর রাধিকার সমস্ত অন্তরটা আমিনপুরের জন্য কেঁদে ওঠে। মুহূর্তের মধ্যে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য প্রাণ আনচান করে ওঠে। ত্বরিতে কুঞ্জ রাধিকাকে প্রস্তাব দেয়, 'চল বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।' [৩য় অঙ্ক, ১ম দৃশ্য] রাধিকা এই প্রস্তাবে রাজি হয়। চল না, আমার কি অসাধ । গাঁয়ে ফিরে যাব, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব?—সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—' [ঐ]

বন্যা, হাহাকার, দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানুষের বুকে গভীর দুঃখ আর হতাশা। কিন্তু 'নবান্নে' শুধু দুঃখ আর হতাশার কাহিনী নেই। তা যদি থাকত তাহলে এই নাটক নাট্য আন্দোলনের হাতিয়ার হতে পারত না, পারত না গণনাটকের মর্যাদা অর্জন করতে। 'নবান্নে' দুঃখ জর্জরিত একদল মানুষের ক্রন্দন আছে, দুর্ভিক্ষ কবলিত অসহায় মানুষের হতাশাচ্ছন্ন হাহাকার আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে প্রচণ্ড আশাবাদের ইঙ্গিত, 'ও সব হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে!' 'নবান্ন' নাটকের মূল্য এখানেই। 'সব হবে' এই আশাবাদই 'নবান্ন' নাটকের আসল ঐশ্বর্য। দুঃখের অমানিশা কাটবে প্রভাতের অরুণালোয় জীবন আবার উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে এই আশা ও আলো কুঞ্জর চোখে ঝলমল করে ওঠে। 'কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।' [ঐ] এ হল প্রথম দৃশ্যের বিষয়বস্তু।

তৃতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য একটি চিকিৎসা কেন্দ্র। দরদালানের মত একটি লম্বা ঘরের দু'পাশের সারবন্দী খাটিয়ায় রোগী ভর্তি। তাদের কেউ কেউ তীব্র আর্তনাদ করছে। বারান্দায় চেয়ার টেবিল পেতে ডাক্তারবাবু বহির্বিভাগের রোগী দেখছেন। তিনি রোগী দেখে প্রেস্ক্রিপশন লিখেছেন। কম্পাউন্ডার লাল নীল বোতল থেকে ওষুধ রোগীদের শিশিতে ঢেলে দেন।

অপুষ্টিজনিত কারণে নানা ধরনের রোগ। চিকিৎসা কেন্দ্রে উপযুক্ত ওষুধ নেই—রুগীর অভিযোগও অন্তহীন। ডাক্তারবাবু নিষ্ঠাভরে রোগী দেখেও তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করতে না পারায় অসহায় বোধ করেন। অনুভব করেন, "আন্তরিকতার কোন মূল্য নেই"। বলেন, 'আই অ্যাম হেল্পলেস্'।

এমনি সময় আকস্মিক দুর্যোগে মানসিক ভারসাম্যহীন অনাহারক্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার নোংরা জামা কাপড় ও স্তূপাকৃতি আবর্জনা নিয়ে ঢুকে পড়ে। সে যে ব্যথার কথা বলে তার সঙ্গে সেই কালবোশেখির যোগ দেখা যায়। সবমিলিয়ে অঙ্কটি যেন হাতাশা ও আশার দোলায় আন্দোলিত জীবনের একটি বাস্তব ছবি।

৮৬.১৩ মূলপাঠ ৪ — নবান্ন ঃ চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শহর থেকে ফিরে ভাঙা ঘরখানা জুড়েতেড়ে নিরঞ্জন আবার বাসোপযোগী করে নিয়েছে। পর্দা সরে যেতেই প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন গেরস্থ চাষীকে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ির স্বল্প পরিসর উঠোনটার মাঝখানে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত দেখা যাচ্ছে। জনতার ভেতর তিনটে গ্রুপ। প্রত্যেক গ্রুপে তিন চারজন করে লোক বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে কথা বলতে শোনা যাচ্ছে। প্রত্যেকটা গ্রুপের আলোচ্য বিষয়বস্তু ও বিশ্লেষণের নিজস্ব একটা ঢং আছে। বাকি লোক সব উঠোনে বসে এ ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলছে। তবে বসে আছে যারা তাদের আলোচনাটা তেমন দৃষ্টি আকর্ষণ করছে না। দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে ঐ তিনটে গ্রুপ। তবে বৈশিষ্ট্য এখানেও যে যখন যে গ্রুপটা কথা বলছে কখনও কখনও বাকি দুটো গ্রুপের আলোচনায় ভাটা পড়ছে অভিনয়ের খাতিরে। মঞ্চের ডানদিকে দাঁড়িয়ে প্রথম গ্রুপ ফকির, সুজন ও ভজনের মধ্যে পর্দা সরে যেতেই আলোচনা শুরু হয়। মঞ্চের মাঝখানে ও বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আর দুটো গ্রুপ তখন নিচু গলায়, আকারে ইঙ্গিতে আলোচনা চালাতে থাকে। দাওয়ার ওপর দয়াল মণ্ডল, নিরঞ্জন প্রভৃতি বসে, আলাপ আলোচনা করছিল এতক্ষণ। সখীচরণ কথা শেষ করতেই বরকত সভা আহ্বান করে।

ফকির। (সুজনের প্রতি) বাপের দেনা ঘাড়ে নিয়ে জগতে জন্মেছি আবার মরবার সময় নিজের দেনাটা যথারীতি ছেলের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে চলে যাব, এই তো হয়ে আসছে দেখি চিরটাকাল., জন্ম-জন্মান্তর। তা এ আর এটা কথা কী এমন বিশেষ।

ভজন। না এ যা বলছ তা খাঁটি কথাই বলেছ।

সুজন। সেই কি আর এটাটা কথা হল।—চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত করবে না, কী রকম ধারা কথা।

ফকির। উপায় কী বল!

সুজন। উপায়—করে নিতে হবে উপায়।

ফকির। তা য়্যাদ্দিন হয়নি কেন—এ তো আর তোমার আজকের সমস্যা না।

সুজন। য়্যাদ্দিন হয়নি কেন—কী রকম যে তুমি কথা বল মামু তা বুঝে উঠতে পরিনে। আরে সমস্যা যদি মেনেই নিতে তো উপায় খুঁজে বের করবার দরকারটা পড়ে কিসে! সব্বার আগে ওটা যে এট্টা সমস্যা, এই বুঝটা তো অন্তত থাকা দরকার, না কী?

ফকির। না তা তো—

সুজন। তো তবে।

(সুজনের কথার সঙ্গে সঙ্গে প্রধান গ্রুপের আলোচনাটা নিস্তেজ হয়ে আসতেই মঞ্চের মাঝখানটায় দ্বিতীয় গ্রুপটা মুখর হয়ে ওঠে। প্রথম গ্রুপের আলোচনাটা তখন বাহ্যত দু-একটা কথাবার্তা কানাঘুসো ও ভাবে-ভঙ্গিতেই ব্যক্ত হতে থাকে। দ্বিতীয় গ্রুপের রহিম বরকত ও গোলাম নবীর মধ্যে আলোচনা আরম্ভ হয়। বরকত তার কচি মেয়েটাকে সাজিয়ে কাঁধে করে নিয়ে এনেছে।)

রহিম। কিন্তু তা যেন না হয় দিলাম, কিন্তু পীরের দরগায় খাসি! সেটা তো দিতেই হয়।

বরকত। কেন!

রহিম। মানত রয়েছে যে।

বরকত। তোর দেখছি শতেক দেনা!

গোলাম নবী। মানত আছে পরে দিও খাসি। তাতে কোনো দোষ নেই। আসলে দেওয়া নিয়ে হচ্ছে কথা। দুদিন পেছিয়ে দিলে আর তুমি জাহান্নামে যাবে?

রহিম। কিন্তু মওলানা যে আমারে তা হলে একেবারে সেরে ফেলে দেবে'খন! এই বলে তাই—

বরকত। বললেই হল আর কী মওলানা। সুবিধে-অসুবিধে নেই মানুষের! ও তুমি দেবার হয় পরে দিও। ...খোদাতালার চোখ তোমার গে ঐ মওলানার কটা চোখের মত ছোটো না. একথা মনে করে রেখো।

বরকতের কথার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় গ্রুপের আলোচনায় ভাটা নামে। আরম্ভ হয় তখন তৃতীয় গ্রুপের কথা বার্তা। দিগম্বর, সখীচরণ প্রমুখ চারজন লোক আলোচনা আরম্ভ করে।

দিগম্বর। আরে পাওনাদার তো আমরা সকলেই। তার জন্যে আর কী, হ্যাঁঃ! জীবন-ভর খালি দেনাই করে গেলাম, পেলাম না আর কোনো কিছু কারো ঠেঙে।

সখীচরণ। ফসলডা যদি একবার মরে-পিটে তুলতে পারি তো দেখি একবার।

দিগম্বর। এখন বলেছ বটে! কিন্তু পেট ভরবার সঙ্গে সঙ্গেই দেখবে যে আবার দয়াবান হয়ে উঠেছ। তখন তার শত্রু-মিত্র জ্ঞান থাকবে না—এই রোগেই তো মরলে চাষী, —দিল করে রেখেছ সব রাজার নাগাল অথচ সঙ্গতি নেই এক আধলার।

সখীচরণ। না এবার আর—

[দাওয়ার উপর দয়াল মণ্ডল, নিরঞ্জন প্রভৃতি আলাপ আলোচনা করছিল এতক্ষণ। সখীচরণ কথা শেষ-করতেই বরকত সভা আহ্বান করে।]

বরকত। তা হলে এইবার আলোচনা আরম্ভ করা যেতে পারে, কী বল মণ্ডল! এসে তো গেছে সকলেই একরকম।

দয়াল। হ্যাঁ আর দেরি কী?

নিরঞ্জন। না, আর দেরি কী, এইবার শুরু করে দেওয়া যাক।

বরকত। হ্যাঁ শুরু করে দাও।

দিগম্বর। আর সকলেই তো একরকম উপস্থিত হয়ে গেছে, এইবার—

সখীচরণ। আরম্ভ কর।

[নেপথ্যে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

বরকত। দয়ালদা শুরু কর।

[নিরঞ্জনের কানে কানে যেন কী কথা বলল।]

নিরঞ্জন। হ্যাঁ। (মাথা নেড়ে হাসতে লাগল)

দয়াল। আমিই করব, তার চাইতে বরং—

নিরঞ্জন। না তুমিই কর, শুরু করে দাও তারপর—

বরকত। হ্যাঁ আরম্ভডা তো করে দাও তারপর সকলে মিলে সেডারে

দয়াল। (একটু হেসে) আচ্ছা, আচ্ছা!

[সহসা একটা ঋজুতা ও কাঠিণ্যের ছাপ ফুটে উঠে দয়ালের মুখে।]

দয়াল। (মাটিতে আঙুল দিয়ে দাগ কাটতে কাটতে তার হঠাৎ মুখ তুলে তুলে) মানে কথা হচ্ছে যে, আমরা, যারা আজ এখানে উপস্থিত হইছি, তারা বেশ ভালো করেই সমস্যার কথা জানি। কী যে সমস্যা, না সে সমস্যা খুবই গুরুতর সমস্যা জীবন-মরণ সমস্যা—ফসল কাটা, ঝাড়া, তোলা তারপর আবার তোমার সেই ফসল রক্ষে করার সমস্যা। এখন প্রকৃত অবস্থা যা, তাতে করে সত্যি কথা বলতে গেলে, এই যে আমরা আজ এখানে দশজন বসে ভেবে-চিন্তে এটা উপায় বের করব বলে স্থির করেছি, এই সময়ডাও পর্যন্ত আমাদের নষ্ট করা উচিত নয়।

নিরঞ্জন। ঠিক, অতি ঠিক।

[নেপথ্যে 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

দয়াল। আমি বলছিনে যে এ আলাপ-আলোচনার প্রয়োজন নেই। আছে, খুবই আছে। সে কথা না, তবে অবস্থার গুরুত্বডা যাতে করে আমাদের কারো কাছে এক মুহূর্তের জন্যেও কম মনে না হয়, সেই কারণেই ঐ কথাডা উত্থাপন করলাম। সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপারডা দাঁড়ায় এই যে, এখনই এই মুহূর্তে আমরা যদি ফসল রক্ষে করার একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারি, তা হলে মিত্যু ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না। সব ঘরে পড়ে মরতে হবে আমাদের। কেউ ঠেকাতে পারবে না।

[সকলে নড়ে চড়ে বসে ও পরস্পররের কানে কানে যেন কী সব বলা কওয়া করে। একটা কলগুঞ্জন ওঠে।]

সংক্ষেপে সমস্যার কথা আমি বললাম, এইবার সকলে মিলে তোমরা কওয়া বলা কর, কী হলে কী হয়, কোন পথে এর এট্টা মীমাংসা হয়—বরকত বল।

বরকত। (নড়ে চড়ে) বলব বা কী আমি।

দয়াল। (কল্‌কে দিয়ে) আহা এ সম্বন্ধে তো যা-হোক কিছু ভেবেছ, তো সেই কথাই বল। সমস্যা সকলের—(তামাক টানে)

[নেপথে— 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

বরকত। না সে তো ঠিক কথা।—

নিরঞ্জন। তুমি যা ভেবেছ তাই বল।

[নেপথে খুব জোরে— 'বল হরি হরিবোল' ধ্বনি।]

নিরঞ্জন। আরে ও মারা গেল কেডা।

[নেপথ্য থেকে উত্তর আসে— 'ত্রিলোচন বিশ্বাস'।]

দিগম্বর। ত্রিলোচন মানে যে আমাদের নারানের বাপ। য়্যাঁ আরে সে দিনও তো কত গল্প করলাম রাস্তায় দাঁড়িয়ে ত্রিলোচনের সঙ্গে। কী আশ্চর্য।

সখীচরণ। হইছিল কী?

নিরঞ্জন। আবার হতে হয় নাকি কিছু।

বরকত। মরা তো হয়েছে হাতের পাঁচ। গেলেই হল।

দয়াল। য়্যাঁ-া-া-া।—হয়েছেই এই অরাজক অবস্থা—তা সে যে গেল তার দায়িত্ব তো ফুরিয়েই গেল এখন থাকল যারা তাদের নিয়েই হচ্ছে কথা। ধান যে ওদিক সব পেকে ঝড়ে পড়ে গেল, সেই অপমিত্যু ঠেকাবে কী দিয়ে এখন সেই কথাই ভাবো।

ফকির। তারপর বরকত বল কী বলছিলে।

বরকত। কীই বা বলব।

দিগম্বর। যা ভেবেছ, তাই বলবে। ঠিকই যে হবে এমন তো কোনো কথা নেই। তবে দেখবে যে এই আলাপ-আলোচনা করতে করতেই পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে, এই, বল, বল না।

সখীচরণ। হ্যাঁ পাঁচজনে মিলে আলোচনা এর ভেতর আবার এট্টা কথা কী!

বরকত। মানে কথা হচ্ছে যে ভাবিনি যে এ বিষয়ে কিছুই একেবারে তা নয়; ভেবেছি। তবে বিষয়ডা তো সহজ নয় তেমন, মুশকিল আসানের পথ এখনও ভেবে বার করতে পারিনি। তারপর শুধু শুধু ভেবেই বা কী করব বল? না পাওয়া যায় এট্টা লোক যে বাতে সঙ্গে এট্টু জোগান দেবে। খাওয়া পরা বাদে দু-তিন টাকা রোজ দিয়েও লোক মেলে না। এখন এত ফসল কেটে তুলি কী করে, বলদিনি। অথচ এদিকে আবার এমনিই অবস্থা— মাতব্বর অবশ্য বলেছে সে-কথা যে, দুইচার দিনের ভেতর এই ফসল কাটা হল তো হল, আর নয় তো বিলকূল পয়মাল হয়ে গেল। এই তো অবস্থা। ভাবিনি বলছ, ভেবেছি কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বিশখানা কাস্তের জায়গায় আমার এই এতটুকুখানি একফালি কাস্তে এ কতডা কী করতে পারে বল তো? তো কী বলব বল এ কথার।

দয়াল। এ তো তোমার গিয়ে সেই সমস্যার কথাই দাঁড়াল।

বরকত। হ্যাঁ, তা তাই তো হল। তা ছাড়া আর কী। ভেবে চিন্তে যখন খেই-ই পাচ্ছি নে কিছুতেই এর তখন—দুই চোখ এক করতে পারিনে রাতে মণ্ডল, খালি ভাবনা আর চিন্তে, ভোর বেলা উঠে দেখি মুখখানা একেবারে পচে তেতো বিষ হয়ে আছে। হাতে পায়ে বল পাই নে—

দিগম্বর। আর এই অসুখ বিসুখ; একেবারে জেরবার করে ফেল্লে মনে প্রাণে। সাওস, উদ্যম, যে না এটা করতেই হবে আমার তা সে মরি আর বাঁচি এ আসবে কোত্থেকে। মানুষ কি আর মানুষ আছে? না!

দয়াল। বুঝলাম, সব বুঝলাম; কিন্তু এই মানুষই তো আবার বাঁচতে চাইবে দিগম্বর। সহায় নেই সঙ্গাতি নেই, মন্বন্তরে একেবারে জ্বলে পুড়ে গেছে সব ঘর-সংসার, তবুও তো দেখ আবার এই সভা হয়। তাও আবার কোথায়? নিরঞ্জনের বাড়ির ওপর, উঁ নিরঞ্জনই হল গিয়ে তার জোগাড়ে। তা এ তুমি ঠেকাবে কেমন করে। মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ই'য়ে এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচতে চাইবেই।

[ক্ষণকালের জন্য সকলেই চুপচাপ। একটু পরে নিরঞ্জন গলাখাঁকারি দিয়ে আকারে ইঙ্গিতে যেমন একটা আবহাওয়া সৃষ্টি করে হাবভাবে মনে হয় যেন সে কিছু বলতে চাইছে।]

বরকত। নিরঞ্জন কিছু বলবে নাকি? তা বল না, জোরেই বল।

দয়াল। কী নিরঞ্জন কিছু বলতে চাও? তো বল না বল;

নিরঞ্জন। না এই বলছিলাম কী!

দয়াল। উঁ।

নিরঞ্জন। এই যে বরকত চাচা আর দিগম্বর যা বলছিল, অসুখ বিসুখ আর দুঃখ-কষ্টের কথা, তা সে কথা বলতে গেলে ওতো আমাদের জীবনের একরকম চিরসাথী হয়ে গেছে। এমন না, দু'দণ্ড বসে ঐ নিয়ে পাঁচজনে আলাপ-আলোচনা করলে তার উপশম হবে'খন।

দয়াল। ঠিক।

নিরঞ্জন। তা এখন যদি কিছু করতে হয় তো এই অবস্থার ভেতরে থেকেই যা হয় এট্টা কিছু করতে হবে।

দিগম্বর। তা তো বুঝেছে সকলেই। কিন্তু সেই 'যা হয় এটা কিছু' করা নিয়েই তো মুশকিল বেঁধেছে। কী সেডা?

বরকত। আদত কথাই তো তাই।—আচ্ছা—া-া—

দয়াল। বল কী বলছিলে।

বরকত। বলছিলাম বলি জমিদার বাবুরা, জমিদার বাবুরা যদি এই গে তোমার গত ক'সনের খাজনা—

দয়াল। মুকুব করে—

বরকত। হ্যাঁ।

দয়াল। বেশ তো আবেদন-নিবেদন করতে থাকো না কেন, বারণ করছে কে! খাজনা-পত্তর চাই, মুকুব চাই, বীজধান চাই, কৃষিঋণ চাই, এ সব তো আছেই। তবে আমার কথা হচ্ছে যে; প্রথম থেকেই একেবারে ওপরওয়ালাদের ওপর নির্ভর করে না থেকে নিজেরা কতটুকুখানি কী করতে পার তাই ভাবো—যা দিয়ে যা হবে।

দিগম্বর। হ্যাঁ প্রথম থেকেই একেবারে চাতকপাখির নাগাল হা-পিত্যেশে ওপরের দিকে চেয়ে থাকা, ওতে কোনো কাজ হবে না।

সখীচরণ। হ্যাঁ।

মানিক। না ও মিথ্যে। অনাহক—

দয়াল। আচ্ছা এক কাজ করলে কেমন হয়।

[উৎকর্ণ হয়ে ওঠে সকলে।]

বিষয়ডা অবশ্য ভালো করে বিবেচনা করে দেখতে হবে সকলে মিলে।

ধ্বনি ওঠে—কী বিষয়, কী বলতে চাও তুমি' ইত্যাদি।

বলছি বলি সকলে মিলে গাঁতায় খাটলে কেমন হয়।

বরকত। গাঁতায় খাটলে!

দয়াল। হ্যাঁ। ধর এই আমিনপুর গ্রামের কথাই বলি। কমপক্ষে চল্লিশ পঞ্চাশ ঘর গেরস্তের এখানে বাস। এখন কাজের সময় আমরা যে ঠিক এই পঞ্চাশ ষাট ঘর গেরস্তেরই সাহায্য পাব, এমন কথা বলিনে। কারণ অসুখ আছে, বিসুখ আছে, রোগ, শোক ইত্যাদি আরও পাঁচটা দৈব দুর্ঘটনা আছে, এ আছে। তবু এখন কথা হচ্ছে যে, এই পঞ্চাশ জনার অর্ধেক অতিকম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি আমরা পাই এবং প্রত্যেকের জমিতে আমরা যদি সকলে মিলে গাঁতায় খাটব বলে পিতিজ্ঞে করি, তা হলে আমার খুব বিশ্বেস যে, একদানা ফসলও কারো জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে অনায়াসে এ ফসল আমরা গোলায় তুলে ফেলতে পারব।

[প্রত্যেকেই প্রত্যেকের দিকে তাকিয়ে হাবভাবে আকারে ইঙ্গিতে কথাবার্তায় সমর্থন করে দয়াল মণ্ডলের যুক্তি।]

দিগম্বর। (মাথা নেড়ে) হ্যাঁ তা হতে পারে।

সখীচরণ। না এ তো যথার্থ কথাই।

সুজন। তা মনে প্রাণে গাঁতায় খাটলে পরে ও একরকম করে ফসল—

গোলাম নবী। না এ লেজ্য কথা—

ফকির। ফসল না হয় তোলা গেল কিন্তু—

দয়াল। সেইটেই কি কম কথা হল বলে তুমি মনে কর মিঞা?

ফকির। না সে তো ঠিকই, তবে সমস্যা তো তোমার সেখানেই শেষ হল না। রক্ষে করবে কী করে তুমি এ ফসল। জমিদার আছে, মহাজন আছে, পাইকার আছে—

দয়াল। আসছে, পরে আসছে সে সব সমস্যার কথা।

সুজন। হ্যাঁ খাজনা সব বকেয়া পড়ে আছে জমিদারের ঘরে, তারপর মহাজনও পাবে থোবে অনেক কিছু। এখন ফসলটা উঠলেই পরেই তো সব চারদিক থেকে একেবারে শকুনের নাগাল উড়ে পড়বে'খন দ্যাও দ্যাও করে।

দয়াল। তা সে রুখতে হবে যে করেই হোক। এখন যারে নিয়ে খাজনা, সে তো আগে বাঁচবে না কী।

সুজন। তা সে কথা বোঝে কে!

দয়াল। বোঝে কে, বোঝাতে হবে। গায়ে জল দে বসে থাকলে হয়।

বরকত। হ্যাঁ সে অবস্থা অনুসারে ব্যবস্থা করে চলতে হবে। এখন আগে থাকতেই মীমাংসা কর কী করে তুমি সব কিছুর?

দয়াল। এই। আসল কথা হল ফসল, সেটা যাতে নষ্ট না হয় তার তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে সব্বার আগে।

সুজন। না সে কথা তো একশ বার।

দয়াল। তো তবে! এক এক করে এসো।

দিগম্বর। না সে গাঁতায় খাটলে পরে—তা কী বল তোমরা সব? স্বীকার আছ তো খাটতে গাঁতায়? সাদা মনে বলবে কিন্তুক।

[সকলে সমস্বরে 'নিশ্চয় খাটব', 'খাটব গাঁতায়' ধ্বনি করে।]

বরকত। হ্যাঁ ফসলটা তো আগে উঠে যাক ঘরে। তারপর মাঝপথে যে সব বাধাবিপত্তি আসবে, তা সে তুমি বলতে পার না এখুনি কী করব। তবে আমার মনে হয় যে একসঙ্গো মিলে মিশে চললে পরে—

দয়াল। (সঙ্গো সঙ্গো) মুশকিল আসানের পথ এট্টা খুঁজে পাওয়া যাবে আশা করা যায়।

দিগম্বর। আসল কথা হচ্ছে এখন ফসল—(আনন্দে) তা সে যা হোক ধান যদি একবার তুলতে পারি সব, তো আমি আমার জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্থ ভাইদের জন্যে দিয়ে দেব।

বুধে। (বোকা গোছের একজন চাষী) আমি সব দিয়ে দেব। চার বিঘে জমির এট্টা ফসলও আমি নেব না।

দয়াল। (হেসে) সব দিয়ে দিলে তুই কী খেয়ে বাঁচবি রে আহাম্মক। দুস!

[সকলে হেসে ওঠে।]

ফকির। কার ফসল কেডা দেয়!—আরে জমি সে তো বেচে বসে আছে ও আগে থাকতেই; তার ধান দেবে কী রকম! ধান কি ওর! তারপর—

গোলাম নবী। এডা লেজ্য কথা বলেছে।

বরকত। হ্যাঁ তা আছে এ সব সমস্যা। আচ্ছা তা হলে এখন এই পর্যন্তই থাকল, তারপর সন্ধ্যের পর আবার দয়াল মণ্ডলের ওখানে বসে—যেও কিন্তু তোমরা সব সময়মতো।

দয়াল। (উঠে দাঁড়িয়ে) হ্যাঁ সে সমস্যা এখনও আছে পরেও থাকবে, তবে বর্তমানে আমার কথা হচ্ছে কী যে কাল সকালবেলা থেকেই ধান কাটা শুরু করে দিতে হবে আর কী। আর বিলম্ব করলে চলবে না।

[সকলে গামছা ও দোলাই ঝেড়ে ঝুড়ে কাঁধের ওপর ফেলে উঠে দাঁড়ায়। তারপর আস্তে আস্তে দু-একজন করে ডানদিক ও বাঁদিক দিয়ে প্রস্থান করে।]

দয়াল। (উঠোনে নেমে বরকতের মেয়েকে লক্ষ্য করে সহাস্য মুখে এগিয়ে গিয়ে) ওডা কেডা রে। কেডা ও য়্যাঁ।

নিরঞ্জন। (হাসিমুখে) বরকত চাচার মেয়ে। বড্ড নজ্জা।

দয়াল। তাই নাকি! (এগিয়ে গিয়ে) হ্যাঁ রে, লজ্জা নাকি তোর খুব। (বরকতের মেয়ের মাথায় হাত দিয়ে) তা লজ্জা হবে না। আমার যে ওর সঙ্গে নিকে হয়েছে সেদিন, না রে!

বরকতের মেয়ে। যা! (মুখ লুকোয় বরকতের কোলের মধ্যে)

দয়াল। আচ্ছা দ্যাখ তো আমারে তোর পছন্দ হয় কি না, এই। আমারে বিয়ে করবি? (মেয়েটা চট্ করে দয়াল মণ্ডলের দাড়ি মুঠো করে ধরে। উ-হু-হু-হু, ছেড়ে দে ছেড়ে দে। (ছাড়িয়ে নিয়ে। কী ডাকাতে বউ-রে বাব্বা, কী ডাকাতে বউ।

[সকলে হাসে, মেয়েটিও খিল খিল করে হাসে।]

[ফকির, নিরঞ্জন ও সকন্যা বরকত বাদে সকলের প্রস্থান।]

ফকির। হুঃ, গাঁতায় খাটলে।—গাঁতায় খাটলেই যেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। গাঁতায় খাটলে!—ধরো যে সমস্ত জমি কবালা হয়ে গেছে, কী করে সেইসব জমিতে গাঁতায় খেটে! আর তারপর ধান বন্ধকি রেখে দাদন খেয়েছে যারা, তাদের জমিতেই বা গাঁতায় খেটে কী হবে আমাদের। ধান তো যাবে জোতদার মহাজনের ঘরে—তারপর।

বরকত। আ-হা তা আছে সে সমস্যার কথা। এ তো আর কেউ অস্বীকার—

ফকির। তো তবে, ফলডা কী হবে এতে করে।

বরকত। তা বলি চেষ্টাডা' ত করতে হবে, না কী, হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকব সব!

ফকির। ভালো, দ্যাখো—কর চেষ্টা।

[ফকিরের প্রস্থান।]

বরকত। ফ'করেডা যেন একেবারে কী রকম ধারা মানুষ!

নিরঞ্জন। (দাওয়ার ওপর বসে তামাক সাজতে সাজতে) তা দাঁড়িয়ে রইলে কেন বরকত চাচা, বস; উঠে বস।

বরকত। হ্যাঁ বসি, বসি। (উঠে বসে)

নিরঞ্জন। (কলকেয় ফুঁ দিতে দিতে) মানুষ, এ মানুষের হুঁ। কখনও কি ভাবতে পেয়েছি বরকত চাচা যে আবার ভিটেয় ফিরে আসব, আবার ঘর বাঁধব, নতুন করে আবার—

[বরকতের দিকে চেয়ে থাকে।]

বরকত। (তামাক খেতে খেতে) এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই।

নিরঞ্জন। (ঘাড় নাড়ে) ঠিক ঠিক!—এক এক সময় মনে হয় বরকত চাচা, যে এ নৌকো বুঝি আর চললে না, থাকল আটকে পড়ে চোরাবালিতে ঐ মাঝ ডাঙায়। কিন্তু তারপরই দেখি যে না, আবার চলতে আরম্ভ করেছে নৌকো তর্ তর্ করে, টল টল করছে জল দরিয়ার। কোথায় চোরাবালি! অদ্ভুত, অদ্ভুত!

বরকত। সংসারের ধারাই তো এই। (দুজনে চুপ করে বসে থাকে কিছুক্ষণ) রাত হয়ে গেল নিরঞ্জন, আমি তা হলে উঠি এখন। (উঠে পড়ে)

নিরঞ্জন। আচ্ছা যাচ্ছ তো তা হলে মণ্ডলের বাড়ি?

বরকত। হ্যাঁ, তুমিও যেয়ো যেন।

[গমনোদ্যত।]

নিরঞ্জন। (পিছু পিছু এগিয়ে গিয়ে) হ্যাঁ নিশ্চয় যাব।

[বরকতের
প্রস্থান।]

(নিরঞ্জন ফিরে গিয়ে দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়ে। নিরঞ্জনের বউ বিনোদিনী দাওয়ার ওপর কেরোসিনের একটা ডিবরি জ্বালিয়ে রেখে উঠোনের একধারে চুলো ধরিয়ে ভাত চড়িয়ে দেয় মাটির হাঁড়িতে। আবছা, অন্ধকারে মেটে হাঁড়িটা পরিবেষ্টন করে আগুনের শিখা কেঁপে কেঁপে ওঠে। নিরঞ্জন শুয়ে পড়ে গান ধরে।)

(গান)

বড় জ্বালা বিষম জ্বালায়
পুড়ে পুড়ে হব সোনা,
সে কথা তো মিথ্যে হল
হলাম অনুপায়।
দুখের দাহন সুখের আসন
বিজ্ঞজনের হক্ কথা,
শুনে এলাম এই তথ্য।
চলতি পথের একতারায়।
হলাম নিরুপায়।।

[গান শেষে কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ।]

কুঞ্জ। (ক্লান্ত স্বরে) এও য্যানো আবার কার বাড়ি এসে উঠলাম। (দীর্ঘশ্বাস) হায় ভগবান!

রাধিকা। (ক্ষীণ কণ্ঠে) আর ঠাওরই করা যায় না অন্ধকারে।

নিরঞ্জন। (ধড়মড়িয়ে উঠে বসে) কেডা ও।—আরে কথা বলে কেডা ওখানে!

কুঞ্জ। (থতমত খেয়ে) এই—এই আমরা?

নিরঞ্জন। (উঠে দাঁড়ায়) আমরা! আমরা, কেডা তোমরা! বলতে পার!

কুঞ্জ। আমরা—আচ্ছা এখানে প্রধান সমাদ্দারের বাড়ি কোথায়?

নিরঞ্জন। প্রধান সমাদ্দার—(দুই তিন পা এগিয়ে বিস্মিতের ভঙ্গিতে) হ্যাঁ প্রধান সমাদ্দার, কিন্তু তাই কী, কেডা তোমরা!

কুঞ্জ। আমরা! (রাধিকার দিকে তাকিয়ে) নিরঞ্জন, নিরঞ্জনের মতন—

নিরঞ্জন। কথা বলে না। আলোটা নিয়ে আয় দিনি বউ।

[বিনোদিনী কেরোসিনের ডিবরিটা হাতে করে এগিয়ে আসে। লাল আলোতে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে বিস্মিতের ভঙ্গিতে চেয়ে থাকে এক মুহূর্ত।]

দাদা দাদা তুমি!

[বিনোদিনী রাধিকাকে বাহুবেষ্টনে আঁকড়ে ধরে।]

কুঞ্জ। (ভাঙা গলায়) সেই নিরঞ্জন বউ আমাদের। সেই নিরঞ্জন। (হঠাৎ ত্রস্তে) দেখি দেখি, তো দেখি, তো সেই যে আমি তোরে মেরেছিলাম মাথায় দেখি তো—(নিরঞ্জনের কপালে হাত বুলিয়ে) এখন আর ব্যথা নেই, না!

নিরঞ্জন। (অভিভূত হয়ে) না।

[উভয়ে আলিঙ্গন করে।]

কুঞ্জ। আমাদের নিরঞ্জন বউ।

কুঞ্জ নিরঞ্জনের মাথাটা বুকের মধ্যে টেনে নেয়।

(পটক্ষেপ)

দ্বিতীয় দৃশ্য

কুঞ্জর গৃহপ্রাঙ্গণ। সদ্য কাটা ফসলে ভরে গিয়েছে উঠোনটা। উঠোনের একধারে নিরঞ্জন মাথায় গামছার একটা ফেটা বেঁধে ধোপার পাটের মত উঁচু একটা বাঁশের ফ্রেমের ওপর ধান ঝাড়ছে, আর তার নিচে বহু ধান জমে আছে দেখা যাচ্ছে। রাধিকাকে ধামা ভরতি করে সেই ধান সংগ্রহ করতে দেখা যাচ্ছে। উঠোনের বাঁদিকে একটা নতুন ধানের মরাইয়ের সামনের দিকটা দেখা যাচ্ছে। মাথায় গামছার ফেটা বাঁধা একটা লোক সদ্য কাটা ফসলের বোঝা থেকে আঁটি আঁটি ধান নিরঞ্জনের হাতের কাছে জোগান দিয়ে চলেছে। নিরঞ্জনের পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আর একজন লোক ধান ঝাড়ছে। আর বিনোদিনী কূলো করে ধান উড়োচ্ছে। কুঞ্জ হুঁকো হাতে এদিক ওদিক ঘুরে ঘুরে সব খবরদারি করে বেড়াচ্ছে। উজ্জ্বল দিবালোকে কর্মব্যস্ত মানুষগুলোকে এতদিনে বেশ জীবন্ত মনে হচ্ছে দূর থেকে। অর্ধেক ধামা ধান ভরতি করে রাধিকার দিকে চেয়ে কি একটা রসিকতা করে বিনোদিনী হাসতে হাসতে ধানের ওপর প্রায় লুটোপুটি খাচ্ছে। রাধিকা দু'হাত কূলো ভরতি ধান মাথার ওপর তুলে ধরে হাসছে মুখ টিপে আর ধান ওড়াচ্ছে। নিরঞ্জন কয়েক আঁটি ধান উপর্যুপরি কয়েক বার ফ্রেমের উপর আছড়ে বাঁদিকের খড়ের গাদায় ফেলে দিয়ে হাঁপাতে থাকে। আর হাত দিয়ে কপালের ধান মুছে ফেলে হঠাৎ বিনোদিনীর দিকে নজর করে।

নিরঞ্জন। (হাস্যময়ী বিনোদিনীর প্রতি) দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো দ্যাখো কাণ্ড দ্যাখো! ওমা, দ্যাখো গলে পড়ল! খুব ধান তুলছিস যাহোক! এই রকম কাজ করলেই হয়েছে আর কী!

বিনোদিনীর হাসি আরও বেড়ে যায়। হাসতে হাসতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ধানের ওপর
ওমা, দে-দেখছ কাণ্ড! (কৃত্রিম রোষে) বউদি, তুমি বলছ না কিছু ওরে, আ গেল যা। কথা শুনে হাসতে হাসতে রাধিকার হাত থেকেও যেন কুলো পড়ে যাবার উপক্রম হয় হয়।

ওমা, তোমরা সকলেই তা হলে। কী হয়েছে কী বলদিনি তোমাদের সব?

বিনোদিনী। (হাসি সামলে) হাতির পা দেখিছি। (হাসতে থাকে)

[রাধিকাও হাসে।]

নিরঞ্জন। (কয়েক আঁটি নতুন ফসল নিয়ে) সেই রকমই মনে হচ্ছে বটে।

[ধান ঝাড়তে থাকে।]

রাধিকা। (হাসি থামিয়ে এক কুলো ধান তুলে বিনোদিনীর প্রতি) নে, কাজ কর কাজ কর। বেশি হাসি ভালো না। (হেসে নিরঞ্জনের দিকে ইঙ্গিত করে) যত হাসি তত কান্না বলে গেছে রামসন্না, জানলি!

নিরঞ্জন। (রাধিকার প্রতি) ঐ যে আসছে রামসন্না, দেখাবে'খন হাসি। (রাধিকা কাজে মন দেয়। বিনোদিনী মাথার ঘোমটা একটু টেনে দিয়ে ধান তুলতে থাকে। হাসো, এইবার হাসো!

[ধান তুলতে থাকে।]

কুঞ্জ। (রাধিকার দিকে এগিয়ে) কী, এগারো কাঠার মতো হয়েছে! তো তুলে দাও। (প্রসন্ন হেসে) আমার ধানডাই আগে পড়ুক।

রাধিকা। এগারো কাঠা কেন, দশ কাঠা বল।

নিরঞ্জন। দশ কাঠাই তো। তাই ঠিক হল না মণ্ডলদার বাড়ি বসে।

কুঞ্জ। দশ কাঠা। আচ্ছা তো আর এক কাঠা নয় আমি বেশিই দিলাম নিজের থেকে। এগারো কাঠা দাও। বেরিয়ে গেল যখন একবার মুখ থেকে—

নিরঞ্জন। (প্রসন্ন মুখে) তা সে বোঝো তুমি। মন চায় দ্যাও। ধর্মগোলায়ই তো যাবে, দ্যাও।

[দয়ালের প্রবেশ।]

দয়াল। কী ধর্মগোলায় যাবে?

[রাধিকা ও বিনোদিনী ঘোমটা টেনে দেয়।]

কুঞ্জ। এই যে, মণ্ডল এয়েছে।—না এই ধানের কথা হচ্ছে। বলছি বলি দাও তা হলে আমার ভাগডাই আগে দেই ধর্মগোলায়।

দয়াল। (হেসে টাকে হাতে বুলিয়ে) ভালো ভালো। তা উঠে গেছে তো সব ধান।

কুঞ্জ। হ্যাঁ তা প্রায় গেছে।

দয়াল। যাক্ (রাধিকার প্রতি হেসে) এইবার একদিন নতুন চালের পিঠে খাইয়ে দিও যেন বউমা।

কুঞ্জ। (হেসে) তা সে তো খাওয়াতেই হবে। নবান্ন আসছে।

নিরঞ্জন। আচ্ছা মণ্ডলদা, এবার নবান্ন উৎসব হবে না!

দয়াল। নবান্নের উৎসব, হ্যাঁ, কেন হবে না! নিশ্চয় হবে।

নিরঞ্জন। (হেসে) প্রতি বছর যে রকম হয় এবারও একেবারে সেই রকম ধূমধাম করে। লাঠা-টাঠি খেলা হবে।

দয়াল। হ্যাঁ।—আচ্ছা এবার আমি তোর সঙ্গে লড়ব, তৈরি হয়ে থাকিস।

নিরঞ্জন। (হেসে) আমার সঙ্গে, আচ্ছা! আচ্ছা!

দয়াল। (স্মিত মুখে) হাতলাঠি কিন্তুক।

নিরঞ্জন। আচ্ছা তাই।

দয়াল। হ্যাঁ; আর যদি না পারিস?

নিরঞ্জন। (উৎফুল্লভাবে) না পারি তো এক সের জিলিপি।

দয়াল। (কুঞ্জ ও আর সকলের প্রতি) শুনলে কিন্তু তোমরা সব। এক সের জিলিপি খাওয়াবে নিরঞ্জন আমারে হেরে গেলে পরে। (নিরঞ্জনের প্রতি) আবার দেখিস।

[গমনোদ্যত।]

নিরঞ্জন। (হেসে) হ্যাঁ সে আমি দেখিছি, দেব এক সের তা কী হয়েছে।

[দয়াল গমনোদ্যত।]

কুঞ্জ। মণ্ডলদা চললে নাকি?

দয়াল। হ্যাঁ মাঠের থেকে ঘুরে যাই একবার।... আজ তো বরকতের পালা, নাকি?

কুঞ্জ। হ্যাঁ, আচ্ছা তো এগোও তুমি আমি যাচ্ছি।

[দয়ালের প্রস্থান।]

নিরঞ্জন। (গদগদ হেসে) উ-উ-উঃ, মণ্ডলদা যে সে একেবারে—

রাধিকা। (ঘোমটা খুলে) বুড়ো হলেও মণ্ডলদার তো এখন বেশ শখ আছে দেখি।

বিনোদিনী। (হেসে) মণ্ডলদা কিন্তু বেশ ভালো লাঠি খেলা জানে, হ্যাঁ। কথা তো দিলে, শেষ কালে দশজনের সামনে বুড়োর কাছে আবার অপদস্থ না হও। তা হলে আর—

নিরঞ্জন। ওগো হ্যাঁ, রাখদিনি তুমি! কত মাতব্বর মণ্ডল দেখে এলাম!

রাধিকা। (ঠাট্টার সুরে হেসে) ও এক সের জিলিপি তোমার গেছে যাই বল!

কুঞ্জ। ন্যাও কী হল, হয়নি এগারো কাঠার মতো এখনও! না, হাসবে আর শুদ্ধু মস্করা করবে তার কাজ হবে কী করে!

রাধিকা। (কৃত্রিম রোষে) ওমা, তা তুলবে তো তোলো না ধান ধর্মগোলায়, আমি কি বারণ করছি। আ গেল যা! একেবারে খেয়ে ফেললে কানের মাথা এগারো কাঠা এগারো কাঠা করে।

নিরঞ্জন। তা হয়ে তো গেছে, এইবার তুলে ফ্যালো না।

রাধিকা। ভর লো বিনো ধান কাঠায়।

কুঞ্জ। ধর্মগোলায় ধান দিবি কালো মুখ করে যেন দিসনি বউ। স্মরণ করে দ্যাখ, এই ধান—

রাধিকা। ওমা, কালো মুখ করব ক্যানো। ধর্মগোলায় ধান উঠবে তার আবার—ন্যাও ধরো।

(কূলো নামিয়ে রেখে রাধিকা বিনোদিনীর কাছ থেকে ধামা ভরতি করে ধান নিয়ে কুঞ্জর হাতে দেয় তার কুঞ্জ গোলার বন্ধ পথে ধান চালতে থাকে। নিরঞ্জন যেমন তেমনই ধান ঝাড়তে থাকে। বিনোদিনী আর একটা ধামার ধান ভরতি করতে থাকে।)

কুঞ্জ। (গোলায় ধান ঢালতে ঢালতে) কার ধান—আর কে দেয়! এই জমি বিক্রি করা নিয়েই বা কত, হুঁঃ! সংসার, সংসার—আসবার সময় দেখাড়া পর্যন্ত হল না। কোথায় যে গেল! হয়তো মরেই গেছে য়্যাদ্দিন—যাগ্‌গে আমার কাজ আমি করে যাই।

রাধিকা। (দ্বিতীয় ধামা ভরতি ধান নিয়ে) কই গো ধর।

কুঞ্জ। ও, এই যে, ন্যাও এই—

[খালি ধামাটা কুঞ্জর হাত থেকে রাধিকা বিনোদিনীর হাতে দিল।]

রাধিকা। নে লো।

[গায়ে ঢিলে আলখাল্লা পরা জনৈক ফকিরের প্রবেশ।
হাতের সাদা চামর দুলিয়ে গাইতে লাগল।]

পেছনে দুজন ফকিরের দোহার, ধুয়া ধরে চলে—'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম'।

ফকির। (ডাক ছেড়ে বিড় বিড় করে কী সব বলতে লাগল) ও-ো-ো (বিড় বিড় করতে লাগল)

আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান।
হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।।
এ ছাড়া আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।
আজও যদি শিক্ষা না হয় শিক্ষা হবে কবে।।
(এখন) বুঝে শুনে যেবা জন পৃথক হয়ে রয়।
ছয় মাসের মধ্যে তার এন্তেকাল ফরমায়।।
খলিলপুরের জব্বর মিঞার দুঃখের কথা জানো।
প্রতিবেশী পতিত পাবন বৈরী যে কারণ।।
কালান্ত আকালে এমন কত চাষী ভাই।
অকালে যে প্রাণ হারাইল লেখা জোখা নাই।।
গরু বাছুর মরল কত হিসাব কে তার রাখে।

নারী শিশু প্রাণ হারাইল কত লাখে লাখে।।
ঘরের বউ বাউরা হইয়া উধাও হইয়া যায়।
এ নহে জঘন্য বৃত্তি জীবনের দায়।।
বালবাচ্চা কচি শিশু দুধ না পাইয়া মরে।
জননী প্রেতিনী হইল বুকে রক্ত ঝরে।।
কোমরে কাপড় নাই বস্ত্র অনটন।
গৃহস্থের হইল দায় লজ্জা নিবারণ।।
কলসকাঠির এরশাদের বউ বললে কেঁদে ডেকে।
কবর খুঁড়ে কাপড় নিয়ে তবে লজ্জা ঢাকে
বাঁচিয়া মরিয়া আছে গৃহস্থ সজ্জন।
ঘরে ঘরে অপমৃত্যু কারণ অনশন।।
মাঠে ঝরে পাকা ধান আর চোখে পানি।
শক্ত করে ধরো হাল হালে পাবে পানি।।
এ জীবনের প্রহসনে কী বা বল ফল।
বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল।।
আমন ফসল শুভ-লক্ষণ প্রতি ঘরে ঘরে।
গাঁতায় খাটিয়া তোলো মিলি পরস্পরে।।
ক্ষুদ্র বুদ্ধি স্বার্থ সিদ্ধি গৃহস্থের নয়।
ছোট মুখে বড় কথার এই মর্ম হয়।।

পূর্ণ ধুয়া— আপনি বাঁচলে তো...দোস্তালি পাতান।।

ফকির। মা...গায়েন ফকিরকে মুশকিল হইতে আসান করবেন।

রাধিকা ছোট একটা বেতের সাজিতে ভরে ফকিরের ঝুলিতে ধান ঢেলে দেয়।

(পটক্ষেপ)

তৃতীয় দৃশ্য

মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা। সূর্য ডোবে ডোবে। গোধুলি আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে গেছে চরাচর। আজ নবান্ন-উৎসব। গ্রামের আবাল বৃদ্ধবনিতা তাই ভিড় করছে এই মরা গাঙের ধারে। স্বাস্থ্যহীন শরীরগুলোতে আজও বিগত আকালের কলঙ্কছাপ সুস্পষ্ট। তবু আজ এই স্বর্ণসন্ধ্যায়, এই মরা গাঙের ধারে চলেছে নবান্নের উৎসব। অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে সব কৃষান-কৃষানীরা। চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে যে সমস্ত চরিত্রগুলো সভায় যোগদান করেছিল বিভিন্ন বেশে এই উৎসবে আজ তারা সকলেই সমুপস্থিত। সকলেই গৃহস্থ চাষী। বেশির ভাগ লোকেরই খালি গা, সঙ্গে একখানা গামছা—মাথায়, কোমরে বা কাঁধে।

নেপথ্য থেকে মাঝে মাঝে গরুর ডাক শোনা যাচ্ছে। আর থেকে থেকে গরুর গলার ঘন্টার শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঢোলের শব্দ দু'চারবার পাওয়া যাচ্ছে প্রথম দিকেই।

পর্দা সরে যেতেই দেখা যাচ্ছে স্টেজের একদম পেছন দিকে Shadow play দেখবার জন্যে চার ফুট উঁচু একটা প্রাচীরের সামনে চাষী মেয়েরা সব দলে দলে পা ছড়িয়ে ব'সে গান করছে আর পান খাচ্ছে। কপালগুলো তাদের সব তৈলাধিক্যে চকচক করছে। কলহাস্যে মুখর পরিবেশ।

আর সামনে খালি গায়ে চাষীরা লড়ায়ে মোরগ কোলে করে বসে আছে। মোরগদের পায়ে সুতো বাঁধা, মাঝে মাঝে ডানা ঝাপটে শব্দ করে উঠছে। চাষী রমণীদের গান শেষ হতেই মোরগের লড়াই শুরু হল। ভিড় করে দাঁড়াল সব দর্শকরা। জোড়ায় জোড়ায় লড়াই। যে বাজী জিতল তাকে নতুন একখানা গামছা আর একখানা কাস্তে দিয়ে সম্মানিত করা হল।

মোরগের লড়াই শেষ হতেই চাষীদের একটা গান শুরু হল, আর সেই গান ছাপিয়ে নেপথ্যে উঠল ধাবমান গরুর ক্ষুরের শব্দ—গরু-দৌড় হচ্ছে। এই দৃশ্যটি Shadow play করে দেখাতে হবে। পিচবোর্ডের গরু বা বড়ো পুতুলের সাহায্যেও এটা দেখানো যেতে পারে। এই সময় গরুর গলার ঘন্টাগুলো সব একসঙ্গে জোরে ঝম ঝম করে বাজতে থাকবে আর নেপথ্যে হুড় হুড় দুড় দুড় শব্দ হবে। অনুসন্ধান করে যার গরু বাজি জিতবে জানা যাবে তাকে একখানা নতুন কাপড়, একখানা গামছা আর একখানা নতুন লাঙল উপহার দিয়ে সম্মানিত করা হবে।

গরু দৌড় শেষ হতে সঙ্গে সঙ্গেই আরম্ভ হল তুমুল ঢোল আর কাঁসর বাজনা। এইবার লাঠিখেলা। ঢোলের সঙ্গে তাল রেখে বেতের ঢাল আর হাতলাঠি নিয়ে দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ শুরু হল নৃত্যছন্দে। দু-একটা লড়াই হয়ে যাবার পর তৃতীয় রাউণ্ডের জোর একটা লড়াই-এর শুরুতে প্রধান এসে হাজির হল।

[(কৃষকরমণীদের গান)]

নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি
ডুরে শাড়ি পাছাপাড় আর হার সাতনলি।
ক'নে দেখা আলো মেখে আসবে বঁধু আল বেয়ে
দেখে হেসে সরে যাবি কথা না কয়ে।।

চারজন চারজন আটজন লোক ঝুঁটিওয়ালা আটটা মোরগ কোলে করে বসে আছে। প্রত্যেকটি মোরগের পায়ের সঙ্গে সুতো বেঁধে বাঁহাতের তর্জনীর সঙ্গে পেঁচিয়ে বাধা আছে; উড়লেও উড়ে যেতে পারবে না। সকলেই যে যার মোরগের তারিফ করছে মাথায় হাত বুলিয়ে। গান শেষ হতেই কথাবার্তা শুরু হল।

১ম সারির ১ম ব্যক্তি। (মোরগ উড়ে যাবার চেষ্টা করতেই ধরে) আরে র-র-বেটা-র। বাজি জিতবে বলে একেবারে তর সইছে না, য়্যাঁ!

২য় সারির ৪র্থ ব্যক্তি। (মোরগ ডানা ঝাপটাতেই)। বাপুরে, বাপুরে বাপুরে তেজ। মেজাজ চড়ে গেছে বাবুর কথাবার্তা শুনে। দ্যাখো না, একেবারে ডগমগ করছে চোখ! লড়বা, লড়বা, সবুর।

২য় সারির ৩য় ব্যক্তি। (মোরগ কোলে করে) আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়ে! (মোরগকে লক্ষ করে) সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এডারেই! এট্টু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এর! হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এর!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (১ম সারির ২য় ব্যক্তির প্রতি) তা ও বাচ্চাডারে ধরে এনেছ কেন মিঞা? সব ডাঁটো ডাঁটো মোরগ এক বাজির তালও সামলাতে পারবে না ঐ বাচ্চা।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (একটু মুখ টিপে হেসে হেসে) কোন বাচ্চা!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। তোমার কোলের মোরগের কথা বলছি। বলছি বলি আনলে যখন তখন ভালো দেখে একটা খাসি আনলেই পারতে!

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (একটু উপেক্ষার হাসি হেসে) বলতে পার!

১ম সারির ৩য় ব্যক্তি। (২য় সারির ১ম ব্যক্তির প্রতি) বলি খুব তো লম্বাই চওড়াই বাত বলছ। ও মোরগ কোথাকার জানো?

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (থতমত খেয়ে) কোথাকার!

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (১ম সারির ৩য় ব্যক্তির প্রতি) আরে চুপ করে যাও; কান আছে শুনে যাই।

১ম সারির ৩য় ব্যক্তি। হুঃ চ'রে মোরগ। ওর জাতই ঐ, দেখতে ছোটো। কিন্তু একেবারে বিচ্ছু।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। কত বড়ো বড়ো পালা খাসি বলে তিন ঝাপ্পড়ে লটকে ফেলে ভুঁই-এ! বিষটা তো জানো না এর; তাই বাচ্চা বলছ।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। (১ম সারির ২য় ব্যক্তির মোরগের ঠোঁটে হাত দিয়ে) ঠোঁটটাই দ্যাখো না, শক্ত যেন একেবারে ল্য। ব্যাটা ঠোকরায় তো না যেন ছুরি চালায়।

[হাতের টিপ খেয়ে মোরগটা ডেকে উঠল।]

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। (হতাশ হয়ে) আমার পালা খাসি।

১ম সারির ২য় ব্যক্তি। ও দেখেই বুঝিছি, আবার বলবা কী। ভাত খেগো তো!

২য় সারির ১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ।

[১ম সারির ২য় ব্যক্তি অশ্রদ্ধার ঘাড় বেঁকিয়ে বসল। দয়ালের প্রবেশ।]

দয়াল। কী বসে আছ যে তোমরা সব মোরগ কোলে করে। এইবার শুরু করে দাও।

১ম সারির ১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ তো জজেরা এলেই এবার আরম্ভ হতে পারে লড়াই।

দয়াল। জজেরা, তা এসে গেছে তো সব জজেরা। (হাঁক দেয়) বলি ও কুঞ্জ, আর বরকত মিঞারে সঙ্গে নিয়ে এদিকে এসো। মোরগের লড়াইডা হয়ে যাক। (প্রতিযোগীদের

প্রতি) তো ন্যাও শুরু করে দাও এইবার। (মোরগগুলো দেখে) জবর জবর মোরগ এয়েছে তো দেখে এবার।

(প্রথম ও দ্বিতীয় সারির পিছনে জজেরা ও জনতা ভিড় করে দাঁড়ায়। মাঝখানে জোড়ায় জোড়ায় লড়াই শুরু হয়। দর্শকেরা লড়াইয়ে রত মোরগদের তারিফ করে—বারে বেটা, আহা, াহা, মার প্যাঁচ ঝাপটা মার মার ঝাপটা, বেশ, বেশ ইত্যাদি।

নেপথ্যে ঘুঙুরের বোল সহ মেয়েদের গান আবার শোনা যায়। মিনিট দুই তিনেক সময়ের মধ্যেই মোরগের লড়াই শেষ হয়। দ্বিতীয় সারির চতুর্থ ব্যক্তির মোরগ বাজি জেতে। তখন তাকে সবাই মিলে উঁচু করে তুলে ধরা হয় সর্বজন সমক্ষে!)

কুঞ্জ। (সহাস্য মুখে ঘোষণা করে) ফেকু মিঞা, মোরগের লড়াইয়ে বাজি জেতার জন্যে ফেকু মিঞারে উপহার দেওয়া হল—এই একখানা গামছা আর একখান কাস্তে। ফেকু মিঞা হাসি মুখে দু'হাত পেতে উপহার নিল। সকলে তখন আবার তুমুল হর্ষধ্বনি করে ফেকু মিঞাকে সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরল।

ফেকু মিঞা। (সহাস্য মুখে) আরে দ্যাখো কী করে, পড়ে যাব পড়ে যাব।

সকলের গান

(আহা) ফেকু মিঞার মোরগ জিতেছে।
দেমাকে মিঞার দাড়ি ফুলে উঠেছে।
(আহা) ফেকু মিঞার মোরগ জিতেছে।

দুই চার ফেরতা গাওয়ার পর সামনের জনতা পাতলা হয়ে যায়। ত্রস্ত গতিতে সব পেছন দিকে ছুটে চলে। এই সময় নেপথ্যে ধাবমান গরুর ক্ষুরের শব্দ উঠবে আর সঙ্গে সঙ্গে রিনটিন টুং টাং ঝমা ঝম্ ঝম্ ঘন্টার আওয়াজ হতে থাকবে। Shadow play-র সাহায্যে দু'চারটে গোরু বৃহদাকারে দেখানো যেতে পারে একদম পেছনের সাদা পর্দায়। পর্দার গায় ছায়াছবিতে গোটা দুয়েক গোরুর ঊর্ধ্ব পুচ্ছ দেখিয়েও গতিবেগটা বোঝানো যেতে পারে। নেপথ্যে এই সময় চলতে থাকবে অবিরাম দ্রুত হুড় হুড় হুড় হুড় আওয়াজ। হট্টগোলের মাঝখানে দু একবার হাম্বা রবও শোনা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পরে একজন চাষীকে কাঁধে করে জনতা হর্ষধ্বনি করতে করতে ঢুকল।

নেপথ্যে থেকে শোনা যায়, আরে গোরু জিতল কার? মঞ্চের উপর ভিড়ের ভেতর থেকেই উত্তর হল, রহমৎউল্লার। রহমৎউল্লাকে ঘাড়ে করে চাষীরা নাচছে।

কুঞ্জ। (গণ্ডগোলের ফাঁকে ফাঁকে জোর গলায় ঘোষণা করে) প্রতি বছর, প্রতি বছর যে রকম গোরু আসে এমন দিনে, এবার তেমন মোটেই আসেনি। কারণ বলদ যা ছিল, প্রায়ই সব মরে গেছে, আর যে-গুলো এখনও টিঁকে আছে ঝড়-ঝাপটার পর, সে-গুলিও খুব কাহিল। প্রথমত গোরু-দৌড় এবার বন্ধই রাখা হবে বলে সাবস্ত্য হইছিল। তারপর অবশ্য

মণ্ডলের কথায়, গোরু দৌড় হবে ঠিক হল। মণ্ডল বলিছিল, গোরুই আমাদের এ উৎসবের প্রাণ সুতরাং কাহিল হোক আর যাই হোক গোরু দৌড় এবারেও হবে। বলদগুলোর শরীরে তাকত নেই, তাই গোরু-দৌড় এবার তেমন জুত্সই হল না। তা সে যা হোক, আসেনি কারও তেমন জুতসই বলদের সংখ্যা এবারে একেবারে কম হয়নি। আর যে দৌড় হল, তাতে করে রহমৎউল্লার গোরু বাজি জিতেছে। তাই উপহার হিসেবে রহমৎ ভাইকে এবার একখানা নতুন কাপড় আর একখানা লাঙল দেওয়া হবে। লাঙলখানা দিয়েছেন আমাদের দয়াল মণ্ডল।

(জনতা রহমৎউল্লাকে তুমুল হর্ষধ্বনি করে আবার একবার সর্বজন সমক্ষে উঁচু করে ধরে নামিয়ে দেয়। রহমৎউল্লাকে পেছন দিক থেকে ঠেলে সামনে এগিয়ে দেওয়া হল। দয়াল মণ্ডল সহাস্য মুখে রহমৎউল্লার হাতে একখানা নতুন কাপড় ও একখানা লাঙল তুলে দেয়।)

দয়াল। আসছে বারে ভালো বলদ আনা চাই।

[রহমৎ গদগদ হয়ে হাসে আর জনতা তুমুল হর্ষধ্বনি করতে থাকে।]

কুঞ্জ। জোরসে হাল চালাবা এবার আর কী!

সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্যে শুরু হয় তুমুল ঢোল কাঁসির আওয়াজ। ছন্দ যেন দুলে দুলে উঠছে থেকে থেকে। এবার লাঠিখেলা। বাজিয়েরা মঞ্চের উপর নেচে নেচে প্রদক্ষিণ করতে লাগল। জনতা লাল কৌপিনপরা দুজন লাঠিয়ালকে পরিবেষ্টন করে দাঁড়াল। লাঠিয়ালদের বাঁহাতে বেতের ঢাল, আর ডানহাতে হাতলাঠি (নড়ি)। বাজনার তালে তালে পা ফেলে লাঠি খেলতে লাগল। প্রথম রাউণ্ড শেষ হতেই ঢোলের আওয়াজ সাময়িকভাবে তিনবার দুনে বেজে বন্ধ হতে না হতেই দ্বিতীয় রাউণ্ডের দুজন লেঠেলের মল্লভূমে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে আবার বেজে উঠল দুনে নৃত্যছন্দে। এবারকার লেঠেলরা খুব কায়দা করে খেলা দেখাল। দ্বিতীয় রাউণ্ডের বিরতির পর বৃদ্ধ দুইজন লাঠিয়ালের খেলা শুরু হল। প্রথম দিকে টিমে তালে খেলা শুরু হবার একটু পরেই দেখা গেল দূরে ঢোলের ছন্দ পায়ে তুলে প্রধান আসছে নাচতে নাচতে। নেপথ্যে মেঘের গুরু গুরু ধ্বনি।

১ম দর্শক। উত্তরে মেঘ হয়েছে, এট্টু তাড়াতাড়ি নাও।

কেউ শুনল না। বাজনার তালে তালে পুর্ণোদ্যমে শুরু হল লাঠিখেলা। দুলে উঠতে লাগল ঢোলের বাজনা আর কাঁসির শব্দ থেকে থেকে। হঠাৎ লাঠিখেলার মাঝখানে দু চারজন দর্শকের দৃষ্টি গিয়েপড়ল প্রধানের ওপর। মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে তাকাতে লাগল তারা প্রধানের দিকে—যেন কিছুতেই চিনে উঠতে পারছে না লোকটাকে। প্রধান গাঁই-গুঁই শব্দ করতে করতে এগিয়ে আসতে থাকে। হঠাৎ জনৈক দর্শক চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে। গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি।

২য় দর্শক। (খুব জোরে চেঁচিয়ে ফেটে পড়ে) মোড়ল, মোড়ল এয়েছে! মোড়ল!

(আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে প্রধান এগিয়ে আসে মাথা নাড়তে নাড়তে আর হাসে।

সকলের দৃষ্টি প্রধানের ওপর গিয়ে নিবদ্ধ হয়। জনতা এক পাশে সরে দাঁড়ায়। ঢোল থেমে যায়।)

প্রধান। আমি এইছি, এসে পড়েছি আমি।

(জনতার মাঝখানে বীর লাঠিয়ালের বেশে লাল কৌপিন পরে দাঁড়িয়ে আছে দয়াল। চোখ মুখ উদ্ভাসিত হয়ে গেছে তার অপূর্ব এক আনন্দে। কিন্তু কথা বলতে পারছে না। কুঞ্জ, নিরঞ্জনও নির্বাক হয়ে গেছে।)

আমি এসে পড়েছি। এসে পড়েছি আমি।

কালো একখানা মেঘ উঠে আসে ধীরে ধীরে উৎসবের মাথার উপর।

দয়াল। (বিশ্বাস যেন হয় না, তাই নিম্ন স্বরে) প্রধান, প্রধান এলে! প্রধান!

কুঞ্জ। (চিৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে প্রধানকে) জেঠা! জেঠা! জেঠা!

প্রধান। (স্মরণে আসে কি আসে না তাই দ্বিধা) য়্যাঁ, য়্যাঁ, কুঞ্জ আমার কুঞ্জ!

[কুঞ্জর মুখটা দু-হাতে ধরে দেখতে লাগল!]

কুঞ্জ, কুঞ্জ!(গরু গরু মেঘের ধ্বনি)

দয়াল। (এগিয়ে এসে) প্রধান চিনতে পারো এই বুড়োরে য়্যাঁ, চিনতে পারো!

(এক গাল দাড়ি মাথার চুলের জট থেকে মুখের ওপর এসে পড়েছে প্রধানের! সেই বিকৃতদর্শন মুখখানার ওপর যেন হঠাৎ জ্বলে উঠল শাণিত দৃষ্টিটা।)

প্রধান। (তর্জনী তুলে) তুমি, তুমি বাবুরালি—(পাথরের মূর্তির মত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে দয়াল) য়্যাঁ, য়্যাঁ তুমি, কৃপনাথ।

[দয়াল কোনো সাড়া দেয় না!]

তুমি, তুমি, কেডা তুমি? (কৌতূহলী করুণ হেসে) দয়াল! দয়াল! তুমি দয়াল!

দয়াল। য়্যাঁ, স্মরণে আসে, প্রধান?

প্রধান। (হেসে তর্জনী তুলে) হ্যাঁ, আসে স্মরণে আসে। দয়াল! দয়াল! তুমি দয়াল।

(দু-ফোটা জল গড়িয়ে পড়ে চোখ দিয়ে প্রধানের। গুরু গুরু মেঘের ধ্বনি।)

দয়াল। আজ আমাদের নবান্নের উৎসব প্রধান।

প্রধান। নবান্নের উৎসব! ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো। সুদিন পড়েছে সব! দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন। আর আসবে না।

দয়াল। যদি আসেই, তো ডর কিসের!

প্রধান। ডর নেই! দুখেরে ডরাও না; য়্যাঁ, ডরাও না দুখেরে! বেশ, বেশ, বেশ ভলো। ভালো। ভালো।

দয়াল। ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরা! আমরা তো বেঁচেই আছি। এই যে তোমার কুঞ্জ, নিরঞ্জন, এই যে বরকত, সখীচরণ। চেনে তো সব এদের? কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।

প্রধান। মরনি, মরনি মন্বন্তরে, ভালো। ভালো। ভালো। কিন্তু দয়াল, মন্বন্তর যদি আবার আসে! আবার যদি আসে সেই মন্বন্তর!

(গুরুগুরু মেঘের আওয়াজ। জলভরা কালো মেঘের একটা অংশ উঠে এল উৎসব অঙ্গানের এক চতুর্থাংশের ওপর কালো ছায়া ফেলে।)

(মেঘের দিকে লক্ষ্য করে) এই দ্যাখো নিচে এই উৎসব, কত আহ্লাদ, কত আনন্দ, কিন্তু আবার ঐ ঐখানে, ঐ ওপরে, দ্যাখো কত বড়ো একটা গোলযোগ গুঁড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। কত বড়ো একটা গোলযোগ! কত বড়ো একটা—

[বিকৃত মুখে মাথা নাড়তে লাগল।]

দয়াল। জানি প্রধান, মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, যে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন; আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!

প্রধান। (জোরে চীৎকার করে ফেটে পড়ে জড়িয়ে ধরে দয়ালকে) দয়াল!

যবনিকা

৮৬.১৪ সারাংশ ঃ (নবান্ন ঃ চতুর্থ অঙ্ক)

আবার সেই আমিনপুর। কিন্তু এ যেন এক নতুন গ্রাম। হকচকিয়ে যায় তারা। এখানে বাড়ি উঠেছে। তাই কুঞ্জ বলে, এও য্যানো আবার কার বাড়ি এসে উঠলাম।' রাধিকা ক্লান্ত অবসন্ন ক্ষীণ কণ্ঠে উচ্চারণ করে, 'আর ঠাওরই করা যায় না অন্ধকারে। তাদের কণ্ঠস্বর শুনে ধড়মড়িয়ে উঠে বসে নিরঞ্জন। তারপর দুই ভাই আর দুই বৌ-এর মিলন হয়—এক বিষাদঘন মমতামেদুর পরিবেশ সৃষ্টি ক'রে।

[৪র্থ অঙ্ক, ১ম দৃশ্য]

অপরদিকে। প্রধান, কুঞ্জ আর রাধিকাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে এক হাসপাতালে। প্রায় উন্মাদগ্রস্ত প্রধানের চোখ দিয়ে হাসপাতালের চিকিৎসা ব্যাপারে নিদারুণ দুরবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। **[৩য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য]** তারপর ওখান থেকে প্রধান ঘুরতে ঘুরতে ফিরে আসে গ্রামে। আমিনপুরে সে যখন ফিরে আসে তখন গোটা আমিনপুরের চালচিত্রটাই গেছে বদলিয়ে। দুর্ভিক্ষ আর হাহাকারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে আমিনপুর। ফিরে পেয়েছে তার পূর্বেকার স্বাভাবিক জীবনযাত্রা। নবান্নের উৎসবে মুখর হয়ে উঠেছে সমস্ত গ্রামটা। নবান্নের উৎসবমুখর আনন্দঘন দিনে আমিনপুরের হিন্দু-মুসলমান অধিবাসীবৃন্দ তাদের প্রাণের প্রধানকে ফিরে পেয়ে আত্মহারা হয়ে ওঠে। দয়াল জানায়—'আজ আমাদের নবান্নের উৎসব প্রধান।' **[৪র্থ অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]** শোষণমুক্ত সমাজের

স্বপ্ন নিয়ে তার আনন্দ, তার উৎসবের আয়োজনে দৃঢ়সংকল্প ঘোষণায় নাটকের পরিসমাপ্তি। 'নবান্ন' নাটকে এটি আর একটি নূতন মাত্রা সংযোজন করেছে। হিন্দু-মুসলমানের মিলনের ইঙ্গিত, এই নাটকের আর একটি বৈশিষ্ট্য। গণচেতনা বৃদ্ধির এই প্রচেষ্টা 'নবান্ন' নাটকের উজ্জ্বলতম দিক। যে মানুষ একসময়ে প্রাণঘাতী দাঙ্গার সামিল হয়ে পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হয়, সেই মানুষেরাই হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে উৎসবের আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রতিশ্রুতি রচনা করেছে।

প্রধানও সেই আনন্দে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঘটনার ঘনঘটায় সে মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিল। ঘটনার সুস্থিরতায় হৃত ভারসাম্য পুনঃ অর্জিত হয়। স্বাভাবিকভাবে সে নবান্নের উৎসবে যোগ দেয়। 'নবান্নের উৎসব! ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো! সুদিন পড়েছে সব! দুঃখের দিন সব কেটে গেছে। কেটে গেছে সব দুঃখের দিন।' কিন্তু তবুও মনের তলায় তির তির করে বয়ে চলে সংশয়ের স্রোত। তাই তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, 'আর আসবে না'

প্রধানের আশঙ্কার উত্তর দেয় দয়াল বলিষ্ঠ বিশ্বাসভরা দৃঢ় সংলাপে—'জানি প্রধান মানি তোমার আশঙ্কা। কিন্তু একথাও জেনো প্রধান, যে গতবারর মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে, আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন, আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব...ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের।...কিছুতেই না। এদের নিতে হলে...এট্টা ব্যবস্থার ওলট পালট করে ফেলে দিতে হবে, তবে যদি পারে। জোর জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার। জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ।

[৪র্থ অঙ্ক, শেষ দৃশ্য]

নবান্নের উৎসব মুখর দিনে দয়ালের প্রত্যয় দৃপ্ত শপথের মধ্যে নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে। কাহিনীর সমাপ্তি সংলাপ স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করছে এই নাটক প্রতিরোধের নাটক। সুতরাং এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে এই মন্তব্য খুবই যুক্তিগ্রাহ্য হবে যে গতানুগতিকতা বর্জিত 'নবান্ন' বাংলা নাট্যসাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র সংযোজন, একটি অনন্য আস্বাদ, একটি অনাবিষ্কৃত দিগন্তের বার্তাবাহী।

৮৬.১৫ অনুশীলনী ২

১। শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) তা ও বেঁচে থাক বাবা........................ , বেঁচে থাক আমার...................... , না হয় .... পয়সা নেবে, জিনিষটি তো ঠিক পাওয়া যাবে।

(খ) থাকবার মধ্যে................. ছিল, গেল। গেল। পথে নেমে দাঁড়াবারও .... সইল নারে কুতুও, ... ঘরে উঠে এল। ঘর বার সব .... হয়ে গেল।

(গ) আপনি বাঁচলে তো .... মিথ্যা সে .... । .... যতেক চাষী .... পাতনি।

২। (ক) "কুঞ্জ ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ। শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।" —প্রসঙ্গটি কী? বক্তা কে? কাকে বলেছেন? উক্তিটির তাৎপর্য বুঝিয়ে লিখুন।

(খ) “আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।” —প্রসঙ্গটি কী? বক্তা কে? মন্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

(গ) “ মানুষের ভেতরকার এই যে এট্টা ইয়ে, এ তুমি রোধ কর কী করে। মানুষ তো বাঁচিতে চাইবেই।”—কোন পটভূমিকায় কে এই কথাগুলি বলেছেন? কথাগুলির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

(ঘ) “এই তো ইতিহাস। উৎরোই আর চড়াই, চড়াই আর উৎরোই।” কোন্ প্রসঙ্গে কে কাকে এ কথা বলেছেন?

৩। শব্দার্থ লিখুন ঃ

লোভানি, খেলাপ, শরম, ইজ্জৎ, অনাহক, গাঁতা, ‘ ব্যাদরা ছেলে’ আহাম্মক।

৮৬.১৬ উত্তর সংকেত

অনুশীলনী—১

১। উদ্দেশ্য পর্যায়ে ৮ টি উদ্দেশ্যের পরিচয় দেওয়া আছে। এ থেকে যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

২। (ক) আগুন (১৯৪৩), খ) ১৯৪৪, গ) ২য় বিশ্বযুদ্ধ। ভারত ছাড়ো ও ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন, জনযুদ্ধ নীতি।

(খ) মেঘে ঢাকা তারা, সুবর্ণরেখা, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো।

৩। ‘অরণি,দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের, শ্রীরঙ্গাম।

৪। (ক) ৬.৪ -এ মূলপাঠ ১-এর ক) অংশ ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

(খ) অঞ্জনগড়, কেরানী, ল্যবরেটরী, আগুন, হোমিওপ্যাথী ও জবানবন্দী—এর যে কোন তিনটির নাম উল্লেখ করুন।

৫। এই পর্বের নাটকের বিষয়বস্তু সমাজের কৃষক, শ্রমিক অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষ ও মধ্যবিত্তের শোষণ-বঞ্চনা। লক্ষছিল এই মানুষগুলির মধ্যে প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগঠনের মাধ্যমে নিরন্তর লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বাঁচবার প্রেরণা সঞ্চার করা।

অনুশীলনী—২

১। (ক) ব্ল্যাক মার্কেট, মজুতদার, চতুর্গুণই।

(খ) খরখানাই, তর, পথই, একাকার।

(গ) বাপের নাম, বয়ান, হিন্দু, মুসলিম, দোস্তালি।

২। (ক) ৪২-এর আন্দোলনে অংশ নিয়ে প্রধান সমাদ্দারের দুই পুত্র শ্রীপতি, ভূপতি শহীদ হয়েছে। এই শূণ্যতা বোধ থেকে প্রধান কুঞ্জকে চিত্ত বিহ্বলতা জনিত কারণে এই উক্তি করেছেন।

(খ) ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে পুলিশী অত্যাচারে ভীত সন্ত্রস্ত বাংলার গ্রামবাসীরা যখন ঘরবাড়ী ছেড়ে বনে বাদাড়ে আশ্রয় নিচ্ছে তখন এ দৃশ্য দেখে পঞ্চাননী ক্ষোভে দুঃখে কুঞ্জকে একথা বলেছেন।

(গ) চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে 'দয়াল' এই কথাগুলি বলেছেন। যুদ্ধ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, মন্বন্তরে-এ যে মানুষগুলি গাঁ ছাড়া হয়েছিল, দুর্যোগের অবসানে তার একে একে গ্রামে ফিরেছে। নতুন করে ঘর বেঁধে, জীবনযাত্রা শুরু করার কালে একে অপরের সঙ্গে কথাবার্তায় নিজ নিজ অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছে। দিগম্বরের কথায় সামান্য হতাশার সুর বাজতেই বললেন, মানুষতো বাঁচতেই চায়। এটাইতো মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মন্বন্তরে সর্বহারা নিরঞ্জন দেখ না নতুন করে ঘর বেঁধে সকলকে নিয়ে সভা করে , আগামী দিনের সংকট উত্তরণের কথা বলছে। এটা স্বাভাবিক। নিরঞ্জন বলে দুঃখ-কষ্টের কথা তো স্বাভাবিক, সে তো মানুষের চিরসাথী, দু-দণ্ড বসে আলাপ আলোচনা করলে খানিকটা উপশম হতে পারে। সকলে এত সম্মতি দেয়। উদ্ধৃত কথাগুলির মধ্যে দিয়ে এই ইতিবাচক সিদ্ধান্তই তাৎপর্য হিসাবে প্রতিপন্ন।

(ঘ) চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে গ্রামের মানুষজন এক একে ফিরে এসে নিজেদের পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে নিরঞ্জন বরকত একথা বলেছেন।
ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি সারাই করে নিজেবাই নিজেদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করছে। কখনও দুর্যোগ যেমন আসে, তার অবসানও হয়—মানুষের জীবনযাত্রা কখনই নিস্তরঙ্গ নয়, তার উত্থান-পতন আছে। ধৈর্য্য ধরে তাকে মোকাবিলা করতে হয়। ইতিহাসে এর সাক্ষ্য মিলবে। প্রধান বরকত তার অভিজ্ঞতা থেকে নিরঞ্জনকে এটিই বোঝাতে চেয়েছেন।

৩। লোক দেখান, কথা না রাখা / প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকরা, লজ্জা, সম্মান, অন্যায়/ অসঙ্গাত, যৌথ খামার, দুষ্টু/বেয়ারা ছেলে, বোকা।

৮৬.১৭ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বিজন ভট্টাচার্য — নবান্ন প্রথম (সংস্করণ)।
২। দর্শন চৌধুরি — গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম পর্যায়।
৩। দিলীপকুমার নন্দী ও নবকুমার মণ্ডল } প্রসঙ্গা নবান্ন (লিপিকা)
৪। মন্দিরা রায় — বিজন ভট্টাচার্যের নাট্যকর্ম ও সমকালীন প্রেক্ষিত।
৫। সুধী প্রধান — নবান্ন ঃ প্রযোজনা ও প্রভাব।

একক ৮৭ ❐ নবান্ন নাটকের আলোচনা

গঠন

৮৭.১ উদ্দেশ্য
৮৭.২ প্রস্তাবনা
৮৭.৩ মূলপাঠ ১ ঃ নবান্ন—রচনা, দেশকাল ও নামকরণ
৮৭.৪ মূলপাঠ ২ ঃ নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ
৮৭.৫ সারাংশ
৮৭.৬ অনুশীলনী ১
৮৭.৭ মূলপাঠ ৩ ঃ নবান্ন নাটকের প্রাসঙ্গিক আলোচনা
৮৭.৮ মূলপাঠ ৪ ঃ নবান্ন নাটকের গঠন
৮৭.৯ সারাংশ
৮৭.১০ অনুশীলনী ২
৮৭.১১ মূলপাঠ ৫ ঃ নবান্ন নাটকের চরিত্র আলোচনা
৮৭.১২ মূলপাঠ ৬ ঃ নবান্ন নাটকের সংলাপ ও গান
৮৭.১৩ সারাংশ
৮৭.১৪ অনুশীলনী ৩
৮৭.১৫ মূলপাঠ ৭ ঃ ‘নবান্ন’ নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান
৮৭.১৬ মূলপাঠ ৮ ঃ ‘নবান্নে’র শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য
৮৫.১৭ সারাংশ
৮৭.১৮ অনুশীলনী ৪
৮৭.১৯ উত্তর-সংকেত
৮৭.২০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ
৮৭.২১ অতিরিক্ত পাঠ — পরিশিষ্ট ১ ও ২

৮৭.১ উদ্দেশ্য

পূর্ববর্তী নাটকটিতে আপনি বিজন ভট্টাচার্যের ‘নবান্ন’ নাটকটি সম্পূর্ণত পড়েছেন। নাটক পাঠ সূত্রে আপনি একদিকে যেমন লেখক বিজন ভট্টাচার্যের সৃষ্টিকর্মের সাধারণ পরিচয় পেয়েছেন, সেইসঙ্গে গণনাট্য আন্দোলন ও প্রসঙ্গত নবান্ন নাটকের ভূমিকায় দেখেছেন।

বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনি নাটকটির সাহিত্যিক মূল্য ও সেইসঙ্গো সংলাপ ও মঞ্চ পরিচালনার সর্ম্পকে জানবেন।

- জানবেন কোন দেশ কালের পরিপ্রেক্ষিতে নাটকটির সূচনা।
- নাটকের 'নবান্ন' নামকরণের তাৎপর্য উপলব্ধি করবেন।
- নাটকের নয়া ভাবনা ও চরিত্র পরিকল্পনার অভিনবত্ব লক্ষ করুন।
- নাটকটিতে কয়েকটি গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানগুলির প্রয়োগ কতটা তাৎপর্যপূর্ণ তা বুঝতে পারবেন।

৮৭.২ প্রস্তাবনা

ভাববাদী শিল্পী দার্শনিকরা মনে করেন, দৈবানুগ্রহে তাদের অনুভবে, মননে, নতুনতর ভাবোদয় হলে, সেটি ব্যক্ত না করা পর্যন্ত, তাঁদের নিস্তার নেই। কিন্তু যাঁরা বস্তুবাদী চিন্তা ও ভাবাদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা বস্তুবিশ্বের সার্বিক কল্যান ভাবনাকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। 'নবান্ন' নাটক রচনার পেছনে তাই সক্রিয় দেখা যায় সেই সময়ের সমাজমনস্ক ইতিহাস রাজনীতি সচেতন কিছু মানুষ তাঁদের উন্নত চেতনা নিয়ে সাহিত্য সংস্কৃতির আন্দোলন গানে,গল্পে, নাটকের মধ্যে দিয়ে প্রকাশে উদ্যত হলেন। গণনাট্য আন্দোলন তাঁরই ফলশ্রুতি।

তাই এঁদের নাট্য প্রযোজনায় বাংলা নাট্যধারায় নতুন প্রাণের জোয়ার দেখা গেল। নাটকে কৃষক শ্রমিকের মধ্যবিত্ত মানুষের কথা এলো। ব্যক্তি চরিত্র থেকে সমষ্টি চরিত্রের প্রাধান্য দেখা গেল। বস্তুতান্ত্রিক জীবনভাবনা, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ, আবেগের চেয়ে বুদ্ধি-যুক্তির প্রাধান্য, শ্রেণী চেতনাসূত্রে সমাজে শোষক-শোষিতের শ্রেণীদ্বন্দ্বের চিত্র নাটকে দেখা দিল। ধনী জমিদার এবং শাসনযন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ আর মমত্ব ও সহানুভূতি প্রকাশ পেল অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে দুর্বল মানুষগুলিরজন্য। মঞ্চ ও প্রয়োগ কলায় সমন্বয়, সৃষ্টি করে নানা বৈচিত্র্য আনা হল। এই প্রেক্ষপটে নবান্ন নাটক রচনাও তার ব্যাপক মঞ্চাভিনয়ের আয়োজন, গণনাট্য সংঘের পতাকা তলে। 'নবান্ন' তাই গণনাট্যের নাটক, গণআন্দোলনের নাটক। আর এখানেই তার সিদ্ধি, তার সাফল্য আর ব্যর্থতা। নবান্ন' পাঠ ও আলোচনায় এই কথাগুলি স্মরণ রাখতে হবে।

৮৭.৩ মূলপাঠ ১ : রচনা, দেশকাল ও নামকরণ

বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের প্রথম প্রকাশ ১৯৪৩ খ্রিষ্টাব্দে 'অরণি' পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ ১৮৪৪- এ (দ্বিতীয় ১৯৪৫ এবং তৃতীয় সংস্করণ ১৯৪৫)। প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গামে ২৪ অক্টোবর ১৯৪৪। প্রসঙ্গাত স্মরণীয় কোনো শিল্পসৃষ্টি দেশকালের সীমার উর্ধ্বে নয়। কালোত্তীর্ণ হতে পারে যে রচনা, তাই চিরন্তনের মর্যাদা পায়।

'নবান্ন' যে দেশকালের প্রেক্ষিতে রচিত হয়েছে সেটি ছিল বড় দুর্যোগের, এক ক্রান্তিকালের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা ১৯৩৯ -এ। ভারতের বিদেশী শাসক রাজশক্তি এই যুদ্ধে জড়িয়ে পরে। একদিকে হিটলারের

জার্মানি, মুসোলিনীর ইটালী, ফ্রাঙ্কের স্পেন, তোজোর জাপান ও গ্রীসের ফ্যাসিস্ট শক্তি, অপরদিকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ, তার দোসর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত রাশিয়া। ওদিকে গণতন্ত্রপ্রেমী মানুষ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম করছে। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতিকে রক্ষার জন্য সারা পৃথিবী ব্যাপী সংগঠিত হতে প্রয়াসী হয়েছে রমাঁ রলাঁ, গোর্কি, রাসেল, শ প্রভৃতি প্রগতিশীল সাহিত্যিকরা যুক্ত মঞ্চ তৈরি করে, পৃথিবীব্যাপী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। কোলকাতাতে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হল 'লীগ এগেইনস্ট ফ্যাসিজিম এন্ড ওয়ার'-এর ভারতীয় কমিটি। এই রাজনৈতিক বাতাবরণে ১৯৪৪ -এ বিজন ভট্টাচার্যের নবান্ন নাটকের প্রকাশ নতুন বার্তা নিয়ে এসেছে। নাটকটি ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক শিল্পী সংঘের নাট্যবিভাগ ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে অভিনীত হয়। প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গমে, ২৪ শে অক্টোবর, ১৯৪৪ নাট্য পরিচালক ঃ বিজন ভট্টাচার্য ও শম্ভুনাথ মিত্র। শ্রীরঙ্গমে সাতবার অভিনয়ের পর ,শিয়ালদা রেলওয়ে ম্যানসন, শ্রী ও কালিকা থিয়েটার, প্রত্যেকটিতে সাতদিন করে নবান্নের অভিনয় হয়। এই নাটকের মধ্যেদিয়ে অবহেলিত শোষিত সাধারণ মানুষের জীবন, লড়াই, সংগঠন ও সংগ্রামের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। এর মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষ ও চিন্তাশীল দর্শক সমাজ মতুন করে বাঁচবার একটি পথের নিশানা খুঁজে পেয়েছে।

নাট্যকার স্বয়ং নাটকের পটভূমিকায় পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন—১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এটি রচিত। সে পরিচয় প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী-পুত্রের আত্মবিসর্জনের ঘটনায় প্রতিফলিত। দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পাশাপাশি যে সামাজিক- প্রাকৃতিক ঘটনা এ নাটকে ফুটে উঠেছে তা হল ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ১৬ ই অক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার একাংশে ঘটে যাওয়া সাইক্লোন ও জলোচ্ছ্বাসে বিপর্যয়ের ইতিহাস। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরিণিত হল—বাংলা সন১৩৫০-এর মন্বন্তর। আর এই মন্বন্তর গ্রাম গঞ্জের চাষী-ক্ষেতমজুরকে ক্ষুধার অন্নের সন্ধানে নিয়ে এসেছে শহরের ফুটপাতে, লঙ্গারখানায়। ক্ষুধার জ্বালাতেই প্রধান দোরে দোরে ঘোরে দু-মুঠো ভাতের জন্য, কুঞ্জ ডাস্টবিন থেকে উচ্ছিষ্ট সংগ্রহ করতে করতে গিয়ে কুকুরের সঙ্গো লড়াই করে। ওদিকে মন্বন্তরের সুযোগ নিয়ে কালীধন অতিরিক্ত মুনাফার জন্য চাল গুদামজাত করে কালোবাজারী করে। সেবাশ্রমের আড়ালে নারী দেহের ব্যবসায় লিপ্ত হয়। হারু দত্ত নিরীহ গ্রামবাসীকে নির্বিচারে শোষন করতে দ্বিধা করেনা। অবশ্যম্ভাবীরূপে দেখা গেল, মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু। দেশকালের এই পরিবেশ পরিস্থিতিতে গ্রাম বাংলা যখন শ্মশানভূমিতে পরিণত, সেই সর্বস্ব হারানো গ্রামের বাস্তব চিত্র এই 'নবান্ন'।

'নবান্ন' নাটকের তাৎপর্য :

সমাপ্তি দৃশ্যের অভ্যন্তরে নিহিত আছে 'নবান্ন' নামকরণের তাৎপর্য। নবান্ন শব্দটির অর্থ হল নতুন অন্ন। নবান্ন শব্দটি ভাঙলে তাই দাঁড়ায়। নব অন্ন—নবান্ন। নতুন অন্ন এখানে বিশেষ তাৎপর্যে মণ্ডিত। নবান্ন হল নতুন চালের পায়সান্ন। গ্রাম বাংলার কৃষকের নতুন ধান কেটে ঘরে তুলে সেই নতুন ধানের নতুন চালে পায়সান্ন তৈরি করতো। শুধু পায়সান্নই নয় পিঠেপুলিও হত। প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়ি গিয়ে তা আনন্দের সঙ্গো খেত। সমস্ত গ্রাম বাংলায় এটি ছিল একটি বিশেষ উৎসব। এই নির্দিষ্ট দিনটিতে খেলাধূলো, এবং

প্রত্যেক অঞ্চলের বিশেষ বিশেষ আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হত। মানুষ সমবেত হয়ে সেই অনুষ্ঠান ও খেলাধূলা দেখতো এবং উপভোগ করতো। অবিভক্ত গ্রাম বাংলার বিশেষ কয়েকটি অঞ্চলে এই নবান্ন উৎসবে আড়ম্বর ছিল সর্বাধিক। গ্রামের বৌ-ঝিদের এই উৎসবে ছিল এক বিশেষ ভূমিকা। এই উৎসবের সঙ্গে লোকসংস্কৃতির একটি ঘনিষ্ট সর্ম্পক ছিল। অধুনা, সভ্যতার সংস্পর্শে এসে বহু ঐতিহ্যপূর্ণ গ্রাম্য সংস্কৃতির মতো নবান্ন উৎসবও আজ বিলুপ্তপ্রায়। তবে এখনো দুই বাংলার গ্রামের প্রান্ত প্রদেশে এই দিনটিতে প্রবেশ করলে নবান্ন উৎসবে গান বাজনার ভগ্নবিশিষ্টের নিদর্শন পাওয়া যাবে। এখনো মাঝবেলায় কোনো কোনো গ্রাম্যবধূ নতুন বস্ত্র পরিধান করে পবিত্র দেহ মন নিয়ে নবান্ন রন্ধনে ব্যস্ত থাকে। এখনো কোনো বাড়ির আনাচে কানাচে নাক রাখলে রুপশাল অথবা কামিনীর নবান্নের সুবাস এসে মোহাচ্ছন্ন করে ফেলে। কোথাও কোথাও গৃহ বধূর আলতা পরা পায়ের আঘাত পড়ে ঢেঁকির পাড়ে, চাল সেই আঘাতে গুঁড়ো হয়ে পিঠে পুলির উপকরণে পরিণত হতে দেখাযায়। অবশ্য এটি অতি বিরল দৃশ্য। যন্ত্রযুগে এটি অতিবিরল দৃশ্য। যন্ত্রযুগে ঢেঁকি উঠে গেছে, এসেছে যন্ত্র। সভ্যতা সমাজকে এগিয়ে এনেছে ঠিক , কিন্তু প্রাণ প্রাচুর্যে ভরা গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যমণ্ডিত উৎসব গুলো আজ তলিয়ে গেছে বিস্মৃতির অতলান্ত তিমিরে। আজ গ্রাম্য সংস্কৃতি হয়ে গেছে প্রায় বিলীন।

'নবান্ন' নাটক আমাদের মনে স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করে তুলে আনে নবান্ন উৎসবের ছবি । বন্যা, মহাযুদ্ধ-মহামারী আমিনপুরের গ্রাম্যজীবনের সুস্নিগ্ধ দিন যাপন পদ্ধতির বুকে প্রচণ্ড আঘাত হেনে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছিল। মানুষ হয়েপড়েছিল জন্তুপ্রায়। অন্নহীন, বস্ত্রহীন, মান-সম্ভ্রমহীন ভিখিরীতে রুপান্তরিত হয়ে মানুষ ভুলতে বসেছিল আপন অস্তিত্ব। এই রকম এক ভয়ঙ্কর এক দুর্যোগ পূর্ণ দিনে যেখানে অস্তিত্বের প্রশ্নটা ছিল সবচাইতে বড় প্রশ্ন, সেখানে নবান্নের উৎসবের কথা ভাবাই যায়না। কিন্তু এত ঝড় ঝাপটায় সেই মানুষ মন থেকে মুছে ফেলতে পারেনি তার স্মৃতিকে। তাই যখন আবার ঘরছাড়া মানুষগুলো ফিরে এসেছে গ্রামে, নতুন ধান তুলেছে ঘরে , তখন নবান্ন উৎসবের কথা জেগে উঠেছে । নবান্ন উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে তারা। তাই বিগত দিনগুলোর বিভীষিকা মন থেকে মুছে ফেলে আয়োজন করেছে নবান্ন উৎসবের। এই নবান্ন উৎসব শুধুমাত্র উৎসব নয় ,এর ভেতর একটা মিলনের ইঙ্গিত আছে। পূর্বেই আমরা বলেছি, এই উৎসব প্রত্যেক বাড়িতে হত, তবুও প্রত্যেকে প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যেকের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দে অংশগ্রহন করতো। তারপর সমবেত হত কোনো প্রান্তরে, গ্রাম্য সাংস্কৃতির অনুষ্ঠানে যোগদিয়ে সম্মিলিতভাবে উপভোগ করত সেই আনন্দ। 'নবান্ন' নাটকের শেষে আমরা দেখি সেই রকম এক পরিবেশ। নবান্নের উৎসবে হিন্দু মুসলমান সকলেই সমবেত হয়ে উৎসবের আনন্দে মেতে উঠেছে। যে হিন্দু মুসলমান অতীতে ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে জড়িত হয়ে পড়ে একে অপরকে সন্দেহ করেছে, সেই হিন্দু মুসলমান মিলিত হয়েছে নবান্ন উৎসবের চাঁদোয়ার নিচে। নাট্যকার দেখাতে চেয়েছেন,একটা বিরাট ভ্রান্তির বশবর্তী হয়ে যাঁরা পারস্পরিক হনন লিপ্সায় মেতে ওঠে তাঁরাই স্বতন্ত্র রাজনৈতিক দিশার প্রীতি ও সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হতে দ্বিধা করেনা। কিন্তু কালোরাত্রির মতো সেই ভ্রান্তিটা একদিন কেটে গিয়ে আবার রচিত হয় মিলনের ক্ষেত্র। নবান্ন উৎসব প্রাঙ্গনে তাই দেখা গেল হিন্দু মুসলমান সকলে এসে জড় হয়েছে। শুধু

জড় নয়, এই উৎসব ক্ষেত্র থেকে সকলে শপথ গ্রহন করছে আকালের বিরুদ্ধে জোরদার প্রতিরোধের । সুতরাং 'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য এদিক থেকে যথেষ্ট। নবান্ন উৎসব 'নবান্ন' নাটকে শুধু উৎসব থাকেনি, হিন্দু মুসলমানের মিলনক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। গণনাটকের যেটি উৎসব প্রধান উদ্দেশ্য—চেতনার বৃদ্ধি ঘটিয়ে জাতিধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত মানুষকে এক লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে এক আদর্শের পতাকাতলে এনে ফেলা,— নাট্যকার সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নাটকের শেষ দৃশ্যে নবান্নের উৎসবের আয়োজন করেছেন। নাট্যকার তার চরিত্রগুলোকে বহু ঝড় ঝাপটা বহু বিসর্পিল পথ ঘুরিয়ে পুনরায় অতি পরিচিত নবান্ন উৎসবের অনাবিল আনন্দের মধ্যে এনে জীবনের একটি ইতিবাচক ইঙ্গিতের দ্যোতনা করেছেন।

৮৭.৪ মূলপাঠ ২ : নাটকের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ

'নবান্ন' চার অঙ্কের নাটক। প্রথম অঙ্কে দৃশ্য সংখ্যা পাঁচ। দ্বিতীয়ে পাঁচ, তৃতীয় ও চতুর্থ অঙেক দুই ও তিনটি দৃশ্য আছে । অর্থাৎ মোট পনেরোটি দৃশ্য সমাবেশের মধ্যে দিয়ে নাট্যকার গ্রাম ও শহর জীবনের শঙ্কা ও সঙ্কটের চিত্র তুলে ধরে সমস্যার একটি ইতিহাচক সমাধানসূত্র তুলে ধরেছেন।

রাতের অন্ধ্রকারে মালভূমির মত উঁচু জায়গায় কতকগুলি ছায়ামূর্তির আনাগোনা দিয়ে নাট্যদৃশ্যের সূচনা। পটভূমিতে আগুনের আভা, বাইরে বাঁশের গাঁট ফাটার মধ্য দিয়ে মেসিনগানের আওয়াজ বোঝানো হয়েছে। পরিবেশের মধ্যে বেশ একটি সন্ত্রস্ত ভাব। আগষ্ট আন্দোলনের পটভূমিতে গাঁয়ের মধ্যে একটি সদা সন্ত্রস্তভাব বিরাজ করছে। বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার আগষ্ট আন্দোলনের কর্মী তাঁর দুই ছেলেকে হারিয়ে বিলাপ করছে। তার স্ত্রী পঞ্চাননীও মেয়েদের ইজ্জৎ নষ্ট হচ্ছে দেখে এবং স্বদেশের টানে নিজে আন্দোলনে যোগ দিয়ে, পিছিয়ে পড়া কর্মীদের উদ্দেশ্যে এগিয়ে যাওয়ার আবেদন জানাচ্ছে। পথেই পুলিশের গুলিতে সে মৃত্যু বরণ করে।

দ্বিতীয় দৃশ্যে কুঞ্জ,প্রধান, নিরঞ্জনের সঙ্গে রাধিকা,বিনোদিনীর পারস্পারিক সংলাপের মধ্য দিয়ে বর্তমান সংকটের দিনে অভাবী সংসারের সরল মানুষগুলির পারস্পরিক কলহ উত্তাপের ছবি ফুটে উঠেছে। সংসারের ভার বহনে যখন পুরুষরা অসহায় ও হীনমন্যতায় ভুগছে তখন নারীদের অসহায়তা ও সেইসঙ্গে অসহিষ্ণুতা বোধ আরও বেশি হবে ,এতে বিস্ময়ের কিছু নেই । এর পরিচয় পাওয়া যায় কুঞ্জ রাধিকা ও নিরঞ্জন-বিনোদিনীর কথোপকথনে।

তৃতীয় দৃশ্যে সংকটের আরও ঘনীভূত রুপ দেখা যায় প্রধানের জমি বিক্রি করবার উদ্যোগের মধ্যে অন্নাভাবগ্রস্ত মানুষের এই দুর্দশার সুযোগ নেয়, হারাধনের মত পোদ্দাররা। অপর কৃষক দয়াল এ-ভাবেই সব হারিয়েছে, এমন কি বীজধান পর্যন্ত। অবশেষে তাকে প্রতিবেশী সমাদ্দার বাড়ি চালের সন্ধানে যেতে হয়েছে। স্ত্রী রাঙার মা "ধুঁকছে কাল বিকেল থেকে"। এই দৃশ্যেরই শেষে আকস্মিকভাবে ঝড় ওঠে, সাইক্লোনে প্রধানের দোচালা বিনোদিনীর মাথার ওপর ভেঙে পড়ে—সে অচৈতন্য হয়ে যায়। ওদিকে বন্যায় সব ভেসে যায়। দয়াল বাড়ি গিয়ে দেখে রাঙা, রাঙার মা বন্যায় ভেসে গেছে।

চতুর্থ দৃশ্যে এরই পরিণতিতে ভয়াবহ অভাব ও অন্নসংকট। "নিত্যি ঐ এক ডুমুরের কলা সেদ্ধ, আর কচুর নতির ঝোল"— এর বিরুদ্ধে কুঞ্জের ছেলে মাখন বিদ্রোহ করে।*

পঞ্চম দৃশ্যে ওদিকে হারু দত্তের লোভ প্রধানের জমির জন্য। প্রধান সব বোঝে। তার সঙ্গে জমি বিক্রি নিয়ে কথা হয়। প্রধান রাজি না হওয়ায় সে নতুন ভাবে চাপ দেয়। কুঞ্জ উপলব্ধি করে "টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দাও।" হারুর লোকজন কুঞ্জ ও প্রধানকে মারে। মাখন এ দৃশ্য দেখে মাথা ঘুড়ে পড়ে যায়। তার মৃত্যু সমস্ত পরিবারকে বিচলিত করে।

দ্বিতীয় অঙ্কের শুরু শহরে। কোলকাতার চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকানে নিরঞ্জন রাখহরি নাম নিয়ে মজুরের কাজ করে। হারু দত্ত গ্রাম থেকে চাল ও মেয়েমানুষ সংগ্রহ করে কালীধনকে সরবরাহ করে। অতিরিক্ত মুনাফার লোভে মজুরদারী ও কালোবাজারী যুদ্ধকালীন ব্যবস্থায় যে জেঁকে বসেছে তার ছায়া এই দুটি চরিত্র সমাবেশের মধ্য দিয়ে দেখা যায়। এরা বিবেকহীন ও হৃদয়হীন ও অমানবিক বাণিজ্যিকতার জাল সমাজের সর্বত্র বিস্তৃত করে রাখে—সে পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যায়ভাবে চড়া দামে চাল বিক্রির প্রতিবাদ করে প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইলে বশংবদ কর্মচারী ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বলে "কত জন ম্যাজিস্ট্রেট এই বাবু ট্যাঁকে রাইখবার পারে তা নি জানো।" এদেরই চক্রান্তে ও রাষ্ট্রশক্তির পৃষ্ঠপোষণায় 'মনুষ্যসৃষ্টি দুর্ভিক্ষ' লক্ষ মানুষের প্রাণ কেড়ে নেয়।

অপর দৃশ্যে দেখা যায় সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছেড়ে শহরের পার্কে আশ্রয় নিয়েছে দুমুঠো খাবার আশায়। এরই মধ্যে বিচিত্র ধরনের সুযোগ সন্ধানীরা নানা রুপে ও বেশে জীর্ণশীর্ণ বস্ত্রহীন এই নিরন্ন কঙ্কালসার মানুষগুলোকে নিয়ে নির্লজ্জভাবে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ চরিতার্থ করতে উদ্যোগী হয়। এদের কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ বা টাউট। প্রথমোক্তরা প্রধানের ভাষায় 'কঙ্কালের ছবির ব্যবসাদার,' তৃতীয় ও চতুর্থ দৃশ্যে প্রধান, কুঞ্জ, রাধিকা রাজপথের খাবারের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। প্রথমোক্ত জন বাড়ি বাড়ি ভিক্ষে করে ক্ষুধার অন্ন জোগাতে পারছে না, আর অপরজন ডাস্টবিনের খাবার নিয়ে কুকুরে-মানুষে লড়াই করছে। এ দৃশ্য বড় মর্মান্তিক। ওদিকে বড়লোকের বাড়ি পানভোজনের সমারোহ, কিন্তু সামান্য উদ্বৃত্তটুকুও দুর্গত মানুষের কল্যাণে দিতে এদের হাত ,সরেনা। ওদিকে দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে হারু একদিকে বিপন্ন মানুষের জমি বাড়ি সস্তায় কিনে নেয়, অপরদিকে গ্রামের দুঃস্থ মা-বাপকে ভুল বুঝিয়ে মেয়ে কেনে, শহরে চালান দেয়। কালীধনের সেবাশ্রম সেবা-নামের আড়ালে নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা কেন্দ্র গড়ে উঠেছে।

অকস্মাৎ কালীধনের দোকানে দারোগা পুলিশের আবির্ভাব—চালক্রেতা ভদ্রলোক তাদের নিয়ে এসেছেন। নিরঞ্জন ইতোমধ্যে সেবাশ্রমে বিনোদিনীর সাক্ষাৎ পেয়েছে। নিরঞ্জন চালের গুদাম ও সেবাশ্রমের ব্যবসার সব পরিচয় তুলে ধরলে পুলিশ ওদের হাতকড়ি পরিয়ে ধরে নিয়ে যায়। কিন্তু তাদের উভয়ের দৃষ্টিতে এমন একটি ভাব ধরা পড়ে যে তাদের ছাড়া পেতেও অসুবিধে হবে না।

---

*"About 50 per cent of the people are dying from starvation at present and about 40 per cent are living in semi-starvation, subsisting on herbs vegetables, and other inedible and undigestable food. People are also dying of cholera." (Quoted from 'Biplabi,' July 29, 1943–a weekly published from underground in and around Tamluk–Sutahata, Midnapur. Edited and Compiled by B.Chakraborty).

তৃতীয় অঙ্ক সংক্ষিপ্ত—দুটি দৃশ্য, একটি লঙ্গারখানার, অপরটি চিকিৎসা কেন্দ্রের। প্রথমটিতে ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল। এরই মধ্যে উপস্থিত কুঞ্জ রাধিকা ও অন্যান্য গ্রামের মানুষ। এদের কথাবার্তায় প্লাবনশেষে ফসলের প্রাচর্যের নানা গল্পকথা। একজন বৃদ্ধ ভিখারী শহর জীবনের যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা থেকে সকলকে গ্রামে ফিরে যেতে বলে। কুঞ্জ রাধিকাও পোড়ামাটির শহর ছেড়ে স্বগ্রামে ফিরে যাওয়ার সঙ্কল্প নেয়। আর দ্বিতীয় দৃশ্য চিকিৎসা কেন্দ্রে প্রধানকে দেখা যায়। এই চিকিৎসা কেন্দ্রে কোন সাধারণ চিকিৎসারও আয়োজন নেই, চিকিৎসার নামে একরকম প্রহসন চলছে। এখানে প্রধানকে মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় দেখা যায়। দৃশ্যের শেষে বলা তার কথাটি "ভুলে যাও তোমার ব্যথার কথা" বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য, প্রথমটি বেশ বড়। ঘটনাস্থল আমিনপুর। শহর থেকে ঘরে ফিরে আসা মানুষরা নিজ নিজ বাড়িতে উপস্থিত। নিরঞ্জনের উদ্যোগে, দয়ালের পরামর্শে প্রধানের বাড়িতে সকলে সমবেত হয়ে আগামী দিনের সম্ভাব্য সঙ্কট উত্তরণের জন্য পরামর্শে নিযুক্ত। নানা ধরনের কথাবার্তার শেষে সকলে সমবেত ভাবে খাটার সঙ্কল্পে নিজেদের সুখী ভবিষ্যৎ গড়ার সিদ্ধান্ত নেয়। এরপর মিলনের সুখময় পরিবেশ—ভাইয়ে ভাইয়ে পুনর্মিলনের আবেগময় দৃশ্য রচনা করে। দ্বিতীয় দৃশ্যে তারই সম্প্রসারিত রূপ—খেটে ফসল তুলে, ঝাড়াই-এর পর ধর্ম গোলায় কুঞ্জ হিসেবের বেশি ধান প্রথম জমা দেয়। ঠিক করে এবার নবান্ন উৎসব ধুমধাম করে করা হবে। সমাদ্দার পরিবারের বারবার মনে পড়ে প্রধানের কথা।

শেষ দৃশ্যে 'নবান্ন' এর উৎসব চলছে। গ্রামের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সকাল সমবেত হয়েছে। চলছে কৃষক রমণীর গান নাচ আর মোরগের লড়াই, গরুর দৌড়—জয় হল ফেকু মিঞার মোরগের আর রহমত উল্লার গরুর। অকস্মাৎ এই আনন্দোৎসবে প্রধানের আবির্ভাব। সে অনেকটা অপ্রকৃতিস্থ হলেও সব বুঝতে পারে। সকলে মিলে জোর প্রতিরোধের সঙ্কল্প নেয়। এখানেই নাটকের সমাপ্তি।

৮৭.৫ সারাংশ

'অরণি' পত্রিকায় ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে 'নবান্ন প্রকাশের পর ১৯৪৪-এ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল। (১৯৩৯-৪৫)। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এসময়ের মধ্যে আগস্ট আন্দোলন হয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সমস্ত প্রথম শ্রেণীর নেতা-নেত্রী কারান্তরালে। দক্ষিণবঙ্গে বিশেষত মেদিনীপুরে স্বাধীন সরকার গঠন করা হয়েছে। সেইসঙ্গে চলছে সমস্ত দেশব্যাপী বিশেষ করে মেদিনীপুর অঞ্চলে শাসক ইংরেজদের সীমাহীন পীড়ন। জাপানী আক্রমণের ভয়ে দেশের ভিতর 'পোড়ামাটি নীতি' ঘোষিত হয়েছে। এই ৪২ আক্টোবর মেদিনীপুর ও ২৪ পরগনার একাংশ সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যায় বিপর্যস্ত হয়। খাদ্য সংকট দেশবাসীর জীবনে নিয়ে এসেছে মন্বন্তর। বাঙলাদেশের ১৫ লক্ষ মানুষ এসময় অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। জোতদার-মজুতদার এর সুযোগ নিয়ে সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচার শোষণ করে; 'নবান্ন' সমাজের সেই বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছে। 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনায় এর সমর্থন পাওয়া যায়।

'নবান্ন' এর বিষয়বস্তু গ্রাম বাংলার সাধারণ কৃষকের জীবন নিয়ে গড়ে উঠেছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে সর্বস্বান্ত কৃষক জীবনের কথাই এর মূল প্রতিপাদ্য। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দেশীয় জোতদার-মজুতদারের ভয়ঙ্করতম শোষণ ও সেই সঙ্গে প্রাকৃতিক দুর্যোগ—সব মিলিয়ে একটা সর্বব্যাপী প্রতিকূল পরিবেশ এ নাটকের

প্রেক্ষাপট।

এদিক থেকে 'নবান্ন'-এর বিষয়বস্তু অভিনব। মন্বন্তর তো শুধু দুর্ভিক্ষ নয়, মারী-হাহাকার তার নিত্যসঙ্গী। এই দুঃখ দুর্দশায় আমিনপুরের সমাদ্দার পরিবার তথা বাংলার বিপুল সংখ্যক গ্রামীণ কৃষক পরিবার প্রাণধারণের প্রয়োজনে নিজ বাসগৃহ ছেড়ে শহর কোলকাতার রুক্ষ পাষাণ প্রান্তরে আছড়ে পড়েছে। নাটকে তাদেরই জীবনবৃত্ত রুপায়িত হয়েছে। শহরের সম্পন্ন গৃহস্থ এই দুঃস্থ মানুষগুলির প্রতি যে নিস্পৃহ ঔদাসীন্যের পরিচয় দিয়েছে, তা উভয়ের শ্রেণীগত ভিন্নতার পরিচয় দেয়। এর প্রতিকার কামনায় বিপর্যস্ত ক্ষুধার্ত মানুষগুলি সার্বিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার শপথ নিয়ে গাঁতায় চাষ ও ধর্মগোলার ব্যবস্থা করেছে। তারা জোটবদ্ধতার শপথ নেয়। এভাবেই নবান্ন হয়ে উঠেছে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।

৮৭.৬ অনুশীলনী ১

১। 'নবান্ন' নাটকের অভিনবত্ব সম্পর্কে অন্তত দুটি উদাহরণ দিন।

২। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম প্রকাশ ও প্রথম অভিনয়ের তারিখ লিখুন।

৩। বাংলার কৃষক জীবন নিয়ে রচিত তিনটি নাটক ও তার নাট্যকারের নাম লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৫।'নবান্ন' নাটকের নামকরণের তাৎপর্য সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৮৭.৭ মূলপাঠ ৩ : 'নবান্ন' নাটকের প্রাসঙ্গিত আলোচনা

'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে আগস্ট আন্দোলন ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কঠোর দমনপীড়নের বর্ণনা। এই সময় প্রধান হারাল তার সংগঠক স্ত্রী পঞ্চাননীকে। বন্যায় এবং হারু দত্তের অত্যাচারে হারাল নাতি মাখন এবং আমিনপুরকে। সমস্ত ঘর-গেরস্থালী ছেড়ে সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পার্কে ভিখারীর জীবন যাপন করতে থাকল। এখান থেকেই বিনোদিনী বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল মূল দল থেকে। তারপর সরে গেল কুঞ্জ, রাধিকা; সকলকে হারিয়ে শহরের গোলোকধাঁধায় ঘুরপাক খেতে খেতে প্রধানের পুনরায় প্রত্যাবর্তন ঘটল গ্রামে। এটাই নবান্ন নাটকের মূল ধারা। কিন্তু এই মূল ঘটনাবলী বর্তুল-আকারে ও প্রায় সংঘাতবিহীন ভাবে ঘটেছে। এর মধ্যে কারুণ্য থাকলেও কোনো দ্বন্দ্ব নেই এমনকি বৈচিত্র্য নেই বললেও চলে। অথচ মূল ধারা থেকে প্রথম যে শাখাটি বেরিয়ে এসেছে—বিনোদিনী যে অংশের প্রধান—স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে মিলিত হয়ে (মিলনটা অতর্কিত) যে ঘটনাটি ঘটিয়েছে সেটা কিছুটা চমকপ্রদ। হারু দত্ত দুষ্ট প্রকৃতির, অত্যাচারী, তার অত্যাচারে প্রধান পরিবার গৃহহারা, দেশছাড়া। ধান চালের চোরাচালানকারী, মুনাফাখোর অসৎ চরিত্র, মেয়ে পাচারকারী, এক কথায় ভিলেন বা খল চরিত্র। কালীধন চালের ব্যবসাদার। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সুযোগ নিয়ে ও যুদ্ধের বাজারে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে অতিরিক্ত মুনাফার ফাঁপানো ব্যবসা চালাচ্ছে এবং সেইসঙ্গে সেবাশ্রমের ব্যবসাকেও ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিয়েছে। এরা সবাই মুনাফা লুটছে, রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়া, বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সুযোগ নিয়ে ফুলে, ফেঁপে একশা হয়ে গেছে। নাটকটি যদি

এদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাটক হত তাহলে দ্বিতীয় অঙ্কের সমাপ্তিতে নাটকের সমাপ্তি ঘটত। কেন না, এই অঙ্কের শেষে হারু দত্ত কালীধন স্বরূপে প্রকাশ হয়ে গেছে। বিনোদিনী নিরঞ্জনের সক্রিয় চেষ্টায় পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে। প্রথম অঙ্কের শেষ দৃশ্যে হারু দত্ত যে অত্যাচার চালিয়ে দর্শকমনে উষ্মার ক্রোধাগ্নি প্রজ্বলিত করেছিল, দ্বিতীয় অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যে তাদের হাতে হাতকড়ি পরাতে পেরে নিরঞ্জন বিনোদিনী খুব তৃপ্তি পেয়েছে, সেই সঙ্গে দর্শকও খুশি হয়েছে এবং নিরঞ্জন বিনোদিনীর আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় অত্যাচারিত হয়েছে যারা, প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যারা সেই কুঞ্জ রাধিকা, প্রধান এ সবের বাইরে থাকল। তারা এ সবের বিন্দুবিসর্গ জানতে পারল না। তার ফলে এই অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটা গুরুত্ব হারিয়ে 'নবান্ন' নাটকের ঘটনাংশ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকল মাত্র। সাধারণত, প্রতিবাদ প্রতিরোধের নাটকে ঘটনাক্রম অগ্রবর্তী হয় এই রকমভাবে—অত্যাচারীর অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তারপর তাকে ধ্বংস করে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হয়। শেষে সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির উদ্বোধন ঘটিয়ে তার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং উদ্বোধিত শক্তির আঘাতে অত্যাচারীর শোচনীয় পরাজয় ঘটে। তারপর আর নাটককে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়। নাটকের গঠনশৈলী তাহলে শিথিল হয়ে পড়বে। ঘনসন্নিবদ্ধ রূপটা নষ্ট হয়ে যাবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় 'নবান্ন' নাটক তারপরও এগিয়েছে এবং জনচিত্তে আলোড়ন তুলে জমজমাটি রূপটা পরিপূর্ণভাবে বজায় রেখেছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীশম্ভু মিত্রের একটি মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ। তিনি বলেন— 'নবান্ন' এর আগে আমাদের সব ট্রাজেডিই ডোমেস্টিক ট্রাজেডি। 'নবান্ন'-এ এল এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। এ নাটকে প্রধানের সংসার সেন্ট্রাল নয়। এর মধ্যে ছিল পোয়েট্রি অব মোমেন্টস। আমরা দৃশ্যের সঙ্গে দৃশ্য জুড়েছিলাম ওয়েলিং দিয়ে। হার্ট-রেনডিং 'ফ্যান দাও' চিৎকার দিয়ে। র' রুডনেস থেকে পোয়েট্রি উঠে আসত। একটা দৃশ্যে কুঞ্জকে কুকুরে কামড়েছে। শোভা কুকুরকে লক্ষ্য করে ওয়াইলডলি শাউট করে তারপরই সফটলি বলে : জল খাবে? তেষ্টা পেয়েছে? মহর্ষি এই দৃশ্য দেখে বলেছিলেন, 'এটা শাশ্বত'।

আর এক জায়গায় বলেছেন—নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেকটার আছে। সম্পাদনায় একটু গোছানো হলেও, একটু সংহত হলেও সে কারেকটার বজায় রাখা ছিল। সম্পাদনায় দৃশ্যগুলি এমন ভাবে রাখা হয়েছিল, যাতে এক একটি এপিসোডের এক একটি ক্লাইম্যাকস প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আসে। প্রযোজনায় এই ক্লাইম্যাকসকে তীক্ষ্ণ করার চেষ্টা ছিল। কলকাতায় আসার পর থেকে দুই দৃশ্যের মাঝখানে 'ফ্যান দাও', 'একটু ফ্যান দাও' এই আর্ত কোরাস নেপথ্যে শোনা যেত। কয়েকদিন আগে পর্যন্ত পথেঘাটে এই আর্ত চীৎকার ভীষণভাবে শোনা যেত। দর্শকের কানে এটা টাটকা ছিল, দারুণ জীবন্ত ছিল।

দ্বিতীয় অঙ্কের পর 'নবান্ন' নাটক ক্রমঅগ্রবর্তী হওয়ার পক্ষে শ্রীশম্ভু মিত্রের বক্তব্য খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে তাঁর বক্তব্যে প্রয়োগচাতুর্যের দিকটা গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। আমরা তাঁর বক্তব্য স্মরণে রেখে 'নবান্ন' নাটকের ঘটনাবলীকে একটু বিশ্লেষণ করে অন্য কিছুর হদিস পাওয়া যায় কিনা তার চেষ্টা করব।

নাট্যকার হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়াকে প্রত্যক্ষত জনশত্রু হিসেবে ধরেছেন ঠিক। কিন্তু তিনি তাদেরকেই বড় করে দেখাতে চাননি, মানে একমাত্র নেগেটিভ ফোর্স হিসেবে দেখিয়ে তাদের ধ্বংস করাটাই বড় কাজ

বলে মনে করেননি। তিনি এদেরকে একটি ক্ষুদ্র শক্তিসম্পন্ন সামান্য শত্রু বলে ধরে নিয়ে তাদের জন্য সৈন্যবাহিনীর একটি অতি ক্ষুদ্রাংশ নিয়োজিত করে পরাজিত করতে চেয়েছেন। ঘটনাটা যেমন ভাবে ঘটেছে তাতে এরকমটা মনে করবার যথেষ্ট কারণ বর্তমান । কিন্তু তাহলে একটি প্রশ্ন থেকে যায়; নাটকের প্রধান প্রতিপক্ষ কে? নাটক মানেই সংঘাত। ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে সংঘাতের ক্ষেত্র রচিত হয়। আর তার ফলে নাটকে এসে পড়ে একটি অনিবার্য গতিবেগ, তরতর করে নাটক ছুটে চলে। কিন্তু কালীধন, হারুদত্তের মতো প্রত্যক্ষ প্রতিপক্ষের পতনের পর নাট্যকার কাকে প্রতিপক্ষ করে পরবর্তী দুটি অঙ্ক পর্যন্ত নাটকে টেনে নিয়ে গেলেন—এ প্রশ্ন স্বভাবত না জেগে পারে না। নাট্যকার পৌঁছতে চান নবান্নের উৎসব দিনে, যে দিনটিতে সকলের প্রত্যাবর্তন ঘটবে এবং সকলের মিলনে উৎসব হয়ে উঠবে প্রাণ অপূর্ব রসে সঞ্জীবিত। এই উৎসব মুখর দিনে সকলে শপথ নেবে প্রতিরোধের, আকালের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের শপথ।

তাহলে দেখা যাচ্ছে প্রধান প্রতিপক্ষ কালীধন হারু দত্ত নয়, প্রধান প্রতিপক্ষ আকাল। এখন এই আকাল ব্যাপারটি কি একটু জানা দরকার। আকাল -এর আভিধানিক অর্থ দুঃসময়। যা মানুষের দুঃখ দুর্দশার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশ্ব সমাজব্যবস্থায় 'নবান্ন' রচনাকালে চলছিল এক চরম সঙ্কট। একদল মানুষের অর্থগৃধ্নুতা, শক্তির দম্ভ এবং প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার অশুভ বাসনা টেনে এনেছিল যে বিশ্বযুদ্ধ, তার ফলে বিশ্বের কতিপয় দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষেও নেমে এসেছিল ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সংকট। জনজীবন হয়ে পড়েছিল বিপর্যস্ত। গ্রামের সুস্নিগ্ধ জীবন প্রবাহে ঘটে গিয়েছিল অবাঞ্ছিত ছন্দপতন। দ্বিতীয়ত, দেশীয় সমাজব্যবস্থাকে বিশৃঙ্খলা করে তোলবার জন্য শোষক সম্প্রদায়ের ষড়যন্ত্রমূলক অভিসন্ধির ফলে এসে গেল আন্দোলন। তৃতীয়ত, প্রাকৃতিক বিপর্যয়— তার ফলে দেশে দেখা দিল ভয়াবহ বন্যা। এই বন্যার দুর্বিপাকে মানুষ হয়ে পড়ল একান্ত অসহায়। মানুষের খাদ্যশস্য রাতের অন্ধকারে চলে যেতে লাগল ব্যবসায়ীর গুদামে। কৃত্রিমভাবে দুর্ভিক্ষকে তীব্রতর ও দীর্ঘতর করে তোলবার প্রয়াস পেলেন অসাধু ব্যক্তিবর্গ, তারা খাদ্যশস্যের অহেতুক অপচয় ঘটাতে লাগলেন নানা উপায়ে। এমন কি বস্তা বস্তা খাদ্যদ্রব্য গঙ্গার জলে ফেলে দেওয়ার খবরও পাওয়া যেতে লাগল। এ সব কিছুর একটাই উদ্দেশ্য কৃত্রিম সঙ্কট তৈরি করা। সব মিলিয়ে দেখা গেল দেশের বুকে একটা চরম দুঃসময় বিরাজমান অর্থাৎ আকাল এসে মানুষের জীবনকে তছনছ করে দিতে লাগল। নাট্যকার সেই বিষয়গুলিকে একে একে তুলে ধরেছেন নাট্যাঙ্গিকে। এবং উপরি-উল্লিখিত বিষয়গুলির সম্মিলিত দুশ্চেষ্টায় জনজীবনে এসে পড়া আকালকে প্রতিপক্ষ করে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছেন নাট্যকার। এই যে বিরাট শত্রু বা দৃশ্য নয় অথচ যার জঘন্য আত্মপ্রকাশ ঘটছে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলবার জন্য, মানুষের সংসারের শান্তি, জীবনের সুখকে বাজপাখির মতো ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তার সঙ্গে লড়াই করতে হবে। যে শত্রু প্রত্যক্ষ এবং নাগালের মধ্যে তাকে শায়েস্তা করা যায় সহজে। তাই কালীধন, হারু দত্তেরা অতি সহজে ধরা পড়ে। তারা এতো সহজে এবং এতো সত্বর ধরা পড়ায় অনেকে আশ্চর্য হতে পারেন, কিন্তু নাট্যকার অতি সুন্দরভাবে প্রত্যক্ষ শত্রুকে পরাস্ত করবার ব্যবস্থা করে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যে প্রত্যক্ষ শত্রুকে পরাস্ত করা যায়। কিন্তু যে শত্রু অপ্রত্যক্ষে থেকে সমাজের ক্ষতি করে যায়, প্রথমে তাকে চিহ্নিত করার প্রয়োজন আছে। তাই এই আকালে সর্বস্ব হারিয়ে এই গ্রাম্য

জনতা এটুকু বুঝেছে যে আর একটা আকালের প্রবেশের পথ বন্ধ করতে হবে। তার বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য বিরাট প্রতিরোধ বাহিনী গড়বার দরকার আছে। তাই নাট্যকার একে একে আকাল সৃষ্টিকারী অশুভ শক্তির স্বরূপ উদঘাটন করে গেছেন প্রথম পর্যায়ে। তিনি দেখিয়েছেন কালোবাজারী, চোরাকারবারীদের চরিত্র, তিনি দেখিয়েছেন বস্ত্রহীন, শতচ্ছিন্ন নোংরা কাপড়ের টুকরো পরিহিত ক্ষুধার্ত নগ্ন নরনারীর ছবি তুলে একদল অসৎ সংবাদজীবী এবং ফটোগ্রাফাররা পয়সার লোভে বিদেশের খবরের কাগজে তা বিক্রি করেছে, বিনিময়ে আর্ত জনতার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিচ্ছে দু-চার আনা পয়সা। নাট্যকার দেখিয়েছেন, যে যুদ্ধের ব্যাপক জনতার কোনো সম্পর্ক নেই সেই যুদ্ধ কার মঙ্গলের জন্য? যুদ্ধ কিসের জন্য এ বোধ যাদের নেই সেই সব মানুষদের ধরে ধরে যুদ্ধে সাপ্লাই করছে একদল অর্থলোভী কন্ট্রাকটর। তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের লালসা মেটাবার জন্য অসহায় ফুটপাতবাসী সোমত্থ নারীদের ভুলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মায়ের বুক খালি করে। তিনি দেখিয়েছেন হাসপাতালের শোচনীয় ক্রিয়াকাণ্ড। সব মিলিয়ে দেশের একটা ভয়াবহ ছবি তুলে ধরেছেন নাট্যকার। এসব দেখাবার উদ্দেশ্য মানুষকে সচেতন করে তোলা। শুধু সচেতন নয় একটা প্রতিরোধবাহিনী গড়ে তোলবার পজিটিভ ইঙ্গিতেও তিনি রেখেছেন তার নাটকে। আগামী দিনে আবার যদি আকাল আসে তবে তার বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। নাট্যকার সে কথা ব্যক্ত করেছেন দয়ালের মুখ দিয়ে, 'কিন্তু এ কথাও জেনো প্রধান, সে গতবারের মতো এবার আর আকাল আচম্বিতে এসে আমার চোখের ওপর থেকে আমারই পরিজন ; আমারই স্বজন, আমারই বন্ধুবান্ধব (জনতার দিকে হাত তুলে দেখিয়ে) এই এরাই তো আমার আত্মীয় পরিজন, ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না এদের। কিছুতেই না। এদের নিতে হলে আগে আমাকে নিতে হবে, আমারে ঘায়েল করতে হবে, এট্টা ব্যবস্থার ওলট-পালট করে ফেলে দিতে হবে প্রধান, তবে, তবে যদি পারে। জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ!—এ প্রতিরোধ আকালের বিরুদ্ধে। প্রতিরোধ মূলক নাটকে তাই স্থান কাল পাত্রের সুসঙ্গতি, ঘটনার যুক্তিসঙ্গত বিন্যাস, ঘাত-প্রতিঘাতের টানাপোড়েন এবং তীব্র নাটকীয় দ্বন্দ্ব সব সময় সঠিকভাবে পাওয়া যাবেই এমন কথা বলা যায়না। 'নবান্ন' নাটকে সে হিসেবে গঠনগত দিক থেকে অল্পস্বল্প ত্রুটি থেকে গেছে। নাট্য সমালোচকের চোখে সে ত্রুটিবিচ্যুতি ধরা সহজেই পড়ে যাবে। কিন্তু 'নবান্ন' নাটকের বিচার-বিশ্লেষণ করতে হবে অন্য রকম ভাবে। গতানুগতিক নাটক আর গণচেতনা বৃদ্ধির জন্য গণমঞ্চের নাটকের একটা স্পষ্টরেখ পার্থক্য আছে। সেই পার্থক্যসূত্রে নাটকে একটা বিপ্লবাত্মক বক্তব্য এসে পড়েই এবং আকস্মিকতার একটা সঙ্গতিবিহীন চমক না থেকে যায়না। এ গুলিকে সমালোচনার খাতিরে শৈল্পিক ত্রুটি হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। যেমন বিভিন্ন দৃশ্য পারস্পর্যবিহীন এক একটি চিত্র ফুটে উঠতে দেখা গেছে। এই সব চিত্রগুলি যদি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত হত তাহলে খুব ভাল হতো। নাটকের ঘটনাবলী একটা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলবে এবং প্রচণ্ড উৎকণ্ঠা জাগিয়ে রেখে একটা সংঘাত সৃষ্টি করে পরিণতি প্রাপ্ত হবে এটাই বাঞ্ছনীয়। তবে আমরা পূর্বের কথার জের টেনেও বলতে পারি গণনাটকের বিচার বিশ্লেষণ স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গিতেই করতে হয়। প্রসঙ্গক্রমে 'নীলদর্পণ'-এর কথাটা এসে পড়ে, আর নীলদর্পণে একটা প্রচারের দিক থাকা সত্ত্বেও নাটকটি অনেক বেশি নাট্যগুণসম্পন্ন। কিন্তু এক্ষেত্রে একটু ভাববার দরকার আছে। কেন না, 'নীলদর্পণ' প্রথমত গণনাটক নয়। দ্বিতীয়ত, কৃষকদের কথাই এই নাটকের একমাত্র বক্তব্য বটে তবে তারাই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র নয়, তা

যদি হত নবীন মাধব নায়ক আর তার পরিবারের বিষাদময় পরিণতিতে নাটকের সমাপ্তি এটা হতে পারত না। শিথিল অর্থে নাটকের মধ্যে যেটুকু ট্রজেডির চেহারা দেখা গেছে, তা গোলোক বসুর পরিবারের ট্রজেডি হয়ে গেছে। সমস্ত কৃষক পরিবারের ট্রজেডি হয়ে উঠতে পারেনি।

তাহলে প্রশ্ন, 'নবান্ন' নাটকে কি সেই ট্রাজেডির কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে? বিষয়টা একটু ভেবে দেখে যেতে পারে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবার এই নাটকের কেন্দ্রীয় পরিবার। এই পরিবারের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণই বেশি। নাটকে দৃশ্যত উদ্বাস্তু হয়েছে এই পরিবারটিই, এই গ্রাম্য পরিবারটির একটা বিপ্লবাত্বক ভূমিকাও আছে। প্রথম দৃশ্যে কুঞ্জ আর প্রধানের সংলাপ ,পরে প্রধানের স্ত্রী পঞ্চাননীর প্রতিরোধমূলক ভূমিকা, আর তা করতে গিয়ে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে এই পরিবারের বৈপ্লবিক ভূমিকাটি তুলে ধরা হয়েছে। তারপর এই পরিবারটিই ভিখিরিতে পরিণত হল, এবং সমাপ্তি পর্বে আবার মিলনের বিন্দুতে সংস্থিত হল, সব মিলিয়ে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে এই সমাদ্দার পরিবারটিই 'নবান্ন' নাটকের একটা ট্রাজিক বাতাবরণ তৈরি করেছে। আবার প্রধান সমাদ্দারের দিকে লক্ষ্য রেখে একথা ভাববার একটুখানি সুযোগ থেকে যায় যে ব্যক্তি ট্রাজেডির একটি বুদবুদ। কিন্তু ব্যক্তির ট্র্যজেডি হতে গেলে সংশ্লিষ্ঠ ব্যক্তিটিকে যে দৃঢ়ভূমির ওপর দাঁড় করান দরকার নাট্যকার তা করতে পারেননি। অপরপক্ষে চরিত্রটি গভীর থেকে গভীরতর তলদেশে প্রবেশ করতে পারেনি। বিষাদের ঘণীভূত রুপটা তার মধ্যে দেখা যায়নি। ফলে দর্শকমনে একযোগে ভয় ও করুণা জাগেনা। বরং পাগলামোর একটা হালকা আবরণ জড়িয়ে এবং কখনো কখনো আকস্মিকতা দোষে দুষ্ট করে চরিত্রটা তরল করে ফেলা হয়েছে। সব মিলিয়ে একটা অসংগত অবাস্তব পাগলামো প্রকাশ পেয়েছে মাত্র। স্বতন্ত্র প্রেক্ষাপট সত্বেও প্রধান অনেকটা 'প্রফুল্ল' নাটকের যোগেশের অতিনাটকীয় ভূমিকার শিকার। অনেকদিক থেকে উভয়ের মিল থাকলেও আসল কথা এই যে 'নবান্ন' নাটকের প্রধান পরিবার বা প্রধান চরিত্রটি সেন্ট্রাল নয়। গোটা সমাজের ছবিটা ফুটিয়ে তোলাই এই নাটকের উদ্দেশ্য। ডোমেস্টিক বা পারিবারিক ট্রজেডি সৃষ্টির কোনো ইচ্ছা নাট্যকারের এখানে ছিলনা। আগষ্ট আন্দোলন বন্যা-বিশ্বযুদ্ধ— এই তিন বস্তুর সমবায়ে আগত আকালের কবলিত হয়ে কৃষক সাধারণের জীবনে যে ছন্দপতন ঘটে গেছে, যে ক্ষয়ক্ষতি, দুঃখদুর্দশা নেমে এসেছে তাতে শান্ত স্নিগ্ধ গ্রাম্যজীবনের চালচিত্র ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাধ-স্বপ্নের ওপর আকস্মিক আঘাত এসে গোটা সমাজের চেহারাটা দিয়েছে বদলিয়ে কোনো ব্যক্তি নয়, কোনো বিশেষ পরিবার নয়, সমস্ত কৃষক সমাজ সমস্ত গ্রাম্যজনতার জীবন দুঃখ, দুর্দশা হাহাকারে ভরে গেছে। শুধুমাত্র প্রধান সমাদ্দার বা তার পরিবারটাই ছিন্নমূল হয়ে শহরের পথে ছেঁড়া কাপড় আর একপেট বুভুক্ষা নিয়ে এসে দাঁড়ায় নি। সমস্ত কৃষক সমজই হয়েছে ক্ষতিগ্রত, তাই এই সব দিকে তাকিয়ে ব্যাপক অর্থে আমরা 'নবান্ন' নাটককে সামাজিক ট্রাজিডি মনে করতে পারি। তবে প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভাল যে সঠিক অর্থে ট্রাজেডি লক্ষণাক্রান্ত নাটক বাংলায় বিরল। না থাকবার কারণটাও অবিদিত নয়। দ্রুত পরিবর্তমান সমাজব্যবস্থায় ট্রাজেডি হতে পারেনা। আবার ব্যক্তির ট্রাজেডির জন্য যে ব্যক্তিত্বশালী পুরুষের দরকার তেমন পুরুষ বিরল। এসব দিক বিচার করলে বলা যায় 'নবান্ন' নাটক ট্রাজেডির নাটক নয়। 'নবান্ন' ছোট ছোট ঘটনার, ছোট ছোট চিত্রের নাটক। 'নবান্ন' প্রতিবার প্রতিরোধের নাটক।

এই নাটক সম্পর্কে আরো একটু বলবার কথা এই যে, নাটকীয় চমক সৃষ্টির দিকে নাট্যকার অতিরিক্ত

মনোনিবেশ করেছিলেন। নতুন বক্তব্য, জীবনবোধ নিয়ে ভিন্ন ধরনের দর্শক আকর্ষণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রযোজনা, সেক্ষেত্রে এ ঘটনা কিছুটা স্বাভাবিক ছিল। তার ফলে যে বিষয়-পরম্পরায় গোটা নাটকের সন্ধিগুলো অগ্রগামী হয়ে নাটকের সুষম সমাপ্তি ঘটে, সে নিয়ম পরম্পরা সব সময় বজায় থাকেনি। বস্তুত নাটকটির প্রতিটি দৃশ্য চমক বিশিষ্ট। প্রত্যেকটা দৃশ্যের শেষে অতর্কিত চমকসৃষ্টির একটা প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। তাতে দর্শক সাধারণের উপভোগ্যতা বহুগুণ বেড়ে যায় ঠিক কিন্তু তাতে গোট নাটকে যে উৎকণ্ঠা বজায় থাকবার কথা সেটি থাকেন। কালীধন ধাড়া হারু দত্ত পর্যন্ত একটা Dramatic Suspense বজায় ছিল। কিন্তু তাদের হাতে হাতকড়ি পড়বার পর নাটকে সে উৎকণ্ঠা আর বজায় থাকেনি। ফলত নাটকে গতিপ্রবাহের তীব্রতা সৃষ্টির পরিবর্তে কেবলমাত্র কয়েকটি সমাজচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টার প্রতি একাগ্রতা লক্ষ্য করা গেছে।

৮৭.৮ মূলপাঠ ৪ : 'নবান্ন' নাটকের গঠন

কোনো কাহিনীকে নাটক করে তুলতে গেলে গোটা কাহিনীকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করে নিতে হয়। সাধারণত পাঁচটি ভাগে এই স্তর বিন্যাস হয়ে থাকে । নাটকের পরিভাষায় একে বলা হয় পঞ্চসন্ধি। একটি পূর্ণাঙ্গ বড় নাটকে এই পাঁচ স্তর বা পঞ্চসন্ধির কড়াকড়ি নিয়ম নিয়ে কাহিনীকে নাটক হিসেবে গড়ে তোলা হয়। সর্বাধুনিক বাংলা নাটকের পূর্ব পর্যন্ত এই নিয়মে নাটক গ্রন্থিবদ্ধ হত। কিন্তু আধুনিক নাটকে এই নিয়মের কড়াকড়ি থাকল না। নাটক আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে আসবার ফলে আধুনিক নাট্যকারগণ গোটা নাটকটিকে তিনটিকে স্তরে ভাগ করে নিলেন। এই স্তর বিন্যাসের সংক্ষিপ্তকরণের কারণটা অনুসন্ধানটা করা যেতে পারে। শুধুমাত্র আকারে এবং প্রকারে ছোট হয়ে যাওয়াটাই বোধ হয় একমাত্র কারণ নয়। গ্রীক নাটকে গুরুত্ব পেত বিষয়বস্তু। তাই গ্রীক নাটককে বিষয় প্রধান বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু সেক্সপীয়রের নাটকে বিষয়টা প্রধান হলনা। প্রধান হল চরিত্র। এই ধারা বয়ে চলল দীর্ঘদিন। বাংলা নাটকের যে যুগটাকে স্বর্ণ যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে অর্থাৎ গিরিশ-অর্ধেন্দু-শিশির-অহীন্দ্র যুগ পর্যন্ত নাটকে প্রধান হয়ে দেখা দিল চরিত্র। যার জন্য প্রায় প্রত্যেকটা নাটকে এমন একজন চরিত্র অঙ্কিত করা হতে থাকল যাতে অভিনয় করবেন কোনো প্রতিষ্ঠিত নট বা নটী। তাদের অভিনয় সাফল্যের সঙ্গো নাটকের সাফল্য ছিল নির্ভরশীল।

আধুনিক কালের বাংলা নাটক দুটি ধারায় বয়ে চলে। একটিতে মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য পুরোপুরি বজায় থাকে। অপর ধারাটি গণনাটকের খাত বেয়ে গণচেতনা বৃদ্ধি, যে গণচেতনা সমাজ পরিবর্তনের অগ্রণী ভূমিকা গ্রহন করবে— সেই দিকে এগিয়ে যায়। গণনাটকে তাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এবং মনস্তত্ত্বের সংমিশ্রিত রুপেই পরিবর্তন ঘটে গেল। নাটকে এসে গেল শোষক শোষিতের সংঘাত মুখর সম্বন্ধ। অর্থাৎ শ্রেণীদ্বন্দ্ব। তাই ব্যক্তিরই হোক বা মনস্তত্ত্বেরই হোক একক প্রাধান্য বজায় থাকল না। প্রধান হয়ে উঠলো গোটা সমাজ। সমাজে একক ব্যক্তির ভূমিকা নিষ্ক্রিয়। তাই ব্যক্তি প্রধান্যের স্থলে সমষ্টি প্রাধান্য সাব্যস্ত হল। সমষ্টি বলতে এখানে বলা হচ্ছে শোষিত গোষ্ঠী। শোষিত গোষ্ঠীর সংখ্যা বিপুল, তাই বিপুল সংখ্যক মানুষের কথা বলবার জন্য গণনাটক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হল। তাই গণনাটকে আমরা দেখলাম প্রতিরোধ আর সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। তাই এই ধরনের নাটককে বলা হয় প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest।

‘নবান্ন’ নাটক Drama of Acceptance বা Interjection অথবা Discomfort নয়, অথবা Frustration কিংবা Drama of Chaos অথবা Absured- ও নয়। ‘নবান্ন’ প্রতিবাদের নাটক, প্রতিরোধের নাটক,Drama of Protest বা Drama of Revolt বলা যেতে পারে। প্রতিবাদ, প্রতিরোধের মনোভাবটাই এই নাটকের মূল সেন্টিমেন্ট। সুতরাং এই নাটকে ব্যক্তি মনস্তত্ত্বের বক্রগামী রেখাচিত্রের শিল্পসম্মত রূপায়ণ মূল লক্ষ্য নয়, জনগণের দুঃখ দুর্দশার কারণগুলো বিশ্লেষণ করে বিরুদ্ধ শক্তির বিরুদ্ধে একটা প্রতিরোধ গড়ে তুলে জনগণকে প্রতিবাদের স্তরে নিয়ে যাওয়াই মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। আর তারপর প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব সংঘাতের মধ্যে দিয়ে কাঙ্খিত মুক্তির শীর্ষবিন্দুটি স্পর্শ করবার পজিটিভ ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে নাটকটির অভীষ্ট পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে। ‘নবান্ন’ নাটক এই ধ্যানধারণার সরিক।

সুতরাং এই ধরনের নাটকের স্তর-বিন্যাসেও অনিবার্য ভাবে এসে যায় কিছু অদল বদল। নাটকের গতানুগতিক ঠিকুজি-কুষ্ঠিটা ছিঁড়ে যায়। নাটক যেহেতু প্রত্যক্ষ জীবনের রণক্ষেত্র থেকে উঠে আসে, তাই তার সুরটা হয় চড়া। চড়া সুরকে দীর্ঘতর করলে অনুচিত ফলের সম্বাবনা দেখা দিতে পারে, তাই নাট্যকার পাঁচটি স্তরের পরিবর্তে কেউ তিনটি,কেউ চারটি স্তরে সমস্ত নাটকটি বিন্যস্ত করেন। একেবারে ছোট নাটক তিনটি স্তরে। একটু বড় নাটককে চারটি স্তরে ভাগ করে নিয়ে নাটক গড়ে তোলবার আধুনিক ইচ্ছাটাই অধিক কার্যকরী হয়ে উঠতে দেখা যায়। ‘নবান্ন’ নাটক বড় নাটক, তাই এই নাটকটি চারটি স্তরে বিন্যস্ত হয়েছে বলা যেতে পারে।

‘নবান্ন’ নাটকের উৎসমুখ উৎসারিত হয়েছে প্রথম অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে। প্রথম অঙ্গের প্রথম দৃশ্যে দেখান হয়েছে স্বাধীনতার আন্দোলন আর তার ফলস্বরুপ আমিনপুর গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি। তারপর দেখান হয়েছে প্রধান পরিবারের সাংসারিক জীবনযাত্রা এবং অনতিবিলম্বে বন্যার ভয়াবহ আক্রমণে গোটা আমিনপুরের সাধারণ মানুষের জীবনের বিপর্যয়ের চিত্র। সেই সঙ্গে মহামারীর ব্যাপক আক্রমণে সহায়সম্বলহীন মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে, খাদ্যাভাবের সংগ্রামের চিত্র। এরই সঙ্গে অসৎ ধনীর অর্থগৃধ্নুতা, লোলুপতার নগ্ন চিত্র অঙ্কিত হয়ে উঠতে থাকল বীভৎসভাবে। প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা; ঘর বাড়ি মানুষজন জীব জন্তুকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়ে সমস্ত আমিনপুরকে সমুদ্রে পরিণত করে ফেলেছে। ....সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা! তার পরের দৃশ্যে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলে খাদ্যাভাবে এবং রোগ অসুখের চিত্র অর্থাৎ দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত। তারপরের দৃশ্যে পয়সাওয়ালা মানুষের জমি আত্মসাতের অপকৌশলের, লোলুপ দৃষ্টির অবলেহনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এই দৃশ্যে সমাদ্দার পরিবার, হারু দত্ত ও তার লোকজনদের নির্মম অত্যাচারে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাচ্ছে শহরে। এই দৃশ্যেই ঘটেছে মাখনের মৃত্যু।

নাটক এরপর উঠতে থাকে ওপরে। দ্রুতগতিতে রাইজিং এ্যাকসনের স্তর ছেড়ে ক্লাইমেক্স-এর স্তরে পৌঁছতে চায় নাটক। প্রথম দৃশ্যে নারীর ইজ্জত রক্ষা দেশে সঙ্কটত্রাণ সাম্রাজ্যবাদীর পাশবিক শক্তির ব্রিটিশ দমননীতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বস্তুত কেড়ে নিল পঞ্চাননীকে। তৃতীয় দৃশ্যে বন্যা নিল প্রধানের প্রতিবেশী দয়ালের স্ত্রী এবং তার একমাত্র সন্তানকে রাঙা, রাঙার মা। কিন্তু তবুও আমিনপুরের মনোবলটা ভেঙে পড়েনি। তবুও উনানের ধোঁয়া উড়ল। শাকপাতা সেদ্ধ করে মানুষগুলো বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে যেতে লাগল

আপন বাস্তুভিটার মাটিটুকু আঁকড়ে। তবে খেত-খামার খাল-বিলের শাকপাতা জগডুমুর আর কুচো কাঁকড় দিয়ে কদিনেই বা চলে, আর ওই বস্তুগুলো অত অপর্যাপ্তই বা কোথায়! তাছাড়া ঘাসেরও দাম বেড়ে গেছে দুর্ভিক্ষের বাজারে। 'এ যেন আমার ঢোলকলমি জলার ঘাস বলে মনে হচ্ছে! তা সে যা করেছ করেছ, আর কেটো না। ঘাসের আজকাল বড্ড দর।'[হারু দত্ত : ১ম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য] প্রধান ঠিক করে জমি বিক্রি করবে। হারু দত্তের সঙ্গে কথা পাকা করে ফেলেছে শুনে বাধা দেয় কুঞ্জ। তার কাছে বাধা পেয়ে প্রধান মত বদলিয়ে ফেলে। ইতিমধ্যেই চালের চোরাচালানদার হারু দত্ত এসে পড়ে ঘটনার কেন্দ্রে। কুঞ্জর সঙ্গে শুরু হল ঘাত-প্রতিঘাত। কুঞ্জকে প্রধান প্রতিবাদী হিসেবে ঘরে নিয়ে তাকে নিষ্ঠুরের মতো লাঠিপেটা করল। প্রধান বাধা দিতে গিয়েছিল, তাকেও রেহাই দিলনা। সমাদ্দার পরিবারের ওপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে বিধ্বস্ত করে দিয়ে বেরিয়ে গেল দস্যু হারু দত্ত তার দলবল নিয়ে। হারু দত্তের অতর্কিত আক্রমণের অভিঘাতে বালক মাখনের মৃত্যু ঘটল। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখেমুখে নেমে আসল 'একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া'।

'নবান্ন' নাটকের মুখ্য ঘটনা এটাই। এরপরই সমাদ্দার পরিবার শহরের পথে পাড়ি দেয়। অলি-গলিতে পথে পার্কে ঘুরে ঘুরে ভিখিরির জীবনযাপন করতে থাকে। প্রধান সমাদ্দার হয়ে যায় উন্মাদপ্রায়। এরপর কাহিনী কয়েকটি ধারায় বিভক্ত হয়ে ক্রমশ অগ্রসর হয়েছে। একদিকে অঙ্কিত হয়েছে দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের মর্মান্তিক জীবনযাত্রার ছবি। তুলে ধরা হয়েছে সমসাময়িক কালের সংবাদপত্রে সাংবাদিক এবং ফটোগ্রাফারদের অর্থ উপার্জনের নোংরা পথ অবলম্বনের চিত্র। তুলে ধরা হয়েছে অসহায় অভাবগ্রস্ত যুবতী মেয়েদের কেনাবেচার চিত্র। পথে পার্কে অসহায় মেয়েদের ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়ার বিবরণ রাখা হয়েছে এই নাটকে।

বিনোদিনীকে এমনিভাবে কাজের লোভ দেখিয়ে এক দালাল তুলে এনে কালীধনের কাছে বিক্রি করে দেয়। এখানে বিনোদিনী মিলিত হয় নিরঞ্জনের সঙ্গে। কালীধন অসৎ উদ্দেশ্যে মেয়ে সংগ্রহ করে অল্প পয়সার বিনিময়ে। 'সেবাশ্রম' নামক একটা জায়গায় তাদের লুকিয়ে রাখে। কালীধনের আরো একটি কারবার আছে। সে চলের মজুতদার। অল্প মূল্যে চাল কিনে গুদামজাত করে রাখে বেশি পয়সায় বিক্রি করবে বলে। তার গুদামে চাল এবং সেবাশ্রমে মেয়ে সরবরাহ করে হারু দত্ত ও টাউটের মত ঘৃণ্য মানুষজন. নাট্যকার কালীধন-হারু দত্ত নিরঞ্জন-বিনোদিনীকে নিয়ে একটি এপিসোড তৈরি করেছেন। এই অংশের পরিণতি ঘটিয়েছেন এইরকম ভাবে যে, সেবাশ্রমে আশ্রিত বিনোদিনী নিরঞ্জনের সঙ্গে আকস্মিকভাবে মিলিত হয়। সেবাশ্রমের সমস্ত গুপ্ত বিবরণ সে তাকে দেয়। নিরঞ্জন সমস্ত শুনে থানায় যায়। কালীধনের চালের গুদামের বিবরণ এবং সেবাশ্রমের বে-আইনী ব্যবসার কথা ফাঁস করে দিয়ে দারোগাকে ডেকে আনে। দারোগা বামালসমেত কালীধন, রাজীব ও হারু দত্তকে গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনার পর নিরঞ্জন বিনোদিনী গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে। পুনরায় আমিনপুরের পরিচিত মাটির কোলে ফিরে আসে, নিজেদের বাস্তুভিটেতে আবার নতুন করে ঘর তোলে।

কুঞ্জ রাধিকা প্রধান তখনও শহরের পথে ভিখিরি জীবনযাপন করতে থাকে। নাট্যকার শহরের অলিগলিতে ঘুরিয়ে শেষে তাদের নিয়ে আসে এক বড়লোকের বাড়ির সামনে। উদ্দেশ্য একটা বৈপরীত্যপূর্ণ

ছবি তুলে ধরা। অর্থাৎ একদিকে দুর্ভিক্ষপীড়িত অসহায় মানুষের অ-মানুষিক জীবনযাত্রার ছবি অঙ্কন করা আর তার পাশাপাশি ধনী মানুষের বিলাস-বৈভবের চিত্র, অকারণ অপচয়ের চিত্র তুলে ধরা। সেই সঙ্গে কালোবাজারী ও চোরাকারবারীদের সঙ্গে অশুভ আঁতাত দেশের শাসনব্যবস্থায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের চরিত্র উদঘাটন এবং এ সমস্তের পাশাপাশি ধনের সঙ্গে ধনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রতিযোগিতার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। অপরদিকে নিরন্ন গরিব মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক কত আন্তরিক, হৃদ্যতাপূর্ণ, প্রেমপ্রীতির বন্ধন কত নিবিড় তা দেখান হয়েছে। মানুষ যে অবস্থার ফেরে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থানে রত, জন্তুর জীবনযাপনে বাধ্য, কিন্তু তবুও তাদের অন্তঃকরণ মানবিক গুণসমৃদ্ধ সে দৃশ্য দেখিয়ে নাট্যকার কাহিনীকে টেনে নিয়ে গেছেন অন্যদিকে।

এই দৃশ্যের পর সমাদ্দার পরিবার আবার দুটি টুকরোয় বিভক্ত হয়ে পড়ে। একদিকে যায় কুঞ্জ রাধিকা, আর একদিকে যায় প্রধান সমাদ্দার। কুঞ্জ রাধিকা এসে পড়ে শহরের এক লঙ্গারখানায়। এখানে এসে তার সমবেত ভিখিরিদের কথাবার্তার মধ্যে আমিনপুরের ফিরে যাওয়ার প্রেরণা পায়। অতঃপর আমিনপুরের পথে পা বাড়ায়, 'কুঞ্জর হাত ধরে রাধিকা এগিয়ে চলে।' অপর দিকে দল থেকে বিশ্লিষ্ট প্রধান সমাদ্দার ঘুরতে ঘুরতে এসে ওঠে একটা হাসপাতালে। তার চোখ দিয়ে নাট্যকার হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থার চরম দুরবস্থার চিত্র তুলে ধরেন। এর পরে প্রধান কোনো দুর্জ্ঞেয় প্রেরণাবশে আমিনপুরে প্রত্যাবর্তন করে নাটকের শেষাংশে।

অতঃপর নাটক চলে আসে পুনরায় আমিনপুরে। নবান্নের উৎসবে সকলে মিলিত হয়।

উপরোক্ত কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, 'নবান্ন' নাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ, সেই সঙ্গে আছে আকর্ষণীয় নাটকীয় উৎকণ্ঠা। প্রতি দৃশ্যে চমক, চমকের পর চমকে নাটকটি জমজমাটি। নাটকটির চারটি অঙ্ক। প্রথম অঙ্কে পাঁচটি দৃশ্য, দ্বিতীয় অঙ্কেও পাঁচটি, তৃতীয় অঙ্কে দুটি এবং চতুর্থ অঙ্কে তিনটি দৃশ্য। অতএব চারটি অঙ্কে মোট দৃশ্য সংখ্যা পনেরটি। প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে আমিনপুর গ্রাম। দ্বিতীয় তৃতীয় অঙ্কের সাতটি দৃশ্য শহর। চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্য পুনরায় আমিনপুর। সব মিলিয়ে আমিনপুর গ্রাম পেয়েছে আটটি দৃশ্য, শহর পেয়েছে সাতটি দৃশ্য। এদিক থেকে মোটামুটি ভারসাম্য বজায় থেকেছে বলা যেতে পারে। আট আর সাতে পনেরটি দৃশ্যের স্তরে স্তরে নাট্যকার সঞ্চারিত করে দিয়েছেন অপর্যাপ্ত নাট্যরস। যে রস দর্শক সাধারণকে জমিয়ে রাখবার জন্যে যথেষ্ট। শম্ভু মিত্র এই নাটকের সম্পাদনা, অভিনয় এবং পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন 'নবান্ন' এ ছিল একটা এপিক নাটকের ব্যাপ্তি। নাটকটির একটা এপিসোডিক কারেক্টার আছে। দৃশ্যগুলি এমনভাবে বাঁধা যে, এক একটি ক্লাইম্যাক্স, প্রতিটি দৃশ্যের শেষে আছে। সুতরাং নাটকটি যে খুব জমজমাট সে বিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। তবে প্লট গঠনে শৈথিল্য খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়।

৮৭.৯ সারাংশ

বাংলা নাটক ও মঞ্চের ইতিহাসে 'নবান্ন' রচনা, প্রকাশ ও অভিনয় একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে।

এর পেছনে সক্রিয় ছিল একটি নতুন ভাবনা, বাংলা সহিত্য সংস্কৃতি জগতে অপেক্ষাকৃত নতুনতর রাজনৈতিক দর্শন। মানুষের কথা, মানুষের কাছে, তাদের ভাষায়, তাদের বোধের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার সঙ্কল্প থেকে 'নবান্ন' নাটকের সৃষ্টি। এই নাটকে সমকাল ও ক্রান্তিকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার একটি চিত্র পাওয়া যায়।

সামগ্রিক বিচারে কিছু অসঙ্গাতি সত্ত্বেও 'নবান্ন' নাটককে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক হিসাবে গণ্য করা হয়। এ নাটকের মূলধারার আবর্তন ঘটেছে প্রধান সমাদ্দার-এর পরিবারকে কেন্দ্র করে। সেখানে প্রধান পুত্রদ্বয় শহীদ শ্রীপতি-ভূপতি, পত্নী পঞ্চাননী, বড় ভাইপো কুঞ্জ ও তার স্ত্রী রাধিকার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বিনোদিনী ও তার স্বামী নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র। অথচ এই দুটি চরিত্রই নাটকের দুষ্টের দমন—এই সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে—চোরাচালান, মেয়ে পাচারকারী হারাধন ও মজুতদার ও নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধনকে ধরিয়ে দিয়ে সামাজিক ন্যায়কে প্রতিষ্ঠা করেছে। Suffering and Struggle-এর মধ্য দিয়ে মানুষের মুক্তির এটি যদি কোনো সামাজিক-রাজনৈতিক বিধান হয় প্রধান-কুঞ্জ সেক্ষেত্রে অনেকটাই অতি সাধারণ দুর্বল চরিত্র মাত্র। যদিও এ নাটকে সমস্ত ধরনের প্রতিকূলতার তারা শিকার, তাদের জীবন যন্ত্রণাই সর্বাধিক প্রতিফলিত। কিন্তু এদের বাঁচবার আকাঙ্খাই শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছে। সম্ভবত এই শেযোক্ত কারণেই—শত হতাশার মধ্যেও বাঁচবার আকুলতা মানুষের জীবনে গভীরতর সত্য বলে বিষয়বস্তু অভিনয় নৈপুণ্য ও সংলাপ নাটকটিকে সেদিন জনপ্রিয় করে তুলেছিল। নবান্ন গণনাট্য হিসেবে সাফল্যের অধিকারী হয়েছে। কারণ নাটক দেশকালের বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে গণচেতনার সঞ্চারে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নাটকের চতুর্দশ-পঞ্চদশ দৃশ্যে, পরিশেযে আমিনপুরের হিন্দু-মুসলমান চাষী জীবনের ক্ষয়ক্ষতি ভুলে সকলে মিলেমিশে ফসল একই খামারে তোলা, ঝাড়াই-এর পর তার একটি অংশ অনাগত ভবিষ্যৎ দুর্যোগ থেকে আত্মরক্ষার জন্য ধর্মগোলায় সংরক্ষণের ব্যবস্থা যেমন করেছে, তেমনি প্রথা অনুযায়ী মরা গঙ্গার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে নবান্ন উৎসবের আয়োজন করেছে।

নাটকের সামগ্রিক পর্যালোচনা শেযে স্মরণ করতে হয়, নাটকের গঠন বিন্যাস প্রসঙ্গাটিও। নাটক সাধারণত পঞ্চসন্ধি সমন্বিত। একটি পূর্ণাঙ্গা নাটক সাধারণত পাঁচটি অঙ্কে বিন্যস্ত। প্রথমে নাটকীয় ঘটনার প্রস্তাবনা বা সূচনা বা এক্সপোজিশন, দ্বিতীয়ে তার ক্রমবির্বতনের প্রথম ধাপ আরোহপর্ব বা রাইজিং অ্যাকশন, পরে নাটকের চূড়ান্ত সঙ্কট মুহূর্ত (crisis) বা ক্লাইম্যাক্স-এর পর একটি পরিণতির দিকে অবরোহ, অবনমন বা ফলিং অ্যাকশন এবংনাটকের পরিণতি পর্ব বা ক্যাটাসট্রফি/ডেনোমেন্ট—পূর্ণাঙ্গা বড় নাটক এই পাঁচটি স্তর অতিক্রম করে সমাপ্ত হয়। কিন্তু আধুনিক নাটক যুগ ও জীবনযাত্রার সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে বিষয় ও চরিত্র প্রাধান্য সূত্রে নাট্যাভিনয় ও নাটকের গঠন বার বার পরিবর্তিত হয়েছে। কাহিনী নির্ভর চরিত্র নাটক, নাটকের ভরকেন্দ্র পরিবর্তন করেছে। সেক্সপীয়রীয় নাটকে চরিত্র বিকাশের জন্য যে গঠন প্রয়োজন ছিল, গিরিশ-অর্দ্ধেন্দু-দানীবাবু-অহীন্দ্র যুগে আবেগপ্রবণ চরিত্রাভিনয়ে যে দর্শককে আবেগতাড়িত করবার জন্য নাটকের বিস্তার প্রয়োজন ছিল, পরবর্তীকালে যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশের জন্য দ্বন্দ্বসঙ্কুল মূহূর্ত ফুটিয়ে তুলতে সেই পরিসরের প্রয়োজন নেই, তাই পরবর্তীকালে ব্যক্তিগত আবেগসর্বস্ব চরিত্রাভিনয়ে ভাটা পড়ায় আধুনিক

নাটক ক্রমশ তিন অঙ্ক থেকে একাঙ্কে রূপান্তরিত হয়েছে। এ যুগের প্রধান চরিত্রগুলি ক্রমশ হয়ে উঠেছিল মনস্তত্ত্ব নির্ভর এবং সমস্ত নাটকে ঘটছিল মনস্তত্ত্বের প্রাধান্য। ঠিক এরই পাশাপাশি আরও একটি ধারা যুক্ত হল চারের দশকে, গণনাট্যের সূচনাপর্ব থেকে। এ নাটকে ব্যক্তি নয়, ব্যষ্টি বা সমষ্টির প্রাধান্য। আর এই সমষ্টি ভাবনার জন্যই গণচেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে নাটক ব্যবহার করা হয়। গণনাটকে তাই ব্যক্তি ও সমষ্টির ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সমাজ মনস্তত্ত্বের যোগ দেখা যায়। গণনাটকে শোষকদের সঙ্গে শোষিতের সংঘাত হয়ে ওঠে অনিবার্য। এই সংঘাত থেকেই নাটকীয় দ্বন্দ্বের সৃষ্টি। নবান্নে বহু মানুষের সমর্থনে দাঁড়িয়ে নাট্যকার শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের, সংগ্রামের ছবি তুলে ধরেছেন।

উচ্চকণ্ঠ হয়ে এই বক্তব্য দীর্ঘ সময় জুড়ে বলা যায়না। তাই নাট্যকার পাঁচটি অঙ্কের পরিবর্তে চার অঙ্কে মোট পনের দৃশ্যে তাঁর বক্তব্য পরিবেশন করেছেন। অকুস্থল মেদিনীপুর, আমিনপুর একটি কল্পিত গ্রাম হলেও, সমকালীন বহু বিচিত্র ঘটনার প্রেক্ষাপটে এ নাটক রচিত। যেমন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর ভারত ছাড়ো আন্দোলন, মেদিনীপুরের সংগ্রামী ইতিহাস, মন্বন্তর-মহামারী, মড়ক—এরই মধ্যে কিছু মানুষের বাঁচার সংগ্রাম। দুঃখ, দুর্যোগের অবসানে, সকলে মিলে সব দুঃখ সয়েও, অনাগত ভবিষ্যতের সঙ্কট উত্তরণের জন্য ধর্মগোলার সঙ্কল্প নিয়ে।

দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নাটকের মূল বিষয়বস্তুকে পর্যায়ক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। নাটকের চরম মুহূর্ত বা ক্লাইম্যাক্স বলে যদি কোনো কিছু কল্পনা করা হয় তবে দ্বিতীয় অঙ্কের শেষ দৃশ্যটিকে ধরা যেতে পারে। দ্বিতীয় অঙ্কে গ্রামসমাজের অত্যাচার অনাচারের নায়কদের শাস্তির উপযুক্ত ব্যবস্থার পর তৃতীয় অঙ্কের সামান্য দুটি দৃশ্যে লঙ্গারখানা ও চিকিৎসাকেন্দ্রের অব্যবস্থার পরিচয় দিয়ে দ্রুত নাটকের উপসংহার টানা হয়েছে চতুর্থ অঙ্কে। নবান্নের কাহিনী বিশ্লেষণ থেকে স্পষ্টত বোঝা যায়, এনাটক সরলরৈখিক ক্রিয়াকাণ্ডের নাটক নয়। এটি জটিল ঘটনার ঘনঘটায় পূর্ণ। এর প্রায় প্রতিদৃশ্যে আছে চমক। পনের দৃশ্যের মধ্যে আটটি দৃশ্যে আমিনপুরে, আর সাতটি শহরে সংঘটিত। গ্রাম-শহরের দৃশ্য সমাবেশ করে নাট্যকার ভারসাম্য রক্ষা করে স্তরে স্তরে নাট্যরস সঞ্চারিত করেছেন। প্রথম পর্বের অন্যতম নাটক পরিচালক ও অভিনেতা শম্ভু মিত্র। নবান্ন নাটকের মহাকাব্যিক (এপিক) ব্যাপ্তি এপিসোডিক ক্যারেকটার পরিচয় লক্ষ্য করেছেন। ফলত নাটকটি যে অভিনয়ে খুবই জমে উঠেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৮৭.১০ অনুশীলনী ২

১। নিচের সংলাপগুলি পড়ে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর দিন :

(ক) প্রধান। চলো চলে যাই।
দয়াল। কোথায়?
প্রধান। কোন শহরে? অন্নকুট খুলেছে সেখানে সব বাবুরা।
—বক্তা কেনে পরিস্থিতিতে, কেন এবং কোথায় যাওয়ার কথা বলেছেন? 'অন্নকূট' শব্দটির বাচ্যার্থ

ও ব্যঞ্জনার্থ বুঝিয়ে দিন।

(খ) "চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব।" —বক্ত কে? কোন প্রসঙ্গো এ কথা বলা হয়েছে? মন্তব্যটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(গ) "আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—" —বক্তা কে? কুঞ্জকে একথা বলার কারণ কী?

(ঘ) "আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস।"—বক্তা কে? কাদের বলেছেন? আমিনপুরের কলঙ্ক বলবার কারণ কী? বক্তার চরিত্র সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

২। "নবান্ন' নাটকের গঠনগত বিশিষ্টতার পরিচয় দিন।

৩। 'নবান্ন একই সঙ্গো দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক।'—মন্তব্যটির সারবত্তা স্থির করুন।

৪। বিষয়বস্তু, উপস্থাপক ও চরিত্র পরিকল্পনায় 'নবান্ন' অভিনবত্ব দাবি করতে পারে।— মন্তব্যটি কতদূর যথার্থ আলোচনা করুন।

৫। 'নবান্ন' সমকালীন সমাজ ও নাট্য আন্দোলনে প্রভূত প্রভাব বিস্তার করলেও, শিল্পসৃষ্টি হিসেবে দুর্বল। — এ সম্পর্কে আপনার অভিমত যুক্তিসহ প্রতিষ্ঠিত করুন।

৮৭.১১ মূলপাঠ ৫ ঃ 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র আলোচনা

একটি নাটকের জন্য কাহিনী, সংলাপের সঙ্গো চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজনকে অস্বীকার করা যাবে না। নাটকে চরিত্র একটি অপরিহার্য অঙ্গ। বর্তমানে নাটকে চরিত্র সংখ্যা খুবই সীমিত। একটি বা দুটি চরিত্র দিয়ে একটি নাটকের সাবলীল গঠনকার্য সমাধা হতে পারে।

বাংলা অপেশাদার গণনাট্য আন্দোলনের প্রথম মঞ্চসফল নাটক 'নবান্ন' কিন্তু এদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। 'নবান্ন' নাটকে ছোট বড় চরিত্র মিলে প্রায় পঁয়তাল্লিশটা চরিত্র। আমরা এখানে 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অভিনয়ের চরিত্রলিপিটা তুলে দিলাম :

প্রধান সমাদ্দার	আমিনপুরের বৃদ্ধচাষী	বিজন ভট্টাচার্য
কুঞ্জ সমাদ্দার	প্রধানের ভাইপো	সুধী প্রধান
নিরঞ্জন সমাদ্দার	কুঞ্জের সহোদর	জলধর চট্টোপাধ্যায়
মাখন	কুঞ্জর ছেলে	মণিকা ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)
দয়াল মণ্ডল	প্রতিবেশী	শম্ভু মিত্র
হারু দত্ত	স্থানীয় পোদ্দার	গঙ্গাপদ বসু
কালীধন ধাড়া	চাল ব্যবসায়ী	চারুপ্রকাশ ঘোষ
রাজীব	কালীধনের সরকার	সজল রায়চৌধুরী
চন্দর	জনৈক চাষী	রঞ্জিত বসু
যুধিষ্ঠির	আন্দোলনকারী	নীহার দাশগুপ্ত

ফটোগ্রাফারদ্বয়	সংবাদপত্রের প্রতিনিধি	অমল ভট্টাঃ, রবীন মজুমদার
প্রথম ভদ্রলোক	চাল খরিদ্দার	মনোরঞ্জন বড়াল
বরকর্তা	বড়কর্তা	চিত্ত হোড়
বৃদ্ধ ভিখারি	—	গোপাল হালদার
ডোম	—	শম্ভূ হালদার
দারোগা	—	বিমলেন্দু ঘোষ
ডাক্তার	—	সমর রায়চৌধুরী
দিগম্বর	—	অজিত মিত্র
ফকির	—	সত্যজীবন ভট্টাচার্য
পঞ্চাননী	প্রধানের স্ত্রী	মণিকুন্তলা সেন
রাধিকা	কুঞ্জর স্ত্রী	শোভা সেন
বিনোদিনী	নিরঞ্জনের স্ত্রী	তৃপ্তি ভাদুড়ী (মিত্র)
খুকির মা	হারু দত্তের মা	
ভিখারিণী	—	বিভা সেন
বাংলার ম্যাডোনা	—	ললিতা বিশ্বাস

ভদ্রলোক, নির্মলবাবু, টাউট, ভিখারী, হারু দত্তের শালা, কনেস্টবল, রোগী, ভৃত্য, চন্দরের মেয়ে, বরকত, কৃষক, নিরন্নের দল, জনতা ইত্যাদি।

চরিত্রলিপি থেকে বোঝা যাচ্ছে 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা অনেক। এতো চরিত্র সংখ্যার পিছনের কারণটা অবশ্য এই নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতা। বিষয় বৈচিত্র্য, সময়দীর্ঘতা এবং প্রেক্ষাপটের বিস্তীর্ণতা প্রভৃতি হেতু নবান্ন নাটকের চরিত্রলিপিও বিরাট হয়ে গেছে। একই সঙ্গে আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, এবং বিশ্বযুদ্ধের পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে হয়েছে নাটকে। গ্রাম ও শহরের চিত্র, সমাজব্যবস্থার চরম দুরবস্থা, নৈতিক অধঃপতন, অর্থনৈতিক সংকট ইত্যাদি তুলে ধরে একটা প্রতিরোধমূলক মুহূর্ত সৃষ্টি করতে গেলে যেমন নাটককে বিস্তৃততর ক্ষেত্রে বিছিয়ে দিতে হয়, সেইরকম সর্বস্তরের সুচারু নাট্য রূপায়ণ করতে গেলে চরিত্র সংখ্যাবৃদ্ধির অপরিহার্যতাকে অস্বীকার করা যাবে না। বর্তমানে, নাটকে জাঁকজমকপূর্ণ বিরাট ও ব্যাপকত্বের পরিবর্তে ছোট ছোট ছবি তুলে ধরবার প্রয়াসটা লক্ষিত হয় বেশি।

'নবান্ন' নাটকে বড় চরিত্রগুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে দেওয়া গেল। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ সমাদ্দার, নিরঞ্জন সমাদ্দার, দয়াল মণ্ডল, হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া, রাজীব। স্ত্রী চরিত্রগুলি যথাক্রমে রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী। একটিমাত্র শিশু চরিত্র মাখন। নাটকে এদেরই ভূমিকাংশ বেশি। এরাই নাটকের প্রধান চালিকাশক্তি। এদেরই অভিনয় নৈপুণ্যের দৌলতে নাটক দ্রুত গতিসম্পন্ন হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রতিটি চরিত্রের অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের ক্ষেত্র নাটকে সুবিস্তৃত। প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ ও নিরঞ্জন সমাদ্দার, রাধিকা, বিনোদিনী, পঞ্চাননী এবং মাখন এক পরিবারভুক্ত। দয়াল প্রতিবেশী, হারু দত্ত, কালীধন চোরাকারবারী ও

চোরাচালানদার। রাজীব কালীধনের সরকার। মূলত এই চরিত্রগুলোকে বিকশিত করবার জন্য, প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য, পরিণতি প্রদর্শনের জন্য নাটকের অপরাপর চরিত্রগুলো রুপায়িত হয়েছে।

নাটকে সাধারণত তিন ধাঁচের চরিত্র দেখা যায়। ফ্লাট চরিত্র, রাউণ্ড চরিত্র, টাইপ চরিত্র। ফ্লাট চরিত্র বড় কিন্তু আগাগোড়া একঢালা। একই রকমভাবে চলতে থাকে। অন্তর জগতের উত্থান-পতন, ভাঙাগড়া, দ্বন্দ্ব-সংঘাত—ইত্যাদির গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত আকুলতা ব্যাকুলতার টানাপোড়েনের রেখচিত্র অঙ্কিত না করে সরলরৈখিক ভাবে চলতে থাকে। এ ধরনের চরিত্র প্রধান সমাদ্দার। রাউণ্ড দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। অর্ন্তদ্বন্দ্বে এবং বহির্দ্বন্দ্বে বিশেষভাবে আন্দোলিত। নাটকে সাধারণত নায়ক চরিত্র এই শ্রেণীতে পড়ে সবচেয়ে আকর্ষণীয় হয় এই ধরনের চরিত্র। নবান্ন নাটকে কুঞ্জ এই রাউণ্ড চরিত্রের মধ্যে পড়ে।

প্রধান সমাদ্দার নাটকের প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে যখন উপস্থিত হয় তখনই তার বার্ধক্য অবস্থা। কিন্তু সেই বয়সেই তার ভেতরে একটা আগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য করা গিয়েছিল। তার দুটি পুত্র ছিল, শ্রীপতি ভূপতি। বৃদ্ধা স্ত্রী পঞ্চাননীর পুত্র এই দুটি মৃত। মৃত পুত্রের শোক বুকে নিয়ে প্রধান সমাদ্দার হত্যা ও সন্ত্রাসবাজদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। সে দুর্দান্ত আবেগে ভরপুর। এরই মাঝে সে অঙ্কন করেছে অনাগত দিনের রক্তিম চিত্র। কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন এক উদ্‌ভ্রান্তি তার সর্বাঙ্গে জড়িয়ে। ভ্রাতুষ্পুত্র কুঞ্জর চোখে সেটা এড়িয়ে যায়নি। অসংলগ্ন কথাবার্তা, অপ্রকৃতিস্থ মস্তিষ্কের অসংযত পরিকল্পনা কখনো কখনো প্রাণ দেওয়ার পাগলামো ব্যাকুল কথাবার্তায় কুঞ্জ ঠিকই ধরেছে 'শেষ পর্যন্ত পাগলই হয়ে গেল দুটো ছেলের শোকে।' পুত্রদুটিকে হারিয়ে বৃদ্ধ প্রধান সমাদ্দার পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকি জীবনটা কাটাতে পারত, কিন্তু সর্বব্যাপক আন্দোলন ও তাকে দমন করবার জন্য সর্বনাশা অত্যাচার ও নির্যাতনে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে তার মৃত্যু হওয়াতে সে সম্বলটুকু চলে গেল। সর্বনাশা ঘাত-প্রতিঘাত কেড়ে নিল দুই পুত্র। তিন মরাই ধান নষ্ট হয়ে গেল। পঞ্চাননী প্রাণ দিল। এরই মধ্যে ভ্রাতুষ্পুত্রের সংসার এবং নাতি মাখনকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিল যেটুকু জমি জায়গা আছে তার ওপর ভর করে। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর এবং সর্বনাশা বন্যা এসে স্বপ্নের শেষাংশটুকু কেড়ে নিয়ে গেল। তারপর এলো চোরাচালানদার হারু দত্তের আক্রমণ। অপদস্থ হল গ্রামের মাতব্বর গোছের প্রধান সমাদ্দার। এরই ভেতর ঘটল মাখনের মৃত্যু। ছাড়তে হল গ্রাম। শহরের পার্ক ও ফুটপাতকে আশ্রয় করে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হতে হল তাকে। একের পর এক এবম্বিধ দুর্ঘটনায় প্রধান সমাদ্দার মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলল।

গ্রামের এই সরল সাদাসিধে মানুষটি যার অভ্যন্তরে এক প্রতিরোধপরায়ণ প্রতিস্পর্ধী সাহসিকতার অপর্যাপ্ত সঞ্চয় ছিল,যা তার মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে উত্তপ্ত লাভা স্রোতের মতো বেরিয়ে এসেছে, 'চল্‌তো গাও বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।' কিন্তু তারপর থেকে চরিত্রটা কেমন এক অহেতুক অসহায়তার কবলে আত্মসমর্পণ করে শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব প্রকাশের পরিবর্তে অসংযত পাগলামোর খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হল। এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে প্রথম অঙ্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চম দৃশ্যে। হারু দত্তের লোকজন যখন কুঞ্জকে লাঠিপেটা করছে তখন প্রধানের বুকের ভেতর স্তুপীকৃত

বারুদের বিস্ফোরণ ঘটবার পরিবর্তে আত্মরক্ষার অসহায়তা ফুটে উঠেছে, 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' প্রথম দৃশ্যের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় দর্পিত বীরত্বের একটুখানিও যদি দেখা যেত তাহলেও চরিত্রটা সঙ্গতিসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারতো। আর তার পরের পরিবর্তনটাকে আমরা এইভাবে মেনে নিতে পারতাম যে বিপর্যয়ের আতিশয্যবশত চরিত্রটা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রথম অঙ্কের বিভিন্ন দৃশ্যে তার চরিত্রে কখনো কখনো দেখা গেছে তীব্র সচেতনতা, 'কী কী বললি তুই কুঞ্জ! ছলনা! নাকী কান্না! আমার সহানুভুতি মিথ্যে তোর কাছে? অপমান করলি তুই আমারে! আমারে অপমান করলি তুই! তুই আমারে অপমান করলি —'[১ম অঙ্ক, চতুর্থ দৃশ্য] কিংবা, 'ছোট ভুলের ক্ষমা আছে, বুঝলে দয়াল! কিন্তু বড়ে ভুলের আর চারা নেই। করতেই হবে তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত।' অথবা, 'ভদ্দরনোকের নামে মুখ করছ, কিন্তু এই ভদ্দরনোক ছাড়া আবার গতিও নেই আমাদের এখন। শত হোক, সেই ঘুরে ফিরে যেতেই হবে তোমার ভদ্দরনোকের দোরে। উপায় নেই।'[১ম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য] সংলাপগুলো চরিত্রটার সচেতনতার দিকটি তুলে ধরে, গভীরতর উপলব্ধির তলদেশ থেকে উঠে এসেছে বলে বোধ হতে পারে, কিন্তু তাৎক্ষণিক। পরের পর্বেই দেখা গেছে চরিত্রটি গতিপথ পরিবর্তন করেছে। আর গ্রাম থেকে শহরে এসে পড়বার পর চরিত্রটি হয়ে পড়েছে অতিরিক্ত নিষ্ক্রিয়। পাগলামির ভাব বজায় আছে বটে এবং কখনো কখনো পাগলামো অবস্থায় কিছু কিছু প্রতীকধর্মী সংলাপ উচ্চারণ করে দর্শক মনে দাগ টানবার একটা ব্যর্থ চেষ্টা করেছে ঠিক, কিন্তু মনের জগতে যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাতের প্রতিচ্ছবি সরীসৃপের মতো এঁকেবেঁকে উঠে এসে বাহ্যিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটা তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করে চরিত্রটি যাতে রাউণ্ড হয়ে ওঠে, তার এমন কোনো চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ফলে চরিত্রটি এক ঢালা হয়ে অসংযত চিন্তা ভাবনার খাপছাড়া বিগ্রহে পরিণত হয়েছে। কোনো ভাবেই কখনোই গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে পারেনি। অথচ চরিত্রটার প্রতি যত্নের কোনো ত্রুটি ছিলনা। কিন্তু এই যত্ন সম্ভবত একটিমাত্র কলমের নয়। নাটকটি লিখিত হওয়ার পর, মনে হয়, সম্পাদনার সময় বহুজনের সযত্ন হস্তক্ষেপের ফলে এমনটি ঘটেছে, যা নাটকের মধ্যে খুব খানিকটা দুর্নিরীক্ষ নয়। বহু যত্নে সন্তানের যে অবস্থা হয় প্রধান সমাদ্দারের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তাই চরিত্রটি ধাপে ধাপে বিকশিত হয়ে পূর্বাপর সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেনি, টুকরো টুকরো মনে সযত্ন প্রয়াসের ফল হিসাবে সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও গভীর হয়ে উঠতে পারেনি। ঠিক যেন শান্ত নদীর বুকে মৃদুমন্দ বাতাসের আন্দোলনে অল্প অল্প তরঙ্গের উত্থান-পতনের মতো হয়ে চরিত্রটা অতর্কিত ভাবে পরিণতির পর্বে এসে পৌঁছেছে। প্রবল ঝড়-ঝঞ্ঝায় সমুদ্র গর্ভে যে ভয়াল ভয়ঙ্কর উত্তালতা সৃষ্টি করে মনের ওপর গভীর ও গাঢ় দাস টানে তেমন ভাবে চরিত্রটা গড়ে ওঠেনি। অথচ নাটকের বিষয়টা ছিল ঝড়-ঝঞ্ঝা-বিক্ষোভের ঘনঘটায় পরিপূর্ণ।

অপরপক্ষে, কুঞ্জ চরিত্রটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে জীবনের উষ্ম আবর্তের ওপর দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য পদক্ষেপে অগ্রসর হয়েছে। তার সংবহনতন্ত্রী তারুণ্যের তাজা রক্ত সুষম বন্টনের ফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার যথাযথ ভারসাম্য বজায় থেকেছে। সে বুঝতে পারছে মারমুখী সন্ত্রাসবাজদের সামনে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, তাই অত্যন্ত ধীর মস্তিষ্কে প্রধানের প্রৌঢ় মনের দপ করে উদীপ্ত হয়ে ওঠাকে দমন করেছে, 'তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? চলো, চলো ঐ বনের ভেতরই পালাই।'[১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] যদিও প্রধান

এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছে, 'আমি তাই বলি কুঞ্জ এগিয়ে চল, এগিয়ে চল্, বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের; তা কুঞ্জ শোনো না, কুঞ্জ শুধু পালায়, কুঞ্জ শুধু—'[১ম অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য] এই বক্তব্য কুঞ্জর পলায়নবাদিতার দৃষ্টান্ত হতে পারে, কিন্তু কুঞ্জ সম্পর্কে এই কথাই যথেষ্ট নয়। হারু দত্ত প্রধানকে জমি বিক্রি করতে বাধ্য করার সময় কুঞ্জ তীব্র প্রতিবাদ বাক্য উচ্চারণ করে তার বীরত্বের প্রমাণ রেখেছে,...........'জমি যার সে বলছে বিক্রি করব না; আর উনি শুধু বলছেন কথার খেলাপ করেছে। ভারি আমার কথা রাখনেওয়ালা রে।' প্রধান চুপ করতে বলায় সে দপ করে জ্বলে উঠেছে, 'কেন, কিসের জন্য। গলা দিয়ে এইবার এট্টা রা কাড়ো বুঝলে, চেঁচাও,—অন্তত আর পাঁচজন মানুষ জানুক।' হারু দত্ত ছোটলোক বলে গালাগালি দেওয়ায় কুঞ্জ মাথা ঠিক রেখে প্রতিবাদ জানিয়েছে, 'এই গালাগালি দিয়ো না বলছি, ভালো হবে না।' 'এই মুখ সামলে কথা বলো কিন্তুক।' কিন্তু হারু দত্ত যখন উত্তেজিত ভাবে প্রধানকে খচ্চর বলে গাল দিয়েছে, তখন কুঞ্জ নিজেকে সামলে রাখতে পারেনি, দপ্ করে জ্বলে উঠেছে সে, 'হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—' বেগে প্রস্থান করে লাঠি হাতে প্রবেশ করেছে সে। হারু দত্তের লোকজনের সঙ্গে লড়াই করেছে সে জমি এবং মান ইজ্জৎ রাখতে। কুঞ্জ চরিত্রের এটাই প্রথম মাত্রা। কুঞ্জ ভীরু নয়, পলায়নী মনোভাবকে আশ্রয় করেনি, সাহসিকতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে কুঞ্জ দুর্দান্ত শক্তিসম্পন্ন।

কুঞ্জ চরিত্রের দ্বিতীয় মাত্রা, কোনো ওপরওয়ালা নয়, ভাগ্য কিংবা ভগবান নয়, আত্মশক্তির ওপর নির্ভরশীলতা। কুঞ্জ কৃষক জীবন মন্থন করে যে সত্য তুলে এনেছে, তা হল—'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অঙ্ক পঞ্চম দৃশ্য] কুঞ্জ এই সত্যের শীর্ষবিন্দুতে একদিনেই আরোহণ করেনি। অতি বাস্তব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত থেকে অর্জন করেছে এই অভিজ্ঞতা। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস মানুষের প্রাণ নিয়েছে, পুড়িয়ে দিয়েছে মানুষের ঘরবাড়ি। অতি বাস্তব বন্যা গরিব মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে মানুষকে। অপরপক্ষে যারা নিরন্ন মানুষের মুখের খাবার আর অসহায় নারীর মান ইজ্জতের মূল্য না দিয়ে বেচাকেনার খোলা বাজার বসিয়েছে ঈশ্বর কেবলমাত্র তাদের প্রতি সদয় এটা একটা লোকঠকানো ধূর্তুমি। তাই অত্যাচারী যখন সেই কথা স্মরণ করিয়ে শোষণকে অব্যাহত রাখতে চায় তখন দৃপ্ত প্রতিবাদের অগ্নি দপ করে জ্বলে ওঠে তার চোখে মুখে। বলে, 'তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' [১ম অঙ্ক, পঞ্চম দৃশ্য] সুতরাং ওপরওয়ালা, ভাগ্য বা ভগবান নয়, মানুষের অত্যাচারী ভূমিকা এবং সেই মানুষের ভেতরই রয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। অযূত সম্ভাবনা, নিযুত সাহসিকতা।

কুঞ্জ গার্হস্থ জীবনযাত্রার এক জীবন্ত প্রতিনিধি। প্রধানের পর সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তান সে। সেই সুবাদে সে এই পরিবারের যুবরাজ। স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত—এই নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এই সাম্রাজ্যের মূলধন জমি, কিন্তু অভাবের একচ্ছত্র আধিপত্যের কাছে সামান্য জমি এতগুলো মানুষের জীবনযাত্রাকে সরলরৈখিক পথে টেনে নিয়ে যেতে পারেনা। তাই অনিবার্যভাবে তার ঘর গৃহস্থালীতে এসে পড়ে ছোটখাট ঝগড়া-বিবাদ। রচিত হয় মতানৈক্যের রোজনামচা। 'সোজা কথায় বললেই হয় যে, না, ফুরিয়ে গেছে সেই ধান। তা না মেয়েমানুষের চ্যাটাং চ্যাটাং কথা শুনলে আমার পায়ের তলা থেকে মাথার চাঁদি পর্যন্ত একেবারে রি রি করে জ্বলে ওঠে।' [১ম অঙ্ক, দ্বিতীয় দৃশ্য] নিজের স্ত্রীর প্রতি

এধরনের মন্তব্য করতে এই চাষাড়ে যুবরাজের এতটুকু দ্বিধা হয় না বটে কিন্তু ভাই নিরঞ্জনের গঞ্জনায় যখন ভ্রাতৃবধূ বিনোদিনীর চোখে জল ঝরতে দেখে তখন মাথা ঠিক রাখতে পারে না, ফের মেরেছিস বুঝি?..........বলি ফের আবার তুই গায়ে হাত তুলিছিস পরের মেয়ের? পশু বলে গালাগাল দিয়ে একখানা কাঠ দিয়ে মাথায় আঘাত করে চেঁচিয়ে ওঠে, 'মেয়ে মানুষের গায়ে হাত.....বেরো বেরো তুই, বেরো।' কিন্তু তারপর ভাই-এর রক্ত দেখে সম্বিত ফিরে পেয়ে আত্মগ্লানিতে ভরে যায় তার মন।'খুন করে ফেললাম! খুন করে ফেললাম আমি নিরঞ্জনরে! নিরঞ্জন! নিরঞ্জন!!' (১/২) কুঞ্জর যন্ত্রণাকাতর হৃদয়ের হাহাকারটা নাট্যমঞ্চ প্রবল প্রতিক্রিয়া সঙ্গে দর্শন করলে আমাদের মনে মর্মস্পর্শী আবেদন সৃষ্টি না করে পারেনা। সুতরাং গৃহকর্তা হিসাবে অভাবের আতিশয্যে যেমন সে নিজের সহধর্মিণীর সঙ্গে অন্যায় ঝগড়া বিবাদে মত্ত হয়, তেমনই পরিবারের অন্যদের দয়ামায়া স্নেহমমতার গাঢ় আলিঙ্গনে বেঁধে রাখতে চায়। এই যে প্রীতিপূর্ণ বন্ধনস্পৃহা—এটি কুঞ্জ চরিত্রের তৃতীয় মাত্রা।

কুঞ্জ শুধু নিজের সংসারটাকে ঝড়ঝাপটার মধ্যে দিয়ে টেনে নিয়ে যাওয়ার দায়ে আবদ্ধ নয়। প্রতিবেশী সম্পর্কেও তার অন্তরে একটা দুর্বল জায়গা আছে। কুঞ্জ বাইরে কঠিন, বাহ্যিক আচরণও খুব খানিকটা রূঢ়। কিন্তু রূঢ় কাঠিন্যের অভ্যন্তরে একটা নরম তুলতুলে জায়গা আছে, যেখানটা ঠিকমতো ঘা লাগাতে পারলে দরদর করে নিঃসৃত হবে অজস্র দয়ার নির্যাস। নিজের অভুক্ত পরিবারের জন্যে ঘটিবাটি বিক্রি করে যে ক'মুঠো চাল কিনে এনেছে তার দাবিদার পরিবারস্থ পাঁচজন ব্যক্তি। প্রধান সমাদ্দার সে কথা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করেও ফেলে, 'শেষ সম্বল দু'খানা পেতলের কাঁসি আর ঘটিবাটি বেচে সের দুয়েক চাল নিয়ে এয়েছে কুঞ্জ; পাঁচজনের সংসার, বলো তো কার মুখে দিই এই চাল ক'টা?' (১/৩)কুঞ্জও কতকটা প্রধানের কথার প্রতিধ্বনি করে, 'রাঙার মা ধুঁকছে কাল বিকেলবেলা থেকে, অমুকের মা ধুঁকছে কাল দুপুরবেলা থেকে, তমুকের মা ধুঁকছে আজ সকালবেলা থেকে, এই তো এখন শুনতে হবে। (১/৩) মুখে উচ্চারণ করলেও কুঞ্জর অন্তরের কথা তা নয়। তাই দয়ালের একমুঠো চালের আবেদন অগ্রাহ্য করতে পারেনা সে। শেষ সম্বলের থেকে কিছুটা চাল দয়ালকে দিয়ে নিজে খুব খানিকটা তৃপ্তি পায়। এই প্রতিবেশী প্রীতি কুঞ্জ চরিত্রের চতুর্থ মাত্রা।

কুঞ্জ গ্রাম্য এক কৃষক সন্তান। রাগ দ্বেষ বিবাদ বিসম্বাদের পাশাপাশি পরিবার এবং প্রতিবেশীর প্রতি প্রীতি এই কৃষক সন্তানের সব কথা নয়। সময়ের ঘূর্ণাবর্তে বিঘূর্ণিত হতে হতে সময়ের গতিপ্রকৃতি কোন আবর্ত রচনা করতে পারে সে সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। গ্রাম্য জীবনে যে অনতিবিলম্বে নেমে আসবে এক হাহাকার তা তার দূরদর্শিতায় ধরা পড়ে। তাই সে অন্য সকলের মতো বিচলিত না হয়ে খুব সহজেই উচ্চারণ করে, 'বলা-কওয়ার তো আর এখন কিছু নেই। আর পাঁচজনের যে অবস্থা হয়েছে, আমাদেরও সেই অবস্থা হবে। দশজনের মতো আমাদেরও ঐ রাস্তায় নেমে দাঁড়াতে হবে।'(১/৩)

কুঞ্জের এই ভবিষ্যদ্বাণী কোন অদৃষ্টদ্রষ্টা সাধুসন্তর ভবিষ্যদ্বাণী নয়, ঘটনার স্রোতে ভাসন্ত এক বাস্তববাদী মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ সত্য। এই সত্য যে কতখানি নির্মম, নিষ্ঠুর তার পরিচয় দ্বিতীয় অঙ্কে পাওয়া যায়। অসংখ্য মানুষের সঙ্গে তারা গ্রামের মাটির কোল থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে শহরের পার্কে, ফুটপাতে নিক্ষিপ্ত হয়ে ভিখারী জীবনে সঙ্গে হাত মেলাতে বাধ্য হয়। (দ্রষ্টব্য ২য় অঙ্ক, ২য় দৃশ্য) এক গ্রাম্য অশিক্ষিত কৃষক সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সময়ের গতি প্রকৃতি জীবনের ওপর যে অনিবার্য বিপর্যয় টেনে আনতে পারে সে সম্পর্কে

দুরদর্শিতার ক্ষমতা কুঞ্জ চরিত্রের পঞ্চম মাত্রা।

গ্রাম্য পটভূমিকায় কুঞ্জের ছোটখাটো একটা মর্যাদার আসন ছিল। পাড়াপড়শীরা সে আসনটা কেড়ে নেয়নি। কুঞ্জও সে আসনের যথাযোগ্য মূল্য দেওয়ার চেষ্টা করেছে। আবার নিজের পরিবারস্থ সভ্যগণের প্রতি তার আন্তরিক স্নেহমমতা ভালবাসার ঘাটতি ছিল না। একের পর এক বিপর্যয় প্রধানকে উন্মাদগ্রস্ত করে তুলেছে, সংসারে জ্যেষ্ঠ সভ্য হওয়া সত্ত্বেও মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে যথাযোগ্য কর্তব্যকর্মে অনেকক্ষেত্রে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটেছে, দুটি পুত্রকে হারিয়ে শোকের পৌনঃপুনিক বিলাপের শোককে গভীর হতে দেয়নি। কিন্তু কুঞ্জ একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে সংযত বিলাপে শোককে গভীরে নিয়ে গেছে। মতিভ্রান্ত হয়ে পুরো পরিবার— যারা তাকে আঁকড়ে বেঁচে থাকতে চেয়েছে, তাদের প্রতি উদাসীন হয়ে ওঠেনি। কেন না, পুত্রশোকটা তার কাছে তত বড় হয়ে ওঠেনি, যত বড় করে দেখেছে সে গোটা কৃষক সমাজের বিপর্যয়কে।

কিন্তু তবুও সকলকে ধরে রাখতে পারেনি সে। প্রথম হারিয়েছে নিরঞ্জনকে। সে দেশান্তরী হয়েছে, দারিদ্র ও ক্ষুধার তাড়নায় ঝালা-পালা হয়ে। পরে পুত্র মাখনকে অতর্কিত মৃত্যু এসে ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে গেছে। তারপর প্রাণের প্রিয় আমিনপুর, তারপর ভ্রাতৃবধু বিনোদিনী। কিন্তু তবুও অবিচলিতভাবে ভিখারী জীবনের হাত ধরে নিদারুণ দুঃসময়ের আঘাতকে সহ্য করবার শক্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে চেয়েছে সে। বৃদ্ধ প্রধানকে সঙ্গে নিয়ে কুকুরের সঙ্গে সহাবস্থান করেছে। কুকুরের সঙ্গে লড়াই করে টুকরো খানেক খাবার অন্বেষণ করেছে ডাস্টবিনের মলয়া ঘেঁটে। পশুর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় হেরে গেছে পশুর কামড়ে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য :২য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য) কিন্তু তবু জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা জাগেনি। দুর্দান্ত জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত হয়নি। অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরো বেশি করে আঁকড়ে ধরেছে গভীর মমতায়। স্ত্রীর প্রতি তার সেই মমতা অজস্রধারে ঝড়ে পড়েছে। গভীর প্রেমে, 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর বাঁ হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর।' ফুটপাতের ওপর তৈরি করে ফেলে বড় প্রেমের এক বিরল অথচ সকরুণ মুহূর্ত।

এই স্নেহমমতা প্রেমপ্রীতি আর ভালবাসা কুঞ্জ চরিত্রের সবচেয়ে বড় সম্বল। ঝড়-ঝঞ্ঝা দৈব-দুর্বিপাকেও সে বিনষ্ট হতে দেয়নি এগুলিকে। রক্তাক্ত হয়েছে। ক্ষতবিক্ষত হয়েছে; লাঞ্ছনা, অবমাননা আর নিপীড়নে জর্জরিত হয়েছে, কিন্তু ভেঙে পড়েনি, দুমড়ে মুচড়ে দলা পাকিয়ে যায়নি। আজন্ম কালের বাস্তুভিটা আমিনপুরের স্মৃতি একটুও মলিন হয়ে যায়নি। স্মৃতির টানে তাই সে আমিনপুরে ফিরে যাওয়ার জন্য ব্যাকুলতা বোধ করে, 'হেঃ, কী যে আনন্দ হয় বউ আমার, সে আমি তোরে—চল্ বউ আমরা গাঁয়ে ফিরে যাই। এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না।' (৩/১) আমিনপুর-প্রীতিই তার প্রত্যাবর্তনের পথ প্রশস্ত করে।

সর্বশেষে বলা যায় কুঞ্জ চরম আশাবাদী। বড় বড় দুর্ঘটনা তাকে নৈরাশ্যের পঙ্ককুণ্ডে নিমজ্জিত করেনি। সব হারিয়েছে বটে তবে হা হুতাশের মধ্যে ফুরিয়ে যাওয়ার মানসিকতা পোষণ করেনি। বরং সর্বহারা হয়েও অন্তরের অন্তস্থলে জ্বালিয়ে রেখেছে আশার অনির্বাণ দীপশিখা। তাই, রাধিকা যখন বলে, 'গাঁয়ে ফিরে যাবে, সে তো আমার সৌভাগ্যির কথা। কিন্তু কোথায় যাব?............সেখানকার মাটিও তো পুড়ে গেছে আমার ভাগ্যে—যদি আমার মাখন থাকত—'(৩/১) কুঞ্জ তখন হতাশ রাধিকার সামনে হাজির করেছে একবুক আশা, 'আশা হবে বউ, সব হবে। দুঃখ করিস নে।' কুঞ্জর এই আশা হতাশের প্রতি স্তোকবাক্য নয়।

এক বাস্তব বোধসম্পন্ন দূরদর্শী মানুষের আত্মবিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ওপর ভর করে কুঞ্জ গ্রামে ফেরে এবং ফিরে পায় তার পুরো সংসার। তাই কুঞ্জ সম্পর্কে বলা যায়, সঠিক অর্থে যদিও কুঞ্জ ট্রাজিক চরিত্র নয়, আর নবান্ন নাটকও ডোমেস্টিক নাটক নয়, তথাপি সে রাউণ্ড চরিত্রের অধিকারী মানতেই হবে।

'নবান্ন' নাটকে নিরঞ্জন চরিত্রটিও একটু গুরুত্ব দাবী করে। যদিও চরিত্রটির গতিপ্রকৃতি তেমন লক্ষণীয় নয়। সংসারের অভাবে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে দুঃখ ভোগের দার্ঢ্য তার ছিলনা। দুঃখের আতিশয্যকে সহ্য করতে না পেরে সে পালিয়ে গিয়ে উপার্জনের স্বতন্ত্র রাস্তা ধরতে চেয়েছে এবং ধরেছে। কিন্তু পুরো গ্রামটার সঙ্গে তাদের সংসার তরণীটি তখন হাবুডুবু খাচ্ছিল, তখন স্বতন্ত্র জায়গায় ঝঞ্ঝার থেকে পিঠ ফিরিয়ে দিন কাটাচ্ছিল সে। তথাপি দুটি কারণে চরিত্রটিকে অল্পাধিক গুরুত্ব দেওয়া যেতে পারে। প্রথমত, সে গ্রামের চোরাচালানকারী হারু দত্ত এবং দুশ্চরিত্র কালোবাজারী কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেওয়ায় দুঃসাহস দেখিয়েছে। দ্বিতীয়ত, গ্রামে ফিরে গিয়ে ভাঙা সংসারকে গড়ে তুলেছে, যে সংসারের আওতায় কুঞ্জ রাধিকা ফিরে গিয়ে পুনরায় পল্লী জীবনের সুন্দর সুনিবিড় ছায়ায় আত্মস্থ এবং আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান সমাদ্দার ফিরে পেয়েছে তার বিপন্ন চৈতন্য। সে স্বস্ত অনুভব করেছে মারি মন্বন্তরের বিরুদ্ধে জোড় প্রতিরোধের সুদৃঢ় আশ্বাসে।

দয়াল চরিত্রটি পূর্বাপর পরম্পর্য সম্পন্ন ক্রমবিকাশমান চরিত্র নয়। তাৎক্ষনিক চমকসৃষ্টির এক বিশেষ প্রক্রিয়া প্রদর্শনের ইচ্ছার দ্বারা চালিত সে। গূঢ় কোন ব্যঞ্জনা কিংবা দুঃখ আর দুঃখ জয়ের কোনো বলিষ্ঠ মনোভাবের দ্বারা সে পরিচালিত হয়নি। নাটকের ভূমিকালিপিতে তার যে পরিচয় জানা যায় তাতে সে প্রতিবেশী মাত্র। অভাবের সংসার ; জমির উপর নির্ভরশীল জীবন। সে আর তার স্ত্রী ও একমাত্র সন্তান 'রাঙা'কে নিয়ে তার সংসার। বন্যা এসে তার স্ত্রী ও পুত্রকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। ভেঙে দেয় তার সাধের সংসার। কিন্তু তারপর গোটা গ্রাম ও গ্রাম্য মানুষদের জীবনে আকাল নেমে আসে এবং আকালের দুর্দান্ত আক্রমণে ঝনঝাহত পতঙ্গের ন্যায় বিপর্যস্ত হচ্ছিল, তখন সে কোথায় ছিল তা জানা যায়নি। অথচ তাকে পুনরায় দেখা গেল এই নাটকের প্রত্যাবর্তন পর্বে। তখন সে অনেকটা উদ্দীপ্ত। গ্রাম্য মানুষদের দলপতির ভূমিকায় তখন সে দাঁড়িয়ে। কোথা থেকে এই উদ্দীপ্তির অপর্যাপ্ত শক্তি সে সঞ্চয় করল এবং গ্রাম্য জনতার নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সে কেমন ভাবে অর্জন করল তার তেমন বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ এ নাটকে নেই। নাট্যকার শেষপর্বে তাকে দিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করিয়ে নিয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ রচনা, শস্য উঠিয়ে ধর্মগোলায় তোলার পরিকল্পনা রচনা ও তাকে কার্যকর করা এবং নবান্ন উৎসবের রূপরেখা অঙ্কনের অগ্রবর্তী ব্যাক্তি হিসাবে প্রতিরোধের তেজঃদৃপ্ত বক্তব্য প্রকাশের পুরোধা হিসাবে তাকে দাঁড় করিয়ে নাট্যকার হঠাৎ তাকে গুরুত্ব দিয়ে দিয়েছেন অনেকখানি। চরিত্রটা অতর্কিতভাবে অনেকখানি গুরুত্ব পাওয়ায় খাপছাড়া হয়ে গিয়েছে। বন্যার পর সে কোথায় কিভাবে ছিল জানা যায় না। সমাদ্দার পরিবার গ্রাম ছাড়ার পূর্বে তার ভূমিকা এতই গৌণ ছিল যে শেষ পর্যায়ে এসে তার ওইরকম বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ছবি খুব খানিকটা বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠেনি। তবে 'মোমেন্টাম'সৃষ্টির ক্ষেত্রে চরিত্রটা যথেষ্ট নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছে বলা যেতে পারে।

চোরাচালানকারী হারু দত্ত কালোবাজারী দুশ্চরিত্র কালীধন ধাড়া এই নাটকের দুটি খল চরিত্র। খল অর্থে

দুষ্ট প্রকৃতির চরিত্র। ইংরাজীতে যাকে বলে ভিলেন। এই নাটকে সমাদ্দার পরিবার এবং আমিনপুরের কৃষকেরা প্রগ্রেসিভ ফোর্স পজিটিভ শক্তি আর হারু দত্ত কালীধন ধাড়া নেগেটিভ ফোর্স দুষ্টচক্র। এরা মজুতদার,দালাল, মানুষ, ও খাদ্যের বেআইনি ব্যবসাদার। ধূর্ত, মুনাফাখোর, পরশ্রমজীবী, সমাজের নোংরা লোক। নিজেদের ঐশ্বর্যবৃদ্ধির জন্য এরা পারে না এমন কাজ নেই। এরা দুজনেই আকাল কবলিত মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অবৈধ কারবারে লিপ্ত থাকে। কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ঘটিয়ে জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোলবার দুরভিসন্ধির জাল বিস্তার করে চলে।

হারু দত্ত গ্রাম থেকে ধান এবং চাল কম দামে কিনে নিয়ে কালীধনের গুদামে তুলে দিয়ে আসে। কালীধন তা মজুত করে সময় মত বেশি দামে লোক বুঝে বিক্রি করে। সেই সঙ্গে হারু দত্ত গরিব গৃহস্থ ঘরের যুবতী মেয়েও ক্রয় করে কম দামে ও বেশি পয়সায় সরবরাহ করে কালীধনের সেবাশ্রম নামক নারী ব্যবসার এক অবৈধ কেন্দ্রে। তাছাড়া হারু দত্ত অভাবের সুযোগে জোতজমিও কিনে নেয় কম পয়সার বিনিময়ে। প্রধান সমাদ্দারের পরিবারকে পথে বসায় এই হারু দত্ত। বন্যা আর দুর্ভিক্ষের সংগ্রাম করতে করতে এই পরিবারটা যখন মুমূর্ষু, তখন সেখানে নেকড়ের থাবা বসায় সে। কুঞ্জর একটি সংলাপে এই চরিত্রটার কর্মপদ্ধতি স্পষ্ট হয়ে যায়, 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েছে।' প্রয়োজনে এই হারু দত্ত, গ্রাম্য অশিক্ষিত মানুষকে ভগবানের ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করতে চায়, 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দেখাবে বলে, তা জানি।' কিন্তু সে সবে যখন কাজ হয় না, তখন সে স্বরূপ ধারণ করে,'উঁ, সোজা শিরদাঁড়াটা তা হলে এইবার তো দেখি এট্টুখানি বেঁকিয়ে দিতে হয়; বেটা ছোটলোকের এত বড়ো আস্পর্দ্ধা!' নিজের লোকজনদের ডেকে হুকুম দেয়, ' দে তো রে আচ্ছা করেঘা দু-চার —' (১ম অঙ্ক, ৫ম দৃশ্য) আবার মেয়ে কেনবার সময়ে কৌশলপূর্ণ চাতুর্যের আশ্রয় নেয়। অক্টোপাসের মতো ঘিরে ধরে মেয়ের বাপকে। মেয়ে সংগ্রহের জন্য সে খুকির মায়ের মত মেয়ে দালাল ছড়িয়ে দেয়। তারা ফাঁকফোঁকর বুঝে তুলে আনে মেয়ের বাপকে। হারু দত্ত মারপ্যাঁচে ঘায়েল করে ফেলে তাকে । 'কিছু না, কিছু না। আমি দেখবো তোমার আপদে , তুমি দেখবে আমার বিপদে, এ না করলে চলবে কেন! —কী বল চন্দর?' প্রথম শিকারকে সে চারিদিক থেকে ঘিরে ফ্যালে, তারপর তার ঘাড়ে কামড় বসায়, 'দু- চোখের সামনে সব না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরে যাবে, এ দেখতে পারব না বলেই তো!' তারপর হর হর করে বিষ ঢেলে দেয়, 'তা সব না, সব খারাপ না, ভালো লোক পৃথিবীতে আছে। ...... তারাই তো চালাচ্ছে এই জগৎটা। এবম্বিধ প্রকারে কাজট হাসিল করে নেয়, 'ন্যাও এসো এইবার টিপ্ সইটা দিয়ে যাও, এসো এসো ।' মেয়ে বিক্রির কোবালায় টিপসইটা দিইয়ে নেয় আটঘাট বাধবার জন্যে, 'মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোন মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নেই— কথা এই বললে ফুরিয়ে গেল ! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে।..... চেপে দ্যাও আঙ্গুলটা, হ্যাঁ, য়্যাঁ।'

(২য় অঙ্ক,৪র্থ দৃশ্য)

হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত এবং জালিয়াত। নাট্যকার অতিযত্নে চরিত্রটা গড়ে তুলেছেন। নিপুনভাবে তার মুখে সংলাপ বসিয়েছেন এবং অঙ্গাভিনয়ের যথেষ্ঠ সুযোগও রেখেছেন। ফলে চরিত্রটা হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কিন্তু সেই তুলনায় কালীধন ধাড়া অতটা ফুটে উঠতে পারেনি। সাধারণত মজুতদাররা একটু মোটাবুদ্ধির হয় , বুদ্ধির চেয়ে টাকার জোরটাই তাদের বেশি। কালীধন প্রচুর টাকার মালিক। বিরাট কারবার তার। প্রচুর চাল গুদামজাত করে রেখেছে সে। বলা বাহুল্য দেশের আপৎকালীন অবস্থায় 'ভারতরক্ষা আইন' বলে মন্বন্তরের বাজারে এই মজুতদারী একেবারে বে-আইনি, দণ্ডনীয় অপরাধের সামিল। এহেন গুদাম সংরক্ষণের এবং দেখাশোনার ক্ষেত্রে বিশেষ সর্তকতা অবলম্বন করা দরকার ছিল, কিন্তু কালীধন সেই সতর্কতা অবলম্বন করেনি। দ্বিতীয়ত নারী ব্যবসার কেন্দ্র সেবাশ্রমটির দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি রাখার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কালীধন সে প্রয়োজন বোধ করেনি। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, কিন্তু দুরদর্শিতার ছিল একান্ত অভাব। তার ধারণা ছিল তার নৌকার পালে যে সুসময়ের হাওয়া লেগে নৌকাটি তরতর করে সমৃদ্ধির উজানে ছুটে চলেছে এর কখনো কোনদিন ব্যত্যয় ঘটবে না এতোখানি নিশ্চিন্ত হওয়ার জন্য সে নিরঞ্জন বিনোদিণীর জালে জড়িয়ে পড়ল এবং একেবারে ভরা ডুবি হয়ে গেল। তৃতীয়ত, হারু দত্তের সঙ্গে বুদ্ধির কসরতে সে এঁটে উঠতে পারে নি। হারু দত্তের দশ ঘাটে জল খাওয়া ঘোড়েল লোক। বুদ্ধি তার পাকা, প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী এবং তীক্ষ্ণ ও দ্রুতগামী। তার সঙ্গে বুদ্ধির কসরৎ করতে গিয়ে পরাজিত হয়েছে কালীধন। উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জন্য হারু দত্ত অনেক কথা খরচ করে, কিন্তু সেই কথাগুলোকে সে কথার কথা বলে ধরে নেয়। কালীধন কিন্তু চালাকচতুর নয়, কথার চাতুর্য তার তেমন নেই, কথাও তেমন বুদ্ধিদৃপ্ত নয়। নাট্যকার গভীর পর্যবেক্ষণ শক্তি দিয়ে এই দুটি চরিত্র গড়ে তুলেছেন।

নাট্যকারের চরিত্রসৃষ্টির নৈপুণ্য আর একটি চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি দিলে সহজে ধরা পড়ে। চরিত্রটা খুব ছোট, স্বল্প পরিসরে আবর্তিত হয়ে টাইপ চরিত্রের 'ফরমুলাকে পালন করবার চেষ্টা করেছে। চরিত্রটার নাম রাজীব। রাজীব পূর্ববঙ্গবাসী। নাটকের প্রেক্ষাপট ও চরিত্র পরিকল্পনার আদর্শ ক্ষেত্র থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় কথা বলে সে। কয়েকটি তুলির টানে এই ছোট চরিত্রটা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। চরিত্রটা প্রথম সংলাপ উচ্চারণ করে হাই তুলে তিনতুড়ি বাজিয়ে, 'রাধে গোবিন্দ বল মন।' অথচ এই গোবিন্দের জীবটি মানুষের ক্ষুধায় তীব্র ব্যঙ্গ করে, 'চাল খায়। বড় চাল খাউন্যা! চাল খাইতে আইছে! দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় যত সব। দুর্ভিক্ষের বাজারে মানুষ যে মানুষ নেই, অন্নের হাহাকারে পাগল হয়ে গেছে সবাই, কালীধনের গদিতে সরকারের চাকরি করতে করতে তা তার জানা হয়ে গেছে। কালীধন এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা ছাড়া ক্ষুধার্ত জনগণ মানুষ কিনা সে সম্পর্কে তীব্র সংশয় প্রকাশ করে সে, 'আরে কালীধন, এগুলো কী মানুষ।' তাই ক্ষুধার চাল না পেয়ে তারা যখন ক্ষিপ্ত স্বরে কথা হলে তখন সে কালীধনের হয়ে প্রবল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে কথা বলে, 'দে দ্যাখ —আবার চোখ ভ্যাটকায়! দেদে গলাটা ধইর‍্যা বার কইর‍্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি।' (২/১) ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তার শেষ সিদ্ধান্ত, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব, মরার আইস্যা পরছে শহরে— কিংবা বিনোদিনীর সঙ্গে সেবাশ্রমে নিরঞ্জনকে কথা বলতে দেখে সবিস্ময়ে বলে , 'রাখহরি! সুট সুট কইর‍্যা ঘরে ঢুইকা ইয়ারে কয় কিডা রে, য়্যাঁ.....চুপ কইরা আছস অহন, কথা সে কস্ না বড় !.....ভাবস বুইড়্যা কিছু ঠাহর পায় না, না বেটা প্রেমালাপ করনের আর জায়গা পাইলা না! (১/৫) তার ধারণা এবং বিশ্বাস প্রেম ভালবাসা কালীধনের ব্যক্তিগত এক্তিয়ার , এসবে আর কারো অধিকার নেই। তাই সে নিরঞ্জনকে শাসায়, 'সিংহর মুখে খাদ্য আর তুই শৃগাল হাত দিছিস তাইতে! বাবু তোরে আজ কী করে দেহিসনে.... বেটা ছুটলোক

আস্পর্ধা পাইলে কী আর রক্ষা আছে না!' আবার বিনোদিনী যখন ঘরের বাইরে যেতে চায় তখন তাকে গিয়ে বাধা দেয়, 'আরে এইডা কী কর ! তুমি মাইয়া মানুষ তোমার স্থান হইল অন্দরমহলে । বাইরে যাবা ক্যান। যাও ভীতরে যাও।— কী আশ্চর্য!' (২/৫)

রাজীব বৃদ্ধ কিন্তু বয়সের ভারে ন্যূজ হয়ে পড়েনি সে। অন্ত্যন্ত করিৎকর্মা। কর্তার বিক্রম প্রকাশ করতে পঞ্চমুখ সে । নিজের প্রভূত্ব খাটাতে সে খুব তৎপর। কালীধনের সেবাশ্রমের ক্রিয়াকাণ্ড তার জানা। এখানে যে সমস্ত স্ত্রী লোকেরা তাদের প্রতি অন্য কারো দৃষ্টি পড়াটা সে যেমন বরদাস্ত করতে পারে না, ঠিক সেই রকম এখান থেকে কোনো স্ত্রীলোক বেরিয়ে যেতে চাইলে সে সতর্ক প্রহরীর মতো বাধা দেয়। চরিত্রটির মধ্যে খুব গভীরভাব এবং ভাবনার চিহ্ন পাওয়া যায়না। হালকা —উপরিস্তরে ভাসন্ত এই চরিত্রটা নাট্যকার অতি যত্ন সহকারে গড়ে তুলেছেন। কথাবার্তা, হালচাল, আদবকায়দার মধ্যেবৈচিত্র্যের সৃষ্টি করে চরিত্রটিকে খুব উপভোগ করে তুলেছেন বলতে হবে।

উপরোক্ত চরিত্রগুলো ছাড়াও 'নবান্ন' নাটকে স্ত্রী চরিত্র আছে কয়েকটি। যেমন, পঞ্চাননী, রাধিকা এবং বিনোদিনী ইত্যাদি।

পঞ্চাননী প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী। আমিনপুরের বৃদ্ধ মহিলা। স্বাধীনতা আন্দোলনে আমিনপুর তথা মেদিনীপুরের একটা বিশেষ একটা ভূমিকা ছিল। গান্ধী বুড়ি মাতাঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা ইতিহাস প্রসিদ্ধ। সম্ভবত এই ঐতিহ্যের পথ ধরে পঞ্চাননী চরিত্রটি নবান্ন নাটকে এসেছে। প্রধান সমাদ্দারের উপযুক্ত স্ত্রী সে। আগষ্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার মানসিকতা ঘিরে শাসক শ্রেণীর অত্যাচারে ভয়ে ভীতু আমিনপুরের মেয়েরা লজ্জা শরম খুইয়ে বনে জঙ্গলে গিয়ে বসে থাকে শুধু আত্মরক্ষার জন্য। এর চাইতে অপমানের কিছু আছে? পঞ্চাননীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়— বলি তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়ে মানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? (১/১)......সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!! মেয়ে মানুষের ইজ্জৎ! !' (১/১০)— উত্তরে কুঞ্জর কাছ থেকে কোনো ইতিবাচক বক্তব্য না শুনতে পেয়ে পঞ্চাননী স্বয়ং একটা জনতাকে নেতৃত্ব দেয়। তাদের এগিয়ে যাওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করে। পুলিশের মার খেয়ে পলায়নপর জনতাকে মারমুখি করে তুলে বিশেষ সাহস ও শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু জীবনী শক্তি তখন তার খুব কম অংশই অবশিষ্ট ছিল, তাই বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। নাটকীয় চরিত্র হিসেবে নাট্যকারের এটি একটি অনবদ্য সৃষ্টি বলতে হবে।

বিনোদিণী সুসংগত, সংযত এক গ্রাম্য বধূর সু-অঙ্কিত চরিত্র। সমাদ্দার পরিবারের কনিষ্ঠ বধূ লজ্জাশীলা ধী-শক্তি সম্পন্না। স্বামী নিরঞ্জন তাকে ছেড়ে চলে যাওয়ার পরও সে এই পরিবারের সঙ্গে একাত্ম হয়ে দুঃখবেদানার সমান অংশীদার হয়ে এই পরিবারের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থেকেছে। তাঁর একটাই বেদনা—স্বামী নিরঞ্জন সংসারের সংকটে সকলেই যখন ঝালাপালা তখন বিনোদিনীর পাশে থেকে,দুঃখ বরণের সহমর্মী হয়ে, মানসিক স্বস্তি ও আশ্বাসের স্থল হওয়ার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে ইতিবাচক ভূমিকা না নিয়ে দেশান্তরে চলে গেছে। শত মান অভিমান অনুরোধেও কর্ণপাত করেনি। তাঁর নারীসত্তার এ অবমাননা বড় বেদনাদায়ক। অতঃপর পরিবারের সকলের সঙ্গে গ্রাম ত্যাগ করে শহরে এসে অতর্কিতভাবে দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। এক টাউট তাকে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে এনে তুলে দেয় কালীধনের সেবাশ্রমে। এখানে ঘটনা চক্রে

সে মিলিত হয় স্বামী নিরঞ্জনের সঙ্গে। নিরঞ্জন রাখহরি নামে সেখানে কালীধনের কর্মচারী। নিরঞ্জনকে বিনোদিনী সেবাশ্রমের সমস্ত বিবরণ দেয় এবং কৌশলে কালীধন ধাড়া ও তার সরকার রাজীব সমস্ত বামাল সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। তারপর বিনোদিনী নিরঞ্জনকে নিয়ে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে এবং ভেঙে পড়া ঘর ও অগোছালো সংসারকে সে পুনরায় গড়ে তোলে। বিনোদিনী একটি সুঅঙ্কিত গ্রাম্যবধূর চরিত্র।

রাধিকা নবান্ন নাটকের সবচেয়ে বড় স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী এবং সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। এই চরিত্রটির তিনটি অংশ। পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ হিসাবে সে খুব দায়িত্বশীলা; সকলকে একসঙ্গে নিয়ে চলবার মনোবাসনা তার অকৃত্রিম। অভাবের সংসারে ছোটখাটো ঝগড়াবিবাদে যেমন জড়িয়ে পড়ে, তেমনই দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহে ভরপুর। দ্বিতীয় অংশ শহরের ফুটপাতবাসিনী। এই অংশে ক্ষুধার সঙ্গে তীব্র সংগ্রামরত সে । কিন্তু ক্ষুধার লেলিহান শিখা তার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে স্বামী ভক্তি ও স্বামীপ্রেমকে খাক করে দিতে পারেনি। বরং তা আরো গাঢ় হয়ে উঠতে দেখা গেছে। কুঞ্জর হাতে কুকুরে কামড়াবার দৃশ্যটি এই বক্তব্যকে সমর্থন করবে। কুকুরে কামড়াবার অব্যবহিত পরে রাধিকার অন্তরের অভিব্যক্তি ধাপে ধাপে গভীর থেকে গভীরতম স্তরে পৌঁছেছে। প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ‘একেবারে কামড়ে খেলে গো’র অনিবার্য সাধারণ গ্রাম্য নারীসুলভ প্রকাশ—‘ভারি পাজি কুকুর তো। .....দূর হারামজাদা লক্ষ্মীছাড়া কুকুর। ঝাঁটা মারো মুখে, ঝাঁটা মারো।’বক্তব্য বিষয় অনেকটাই অমার্জিত Crude । এটি যখন অনুভূতির গভীরে প্রবেশ করে, তখন ‘ওমা এ যে অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে দেখছি। ওমা আমার কী হবে গো।’ ঘর বার যখন একাকার ,তখন তার এ উপলব্ধি অন্তরে যে অসহায়তা তারই প্রকাশ উপরোক্ত অংশে। বোধ করি স্বামী কুঞ্জর যন্ত্রনাকাতর মুখ লক্ষ্য করে, তারচৈতন্যের গভীরে যে উপলব্ধি তা থেকেই বেরিয়ে আসে, ‘খুব যন্তনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?— এ যেন নতুন করে স্বামী প্রেমকে ফিরে পাওয়া, নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার। তারপর ফিরে এসেছে স্বামীর হাত ধরে নিজেদের গ্রামে। তৃতীয় অংশ গ্রামপ্রীতি। গ্রামে প্রত্যাবর্তনের জন্য তার অন্তরে একটা ইচ্ছা সুপ্ত ছিল। তাই কুঞ্জ যখন প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব উত্থাপন করে, রাধিকা তৎক্ষণাৎ তা সমর্থন করে। সেই মুহূর্তে তার অন্তরে শাশ্বত মাতৃত্বের জাগরণ ঘটে। মৃত পুত্র মাখনের জন্য তার সমস্ত অন্তর হাহাকার করে ওঠে। কিন্তু গ্রামে প্রত্যাবর্তন করে সে সমস্ত কিছু ভুলে নতুন করে গড়বার আনন্দে আবার মেতে ওঠে। এই অংশের রাধিকাকে আমরা আবার প্রথম অংশের রূপে দেখে মুগ্ধ হই। রাধিকা ‘নবান্ন’ নাটকের একটি অনবদ্য নারী চরিত্র। নাট্যকার এই চরিত্রটি গভীর নিষ্ঠা ও পর্যবেক্ষণ শক্তির সাহায্যে গড়ে তুলেছেন।

৮৭.১২ মূলপাঠ ৬ : ‘নবান্ন’ নাটকের সংলাপ ও গান

নাটক সংলাপ নির্ভর। সংলাপের ওপরেই নাটকের নাটকীয়তা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, সংলাপের মধ্যে দিয়েই নাটকের দ্বন্দ্বসংঘাত সৃষ্টির চেষ্টা, নাটকীয় বৃত্ত গঠন, চরিত্রের বিকাশ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি নির্ভর করে। সাহিত্যে অন্যান্য প্রকরণগুলিতে রচয়িতার এক নিজস্ব কলম থাকে, যে কলমে তিনি কিছু বর্ণনা, কিছু বিশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে কাহিনী, চরিত্র, প্রকৃতি, পারিপার্শ্বিকতা, স্থান ও কালের

অনেকখানি পরিচয় দিয়ে থাকেন। নাটকে কিন্তু নাট্যকারের সে সুযোগ নেই। নাট্যকার এ সমস্ত কিছুই সংলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন। নিজে করতে গেলেও নিজেকে প্রথম চরিত্র করে তুলতে হবে, তারপর অন্যান্য চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্য রক্ষা করে যুক্তিগ্রাহ্য পথে সংলাপ উচ্চারণের মধ্যে দিয়ে এ কাজগুলি করে থাকেন।

সুতরাং নাটকের ,সংলাপ যেমন একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, তেমনই এর রচনা পদ্ধতির প্রতি রচয়িতার বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়? সচেতন মনের সযত্ন প্রয়াসেও অতিরিক্ত সাবধানতা গ্রহন করতে হয়। মনের বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার স্বরগ্রাম্যভিত্তিক সংলাপ রচনা করতে না পারলে নাটক প্রার্থিত ফলদানে সক্ষম হয়না। মনের বিভিন্ন-ভাব- অনুভাব বিভাব, সঞ্চারী ভাবকে বিভিন্ন গ্রামে নিয়ে গিয়ে উপযুক্ত স্বর সহযোগে নিক্ষেপ করতে হয়, তাহলেই নাটক থেকে উপচিত হবে যথেষ্ঠ উপভোগ্য নাট্যরস। এই সংলাপের মধ্যেই নিহিত থাকে বাচিত অভিনয়ের বহুবিধ উপকরণ, আবার এই সংলাপের মধ্যেই অনুল্লেখিতভাবে জড়িত থাকে অঙ্গাভিনয়ের নানা নির্দেশ। যেমন, ‘চলে যাও’ বললে একরকমের অঙ্গাভিনয় হবে, আবার যাও, তুমি চলে যাও, তুমি চলে যাও’ বললে অঙ্গাভিনয়ের ধরনটা যাবে বদলে,আবার, ‘যাও, যাও চলে যাও’ বললে তার অঙ্গাভিনয়টা হবে অন্যরকম।

এই যে নাটকে দ্বিবিধ অভিনয় তা সংলাপের ওপরেই নির্ভরশীল। তাই যে নাট্যকার যত বেশি ভাল সংলাপ রচনা করতে পারেন, সেই নাট্যকারের নাটক রসিক মহলে তত বেশি সমাদৃত হবে। সেই নাট্যকার কালের দেওয়ালে হাত রাখতে পারবেন। এমন অনেক সময় দেখা গেছে যে , হালকা সংলাপের নাটকে সুদক্ষ অভিনেতাও, সুনাম অর্জন করতে পারেননি, কিন্তু ভাল সংলাপ সংযুক্ত নাটকে তৃতীয় স্তরের অভিনেতাও অতি সহজে দারুন অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করে কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

অতএব আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি সংলাপই নাটকের প্রাণ। তাকে আশ্রয় করেই নাটকের চরিত্রেরা চলাফেরা করে, তারা পরিস্ফুট হয়, বিকশিত হয়। তাই সংলাপ হওয়া উচিত স্বাভাবিক কথা ভাবানুগ, চরিত্রানুগ ও সংক্ষিপ্ত। এই ধরনের সংলাপ রচনার সূত্রপাত করেন মধূসূদন। তিনি একটি চিঠিতে কেশবচন্দ্রকে লিখেছিলেন, I shall endeavour to creat characters who speak as nature suggests and not mouth mere poetry. — অর্থাৎ চরিত্র স্বাভাবিকভাবে কথা বলবে, কাব্যাংশ আওড়াবে না। তার পরিচয় পাওয়া গেল মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে— ‘বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ’ আর ‘একেই কি বলে সভ্যতা’ এবং ‘কৃষ্মকুমারী’ নাটকে। কৃষ্ন কুমারিতে এসেছে কথ্যরীতি। সংলাপ উচ্চারণের কাল হয়েছে দ্রুত, দ্বন্দ্বমথিত তীব্রতায় সংলাপ চরিত্রকে ব্যক্ত করেছে। সংলাপগুলির ভাষায় চরিত্রগুলির ব্যক্তি পরিচয় ব্যক্ত হয়েছে। মধুসূদনের প্রহসন দুটির সংলাপ ত্রুটিমুক্ত, প্রত্যক্ষ। এই প্রত্যক্ষতা ঘটনাগত ও অনুভূতিগত। সংলাপ, সংস্কৃত নাটকের সংলাপরীতি অনুযায়ী বিবরণধর্মী না হয়ে বক্তব্যের বাহন হয়েছে। বগতোক্তি প্রায় বর্জিত, যা আছে তা সংক্ষিপ্ত, তীক্ষ্ণ। সর্বোপরি সংলাপ হয়ে উঠেছে চরিত্রের দর্পণ। ‘একেই কি বলে সভ্যাতা’র থেকে একটি উদাহ্রণ তুললে মন্তব্যটি প্রতিষ্ঠিত হবে। নায়ক নবকুমারের ইয়ার কালী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, ‘কি পরিচয় দেব বলো দেখি ভাই? তোমাদের কর্তাকে কি বলব যে আমি বিএরের —মুখটি—স্বকৃতভঙ্গ— সোনাগাছিতে আমার শত শ্বশুর—না না, শ্বশুর নয় —শত শাশুড়ির আলয়, আর উইলসনের আখড়ায় নিত্য

মহাপ্রসাদ পাই—'

অপরদিকে রবীন্দ্রনাথের সংলাপ প্রতীক আর রূপকধর্মী। কাব্যরসাশ্রিত প্রতীকধর্মী সংলাপ রচনার যাদুকর ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। এক অসম্ভব রকমের নিজস্বতার স্বাতন্ত্র্যে তিনি উদ্ভাসিত। তাঁর সংলাপ অনেক সময় তরঙ্গায়িত বলে মনে হতে পারে। সহজ সরল শব্দগুলিকে তিনি এমনভাবে সাজান যে তার থেকে কাব্য ঝরে পড়ে। লোক প্রচলিত বাজার চলতি শব্দের ব্যবহার না থাকবার দরুন একটা মার্জিতরূপ গড়ে ওঠে। কবির মনোলোকের গভীর তলদেশ থেকে উৎসারিত হয় শব্দতরঙ্গ, সংলাপের মধ্যে আনে এক বোধসম্পন্ন অনুভববেদ্য আবেশ। শ্রীশম্ভু মিত্র রবীন্দ্রনাথের সংলাপ সম্পর্কে বলেছেন, জীবন প্রতিম বলে চিনতে পারার মতো সমস্ত বিশিষ্টতা আরোপ করেও সাধারণ প্রতীকী চেহারাটা তিনি অক্ষুন্ন রাখতে পারতেন।' প্রসঙ্গক্রমে 'রক্তকরবী', 'মুক্তধারা', 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অথবা 'কালের যাত্রা' প্রভৃতির সংলাপের কথা বলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপের প্রসঙ্গে একটা কথা বললেই যথেষ্ট হবে, তিনি নাটকের সংলাপ লিখতেন কবির কলমে।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীর চল্লিশের দশক থেকে সংলাপ রচনার ক্ষেত্রে আশ্চর্য রকমের বিবর্তন ঘটে গেছে। সংলাপের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটে গেছে আমূল। মধুসূদন, দীনবন্ধু, গিরিশচন্দ্র, দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথের নাট্যসংলাপ থেকে এই সংলাপ সম্পুর্ণ স্বতন্ত্র। দর্শক এবং চরিত্রের তফাৎটা ভেঙে ফেলে পারস্পররিক সাযুজ্য সন্ধানে নতুন রীতি ও কৌশল অবলম্বিত হয়েছে বাংলা নাটকের সংলাপ রচনায়। আমরা পার হয়ে এসেছি—

'গর্ব, মান, বীর-অহঙ্কার—
পাণ্ডবের তুমি হরি!
আদেশে তোমার
অশ্বমেধ হইয়াছে আয়োজন,
নারায়ণ, নাহি লয় মন
তাহে কভু বিঘ্ন হবে।' (গিরিশচন্দ্র)

কিংবা, 'তুমি দেখতে পাচ্ছো না দুর্যোধন, কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি ঐ আগুনের শিখা লক লক করে আকাশ ছেয়ে ফেলল, ঐ আর্তনাদ, ঐ হাহাকার—হাঃ হাঃ হাঃ— (অপরেশচন্দ্র)

কিংবা, '—ঐ সূর্য্য অস্ত যাচ্ছে। দিবার চিতাগ্নি তার চারদিকে ধূ ধূ করে জ্বলে উঠেছে। কাল আবার ঐ সূর্য্য উঠবে। উঠুক! একদিন আসবে, সেদিন ঐ সূর্য্য আর উঠবে না। ঐ জ্যোতি ক্রমে ক্রমে শীর্ণ, মলিন, ধূসর হবে যাবে। তার পাংশুরক্তবর্ণ ধূম পৃথিবীর পাণ্ডুর মুখের ওপর এসে পড়বে। তারপর তাও পড়বে না। কৃষ্ণ সূর্য্য অনন্ত শূন্যে অদৃশ্য হয়ে যাবে। কি গরিমাময় দৃশ্য সেই? — কে?' (দ্বিজেন্দ্রলাল)

অথবা, 'সামনে তোমার মুখে চোখে প্রাণের লীলা, আর পিছনে তোমার কালো চুলের ধারা মৃত্যুর নিস্তব্ধ ঝরনা। আমার এই হাত দুটো সেদিন তার মধ্যে ডুব দিয়ে মরবার আরাম পেয়েছিল। মরণের মাধুর্য আর কখনো এমন ভাবে ভাবিনি। সেই গুচ্ছ গুচ্ছ কালোচুলের নীচে মুখ ঢেকে ঘুমোতে ভারি ইচ্ছা করছে। তুমি জান না, আমি কত শ্রান্ত। (রবীন্দ্রনাথ)

এ সমস্ত সংলাপ অতিক্রম করে চল্লিশের দশক লিখছে, ‘হেঃ, এ রক্তের আবার দাম! এ রক্তের জন্যে আবার মায়া! জন্তু জানোয়ারের মতো বনে জঙ্গলে যাদের পালিয়ে পালিয়ে বাঁচা — ও বেশ হয়েছে কুঞ্জ, তুই আমারে ছেড়ে দে।— আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর—

কুঞ্জ। অন্তর কার জলেনি, আমার না?

প্রধান। (ক্ষুব্ধ স্বরে) জ্বলেছে তো এগুলি নি কেন যখন বল্লাম? এগুলি নি কেন? কেন এগুলি নি তুই? তোর অন্তর যদি —আমার শ্রীপতি-ভূপতি—

কুঞ্জ। শ্রীপতি-ভূপতি ব্যথা বড় কম বাজে নি এই বুকে, জানলে জেঠা! তবে তুমি শুধু বারবার ঐ নাম দুটো করে মিথ্যে শান্তি পেতে চাও, আর আমি ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরি, এই তফাৎ।—

এই সংলাপ যেন প্রত্যক্ষ জীবনের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে উঠে এসে রুপ নিয়েছে ফোঁটা ফোঁটা রক্তে। অদ্ভুত রকমের জীবন্ত, বাস্তব, স্বাভাবিক। বাস্তবধর্মী জীবনের উষ্ণতায় ভরা অথচ মেদবর্জিত, বহুবর্ণ অননুরঞ্জিত পেলবতাহীন, অপ্রলম্বিত মৃত্তিকাশ্রয়ী মৃত্তিকাগন্ধী সংলাপ। সর্বনাশা সঙ্কটের বিরুধে প্রতিকারহীন প্রতিরোধস্পর্ধী আত্মার উত্তপ্ত গ্লানির কেন্দ্রস্থল থেকে উঠে এসেছে,— ‘ঐ হয়েছে এক কিন্তু, সব কথার ভেতরে ঐ কিন্তু; (হঠাৎ উদভ্রান্তের মত ছুটে গিয়ে টুঁটি টিপে ধরে কুঞ্জর) ঐ কিন্তুটার টুঁটি একবার, (মরিয়াভাবে) কিন্তুটা-রে একেবারে শেষ করে ফেলে দেই। একেবারে শেষ করে (ধস্তাধস্তি)—’

কুঞ্জ। জেঠা, জেঠা, কী হচ্ছে, কী কর? জেঠা! জেঠা!! (কুঞ্জর ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে প্রধান)

প্রধান। (হঠাৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে) য়্যাঃ!

কুঞ্জ। জেঠা!

প্রধান। আমার অন্তর জ্বলে গেছে রে কুঞ্জ, আমার অন্তর জ্বলে গেছে।

চল্লিশের দশকে ‘নবান্ন’ ছড়িয়ে দিচ্ছে জীবনের ঊষর ক্ষেত্রের ওপর দণ্ডায়মান কতগুলো মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহায় মুমুক্ষু আত্মার মর্মবাণী, ‘আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোস নি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।’

এ সংলাপ যেন নাট্যকারের নয়, এ সংলাপ চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট চরিত্র নয়, সময়ের ঝঞ্ঝাবর্ত্মে ব্যতিব্যস্ত কৃষিভূমিতে দণ্ডায়মান অকালগ্রস্ত, অথচ ভাগ্যবাদী চরিত্রও নয়, বরং বাস্তববোধের দ্বার বিদীর্ণ কতকগুলি জীবন্ত মানুষ। ‘জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।’ সংলাপ তাই উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তঃস্থল ঠেকে ‘টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে। এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।’ অত্যাচারী লুণ্ঠনস্পৃহ দানবের বিরুধে চাষাড়ে রক্ত টগবগে হুংকার ছোড়ে, ‘হেত্তেরি শালা নিকুচি করেছে তোর ঝামেলার—

সংলাপের শব্দগুলো লক্ষ্য করবার মতো এসব শব্দের জন্মভূমি নাট্যকারের মনোজগৎ নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্নার মধ্যে, মাঠ ঘাট পথ প্রান্তরের মধ্যে এর অস্তিত্ব। তাদের আনন্দ-উৎসব, পালপার্বণ, সুখদুঃখ, যন্ত্রণা হাহাকার, রাগদ্বেষ, ঘৃণা, হিংসা, ক্রোধ এবং ক্রোধোন্মত্ত অন্তরের উত্তপ্ত ক্ষেত্র থেকে রচনায়

এসেছে শব্দের মণিমাণিক্য।

গ্রামের চাষী মজুরের ভাষা ও শহুর কোলকাতার আটপৌরে ভাষার অস্তিত্বও দেখা যাবে 'নবান্ন' নাটকে। আবার পূর্ববাংলার উপভাষা এই নাটকে এসে গেছে রাজীবের মুখে। এ ছাড়া আরবী, ফার্সি শব্দ এসে গেছে। মোটের ওপর এই চার রকমের ভাষার সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ।

'নবান্ন' নাটকের গঠনগত একটা বিশেষত্ব— প্রায় প্রতিটা দৃশ্যে একটা করে চরম মুহূর্ত গড়ে তোলা হয়েছে দৃশ্যান্তে। সেই চরমমুহূর্ত গড়ে উঠেছে সংলাপের অদ্ভুত ঠাস বুননে—

(উন্মত্ত অবস্থায় নেপথ্য থেকে দয়াল 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দেয়)

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ........কুঞ্জ! ....কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ,কুঞ্জ, কুঞ্জ!

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল.....সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

বিস্ময়ে বিমূঢ় করে তোলে আটপৌরে ঘর-কন্নার ভাষাকে দিয়ে কি অদ্ভুত ভবে ক্লাইমেক্স গড়ে তুলেছেন নাট্যকার। বন্যায় দয়ালের ঘরবাড়ি স্ত্রী-পুত্র গোটা সংসারটা ভেসে গেছে। সেই যন্ত্রণার হাহাকার বেরিয়ে এসেছে তীব্র তীক্ষ্ণ স্বরে কুঞ্জ কুঞ্জ ডাকের মধ্যে। দর্শক অতর্কিতে ওই আর্তনাদে চমকে চমকে ওঠে। নাট্যকার প্রধান শব্দটা ব্যবহার করলেন না, কেন না, কুঞ্জ শব্দটার ভেতর অভিনেতা, আতঙ্কিত কণ্ঠস্বরের ঢেউটা খেলাতে পারবেন, যে ঢেউ দর্শক মনে উত্তাপ তরঙ্গ তুলবে। আর একটি শব্দ 'সমুদ্দুর'। সমুদ্র বললে স্বরক্ষেপের কালসীমা যতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, 'সমুদ্দুর তারও চেয়ে অনেক বেশি হয়। অভিনেতা কণ্ঠস্বরকে অনেকখানি দর্শকমনে গভীর ছাপ ফেলবার সুযোগটা পেয়ে যান।

হারু দত্তের সরীসৃপ মন লালাসিক্ত রসনায় উচ্চারণ করে অদ্ভুত সংলাপ, 'হেঃ, হেঃ ছেলেমানুষ কিনা! ' প্রস্থানরতা বিনোদিনীর দেহের প্রতি লোলুপতা প্রকাশের পক্ষে ওইটুকু সংলাপই যথেষ্ট। কিংবা কুঞ্জকে যখন হারু দত্তের লোকজন লাঠিপেটা করছে প্রধানের সংলাপ তখন তৈরি করছে অদ্ভুত 'সিকোয়েন্স', 'মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।' —সংলাপের ওপর অভিনয়, দর্শক মনে গভীরভাবে দাগ কেটে যাওয়ার মতো। আবার তিনটি শব্দের বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে প্রেক্ষাগৃহ উত্তাল আবেগে

চঞ্চল হয়ে ওঠে। মাখনের মৃত্যুদৃশ্যে কুঞ্জের আর্তনাদ, 'য়্যাঃ মাখন, মাখন—' লক্ষ্য করবার মতো শব্দগুলো মোটেই আবেগময় নয়। আবেগ উচ্ছ্বাস বর্জিত। এই ধরনের সংলাপ রচনা করে নাট্যকার তাঁর নবান্ন নাটকের বিশেষত্ব মণ্ডিত করেছেন।

রাজীব পূর্ববঙ্গীয় উপভাষায় অদ্ভুত অমানবিক ধরনের সংলাপ উচ্চারণ করে, যাতে তার প্রতি দর্শকের ঘৃণা এবং ক্রোধ যুগপৎ বেরিয়ে আসে। 'দে দ্যাখ— আবার চোখ ভ্যাটকায়! দেচে গলাটা ধইর্যা বার কইর্যা দোকান থিহ্যা রাখহরি। দে চে রাখহরি—' বা প্রধানের উন্মত্ততা প্রকাশের জন্যে নাট্য সংলাপ অদ্ভুত শব্দ সহযোগে গড়ে তোলেন, 'ঐ ব্যথা দৌড়ে পালিয়ে গেল; একেবারে সে সোঁ-ও-ও-ও-ও-ও নদ-নদী, খালখন্দ পেরিয়ে বনবাদাড় ভেঙে সে ব্যথা একেবারে হাওয়া গাড়ির মতো দৌড়ে চলে গেল হুই—' আবার আবেগময় রূপকধর্মী সংলাপ রচনায় নাট্যকার সহজ সরল শব্দ ব্যবহার করেন নিপুণ হাতে,—'তাই ভালো। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।'

শহুরে ভদ্র সম্প্রদায়ের ব্যক্তি নির্মলবাবু। স্বশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গের অর্থগৃধ্নুতা এবং দুর্ভিক্ষের বাজারে অন্ধকার পথে কামানো অর্থে ঐশ্বর্যের দম্ভ প্রকাশের বিপক্ষে বিরুদ্ধ মানসিকতা পোষণ করে অর্থহীন মানুষদের পক্ষে সওয়াল করেন শহরাঞ্চলে ব্যবহৃত সহজ সরল সংলাপে, সে পয়সা যাদের আছে তার বলতে পারে এ কথা! কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বেশির ভাগ লোকেরই আবার সেটা নেই কি-না?' এই দৃশ্যে 'মাগো মাগো' ধ্বনি দুর্ভিক্ষের হাহাকার প্রকাশের উপযুক্ত সংলাপ। নাট্যকার এই শব্দ দুটির অভিনয় করিয়েছেন 'অফ ভয়েসে'। নেপথ্য থেকে মাইক্রোফোনে।

দেশী শব্দের সঙ্গে আরবি ফার্সি ভাষার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে নাট্যকার নাট্যসংলাপে বৈচিত্র্য এনে সংলাপকে শ্রুতিমধুর করে তুলেছেন যেমন, তেমনি ব্যক্তি পরিচয়ের বাহন হয়ে উঠেছে এ সংলাপ। '............আর অগরারে ধরতেই পারলাম না কিছুতে। এই খপ করে ধরতে যাব কি সঙ্গে সঙ্গে উড়ে গিয়ে বেরুল বাদাড়ে! সামনে পেলাম, ধরে নিয়ে এলাম এড়ারেই! এট্টু কমজোরি, তা হলেও কায়দা জানা আছে। প্যাঁচ মারা তো দ্যাখনি এর! হ্যাঁ হ্যাঁ বাবা, অগরা পর্যন্ত কাছে ঘেঁসতে সাহস করে না এর!

'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণনাটকের আসল সংলাপ। গণনাটকে গণচেতনা বৃদ্ধির একটা সচেষ্ট প্রয়াস থাকে। সেই চেষ্টাকে সফল করে তোলবার জন্য নাট্যকারকে সচেতন হতে হয়। নাটককে অধিক সংখ্যক মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া সেই সচেতনতার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য। সাধারণ মানুষের কাছে নাটককে নিয়ে যেতে গেলে, সাধারণ মানুষের বোধগম্য করে তুলতে গেলে সংলাপকে সর্বজনবোধ্য করে তুলতে গেলে সহজ সরল শব্দ, অতি প্রচলিত সাধারণ শব্দ দিয়ে সংলাপের দেহ গঠন করতে হয়। সেদিক থেকে 'নবান্ন' নাটক যথেষ্ট সফল বলা যেতে পারে।

'নবান্ন' নাটকের গান :

শিল্পকলা হিসেবে নাটকের উদ্ভবের সঙ্গে গানের একটি ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। কোনো দেশেই পূর্ণাঙ্গ নাটক স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেনি। তার সূচনা কোনো ধর্মীয় বা লোকোৎসবের মধ্য দিয়ে

হয়েছে। এই সমস্ত উৎসবকালে গান-নির্ভর আবৃত্তির মধ্যে নাটক ও অভিনয়-কলার জন্মসূত্র জড়িত। গ্রামীণ সৌরোৎসব থেকে যেমন যাত্রার উদ্ভব ধরা হয়, তেমনি এদেশে প্রাচীন নাটগীত, আধুনিক নাট্যকলার অঙ্কুর বলে মনে করা হয়।

প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন প্রধানত যাত্রা প্রভাবিত ছিল। এই যাত্রাভিনয় ধর্মীয় বা লোকোৎসবকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। জনসাধারণের রসপিপাসু মন এর মধ্যেই পরিতৃপ্তি লাভ করত। এই ধরনের রচনায় ধর্মভাব ও সঙ্গীত বাহুল্য ছিল। এ দুটির উপস্থিতিতে নাটকীয় দ্বন্দ্বের অভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া যাত্রা লোকজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার ফলে, মুক্তমঞ্চে, দৃশ্যপট ছাড়াই অভিনীত হত।

উনিশ শতকে বাংলা নাটক ইউরোপীয় আদর্শে গড়ে উঠলেও, বাঙালি জীবনে যাত্রার সংস্কার, সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভবপর হয়নি। বিশেষত মঞ্চমুখী নাট্যকারেরা যাদের প্লে-রাইট বলে চিহ্নিত করা যায় তারা জনচিত্তজয়ের জন্য, তাদের রুচির রীতির ওপর অনেকটা নির্ভরশীল হতেন। গান এ ক্ষেত্রে একটি অপরিহার্য অঙ্গ গণ্য হয়। গানের একটা তীব্র আকর্ষণ আছে, মনোরঞ্জক ভূমিকা আছে। উনিশ শতকের মঞ্চপ্রাণ নাট্যকারেরা অনেকেই গানের বহুল ব্যবহার করেছেন। কিন্তু নাট্যবোধ যেখানে প্রেরণা, জীবনের গানের ব্যবহার নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। নাটকীয় চরিত্র ঘটনা ও পরিবেশ বর্ণনা, সংলাপ ও অভিনয়কে অর্থবহ করবার জন্য বা ভারাক্রান্ত দর্শকমনকে আনন্দ বিরতি (Dramatic Relief). নীতি উপদেশ প্রভৃতি দেবার জন্যও গানের ব্যবহার হয়ে থাকে।

কিন্তু 'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকা নিয়ে এমন একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানে প্রতিপাদ্য বিষয়টি মুখ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও জাপানী আক্রমণ, ৪২-এর আন্দোলনে উত্তাল এ দেশ, মারী-মন্বন্তর ও জলোচ্ছ্বাস, সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা স্বভাবত নাট্যকারের শিল্পবোধ ও সংযম গানের বাহুল্যকে পরিহার করতে সচেষ্ট হয়েছে। নাটকটি সমস্যাকণ্টকাকীর্ণ বৃহত্তর জনসমাজ ও দেশের নানা ঘটনার সামগ্রিক রূপ ফুটিয়ে তোলায় এতই নিবেদিত যে, প্রথম তিনটি অঙ্কের বারটি দৃশ্যে সঙ্গীতের ব্যবহারের সুযোগই ছিলনা। যুদ্ধের জন্য গ্রামীন অর্থনীতিতে বিপর্যয়ের জন্য সমাদ্দার পরিবার গ্রাম জীবন থেকে মন্বন্তর কবলিত শহরে আশ্রয় নিয়ে তার সঙ্কট ও আবর্তে বিব্রত ও হৃতসর্বস্ব হয়ে পরিশেষে ঘরে ফিরেছে। এর পরই একটু স্থিত হবার অবকাশ। বিজন ভট্টাচার্য কতকটা সমাদ্দারদের এই মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য হৃদয়ের উচ্ছ্বাসকে ব্যঞ্জনাময় করবার জন্য এবং বোধকরি কতকটা দর্শক চিত্র রঞ্জনের জন্য, চতুর্থ অঙ্কের তিনটি দৃশ্যেই গান সংযোজন করেছেন।

প্রথম দৃশ্যে নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা' দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক ফকিরের গান 'আপনি বাঁচলে বাপের নাম' এবং তৃতীয় দৃশ্যে কৃষক রমণীদের গান 'নিস্‌লো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাসলি।'

সুধী প্রধান লিখেছেন, মুদ্রিত সংস্করণের ১৫ টি দৃশ্যের পরিবর্তে মোট ১৪ দৃশ্যে নাটক অভিনীত হত। ফকিরের গানটি মূল দৃশ্যকে প্রায় সব বাদ দিয়ে চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে কৃষকদের সভাশেষে এবং কুঞ্জ রাধিকার ঘরে ফেরার আগে গাওয়া হত। নিরঞ্জনের গান 'বড় জ্বালা বিষম জ্বালা'— কোনদিনই গাওয়া হয়নি। এমনকি শেষ দৃশ্যে কৃষক মহিলাদের গান দু'একদিন গাওয়া হলেও পরে পরিত্যক্ত হয়।

উপরোক্ত তথ্যগুলি থেকে এটি স্পষ্ট যে, অভিনয়কালে 'আপনি বাঁচলে' গানটি ছাড়া অন্য দুটি গানের

নাট্যোপযোগিতা বস্তুত স্বীকৃত হয়নি।

গণনাট্য আন্দোলন তাঁর অন্যান্য প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আদর্শের উদ্বোধনে দায়বদ্ধ। নাটকের প্রথম অঙ্কত্রয়ে ঘটনার ঘনঘটায় এ বক্তব্যটি তুলে ধরা সম্ভবপর হয়নি। চতুর্থ অঙ্কের শান্ত স্নিগ্ধ শান্তির পরিবেশে ফকিরের গান হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত চাষী ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছে। 'হিন্দু-মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান। ফকির বলে হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ভিন্ন আর উপায় নাই সার বুঝ সবে।' বহুদর্শী ফকির আকালের, মন্বন্তরের সীমাহীন দুর্দশার অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেয়েছে—'বাঁচিবারে যদি চাও মনে আনো বল' এবং ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে গাঁতায় খেটে আমন-ফসল ঘরে তোলবার পরামর্শ দিয়েছে।

এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে গাঁতায় খাটার এবং দ্বিতীয় দৃশ্যে ধর্মগোলায় ফসল তোলার যে সঙ্কল্প ঘোষিত হয়েছে, তাকেই ফকির তার গানের মধ্য দিয়ে সকলের মনের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দিয়েছে। গানটি আপাতদৃষ্টিতে উপদেশাত্মক মনে হলেও, প্রকৃতপক্ষে গানটির ব্যবহার এখানে নাটকের যে লক্ষ্য—ঐক্য ও সংহতি এবং সমস্ত প্রতিকুলতার বিরুধ্বে প্রতিরোধ রচনা করা তারই ভূমিকা। এদিক থেকে এটি অনেকটা নাট্যোপযোগী।

নিরঞ্জন ও কৃষক রমণীদের গানদুটি সূখী তৃপ্ত গৃহস্থ জীবনের স্মৃতি-বিস্মৃতি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি।

যুদ্ধ আন্দোলন মারী মন্বন্তরে বিধ্বস্ত গ্রাম আজ নতুন জীবনের স্বপ্নে বিভোর, কিন্তু পুরনো দিনগুলো স্মৃতিকে ভাবাতুর করে বইটি! কিন্তু দুঃখের দহন জ্বালার মধ্য দিয়ে তো সুখের আসন প্রতিষ্ঠা এ কথাই তো বিজ্ঞজনেরা বলেন। নিরঞ্জন শুয়ে অবকাশ যাপনের সময় গানের মধ্য দিয়ে স্মৃতিবিজড়িত অতীত স্মরণের মধ্য দিয়ে একটি সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা করছে, দেখা যায়। গানটি কথার সীমা অতিক্রম করে সুরের মধ্য দিয়ে তার স্বজন হারানোর বেদনাভারটিকে পাঠকের অনুভূতির গভীরে পৌঁছে দেয়। এর পরই কুঞ্জ রাধিকার প্রবেশ যেন—হারিয়ে পাওয়ার সুগভীর আনন্দে পরিপূর্ণতা এনে দিয়েছে।

কৃষক রমণীদের গান গ্রাম্য মেলার পরিবেশে উপস্থাপিত। মেলারব, আনন্দ-উচ্ছ্বাসের স্বপ্নরঙিন জীবনের আকাঙ্ক্ষা এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে। সঙ্কটাবসানে জনমানসের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরবার পক্ষে গানটির তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। মূল পরিবেশের সঙ্গো সঙ্গাতি রেখে মেলার আনন্দ-উজ্জ্বল পরিচয় তুলে ধরবার ক্ষেত্রে গানটি যথেষ্ট আনুকূল্য করেছে।

নাটকের গান তিনটির একটি মাত্র কার্যত অভিনয়কালে গীত হলেও, কোনটিই নাটকের ভাবরসের সঙ্গো সঙ্গাতিহীন তো নয়ই বরং নাটকের অভিপ্রায়ের পরিপূরক।

৮৭.১৩ সারাংশ

নাটকে কাহিনীর পর চরিত্রের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশ্চাত্য বিশেষত গ্রীক নাটকে কাহিনীর প্রাধান্য ছিল, সেক্সপীয়রের নাটকে চরিত্রের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপিত হয়। কিন্তু চল্লিশের দশকে গণনাট্য

আন্দোলনের নাটকে ব্যক্তি নয়, সমষ্টির প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। আর সামগ্রিক অভিনয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়। 'নবান্ন' নাটকে ছোট-বড় চরিত্রের সংখ্যা পঁয়তাল্লিশ। চরিত্রসংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে নাটকের বিষয়বস্তুর ব্যাপকতাই হয়তো এর জন্য দায়ী। একই সঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ কালের সঙ্কট, আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ-মহামারীর বিশাল ক্যানভাসে গ্রাম-শহরের বিপর্যস্ত চেহারা। এ সময় বিপর্যয় ঘটেছে মানুষের মূল্যবোধে, সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, দেশে অর্থনৈতিক সংকট ঘনীভূত, এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে গেলে বিস্তৃতের ক্ষেত্র ও চরিত্র সংখ্যা বৃদ্ধি অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এরা জনতার ভূমিকা নেয়নি। জনতায় অনেকগুলি মুখের সমাবেশ থাকে, অথচ তাদের চরিত্র এক ও অভিন্ন। এখানে তা ঘটেনি।

গুরুত্ব অনুসারে 'নবান্ন'-এর চরিত্রগুলো হল—প্রধান সমাদ্দার, কুঞ্জ, রাধিকা, নিরঞ্জন, বিনোদিনী, পঞ্চাননী ও দয়াল এবং হারু দত্ত, কালীধন ধাড়া ও রাজীব। অন্যান্য চরিত্রগুলো নেহাৎই গৌণ— ক্ষণকালের জন্য এসে তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্বটুকু পালন করেছে মাত্র।

প্রধান সমাদ্দার প্রথম দৃশ্যেই দর্শকের সামনে উপস্থিত হয়েছে। তখন থেকেই তাকে দ্বন্দ্বময়, মর্মজ্বালায় জর্জরিত দেখা যায়। সূচনাতেই যখন দেখা যায় কুঞ্জ নিরঞ্জন আর পঞ্চাননী অবস্থার প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় জ্ঞাপন করে— প্রথমোক্তরা অসম শক্তি বিন্যাসের কারণে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পালিয়ে যেতে বলে, পঞ্চাননী সেখানে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়। এই দুই স্বতন্ত্র মতের কারণে দ্বিধাগ্রস্ত প্রধান প্রতিরোধের কথা বলে — 'কুঞ্জ, ও কুঞ্জ, আমি প্রাণ দেব রে কুঞ্জ।..........আমি প্রাণ দেব। এর পেছনে সক্রিয় ছিল তার পুত্রশোক— শ্রীপতি ভূপতিকে পুলিশ-মিলিটারির আক্রমণে সে হারিয়েছে। এ যেন হত্যা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তার প্রতিবাদ । প্রধান ক্ষোভে বলেছে 'জন্তু জানোয়ারের মত বনে জঙ্গালে পালিয়ে' বাঁচতে চায় না।

প্রধান দুটি সন্তান হারাবার পর স্ত্রী পঞ্চাননীকে সম্বল করে বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারত, কিন্তু সে-ও পুলিশের নির্মম অত্যাচার ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে প্রাণ দিয়েছে। ওদিকে প্রকৃতি কেড়ে নিয়েছে তার সমস্ত সম্পদ। প্রলয়ঙ্কর ঝড়, সর্বনাশা বন্যা সঙ্গে নিয়ে এসেছে দুর্ভিক্ষ ও মন্বন্তর। প্রধানের স্বপ্নের শেষ স্মৃতিটুকুও মুছে গেল। তাকেও পথে নামতে হল। বস্তুতপক্ষে নাটকে শারীরিক ও মানসিক আঘাত তার ওপরই বেশি করে নেমেছে। একের পর কে দুর্ঘটনায় প্রধান তার মস্তিষ্কের ভারসাম্য অনেকটা হারিয়ে ফেলে।

এই প্রধানকেই আবার যখন দেখি একদিকে হারু দত্ত, তার বাড়িতে এসে জমি কিনতে চায়, প্রত্যাখ্যাত হয়ে ক্রুদ্ধ হারু গালাগাল দেয়, কুঞ্জ প্রতিবাদ করলে হারুর লাঠিয়ালারা কুঞ্জ ও প্রধানের মাথায় আঘাত করে। অপরদিকে প্রধানের চোখের সামনেই শক্তিহীন মাখনের মৃত্যু হয়, তখন কিন্তু প্রধান কান্নায় ভেঙে না পরে বলে, 'মাখন চলে গেলি'— তখন বোঝা যায় এ বেদনার ভার বড় কঠিন, এর হাত থেকে নিস্তার নেই।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই প্রধান-ই এক সময় ছিল গ্রামের মাথা, নানা প্রতিকূলতায় পথের ভিখারি। তথাপি তার সম্বিত একেবারে হারায়নি। ফটোগ্রাফার তার বাড়ি জানতে চাইলে সে উত্তর দেয়, '.......এ-এ চিনতে পারবেন!' কঙ্কালসার দেহের ছবি তুলছে দেখে বলে, 'তা ভালো,......... কঙ্কালের ছবির ব্যবসা! '— এ থেকে তার বোধের মধ্যে যে একটা আলো-আঁধারির পরিবর্তন কাজ করছে তা বোঝা যায়। অপর এক দৃশ্যে যখন দেখি এই প্রধান উৎসব বাড়িতে ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য সামান্য ভাত চেয়েও তা পাচ্ছে না,

তখন ধিক্কার দিয়ে বলে, 'তোমারা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু। ....অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু!' তখন মনে হয় প্রধান সম্ভবত আবার বাস্তবে ফিরে এসেছে। আবার চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যথার কথা বলতে গিয়ে অনেক গিয়ে অনেক অসংলগ্ন কথা বলেছে, যা থেকে তাকে অনেকটা অস্বাভাবিক মনে হয়েছে। নাটকের শেষে গ্রামে ফেরার পর মনে হয়, তার প্রায়ান্ধকার চৈতন্য, পরিচিত পরিবেশ হারিয়ে আবার ফিরে পায়। বলে, 'ভালো, ভালো, নবান্ন ভালো।' দয়াল যখন বলে, 'জোর প্রতিরোধ এবার,' প্রধানও উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠে 'দয়াল'।

এই আলোচনা থেকে স্পষ্টত এটি উপলব্ধির বিষয় যে, প্রকৃত অর্থে 'নবান্নে' কোনো নায়ক না থাকলেও প্রধান সমাদ্দারই এ নাটকের মুখ্য চরিত্র। মূলত তার সার্বিক জীবন যন্ত্রণা (sufferings)....এ নাটকে প্রধানতম ঘটনা। সে এক সময় গ্রামে সম্পদে প্রতিষ্ঠায় মর্যাদায় শীর্ষস্থানে ছিল। ভাইপো, পাড়া প্রতিবেশী সকলেই তাকে মনত। কিন্তু দুর্ভিক্ষ ও সমাজ শোষণ তাকে সর্বতোভাবে রিক্ত করেছে। দুই ছেলেকে হারিয়ে, তিন মরাই ধান পুড়িয়ে, ক্ষুধা ও তৃষ্মায় দুর্বল একমাত্র বংশধর মাখনকে হারিয়ে, অভাবের তাড়নায় জমি আংশিক বিক্রি করে, সে প্রায় সর্বস্ব খুইয়েছে। বাস্তু ছেড়ে শহরে গিয়ে ক্ষুধার অন্ন সন্ধান করতে বাধ্য হয়েছে— এর চাইতে দুবির্ষহ জীবন যন্ত্রণা আর কি হতে পারে। সমাজের সংসারের মর্যাদার আসন থেকে এই চরম বিপর্যয় ও পতন, তার মত এমন তীব্র শোক, এ নাটকের কোনো চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। এদিক থেকে প্রধান সমাদ্দার এ নাটকের অবিসংবাদী মুখ্য চরিত্রের মর্যাদা পাওয়ার অধিকারী।

কুঞ্জ চরিত্রের মধ্যে তারুণ্যের তাজা রক্ত মস্তিষ্কের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় একটা ভারসাম্য বজায় রেখেছে। সে বোঝে সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী শাসকদের শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে এগিয়ে যাওয়া মানে হঠকারিতা, অকারণ জান দিয়ে কোনো লাভ নেই। এই কুঞ্জই আবার হারু দত্তের চক্রান্তের শিকার প্রধান সমাদ্দারকে জমি বিক্রি করতে বাধা দিয়ে হারুর ক্রোধের কারণ হয়েছে।

কুঞ্জ কোনো দৈব নয়, আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী। সে দেখেছে, মনুষ্যসৃষ্ট সন্ত্রাস, তারা প্রাণ নিয়েছে, মানুষের ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। দেখেছে প্রকৃতির ভয়ঙ্কর রূপ, বন্যা মানুষের আশ্রয় এবং অন্ন কেড়ে নিয়ে তাদের দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর কবলে ঠেলে দিয়েছে। তাই সে আর ভাগ্য—ভগবানে নয়, মানুষের নিজের ভেতর যে শক্তি রয়েছে, তার ওপর তার আস্থা সবচেয়ে বেশি।

কুঞ্জ গার্হস্থ্য জীবনযাত্রার মূর্ত প্রতীক। স্ত্রী পুত্র, ভাই ও ভ্রাতৃবধূ ও জ্যেষ্ঠতাত নিয়ে তার চাষাড়ে সাম্রাজ্য। এ সাম্রাজ্যের প্রধান সম্পদ জমি,—তার অপ্রতুলতা অভাব দূর করতে পারেনা। সৃষ্টি হয় মতানৈক্য। অনিবার্য হয় ছোটখাট ঝগড়া বিবাদ। এর ফলে সহধর্মিনীর সঙ্গে কদাচিৎ মতদ্বৈত হলেও পরিবারের অন্যদের জন্য স্নেহ মমতার অন্ত নেই। এই প্রীতিপূর্ণ বন্ধন স্পৃহা কুঞ্জ চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

কুঞ্জ নিজের সংসারের ঝড়-ঝাপটা সামলায়, শুধু তাই নয়, প্রতিবেশীদের জন্যও তার হৃদয়ে দুর্বল স্থান আছে। নিজের পরিবারের জন্য ঘটি বাটি বিক্রি করে দুমুঠো চাল কিনে এনে যখন শোনে দয়ালের কুটোটির ব্যবস্থা নেই, তখন তার শেষ সম্বল থেকে খানিকটা দিয়ে তৃপ্তি বোধ করে। সে বুঝতে পারে গ্রামজীবনে একটি অনিবার্য সঙ্কট নেমে আসছে, তাকে অবিচলিতভাবে গ্রহণ করতে হবে। আর পাঁচজনের যা হবে, তারও তাই ঘটবে। সেই বাস্তব পরিস্থিতিতে গ্রামের মাটি থেকে বিশ্লিষ্ট হয়ে তারাও শহরের ফুটপাতে নেমে

এসেছে। পশুর সঙ্গো খাদ্য কাড়াকাড়ি করে খেতে হলেও ক্ষতবিক্ষত কুঞ্জ হার মানেনি, জীবন সম্পর্কে বিতৃষ্মা হয়নি, অবসাদগ্রস্ত হয়ে পিছু হটেনি। বরং জীবনকে আরও গভীরভাবে আঁকড়ে ধরেছে, স্ত্রীর প্রতি মমতা, অজস্র ধারায় ঝরে পড়েছে। গভীর প্রেমে 'কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর হাতখানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর। তৈরি হয় প্রেমের বিরল মুহূর্ত। তারা অবশেষে আমিনপুরে ফিরে আসে এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে সব ঠিক হয়ে যাবে এবং যায়-ও।

নিরঞ্জন অপেক্ষাকৃত গৌণ চরিত্র হলেও দুটি কারণে তার গুরুত্ব মানতে হবে। সে পরিবারের পাঁচজনের সঙ্গো দুঃখ ভাগ করে নিতে না পারলেও গ্রামের চোরাব্যবসায়ী ও মেয়ে পাচারকারী হারু দত্ত এবং কালোবাজারী ও সেবাশ্রমের নামে নারীদেহের ব্যবসাদার কালীধন ধাড়াকে বামাল সমেত ধরিয়ে দেবার দুঃসাহস দেখিয়েছে। সে স্ত্রী বিনোদিনীকে কালীধনের সেবাশ্রমে ফিরে পেয়ে গ্রামে গিয়ে ভাঙা সংসার গড়ে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। কুঞ্জ রাধিকা পুনরায় সেখানে গিয়ে আশ্বস্ত হয়েছে। প্রধান তার বিপন্ন চৈতন্যকে ফিরে পেয়েছে।

নবান্নের দুটি খলচরিত্র হারু দত্ত ও কালীধন ধাড়া। এরা মানুষেগ্ন জীবনধারণের অত্যাবশ্যকীয় খাদ্য নিয়ে কালোবাজারী মজুতদারী করে। নিজেদের সম্পদ বৃদ্ধির জন্য এরা পারেনা এমন কোনো কাজ নেই। ধান-চালের মত নিজ গাঁয়ের মেয়ে পাচার করতেও এদের দ্বিধা হয়না। এই হারুই প্রধান সমাদ্দারকে টাকার লোভানি দিয়ে সস্তায় জমি কিনে নিতে চায়। বাধা পেলে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত আক্রমণ করতেও তার বাধেনা। পাচারের জন্য মেয়ে কিনতে সে খুকির মা-র মত দালাল ধরে, সেই সঙ্গো নিজেও অক্টোপাসের মত মেয়ের বাপকে ঘিরেধরে কামড় বসায়। হারু দত্ত শঠ, প্রবঞ্চক, প্রতারক, ধূর্ত ও জালিয়াত। হেন কাজ নেই যা সে পারেনা। নাট্যকার অত্যন্ত সতর্কভাবে চরিত্রটিকে গড়েছেন বলে সে হয়ে উঠেছে জীবন্ত।

কালীধন সে তুলনায় অপেক্ষাকৃত দুর্বলভাবে চিত্রিত। তার অর্থ প্রাচুর্য ছিল, ছিল না দূরদর্শিতা। ভারতরক্ষা আইনের বিধান অমান্য করে প্রচুর চাল গুদামজাত করে রেখেছে, তার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্বন করেনি। ফলে নিরঞ্জন-বিনোদিনীর জালে জড়িয়ে পরে ভরাডুবি ঘটল। এদিক থেকে রাজীব স্বল্প পরিসরে কয়েকটি তুলির টানে জীবন্ত হয়ে উঠেছে। সংলাপ উপকরণ ক্ষুরধার ব্যঙ্গ, ক্ষুধার্ত মানুষ সম্পর্কে তার মন্তব্য, 'দুর্ভিক্ষের কাঙালি যত সব বা 'দুর্ভিক্ষের পোকামাকড় সব' তীব্র, তীক্ষ্ণ ও মর্মবিদারী।

নবান্নের স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে পঞ্চাননী, মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে পরিকল্পিত। প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী সে। তার চারিত্রিক দৃঢ়তা মর্যদাবোধ উল্লেখযোগ্য। আগস্ট আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য শাসক শ্রেণির অত্যাচারের ভয়ে যখন সাধারণ গ্রামবাসী বনে জঙ্গালে আশ্রয় নিচ্ছে তখন তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর থেকে শোনা যায়—'তোদের এই অক্ষমতার জন্যে মেয়েমানুষ কেন সহ্য করতে যাবে এই দুর্ভোগ? .....সব চাইতে বড়ো কথা ইজ্জৎ!!' পুলিশের মার খেয়ে মানুষ যখন পালাচ্ছে, পঞ্চাননী তাদের নেতৃত্ব দিয়েছেন—এগিয়ে যা বলছি, এগিয়ে যা। পঞ্চাননী নিজেও এভাবে শহীদের মৃত্যুবরণ করেছে।

বিনোদিনী সুসংগত, সংযত এক গ্রামবধূর চরিত্র। সে পরিবারের সকলের সঙ্গো দুঃখ যন্ত্রণা ভাগ করে নিয়েছে। ঘটনাচক্রে কাজের প্রলোভন দেখিয়ে তাকে পরিজন থেকে বিচ্ছিন্ন করে কালীধনের সেবাশ্রমে

নিয়ে যায় এক টাউট। সেখানে আকস্মিকভাবে নিরঞ্জনের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ। উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় দুষ্কৃতিরা ধরা পড়ে। নিরঞ্জন বিনোদিনীকে নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে, তারা আমিনপুরের বিধ্বস্ত সংসারকে আবার নতুন করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

রাধিকা এ নাটকের প্রধান স্ত্রী চরিত্র। কুঞ্জর স্ত্রী, সমাদ্দার পরিবারের জ্যেষ্ঠ বধূ। একটি সন্তানের জননী। জ্যেষ্ঠ বধূ হিসেবে সকলকে নিয়ে চলবার মানসিকতা সম্পন্ন ও দায়িত্বশীলা গৃহবধূ। অভাবের সংসারে মাঝে মধ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করলেও, দুঃখের সংসারকে সুখের করে তোলবার ঐকান্তিক আগ্রহের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তারা ফুটপাথবাসিনী, ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহে বিপন্ন বোধ করেছে, তখনও তার অন্তরের প্রেম শুকিয়ে যায়নি, বরং এই দুর্দিনে তার স্বামী-প্রেম আরও অনেক গভীর হয়ে উঠেছে। (দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য)।

তার চৈতন্যের গভীর থেকে এ প্রেম নিঃসৃত—তা তার কথা থেকে বোঝা যায়—'খুব যন্ত্রনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব, জল? একটু জল খাবে?'—এভাবেই নতুন করে তারা দুজনে দুজনের প্রেমের স্বাদ নতুন করে অনুভব করেছে। পরিশেষে, এই প্রেমই তাঁদের গ্রামে ফিরে নতুন করে ঘর বাঁধবার স্বপ্নকে উজ্জীবিত করে। সে মুহূর্তে, তাঁর মৃত পুত্রের জন্য প্রাণ হাহাকার করে উঠলেও, তার সামলে নিয়ে এসে নতুন করে সব কিছু গড়বার আনন্দে মেতে ওঠে। নাটকের দর্শক/পাঠক প্রথম রাধিকাকে আবার নতুন করে আবিষ্কার করে। রাধিকা 'নবান্ন' নাটকের একটি স্মরণীয় চরিত্র।

সংলাপ এক অর্থে নাটকের 'প্রাণ-ভোমরা'। সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার নাটকের বিষয়বস্তু বর্ণনা, নাটকীয় দ্বন্দ্বের উপস্থাপনা, নাটকের বৃত্ত গঠন, চরিত্র বিকাশ ও বিশ্লেষণ করে থাকেন। আবার এই সংলাপের মধ্যেই একাধারে নিহিত থাকে বাচিক অভিনয়ের উপকরণ, অপরদিকে অঙ্গাভিনয়ের অনেক অনুল্লেখিত নির্দেশ। সংলাপে ভাষা তাই নাটকীয় চরিত্রের ভাব, ভাবনা প্রকাশোক্ষম হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু কালের ব্যবধানে বক্তব্য পস্থাপনা রীতিরও যুগে যুগে বিবর্তন ঘটেছে। প্রাক রবীন্দ্র, রবীন্দ্র-উত্তর, রবীন্দ্রযুগে নাটকের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বদলেছে। চল্লিশের দশকে গণ-নাট্যের নাটকে সংলাপ এবং ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি বলা যায় আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। এ সময় সংলাপ হয়ে উঠেছে অনেকটা প্রত্যক্ষ জীবন থেকে উৎসারিত—রক্ত-মাংসে গড়া মানুষের জীবন্ত ভাষা। যেমন—

প্রধান। চল তো গাঙ বরাবর এগিয়ে গিয়ে বেড় দিয়ে ফেলি গে ওদের, ডাক সব ওদের কুঞ্জ।

কুঞ্জ। না না না, তা হয় না, ... চলো পালাই।

প্রধান। পালাব, পালাতে বলছিস তুই!

কুঞ্জ। আ—া—হা—া, তা খামখা জান দিয়ে কি কোনো লাভ আছে? (১/১)

এই সংলাপ স্বচ্ছন্দ, স্বাভাবিক, বাস্তবধর্মী ও জীবন্ত। এর ভাষা মেদবিহীন, বহুবর্ণরঞ্জিত, মাটিঘেঁষা। আবার—

পঞ্চাননী। আমিনপুরের কলঙ্ক, আমিনপুরের কলঙ্ক তোরা সব, তাই পেছু হটছিস। পেছোসনি, এগিয়ে যা। এগিয়ে যা তোরা সব, এগিয়ে যা।

নেপথ্যে বাঁশ ফাটার বিরামহীন শব্দ। পঞ্চাননী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে (ক্ষীণকণ্ঠে) এগিয়ে যা, এগিয়ে

যা তোরা সব....

পঞ্চাননীর এই বাচিক ও আঙ্গিক সংলাপ চল্লিশের দশকে নবান্ন নাটকের মাধ্যমে মানুষের মনে প্রতিরোধের স্পৃহা সঞ্চার করে দেওয়া অগ্নিগর্ভ বাণী। এ সংলাপ নাট্যকারের সাধারণ সংলাপ নয়—প্রতিবাদী চরিত্রের। এ চরিত্র নাট্যকার সৃষ্ট বলা ভুল হবে, বরং বলা ভালো আগস্ট আন্দোলনের ঝঞ্ঝাবর্তে বিপ্লবী ভাবাদর্শে গড়ে ওঠা মানুষের। সেই সঙ্গে বলা যায়, দুর্যোগে ঝড়-ঝঞ্ঝা, বন্যা মন্বন্তর মারীজনিত দুর্ভোগের প্রতিক্রিয়ায় ব্যতিব্যস্ত বিপন্ন মানুষ, পুলিশ প্রশাসন, চোরাকারবারীদের অত্যাচারে অসহায় গ্রামবাসী, সেই সঙ্গে যুদ্ধের আক্রমণে দিশেহারা জীবন্ত মানুষগুলির এ হল প্রতিবাদের কণ্ঠস্বর। আবার যখন শুনি 'জানি জানি, ওপরের দিকে হাত দ্যাখাবে, তা জানি। তা সে বিশ্বাস ভেঙে গেছে; ওতে আর ভয় করি নে।' (কুঞ্জ ১/৫) অথবা 'টাকার লোভানি দিয়ে দেশশুদ্ধ, লোকের ধানগুলো সব নিয়ে গেছে এর আগে, এখন আবার জমি ধরে টান মারতে এয়েচে। ও জমি বিক্রি হবে না বলে দ্যাও।' (কুঞ্জ ১/৫)—প্রথমটিতে বক্তার অদৃষ্টবাদ নয়, সুদৃঢ় বাস্তববোধের পরিচয় যেমন ফুটেছে, তেমনি শেষোক্ত সংলাপে যেন উঠে এসেছে সত্যকথনের দৃঢ় প্রত্যয়ের অন্তস্থল থেকে। এসব সংলাপের শব্দগুলো নাট্যকারের বানানো কথা নয়, গ্রাম বাংলার কৃষক মজুরের ঘরকন্না, মাঠঘাট, পথ-প্রান্তর থেকে উঠে আসা। শহুরে বিত্তমান মানুষের ভাষা থেকে এ সংলাপ একেবারেই স্বতন্ত্র।

তাই বলা যায় 'নবান্ন' নাটকের সংলাপ গণজীবন থেকে পাওয়া যথার্থ অর্থে গণনাট্যের সংলাপ। গণনাটকের প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় নাটকের বিষয়বস্তু ও তার বক্তব্যকে সাধারণ মানুষের কাছে নিয়ে যাওয়া, তার সংলাপের ভাষাও সাধারণ মানুষের বোধগম্য হওয়া বাঞ্ছনীয়। 'নবান্ন' এদিক থেকে যথেষ্ট সফল।

নাটকে গানের ব্যবহার নানা কারণে হয়ে থাকে। অনেকে মনে করেন, যাত্রা নাটগীতের সঙ্গে বাংলা নাটকের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকায়, নাটকের গঠনের ব্যবহার জন্মসূত্রেই এসে গেছে। তাই গানের একচ্ছত্র আধিপত্য বাংলা নাটকে বাস্তব ঘটনা নয়। কিন্তু যেহেতু প্রাগাধুনিক বাঙলার লোকজীবন যাত্রা প্রভাবিত ছিল, তাই জনজীবনে, সেই সূত্রে সংগীতের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ইউরোপীয় আদর্শে বাংলা নাটক রচনার আগ্রহ দেখা দেয়। এক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটক ও বাঙালির যাত্রার সংস্কার সর্বত্র কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হয়নি। ফলে গান এক্ষেত্রে অপরিহার্য গণ্য হয়েছে। নাটক, বস্তুত জীবনাশ্রয়ী, বাস্তব জীবনের কথা বলা, তার প্রধান দায় হলেও, এই জীবনে বিনোদনের একটি ভূমিকা আছে, আছে, তাই সঙ্গীত—কণ্ঠ ও বাদ্যযুক্ত হওয়া অসঙ্গত নয়। কিন্তু সঙ্গীত যদি নাট্য বিষয়কে আচ্ছন্ন করে, তবে নাটকের মৌল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হতে বাধ্য। ব্যবসায়িক থিয়েটারের নাটকে নাচ-গানের বাহুল্য অনেক ক্ষেত্রেই পীড়াদায়ক। নাচগান এখানে পণ্য। দর্শক মনোরঞ্জনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সাফল্য তার প্রধান লক্ষ্য। গ্রিক নাটক বা সেক্সপীয়রের নাটকেও গানের ব্যবহার আছে। গান সেখানে নাট্যবোধ সঞ্চারে যেমন সহায়ক, তেমনি ঘাত-প্রতিঘাত দ্বন্দ্বমুখ্য নাটকে বিশেষ ভাব-রস সঞ্চারের প্রয়োজনে, কখনও কখনও গানের ব্যবহার করা হয়েছে। গানের ব্যবহার এ ক্ষেত্রে নাট্য প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

'নবান্ন' গণনাট্য সংঘের পতাকাতলে একটি সময় ও চেতনাকে প্রকাশ করবার দায়িত্ব পালন করেছে। সেখানে গান মুখ্য বিষয় নয়—মুখ্য তার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। তাই বিশ্বযুদ্ধ, আগস্ট আন্দোলন, ঝড়-জলোচ্ছ্বাস, মারী, মন্বন্তরের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা এ নাটকের প্রেরণা, সেখানে মনোরঞ্জক গান প্রধান বিষয় হতে পারেনা। তাই পনের দৃশ্যের নাটকের প্রথম বারোটি দৃশ্যে গানের ব্যবহার নেই। এ নাটকে যে তিনটি গান রয়েছে—তাও নাটকের শেষে চতুর্থ অঙ্কের সমস্যাজর্জরিত মানুষ নতুন ফসল চোখের সামনে দেখে স্বস্তি ও আনন্দের আশ্বাস নিয়ে যখন শহর থেকে একে একে ঘরে ফিরছে, তখন তাদের কণ্ঠে গান উঠে এসেছে। প্রথম দৃশ্যেই ঘরে ফিরে নিরঞ্জন 'ঘরখানা জুড়েতেড়ে' নিয়ে গ্রামের সকলের সঙ্গে আলাপচারিতার পর দাওয়ার ওপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে গান ধরেছে—'বড়ো জ্বালা বিষম জ্বালায় পুড়ে হব সোনা'। (৪/১) দ্বিতীয় দৃশ্যে জনৈক পথিকের গান—'আপনি বাঁচলে তো বাপের নাম মিথ্যা সে বয়ান/হিন্দু মুসলিম যতেক চাষী দোস্তালি পাতান।' ধর্ম ও সম্প্রীতির গান গণনাট্যের বক্তব্যকেই তুলে ধরেছে। তৃতীয় দৃশ্যে 'নবান্ন' উৎসবের মাতোয়ারা কৃষক রমণীর গান—'নিসলো চেয়ে সামনের হাটে গলার হাঁসুলি।' প্রভৃতি বিষয়ানুগ ও সবিশেষ তাৎপর্যবহ।

৮৭.১৪ অনুশীলনী ৩

১। **সঠিক উত্তরে (✓) টিক চিহ্ন দিন :**
(ক) 'নবান্ন' নাটকের চরিত্র সংখ্যা — ১০/১৮/২৪/৪৫
(খ) 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য পুরুষ চরিত্র — কুঞ্জ/প্রধান/নিরঞ্জন।
(গ) 'নবান্ন' নাটকের মুখ্য নারী চরিত্র — পঞ্চাননী/বিনোদনী/রাধিকা।

২। **নিচে উল্লিখিত চরিত্রগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিন :**
রাজীব, দয়াল, মণ্ডল, নির্মলবাবু, বরকত, যুধিষ্ঠির।

৩। "তা ও বেঁচে থাক বাবা ব্ল্যাক মার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার, না হয় চতুর্গুণই পয়সা নেবে, জিনিসটি তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে।" —বক্তা কে? ব্ল্যাক মার্কেট কী? 'মজুতদার' শব্দটির উৎস কী? কোনো প্রসঙ্গে বক্তা একথা বলেছেন? বক্তার সম্পর্কে আপনার অনুভব সংক্ষেপে লিখুন।

৪। 'নবান্ন' নাটকের নায়ক কে যুক্তিসহ আলোচনা করুন।

৫। "চলে এয়েছে বলেই যে জিনিসটারে চালিয়ে নেবে, ভালমন্দ বিচার পর্যন্ত করবে না, কী রকম ধারা কথা।" —বক্তা কে? কী 'চলে এয়েছে'? বক্তার মনোভাবটি বুঝিয়ে দিন।

৬। 'নবান্ন' নাটকে প্রধান সমাদ্দার / হারু দত্তের নাট্যভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৭। চরিত্র ও পরিবেশ উপযোগী সংলাপ রচনায় নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য অনেকটাই সার্থক। 'নবান্ন' নাটক অবলম্বনে মন্তব্য বিচার করুন।

৮। 'নবান্ন' নাটকের সংলাপের বিশিষ্টতা ও স্বাভাবিকতা উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৯। ‘নবান্ন’ নাটকের সংলাপ ‘অকৃত্রিম ও স্বাভাবিক’—এ মন্তব্যের যাথার্থ বিচার করুন।

১০। ‘নবান্ন’ নাটকের সঙ্গীতসমূহের নাটকীয় প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১। “এ পোড়া মাটির দেশে আর থাকব না। চল ফিরে যাই।”—বক্তা কে? কোথায় ফিরে যাওয়ার কথা বলেছে? ‘পোড়া মাটির দেশ’ বলতে কি বুঝিয়েছেন? এ কথা বলায় বক্তার কী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়?

১২। “তাই ভালো। ভুলে যাও। ভুলে যাও ব্যথার কথা! ভুলে যাও তুমি তোমার ব্যথার কথা। ভুলে যাও।” —এই সংলাপ কার? নাটকীয় তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

১৩। “ওরে বাবারে—তা দিতে হবে না। মানুষের মুখের কথায় জানবে চন্দর কোনো মূল্য নেই, একেবারে কিছু দাম নাই—কথা এই বললে, ফুরিয়ে গেল! না কি! করবে যা তা সব কাগজে কলমে। একবার করলে চিরকালের মতো এট্রা ইয়ে হয়ে থাকল!” —কার লেখা, কোন নাটকে, কার উক্তি? প্রসঙ্গটি উল্লেখ করুন। উক্তিটির মধ্যে বক্তার কি চরিত্র-পরিচয় মেলে বুঝিয়ে দিন।

৮৭.১৫ মূলপাঠ ৭ : ‘নবান্ন’ নাটকের মঞ্চ, আলো, আবহসংগীত ও অন্যান্য নেপথ্য বিধান

মঞ্চ :

এদেশে আধুনিক মঞ্চ বলতে যেটি বোঝায় তা প্রসেনিয়াম মঞ্চ। তার নির্মাণকর্তা লেবেডফ। সেখানে তিনি যে বাংলা নাটকটির অভিনয় করান তার নাম ‘কাল্পনিক সংবদল’। এটি এম. জড্রেল-এর লঘু নাটক ‘দি ডিগসাইস্’-এর বঙ্গানুবাদ। তার মঞ্চগঠন পদ্ধতি দেখে আমরা মঞ্চের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে পারি। তা হল—তিনদিক ঢাকা সম্মুখ ভাগ খোলা একটি আয়তাকার ক্ষেত্রবিশিষ্ট স্থান যার ওপরটাও ঢাকা এবং মাঝখানটি উঁচু বেদির মতো—তাকে মঞ্চ বলা হয়। এই উঁচু মঞ্চটিকে অভিনয়ের জন্য নির্দিষ্ট করে রাখা হয় এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাজান হয়। লেবেডফ অভিনয়ে চারুত্ব সম্পাদনের জন্য মঞ্চকলার অভিনবত্ব সৃষ্টিতে আগ্রহী ছিলেন। একাজে তিনি ছিলেন একাধারে স্থপতি, কারুশিল্পী, দৃশপট শিল্পী, সঙ্গীত ও অভিনয় পরিচালক। এক্ষেত্রে তাঁর স্বদেশের মঞ্চ পরিকল্পনা ও মঞ্চশিল্পী ফিয়োডার ভলকভের সম্ভাব্য অনুসরণ ছিল মনে হয়। তথাপি তাঁর দৃশ্যাঙ্কনে বাংলাদেশ ও বাঙালির প্রতিকৃতি প্রাধান্য পেয়েছিল। এর পর বাংলা নাট্যমঞ্চের দৃশ্যসজ্জায় পরিবর্তন আনেন ধর্মদাস সুর। ধর্মদাস ১৮৭২ সালে ৭ই ডিসেম্বরে অভিনীত ‘নীলদর্পণ’ নাটকের মঞ্চসজ্জার হাতেখড়ি দিয়েছিলেন. এই মঞ্চের পিছনে ছিল কাপড়ের ওপর হাতে আঁকা দৃশ্যপট। এই দৃশ্যপট বা সীনগুলো ওপর থেকে পর পর ঝোলান থাকত। দৃশ্যের প্রয়োজন অনুযায়ী তোলা নামানো হত সেগুলো। তারপর এই আঁকা সীনগুলির সঙ্গে দুপাশে টরমেন্টার এঁকে তার মধ্যে একটু ডাইমেনসন আনার চেষ্টা হয়েছিল। ক্রমে ওই সব কাপড়ে আঁকা স্থিরচিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গাতি রেখে কিছু কিছু আসবাব ব্যবহার করা হত। এরপর ওই স্থির দৃশ্যপটের সঙ্গে যুক্ত করা হল ফ্ল্যাট সীন। কাঠের ফ্রেমের

ওপর টান করে কাপড় লাগিয়ে তার ওপর ছবি আঁকা হত। এর সঙ্গে দুটো ফ্রেম তৈরি করা হত। দুদিক থেকে ঠেলে জুড়ে দিলে একটা দৃশ্যপট হয়ে যেত। একেই বলা হত ঠেলা সীন। আবার দৃশ্য শেষ হয়ে গেলে দুপাশে টেনে নিয়ে যাওয়া হত।

এই অবস্থাকে মেনে নিয়ে মঞ্চে এলো প্যানোরামা পদ্ধতি। কিন্তু ১৮৯৭ সালের আগে নতুন কোনো পদ্ধতি মঞ্চসজ্জার ক্ষেত্রে দেখা গেলনা। ১৮৯৭ সালে অমর দত্ত রঙ্গামঞ্চে এক বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন। ক্লাসিক থিয়েটারে তাঁর প্রথম প্রযোজনা 'নলদময়ন্তী'। 'নলদময়ন্তী' নাটকের বিজ্ঞাপনের একটুখানি তুলে দিলে আমাদের বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যাবে।

"নলদময়ন্তী—Splendid Lotus Scene!

একটি ক্ষুদ্র পদ্মকোরক হইতে দলে দলে অপ্সরীগণ বহির্গত হইয়া পদ্মে পদ্মে দাঁড়াইয়া নৃত্যগীত করিবে।"

এই ক্লাসিক থিয়েটারের আমল থেকে দৃশ্য সজ্জায় কাট আউটের ব্যবহার। সেট সীন, নকল আসবাবপত্রের পরিবর্তে আসল বস্তু দৃশ্যসজ্জায় এসে গেল। যেমন, আসল খাট, আয়না, চেয়াল-টেবিল ইত্যাদি।

মঞ্চ এবং মঞ্চপরিকল্পনায় আমূল পরিবর্তন ঘটালেন শিশির ভাদুড়ী। তিনি নাট্যমঞ্চে দুটি যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটালেন। (১) পাদপ্রদীপ বা ফুটলাইট তুলে দিলেন। (২) উইংস বা পার্শ্বপট নামক কৃত্রিম এবং অস্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথকে রঙ্গমঞ্চ থেকে চিরকালের জন্য নির্বাসন দিলেন। প্রথমটি সম্পর্কে আমরা নেপথ্যবিধানের অন্যতম অঙ্গ, আলোকসম্পাতের প্রসঙ্গে আলোচনা করব। এখন উইংস বা পার্শ্বপট প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাক।

কলকাতায় ইংরেজদের নাট্যাভিনয়ে ব্যবহৃত মঞ্চের অনুসরণে বাংলা রঙ্গামঞ্চে দৃশ্যপট হিসেবে অঙ্কিত পশ্চাৎপট ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। প্রসেনিয়াম মঞ্চে তখন থেকেই উইংসের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উইংস মঞ্চের দুপাশে থাকত। দুটি উইংস বা পার্শ্বপটের মধ্যবর্তী স্থান দিয়ে শিল্পীরা মঞ্চে আসত এবং প্রস্থান করত। এই ব্যবস্থা যখন দৃশ্য সংস্থাপনায় কাট-আউট দৃশ্য সংবলিত সেট সীনের ব্যবহার চালু হল তখনও প্রচলিত ছিল। কিন্তু শিশিরকুমার ভাদুড়ী দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট ডাইমেনসনাল বা মাত্রাবিশিষ্ট মঞ্চের প্রবর্তন করবার সঙ্গে সঙ্গে পার্শ্বপটের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করলেন। তার ফল মঞ্চে শিল্পী পেলেন প্রবেশ প্রস্থানের স্বাভাবিক পথ। মঞ্চ হয়ে উঠল আরো বাস্তব এবং জীবন্ত। বাস্তব এবং জীবন্ত বলা হচ্ছে এই কারণে যে, একটি ঘর দেখান হচ্ছে মঞ্চে নিশ্চয় তার দরজা থাকবে। একটা বাইরের, আর একটা ভেতরে যাওয়ার। শিল্পীরা ডাইমেনশনাল মঞ্চ পেয়ে প্রবেশ ও নিষ্ক্রমনের স্বাভাবিক পথ ব্যবহার করার ফলে মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তবঘেঁষা হয়ে উঠল। এছাড়া শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে খোলা আকাশ দেখাবার ব্যবস্থাও করেছিলেন, তবে অত্যন্ত জটিল পদ্ধতিতে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী ডাইমেনশনাল মঞ্চ তৈরি করে মঞ্চ স্থাপত্যে অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তার পূর্ববর্তীকালে প্রচলিত প্রসেনিয়াম মঞ্চকে সাধারণত ফ্লাট মঞ্চ বা সমতল মঞ্চ বলা হয়ে থাকে। এই সমতল চতুষ্কোণ বিশিষ্ট মঞ্চকে একমাত্রিক মঞ্চও বলে যেতে পারে। এই একমাত্রিক বা One dimensional মঞ্চকে

দ্বি-মাত্রিক (two dimensional) বা ত্রি-মাত্রিক (three dimensional) মঞ্চ করা যায়। একসঙ্গে যেখানে দুধরনের বা তিন ধরনের অভিনয় দেখাবার প্রয়োজন সেখানে এইরকম মঞ্চ একান্ত অপরিহার্য। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের যে মঞ্চ পরিকল্পনার নির্দেশ নাট্যকার দিয়েছেন তা দ্বিমাত্রিক মঞ্চ বা two dimensional মঞ্চ পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেয়—

> শহরের রাজপথ। পাশেই এক ধনীর আবাসভবন। সামনের ফটক দিয়ে যাচ্ছে সুবেশ পুরুষ ও মহিলারা ঢুকছেন বেরুচ্ছেন। ফটকের ভেতরে ঢুকতে ডাইনে বাঁয়ে সারবন্দী ভেনেস্তা কাঠের চেয়ারগুলোর গা বেয়ে যেন বিজলি বাতির আলো চুঁইয়ে পড়ছে। অন্দরমহল থেকে সানাই-এর সুর কেঁদে কেঁদে উঠছে—আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে। হাসির লহরী তুলে কলহাস্যমুখর একদল তরুণী যেন এক ঝাঁক প্রজাপতির মতোই উড়ে বেরিয়ে গেল ফটকের ভেতর দিয়ে। ফটকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সপারিষদ বাড়ির বড়োকর্তা। অভ্যাগতদের আপ্যায়ন করেছেন এই যে আসুন—বসুন।' তাঁর পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দশ বারো বৎসরের একটি ফুটফুটে মেয়ে, হাতে তার এককাঁড়ি বেলকুঁড়ির মালা। এই গেল মঞ্চের ডানদিকের ব্যাপার। আর মঞ্চের বাঁ দিকের এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে একটা ডাস্টবিন—অস্পষ্ট। কুঞ্জ ও রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট কলাপাতার স্তূপ ঘেঁটে আহার্য সন্ধান করছে। কিন্তু আলোর অস্পষ্টতার দরুণ ওদের কাউকেই ভালো করে ঠাহর করা যাচ্ছে না।

এই নির্দেশ থেকে two dimensional মঞ্চ স্থাপত্যের ইঙ্গিত বেরিয়ে আসে। শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটকে প্রথম মঞ্চ স্থাপত্যে এই ধরনের নতুনত্ব সৃজন করেছিলেন। 'সীতা' নাটকের একটি দৃশ্যে দেখাতেন, প্রাসাদ অঙ্গনে উঁচু স্থানে প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা, নিম্নস্থানে জনসাধারণ, সকলের ওপরে অলিন্দে উপস্থিত অন্তঃপুরচারিণীরা, কেউ উপবিষ্ট, কেউ দণ্ডায়মান, কেউ চলমান এবং সকলেই অভিনয়ে রত। কেউ হাবেভাবে, কেউ ভাষায়। স্পষ্টত, ত্রিমাত্রিক মঞ্চ ব্যবস্থার ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে।

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর 'দিগ্বিজয়ী' নাটকের একটি মঞ্চ পরিকল্পনা এখানে তুলে দেওয়া হল। এই নাটকটি সামগ্রিক প্রয়োগ কুশলতায় বঙ্গারঙ্গামঞ্চে অতুলন। প্রথমে যে তাঁবুর দৃশ্য দেখান হয়েছে তা প্রেক্ষাগৃহকে সচকিত করে তোলে। পুরো মঞ্চ পীঠের আয়তন জোড়া একটি কাঠের ফ্রেমে দরবার, তাঁবুর অনুকরণে ছাপানো কাপড় হুক দিয়ে ঝুলিয়ে অভ্যন্তরভাগ তৈরি করা হয়েছিল। পেছনে প্রবেশপথ এবং তার দুধারে (দর্শনানুপাত) অনুযায়ী অন্যান্য তাঁবুর অংশ তৈরি করা হয়েছিল। তাঁবুর পিছনে মোতায়েন রক্ষীবাহিনী টহল দিচ্ছে। কিংবা, দিল্লীর রাজপথ পিছনে রেখে জুম্মা মসজিদের চত্বরের দৃশ্য—যেখানে সামনে পিছনে অস্থির পদচারণা করতে করতে নাদির শাহ দিল্লী ধ্বংস করেছিলেন। 'কোতল' 'কোতল' বজ্রনিনাদ আর জনতার আর্তকোলাহলের সঙ্গে দিল্লীর অগ্নিদগ্ধ হওয়ার দৃশ্য অবিস্মরণীয়। শ্রীশম্ভু মিত্র বলেছেন, 'দিগ্বিজয়ী' না দেখলে, তিনি 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্য কল্পনা করতে পারতেন না। এই প্রসঙ্গে 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্যের মঞ্চ ব্যবস্থায় নাট্যকারের নির্দেশটুকু তুলে দেওয়া হল—

> দিনাবসানে চরাচর আচ্ছন্ন করে দুর্গত পল্লীর বুকে নেমে আসছে রাত্রি। মঞ্চ প্রায়ান্ধকার। সুদূরের পটভূমি রক্তিম। অস্পষ্ট আলোকে কচ্ছপের পিঠের খোলার আকৃতি একটা মালভূমির ওপর ছায়ামূর্তির মতো দু-চারজন লোকের

আনাগোনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই দুটো লোক ত্রস্ত অথচ সন্তর্পণে ঢুকে কী যেন সব ফিসফিসিয়ে বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে আবার বেরিয়ে চলে গেল। একটু পরেই আবার এসে ঢুকল যেন আরও কারা। কী সব কথা ফিসফিস করে বলে কয়ে চলে গেল। ছায়ামুর্তিগুলোর হাত-পা নাড়া ও কথা বলার বলিষ্ঠ ধরনে মনে হচ্ছে যেন কী একটা ভীষণ চক্রান্ত চলছে ওদের মধ্যে। হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি। আগুনের আভায় মালভূমির ওপরকার দুটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি এবার সুস্পষ্ট হয়ে উঠল দুচোখের সামনে। কালো চেহারার বলিষ্ঠ দুজন লোক। একজন প্রৌঢ়ত্বের ওপারে পৌঁছেছে : আর একজনের বয়স কম—গোটা ত্রিশ-বত্রিশ। খালি গা, হাঁটু পর্যন্ত কাপড় গোটানো, হাতে গাছলাঠি—শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ফুলে উঠেছে উত্তেজনায়।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় শ্রীশম্ভু মিত্র যথার্থ কথা বলেছেন :

শিশিরকুমার ভাদুড়ীর ‘সীতা’ এবং ‘দিগ্বিজয়ী’ নাটকে মঞ্চের ওপর যে স্বাভাবিক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল তা আরো বাস্তব আরো সহজ হয়ে এলো ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৩ সালে রঙ্গমহলে ‘মহানিশা’ নাটকে সতু সেন প্রথম রিভলভিং বা ঘূর্ণায়মান মঞ্চ তৈরি করে বক্স-সেটের ব্যবহার করলেন।

এরপর মঞ্চ ব্যবস্থার রীতি আরো সহজ ও সরল হয়ে এলো ১৯৪৪ সালে গণনাট্য সংঘের ‘নবান্ন’ নাটক প্রয়োজনায়। মঞ্চের ওপর কেবল মাত্র গোটাচারেক চট ঝুলিয়ে দিয়ে তাকেই দৃশ্যানুযায়ী একটু আধটু পরিবর্তন করে ঘর বার দুই দেখান হয়েছিল।

প্রসেনিয়াম দর্শক ও নাট্যাভিনয় ক্ষেত্রে অভিনয়কারী কুশীলবের মধ্যেকার একটা অস্বাভাবিক অবরোধ। সুতরাং এই অবরোধ উঠে গেলে নাটক ও দর্শক এক ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের স্তরে এসে পৌঁছতে পারবে। এই ব্যবস্থাকে আরো ত্বরান্বিত করেছিল ঘূর্ণায়মান মঞ্চ। তবে এই কাজে আরো অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আলোকসম্পাতের ব্যবস্থা।

গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের মধ্যে নিয়ে যাওয়া। তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ অত্যাচার নিপীড়ন বঞ্চনার কাহিনী জনসমক্ষে তুলে ধরা এবং যারা তাদের দুঃখ, বেদনা, বঞ্চনার কারণ তাদের প্রতি তীব্র প্রতিবাদ জানান অর্থাৎ প্রতিবাদের নাটক বা Drama of Protest গড়ে তোলবার ইচ্ছা। শহরাঞ্চলের স্থবির মঞ্চের বাইরে উন্মুক্ত আকাশের তলে, মুক্তাঙ্গনে নাটককে নিয়ে যেতে হবে। তা করতে গেলে আয়েজানবহুল মঞ্চকে হালকা করে ফেলতে হবে। সেই সঙ্গে সমস্ত কিছুকেই সহজ সরলীকরণ করে নিতে হবে। সহজ ও সরলীকৃত হওয়ার প্রবণতা যে রঙ্গামঞ্চের মধ্যে নিহিত আছে, নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী তা বুঝেছিলেন, তাই তিনি নাট্যমঞ্চ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করে গেছেন। শিশির ভাদুড়ী যে দৃষ্টিভঙ্গিটির আভাস রেখে গিয়েছিলেন, গণনাট্য সংঘের কর্মীরা সেই ইঙ্গিতটুকু অবলম্বন করে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনয়নে সচেষ্ট হলেন। গণনাট্যের নাট্যকর্মীরা চল্লিশের দশকে পেশাদারী নাট্যমঞ্চের বাইরে নাটককে নিয়ে যাওয়ার জন্য গ্রহণ করেছিলেন অগ্রণী ভূমিকা। তার জন্য রঙ্গামঞ্চের প্রচলিত ব্যবস্থাকে ভেঙে সহজ সরল করে নেওয়ার জন্য ব্যাপক চিন্তা-ভাবনা সুরু করেছিলেন।

গণনাট্য সংঘ প্রযোজিত ‘নবান্ন’ নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনার রীতিতেই পরবর্তীকালে বাংলা রঙ্গামঞ্চে

এসেছে 'সাজেসটিভ' মঞ্চ। 'নবান্ন'র হাত ধরে সাজেসটিভ রিয়ালিজমের হাওয়া বাঙলা রঙ্গমঞ্চে এসে বাঙলার পেশাদার রঙ্গমঞ্চগুলিকে নাজেহাল করে তোলবার চেষ্টা চালিয়েছে। আর তার জন্যই মঞ্চ ছড়িয়ে পড়তে পেরেছে শহরে, গ্রামে যত্রতত্র। এই রীতিতে শুধুমাত্র একটা কালো পর্দার সামনে গুটিকয়েক আসবাব দিয়ে কিংবা তার বদলে কাঠের বাক্স সাজিয়ে সাজেসটিভ সেটে নানা পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হচ্ছে। তার ফলে নাটকের সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, নাটক হয়ে উঠছে মানুষের জীবন সংগ্রামের হাতিয়ার। একাজে অবশ্য আর একটা নেপথ্য বিধান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে তার নাম আলোকপাত। পরে সেই আলোকসম্পাতের বিবর্তনের চেহারাটা সুস্পষ্ট করে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

মঞ্চ-আলোকসম্পাত—আবহসংগীত :

এখন মঞ্চে আলোকসম্পাত ধ্বনি এবং আবহসংগীত প্রভৃতি নাট্যাভিনয়ের বিশিষ্ট অঙ্গগুলির যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়। 'নবান্ন' নাটকের ক্ষেত্রেও এগুলির ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন আছে। আধুনিক বিচারে এগুলিও নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। নাটককে মনোজ্ঞ করে তুলতে, নাটককে রসগ্রাহী করে তুলতে গেলে এদের ভূমিকা অপরিসীম। রঙ্গমঞ্চের নেপথ্যে পশ্চাৎপটে যে আর এক ধরনের অভিনয়, অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে সমান্তরালভাবে চললে নাট্যাভিনয় একটি নিটোল রসরূপ পায়, তার একান্ত ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হল ঐগুলি। 'নবান্ন' নাটককে নিটোলত্ব দান করেছে মঞ্চব্যবস্থা, আলোকসম্পাতের নতুনত্ব এবং আবহসংহীতের অভিনব আয়োজন। অতএব এ সম্পর্কে কিছু জানার দরকার আছে।

নেপথ্যবিধান ও 'নবান্ন' নাটক :

নাট্যাভিনয় বা থিয়েটারের দুটি অংশ : (১) প্রত্যক্ষ অভিনয়, (২) নেপথ্য অভিনয়। নট-নটী অভিনেতা অভিনেত্রীদের সংলাপ ও অঙ্গভঙ্গি সহযোগে অভিনয় মঞ্চে ঘটতে থাকে। আর এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাঙ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলবার জন্য নেপথ্য অভিনয়ের অপরিহার্যতা সর্বজনস্বীকৃত। এই দ্বিতীয় অভিনয় বা নেপথ্য অভিনয়কে নেপথ্যবিধান বলে। নেপথ্যবিধান অভিনয়ের সঙ্গে একান্ত প্রয়োজনীয় এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ সঙ্গতিসম্পন্ন এবং ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পর্কিত। উভয়ে সুসঙ্গত সহযোগিতায় নাটকে বাঞ্ছিত রস সৃষ্টি হয়। 'নবান্ন' নাটক শুধু কাহিনীগত গতানুগতিকতার বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়নি, মঞ্চ সজ্জায়, আবহসংহীতে এবং আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন আনয়ন করেছিল, যা গণনাট্য সংঘের এক লক্ষণীয় প্রচেষ্টা। পেশাদার মঞ্চ পরিকল্পনার বাইরে নাটককে গণনাট্যকে রূপান্তরিত করে যে পরিবর্তন সূচিত করেছিল, আজও সেই প্রবাহে পরবর্তী নাট্য আন্দোলন প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

আলোকসম্পাত ও 'নবান্ন' :

ভারতবর্ষ, কি ভারতবর্ষের বাইরে যে সমস্ত নাট্যাভিনয় প্রাচীনকালে করা হত তা বস্তুত হত দিনমানে। তখন মঞ্চে আলোকের উৎস ছিল সূর্য। উন্মুক্ত আকাশের তলে তখন অভিনয়পর্ব চলত, সূর্য নামক একটি আলোক উৎসের অজস্র রশ্মিপুঞ্জ রঙ্গমঞ্চে অপর্যাপ্ত আলো সরবরাহ করত। কিন্তু নাট্যাভিনয় যে দিন থেকে

উন্মুক্ত আকাশ পরিত্যাগ করে প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে এসে পড়ল, সেদিন থেকে স্বাভাবিক আলোক উৎস থেকে রশ্মি সরবরাহ ব্যবস্থায় বাধা পড়ল। তখন থেকেই আলোর অস্বাভাবিক প্রয়োগকৌশলে নাট্যমঞ্চ যেন কথা বলে উঠল, এক নতুনতর প্রাণবন্ত অভিব্যক্তিতে চনমন করে উঠল।

প্রথমে প্রেক্ষাগৃহ বিশিষ্ট রঙ্গমঞ্চে আলো সরবরাহ করত মোমবাতি কিংবা তেলের বাতি। এই মোমবাতি কিংবা ল্যাম্পের আলো সামনে থেকে পড়ত মঞ্চের ওপরে। তারপরে এলো গ্যাসের আলো। গ্যাসের আলোই ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের উৎস। অর্থাৎ ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ ব্যবহার রঙ্গমঞ্চে দেখা গেল গ্যাসের আলো আসবার পর থেকে। তারপর শহরে বৈদ্যুতিক আলো আসবার সঙ্গে সঙ্গে শহুরে সভ্যতায় ঘটে গেল এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সেইরকম বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে দেখা গেল রঙ্গামঞ্চেও। এই আলো সব কিছুই অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই দর্শকের সামনে তুলে ধরল।

বাংলা রঙ্গামঞ্চেও এবম্বিধ পরিবর্তন এলো। গণনাট্যের 'নবান্ন' নাটকে আলোকসম্পাতের একটা দারুণ শিল্পসম্মত সুযোগ আছে। আলোর এই শিল্পসম্মত প্রয়োগ না হলে 'নবান্ন' নাটক অত জীবন্ত হয়ে উঠতে পারত না। ছেঁড়া চটের টুকরো দিয়ে মঞ্চসজ্জা চলে, কিন্তু আলোর প্রয়োগকৌশল আরোপিত না হলে ছেঁড়া চট চটই থেকে যায়। মঞ্চমায়া সৃষ্টি হয়না। এই নাটকের কোনো কোনো স্থানে প্রতীকধর্মী পরিবেশ সৃজনে আলো অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তার ফলে 'নবান্ন' হয়ে উঠেছে বাস্তবের জীবন্ত নাট্যরূপ।

আলো কেমনভাবে নাটকে এত জীবন্ত বাস্তবের প্রতিরূপ গড়ে তোলে তা বিশ্লেষণ করে দেখা যেতে পারে।

বৈদ্যুতিক আলো ব্যবহারের সময় থেকে বাংলা নাটকের প্রয়োগরীতিতে সংযোজিত হয়েছে অভিনব এক অধ্যায়। আদিতে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপের ব্যবহার হত। রঙ্গামঞ্চের সামনের দিকে প্রান্তিক অঞ্চলে একফুট উঁচু করে ফুটলাইট বসানো হত। এর ফলে তার থেকে বিচ্ছুরিত রশ্মিপুঞ্জ অভিনেতা অভিনেত্রীদের ওপর পড়ে সৃষ্টি করত একটা প্রস্থায়া। সেই ছায়া পশ্চাঋপটের ওপর পড়ে একটা কিম্ভুতকিমাত্রার পরিবেশ তৈরি করত। ফলত দর্শক মনে সামগ্রিক ইম্পেশন সৃষ্টিতে বাধা হত। তাই প্রথমে প্রয়োজন হল পশ্চাৎপটের এই ছায়া দূর করবার। তাই প্রসেনিয়ামের পিছনে টাঙনো দু'ফুট চওড়া ঝালর (যেটি রঙ্গপীঠের ওপর থাকত)-এর অন্তরালে জ্বালান হত বালবের ছড়ি। এইভাবে চতুর্দিক আলোয় ঝলমল করে ওঠবার ফলে ছায়া স্পষ্ট হয়ে পশ্চাৎপটে পড়তে পারলনা। প্রচ্ছায়া ভুতটা রঙ্গামঞ্চ থেকে বিদায় নিল।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী 'সীতা' নাটক প্রযোজনা কালে ফুটলাইট বা পাদপ্রদীপ তুলে দিলেন। পাদপ্রদীপ তুলে দেওয়ার যুক্তিগ্রাহ্য কারণগুলো এইরকম—দিবাভাগে সূর্য পূর্বাকাশে ওঠে। সারাদিন ভূপ্রদক্ষিণ করে অপরাহ্নবেলায় পশ্চিমাকাশে অস্ত যায়। রাত্রে চাঁদ থেকে শুরু করে ইলেকট্রিকের আলো, গ্যাসের আলো প্রভৃতি সবই ওপর থেকে পড়ে, নয়তো আসপাশ থেকে পড়ে। আলোকরশ্মি প্রক্ষেপণের এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। এই স্বাভাবিক নিয়মে শিশির ভাদুড়ী মঞ্চে আলোক ক্ষেপনের ব্যবস্থা করলেন, তাই তিনি তুলে দিলেন ফুটলাইট, আমদানী করলেন ফ্লাডলাইট, স্পটলাইট। সাধারণভাবে সমস্ত মঞ্চ আলোকিত করবার জন্য ফ্লাডলাইট। পার্শ্বলাইট থেকেও আলো সরবরাহ করা যেতে পারে। আর কোনো বিশেষ স্থান, বিশেষ

মুখ বা অবয়ব বা অভিব্যক্তিকে স্পষ্ট করে তোলবার জন্য তিনি ব্যবহার করলেন স্পটলাইট। স্পটলাইট হল তাই—যা নির্দিষ্ট কোনো অংশ বা স্থানকে আলোকিত করতে পারে। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে আলোক নিক্ষেপণ যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত হল ডিমার বা ধীরে ধীরে আলো বাড়াবার কমাবার যন্ত্র।

এই ব্যবস্থার গুরুত্ব এই যে হঠাৎ আলো জ্বলল এবং তীব্র আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হল বা হঠাৎ আলো নিভে গেল, এতে মঞ্চের স্বাভাবিকতা নষ্ট হয় এবং অভিনেতার অভিব্যক্তির ক্রমবিলীয়নাম রূপটা ঠিকভাবে ফু উঠে অভিনয়কে ব্যঞ্জনার পর্যায়ে নিয়ে যেতে বাধা প্রদান করে। ধরা যাক 'নবান্ন' নাটকের একটি দৃশ্য, যেখানে কুঞ্জর হাতে কুকুরটা কামড়ে দিয়েছে। সেই রক্তাক্ত কম্পিত হাতটা নিয়ে যে যন্ত্রণাকাতর মুখে রাধিকার দিকে এগিয়ে আসছে। তারপর রাধিকা নিজের পরনের কাপড় ছিঁড়ে তা দিয়ে হাতের ক্ষতস্থানটা বেঁধে দিচ্ছে এবং একসময় দুজনে দুজনার মুখের দিকে গভীর প্রেম ও মমতাঘন দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। উভয়ে উভয়ের দিকে তাকিয়ে আর আলোটা একটু একটু করে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এই অংশে পাত্রপাত্রীর মুখে কথা নেই, কিন্তু আলো এই অংশে কথা বলছে। বেদনাঘন মুহূর্তটা দর্শক মনের পরতে পরতে গেঁথে দিয়েছে। এখানে স্পটের সঙ্গে ডিমার যদি না থাকত, তাহলে আলোটা দপ করে নিভে যেত। শেষ, মুহূর্ত পর্যন্ত কুঞ্জ রাধিকার উদ্বেল হৃদয়ের রক্তক্ষরণ দেখান সম্ভব হত না, যা তাদের নীরব দৃষ্টির অশ্রুক্ষরণের মধ্যে দিয়ে দর্শক মনের প্রত্যন্ত প্রদেশের নিস্তরঙ্গতায় বেদনার তরঙ্গকে উদ্বেল করে তুলছে। একাজ করেছে ডিমার যুক্ত স্পটলাইট। এতএব স্পটলাইট আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র।

এরপর আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে আরো বহু পরিবর্তন ঘটে গেছে। এই পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সতু সেন। সদ্য আমেরিকা থেকে ফিরে তিনি পেশাদার রঙ্গালয়ের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন। আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রে সতু সেন বিস্ময়কর পরিবর্তন আনলেন, নাট্যনিকেতন মঞ্চে 'ঝড়ের রাতে' নাটকে। বৈজ্ঞানিক কলাকৌশলের সাহায্যে রঙ্গমঞ্চে ঝড় বৃষ্টি বিদ্যুৎ ইত্যাদি খুব বাস্তব রূপে তিনি ফুটিয়ে তোলেন। রঙমহলে 'স্বামী স্ত্রী' নাটকে কয়লার খনির যে দৃশ্য দেখান হয়েছিল তা দর্শকদের বিশেষ ভাবে চমৎকৃত করে। পরবর্তীকালে তাপস সেনের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

আলোর এই বিস্ময়কর চাতুর্য অবশ্য ঘটেছিল বাঁধা মঞ্চগুলিতে, যা পেশাদার মঞ্চ বলে চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু পেশাদার মঞ্চের বাইরে মঞ্চ তৈরি করে সেখানে আলোর খেলা দেখাবার কৃতিত্ব বোধহয় গণনাট্য সংঘের। এখানে 'নবান্ন' নাটকে আলো কি রকম প্রতীকধর্মী অভিনয় করেছে তার একটু পরিচয় নেওয়া যাক। দ্বিমাত্রিক মঞ্চে দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যের অভিনয় চলেছে। বিয়ে বাড়ি, ফটকের ভেতর দিয়ে বাড়ির মধ্যে যাওয়ার রাস্তা। দু'পাশে চেয়ার পাতা, সেখান দিয়ে লোকজন ভেতরে যাচ্ছে, ভেতর থেকে আসছে, একপাশে বাড়ির কর্তা এবং তার সাঙ্গপাঙ্গদের কথাবার্তা চলছে। এখানে আলো খুব উজ্জ্বল। অর্থ, বৈভব, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য আর উৎসবের উদ্দাম আনন্দের সঙ্গে আলো এখানে যথেষ্ট সঙ্গতিসম্পন্ন। ঠিক এরই একপাশে রাস্তা, একটা ডাস্টবিন, সেখানে কুকুর আর মানুষের সহাবস্থান। উভয়ে ডাস্টবিন ঘেঁটে খাদ্য সংগ্রহে ব্যস্ত। এখানে আলো অল্প। নাট্যকার তারই নির্দেশ রেখেছেন। নাট্যকারের নির্দেশ থেকে একটা তাৎপর্য বেরিয়ে আসে, এই সব গরীব ভিখিরি মানুষগুলোর জীবনে সুখ নেই, স্বাচ্ছন্দ্য নেই, তাই আলোও নেই। নৈরাশ্য

আর অসহায়তার তমিস্রায় তাদের জীবন আচ্ছন্ন। সুতরাং এখানে উজ্জ্বল আলো একান্ত অপ্রয়োজন। স্পটলাইটের স্বল্পালোকে তাদের সামাজিক অবস্থানের প্রতীকধর্মী মঞ্চরূপ গড়ে উঠেছে। এই দৃশ্যে দুই স্তরের মানুষের সামাজিক অবস্থান নির্দেশে আলো এখানে প্রতীকধর্মী ভূমিকা পালন করেছে।

অবশ্য আলো ছাড়া আরো একটি বস্তু নাটকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, তা হল আবহসংগীত। যেটি নেপথ্য বিধানের তৃতীয় বস্তু। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে, নাটকের পরিভাষায় আবহসংগীতের অর্থ এইভাবে করা যায় যে, নাট্যাভিনয়কালে দর্শকদের দৃষ্টির অন্তরালে কৃত অভিনয়ের ঘটনার অনুসঙ্গী সংগীত, ইংরাজীতে যাকে background music বলে। আবহসংগীতের আভিধানিক অর্থও তাই। সংগীত নাটকের পাত্রপাত্রীর অভিনয় দ্বারা সৃষ্ট পরিবেশকে আরো বেশি জীবন্ত, মর্মস্পর্শী করে তোলে, বা অভিনয় করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে যে সংগীত তাকে আবহসংগীত বলা হয়। 'নবান্ন' নাটক থেকে একটা উদাহরণ দেওয়া হচ্ছে। দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য। বিবাহ বাড়ি, মঞ্চসজ্জা, পাত্রপাত্রীর সাজসজ্জা এবং তাদের সংলাপের মধ্যে দিয়ে বোঝবার পক্ষে কোনো অসুবিধা নেই যে দৃশ্যটা বিবাহের। তাহলেও নাট্যকার নির্দেশ দিলেন যে, এখানে সানাই-এ 'আশাবরীর আলাপ চলেছে বিলম্বিত তানে'। এর কারণ এটাই বিবাহের অনুষ্ঠানে সানাই-এর একান্ত অপরিহার্য 'রাগ'। অর্থাৎ কথাটা এই দাঁড়াল যে পরিবেশ সৃষ্টি। উক্ত দৃশ্যকে বাস্তবধর্মী করে তোলবার জন্য এটি একটি স্বাভাবিক প্রয়াস।

কিন্তু প্রশ্ন, যে দৃশ্যে নাট্যকারের নির্দেশ নেই, সেখানে কি তাহলে আবহসংগীত হবে না? যেমন ধরা যাক, কুঞ্জর রক্তাক্ত হাত দেখে রাধিকা চমকে 'ওমা একেবারে কামড়ে খেলে গো' বলে সে সংলাপটা উচ্চারণ করল, এখানে ওই চরিত্রের আতঙ্কিত হওয়া, পরে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে, অনুরাগ রঞ্জিত হৃদয়ে 'ভারি পাজি কুকুর তো। কামড়ে দিলে গা।'—সংলাপ-অনুভূতি স্তরগুলিকে আরো হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের কি দরকার নেই? প্রথমে 'ওয়াইলড্‌লি' চিৎকার, তারপর রাধিকা যখন দেখে কুকুর অনেকখানি কামড়ে নিয়েছে তখন ত্রস্তে পরনের কাপড়টা ছিঁড়ে নিয়ে বেঁধে দিতে দিতে অসহায় বোধ নিয়ে বলে, 'ওমা আমার কি হবে গো' বা গভীর মমতায় 'খুব যন্ত্রনা হচ্ছে, না! জল এনে দেব জল? একটু জল খাবে?' প্রভৃতি উচ্চারণ সংবেদনশীল হৃদয়ের অনুভূতিকে গভীরতম তলে পৌঁছে দেয়। এটিকে প্রকাশ করতে নিঃসন্দেহে অভিনেত্রীর অসাধারণ অভিনয় ক্ষমতার দরকার, এর জন্য প্রয়োজন স্বরগ্রামে—এই খেলা অতিসাধারণ অভিনেত্রীর পক্ষে সম্ভব হবে না। এটা যেমন অভিনেত্রীর ক্ষমতার ওপর অনেকটা নির্ভরশীল, ঠিক তেমনই আবহসংগীত অভিনেত্রীকে অনেক বেশি সাহায্য করে দর্শক হৃদয়ে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার জন্য। আর একটি জায়গা, প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য, প্রতিবেশী দয়াল প্রধানের বাড়ি থেকে চাল চেয়ে নিয়ে গেছে অভুক্ত স্ত্রী রাঙার মাকে খাওয়াবার জন্য। কিন্তু গিয়ে পৌঁছানর পূর্বেই বন্যা অতর্কিতে আক্রমণ করে নিয়ে গেছে সকলকে ভাসিয়ে, বিপর্যস্ত, ক্ষতবিক্ষত সর্বহারা দয়াল এর পর উন্মাদের মতো ছুটে আসছে কুঞ্জর কাছে বাইরে থেকে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক দিতে দিতে।

(নেপথ্যে 'কুঞ্জ কুঞ্জ' ডাক)

কুঞ্জ। (উৎকর্ণ হয়ে) য়্যাঃ ... কুঞ্জ! ... কে!

[উন্মত্ত অবস্থায় দয়ালের প্রবেশ]

দয়াল। কুঞ্জ, কুঞ্জ, কুঞ্জ।

কুঞ্জ। দয়ালদা। কী হয়েছে দয়ালদা?

দয়াল। (কোঁচড়ের চাল হাতে নিয়ে) এই যে কুঞ্জ, তোর, তোর সেই চাল ক'টা। তোর সেই চাল ক'টা।

কুঞ্জ। (বিস্মিতের ভঙ্গিতে) দয়ালদা! দয়ালদা!

দয়াল। (স্বপ্নোত্থিতের মতো) য়্যাঁঃ, কোনো কিছু ছিল নাকি আমার কোনো দিন? ছিল কি কেউ? কোথায় গেল! আমার কি কিছু ছিল না!!

কুঞ্জ। রাঙার মায়ের জন্যে যে তুমি।

দয়াল। রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙার মা, কোথায় গেল রাঙা! আমার ঘর, কোথায় গেল আমার ঘর! কুঞ্জ!!

প্রধান। দয়াল!!

দয়াল। প্রধান, সমুদ্দুর, চারদিকে শুধু সমুদ্দুর—জল আর জল, কিছু নেই শুধু জল...সমুদ্দুর উঠে এয়েছে গ্রামে। রাঙার মা, রাঙা, রাঙার মা রাঙার মা!!

ঝড়ের শব্দ—সাঁই সং.

দৃশ্যাংশটুকুর অভিনয় পুরোটাই আবহসংগীত নির্ভর। নাট্যকারের নির্দেশ থাক বা না থাক, অভিনেতা যতই ক্ষমতাসম্পন্ন হোন, দর্শক মনে গভীর ভাবে ছাপ ফেলবার জন্য এখানে আবহসংগীতের একান্ত ঘনিষ্ঠ এবং আন্তরিক সহযোগিতার খুব দরকার। কিংবা দ্বিতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে যেখানে রাধিকা কুঞ্জর হাত বেঁধে দিচ্ছে আর কাঁদছে—তারপর উভয়ে উভয়ে মুখেন্ন দিকে তাকিয়ে—এই অতি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আবহসংগীত তো এদের অব্যক্ত বক্তব্যকে, নিবিড় প্রেমের নিদারুণ বেদনাকে দর্শকের দরবারে পৌঁছে দেবে।

আবহসংগীত বলতে আমরা বুঝি এ্যাফেক্ট মিউজিক অর্থাৎ প্রভাব বিস্তারকারী সুরলহরীকে আর শব্দ সংযোজনাকেও এই অংশের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। 'নীলদর্পণে'র কথা ধরা যাক, যেখানে চারজন রাইয়ত হঠাৎ অফ ভয়েসে মজুমদারের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সেই মুহূর্তে মনে আতঙ্ক জেগে উঠল। আবহসংগীতের প্রভাব এখানে অনস্বীকার্য। অথবা, ক্ষেত্রমণির প্রতি রোগ সাহেবের অত্যাচার দৃশ্যে—আবহসংগীত ছাড়া এ দৃশ্যের অভিনয় চিন্তা করা যায়না। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম অঙ্কের পঞ্চম দৃশ্যের শেষাংশে—

হারু দত্ত। (কুঞ্জের মুখের ওপর লাঠি ঠুকে) বড় যে লম্বা-চওড়া কথা, উঁ? বড় যে—। (লাঠি ঠুকে) কেন, কারসঙ্গে কী কথা বলিস ঠিক থাকে না? উঁ, মনে থাকে না?

[অপমানহত কুঞ্জ গুমরে কাঁদে শিশুর মত]

প্রধান। মেরে ফেলোনি বাবা ওরে। বাবা, মেরে ফেলোনি। মেরে ফেলোনি।

২য় ব্যক্তি। এই ওপ্। (লাঠি খেয়ে প্রধান বসে পড়ে)

(কুঞ্জর কান্না আরও জোরালো হয়ে ওঠে। রুগণ মাখন তার সমস্ত শক্তি সংহত করে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যায় মাটিতে। ছুটে যায় বিনোদিনী, রাধিকা, প্রধান। মরণাহত

মাখনের মুখের ওপর গিয়ে সব হুমড়ি খেয়ে পড়ে।)

রাধিকা। হায় হায় হায় হায়, আমার সব গেল গো, সব গেল। ও মাখন, মাখন—

প্রধান। (বিনোদিনীর প্রতি) এট্টু, জল, জল আন। জল—

রাধিকা। ও মাখন, মাখন রে—

(আর্তকণ্ঠে মাখন গাঁইগুই শব্দ করতে থাকে)

প্রধান। মাখন, মাখন রে ে-ে-ঃ, —কুঞ্জ, দ্যাখ, মাখনরে একবার তুই দ্যাখ্।

(রাধিকা কেঁদে ফেটে পড়ে। ভয়বিহ্বল বিনোদিনীর চোখমুখ ভেঙে নেমে আসে একটা সমূহ বিপৎপাতের কালো ছায়া।)

কুঞ্জ। (মুখ তুলে মাখনের দিকে) য়াঁ, মাখন, মাখন...

প্রধান। মাখন চলে গেলি!

এই অংশে যেখানে সংলাপ আছে সেখানে তো বটেই, যেখানে সংলাপ নেই সেখানেও আবহসংগীত খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন না করলে পুরো ব্যাপারটা মর্মগ্রাহী হয়ে উঠতেই পারবে না।

অতএব নাটকে আবহসংগীত একান্ত অপরিহার্য একটি নেপথ্য বিধান। এই বিশেষ নেপথ্য বিধানটি নাট্যাভিনয়ের প্রথম দিকে বিশেষভাবে অবহেলিত ছিল। এটা নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ অঙ্গ হিসেবে দেখা হয়নি। তাই যত্রযত্র যেরকম সেরকম musical instrument ব্যবহার করা হত। তার যুক্তিসংগত কারণও ছিল। তখন পরিচালকরা অভিনয়ের ওপর জোর দিতেন, আর দর্শকরা অভিনয়টাই দেখতে যেতেন। তাই চরিত্রের মুখে নাট্যকাররা জুগিয়ে দিকেন অজস্র কথার বুনানী অর্থাৎ সংলাপ। অভিনেতৃবর্গ কণ্ঠস্বরের উৎক্ষেপণ—কম্পনের মধ্যে দিয়ে বিভিন্ন স্বরগ্রামে নিয়ে গিয়ে দর্শক মনে দাগ টানবার ব্যবস্থা করতেন। তাই আবহসংগীত ব্যাপারটা তখন নেহাতই গৌণ ছিল। সম্ভবত, সেই কারণে 'নীলদর্পণে'র মত নাটকের প্রথম অভিনয়ে চুনাগলির ফিরিঙ্গি কনসার্ট ব্যবহার করা হয়েছিল। তার জন্য সমকালীন সংবাদপত্রে এই বিসদৃশ সংগীত সংযোজনার যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনা করা হয়েছিল। অবশ্য প্রথম দিকে থিয়েটারে ফিরিঙ্গি কনসার্টই ব্যবহার করা হত। লেবেডফ তার নাটকে বিলিতি বাজনদারদের এনেছিলেন। কিন্তু মোট কথা, তখনকার দিনে নাট্যাভিনয়ে ফিরিঙ্গি কনসার্টের নিঃসপত্ন আধিপত্যকে অস্বীকার করা যাবেনা। পরবর্তীকালে নাট্যাভিনয়ে বীর, করুণ ইত্যাদি রস বোঝানোর জন্য, ক্লাইম্যাক্স বোঝানোর জন্য ঝাঝ, বেহালা ইত্যাদি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। তখন বেহালা, ক্লারিওনেট, বিভিন্ন পর্দার আড়বাঁশী, ছোট বড় নানারকমের ঝাঝই ছিল আবহসংগীতের উপকরণ।

নাট্যাভিনয়ে সুসংহত, সুপ্রযোজিত আবহসংগীতের প্রয়োগ করলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তার 'সীতা' নাট্যাভিনয় থেকেই প্রথম আরম্ভ হয় নাট্যক্রিয়াকে তীব্রতর এবং অভিনয়ের রস ঘনীভূত করে তোলবার জন্য আবহসংগীতের সুসংহত ব্যবহার। এই কাজ করবার জন্য তিনি তখনকার ব্রডকাস্টিং কপর্পোরেশনের বাংলা কর্মসূচীর অধ্যক্ষ অদ্বিতীয় ক্লারিওনেট বাদক নৃপেন মজুমদারকে ডেকে আনেন। 'স্বর্ণসীতা গড়বার প্রয়োজনে যখন ভারবাহীরা সোনার তাল বহন করছে নীরবে, তখনকার তীব্র বিরহ বেদনাসূচক আবহসংগীত আজও

আমার কানে বাজছে'—একথা বলেছিলেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়।

পরবর্তীকালে বাংলা নাটকের ক্ষেত্রে আবহসংগীত একটা আলাদা মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নাট্যাভিনয়ে নেপথ্য বিধানের এই অঙ্গটির অনুপস্থিতি আজ আর কল্পনা করা যায় না। বাচিক অভিনয় হোক, মুকাভিনয় হোক কিংবা অঙ্গাভিনয় হোক, আবহসংগীত সমান তালে চলতে থাকে। অভিনেতার বিভিন্ন মুডকে ব্যঞ্জনাময় করে তোলে। বিভিন্ন ভাষাহীন অভিব্যক্তির ভাষা প্রদান করে আবহসংগীত নাটকের একটা সামগ্রিক রসরূপ, শিল্পরূপ গড়ে তোলে। যা উপরিস্তরে ভাসমান থাকে, তাকে গভীর থেকে গভীর স্তরে নিয়ে গিয়ে একটা দাগ কেটে দেয়। অর্থাৎ কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে মনপ্রাণ আকুল করে তোলে। নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে আজ আবহসংগীতের নিঃসপত্ন আধিপত্য।

নাট্যসাহিত্যে সাধারণ নাট্যশালায় প্রথম শতকের ন্যূধিক শেষ দু'দশক নাট্যজগতের গৌরবজনক অধ্যায় বলে চিহ্নিত হতে পারে ঠিক, কিন্তু নেপথ্য বিধান সম্পর্কে অর্থাৎ মঞ্চ, আলো ও আবহসংহীত সম্পর্কে পথিকৃৎ হচ্ছে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাগত অপেশাদার গোষ্ঠী। তার মধ্যে প্রধান হল গণনাট্য সংঘ। 'নবান্ন' নাটকে 'গণনাট্য সংঘ' প্রত্যক্ষ ও নেপথ্য জগতের সুসংহত মেলবন্ধন ঘটিয়ে টীমওয়ার্ক ধর্মী নাট্য পরিবেশন রীতির প্রবর্তন করে—এ সম্পর্কে কেউ কেউ দ্বিমত পোষণ করতে পারেন বটে তবে কালের বিচারে তা গ্রাহ্য হবেনা। 'নবান্ন' নাটকেই প্রথম দেখা গিয়েছিল বস্তুনিষ্ঠ কাহিনী অতি প্রচলিত ভাষার রথে চেপে ধ্বনি, আলোক ও মঞ্চকৌশল সমন্বিত বাস্তবানুগ পরিবেষ্টনীর মাঝে খুবই বিশ্বাসগ্রাহ্যভাবে যাত্রা শুরু করে অতি সহজেই দর্শক হৃদয় জয় করে ফেলেছিল। সেদিনই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ বুঝেছিল অভিনয় জগতে একাধিপত্যের দাপট আর খাটবে না। তাকে টেক্কা দেবার মতো শিশু জন্মগ্রহণ করে গেছে। এখানেই গণনাট্য সংঘের আন্দোলন, এখানেই বিজন ভট্টাচার্যের নাটকের বিশেষত্ব। এখানে একান্ত বাস্তবধর্মী 'নবান্ন' নাটকের নেতৃত্ব। তাই বাংলা নাট্যসাহিত্যর ইতিহাস 'নবান্ন' নাটকটিকে একটি বিশেষ দৃষ্টিতে দেখা হয়। দেখা হয় এইজন্যে যে, এই নাটকের মধ্যে দিয়ে সূচিত হয়েছিল নাট্য আন্দোলন। জীবন ও গভীর জীবন প্রত্যয় যার বিষয়, জীবনের বাস্তবানুগ উপস্থাপনা যার লক্ষ্য। বক্তব্য মানুষের পক্ষে—খেটে খাওয়া মানুষের পক্ষে—শোষণ নিপীড়ন-এর বিরুদ্ধে।

৮৭.১৬ মূলপাঠ ৮ : 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যের তাৎপর্য

চতুর্থ অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্যের পর নাটকের 'যবনিকা' পাত ঘটেছে। এটিই শেষ দৃশ্য। এ দৃশ্যের পটভূমিকা 'মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর। সুদূর দিগন্তের পশ্চিমাকাশে অস্তমিত সূর্যের রক্তিমাভা। পরিবেশ কলহাস্যমুখর। নবান্ন উৎসব চলছে। মোরগের লড়াই, লাঠিখেলা ও কৃষাণীদের গানে মুখরিত সমগ্র অঞ্চল।' ইতোমধ্যে এই অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে শহর থেকে ফেরা নিরঞ্জন-বিনোদিনীর নতুন করে গুছিয়ে নেয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকার প্রত্যাবর্তন ঘটেছে। তৃতীয় ও শেষ দৃশ্যে অকস্মাৎ 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার 'মাথা নাড়তে' প্রবেশ করে। এমনাড়তেভাবে প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে যে দুর্যোগের ঘনঘটনার সূচনা, পরে বিস্তার, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদ, শেষ দৃশ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন এবং সেই সঙ্গে দয়ালের বক্তব্য 'মন্বন্তরের দাপট গিয়েছে, তবু মরিনি...আমরা', 'এবার আর

আকাল এসে আত্মীয় পরিজন ছিনিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না', 'জোর, জোর প্রতিরোধ প্রধান এবার! জোর প্রতিরোধ। জোর প্রতিরোধ'—প্রভৃতি আপ্তবাক্য সুলভ সংলাপের অতিনাটকীয়তা ও পূর্বাপর রহিত অপ্রত্যাশিত ঘটনার আতিশয্যের জন্যই, নাটকাভিনয় দেখে, সে দিন এই দৃশ্যটি সম্পর্কে কিছু প্রতিকূল সমালোচনা হয়েছিল।

শ্রীরঙ্গম মঞ্চে একাদিক্রমে সাত রাত্রি অভিনয়ের পর 'নবান্ন' নাট্যামোদী, বুদ্ধিজীবী মহলে প্রবল সাড়া এনে দিয়েছিল। নাটক ও প্রযোজনার অন্যতর চিন্তা-ভাবনার অভিব্যক্তি এক নতুন দিগন্তের আভাস এনে দেয়। গণনাট্যের জয়যাত্রার শুরু এখান থেকে।

নতুন ভাবনা ও প্রযোজনার দিক থেকে 'নবান্ন' যতটা অভিনন্দিত হয়েছে, সাহিত্য হিসাবে নাটকটি ততটা ত্রুটিমুক্ত ছিল না। এর ঘটনা পরম্পরা একটি অখণ্ড কাহিনীর ক্রমবিকশিত রূপকে তুলে ধরার চেয়ে, নাটকীয় আবেগকে একমুখী করে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি ও আবেগ বৈচিত্র্যের প্রতি বেশি মনোযোগী। সাধারণ কৃষক ও নিম্নবিত্ত কতকগুলি মানুষ ও তাদের সমাজজীবনের অবলম্বন হলেও তাকে নাট্যরসাশ্রিত করার জন্য যে প্রতিভার প্রয়োজন, সে পরিচয় নাটকটিতে পরিস্ফুট হয়নি। তাই নবান্নের কোনো কোনো দৃশ্য পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। এঁদের কেউ কেউ শেষ দৃশ্যটিকে নবান্নের দুর্বলতম অংশ বলে মনে করেন। "নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। ওই অংশগুলিতে ঘটনা বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পঙ্গু।" "এই দৃশ্যে গ্রন্থাকার যেভাবে তার উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিবিহীন।" ('নবান্ন'—হিরণকুমার সান্ন্যাল, পরিচয়, চৈত্র ১৩৫১)।

সমালোচকের বক্তব্য থেকে এ কথা স্পষ্ট যে, নাটকটির প্রথমাংশে গ্রাম বাঙলার জনজীবনের অনুপুঙ্খ বর্ণনার মধ্য দিয়ে নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি ও তৎসহ নাট্য কাহিনীতে একটি গতিবেগ আনবার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়, তা অনেকটা স্বাভাবিক ও বাস্তবানুগ।

দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি—রাষ্ট্রনৈতিক, সামাজিক ঘটনার টানাপোড়েন, দুর্ভিক্ষ মহামারী—বন্যায় বিপন্ন মানুষের স্বপক্ষে বক্তব্য উপস্থাপনার দায় নিয়ে সেদিন ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাঙলা শাখার ওপর কিছু দায়িত্ব বর্তে ছিল। প্রয়োজন ছিল সাধারণ মানুষকে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন এবং ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ নবান্ন নাট্যাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সে দায় ও দায়িত্ব সম্যকভাবে পালন করেছে।

চার অঙ্কে বিন্যস্ত 'নবান্ন' নাটক বঙ্গদেশের অনাদৃত বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর প্রথম আলেখ্য। প্রথম বাংলার চাষী মজুরের 'দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সংকল্পের চমৎকার বাস্তবসম্মত চিত্র'। এর পটভূমিতে আছে তৎকালের বাংলাদেশের তিন বৎসরের ঘটনা। ১৯৪২-৪৪ সালের গ্রাম বাঙলার জনজীবনের পক্ষে উল্লেখযোগ্য নানা রাজনৈতিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক ঘটনাকে নাট্যকার অতি স্বচ্ছন্দভাবে এ নাটকে তুলে ধরেছেন। উদ্দেশ্য গণজীবনের বিস্তৃত পরিসরটি তুলে ধরার সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পোড় খাওয়া মানুষের মাধ্যমে নতুন এক বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবন দর্শনকে প্রকাশ করা, যার প্রতিপাদ্য 'সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের

বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ' চেতনা সঞ্চার করা। গণনাট্য আন্দোলনের কর্মী নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য তাঁর এই প্রতিপাদ্যটি তুলে ধরবার জন্য প্রাথমিকভাবে দুর্গত পল্লী ও পল্লীবাসীর সঙ্কটের স্বরূপ তুলে ধরেছেন প্রথম অঙ্কের দৃশ্য পরম্পরায়। প্রথম দৃশ্যের পটভূমি : বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধ আর এখানে '৪২-এর আগস্ট আন্দোলন দেশব্যাপী অগণিত মানুষের সংগ্রাম ও সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের রক্তাক্ত সন্ত্রাস সৃষ্টির ঘটনাকে নাট্যকার বর্ণনা করেছেন—"সুদূরের পটভূমি রক্তিম। ... হঠাৎ নতুন কোনো কিছুর আহুতি পেয়ে পটভূমিটা আরও রক্তিম হয়ে উঠল; আর ঊর্ধ্বগতি ধূমকুণ্ডলীর সঙ্গে উড়তে লাগল ছাই আর আগুনের ফুলকি।"—এ থেকে বোঝা যায় বাঙলার রাজনৈতিক পটভূমি তখন অগ্নিগর্ভ। এ হেন পরিস্থিতিতে আমিনপুরের কৃষক প্রধান সমাদ্দার তিন গোলা ধান নষ্ট করে, নৌকা আটকে রাখে, আবার দুই ছেলেকে নিয়ে আগস্ট আন্দোলনেও যোগ দেয়। তার স্ত্রী পঞ্চাননী পুলিশী সন্ত্রাস অত্যাচারের ভয়ে ভীত 'মেয়েমানুষের লজ্জা শরম খুইয়ে বনেজঙ্গলে গিয়ে' পহরের পর পহর বসে গ্লানির প্রতিবাদ করেও যখন কোনো সুরাহা হয় না দেখে তখন নিজেই বিদ্রোহের মশাল হাতে জনতার নেতৃত্ব দেয়, অবিচল দৃঢ়তায়; উদ্বুদ্ধ করে এগিয়ে যেতে। পক্ষান্তরে, কুঞ্জ মনে করে দেশের মানুষের প্রস্তুতিবিহীন সংগ্রাম আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র। আর যুধিষ্ঠিরের সংলাপ নেহাৎই প্ররোচনাকারীর বক্তব্য। সব মিলিয়ে দৃশ্যটিতে বিশ্বযুদ্ধ ও আগস্ট আন্দোলনের উত্তেজনার দিনগুলোর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। বাঙলাদেশের মানুষ সেদিন যুবাবৃদ্ধ নির্বিশেষে নানাভাবে আন্দোলিত হয়েছিল তা বোঝা যায়। এ তো নেপথ্যভূমি।

দ্বিতীয় থেকে চতুর্থ দৃশ্য প্রধানের ছন্নছাড়া গৃহস্থালীর বিস্তৃত বর্ণনায় সমৃদ্ধ। অভাবের তাড়নায় সমাদ্দার পরিবার বীজধানের শেষে ঘরের থালা বাসন বিক্রি করে মুখের গ্রাস সংগ্রহ করছে, তৎসত্ত্বেও সহৃদয়তা হারায়নি। প্রতিবেশী দয়ালকে সংগৃহীত সামান্য খুদকুঁড়ো থেকে মুঠোকখানেক দিতে দ্বিধা করেনা। নিরঞ্জন এ কষ্ট সহ্য করতে না পেরে বেরিয়ে পড়ে কাজের সন্ধানে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। দুর্দৈব এতক্ষণ বোধ করি প্রতীক্ষা করছিল। আকস্মিক দমকা বাতাসকে সঙ্গে নিয়ে সাত-আট হাত উঁচু হয়ে আসা বান আর প্রবল ঝড়ের তাণ্ডবলীলা চলতে থাকে। প্রধানের দোচালা ভেঙে 'ঘর বার' সব একাকার হয়ে যায়। এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে মহামড়ক উজাড় করতে থাকে গ্রামের পর গ্রাম। তবু এরই মধ্যে বাঁচবার সংগ্রাম চলে, সমাদ্দার পরিবারের। এ হেন বিপর্যয়ে, সঙ্কটে হায়েনারা স্থির থাকতে পারেনা। তাদের লোভী দৃষ্টি মানুষের শেষ সম্বলটুকুতেও হাত বাড়ায়। হারু দত্ত গ্রামের মহাজন, সমাদ্দারদের অভাবের সুযোগ নিয়ে জমি কাড়তে উদ্যত হলে, কুঞ্জ বাধা দেয়। পরিণামে হারুর লাঠিয়ালের আঘাতে সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়-তৃতীয় অঙ্ক সমাদ্দার পরিবারের শহরবাসের ইতিকথা। ভিন্নতর পরিবেশে অনভ্যস্ত জীবনচারণে প্রতিপদে আত্মাবমানানা সহ্য করতে না পেরে প্রধান, গ্রাম বাঙলার পিতৃপুরুষ, কেমন যেন পাগলের মতো হয়ে যায়। কুঞ্জ, রাধার নগরজীবনের সীমাহীন হৃদয়হীনতায় স্বগ্রামে ফিরে যাবার সংকল্প নেয়। কালীধন সেবাশ্রমে (?) বিনোদিনীর সঙ্গে নিরঞ্জনের পুনর্মিলন ও ধাড়ার সমস্ত হীন ব্যবসার পুলিশ সংবাদ দিয়ে, সচক্র ধরিয়ে দেয় এবং পরিশেষে তারা ঘরে ফেরে।

বস্তুত প্রথম অঙ্কের পাঁচটি দৃশ্যে ৪২-৪৩ সালের আমিনপুর তথা গ্রামবাঙলার যে ছবি তুলে ধরা হয়েছে,

তা যেমন ব্যাপক ও বাস্তবানুগ, তেমনি নাটকীয়। এই সমস্ত ঘটনা পরম্পরার তালিকাকে ক্ষুধা মারী মন্বন্তরে পীড়াগ্রস্ত আর্ত বাঙলাদেশের ইতিহাস বলা যায়। কিন্তু ইতিহাস তো কোথাও থেমে থাকে না। আর তাই শুধু ধ্বংসের বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপনাতেই সমাজ সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধ্বংস যতই বড় হোক, প্রাণের অঙ্কুরোদগমের সেখানেই শুরু। শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষের বাঁচবার আশা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা, সে তো চিরন্তন! মানুষের সুকুমার বৃত্তিগুলো অনেক প্রতিকূলতার মধ্যেও নিঃশেষে মরে না, 'নবান্ন' সেই বার্তা বহন করে নিয়ে এসেছে। দয়াল বলেছে—"মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, ... আমরা তো বেঁচেই আছি। কই মরিনি তো আমরা সবাই মন্বন্তরে।" কিন্তু কি সেই সঞ্জীবনী মন্ত্র যা মানুষের বুকে বল, মনে শক্তি জোগায়—ভয় থেকে অভয়ে পৌঁছে দেয়? 'নবান্ন' সেই সংবাদ বাঙলার ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছে—"জোর জোর প্রতিরোধ! জোর প্রতিরোধ!" এভাবেই তো মানুষ অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ রচনা করে। এখানেই বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনচেতনার পরিচয়। 'নবান্ন' নাটকের এই উপসংহারে পৌঁছুবার জন্য মানস প্রস্তুতি ঘটেছে চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে, গাতায় খাটার প্রতিশ্রুতিতে। সংঘশক্তির এখানেই প্রতিষ্ঠা। তারপর "জমির অর্ধেক ফসল গেরামের দুঃখী গেরস্থ ভাইদের জন্য দিয়ে" 'ধর্মগোলা' স্থাপনের সঙ্কল্পে তার প্রাণসঞ্চার। তৃতীয় দৃশ্যের প্রতিরোধ তো তারই পরিণত রূপ। দয়াল আমিনপুরে নানান বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে চলতে গিয়ে যে পাথেয় সংগ্রহ করেছে, সেখানে থেকে গড়ে উঠেছে এই বলিষ্ঠ জীবনদর্শন। 'নবান্ন'-এর শেষ দৃশ্যটা তাই নাটকের প্রথমাংশ থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি পণ্ড হয়েছে, তা বলা যায়না। নিরঞ্জন বিনোদিনী, কুঞ্জ রাধা এবং প্রধানের শেষ অঙ্কে পর্যায়ক্রমে ঘরে ফেলা একাট উপলক্ষ্য মাত্র।

পরিশেষে আর একটি কথা। নাটকের শেষ দৃশ্যটি নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও কোনো কোনো সমালোচকের মতে এ দৃশ্যটিই সব চাইতে ভালো। কেন না এই দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। তৎসত্ত্বেও দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় নাট্যকারের অসামান্য দক্ষতার পরিচয় রয়েছে। গণনাট্য সংঘ, তার অনন্য সংঘশক্তি ও অভিনয় নৈপুণ্যে এই দৃশ্যটি সম্পর্কে জনমানসে একটি দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব রাখতে সক্ষম হয়েছে। তাই সামগ্রিক বিচারে এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে, নবান্নে আপাতঃ কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত হলেও, একটি সফল নাট্যপ্রয়াস।

৮৭.১৭ সারাংশ

আধুনিক নাট্যাভিনয়ে আলো, ধ্বনি, আবহসংহীত প্রভৃতি গভীরভাবে সম্বন্ধযুক্ত। এগুলিকে নাট্যাভিনয়ে বা থিয়েটারের পরিভাষায়য় বলে নেপথ্য বিধান। থিয়েটারের দুটি অংশ—(১) প্রত্যক্ষ অভিনয়, (২) নেপথ্য অভিনয়। প্রথমটির পরিচয় পাওয়া যায়। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের সংলাপ বা বাচিক ও অঙ্গাভঙ্গি সহযোগে মঞ্চে প্রত্যক্ষ অভিনয়ে। এই অভিনয়কে মনোজ্ঞ, বাগ্ময় ব্যঞ্জনাধর্মী এবং অভিনয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করবার জন্য নেপত্য বিধানের অপরিহার্যতা সর্বজন স্বীকৃত। এতদুভয়ের সুসঙ্গাত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে নাটক বাঞ্ছিত রস জারণ করতে পারে। নবানের কাহিনী শুধু গতানুগতিকতা বর্জিত হয়, এর

মঞ্চসজ্জা, আবহসংগীত, আলোকসম্পাতের ক্ষেত্রেও অভিনবত্ব ছিল, যা গণনাট্য সংঘের উল্লেখযোগ্য অবদান। 'নবনাট্য' পর্বে যে আলো-ধ্বনি-আবহসংগীত বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার প্রাথমিক সূচনা 'নবান্ন' নাটকের মঞ্চাভিনয়ে দেখা গিয়েছিল।

উন্মুক্ত আকাশ বা ধূসর প্রান্তরে জনতার মাঝখানে রঙ্গামঞ্চের সূচনা। গ্রীক মঞ্চ পরিকল্পনা ও তার বিবর্তনে 'কোরাস' ও 'অর্কেস্ট্রা'র বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। দর্শকদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গাকে বলা হত থিয়াট্রন। এই থিয়াট্রন থেকে থিয়েটার শব্দটি এসেছে।

এদেশে লোকনাট্যের অভিনয়ের জন্য মঞ্চের প্রয়োজন হতনা। পরবর্তীকালে সংস্কৃত ও ইউরোপীয় মঞ্চপ্রভাবে মঞ্চ ক্রমশ জটিলতর হয়েছে। নানা বৈজ্ঞানিক ও কারিগরী কৃৎ-কৌশল যুক্ত হয়ে আধুনিক মঞ্চভাবনা ক্রমান্বয়েই নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলেছে।

বাংলা নাট্যাভিনয়ের জন্য এখন যে মঞ্চকে বোঝায় তা হল প্রসেনিয়ম মঞ্চ। এর সূচনা করেছেন লেবেডফ, জড্‌রেলের লঘুনাটক 'দি ডিসগাইজ' এর বঙ্গানুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' অভিনয় কালে। মঞ্চটির তিন পাশ ওপর দিক ঢাকা, সামনেটা খোলা, আয়তাকার, একধারে উঁচু বেদীর ওপরে, প্রয়োজন অনুযায়ী সাজিয়ে সেখানে অভিনেতারা তাদের সংলাপ উচ্চারণ করেন। পেছনে দৃশ্যপট এঁকে পর পর ঝোলান থাকত। প্রয়োজনমত এর ব্যবহার করা হত। ১৮৭২-এ জাতীয় নাট্যশালা বা সাধারণ রঙ্গামঞ্চে ধর্মদাস সুর 'নীলদর্পণ' নাটকের জন্য এধরনের একটি মঞ্চ গড়েছিলেন। পরে অমর দত্ত ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে ক্লাসিক থিয়েটারে দৃশ্যপট ও আসবাবপত্রে আরও বাস্তবতা আনেন। কিন্তু এর আমূল পরিবর্তন ঘটান শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তিনি দৈর্ঘ্য-প্রস্থ বেধ বিশিষ্ট মঞ্চ পরিকল্পনা করেন, সেইসঙ্গো পার্শ্বপট ও পাদপ্রদীপ তুলে দেন। ফলে শিল্পীরা স্বাভাবিক প্রবেশ প্রস্থানের পথ পান। ফলত মঞ্চ অনেক বেশি বাস্তব ঘেঁষা হয়ে ওঠে।

চতুষ্কোনপ্রসেনিয়ম মঞ্চকে প্রয়োজনানুযায়ী এক, দুই বা ত্রিস্তরীয় মঞ্চ করা যায়। 'নবান্ন' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্ক তৃতীয় দৃশ্য মূলত দ্বিস্তরীয় মঞ্চ। "শহরের রাজপথ। পাশে ধনীর বাসভবন" প্রভৃতি মঞ্চের ডানদিকের বর্ণনা। "আর মঞ্চের বাঁদিকে এক কোণে অর্ধবৃত্তাকারে দেখা যাচ্ছে ডাস্টবিন..........কুঞ্জ রাধিকা ডাস্টবিনের উচ্ছিষ্ট..............ইত্যাদি।" শিশিরকুমার তাঁর 'সীতা' ও 'দিগ্বিজয়ী' তে এর ব্যবহার করেছিলেন। 'নবান্ন' নাটকের প্রথম দৃশ্য কল্পনায় শিশিরকুমারের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। গণনাট্যের যুগে নাট্যকর্মীদের উদ্দেশ্য ছিল নাটককে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়া, তাই স্বল্পতম আয়োজনে মঞ্চ পরিকল্পনা করা হোত। তাই এ মঞ্চ বস্তুভারের পরিবর্তে ব্যঞ্জনাধর্মী হয়ে উঠল। আলোধ্বনি ও আবহসংগীত এ ব্যাপারে অনেকটা সহায়ক হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে প্রথম অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য প্রধানের বাড়ি থেকে দয়াল-এর চাল নিয়ে যাওয়ার পরবর্তী ঘটনা, বা দ্বিতীয় অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্যে রাধিকা কুঞ্জকে কুকুরে কামড়ানো হাত বেঁধে দিচ্ছে ও কাঁদছে—দৃশ্যে আবহসংগীত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'নবান্ন' নাটকের বাস্তবধর্মী বিষয়বস্তুর সঙ্গো বাস্তবধর্মী দৃশ্য রচনা, জীবনের বাস্তবানুগ নাট্যাভিনয়ের সাফল্য বস্তুত গণনাট্য আন্দোলনের সাফল্য।

'মরা গঙ্গার ধারে বিস্তীর্ণ প্রান্তর', চতুর্থ অঙ্কের তৃতীয় দৃশ্য— এখানে নবান্ন উৎসবের আয়োজন হয়েছে—এটি নাটকেরও শেষ দৃশ্য। অস্তায়মান সূর্যের গোধূলি আলোয় চরাচর উদ্ভাসিত। অফুরন্ত প্রাণস্ফূর্তিতে মেতে উঠেছে কৃষাণ-কৃষাণীরা। এদিকে ইতোমধ্যে শহর থেকে আমিনপুরে ফিরেছে নিরঞ্জন-বিনোদিনী, তাদের নতুন করে গুছিয়ে নেওয়া সংসারে কুঞ্জ-রাধিকাও ফিরে এলো। অবশেষে শেষ দৃশ্যে 'আবর্জনার কাঁড়ি বগলে নিয়ে' প্রধান সমাদ্দার ফেরে। প্রথম অঙ্ক প্রথম দৃশ্যের দুর্যোগ, সমাদ্দার পরিবারের বিপর্যয় ও বিচ্ছেদের পর শেষ দৃশ্যেই সমাদ্দার পরিবারের সব স্বজনের পুনর্মিলন ঘটে। সর্বস্ব হারানো দয়াল সব সঙ্কটকে তুচ্ছ করে বলেছে, মন্বন্তরে মরিনি আমরা, আবার আকাল আমাদের আত্মীয় পরিজনকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তার উদ্দীপক ভাষণ, "জোর, জোর প্রতিরোধ এবার প্রধান।" দয়ালের এ ভাষণ যতই আকস্মিক ও আতিশয্যপূর্ণ হোক না কেন, এর সফল অভিনয় নাট্যামোদী মহলে নতুন দিগন্তের আভাস এনে দিয়েছিল।

নবান্নের অভিনয় সাফল্য, নতুন ভাবনা ও প্রয়োজনার জন্য অভিনন্দিত হয়েছে। নবান্ন জটিল নাটকীয় দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তোলার চেয়ে, ঘটনার বহুধা ব্যাপ্তি আবেগ সৃষ্টির প্রতি বেশি মনোযোগ দিয়েছে। নবান্ন নাটক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি উপস্থাপনার মাধ্যমে আর্ত জনসাধারণ সম্পর্কে সচেতন ও ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করার যে দায় ও দায়িত্ব গণনাট্য সংঘ গ্রহণ করেছিল, তা যথার্থভাবে পালন করেছে।

নাটকের তিনটি অঙ্ক পরম্পরায় বিশ্বযুদ্ধ, ৪২-এর আন্দোলন, ঝড়ঝঞ্ঝা, বন্যা, মারী-মন্বন্তরের যে দৃশ্যপট রচনা করেছে, ইতিহাস সেখানে থেমে থাকেনি। তাই ধ্বংস বিপর্যয়ের চিত্র উপস্থাপনাতেই সমাজ-সচেতন শিল্পীর দায়িত্ব শেষ হয়না। কেননা ধ্বংসের মধ্যেই থাকে প্রাণের অঙ্কুরোদগমের সম্ভাবনা। তাই শত হতাশা ও সহস্র বিপর্যয়ের মধ্যেও মানুষ বাঁচতে চায়। নবান্নের শেষ দৃশ্য সেই বার্তাই বয়ে এনেছে। দয়ালের কথায়, "মন্বন্তরের দাপট গিয়েছে..........কই মরিনি তো আমরা"। সেই সঞ্জীবনী মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে শেষ দৃশ্যে। গাঁতায় খাটা (৪/১), ধর্মগোলা স্থাপনের সঙ্কল্প শেষ দৃশ্যে প্রতিরোধ রচনার প্রতিজ্ঞা আমিনপুরের মানুষকে সঙ্কট উত্তরণ শেষে নতুন করে বাঁচার পথ দেখিয়েছে। নবান্নের শেষ দৃশ্য তাই বিশেষ তাৎপর্যবহ। নবান্নের উৎসবমুখর পরিবেশ গঠনের লোকায়ত উৎসবের আয়োজন প্রভৃতির দৃশ্য পরিকল্পনা ও পরিচালনায় নাট্যকার যথার্থ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

৮৭.১৮ অনুশীলনী ৪

১। "সাদা কথায় বলতে গেলে ব্যাপরডা দাঁড়ায় এই যে, এখনই, এই মুহূর্তে আমরা যদি ফসল রক্ষে করার একটা ব্যবস্থা না করে উঠতে পারি, তা হলে মিত্যু ছাড়া আমাদের কোনো গত্যন্তর থাকবে না।"—কে, কোথায়, কি প্রসঙ্গে এ কথা বলেছেন? 'মিত্যু' থেকে 'গত্যন্তরে'র কি উপায় স্থির হয়েছিল লিখুন।

২। ‘নবান্ন’ নাটকের বিষয়বস্তু, চরিত্র ও লক্ষ্য প্রমাণ করে নাটকটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদের নাটক। নাটকের অভিনয় গঠনরীতিতে তার আভাস আছে। —আলোচনা করুন।

৩। “নবান্ন’ বাংলা রঙ্গামঞ্চের ইতিহাসে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল”—সমালোচকের এই মন্তব্য সম্পর্কে আপনার অভিমত দিন।

৪। “ডর আছে, কিন্তু প্রধান, মন্বন্তরের দাপটও তো গিয়েছে এই মাথার ওপর দিয়ে, মরিনি তো সবাই আমরা! আমরা তো বেঁচেই আছি।”—কার লেখা, কোন নাটকের অংশ? কে এই কথা কখন বলেছে? বক্তব্যটির তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৫। “নবান্ন’কে একই সঙ্গে দুর্গতি ও প্রতিরোধের নাটক বলা হয়।”—নাটকটিতে দুর্গতি প্রতিরোধের যে চিত্র পাওয়া যায় তা বর্ণনা করুন।

৬। ‘নবান্ন’ নাটকের সামগ্রিক পরিকল্পনায় বিশেষত মঞ্চ ও দৃশ্যসজ্জা ও আবহসংগীত একটি নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে। —মন্তব্যটির যাথার্থ্য নিরুপণ করুন।

৮৭.১৯ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ :

১। (ক) অভিনবত্ব নাটকের বিষয়বস্তুতে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়, মন্বন্তর, মারী ও মড়কে বিপর্যস্ত সর্বস্বান্ত গ্রাম বাংলার দরিদ্র কৃষক ও মধ্যবিত্ত পরিবার ক্ষুধার অন্ন সংগ্রহের জন্য কোলকাতা শহরের পার্কে জমায়েত হচ্ছে লঙ্গারখানায় সামান্য খাদ্যের জন্য। এ বিষয় বাংলা নাট্যসাহিত্যে প্রথম।

(খ) নাটকে কোন নায়ক চরিত্র নেই। নাটকের চরিত্রগুলির সামগ্রিক অভিনয়েই নাটকের সাফল্য নির্ভরশীল।

(গ) নাটকের সংলাপ, বাস্তবমুখী ও জীবনানুগ।

(ঘ) এ নাটকের মঞ্চ, দৃশ্য, আলো ও ধ্বনির ব্যবহারে অভিনবত্ব উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত বিষয়গুলির যে কোন দুটির উল্লেখ করুন।

২। প্রথম প্রকাশ ‘অরণি’ পত্রিকায় ১৯৪৩-খ্রিস্টাব্দে, গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯৪৪-এ, প্রথম অভিনয় শ্রীরঙ্গাম মঞ্চে, ২৪শে অক্টাবর, ১৯৪৪।

৩। কৃষকের জীবন নিয়ে রচিত তিনটি নাটক হল—
নীলদর্পণ—দীনবন্ধু মিত্র।
জমিদার দর্পণ—মীর মশাররফ্ হোসেন।
নবান্ন—বিজন ভট্টাচার্য।

৪।   ৭.৩ অংশের ‘দেশকাল’ পর্যায়টি পাঠ করে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

৫।   ৭.৩ অংশের ‘নামকরণ’ অংশ অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ২ :

১। (ক) যুদ্ধ, দুর্যোগ, মন্বন্তরে আমিনপুর গ্রামের মানুষ যখন বিপন্ন, সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষ যখন সকলকে পীড়িত করছে, তখন বন্ধু দয়ালকে সম্বোধন করে প্রধান সমাদ্দার একথা বলেছে। সে শুনেছে বিত্তবান মানুষেরা দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দরিদ্র মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খুলে খাবার বিতরণ করছে। এই সংবাদে তার আশা শহরে গেলে প্রাণধারণের জন্য অন্তত দুমুঠো অন্ন জুটবে।

‘অন্নকুট’ শব্দের বাচ্যার্থ হল অন্নের পাহাড়তুল্য অন্নরাশি বা খাদ্যস্তূপ। বিশেষ তিথিতে দেবার্চনার উদ্দেশ্যে নিবেদিত ‘অন্ন’ প্রসাদ হিসেবে সাধারণে বিতরণ করা হয় যে উৎসবে তা অন্নকুট নামে পরিচিত। এখানে ব্যঞ্জনার্থে শহরের লঙ্গরখানা থেকে রান্না করা খাদ্য বিতরণের আয়োজনকে ‘অন্নকূট’ বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

(খ) দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম দৃশ্যে চাল ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার ‘সরকার’ রাজীব বলেছে। কালীধন চালের মজুতদার। কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করবার জন্য চাল গোপনে গুদামজাত করে, বাজারে দাম বাড়িয়ে দেয়। সাধারণ মানুষ প্রয়োজনীয় চাল সহজভাবে না পেলে বেশি দাম দিয়ে চাল কিনতে বাধ্য হয়। এ ক্ষেত্রে জনৈক ভদ্রলোক চাল কিনতে এসে কোথাও না পেয়ে চাল-ব্যবসায়ী কালীধন ধাড়ার দোকানে হাজির হয়ে করজোড়ে একটা ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। কালীধন অন্য জায়গা থেকে পঞ্চাশ টাকা দামে সংগ্রহ করে দেবার প্রস্তাব দিলে ভদ্রলোক বিস্ময় প্রকাশ করেন। তারই প্রতিক্রিয়ায় কালীধনেরই যোগ্য কর্মচারী রাজীব এই উক্তি করে।

এই মন্তব্যের মধ্য দিয়ে অহসায় ছাপোষা সাধারণ ক্রেতা ভদ্রলোকের প্রতি বক্তা রাজীবের তাচ্ছিল্যের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। হীন চরিত্র কালীধনের সাহচর্যে রাজীব তার প্রভুরই মত কুরুচির পরিচয় দিয়েছে।

(গ) বক্তা প্রধান সমাদ্দার। তাঁর দুটি পুত্র শ্রীপতি ভূপতি দেশের ৪২-এর স্বাধীনতা সংগ্রামে শহীদ হয়েছে। পুত্রহারা পিতার এই বিলাপ তাঁর অন্তর বেদনাকে প্রকাশ করেছে। কুঞ্জ প্রধানের ভ্রাতুষ্পুত্র, সেও শ্রীপতি-ভূপতির জন্য বেদনাবোধ করে বলেছে—“শ্রীপতি-ভূপতির ব্যাথা বড় কম বাজে নি এই বুকে জানলে জেঠা”—কুঞ্জ এজন্য ভেতরে ভেতরে দগ্ধে মরে। তাই বৃদ্ধ জেঠাকে স্বান্ত্বনা দেয়।

(ঘ) উক্তিটি প্রধান সমাদ্দারের স্ত্রী পঞ্চাননীর। স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রবল ঢেউ-এ যখন ইংরেজ সরকার বিব্রত শুধু নয়, বিপন্ন, তখন সংগ্রামীদের ওপর প্রবল বিক্রমে তারা ঝাঁপিয়ে পড়ে।

গ্রামের বিপ্লবীদের সন্ধানে পুলিশ সাধারণ মানুষের ওপর নানা ধরনের পীড়ন শুরু করে। পুলিশের পীড়নের ভয়ে অনেকে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ ছেড়ে পালিয়ে আসছে দেখে পঞ্চাননী তাদের এগিয়ে যেতে পরামর্শ দিয়েছেন. সংগ্রাম ছেড়ে সংকটকালে যারা পিছিয়ে আসে তারা জাতীয় জীবনে কলঙ্ক স্বরুপ সন্দেহ নেই। নাটকে পঞ্চাননী চরিত্রটি বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী মাতঙ্গিনী হাজরার আদলে রচিত। অকুতোভয় পঞ্চাননীর দেশপ্রেম, দৃঢ় চরিত্রবল, সংকটে যথার্থ নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা ছিল—এই সংলাপ থেকে তা বোঝা যায়।

২। এই এককের ৭.৯ অংশের 'নবান্ন' নাটকের গান, অংশটি এবং সারাংশের প্রাসঙ্গিক অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। 'নবান্ন' নাটকের নামকরণ ও প্রাসঙ্কি আলোচনা পড়ে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করুন।

৪। 'প্রাসঙ্কি আলোচনা' পর্যায় অবলম্বনে উত্তর লিখুন।

৫। গণনাট্য হিসেব 'নবান্ন'র অবদান ও গণনাট্য আন্দোলনে নবান্নের ভূমিকা অংশ পাঠ করে উত্তর লিখুন।

অনুশীলনী ৩ :

১। (ক) ৪৫ (খ) প্রধান (গ) রাধিকা

২। পরিচয়ের জন্য চরিত্রলিপি এবং ৭.১১ অংশের উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে 'প্রাসঙ্গিক আলোচনা'র সাহায্য নিন।

৩। বক্তা দ্বিতীয় ভদ্রলোক।

ব্ল্যাক মার্কেট-এর বাংলা প্রতিশব্দ 'কালোবাজার'। খোলা বাজারে কৃত্রিম অভাব তৈরি করে গোপনে অতিরিক্ত মুনাফায় বেশি দাম দিয়ে বিক্রি করা। এভাবে অর্জিত হিসাব বহির্ভূত অর্থই কালো টাকার (Black Money) উৎস।

মজুতদার শব্দটি আরবী 'মৌজদ' + দার (ফরাসী প্রত্যয়) গড়ে উঠেছে।

উদ্ধৃত উক্তির মূল প্রসঙ্গা হল দ্বিতীয় অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য, শহরের রাজপথ সংলগ্ন ধনীর আবাস। সেখানে বিবাহোৎসব। গৃহকর্তা-বড়োকর্তার হাজার খানেক নিমন্ত্রিত। নির্মলবাবু প্রসঙ্গাত বলেছেন। জিনিসপত্তর জোগাড় করতে কোনো অসুবিধা হয়নি তো? বড়োকর্তা জানান যদ্দিন চোরাবাজার আছে, ততদিন—কথা অসম্পূর্ণ থাকতেই দ্বিতীয় ভদ্রলোক চোরাবাজারের প্রশংসার ভঙ্গিতে বলেন, চোরাবাজার আছে বলেই কিছু আটকাচ্ছে না। তাই, তিনি প্রকাশ্যে চোরাবাজার বা ব্ল্যাকমার্কেট ও মজুতদারদের সমর্থন জানান। নির্মলবাবু অবশ্য বলেছেন পয়সা যাদের আছে, তারা একথা বলতে পারেন।

(প্রশ্নটির পরীক্ষার্থী তার নিজস্ব মনোভাব ব্যক্ত করবেন।)

৪। ৭.১১ অংশটি পাঠ করে উত্তর তৈরি করুন। গ্রীক বা সেক্সপীয়রীয় অর্থে যাকে নাটক বলা হয়, সে অর্থে এখানে নায়ক নেই, তবে প্রধান বা কুঞ্জকে জীবনসংগ্রাম ও তা থেকে উত্তরণসূত্রে মুখ্য চরিত্র হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

৫। বক্তা সুজন, সাধারণ গ্রামবাসীদের একজন। এঁরা কুড়ি-পঁচিশ জন প্রধান সমাদ্দার বাড়ির স্বল্প পরিসর উঠোনে বসে পারস্পরিক আলোচনায় মত্ত।

আলাপচারিতার মধ্যে ফকির বলেছে, বাংলা দেশের গ্রামীণ সন্তানরা বাবার দেনা ঘাড়ে জন্মায় এবং তারা শেষ জীবনে নিজের দেনা ছেলের ঘাড়ে চাপিয়ে চলে যায়, এমনটাই চিরকালটায় ঘটছে। এর মধ্যে কোনো স্বতন্ত্র বিশেষত্ব নেই।

এই কথার উত্তরে সুজন বলেছে, এতদিন ধরে এমনটি ঘটেছে বলেই, তা মেনে নিতে হবে তা কেন? কেন এর ভালমন্দ বিচার করা হবে না? এই কথার মধ্য দিয়ে সুজনকে অনেকটা বাস্তববাদী ও সংস্কারমুক্ত, যুক্তিবাদী এবং প্রগতিশীল ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী বলে মনে হয়।

৬। ৭.১১ চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য। ভাল করে এটি পড়ে নিয়ে উত্তর দিন।

৭। ৮। ৯। — ৭.১২ অংশটি ভাল করে পড়ে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখুন।

১০। ৭.১২ ও ৭.১৩ অংশের শেষ পর্যায়ে নাটক সম্পর্কে যে আলোচনা করা হয়েছে, তার সাহায্য নিয়ে উত্তর তৈরি করুন।

১১। শহরে বাসকালীন অসহায়, বিপন্ন কুঞ্জ, রাধিকাকে বলেছে। হৃদয়হীন, শহর জীবনের চেয়ে তার নিজের গ্রামে কুঞ্জ অনেকটা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করবে, এই ধারণা থেকে কথাগুলি বলেছে।

হৃদয়হীন শুষ্ক শহর জীবনে কোনোভাবেই স্বাভাবিক হতে পারছে না, তার স্বগ্রামে স্ব-ভূমিতে সে সুস্থ বোধ করবে, এই প্রত্যয় থেকে সে কথাটি বলেছে।

বক্তার এই মন্তব্য থেকে তার মাটির প্রতি চিরন্তন মমত্ব ও আকর্ষণের পরিচয় পাওয়া যায়।

১২। এই সংলাপটি তৃতীয় অঙ্ক দ্বিতীয় দৃশ্যে প্রধান সমাদ্দার উচ্চারণ করেছে। সংলাপটি বিশ্লেষণ করে তাৎপর্য বুঝতে হবে।

১৩। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের আমিনপুরের স্থানীয় পোদ্দার তথা চোরাচালানকারী হারু দত্তের। গ্রামের বৃদ্ধা মহিলা দুঃস্থ পরিবারের মেয়েদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে হারু দত্তের হাতে তুলে দেয় শহরে পাচার করবার জন্য।

চন্দরের অল্পবয়সী মেয়ে। তিন বছর বয়সে তার মা মারা গেলে, অনেক যত্নে সে মা-মরা মেয়েটিকে লালন করে বড় করেছে। খুকীর মা মিথ্যা প্রলোভন দিয়ে চন্দরের মেয়েকে হারু দত্তের হাতে তুলে দেয়। হারু দত্ত চন্দরকে দিয়ে একটি কাগজে টিপ-ঠাপ দিইয়ে নেয়।

এখানে বক্তা হারু দত্তের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা হল এই যে, সে শুধু মজুতদারই নয়, একজন হীন মেয়ে পাচারকারী। ধূর্ত ব্যবসায়ী এই অন্যায় কাজটি অত্যন্ত সতর্কভাবে করে। পাকাপোক্ত করবার জন্য নিরক্ষর মানুষগুলোকে দিয়ে নিজের ইচ্ছেমত কথা লিখিয়ে নেয়।

অনুশীলনী ৪ :

১। 'নবান্ন' নাটকে দয়াল, চতুর্থ অঙ্ক প্রথম দৃশ্যে একথা বলেছেন। প্রসঙ্গটি হল ফসল কাটা, ঝাড়া, তোলা তারপর সেই ফসল রক্ষে করার সমস্যা।

অল্প সময়ে এ কাজ সম্পন্ন করা খুবই দুরূহ। তারই একটা উপায় সকলে মিলে আলোচনা করে ঠিক করতে হবে। ঘরে খাদ্যাভাবের পরিণতি কি দয়াল তার জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। সেই অভিজ্ঞতা থেকে দয়াল এ বিষয়ে আলোচনার সূত্রপাত করে বলেছেন ফসল রক্ষে করতে না পারলে 'মিত্যু ছাড়া গত্যন্তর' থাকবে না।

'মিত্যু' থেকে গত্যন্তরে'র উপায় অনুসন্ধান করতে গিয়ে নানা জনে নানা কথার অবতারণা করলেও কোনো ইতিবাচক মতে পৌঁছানো যখন যাচ্ছে না, অথচ বড়োকর্তা এটা বুঝেছে "দুইচার দিনের ভেতর ফসল কাটা হল তো হল, নয় তো বিলকুল পয়মাল হবে।" অবশেষে দয়াল 'সকলে মিলে গাঁতায়' খাটার প্রস্তাব দিয়ে বলে, "অতিকম পঁচিশ ঘর গেরস্তের সাহায্যও যদি পাওয়া যায়, সকলে মিলে গাঁতায় খাটার পিতিজ্ঞে করে, তা হলে একদানা ফসলও জমির নষ্ট হতে পারবে না। দশ হাতে ফসল গোলায় তুলে ফেলা সম্ভব।" তাই ফসল যাতে নষ্ট না হয়, তার ব্যবস্থা করতে হবে সব্বার আগে। আমিনপুরবাসী এভাবেই মিত্যু থেকে রেহাই পেয়েছে।

২। 'নবান্ন'-এর গঠনরীতি (৭.৮ অংশের মূলাঠ ৪) সংক্রান্ত আলোচনা পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। বক্তা মূলাপাঠ ৭(দ্রষ্টব্য ৭.১৫) অংশটি পড়ে উত্তর লিখুন।

৪। চতুর্থ অঙ্কে তৃতীয় দৃশ্যে উদ্ধৃত কথাগুলি আংশিক মানসিক ভারসাম্য হারানো প্রধান সমাদ্দারের কথার উত্তরে বলেছে দয়াল মণ্ডল। অন্য সকলের মত দয়ালের ওপর দিয়েও জলোচ্ছ্বাসের দাপট গিয়েছে। তা সত্ত্বেও যখন তারা অনেকেই বেঁচে আছে, তখন এমনটি করতে হবে যাতে আকাল আর আচম্বিতে এসে কোনো স্বজনকে ছিনিয়ে নিতে না পারে। দয়ালের এই উক্তির মধ্য দিয়ে একটি আশাবাদী মানুষের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে।

৫। মূলপাঠ ৩ (দ্রষ্টব্য ৭.৭) অংশের শেষের দিকে এ প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক আলোচনা আছে। সেটি অনুসরণ করে উত্তর দিন।

৬। ৭.১৩ অংশের মূলপাঠ ৭ ভালো করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৮৭.২০ নির্বাচিত পাঠ্যগ্রন্থ

১। বিজন ভট্টাচার্য—*নবান্ন*।

২। ড. দিলীপকুমার নন্দী ও ড. নবকুমার মণ্ডল— *প্রসঙ্গ : নবান্ন*।

৩। ড. দর্শন চৌধুরী — *গণনাট্য আন্দোলন*।

৪। ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) — *মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (১ম-৩ য় খণ্ড)*।

৫। ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদিত) — *বস্তুবাদী সাহিত্য বিচার ও অন্যমত*।

৬। বহুরুপী — *'নবান্ন' স্মারক সংখ্যা ১. অক্টোবর ১৯৬৯ এবং স্মারক সংখ্যা ২, অক্টোবর ১৯৭০*।

৮৭.২১ অতিরিক্ত পাঠ

পরিশিষ্ট—১

'নবান্ন' নাটক প্রকাশিত ও মঞ্চস্থ হওয়ার পর সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় বিভিন্ন লেখক ও সমালোচক যে মতামত প্রকাশ করেন তার কয়েকটির নির্বাচিত অংশ উপস্থাপিত হল :

১৯৪৪ সালের ২৭ শে অক্টোবর আনন্দবাজার পত্রিকা থেকে উদ্ধৃত করা হল—

'জবানবন্দী' বাংলা নাট্যধারাকে নতুন পথে শুধু চালনা করার ইঙ্গিত দিয়াছিল। 'নবান্ন'র সেই ধারা আরো অগ্রসর হইয়াছে, গণনাট্য সংঘের নাট্যাভিনয় সম্বন্ধে সবচেয়ে বড় কথা এই যে, আমাদের দেশের উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত জনজীবনকে ইহারা নাট্যরূপ দিতেছেন। গত তিন বৎসর ধরিয়া বাংলার কৃষক সাধারণের ওপর দিয়া যে ঝড়-ঝাপটা যাইতেছে 'নবান্ন' তাহারই আলেখ্য। অতি পরিচিত উচ্চশ্রেণীর মধ্যবিত্তের পরিবর্তে এই স্তরের জনগণ সম্বন্ধে নাটক লেখা ও অভিনয় করা যে কি দুঃসাধ্য তাহা সহজেই অনুমান করা যায়। বহু চরিত্র সমন্বিত এই সুদীর্ঘ নাটকটি যেরূপ কুশলতার সহিত অভিনীত হইয়াছে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বড় হইতে ছোট প্রায় প্রত্যেকটি চরিত্র অভিনয় সমান তালে চলিয়াছে। পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রীদের তুলনায় ইহাদের অভিনয় কোন অংশে ন্যূন মনে হয়না; বরং নতুন দৃষ্টি ও মননের গুণে কোন কোন বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।"

ঐ একই তারিখে যুগান্তর পত্রিকা লিখল, "এতকাল আমরা রঙ্গমঞ্চে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বা সামাজিক নাটকের পেশাদারী অভিনয় দেখিয়া আসিয়াছি। কিন্তু গণনাট্য সংঘ এক নতুন জিনিসের আমদানী করিয়াছেন, তাহারা কেহই পেশাদার অভিনেতা অভিনেত্রী নহেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত, যুগের রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন তরুণ তরুণীরা এই অভিনয় করিয়াছেন। আগস্ট আন্দোলন, বন্যা, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর পটভূমিকায় এই নাটকের গল্পাংশ রচিত এবং সমাজের যাহারা একেবারে নীচের তলায়

বাংলার সেই দুঃস্থ কৃষকের জীবন ইহার মধ্যে প্রতিফলিত। ইহা সত্যসত্যই গণজীবনের প্রতিচ্ছবি। যতদূর সম্ভব গণনাট্য সংঘ 'নবান্ন'কে বাস্তব রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। দুর্ভিক্ষ ও মহামারীগ্রস্ত বাঙ্গালার যে দৃশ্য ইহার মধ্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা দেখিয়াঅশ্রু সংবরণ করা কঠিন। এই ধরনের নাটক কেবল নতুনতর আর্ট হিসাবেই প্রশংসনীয় নহে দুঃস্থ ও নিপীড়িত মনুষ্যত্বের প্রতি ইহা যে বেদনা জাগ্রত করে তাহার মূল্য অনেক।"

ওই সালেই **('পরিচয়' চৈত্র, ১৩৫১) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়** 'নবান্ন'কে ভারতের মর্মবাণী ঘোষণা করে লিখলেন, 'এদের এই অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য কোথা থেকে এল? কি এদের অভিনয় সাফল্যের মর্মকথা? এর একটি মাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করেনা, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই এই প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী এ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্যজগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায়না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেছেন। অথচ এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন ইচ্ছাই গণনাট্যের নেই।'

ওই সংখ্যায় (পরিচয়ে) তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, "বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নূতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করে সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশলাভ করেছে।'

হিরণ সান্যাল (পরিচয়, পৌষ ১৩৫১) বলেছেন, 'সংলাপ, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজনবাবুর কলম এতদূর এগিয়েছে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছেন, এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার করা হবে।"

উপরিউক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে একটা সাধারণ সত্যের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, 'নবান্ন' নাটকে একটা আলোড়ন সৃষ্টিকারী নতুনত্বের বার্তাবহ। 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'-র আগে নাটক ছিলনা, একথা বলা যাবে না কিন্তু তা থেকে কোন নাট্যকার তেমন প্রেরণা পাননি, কোন গ্রুপ থিয়েটারেরও জন্ম হয় নি, কোন আন্দোলনও সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে 'নবান্ন' ক্রান্তিকাল-সৃষ্টিকারী এক অপূর্ব শিল্পকর্ম, ঐতিহাসিক দিক থেকে সবিশেষ তাৎপর্যবহ।

'নবান্ন' নাটকের কিছু অন্যতর সমালোচনা।

'নবান্ন' নাটকে যে কৃষককে আমরা দেখি, দুর্ভিক্ষপীড়িত সে কৃষক মরে কিন্তু লড়ে না, লড়াইয়ের চিন্তাও করেনা। 'নবান্ন' নাটক কাঁদায়, কিন্তু দুর্ভিক্ষ সৃষ্টকারীদের বিরুদ্ধে ক্রোধ উদ্দীপ্ত করেনা। কি করে করবে? দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী প্রধান আসামী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদই যে সেখানে অনুপস্থিত। যাদের দেখি

—মজুতদার, নারী-ব্যবসায়ী— তারা ঘৃণ্য বটে কিন্তু তারা বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি মাত্র, কোন শ্রেণীর প্রতিভূ নয়। আর বাঁচার পথ?—(যা নাটকের শেষে জোর করে জুড়ে দেওয়া একটা ক্রোড়দৃশ্য) সব জমি এক করে চাষ করো তাহলেই সব দুঃখ-কষ্ট মিটে যাবে। অর্থাৎ, কোন লড়াইয়ের দরকার নেই, শ্রেণী-সংগ্রাম মিছে কথা। অল্প কথায়, এই হল 'নবান্ন' নাটকের বিষয়বস্তু। এর মধ্যে বিপ্লবটা কোথায়? কৃষক পাত্রপাত্রী 'নবান্ন' পাদপ্রদীপের সামনে এসেছেন তা সত্যি, তাঁরা কৃষকের ভাষায় কথা বলেছেন এটাও ঠিক, কিন্তু তবু কি তাঁরা কৃষকের কথা বলেছেন? শ্রমিক-কৃষক নিয়ে নাটক রচনাই কি গণনাট্যের শেষ কথা? তাহলে 'হাঁসুলি বাঁকের উপকথা'-কে গণসাহিত্য বলতে দোষ কি? আসলে জনতাকে নিয়ে লিখলেই বিপ্লবী নাটক বা বিপ্লবী উপন্যাস হয়না। জনতাকে নিয়ে কি লেখা হল, সে জনতার শ্রেণীচরিত্র যথার্থভাবে ফুটেছে কিনা, শত্রুর বিরুদ্ধে সে নাটক হাতিয়ার হয়ে ওঠে কিনা— এটাই বিপ্লবী নাটকের মূল কথা। এইভাবে বিচার করলে, 'নবান্ন'কে কি বিপ্লবী নাটক বলা যায়? না তা নিয়ে গর্ব করা শোভা পায়? তার ওপর আঙ্গিকের দিক থেকেও নাটকটি এমনভাবে রচিত যে নাট্যমঞ্চের বাইরে তার অভিনয় এক প্রকার অসম্ভব।

বাংলা প্রগতি সাহিত্যের আত্মসমালোচনা। রচনা : প্রকাশ রায় (প্রদ্যোৎ গুহ)। দ্রষ্টব্য : মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (১ম খণ্ড) — সম্পাদনা : ধনঞ্জয় দাশ, ১৯৭৯, পৃঃ ৬৫।

পরিশিষ্ট — ২

'নবান্ন' নাটক প্রকাশ ও গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে সফল অভিনয়ের পর সমকালীন কয়েকটি প্রগতিশীল পত্র-পত্রিকায় যে সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল তার কিছু অংশ শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে নিচে মুদ্রিত হল :

(ক)
নবান্ন/সুশীল জানা

শ্রীরঙ্গমে 'নবান্ন'র অভিনয় দেখলাম। এর আখ্যানভাগ শুরু হয়েছে ১৯৪২ সালের উচ্ছৃঙ্খল রাজনীতির পটভূমিকায়। শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রাচীন পাশব-নীতি প্রজামণ্ডলের মাঝখানে ধনপ্রাণের বিনিময়ে একটা তথাকথিত শৃঙ্খলা নিয়ে এলো—এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-বাংলার বাসিন্দা যারা—যারা কৃষাণ, কৃষি, মজুর, যারা শুধু এতদিন পরিচয় পেয়ে এসেছিল তাদের নিকটতম প্রভু জমিদার-মহাজনের, তাদের সুমুখে আর একটা নির্মম পরিচয় উদঘাটিত হল।

এই এর শুরু। তারপর এলো ঝড়—এলো প্লাবন, চারিদিক জুড়ে নামল দুর্ভিক্ষ আর মহামারীর কালো ছায়া। ১৯৪৩-৪৪ সাল জুড়ে চললো এক নিরবচ্ছিন্ন নিরুপায় অবস্থার ধারা। ধান নেই, চাল নেই, ওষুধ নেই, সহায় নেই, গ্রাম-বাঙলা ছারখার হতে চল্‌লো। জীবনের বলিষ্ঠ সংগ্রামকে যারা রূপ

দিয়ে নিজের করে নিতে পারে—তারাই বাঁচে, বাঁচার চেতনায় জর্জরিত হয়, আর দুর্জয় হয়ে ওঠে। যারা পারে না—তারা মরে। এমনি করে মরে গিয়েছে অনেকে। তবু নিঃশব্দ এই শ্মশানভুমি থেকে জীবনের ঝঙ্কার ওঠে। এই ঝঙ্কারই 'নবান্ন'র কাহিনী। রাজনীতি, মহাজনী-নীতি আর ধনতন্ত্রের কূটিল অর্থনীতি—এই তিন নীতির ঘূর্ণিতে পড়ে গ্রাম গ্রাম-বাঙলার জনগণ চললো ভেসে, আর দুর্যোগের অন্ধকারে চরম অসহায়তার মাঝখানে পরিচয় লাভ করল একটা সঙ্ঘবন্ধ প্রতিরোধমূলক অমর জীবনের—বিরাট সংগ্রামশীল জীবনের। এই হলো 'নবান্ন' নাটকের আবহাওয়া।

প্রচলিত নাট্যকাহিনীগুলির মতো এর গল্পাংশ কোনো নায়ক-নায়িকাকে কেন্দ্র করে ক্রমোন্নত একটা চরম আবহাওয়ায় এসে শেষ হয়নি। এবং কাহিনী গোটা আমিনপুর নিয়ে—বাঙলার সমস্ত গ্রামকে নিয়ে। দুর্দিনতাড়িত প্রধান সমাদ্দারের পরিবারের আশেপাশে অসংখ্য পরিবার এসে মিশেছে পথের প্রান্তে। নায়ক-নায়িকার বিশিষ্ট অংশগ্রহণ করে সবগুলি চরিত্রই তাদের জীবনের নির্মম বক্তব্যকে ভাষা দিয়ে গিয়েছে। আগাগোড়া একটা জীবনের বাস্তববোধকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে চীৎকার করে উঠতে শোনা যায় প্রত্যেকটি চরিত্রে—সেখানে কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়, কেউ কারুর চেয়ে বড় নয়। একজনের দুঃখ নাটকের পরিণতির খাতিরে আর সকলের মর্মবেদনাকে ম্লান করে দেয়নি। জীবনের এই বাস্তববোধ আর সামঞ্জস্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা দুর্লভ গুণ। নাটকের গতির সঙ্গে সঙ্গে একটা জিনিস মনে আঘাত করে। মনে হয় এর প্রত্যেকটি দৃশ্য স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রত্যেকটি দৃশ্য শেষ হচ্ছে একটা চরম আবহাওয়ায় এসে। তাতে নাট্যকাহিনীর ক্রমপরিণতি ব্যাহত হচ্ছে। ১৯৪২ সাল থেকে ৪৪ সাল পর্যন্ত যে বিভিন্ন বিপর্যয় নেমে এসেছে গ্রাম-বাঙলার গণজীবনে—তার প্রত্যেকটিতে দেখানো হয়েছে যেন বিচ্ছিন্ন করে। গণজীবনের বিরাট এক গোষ্ঠী নিয়ে এর পরিকল্পনা, তাতে কিন্তু এইটে আসাই স্বাভাবিক। এবং গত তিন বছরের বিভিন্ন বিপর্যয়—তারা কেউ কারুর চেয়ে খাটো নয়। প্রত্যেকটি নাট্যস্রষ্টার গভীর অন্তদৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে। যার ফলে বিভিন্ন বিপর্যয়-সমন্বিত দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

'নবান্ন'কে ভোলা যায়না। এই তিন বছরের আবহাওয়া দেশী-বিদেশী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বহু কারণে যেমন নাটকীয় হয়ে উঠেছে—তেমনি একটা বিরাট ও অমর জীবনদর্শনের পরিচয় হয়েছে—যা ছাড়া আমরা বাঁচতে পারিনা, আমাদের জাতীয় জীবন—আমাদের গণজীবন বাঁচতে পারেনা। সে হচ্ছে সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, বলিষ্ঠ সংগ্রামশীল জীবনের আত্মচেতনা। এই আত্মচেতনা এসেছে ধীরে ধীরে—আমাদের গণজীবন অর্জন করেছে একে বীর্য দিয়ে, মূল্য শোধ করেছে নির্মমভাবে। গোটা নাটকটি জুড়ে এই চেতনা ধীরে ধীরে পরিবর্ধিত হয়েছে। নানান বিপর্যয়ের মাঝখান দিয়ে যেতে যেতে আমিনপুরের সমাদ্দার-পরিবার আর আশেপাশের বহু পরিবার পরিচয় পেয়েছে তার চারপাশের। পথের জীবনের পরিচয় পেয়েছে পথের। এইরকম একটা সমগ্রতার সঙ্গে পরিচয়ের পরই একটা বলিষ্ঠ জীবনদর্শন গড়ে উঠতে পারে। তাই নাট্যকাহিনীর ক্রমপরিণতির যে ত্রুটিটা বিচ্ছিন্ন

দৃশ্য বলে মনে হয়—সেই ত্রুটির অন্তরালে গত তিন বছরের আবহাওয়ার একটা ক্রমপরিণতির ধারা নাট্যসংঘাতের চড়াই-উৎরাই ভেঙে সুষ্ঠুভাবে এগিয়েছে। খোলা মনে শিথিল দেহে নাটক-দেখতে গিয়ে ফিরে আসতে হবে প্রতিজ্ঞা-কঠোর মন নিয়ে, দৃঢ় মুষ্ঠিতে বলিষ্ঠ এই প্রাণশক্তির উদ্বোধন 'নবান্ন'র প্রাণবস্তু। সমাদ্দার-পরিবারের পুত্রশোকাতুর বৃদ্ধ—গ্রামবাঙলার পিতৃপুরুষ প্রধান সমাদ্দার উন্মাদ নয়, সে একটা প্রাণপ্রাচুর্যের দুর্জয় উন্মাদনা। বাঙলার গণজীবনের এই প্রাণস্পন্দন কোথাও দেখিনি, 'নীলদর্পণে'ও না। এতদিন শুধু দেখেছি নিরুপায় মর্মান্তিক মৃত্যু, আর সকাতর আর্তনাদ। সেইটেই শুধু সত্য নয়—তারও আড়ালে জীবনের একটা সুগভীর আর্তনাদ আছে, যেটা সাহিত্যকে বিরাটত্ব দান করে—সার্থক সৃষ্টির পথে এগিয়ে দেয়। সাহিত্যের সেইটেই বড় বাস্তব—বড় সত্য। সেই সাফল্যের পথযাত্রী রূপে আমরা 'নবান্ন'র রচয়িতা শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যকে অভিনন্দন জানাই।

তারপর 'নবান্ন'র অভিনয়নৈপুণ্য। প্রত্যেকটি চরিত্রের পেছনে সমসাময়িক আবহাওয়ার এমন একটা মর্মান্তিক প্রেরণা আছে, যার ফলে তারা কমবেশি নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে সার্থক ও সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে। যেমন বৃদ্ধ ভিখিরির চরিত্রে অধ্যাপক গোপাল হালদার, পঞ্চাননীর ভূমিকায় শ্রীযুক্তা মণিকুন্তলা সেন প্রভৃতি। বড় চরিত্রগুলির তো কথাই নেই। এই নৈপুণ্যের মস্ত বড় একটা প্রেরণা যেমন অভিনেতাদের গণজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগের ফলে, তেমনি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মীদের বিরাট আশাবাদী অবিচলিত দেশপ্রেমের জন্যও বটে।

বাঙলার নাট্যশালাগুলি মাকড়সার মতো জাল বুনে চলছিল ঘরের কোণের অন্ধকারে—হৃদয় দেওয়া-নেওয়ার সহস্র কাহিনীকে অবলম্বন করে। দর্শকসাধারণ এই নিয়ে ছিল অন্ধ। কোনো রাজনৈতিক দলে না ভিড়ে বৃহত্তর জাতীয় জীবনের সঙ্গে কোনো পরিচয় ছিল না নগরবাসীদের তথা জাতীয় জীবনের শিক্ষিত অংশের। নানা বিরোধী ভাবধারার মধ্যে তারা বিভ্রান্ত হয়েছে, বিচলিত হয়েছে। এবং মাঝখানে জাতীয় সংস্কৃতির উদ্যাপনকল্পে একদল তরুণ-তরুণীর আর্বিভাব ও গণনাট্য সংঘের সৃষ্টি বাংলার নাট্যসাহিত্য ও মঞ্চশিল্পকে এক নতুন সৃষ্টির পথে অগ্রসর করে দিয়েছে। সুমুখে বিপদ আছে অনেক তবু আমরা আশা করব—বাংলা নাট্যসাহিত্যের, জাতীয় সংস্কৃতির, গণজীবনের সম্ভাবনাময় বিরাট সংগঠনের। গত তিন বছর নিশ্চয়ই নিঃশেষে হারিয়ে যাবেনা। জাতীয় জীবনকে যে নির্মম মূল্য দিতে হয়েছে তা ব্যর্থ হবেনা। বাস্তবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই মানুষকে বাঁচবার প্রেরণা জোগায়, তাকে মহান করে—বিরাট করে; তাকে পথ দেখায়।

'নবান্ন'র মঞ্চ-ব্যবস্থাপনায় শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্র ও বিজন ভট্টাচার্য যে সাফল্য ও কলানৈপুণ্য দেখিয়েছেন—তা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

(২)

নবান্ন / মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

যাঁরা 'জবানবন্দী' দেখেছেন, তাঁরা 'নবান্ন' থেকে নূতনত্বের চমক পাবেন না। কিন্তু পাবেন আর এক ধরনের চমক। বিস্তৃতি ও বলিষ্ঠতায় গণনাট্য সংঘের দ্রুত উন্নতি সত্যই চমকপ্রদ।

'নবান্ন' পড়ে মনেই হয়না এর মঞ্চোপযোগিতা থাকতে পারে। এ নাটককে রূপ দেবার সাহস ও সফলতা গণনাট্য সংঘের পক্ষেই সম্ভব। কারণ, এমন আদর্শবাদী রূপতপস্বী সমবায় কোনো ব্যবসাদারী থিয়েটারের পক্ষে গড়ে তোলা সম্ভব নয়। ছোট বড় বহু সংখ্যক ভূমিকা সমানভাবে প্রাণ দিয়ে অভিনয় করতে পারেন তাঁরাই, যাঁরা জানেন মাত্র জনসেবাই এর লক্ষ্য—নিজেদের প্রতিষ্ঠা নয়।

'নবান্ন' নাটকত্বের বিচার অন্য নাটকের সূত্রে চলবে না। এ এক নতুন সৃষ্টি। এদের কানুন তৈরি হবে পরে। এদের পাঠক-দর্শক-সমালোচক কারো মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হয়না। গোড়া থেকেই বাঙালি এদের নিজের বলে চিনে নিয়েছে। সেইখানেই তো গণনাট্য সংঘের সাহস ও শক্তি, আর নতুন নিয়ে পরীক্ষা করবার সুযোগ। গণনাট্য সংঘের দায়িত্বও সেইখানে। 'জবানবন্দী'র পরে 'নবান্নে' সে দায়িত্ববোধের পরিচয় দর্শক যথেষ্ট পেয়েছেন।

রস পরিবেশনের সঙ্গো সঙ্গো সমাজমনকে সাময়িক সমস্যার প্রতি মনোযোগী করে তোলবার শিক্ষা পরিবেশন গণনাট্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। নিকটতম উদ্দেশ্য পিপল্স রিলিফ কমিটির প্রয়োজনে অর্থ সংগ্রহ। বাংলায় অনাহার মৃত্যু চোখের ওপর ঘটেছে না বলে বন্ধ হয়নি। এখন আবার মহামারীর পালা। রিলিফের কাজ বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হবার সময় এখনো অনিশ্চিত ভবিষ্যতে। গণনাট্য সংঘের অভিনয় এখনো তাই ক্ষুধার্ত পীড়াগ্রস্ত বাংলার আর্তনাদ। সংঘ দেশবাসীর কাছ থেকে কামনা করেন, ধনীর কাছ থেকে ধন, শিল্পীর কাছ থেকে শিল্পজ্ঞান, সমালোচকের কাছ থেকে উপদেশ। আশার কথা, সাধারণভাবে সংঘ তা পাচ্ছেন।

বিজন ভট্টাচার্য নাট্যকার-অভিমানে নাটক লেখেননি। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর নমুনা নিয়ে এক একটি চরিত্রের মুখে তাদের কথা সহজভাবে বলিয়েছেন। প্রতিকূল সমাজব্যবস্থার অনিশ্চিত ভবিষ্যতে ভয়ে কারো মনে স্বস্তি নেই, যে যার কোলে ঝোল টানবার জন্যে ব্যস্ত। মূলধনীর ধনবৃদ্ধির লোভ, মধ্যবর্তী দালালের আত্মরক্ষায় হিতাহিত জ্ঞানলোপ, নিম্নমধ্যবিত্তের অসহায় অবস্থার ফলে হৃদয়হীনতা, আর সকলের চাপে নিষ্পেষিত ভূমিজ চাষী। এই অব্যবস্থিত সমাজ বাইরের সামান্য আঘাতে টালমাটাল তো হবেই।

কিন্তু ধ্বংস যত বড়ই হোক প্রাণের অঙ্কুর তার ফাটলের মাঝখান দিয়ে আবার গজিয়ে ওঠে. মানুষের আত্মপ্রত্যয় আর দাম্পত্যজীবনের মাধুর্য সহস্র ঘা খেয়েও যায়না, 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত এই আশার বাণী শুনিয়ে যায়। সমাজের কাঠামোকে শক্ত করতে গেলে জ্ঞাতসারে সমবেত চেষ্টার যে প্রয়োজন, নিরক্ষর চাষীর কাছেও তা প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, চাষীরা 'গাঁতায় খাটতে' লেগে যায়।

অভিনয়শক্তি সকলের সমান থাকেনা, শিক্ষার সুযোগও সকলের সমান হয়নি, কাজেই ব্যক্তি নিয়ে তুলনামূলক আলোচনা এঁদের করবনা। সকলেই সমান আন্তরিকতার সঙ্গে, উদ্দেশ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করে যে অভিনয় করেছেন তাতে সন্দেহ নেই। একটি অনাড়ম্বর অথচ সুষ্ঠু পৃষ্ঠপটের সম্মুখে অভিনয় এঁদের তাই এত প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। এতগুলি ছোট বড় ভূমিকাকে এরূপ নিপুণভাবে একসূত্রে গেঁথে তোলা উচ্চশ্রেণীর পরিচালনাশক্তির পরিচয় দেয় এবং আবহধ্বনি ও সুর তার অঙ্গ।

(গ)

নবান্ন প্রসঙ্গে/স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

'পরিচয়' সরাসরি রায় দিয়েছেন : 'নাটক হিসেবে 'নবান্ন'-কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না।" তবু ঐ নাটকের অভিনয় 'পরিচয়'-এর সম্পাদকেরও খুব ভাল লেগেছে। তার কারণ " 'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে।"

আমার মতে 'নবান্ন' রীতিমত সক্ষম রচনা, তার একাধিক দোষ ত্রুটি আছে। তা বড় কথা নয়। প্রথম কথা 'নবান্নে' কি পেলাম। এতদিন যাকে আমরা পাবার আশায় ছিলাম তার সবটা না পেলেও যদি তার অনেকটা বা কিছুটাও পেয়ে থাকি, সেই কি কম? 'নবান্নে' পেয়েছি এতকালের অনাদৃত বৃহত্তর বঙ্গদেশকে। বাংলার চাষীর সুখ-দুঃখের দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সঙ্কল্পের চমৎকার আলেখ্য 'নবান্ন'। কেবল বিষয়বস্তুর জোরেই 'নবান্ন' সার্থক নয়। এ বইয়ের সাহিত্যিক সাফল্যও যথেষ্ট। 'নীলদর্পণ'-এর বহুকাল পরে বাংলার অপাংক্তেয় কৃষক বাংলা রঙ্গমঞ্চের নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশাধিকার আদায় করে নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার নিজের কথা নিজের মতো করেই অনায়াসে বলেছে, কেঁদেছে, কোঁদল করেছে। হাসিয়েছে, নাড়া দিয়ে চলে গেছে। এক কথায় নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এ কি অক্ষমতার পরিচয়? অনভ্যস্ত মাঝে মাঝে কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে কিংবা দু-এক স্থানে একটু-আধটু বাড়াবাড়ি হয়তো করে ফেলেছে। সেই কি একমাত্র বিচার্য বিষয়।

'নবান্ন'-র ত্রুটিগুলির অধিকাংশ তার Birthmarks, নতুন ভুঁইফোঁড় নয়। পুরাতনের জঠর থেকে আসে সে। যে দু-চারটে গতানুগতিক বা মঞ্চঘেঁষা ত্রুটি আছে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের পরবর্তী নাটকগুলিতে সে-সব গৌণ বিষয় এক এক করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে আমরা আশা রাখি। 'নবান্ন' নবাঙ্কুর বলেই তার অবশিষ্ট ত্রুটিগুলিও আর এক অর্থে ত্রুটি নয়—সেগুলিকে প্রচলিত নাট্যকলা বিচারের অভ্যস্ত চশমা চোখে এঁটে বিচার করলে চলবে না। যেমন, কেউ কেউ বলেছেন, একখানি নাটকে এতটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের ভিড়ে ঠাস বুনটের গলদ রয়ে গেছে। এ অভিযোগ সত্যি হলেও তাকে অসাফল্য বলা চলেনা। নতুন সর্বত্র বা প্রধানত পুরাতনের বিধিবিধান না মেনে নির্ভুল পথে পা বাড়িয়েছে কিনা সেই কথাই বিচার্য। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিমত উল্লেখযোগ্য মনে করি, "নবান্ন নতুন নাটক। এর কানুন রচিত হবে পরে।" 'পরিচয়' বলেছেন, "ঘটনা-পরম্পরায় এই প্রকাণ্ড তালিকা

যাকে গত দু-বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায় একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে।" যুগান্তকারী প্রতিভা কি স্বয়ম্ভু? তা যদি না হয় তবে একদিন যুগান্তকারী প্রতিভা 'নবান্ন' প্রভৃতির কল্যাণে অনেকখানি তৈরি পথ পাবেন। সেই পথ পরিষ্কারের কাজকে কি মোটেই সক্ষম রচনা নয় বলব? 'পরিচয়' সম্পাদকের অভিমতের ন্যায় আমার এই মতামতও চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতে পারেনা। সমঝদার মহলের কাছ থেকে সমালোচনা আমরা প্রত্যাশা করি। ছোট বড় ত্রটিবিচ্যুতিগুলি নিয়েও 'নবান্ন' এমন এক বহুপ্রত্যাশিত ফললাভ—যার সম্পর্কে এক কথায় বায় দেওয়া সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়।

(ঘ)
নবান্ন/কালিদাস রায়

'নবান্নে'র অভিনয় এতই চমৎকার হইয়াছে যে, আমি যে নগরের রঙ্গালয়ে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হাবভাব, চালচলন, বাগ্‌বিন্যাস, উচ্চারণভঙ্গি এমন কি আকৃতি প্রকৃতিতে এমন যথাযথতা, কোনো, অভিনয়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়না। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। আমরা কাঙাল চাষীদেরই প্রতিবেশী। কাজেই যথাযথ হইল কি না বলিবার অধিকার আমাদেরই আছে—চিরনগরবাসীদের নাই।

এই অভিনয় দেখিতে গিয়া আর একটা কথা মনে হইয়াছে। নগরের শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা নাগরিক বেশ ত্যাগ করিয়া চাষা-চাষীদের বেশ ধারণ করিয়াছিল। মনে হয় নাই তাহারা চাষা-চাষাণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে মনে হইয়াছে—গরীব, দুঃখী, চাষা-চাষাণী ও নগরের যুবক-যুবতী একই জাতির লোক—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি প্রকৃতিতে কোনো বৈষম্য নাই। কেবল জামা জুতা চশমা ঘড়ি চুরুট সিগারেট ইত্যাদিই পল্লী ও নগরের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে—দর্জ্জি ও ধোবা একই জাতির লোককে এতটা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই পুরাতন সত্যকেই সেদিন হারাধনের মতো যেন ফিরিয়া পাইলাম।

বহু কাব্য-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে বাংলার দুঃস্থ দুর্গত পল্লীজীবনের চিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি ; কিন্তু তাহাতে আমার তটস্থ উদাসীন সাহিত্যিক মন বিচলিত হইয়া আমার নেত্রযুগলে বাষ্পের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। 'নবান্নে'র অভিনয় দেখিতে গিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এই অশ্রু অলস বাষ্প মাত্র নয়—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে একটা অকপট কল্যাণ বুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে। মনে হইয়াছে, এই দুঃস্থ দুর্গতদের জন্য আমার যতটুকু করিবার ছিল তাহা করাহয় নাই। এজন্য অনুতাপ জন্মিয়াছে—নিজের আরাম বিলাসের হৃদয়হীন জীবনযাত্রার প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে—ভবিষ্যতে আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু কবিবার জন্য সংকল্পও জাগিয়াছে। তাহাছাড়া দেশ, সমাজ, রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম, কৃষিশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে। মোটের উপর 'নবান্ন' আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আমূল আলোড়িত

করিয়াছে। এই সমস্তই সাময়িক সন্দেহ নাই—কিন্তু মনের উপর একেবারে কোনো ছাপ রাখিয়া যায় নাই তাহা মনে হয়না। আজ একমাস অতীত হইল এখনো আমার মন হইতে 'নবান্নে'র ছায়া অপসারিত হয় নাই।

'নবান্ন' অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছি। 'নবান্ন'কে একটি পরিপূর্ণাঙ্গ নাটক না বলিয়া ইহাকে একখানি দৃশ্যকাব্য বলিতে চাই। ইহাতে গীতধর্ম অপেক্ষা চিত্রধর্মই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা কতগুলি জীবন্ত জ্বলন্ত প্রাণস্পর্শী দৃশ্যের একত্র গ্রন্থন, খাঁটি বাংলার জীবনসূত্রে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের আবহাওয়ায়।

মাটির যাহারা খাঁটি মালিক—আসল বাংলাদেশ যাহাদের সুখদুঃখের মধ্যে অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে তাহাদের উপেক্ষিত জীবনযাত্রা লইয়া রচিত নাটক বাংলা সাহিত্যে এই বোধহয় প্রথম। এই নাটক পূর্ববর্তী কোনো নাটকের অনুকৃতি নয়। ইহার বিষয়বস্তুতে মৌলিকতার দাবি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবযুগে নাট্যসাহিত্যের ইহা অগ্রদূত।

আমরা নানা প্রবন্ধে, সংবাদপত্রে, কবিতায় ও উপন্যাসে দেশের মর্মস্থলের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি। কিন্তু সে পরিচয় একটা কোনো না কোনো পর্দার মধ্য দিয়া। 'নবান্ন' রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেশের মর্মস্থলকে প্রত্যক্ষভাবে উদঘাটিত করিয়াছে।

(৬)

নাট্যকলা : নবান্ন/হিরণকুমার সান্যাল

(১)

সম্প্রতি ভারতীয় গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখা কর্তৃক কলকাতার 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গালয়ে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। এ নাটকখানা ও গণনাট্য সংঘের এ সার্থক অভিনয় বিশেষ আলোচনার যোগ্য। বারান্তরে আমরা তা করব আশা করি।

নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলেনা। এতে গল্পের অখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশি লক্ষণীয়। ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট বিশৃঙ্খলার পর থেকে বাংলার চাষী ও গ্রাম্যজীবনের আওতায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী থেকে শুরু করে যতগুলি মর্মান্তিক বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলি, আর সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত-জীবনের সংবাদপত্রীয় মন্বন্তরবিলাস, ব্যবসাদারী চাল ও নারী রপ্তানির হৃদয়হীনতা, কিংবা সরকারী চিকিৎসা, রিলিফের অক্ষম প্রহসন—এতগুলি ব্যাপার এই একটি নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনা-পরম্পরার এই প্রকাণ্ড তালিকা, যাকে গত দু'বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায়, একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। সেই প্রতিভার পরিচয় আজও পাওয়া যায়নি। তবে, বিজনবাবু নতুন ধরনের নাটক রচনার চেষ্টা করে বাংলা সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন, এ কথা স্বীকার করতে হবে।

‘নবান্ন’ নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে। এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই যে, এর সার্থকতার মূলে রয়েছে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা নয়, সমগ্র মণ্ডলীর উৎসাহিত উদ্যম। বাংলাদেশের অনেক লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে আজ যে নতুন প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়, গণনাট্য সংঘের উদ্যোগে আজই সেই প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে বাংলা রঙ্গমঞ্চে—তাই সাহিত্যের মতো সেখানেও অনেক বেশি মূল্যবান বর্তমানের সামান্য সার্থকতার চেয়ে ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার আশাপ্রদ ইঙ্গিত।

(পরিচয় : আশ্বিন, ১৩৫১)

(২)

‘নবান্ন’ বই আমি পড়িনি, কিন্তু অভিনয় দেখে যতদূর মনে হয় বহু উৎকর্ষ সত্ত্বেও নাটকীয় রচনা হিসাবে এর ত্রুটি এত গুরুতর যে ‘নবান্ন’ শেষ পর্যন্ত যথার্থ নাটকীয় সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।

অভিনয় দেখার এতদিন পরে এই নাটকটির সবগুলি ত্রুটির উল্লেখ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সহজসাধ্য নয়। যে ত্রুটিগুলি বিশেষভাবে মনে পড়ে তারই উল্লেখ করছি। একেবারে প্রথম দৃশ্যে বিশেষ একটি গ্রামের ও সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের যে অবস্থা উদঘাটিত হয় পরবর্তী দৃশ্যগুলির সঙ্গে তার সংযোগের সূত্র অতি ক্ষীণ। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি শুধু নাট্যকারের নয়, পরিচালকেরও। আচমকা কতকগুলো লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটন, পরের ঘটনাপ্রবাহে থাকল তার অস্পষ্ট রেশমাত্র। অর্থাৎ নাটকটির সূত্রপাতে এমন একটি রহস্য থেকে গেল যার সমাধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

কিন্তু তবু অভিনয় জমল, লেখকের মর্মস্পর্শী আলেখ্য অবলম্বন করে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নৈপুণ্য ও পরিচালক-প্রযোজকের শক্তিশালী পরিকল্পনার ফলে। মাঝে মাঝে স্খলন হয়েছে, যদিও গুরুতর নয়, যথা :

ছোট বৌর গায়ে হাত তোলার অপবাদ দিয়ে বড় ভাই নিরপরাধ ছোট ভাই-এর ওপর যে-ভাবে গগনভেদী মারণ ও তাড়ন লীলা প্রকট করলেন তাতে বৌর মুখ বুঁজে থাকা ভাসুর-ভাদ্র বৌর সলজ্জ্ সম্পর্কের দোহাই দিয়েও অত্যন্ত অস্বাভাবিক, বিশেষত চাষীর ঘরে। ‘তোরা যা, আমি যাবনা’। বেসুরো গলায় এই সুরোৎপাদন প্রচেষ্টা খুব শোভন হয়নি; ততোধিক অশোভন এই সঙ্গে নট ও নটীর তথা ভিক্ষুক ও ভিখারিণীর তালে তালে পা ফেলে নিষ্ক্রমণ। এই দৃশ্যে অশোভনতার চরম করুণ বংশী-বিলাপ। খেলো সিনেমা আঙ্গিকের এই অনুকরণ ‘নবান্ন’র আসরে একেবারেই অপাংক্তেয়।

রিলিফ হাসপাতালের পরিবেশে ডাক্তারটির ছিমছাম পোশাক ও চাঁচাছোলা মুখস্থ-করা কেতাবী বয়েৎ সমান বেমানান। এক সত্যিকারের ডাক্তার নাকি এই ভূমিকায়. নেমেছিলেন। একথা সত্য হলে তাঁর পোশাক ও বুলি দুই-ই কিঞ্চিৎ অভিনয়দুরস্ত করে নেওয়া উচিত ছিল।

এই জাতীয় ত্রুটি হয়তো আরো দু-একটি আছে। এখন তার সঠিক বর্ণনা আমার অসাধ্য। যাই হোক, এগুলি গৌণ ত্রুটি—অত্যন্ত গৌণ। ‘নবান্নে’র নাটকীয় সম্পূর্ণতাকে এরা অতি সামান্যই ক্ষুন্ন

করেছে। 'নবান্নে'র দুর্বলতম অংশ শেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যে গ্রন্থকার যেভাবে তাঁর উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা শুধু রোমান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটির পূর্বাংশের সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিহীন। মারী ও দুর্ভিক্ষে যে গ্রাম ছারখার হয়েছে ও এই প্রচণ্ড দ্বৈতবিভীষিকা যথেষ্ট নয় মনে করে গ্রন্থকার যে গ্রামকে বন্যা দিয়ে বিধ্বস্ত না করে খুশি হননি, ঠিক সেই গ্রামে সেই প্রধানের কুটির-প্রাঙ্গণে অক্ষত দেহে ফিরে এল একটির পর একটি গ্রামত্যাগী দুঃস্থ, যারা দু'দিন আগে শহরের পথের ডাস্টবিন হাতড়ে খুঁজেছে জীবনধারণের শেষ সম্বল। বৃদ্ধ প্রধান পর্যন্ত এই মিলনান্ত দৃশ্য থেকে বাদ পড়লেন না, তাঁর মাথা গেল বিগড়ে কিন্তু আশি বছরের প্রাচীন দেহ কায়কল্প চিকিৎসা না করেও শেষ পর্যন্ত রইল সক্ষম। মাঝখান থেকে মারা গেল একটি অসহায় শিশু, তাও গ্রাম ত্যাগের আগেই। লেখকের এই শিশুহত্যার প্রবৃত্তি—পূর্ব নাটক 'জবানবন্দী' স্মরণীয়—তাঁর কলমের পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এর ফলে সাময়িকভাবে যে করুণ রসের সৃষ্টি হয় নাটকের ঘটনা বিরচনে তা প্রায় অবান্তর।

কিন্তু নাটক হিসাবে 'নবান্নে'র এই গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও অভিনয় ও পরিচালনায় অসাধারণ উৎকর্ষের ফলে 'নবান্ন' দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি, যেমন আরো বহু দর্শক হয়েছেন। এর ফলেই কথা ওঠে—স্বর্ণকমলবাবু যার উল্লেখ করেছেন—একটি অক্ষম নাটককে অবলম্বন করে অভিনয় ও প্রযোজনার এতখানি কৃতিত্ব কি সম্ভব? এর উত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে, তা যদি না সম্ভব হতো তাহলে বাংলাদেশের শিশির ভাদুড়ীর মতন অভিনেতার অভ্যুদয় হলো কি উপায়ে? 'সীতা' বা 'আলমগীর'কে যদি সক্ষম নাটক বলতে হয় তাহলে অক্ষম নাটক কাকে বলে জানিনা। আরো দৃষ্টান্ত দিতে পারি, কিন্তু দরকার বোধ করছি না।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে, 'নবান্ন' নাটক হিসাবে—'নাটক' কথাটির ওপর বিশেষ জোর দিয়ে বলছি—অক্ষম হলেও 'সীতা' বা 'আলমগীর'-এর মতন নিম্নশ্রেণীর রচনা নিশ্চয়ই নয়। 'নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কারণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ঐ অংশগুলিতে ঘটনা-বিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় সে, দৃশ্যে এসে তা একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পণ্ড। কিন্তু শেষ দৃশ্যটি বাদ দিলে যা বাকি থাকে তাকে যদিও সম্পূর্ণ নাটক বলা চলেনা তবু একাধিক কারণে তা নিঃসন্দেহে অসাধারণ রচনা। কেন অসাধারণ সে কথা স্বর্ণকমলবাবু ও কালিদাসবাবু দুজনেই বলেছেন ও এ বিষয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত; তাঁদের সঙ্গে বিরোধ এই যে আমি 'নবান্ন' দেখেছি শুধু সমঝদারের দৃষ্টিতে নয়, সমালোচকেরও, তাই শেষ দৃশ্যের অসংগতি আমার চোখ এড়ায়নি।

কিন্তু এই শেষ দৃশ্যই আবার অন্যান্য পাঁচজনের মতন আমারও চোখে বোধ হয় সব চাইতে ভালো লেগেছে। এই দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। এতগুলি লোককে স্টেজে নামালে গণ্ডগোলের সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক, বহুক্ষেত্রে হয়েও থাকে তাই। এক্ষেত্রে কিন্তু এতগুলি লোককে যেভাবে বাগ মানানো হয়েছে তাতে এই দৃশ্যটির পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় অসাধারণ বাহাদুরির তারিফ না

করে পারা যায়না। এই বাহাদুরির ভাগীদার হিসাবে অন্যতম পরিচালক বিজনবাবুকে তাঁর প্রাপ্য দিতে আমি একটুমাত্র কুণ্ঠিত হবনা, যেমন হবনা অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রশংসা করতে। জায়গায় জায়গায় মনে হয়েছে যে বিজনবাবুর অভিনয়ে একটু যেন আতিশয্য এসেছে। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা আছে।

মোটকথা এই যে, যদিও বিজনবাবু একটি সক্ষম নাটক লিখে উঠতে পারলেন না, অর্থাৎ যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল নাটকটির প্রথম দিকে শেষ পর্যন্ত তা গেল ভেস্তে, তবু এমন একটি নাটক রচনার চেষ্টা তিনি করেছেন যা শুধু চেষ্টার গুণেই স্মরণীয়। অবশ্য গুণ শুধু চেষ্টার নয়। সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজনবাবুর কলম ও কল্পনা এতদুর এগিয়েছে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছেন, এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। কিন্তু এই নতুন আবহাওয়ার স্রষ্টা একা বিজনবাবু নন, তাঁর সঙ্গে ও তাঁর পেছনে রয়েছে গণনাট্য সংঘ। এই সংঘের প্রেরণা ও উদ্যম ছাড়া বাংলার রঙ্গমঞ্চে 'নবান্নে'র অভ্যুদয় ছিল অসম্ভব। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের অভিনয় কুশলতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেন না তা অবিসংবাদিত।

(পরিচয় : কার্তিক, ১৩৫১)

(চ)

মন্বন্তর ও সাহিত্য/তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে নাটকের ক্ষেত্রে নূতন আবেগ এবং নূতন সুর যোজনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য। এই মন্বন্তরকে অবলম্বন করেই সে সুর, সে আবেগ পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ করেছে। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক ব্যাকরণ অনুযায়ী হয়তো এখনও আদর্শ নাটক হয় নাই, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে যে প্রচণ্ড অবরুদ্ধ আবেগ সে সত্যই অতুলনীয়। এই সঙ্গে তার অদ্ভুত অভিনয়-প্রতিভার কথাও প্রসঙ্গক্রমে আমি উল্লেখ করছি। নাটকের ক্ষেত্রে বিজন ভট্টাচার্যের আগমন বিপুল প্রত্যাশার সঞ্চার করেছে।

(ছ)

ভারতের মর্মবাণী/মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

সংস্কৃতির কোনো বিশিষ্ট রূপ ও ধারাকে সংস্কারের মতো রূপান্তরহীন করে রাখলে তার কোনো ভবিষ্যৎ থাকে না, তার মৃত্যু অনিবার্য। লোক-কলাকে বাঁচাবার ও লোকশিক্ষার বাহন হিসাবে তাকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্য তখনই সফল হতে পারে, যদি জনগণের জীবনের বর্তমান বাস্তবতার সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করা যায়, তাদেরই জীবন্ত আনন্দ-বেদনা আশা-নিরাশা সঙ্কট ও সমস্যা রূপায়িত হয়। গণনাট্য সংঘ এটা উপলব্ধি করেছেন। তাঁরা তাই শুধু দেশের সামনে লোক-কলার কতগুলি নমুনা ধরে দেশবাসীর কাছে আবেদন জানাননি—জাতির এই সম্পদকে রক্ষা করা চাই। জানালে সেটা

অরণ্যরোদন হতো মাত্র। নিজেরাই তাঁরা কাজটা আরম্ভ করেছেন—দেশের সামনে শুধু আদর্শটা নয়, উপায়টাও ধরে দিয়েছেন। সকলের মন তাই নাড়া খেয়েছে, সাড়া মিলেছে।

এই কার্যে ব্রতী তরুণ ও অ্যামেচার অভিনেতা ও অভিনেত্রী নিয়ে গড়া এই বাহিনীটির বয়স এক বছরও পূর্ণ হয়নি। এদের এই অপূর্ব অভিনয়নৈপুণ্য কোথা থেকে এল? কি এঁদের অভিনয় সাফল্যের মর্মকথা? এর একটি মাত্র জবাব জানি—এঁরা শুধু শিল্প-প্রাণ নন, দেশপ্রাণও বটে। আর্টের জন্য আর্টের ধোঁয়ায় এঁদের চোখ কটকট করে না, শিল্পীর কর্তব্য সম্বন্ধে এঁদের দ্বিধাও নেই, দুর্বলতাও নেই। এই প্রসঙ্গে গণনাট্য সংঘের বাংলা শাখার এমনি অল্পবয়সী এ্যামেচার অভিনেতা অভিনেত্রীদের প্রদর্শিত 'জবানবন্দী' ও 'নবান্ন'র কথা স্মরণীয়। এ দুটি নাটক নাট্যজগতে কি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে কারো তা অজানা নয়। 'নবান্ন' অভিনয়ের জন্য আজ চেষ্টা করেও স্টেজ ভাড়া পাওয়া যায়না। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের কর্তারা ভয় পেয়ে গেছেন। অথচ এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার কোন ইচ্ছাই গণনাট্যের নেই— এঁরা ব্যবসায়ী নন, লাভের টাকা শিল্পী বা পরিচালক কারো পকেটে যায়না। বাংলার দুর্ভিক্ষের জন্য বাংলা শাখা বোম্বাই ও পাঞ্জাবে সফর দিয়ে লক্ষাধিক টাকা সংগ্রহ করেছিল, 'নবান্ন' অভিনয়ের কয়েক হাজার টাকা বাংলার মহামারীর চিকিৎসায় লেগেছে।

কথাশিল্পী হিসাবে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কাছে একটি ব্যক্তিগত ঋণের কথা স্বীকার না করলে অন্যায় হবে। নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা ঋণ নয়, ওটা শুধু আমাকে নয় সকলকেই ওঁরা পরিবেশন করেছেন, সেজন্য ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞতা জানাবার প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যিক হিসাবে আমার একটি ভীরুতা সম্বন্ধে এঁরা আমাকে সচেতন করেছেন। পাঠক-সাধারণকে একটু বেশিরকম ভোঁতা ও একগুঁয়ে মনে করার প্রতিক্রিয়া অনেক লেখকের রচনাতেই কতগুলি অনাবশ্যক সতর্কতা হয়ে দেখা দেয় নানা ভাবে, সমস্ত রচনাটিকে প্রভাবান্বিত করে। লেখকের ভীরুতাই এজন্য দায়ী। সংঘের অভিনব প্রচেষ্টাকে সাধারণ দর্শক যেরকম উদারতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন তাতে আমি উপলব্ধি করেছি যে আমরাই, লেখক ও শিল্পীরাই, পাঠক ও দর্শক-সাধারণের ঘাড়ে অযথা দোষ চাপাই, তাঁদের কতগুলি সঙ্কীর্ণতা ও বিরোধিতা স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নিই। আসলে তাঁরা আমাদের সব রকম সুযোগ ও স্বাধীনতা দিতে সর্বদাই প্রস্তুত, আমরাই তাঁদের এই উদারতা স্বীকার করতে ভয় পাই। আমি বিশ্বাস করি নিজের এই দুর্বলতা চেনার ফলে আমার লেখার উন্নতি হবে।

(উদ্ধৃতিসূত্র : ধনঞ্জয় দাশ সম্পাদিত মার্কসবাদী সাহিত্য বিতর্ক (৩য় খণ্ড)

একক ৮৮ ❑ নাট্যমঞ্চ ঃ দেশী ও বিদেশী

গঠন

৮৮.১ উদ্দেশ্য
৮৮.২ প্রস্তাবনা
৮৮.৩ মূলপাঠ (প্রথম অংশ) দেশী নাট্যমঞ্চ পরিকল্পনা ঃ সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের গঠন ও তাৎপর্য আলোচনা
৮৮.৪ সারাংশ
৮৮.৫ অনুশীলনী ১
৮৮.৬ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) লোকায়ত যাত্রাভিনয়ের মঞ্চ পরিকল্পনা, গঠন ও তাৎপর্য আলোচনা
৮৮.৭ সারাংশ
৮৮.৮ অনুশীলনী ২
৮৮.৯ মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) বিদেশী মঞ্চ পরিকল্পনা ঃ মিশর, চীন, গ্রীস
৮৮.১০ সারাংশ
৮৮.১১ অনুশীলনী ৩
৮৮.১২ মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) বিদেশী মঞ্চ ঃ ইংরেজি মঞ্চ ও অন্যান্য
৮৮.১৩ সারাংশ
৮৮.১৪ অনুশীলনী ৪
৮৮.১৫ উত্তর-সংকেত
৮৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৮৮.১ উদ্দেশ্য

এই একক পাঠ করলে আপনি—

- প্রাচীন কাল থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত পৃথিবীর নানা দেশের নাটক, নাট্যাভিনয় এবং রঙ্গমঞ্চ সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- নাট্যাভিনয় দেখতে আসা দর্শক কিভাবে অভিনেতাদের ভাবভঙ্গি দেখতে পাবে, তাদর কথা শুনতে পাবে তা জানতে পারবেন।

- মঞ্চ কিভাবে দর্শককে নাটকের প্রতি আকৃষ্ট করে তা জানতে পারবেন।
- দর্শকের আসন থেকে নাটককে বিচার করতে শিখবেন।
- সামগ্রিকভাবে নাট্যসাহিত্য ও নাট্যধারা সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলতে পারবেন।

৮৮.২ প্রস্তাবনা

বিশ্বের সর্বত্র আদিম নৃত্যানুষ্ঠান থেকে নাটকের উদ্ভব। বেদের যুগ থেকে সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যের সূচনা। ভারতবর্ষে ধর্মকেন্দ্রিক নৃত্যগীতানুষ্ঠান থেকেই উদ্ভব হয়েছে নাটকের। নাট্যশাস্ত্রকার ভরত লোকধর্মী অভিনয় পদ্ধতির কথা বলেছেন। নন্দিকেশ্বর সরাসরি নাটকের উল্লেখ না করলেও ভাবপ্রকাশে নানারকম মুদ্রা উল্লেখ করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার বছর ধরে সভ্যতার অন্যতম নিদর্শন নাটক নানাকালে নানারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। জন্মলগ্ন থেকেই নাটক সমাজ পরিবর্তনের হাতিয়ার। নাটকের সঙ্গে সমাজজীবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। এর মধ্য দিয়ে সামাজিক বিভিন্ন কুপ্রথা, অর্থনৈতিক শোষণ, বলবানের অত্যাচার প্রকাশ পায়। রঙ্গমঞ্চে নাটক দেখে জনগণ এসব সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠেন। ফলে সমাজজীবনের ওপর নাটকের প্রভাব অপরিসীম। সমকালীন জীবন, তাদের বিশ্বাস, আশা-আকাঙ্ক্ষা, জনরুচি, জীবন ভাবনা ও লক্ষ্য—এসবই রূপায়িত হয় নাটকে।

নাটক রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয় কৌশলের একটি সম্মিলিত রূপ হল থিয়েটার। নাটক অভিনয়ের প্রথম অবস্থায় অভিনেতারা মঞ্চের পরিবর্তে মাটিতে দাঁড়িয়ে অভিনয় করত, সেটাই ছিল তাদের কাছে মঞ্চ। নাটকের প্রয়োজনেই মঞ্চ গড়ে উঠেছে। পরবর্তীকালে অবশ্য মঞ্চ নাটককে প্রভাবিত করেছে। নাটককে দৃশ্যরূপ দেওয়ার জন্য রঙ্গালয়ের উৎপত্তি। নাটকের নানা ধরনের ক্রমবিকাশ রঙ্গমঞ্চকে জটিল করে তুলেছে। অভিনীত নাটকের ওপর রঙ্গামঞ্চের একটা বিশেষ প্রভাব থাকে। প্রত্যেক দেশে নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চ বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নাটক অভিনয়ের জন্য মঞ্চের উপযোগিতা অপরিসীম। দর্শক ও শ্রোতা অভিনেতার অভিনয় ভালোভাবে দেখবে ও শুনবে—এই আন্তরিক আগ্রহ ও তাগিদ থেকেই মূলত মঞ্চের সৃষ্টি।

৮৮.৩ মুলপাঠ (প্রথম অংশ) দেশী নাট্যমঞ্চ পরিকল্পনা ঃ সংস্কৃত নাট্যাভিনয়ের গঠন ও তাৎপর্য আলোচনা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে নাট্যচর্চা প্রচলিত ছিল। আর্য সভ্যতার প্রথম পর্বে আর্যদের মধ্যে যে নাট্যচর্চার ধারা ছিল তা ঋক্‌বেদ থেকে জানা যায়। আর্যদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ উপলক্ষে আহুতি দেওয়া, সোমরস পান, বেদমন্ত্র গান, দেবদেবীর স্তব এসবই এমনভাবে ঘটত যাতে নাটকীয় উপাদান পাওয়া

যায়। ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব। ভারতীয় নাট্যারম্ভের কাল নির্ণয় করা দুষ্কর। তবে বেদের যুগে সঙ্গীত, নৃত্য ও কথোপকথনের উপাদান পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে পাণিনির রচনায় শিলালিন এবং কৃশাশ্ব এই দুই নাট্যকারের সন্ধান পাওয়া যায়। খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ অব্দ পাতঞ্জলির মহাভাষ্যে নাট্যানুষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে ভরতমুনি, কোহল, নন্দিকেশ্বর, মাতঙ্গ প্রমুখ আচার্যগণ নাট্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই সমস্ত নাট্যশাস্ত্রের মধ্যে 'ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্র' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। ভরতের আলোচিত অভিনয় পদ্ধতি বাস্তবানুগ। ভিন্ন অভিনয় পদ্ধতির প্রবর্তক হিসেবে নন্দিকেশ্বরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ। তাঁর "অভিনয় দর্পণ" যথেষ্ট প্রামাণ্য গ্রন্থ। কোহল ও মাতঙ্গকে ভরতের শিষ্য বলা হয়। তবে নাট্যসম্পর্কিত যে সমস্ত বিষয় ভরত আলোচনা করেন নি কোহল তা নির্ধারণ করেছেন। মহাভারতে নট-নটীদের উল্লেখ আছে। সেখানে দেখা যায় রাজপ্রাসাদে আলাদা নাট্যশালা থাকত। রামায়ণ ও মহাভারতের আবির্ভাবের পর নাটকে রাজচরিত্রই প্রধান হয়ে ওঠে।

নাট্যকাহিনী বা নাট্যাভিনয়ের উদ্ভব সম্পর্কে বলা হয় ব্রহ্মা নৃত্য, গীত, বাদ্য, বাক্য সমন্বিত পঞ্চমবেদ অর্থাৎ নাট্যবেদ রচনা করেন এবং ভরতমুনিকে তা প্রয়োগ করতে আদেশ করেন। অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয় তাঁর "বাংলা নাট্য বিবর্ধনে গিরিশচন্দ্র" গ্রন্থেও এমন ধারণা পোষণ করেছেন। এই সময় থেকেই জানা যায় নাটক সর্বসাধারণের আচার-আচরণের এবং ভাল-মন্দের অনুকৃতি। শিল্পের নানান রকম কৌশল নাটকের মধ্যে পাওয়া যায়। ভরতমুনি নাট্যারম্ভে 'নান্দীপাঠ' প্রয়োগ করেন। তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটক সম্পর্কিত সবরকম রীতি এবং নাট্যমঞ্চের ধারণাও পাওয়া যায়। তবে সংস্কৃত ভাষা যেহেতু সর্বসাধারণের ভাষা ছিল না, তাই সংস্কৃত নাটক সকলের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়নি। বৌদ্ধ যুগে পালি ভাষায়ও কিছু নাটক লেখা হয়েছিল, তবে সেগুলোও প্রচারধর্মী। ভরত তাঁর নাট্যশাস্ত্রে নাটকের বিভিন্ন দিক, কলাকৌশল, তার প্রয়োগ ইত্যাদির উল্লেখ করতে গিয়ে রঙ্গালয়ের উল্লেখ করেছেন।

ভারতীয় ধ্রুপদী রঙ্গালয় সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান বা ধারণার অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে জানা যায় ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দুস্থাপত্য শিল্পের রীতি অনুসারে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে এবং কাঠ ও মাটির সাহায্যে তা তৈরি হয়। ভরতমুনির বর্ণনাতেও এমন কথার উল্লেখ আছে। নাট্যশাস্ত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রঙ্গালয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে তার বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগও দেখানো হয়েছে। ভরত বলেছেন রঙ্গালয় তিন প্রকার —বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র। এর মধ্যে চতুরস্র-মধ্যই হল আদর্শ রঙ্গালয়। আবার এই মধ্যম রঙ্গালয়কে তিনি রঙ্গশীর্ষ, রঙ্গপীঠ, নেপথ্য, মত্তবারণী প্রভৃতি ভাগে ভাগ করে তার অবস্থান সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। এই শ্রেণীবিভাগের পর শাস্ত্র অনুযায়ী ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রঙ্গালয়ের দেওয়াল, দরজা, জানালা, মঞ্চ ইত্যাদি তৈরি করা হত। মঞ্চের ভিত্তি হত মাটি দিয়ে তৈরি। মেঝে হত মসৃণ ও সমতল। রঙ্গমঞ্চের বিভিন্ন জায়গায় মণিমুক্তা পুঁতে রাখার ব্যবস্থা থাকত। দর্শকদের

যাতায়াতের সুবিধার জন্য দরজাগুলি মুখোমুখি বসানো হত। দর্শকদের বসার জন্য কাঠের বা পাথরের বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। নানারকম শিল্পসম্ভার, হাতের কাজ ইত্যাদির মাধ্যমে মঞ্চকে সুসজ্জিত করে রাখা হত। যা হোক মঞ্চের রঙ্গশীর্ষ, রঙ্গপীঠ, নেপথ্য ও মত্তবারণীর নানা বিভাগ, পরিমাপ ইত্যাদি যেমন সুচারুরূপে দেখানো আছে, তেমনি তা নিয়ে সংশয় দেখা দিলে ভরত, অভিনব গুপ্ত প্রমুখ নাট্যশাস্ত্রকারদের সুচিন্তিত পন্থায় তার বাস্তবসম্মত সমাধানের কথাও বলা আছে। সংশয়, মতবিরোধ থাকলেও এগুলোর অস্তিত্ব নিয়ে কোনো সংশয় নেই।

প্রাচীন ভারতে নাট্যমঞ্চে বস্তুলোক প্রাণীলোকের ব্যবহার দেখা যেত। মঞ্চে শৈল, যান, বিমান, চর্মবর্ম, ধ্বজ প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন অলংকারের উপাদান; কেশচর্চা, চন্দন ইত্যাদি জাতীয় রূপসজ্জা; মৃগ, হস্তী জাতীয় সজীব প্রাণীর ব্যবহার ছিল। শকুন্তলা নাটকে হরিণের উপস্থিতি, মৃচ্ছকটিক নাটকে মাটির 'খেলনা গাড়ির' ব্যবহার দেখা যায়। হিন্দু রঙ্গমঞ্চে মঞ্চোপকরণ ছিল অল্প, দৃশ্যসজ্জার বিশেষ বাহুল্য ছিল না, দর্শক-শ্রোতাদের কল্পনা শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হত। রঙ্গমঞ্চে নাটকের গতির সঙ্গে স্থান ও দৃশ্য পরিবর্তনের নাট্যপ্রথা প্রচলিত ছিল। সমপর্যায়ের চরিত্র হলে পাশাপাশি এবং নিম্নস্তরের চরিত্রের সঙ্গে হলে পারিষদ পরিবৃত হওয়ার প্রথা ছিল। 'যবনিকা' অর্থাৎ পর্দা তখনকার দিনে মঞ্চে ব্যবহৃত হত। নাট্যাভিনয় আরম্ভ হওয়ার আগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন থাকত। যন্ত্রসঙ্গীত শিল্পী আসবেন, স্তোত্র পাঠ হবে, গলা ঠিক করা হবে, 'নান্দী' পাঠ হবে, মঞ্চের বিঘ্ননাশের জন্য দুজন পারিপার্শ্বিক সহ-সূত্রধার পুষ্প নিয়ে মঞ্চের দশদিক পরিক্রমা করবেন। এরপর প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ অর্থাৎ নাটকের বিষয়বস্তু উপস্থিত সকলকে জানিয়ে দেওয়ার রীতি ছিল। প্রথমদিকে নাট্যানুষ্ঠান হত বাগানের মধ্যে গৃহ নির্মাণ করে অথবা রাজপ্রাসাদ ও মন্দির সংলগ্ন কোনো ঘরে। এই সময় রঙ্গালয় ছিল ত্রিভুজ-আকৃতির, তারপরে হয়েছে চতুর্ভুজ এবং সবশেষে আয়তাকার। দ্বাদশ শতকের প্রারম্ভে সারদাতনয় তাঁর "ভাব প্রকাশনম্" নামক অলঙ্কার গ্রন্থে তিনপ্রকার নাটমণ্ডপের মধ্যে বৃত্তাকার নাটমণ্ডপের উল্লেখ করেছেন। উদাহরণ হিসেবে খাজুরাহোর 'লক্ষ্মণ-মন্দির', পৌন্ড্রবর্ধনে কার্তিকেয়র মন্দিরের উল্লেখ করা যায়। দক্ষিণ ভারতে ভগ্নদশাগ্রস্ত কয়েকটি মন্দির-নাট্যশালার সন্ধান পাওয়া যায়। এখানকার রঙ্গালয়ে প্রবেশ-প্রস্থান, বেদি, নেপথ্য, যবনিকা সবকিছুর সন্ধান মেলে।

ভাস, কালিদাস, ভবভূতি প্রমুখ নাট্যকারদের সময়ে সংস্কৃত ভাষায় নাটক প্রচলিত ছিল। ভরত থেকে শুরু করে বিশ্বনাথ পর্যন্ত নাট্যশাস্ত্রকারদের রচনা থেকে জানা যায় এই সময়ের রচিত নাটকগুলি রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের উদ্দেশ্যে রচিত হয়েছিল। জনগণের চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে জনরুচিকর নাট্যরীতির উদ্ভব হয়েছিল। তবে মুসলমান আক্রমণের পর থেকে নাটক, নাট্যাভিনয় ও নাট্যমঞ্চে পালাবদল শুরু হয়।

৮৮.৪ সারাংশ

প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে নাট্যচর্চা প্রচলিত ছিল। আর্যদের যাগ-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের ঘটনায় নাটকীয়তা থাকত। ভারতীয় নাট্যারম্ভের কাল নির্ণয় দুস্কর হলেও পাণিনির রচনায় নাট্যকারদের নাম পাওয়া যায়। ভরতমুনি, কোহল এ জাতীয় অনেকে নাট্যশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা করেছেন। ভরতের আলোচনায় বাস্তবতা, নন্দিকেশ্বরে ভিন্ন অভিনয় পদ্ধতি আলোচিত। রামায়ণ মহাভারতের সময় থেকে রাজচরিত্র প্রধান হয়ে উঠেছে। ব্রহ্মা নাট্যবেদ রচনা করেন। ভরতমুনির নাট্যশাস্ত্রে নাটকের রীতি ও নাট্যমঞ্চের ধারণা পাওয়া যায়। বৌদ্ধযুগেও প্রচারধর্মী কিছু নাটক লেখা হয়েছিল।

প্রাচীন হিন্দু স্থাপত্যশিল্পের রীতি অনুসারে ভারতবর্ষে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। রঙ্গালয়কে বিকৃষ্ট, চতুরস্র এবং ত্র্যস্র এই তিনভাগে ভাগ করে চতুরস্র-র অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। রঙ্গালয়ের ভিত্তি, সংস্কার, দর্শকদের যাতায়াত ও বসার ব্যবস্থা, মঞ্চকে সুসজ্জিত করার নানা পদ্ধতির উল্লেখ করা হয়েছে ভরত, অভিনব গুপ্তদের মত অনুসারে। প্রাচীন ভারতে রঙ্গামঞ্চে বস্তুলোক ও প্রাণীলোকের ব্যবহার ছিল। মঞ্চোপকরণ কম থাকলেও দর্শকদের কল্পনা শক্তিকে গুরুত্ব দেওয়া হত। নাটকে স্থান ও দৃশ্যের পরিবর্তন, যবনিকার ব্যবহার, নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিষয় জানিয়ে দেওয়ার পদ্ধতির প্রচলন ছিল। প্রথমদিকে নাট্যানুষ্ঠান হত বাগানের মধ্যে, রাজপ্রাসাদে বা কোনো মন্দিরে। পরে অভিনয়ের জন্য নাট্যমন্দির তৈরি হয়। এই সমস্ত নাটমন্দিরে প্রবেশ-প্রস্থান বেদি, নেপথ্য, যবনিকা সবই ছিল। মূলত জনগণের চাহিদা অনুযায়ী জনরুচিকর নাটক রঙ্গামঞ্চে উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হত।

৮৮.৫ অনুশীলনী ১

১। নিচের দেওয়া বিবৃতিগুলি ঠিক কিম্বা ভুল ডানদিকে দেওয়া ঘরগুলিতে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন ঃ

	ঠিক	ভুল
(ক) ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই সংস্কৃত নাটকের উদ্ভব।	☐	☐
(খ) কোহলের নাট্যশাস্ত্র সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য।	☐	☐
(গ) চতুরস্র-মধ্যই হল আদর্শ রঙ্গালয়।	☐	☐
(ঘ) শকুন্তলা নাটকে হরিণের উপস্থিতি দেখা যায়।	☐	☐
(ঙ) 'ভাব প্রকাশনম্' একটি ছন্দের গ্রন্থ।	☐	☐

২। নিচের বিবৃতিগুলির নিচে দেওয়া উত্তরগুলির মধ্যে যেটি সঠির তার ডানপাশের ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করুন ঃ

(ক) পাণিনি কত খ্রিস্টাব্দের লোক?

(১) খ্রিস্টপূর্ব ১৪০ ☐

(২) খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ ☐

(৩) খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ ☐

(খ) অভিনয় দর্পণ-এর লেখক—

(১) কোহল ☐

(২) মাতঙ্গ ☐

(৩) নন্দিকেশ্বর ☐

(গ) পঞ্চমবেদ রচনা করেন —

(১) ব্রহ্মা ☐

(২) ভরত ☐

(৩) অহীন্দ্র চৌধুরী ☐

৮৮.৬ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) লোকায়ত যাত্রাভিনয়ের মঞ্চ পরিকল্পনা, গঠন ও তাৎপর্য আলোচনা

যাত্রা এই শব্দটা বাংলা ও বাঙালিত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেও গোটা বিশ্বের লোকাভিনয়ের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ। সর্বসাধারণের মধ্যে খোলা আসরে গ্রামের মাটিতে বহুলোকের মাঝখানে যাত্রা অভিনীত হত। যাত্রা শোনার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হত বেশি। আমাদের দেশে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় গমন বা যাত্রা থেকে। যাত্রা অর্থাৎ গমন। মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে যাত্রা বলতে দেবোৎসব বোঝাত। যেমন স্নানযাত্রা, রথযাত্রা, দোলযাত্রা, রাসযাত্রা, গোষ্ঠযাত্রা, শিবযাত্রা ইত্যাদি। দেববিগ্রহ নিয়ে পূজারী এবং ভক্তগণ শোভাযাত্রা করে ভক্তিরসের সঙ্গে মানবপ্রসঙ্গের সংযোগ স্থাপন করেছিল। বিভিন্ন উৎসব উপলক্ষ্যে নৃত্য এবং গীত অনুষ্ঠিত হত। এই নৃত্য-গীত অর্থাৎ নাটগীতকেই যাত্রা বলে। ধর্মীয় শোভাযাত্রা, নৃত্যগীত, ভাবপ্রকাশক অঙ্গাভঙ্গি, হাস্যরসাত্মক সংলাপ দেবমহিমার প্রকাশ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে যাত্রার উদ্ভব।

প্রাচীনকালে মিশরে Passion Play উপলক্ষ্যে নৌযাত্রা গ্রীসে 'কমাস' উৎসব উপলক্ষ্যে লিঙ্গমূর্তি

যাত্রা, চীন ও জাপানেও ধর্মীয় লোক-উৎসব উপলক্ষ্যে বিভিন্ন শোভাযাত্রা থেকে নাটকের জন্ম। ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে যাত্রা কথাটি পাওয়া যায়। ভরতের নাট্যশাস্ত্রে, ভবভূতির মালতী মাধবে যাত্রার উল্লেখ আছে। দর্শকেরা মুক্ত অঙ্গনে বহুলোকের নাট্যক্রিয়া একসঙ্গে দেখতে চাওয়ার কারণে বর্তমানে যাত্রার এত জনপ্রিয়তা। চারদিক খোলা অভিনয়ের আসরে অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করত। এটা শুধু আদিম মানুষেরা নয়, প্রাচীন গ্রীস, রোম, যবদ্বীপ, বালি প্রভৃতি দেশের অভিনেতারা মুখোশ ব্যবহার করে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করতে পারত। বর্তমানে ছৌ নৃত্যে মুখোশের ব্যবহার লক্ষণীয়। তবে বাংলা যাত্রাভিনয়ে মুখোশের ব্যবহার খুব একটা নেই। বরং রঙে, রেখায়, পোশাকে, প্রসাধনে চরিত্রকে বর্ণময় ও আকর্ষণীয় করে তোলা হয়। যাত্রার দর্শকরা প্রথমদিকে মূলত শ্রোতা ছিল। তারা যাত্রাগানের কথা ও সুরের মাধুর্যেই নিজেদের আবিষ্ট করে রাখত। শ্রোতারা ভক্তিরস আস্বাদন করে চরিতার্থ হত। লক্ষ করলে দেখা যাবে তখনকার দিনে রামায়ণ মহাভারতের বহু কাহিনী নিয়ে যাত্রা পালা রচিত হয়েছে।

যাত্রাভিনয়ের অভিনেতাকে দর্শকেরা মঞ্চের চারপাশ থেকে দেখে। তাকে অনেক দূর থেকেও দেখতে হয়। ফলে অভিনেতাকে বলিষ্ঠ, দীর্ঘদেহী, ব্যক্তিত্ববান হতে হয়। বহু দূরবর্তী শ্রোতাকে শোনানোর জন্য তাকে গম্ভীর কণ্ঠের হতে হয়। যাত্রার অভিনেতা সাজঘর থেকে বেরিয়ে দর্শকের মাঝখানের একটি সরু পথ দিয়ে মঞ্চে বা আসরে আসেন। হেঁটে আসার পথে অভিনেতার উক্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে। যাত্রার বিবেকজাতীয় গানও অনেক সময় এই হেঁটে আসার পথেই গীত হয়। যাত্রাভিনয়ে অভিনেতাদের অনবরত ঘুরে ফিরে চারিদিকের দর্শকদের দিকে তাকিয়ে অভিনয় করতে হয়। অভিনেতা মঞ্চের অপর অভিনেতা ছাড়াও অধিকারী, বাদ্যযন্ত্রী, দর্শক-শ্রোতা সকলের সঙ্গে কথা বলেন। অভিনেতারা শারীরিক কসরত, রণচাতুর্য ও ক্রীড়াকৌশল দেখিয়ে দর্শকদের মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে। চমকপ্রদ ভঙ্গি ও কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্যের দ্বারাও তারা দর্শক-শ্রোতাদের আনন্দদান করে।

তবে যাত্রা এখন থিয়েটারী মঞ্চে প্রবেশ করেছে। ফলে যাত্রার অভিনয় থিয়েটারী অভিনয়ের মত নকলপনায় ভরপুর। যাত্রা এখন আর সেই গ্রাম্য ধূলিমলিন অবজ্ঞার বিষয়রূপে গণ্য হয় না। থিয়েটারের মত মঞ্চমায়ার সুযোগ নিয়েছে যাত্রা। ব্যয়বহুল নাগরিক মঞ্চ, আলোকসম্পাত, কণ্ঠস্বরের সংযত ভাব, ঘটনার প্রকৃত রূপ মঞ্চে দেখিয়ে যাত্রাভিনয়ে কৌলিন্য এসেছে। দেশকালের পটভূমি অনুযায়ী যাত্রার চরিত্রের পোশাক, রূপসজ্জার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হচ্ছে। একক অভিনয়ের পরিবর্তে দলগত অভিনয়ের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন পরিচালক। আধুনিক যাত্রার উদ্দেশ্যই হল দর্শক-শ্রোতাদের পরিতৃপ্তি সাধনের চেষ্টা করা।

৮৮.৭ সারাংশ

যাত্রা গোটা বিশ্বের লোকাভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু যাত্রা শব্দটাতে একটা বাঙালিয়ানা আছে। দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে যাত্রার উদ্ভব। গ্রামের মাটিতে খোলা আসরে বহুলোকের মাঝখানে যাত্রা অভিনীত হত। উৎসব নৃত্য-গীত এর অঙ্গ। ভারতবর্ষের মত মিশর, গ্রীস প্রভৃতি দেশে 'যাত্রা' গমন, শোভাযাত্রা ইত্যাদি শব্দও ঘটনা কেন্দ্রিক। প্রাচীনকালে যাত্রায় মুখোশের ব্যবহার ছিল। বাংলা যাত্রাভিনয়ে মুখোশের ব্যবহার খুব একটা চোখে পড়ে না। তবে রঙে, রেখায়, পোশাকে, প্রসাধনে যাত্রাকে বর্ণময় করে তোলা হয়। যাত্রার অভিনেতাকে দীর্ঘদেহী, গম্ভীর কণ্ঠের এবং ব্যক্তিত্ববান হতে হয়। তার উক্তি দর্শকদের মুগ্ধ করে। যাত্রার বিবেক জাতীয় গান থাকে। মঞ্চে অভিনেতা, বাদ্যযন্ত্রী থাকে। অভিনেতারা শারীরিক কসরত দেখিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। তবে যাত্রা এখন আর গ্রাম্য পরিবেশে অনুষ্ঠিত বিষয়রূপে গণ্য হয় না। থিয়েটারী মঞ্চে প্রবেশ করে যাত্রায় এখন কৌলিন্য এসেছে।

৮৮.৮ অনুশীলনী ২

১। নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরে টিক (✓) দিন ঃ

(ক) নৌযাত্রা প্রচলিত ছিল—
১। মিশর
২। চীন
৩। জাপান

(খ) যাত্রার দর্শকরা প্রথমদিকে ছিল—
১। শ্রোতা
২। দর্শক
৩। পূজারী

(গ) যাত্রায় থাকে—
১। বিবেক জাতীয় গান
২। আধুনিক গান
৩। রাগপ্রধান গান।

২। নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট করে টিক (✓) দিন।

	ঠিক	ভুল
(ক) আমাদের দেশে যাত্রার উদ্ভব হয়েছে দেবতার পূজা উপলক্ষ্যে।	☐	☐

(খ) ছৌ নৃত্যে মুখোশ আছে। ☐ ☐

(গ) যাত্রায় অভিনেতারা শারীরিক কসরত করেন না। ☐ ☐

(ঘ) তখনকার দিনে যাত্রায় রামায়ণ মহাভারতের কাহিনী ছিল। ☐ ☐

৮৮.৯ মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) বিদেশী মঞ্চ পরিকল্পনা ঃ মিশর, চীন, গ্রীস

মিশর ঃ মিশরের অতীত কাহিনীর লিপিবদ্ধ রূপ 'পিরামিড টেক্সট্স' থেকে সেদেশের নাট্য প্রচেষ্টা সম্বন্ধে জানা যায়। প্রাচীন মিশরে চার পাঁচ শ্রেণীর নাটক ছিল। সেখানকার অভিজাতদের কবরভূমিতে পাওয়া বেশ কিছু নাটকের নাট্যকাহিনীর সঙ্গে মঞ্চ নির্দেশের কথা উল্লেখ করা আছে। কখনও অভিজাত ব্যক্তির স্বর্গারোহণ ও পুনর্জীবন লাভের কাহিনী, কখনও রাজ্যাভিষেক উৎসব, কখনও রোগ সারানো ও ভূত তাড়ানো, আবার কখনও বা প্যাশান প্লে—এই জাতীয় নাট্যকাহিনী মিশরীয় নাটকের ক্রমবিবর্তনে লক্ষ্য করা যায়। পিরামিড টেক্সটের গায়ে লিপিকৃত হয়ে আছে প্যাশান প্লের মঞ্চ নির্দেশকদের নাম। আই-খার্-নেফার্ট প্যাশান প্লের প্রথম নাট্য পরিচালক। তিনি নাটকে নৌকার ব্যবহার, জমকালো সুদৃশ্য পোশাক ও অলংকারের ব্যবহার দক্ষতার সঙ্গে করেছিলেন। এই সময়ে অনুষ্ঠিত নাটকগুলো বিভিন্ন জায়গা ঘুরে ঘুরে হত এবং কিংবদন্তী স্থানগুলো মঞ্চের নাম পেত।[১] প্রকৃত রাজপ্রাসাদ, রাজপথ, মন্দির, গ্রাম ও প্রাকৃতিক পরিবেশ এ সবই অকৃত্রিমভাবে রঙ্গমঞ্চরূপে ব্যবহার হতে থাকে। মূলত ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, মৃত্যুযাত্রা এ জাতীয় বিষয়কে কেন্দ্র করে নাটক এগিয়ে চলতে থাকে। সে সময় অভিনয় করার জন্য স্থায়ী কোনো রঙ্গমঞ্চ ছিল না।

চীন ঃ পৃথিবীর অনেক দেশে নৃত্য, গীত ও পূজানুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে নাটকের উৎপত্তি। চীনদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। চীনদেশীয় নাটকের প্রধানতম উৎস হল নৃত্য। নৃত্যের মধ্যে জটিলতা দেখা দিলে অভিনেতার সৃষ্টি হয়। 'চাও' রাজত্ব থেকে শুরু করে নানান সময়ে নৃত্য-নাট্যের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। কৌতুক শিল্পী, ক্রাউন, পাখা নিয়ে নৃত্য, দেবতা বা পশুর পোশাক ও মুখোশ পরে নৃত্য—এ সবের পরিচয় বিভিন্ন নাট্যানুষ্ঠানে থেকে জানা যায়। 'থং' রাজত্বে নাট্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছিল। জানা যায় থং সম্রাট 'মিং হুয়াং' এক কল্পকাহিনীর দ্বারা আবেগতাড়িত হয়ে একটি নাটকের দল সৃষ্টি করেন এবং অভিনয়ের জন্য ন্যাসপাতি কুঞ্জে একটি রঙ্গমঞ্চও তৈরি করেন। মধ্যযুগের শেষ ভাগে 'ইয়াং' রাজত্বে ক্লাসিকাল ধারার নাটক চীনা রঙ্গমঞ্চে আধিপত্য বিস্তার করে। দেবতার পাশাপাশি বীরগাথা, পুরাণকাহিনী, কমেডি এসবও নাটকের বিষয় হয়ে উঠতে শুরু করে। এই সময় থেকে নাটকে

১. এর ফলে বেশিরভাগ জায়গায় স্থান অনুসঙ্গে প্রকৃতিক দৃশ্যাবলীও নাটকে এসে গেছে।

প্রচুর চরিত্রের আগমন ঘটে এবং জনপ্রিয়তা বাড়ে। ‘মাঞ্চু’ রাজত্বে রঙ্গমঞ্চে অভিনেত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। চীনদেশের নাটকের গঠন অনেকক্ষেত্রে চরিত্রনির্ভর ছিল। সাজ-সজ্জা, রূপ-সজ্জা, বিভিন্ন ধরনের চরিত্রের অভিনয় চীনা রঙ্গমঞ্চে জনপ্রিয়তা পায়। বিশেষ করে ক্লাউন চরিত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করত। চীনা নাটকে টাইপ চরিত্রের প্রাধান্য ছিল।

চীনদেশীয় মঞ্চ ও মঞ্চোপকরণ অনেকের কাছে কৌতুহলের। এখানকার নাট্যশিল্প ছিল ক্লাসিক, তা রূপকথার রাজ্যের মত এবং প্রথানির্ভর। চীনদেশের রঙ্গমঞ্চকে চারভাগে ভাগ করা হয়— (১) অস্থায়ী মঞ্চ, (২) ক্লাসিকাল রঙ্গালয়, (৩) পশ্চিমী ধরনের মঞ্চ এবং (৪) ইয়াংকো থিয়েটার। এ দেশের প্রাথমিক মঞ্চ ছিল দেবমন্দিরের অঙ্গান। এখানে থেকেই তা হাটে, মাঠে মুক্তাঞ্চলে ছাড়িয়ে পড়ে। এইসব জায়গায় বাঁশ, মাদুর দিয়ে মঞ্চ করে পাটাতন তৈরি করে নাট্যাভিনয় চলত। মঞ্চের সম্মুখ অংশ থাকত উন্মুক্ত। যবনিকা, উইংস, যান্ত্রিক কলাকৌশল কিছুই থাকত না। তবে মঞ্চের পিছনে দুটো দরজা থাকত প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য। সঙ্গীত,আবৃত্তি, উজ্জ্বল পোশাক— এ জাঁকজমক থাকত মঞ্চে। চা-খানাকে কেন্দ্র করেও স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। চীনের পেপিং শহরকে থিয়েটারের পীঠস্থান বলা হয়ে থাকে। মন্দির, রেস্টুরেন্ট-এ নাট্যাভিনয়ের পাশাপাশি ইউরোপীয় ধারায় সংহাই, ক্যানটন প্রভৃতি বড় বড় শহরে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। স্থায়ী অস্থায়ী অসংখ্য রঙ্গালয়ের সন্ধান সে দেশে পাওয়া যায়।

চীনা রঙ্গালয়ে কর্তালের ঝঙ্কার, বেহালার বিলম্বিত সুর, কাষ্ঠখণ্ডের ক্লাপ শব্দ শোনা যেত। মঞ্চের প্রবেশদ্বার ছিল আকর্ষণীয়। মঞ্চের সামনে মেঝে এবং গ্যালারীতে দর্শক বসত। বর্ণসম্ভারে সুসজ্জিত থাকত মঞ্চ। মঞ্চে টানা আলো ব্যবহার করা হত, স্পটলাইট থাকত না। অভিজাত স্বল্পবিত্ত দর্শকদের আলাদা আলাদা ব্যবস্থা থাকত। মঞ্চের অভিনেতাদের চরিত্র অনুযায়ী (ধনী, দরিদ্র) পোশাক, বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হত। মঞ্চের বাঁদিকে অরকেস্ট্রার দল ঝাঁঝর, কর্তাল, ড্রাম, গং, ট্রাম্পেট, ফ্লুট, বেহালা ইত্যাদি নানারকম বাদ্যযন্ত্র নিয়ে বসত। নারী চরিত্রে দক্ষ পুরুষ অভিনেতারা অভিনয় করতেন। চীনদেশে মঞ্চের জন্য বহুরকম উপকরণ ছিল। মঞ্চের পিছনে থাকত গ্রীনরুম। কয়েকখানা মূল্যবান সিল্কের পর্দা, মেঝেতে পাতার জন্য (চিত্রিত রাগ) গালিচা, কয়েকটা চেয়ার-টেবিল, বাঁশের ফ্রেম এই জাতীয় মঞ্চোপকরণ ব্যবহার করা হত। মঞ্চের এই উপকরণগুলি সাধারণ মানের হলেও অভিনেতাদের পোশাক ও অভিনব কৌশল যথেষ্ট উন্নতমানের ছিল। চীনদেশের অভিনয় শিল্পীদের অল্প বয়স থেকে সুদীর্ঘকাল মঞ্চে শিক্ষানবিশি করতে হত। অভিনয় করার জন্য শারীরিক কসরত করাও তাদের প্রয়োজন হত।

চীনে সাধারণ রঙ্গালয় ছাড়াও রাজপ্রাসাদে এবং কোথাও কোথাও দোতলা, তিনতলা পর্যন্ত উন্নত শ্রেণীর মঞ্চ-স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানকার ক্লাসিকাল রঙ্গমঞ্চে ব্যক্তিচরিত্র ছিল অনাদৃত। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার চিত্র, দার্শনিক জীবনাদর্শ, ধর্মীয় বিশ্বাস চীনা নাট্যশিল্পের অন্যতম বিষয় ছিল। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চীনের সমাজজীবনবোধের পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে গড়ে উঠেছে

'ইয়াংকো' ধারার নাটক ও নাট্যমঞ্চ। শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী ইউরোপীয় কায়দায় আধুনিক ধরনের রঙ্গমঞ্চ গড়ে তুলল। লৌকিক ধর্মের ক্রিয়াকলাপ, সামাজিক অনুষ্ঠান, জনপ্রিয় সঙ্গীত ও নৃত্য, কোরাস, প্রেম-প্রশস্তি— এ সবই ইয়ংকোর অঙ্গ ছিল। ক্রমে ক্রমে ইয়াংকো লোকশিল্পের মর্যাদা পায়। ছড়িয়ে পড়ে গ্রামে-গঞ্জে। হয়ে ওঠে মুক্তাঙ্গন নৃত্যানুষ্ঠান। বসে যায় ইয়াংকোর মাঠে আনন্দের হাট। নৃত্য, কোরাস, বাজনা, সঙ্গীত, সুরের মূর্চ্ছনায় চীনা নাটক ও নাট্যমঞ্চ জীবনের গতি নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

গ্রীস ঃ গ্রীস দেশে ব্যালাড্ ডান্সের বহু বৈচিত্র্যের মাঝে যে ধারাটি পরিপুষ্টি লাভ করে তার নাম নাটক। ব্যালাড ডান্সের একটি পরিব্যাপ্ত রূপ কোরাস (chorus)। সঙ্গীতের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে এটি অন্যতম। এই কোরাস সঙ্গীত পাওয়ার সময় শিল্পীরা যে দেববেদী ব্যবহার করত তার থেকেই মঞ্চের ধারণা বা পরিকল্পনা গড়ে ওঠে। গ্রীস দেশে একজন প্রতিভাধর ব্যক্তি থ্রেস্‌পিস্ যিনি লিপিক ট্র্যাজেডিকে নাট্য-ট্রাজেডিতে রূপ দিয়েছিলেন। তিনিই প্রথম নাটকের মাধ্যমে গ্রীক নাট্যভূমিতে মঞ্চের ব্যবহারকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলেছিলেন। তবে এই রঙ্গমঞ্চের আকৃতি সম্পর্কে ভিন্ন মত আছে। কেউ বলেন— নাট্য-অভিনেতা থেস্‌পিস্ ঠেলা গাড়ির মত একটা উঁচু আসনে দাঁড়াতেন, কেউ বলেন— তিনি কাষ্ঠপীঠের মত একটা টেবিলের ওপর দাঁড়াতেন। এটাও শোনা যায় যে থেস্‌পিস্ গ্রামান্তরে গোরুর গাড়ি করে ঘুরতেন ও অভিনয় করতেন। তবে এ সমস্ত ধারণা সম্ভবত হোরেসের রচনা থেকে পাওয়া। কারণ হোরেসের রচনায় প্রথম রঙ্গমঞ্চ রূপে ঘোড়া ও গোরুর গাড়ির উল্লেখ আছে। যা হোক থেস্‌পিস্ নাটকে অভিনয় করার সময় দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও তাদের ভালো করে দেখা ও শোনার জন্য যে উঁচু জায়গার কথা ভাবতেন তা থেকেই মঞ্চের উৎপত্তি।[২] গ্রীক নাট্যশিল্পকে থেস্‌পিস্ নানাভাবে ক্রমোন্নতির পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করেছেন। নাটকের প্রয়োগ শিল্পের বিশেষত্ব খুঁজে পাওয়া গেছে— অভিনব করার জন্য মুখে সাদা রং-এর প্রলেপ ব্যবহারে, বেশভূষায়, প্রস্তাবনায় এবং দূতের ভাষণে। থেস্‌পিসের সময় থেকেই নটের জন্য নির্দিষ্ট রঙ্গাভূমির নাম দল 'বেদি'। আর বেদির পিছনে বাগানের মত যে ছোট ঘরটি থাকত, তাই পরবর্তকালে রঙ্গামঞ্চের দৃশ্যপট ও পশ্চাদপট হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

নাটক জীবনকে নিখুঁতভাবে রূপায়িত করতে পারে। গ্রীক নাটক তার অপরূপ শৈল্পিক বিকাশের মধ্য দিয়ে যে নাটকীয় সজ্জা গ্রহণ করতে থাকে তার পক্ষে উল্লেখযোগ্য বিবর্তন হল মঞ্চের বিবর্তন। থেস্‌পিসের যুগের সেই অভিনয় বেদিই অদূরকালেই দিওন্যুসাসের থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়। দিওন্যুসাস থিয়েটার গড়ে ওঠে আক্রোপোলিস অর্থাৎ নগরীর উচ্চভূমির দক্ষিণ ঢালুতে দিওন্যুসাস এলেউথেরেউসের পবিত্র পূজাভূমিতে। সম্ভবত খ্রিঃপূঃ ৬০০ অব্দে এই রঙ্গালয়টি গড়ে ওঠে। থেসপিস্ মঞ্চে চরিত্র

১. খ্রিঃপূঃ ৫৩৫ অব্দ।

২. গ্রীক রঙ্গালয়ের ক্ষুদ্র মধ্যবৃত্তকে অর্‌খেস্ত্রা (orchestra) বা নৃত্যভূমি বলা হত। বর্তমানকালে যারা নানারকম বাদ্যযন্ত্র বাজায় তাদেরকে অর্‌খেস্ত্রা বলা হয়।

পরিবর্তনের যে রীতি প্রচলন করেছিলেন, সেটাই মঞ্চে দৃশ্যসজ্জাকে সুচারুরূপে গড়ে তোলে। ফলে নাটকের প্রয়োগ পদ্ধতি ও মঞ্চশিল্প উভয়ই সেই সময় থেকে যথার্থভাবে বিকশিত হতে থাকল। কোরাস কেন্দ্রিক নাটকে মানুষ ও দেবতার সংঘাত নিয়ে বকখাস ও ল্যকুর্গাস নামক দুই চরিত্রের অভিনয় দ্বন্দ্ব ও আবেগে তীব্রতর হয়ে ওঠে। গ্রীক কোরাস সঙ্গীত, একজন অভিনেতা ও একটি মঞ্চ যুক্ত হয়ে নাটকের প্রাথমিক রূপ গড়ে তোলে। এখান থেকেই দেখা যায় নাটকে কোরাস সঙ্গীতের পরিবর্তে কথোপকথন বৃদ্ধি পেয়ে মঞ্চ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে।

খ্রিঃপূঃ ৪৯৯ অব্দে গ্রীসে কোনো এক অভিনয়কালে কাঠের স্ট্যান্ড ভেঙে যাওয়ার কথা জানা যায়। এই ভেঙে যাওয়া জনিত কারণকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে কাঠের স্ট্যান্ড বা পাটাতনের পরিবর্তে পাহাড়ের কঠিন সানুদেশে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। তখনকার দিনের সুবিখ্যাত রঙ্গালয় ছিল এথেন্সের দিওন্যুসাস থিয়েটার। এই থিয়েটারে ইস্কাইলাস, সফোক্লিস, এউরিপিদেস, আরিস্তোফানেস প্রমুখ বিখ্যাত নাট্যকারদের নাটকগুলির প্রথম অভিনয় হয়। আইস্খ্যুলসের মঞ্চ পদ্ধতিও থেস্‌পিসের অনুসরণে গড়ে ওঠা। এই সময়ে গড়ে ওঠা রঙ্গালয়ে দর্শকদের বসার ব্যবস্থা ভাল ছিল না, অভিনেতাদের জন্য অরখেস্ত্রা ছাড়া যথার্থ মঞ্চ ছিল না। এই সময় থেকেই অরখেস্ত্রা ও মঞ্চ আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। নাটকে ধর্মীয় প্রেরণার কারণে কোরাসের প্রাধান্য কমে যায়। নাটকীয় ক্রিয়া সংঘাতে কোরাসের প্রাধান্য কমে যাওয়া গ্রীক রঙ্গামঞ্চের সাধারণ ইতিহাসে একটা লক্ষণীয় বিষয়। মঞ্চে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ও যান্ত্রিক পদ্ধতির যে পরিবর্তন তা নাটকের কুশীলবদের প্রয়োজনেই। তাছাড়া এই সময়ে লেখা নাটকগুলো মঞ্চকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে। কখনো আবার দেখা গেছে নাট্য বিষয়ের প্রয়োজনে মঞ্চেরও নানারকম বিবর্তন ঘটেছে। কখনো কখনো অনিপুণ কিছু দৃশ্যাবলী মঞ্চে প্রবেশ করেছে। গ্রীসে প্রাচীন রঙ্গামঞ্চের ভগ্নাবশেষে যে কাঠের বীমের ভগ্ন প্রান্তভাগ দেখা যায় সেটা আসলে পশ্চাদ্‌পটের স্কেনের কাঠামো।

ইস্কাইলাসের পর সফোক্লিসের সময়ে নাটকেও তার প্রয়োগশিল্পের আঙ্গিকে পরিবর্তন দেখা যায়। এথেন্সের নিম্নভূমিতে 'থিয়েত্রোন' নাম রঙ্গালয়ের সৃষ্টিও হয়। মূলমঞ্চের গঠন একই রকম রেখে মাঝে বিভিন্ন ধরনের নাটকের জন্য বিভিন্ন ধরনের মঞ্চ বা মঞ্চদৃশ্য ব্যবহার করা হত। প্রথম দিককার অস্থায়ী মঞ্চ পরের দিকে স্থায়ী মঞ্চে পরিণত হয়েছে। গ্রীসের প্রাচীন নাট্যশালার মধ্যে এপিদাউরসের মঞ্চ গঠনশৈলী বেশ উন্নত মানের ছিল। এখানে দর্শক-শ্রোতাদের প্রবেশ-প্রস্থানে সুবিধার জন্য তীক্ষ্ণ নজর ছিল। গ্রীসে যথার্থ নাটক গড়ে তোলার জন্যই রঙ্গামঞ্চের অগ্রগতি হয়েছে। আবার গ্রীকমঞ্চে অভিনয়ের নানান কৌশল, অবলম্বন করার প্রমাণও পাওয়া যায়। এ যুগের প্রধান যান্ত্রিক কৌশল তিনদিকের তিন দৃশ্য ঘুরিয়েই দৃশ্যপট পরিবর্তন করা। দ্বিতীয় যান্ত্রিক পদ্ধতিতে দৃশ্য অপসারণ, দৃশ্য সজ্জিত করে রাখা এবং নতুন দৃশ্য রচনা করা যেত। তৃতীয়ত সঞ্চরণশীল মঞ্চবেদি এই সময় তৈরি হয়। এউরিপিদিস

তাঁর বহু নাটকে দেব-আদেশ জাতীয় অভিনব মঞ্চকৌশল ব্যবহার করে নাটককে এক আকস্মিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতেন। এভাবেই নাটকে মঞ্চ নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে। খ্রিঃপূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে "ফ্লাইং মেশিন"-এর ব্যবহারও দেখা যায়। "এরেত্রিয়া" থিয়েটারে মঞ্চের নিচে ভূগর্ভ পথের সন্ধানও পাওয়া যায়। গ্রীক নাটকে প্রতিনিয়ত যে ভাঙা-গড়া চলত তার সূত্র ধরেই মঞ্চোপকরণ ও কলাকৌশলের নানা পরিবর্তন ঘটেছে। এক্ষেত্রে নাট্যকারদের দাবি মেটানো এবং অভিনেতাদের প্রাধান্যও স্মরণযোগ্য।

হেলেনীয় যুগ গ্রীসের শিল্প-সাহিত্যের ইতিহাসে গ্রীক সভ্যতার অবক্ষয়ের যুগ। 'মাইমস্' এই সময়কার সৃষ্টি। এ যুগের প্রতিভাবান এবং শক্তিশালী শিল্পী-অভিনেতার অভিজাত ধরনের রঙ্গভূমি গড়ে তোলার দিকে নজর দিলেন। এই সময়ে গ্রীসে সর্বপ্রথম উচ্চতা বিশিষ্ট মঞ্চের আবির্ভাব ঘটে। এ সবের প্রকৃষ্ট উদাহরণ "প্রিয়েনে" থিয়েটার। এ যুগে নাট্যসাহিত্যের খুব বেশি বিবর্তন না হওয়ায় মঞ্চ স্থাপত্যেও তেমন উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়ে নি। যা হোক গ্রীক যুগের শেষ পর্যায়ে এসে দেখা যায়—অরখেস্ত্রা ছিল প্রাচীন "আরখেইক্" যুগের তৈরি, থিয়েটার বা রঙ্গমঞ্চ ছিল ক্লাসিকাল যুগে অর্থাৎ খ্রিঃপূঃ চতুর্থ শতকে তৈরি এবং অভিনব মঞ্চ হল হেলেনীয় যুগে তৈরি। নাটকে আদর্শ মঞ্চ ধারণা এভাবেই গড়ে ওঠে।

গ্রীক মঞ্চ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে কোরাস, অরখেস্ত্রা, স্কেনে, বেদি খুবই উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন গ্রীসে অভিনয় ক্ষেত্রটি তৈরি হত একটি স্বল্পায়ত বৃত্তাকার গর্তের মধ্যে। এই গর্তের পিছনে থাকত দেবমন্দির। তারপর জনপথ, সমুদ্রতীর, ককেশাস পাহাড়ের নির্জনভূমি, রাজপ্রাসাদের সম্মুখ—এমনিভাবে ধাপে ধাপে তার অগ্রগতি।

৮৮.১০ সারাংশ

মিশরের 'পিরামিড টেক্সটস্' থেকে সেদেশের নাটক সম্বন্ধে জানা যায়। মিশরের অভিজাতদের কবরভূমিতে নাটকের সঙ্গে মঞ্চের উল্লেখ পাওয়া যায়। নাটকে নৌকা পোশাক ও অলঙ্কারের ব্যবহার ছিল। বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে নাটক হত। স্থায়ী কোনো রঙ্গমঞ্চ ছিল না। নাটকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা গুরুত্ব পেত।

চীনা নাটকের প্রাচীন উৎস হল নৃত্য। আবেগতাড়িত হয়ে থং সম্রাট একটি নাটকের দল তৈরি করেন। দেবতার কাহিনী নাটকের বিষয় হয়ে ওঠে। চীনের নাটক অনেক ক্ষেত্রে চরিত্র নির্ভর ছিল। মঞ্চ, সাজসজ্জা, চরিত্র অনেকের কাছ আকর্ষণীয় ছিল। দেবমন্দির, মুক্তাঞ্চলে নাট্যাভিনয় চলত। মঞ্চের গঠন, মঞ্চের উপাদান, আবৃত্তি পোশাক খুবই জাঁকজমক থাকত। চা-খানাকে কেন্দ্র করে স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। মন্দির, রেস্টুরেন্ট ছাড়াও বড় বড় শহরে অনেক রঙ্গালয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। চীনা রঙ্গালয়ে

বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, সুসজ্জিত মঞ্চ, আলাদা বসার জায়গা, টানা আলোর ব্যবহার—এ জাতীয় বহুরকম উপকরণ ছিল। মঞ্চোপকরণ সাধারণ মানের হলেও পোশাক ও অভিনয় কৌশল ছিল উন্নতমানের। সাধারণ রঙ্গালয় ছাড়া রাজপ্রাসাদেও কোথাও কোথাও রঙ্গালয় ছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা, দার্শনিক জীবনাদর্শ চীনা নাট্যশিল্পে থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে চীনে গড়ে উঠেছে 'ইয়াংকো' ধারার নাটক ও নাট্যমঞ্চ।

গ্রীস দেশে কোরাস সঙ্গীত থেকেই মঞ্চের ধারণা গড়ে ওঠে। হোরেসের রচনা থেকে জানা যায় থেস্‌পিস দর্শকদের নাটক দেখার জন্য উঁচু জায়গা থেকে অভিনয় করতেন। এখান থেকেই মঞ্চের ধারণা গড়ে ওঠে। মঞ্চোপকরণ হিসেবে মুখে সাদা রং, বেশভূষা, প্রস্তাবনা, দৃশ্যপট প্রভৃতির ব্যবহার ছিল। থেস্‌পিসের যুগের 'বেদি' পরবর্তীকালে দিওন্যুসাসের থিয়েটারে রূপান্তরিত হয়। এর নাটকের শৈল্পিক বিকাশ ঘটে কথোপকথনের মাধ্যমে। দিওন্যুসাস থিয়েটারে ইস্কাইলাস, সফোক্লিস প্রমুখদের বিখ্যাত নাটক অভিনীত হয়। পাহাড়ের সানুদেশে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। দর্শকদের বসার ব্যবস্থা হয়। মঞ্চে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপকরণ ও যান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তন ঘটে। সফোক্লিসের সময়ে নাটকের আঙ্গিকে পরিবর্তন দেখা যায়। গ্রীসে যথার্থ নাটক গড়ে তোলার জন্য রঙ্গামঞ্চের অগ্রগতি ঘটেছে। সঞ্চরণশীল মঞ্চবেদি এই সময়ে তৈরি হয়। 'মাইমস্' হেলেনীয় যুগের সৃষ্টি। সর্বপ্রথম উচ্চতাসম্পন্ন মঞ্চের আবির্ভাব এই সময়ে। নাটক, মঞ্চ, মঞ্চোপকরণ, কলাকৌশল এমনিভাবেই ধাপে ধাপে গ্রীক রঙ্গালয়ের অগ্রগতি ঘটেছে।

৮৮.১১ অনুশীলনী ৩

১। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর ডানদিক থেকে বেছে নিয়ে টিক ($\checkmark$) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) চীনদেশীয় নাটকের প্রাচীনতম উৎস হল— ১। গীত

২। নৃত্য

৩। পূজা

(খ) চীনা নাট্যশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি ঘটে— ১। ইয়াং রাজত্বে

২। থং রাজত্বে

৩। মাঞ্চু রাজত্বে

(গ) দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর চীনে গড়ে ওঠে— ১। ইয়াংকো নাট্যগোষ্ঠী

২। শৌখিন নাট্যগোষ্ঠী

৩। ক্লাসিক নাট্যগোষ্ঠী

(ঘ) থেস্‌পিসের সময় রঙ্গমঞ্চের নাম হল— ১। গোরুর গাড়ি
২। বাগান
৩। বেদি

(ঙ) ইস্কাইলাসের পরের নাট্যকার— ১। এউরিপিদিস
২। সফোক্লিস
৩। থেস্‌পিস্

(চ) সঞ্চরণশীল মঞ্চবেদী প্রতিষ্ঠিত হয়— ১। চীন
২। গ্রীস
৩। মিশর

২। নিচের শূন্যস্থানগুলি সঠিক উত্তর লিখে পূরণ করুন।

(ক) আই-খার্‌-নেফার্ট —— প্লের প্রথম নাট্যপরিচালক।

(খ) মাঞ্চু রাজত্বে রঙ্গমঞ্চে —— প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়।

(গ) চীনা নাটকে —— চরিত্রের প্রাধান্য ছিল।

(ঘ) চীনের থিয়েটারের পীঠস্থান —— শহর।

(ঙ) ব্যালাড্‌ ডান্সের একটি পরিব্যাপ্ত রূপ ——।

৩। নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান ঃ

	ঠিক	ভুল
(ক) 'মিং হুয়াং' থং সম্রাট ছিলেন।	☐	☐
(খ) চীনদেশে চা-খানাকে কেন্দ্র করে স্থায়ী রঙ্গালয় গড়ে ওঠে।	☐	☐
(গ) গ্রীসে পাহাড়ের সানুদেশে রঙ্গালয় গড়ে ওঠে।	☐	☐
(ঘ) 'ফ্লাইং মেশিন'-এর ব্যবহার পঞ্চম শতাব্দীতে	☐	☐

৮৮.১২ মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) বিদেশী মঞ্চ ঃ ইংরেজি মঞ্চ ও অন্যান্য

ইংলণ্ডের রাজা অষ্টম হেনরীর রাজসভায় নানা ধরনের উৎসব ও নাট্যানুষ্ঠান হত। এখানে রেনেসাঁস যুগের ক্লাসিকাল ধারার ল্যাটিন নাটক রচিত ও অভিনীত হতে থাকে। বিদ্যালয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিও রাজসভার অনুকরণে নাট্যানুষ্ঠান শুরু করে। রাজা হেনরীর সময়ে নিকোলাস উদালের 'র‍্যালেফ্‌ রোইস্টার

ডোইস্টার' নাটক এবং প্রথম এলিজাবেথের সময়ে 'গোর্বোডাক' এবং 'গ্যামার গার্টনস্ নীডল' নামক দুখানি নাটক পাওয়া যায় যা ক্লাসিক রীতিনীতি ভঙ্গ করেই অভিনীত হয়। প্রথম এলিজাবেথ ১৫৫৮ সালে সিংহাসনে বসেন। তিনি নাটকে যথার্থ পরিবর্তন আনেন। তাঁর সময়ে কবি ও নাট্যকার রিচার্ড এডোয়ার্ডস রাজসভার গায়ক ও অভিনেতা বালকদের শিক্ষা দিতেন। এডোয়ার্ডস নিজে হালকা রোমান্টিক কমেডি নাটকও লিখতেন। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত পোশাক, নাটকের অভিনয় সকলের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে থাকে। এডোয়ার্ডেসের পর চ্যাপেল রয়ালের বালকদের শিক্ষার দায়িত্ব পান ইউলিয়াম হানিস। এই সময়ে রানী বেশ কিছু কিশোর দল তৈরি করেন। তার মধ্যে একটি তাঁর গ্রীষ্মকালীন আবাসে গড়ে ওঠে এবং তার দায়িত্ব পান রিচার্ড ফ্যারান্ট। এই ফ্যারান্ট রানীকে যে সমস্ত নাটক দেখাতেন, সেগুলো অভিজাত দর্শকদেরও দেখানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ফলে নাট্য প্রযোজনার ব্যাপারে অনেকে উৎসাহী হয়ে উঠল, অভিজাতরা অর্থব্যয় করে অভিনয় দেখতে শুরু করল। ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে রিচার্ড ফ্যারান্ট "ব্লাকফ্রাইয়ারস্" নামে একটি হলঘর লীজ নিয়ে সেখানে অভিনয় দেখাতে শুরু করলেন।

এইভাবে পেশাদারী অভিনয় শুরু হল। ভাল নাট্যদল গড়ে উঠল। ব্যবসায়ী নাট্য প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নাটক ও নাটকের প্রয়োগশিল্পের উন্নতি সাধনে সচেষ্ট হল। এলিজাবেথীয় যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শেকসপীয়রের নাটক ও মঞ্চে তার ব্যবহার। এলিজাবেথীয় যুগে নাটক সমাজের সব ধরনের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট ছিল। বাস্তব সমাজের সব রকম জীবনধারার পাশাপাশি জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে যেমন এলিজাবেথীয় যুগ, তেমনি শেকসপীয়রীয় থিয়েটার এবং দর্শক একাত্ম হয়ে উঠেছিল। ছন্দ, সুর, ভাবাবেগ, নাটকীয় কলা কৌশল ইংরেজ জাতির জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। রানী এলিজাবেথ নাটকের পৃষ্ঠপোষকতা করলেও উচ্চশ্রেণীর নাটক ও নাট্যশালা সম্পর্কে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল না। ফলে শেকসস্পীয়রদের মহান সৃষ্টি হাট-মাঠ, সরাইখানা জাতীয় রঙ্গালয় থেকে অনুকূল পরিবেশ পেয়ে উঠে আসা। তখন রাজ্যসভার পাশাপাশি সরাইখানায় অভিনয়ের জন্যও নাটক লেখা হত। এলিজাবেথের সময়ে রাজসভার নাটকে সেট, সিন ও স্থাপত্যেশিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায়। ১৭শ শতকে ইংরেজি রঙ্গমঞ্চের বিখ্যাত নাম "ইনিগো জোনস" ইতালীয় মঞ্চের অনুকরণে চিত্রাঙ্কণ, দৃশ্যপট, যবনিকা, রূপক চরিত্রের জন্য বিচিত্র ধরনের পোশাক ব্যবহার করে ইংলণ্ডের মঞ্চকে বিশেষভাবে সজ্জিত ও প্রভাবিত করেছিলেন।

প্রথম রাজসভার থিয়েটার, পরে সাধারণ রঙ্গালয়—এই দুইয়ের পাশাপাশি ইংলণ্ডে এক ধরনের ব্যক্তিগত রঙ্গালয় গড়ে ওঠে। এগুলো মূলত অভিজাত শ্রেণীর এবং স্কুল-কলেজের নিজস্ব রঙ্গালয়। ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দে শেকসপীয়রের দল 'ব্লাকফ্রাইয়্যারসে'র রঙ্গালয়টি পুনর্গঠন করে সেখানে অভিনয় চালাতে থাকে। রঙ্গালয়ের একপাশে যে মঞ্চ ছিল তাতে দৃশ্যসজ্জার প্রভাব ছিল। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের

বসার জন্য বেঞ্চের ব্যবস্থা ছিল। রঙ্গালয় ছোট হওয়ায় দর্শকের আসন সংখ্যাও ছিল অল্প। রাজপ্রাসাদে বড় বড় হলঘরে নাট্যাভিনয় হত। স্কুল-কলেজের জন্য আলাদা অভিনয় কক্ষ নির্মিত হতে থাকল। দেখা যাচ্ছে এ যুগে নাট্যাভিনয়ের জন্য নানাধরনের নাট্যমঞ্চ তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া অভিনেতাদের পোশাক পরিচ্ছেদ, মঞ্চদৃশ্য ও অন্যান্য উপকরণ যথাযথ ব্যবহারের ব্যবস্থা ছিল। শেকস্পীয়রের নাটকের মধ্যেই মঞ্চ পরিকল্পনার সাক্ষ্য পাওয়া যায়।

ইংলণ্ডের পেশাদার অভিনেতারা ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সরাইখানায় রঙ্গামঞ্চ করে স্থায়ীভাবে অভিনয় শুরু করে। সে সময় লণ্ডন শহরেই একমাত্র স্থায়ী রঙ্গালয় ছিল। লণ্ডনের দলগুলো গ্রামে অভিজাতদের প্রাসাদে অভিনয় করলে জমিদারের দুর্গের প্রধান হলঘরে মঞ্চ তৈরি হত। কখনও কখনও ভ্রাম্যমাণ দল ওয়াগন্ মঞ্চে অভিনয় করত। নাট্যাভিনয়ের জনপ্রিয়তার কারণে ব্যবসায়ীরা লণ্ডনের বড় বড় সরাইখানা ভাড়া নিয়ে স্থায়ী রঙ্গামঞ্চ তৈরি করে। সরাইখানার একটা বিশেষত্ব ছিল। যেমন আকাশের নিচে অনাবৃত মুক্তাঙ্গন, দেওয়ালের গায়ে দু'তিন সারি গ্যালারী অভিমুখী সিঁড়ির কাছে মঞ্চ, মঞ্চের পিছনে পর্দা, তার পিছনে অভিনেতাদের সাজসজ্জার ঘর, সামনের চত্বরে দর্শক। ইতিমধ্যে সামাজিক ও রাজনৈতিক টানাপোড়েনের নাটকের ওপরে বড় ধরনের আঘাত নেমে আসে। অবশেষে 'জেমস্ বারবাজ' থিয়েটারকে বাঁচানোর জন্য একটা পরিকল্পনা করেন। বিখ্যাত এই অভিনেতা, সূত্রধর এবং মঞ্চশিল্পী পৌরসভার বাইরে একটি রঙ্গালয় তৈরি করেন। এখানেই ১৫৭৫-এ 'দ্য থিয়েটার' নামের সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী ২৫ বছরে অনেকগুলো রঙ্গালয় গড়ে উঠেছিল।

শেকস্পীয়রের যুগে সাধারণ রঙ্গালয় কাঠ, খড়, টালি দিয়ে তৈরি হয়েছিল। সোয়ান থিয়েটারে দেখা যায় বৃত্তাকার প্রেক্ষাগৃহ, উন্মুক্ত স্টেজ, মঞ্চের পিছনে দেওয়ালে— তার দুপাশে দুটি দরজা, মঞ্চের চারদিকে গ্যালারী। এরকম নানারকম বর্ণনার কিছু নাট্যমঞ্চের সন্ধান এই সময় পাওয়া যায়। মঞ্চের প্রধান প্রধান চরিত্রদের বৃহৎ স্বগতোক্তি মার্লো ও শেকস্পীয়রের নাটকে বেশি দেখা যায়। এলিজাবেথীয় মঞ্চ স্বগতোক্তির পক্ষে আদর্শস্থানীয় ছিল। শেকস্পীয়রের নাটকে বর্হিদৃশ্য, অর্ন্তদৃশ্য দেখা যায়। মঞ্চ পরিকল্পনা ছিল উন্নতমানের। 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট' নাটকে ব্যালকনির ব্যবহার দেখা গেছে। দরজা, জানলা, ছাদ, স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য, বৃত্তাকার প্রেক্ষাগৃহ— এ জাতীয় বাস্তব ভাবনা মাথায় রেখে মঞ্চ গঠন হয়েছিল। যান্ত্রিক কলা কৌশল সাধারণ রঙ্গামঞ্চ এসে গেছে। মঞ্চের কাছেই অভিনেতাদের সাজঘর থাকত। এই সময়কার সাধারণ রঙ্গালয়গুলি প্রায় একই রকমের ছিল। মঞ্চগুলো ছিল বর্ণবহুল। এলিজাবেথীয় যুগের নাট্যোন্নতির পক্ষে এই রঙ্গামঞ্চগুলি ছিল অত্যন্ত সহায়ক।

সামাজিক অবস্থা ও দর্শকদের মানসিকতার দিকে তাকিয়ে নাট্যকারদের নাটক রচনা করতে হত। অনুন্নত মানের শিল্পকর্মে প্রবল আপত্তি দেখা যেত। মার্লোর স্বল্প রচনা যেমন এলিজাবেথীয় যুগকে চিরস্মরণীয় করে রাখে, শেকস্পীয়রও সর্বকালের মানুষের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকারের সম্মান পান।

রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে শেকস্‌পীয়রের প্রত্যক্ষ যোগের ফলে তিনি নাটকীয় কলাকৌশলে পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। এ যুগের দর্শকরা মঞ্চে ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দুটোই দেখতে চাইত। লণ্ডনের 'প্যান্টামাইম' অভিনয়ে যেরূপ যান্ত্রিক কৌশল প্রদর্শিত হয়ে থাকে জগতের আর কোথাও এমন দেখতে পাওয়া যায় না।

ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের বিরোধের ফলে থিয়েটারের ওপর আঘাত হেনেছে, কিন্তু তাকে দমন করা যায় নি। আঘাতের পরবর্তী যুগকে থিয়েটারের পুনঃপ্রতিষ্ঠার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এ যুগের নাটকে ছিল জীবনের অন্তঃসারশূন্যতা। ফলে নাটকের সঙ্গে পাল্টেছে মঞ্চের প্রকৃতি। শেকস্‌পীয়রীয় যুগের ঠিক বিপরীত ছিল এই যুগ। এই যুগের নাটক অভিজাত ইংরেজদের কাছে গল্পগুজব বাবুয়ানার জায়গায় পর্যবসিত হয়। 'জন ওয়েব'-এর রচনা থেকে রেস্টোরেশন যুগের মঞ্চশিল্প, দৃশ্যসজ্জা সম্পর্কে জানা যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে 'ইনিগো জোনস্' অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে নাটকে আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্যসজ্জা প্রণালী, মঞ্চস্থাপত্য ও দৃশ্যাপসারণ পদ্ধতি ব্যবহার করেছিলেন। অনেক দিন পর্যন্ত এই পদ্ধতি চালু ছিল। রেস্টারেশন মঞ্চ দরবারী মঞ্চে পরিণত হয়েছিল। আধুনিক রঙ্গালয় এ যুগেই আরম্ভ হয়েছিল। 'দ্য রেড বুল', 'সলসবেরী কোর্ট', 'ডিউকস প্লে হাউস' নামক কিছু থিয়েটার হয় স্থাপিত না হয় পুনর্গঠিত হয়। নাটকে মুখবন্ধ, যবনিকা, স্বস্তিবচন, মঞ্চে দৃশ্য পরিবর্তন ছিলই। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি মঞ্চে অঙ্ক-যবনিকা এল। মঞ্চে মোমবাতি বা তেলের বাতি জ্বেলে আলোকসজ্জা হত। রঙ্গালয় ছিল গৃহাভ্যন্তরে। এই সময়কার রঙ্গমঞ্চে বাস্তব এবং প্রথাসম্মত ব্যবস্থার অদ্ভূত সমন্বয় ঘটেছিল। এই যুগের মঞ্চশিল্পে স্বদেশী-বিদেশী পদ্ধতির সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়।

৮৮.১৩ সারাংশ

রাজা অষ্টম হেনরীর সময় থেকে ইংলণ্ডে নাট্যানুষ্ঠান শুরু হয়। প্রথম এলিজাবেথ নাটকে পরিবর্তন আনেন। এই সময়ে গায়ক ও অভিনেতা এডোয়ার্ডস নাটককে সকলের কাছে জনপ্রিয় করে তোলেন। পরে রিচার্ড ফ্যারান্ট-এর আগ্রহ ও উৎসাহে রানী হলঘর ভাড়া নিয়ে অভিনয় দেখাতে শুরু করেন। এইভাবে পেশাদারী ভালো নাট্যদল গড়ে ওঠে। এলিজাবেথীয় যুগে শেকস্‌পীয়রের নাটক মঞ্চস্থ হয়। নাটকীয় কলাকৌশলের দ্বারা অভিনয় বাস্তব সমাজের নানান ঘটনা প্রকাশ করে। শেকস্‌পীয়রের নাটক সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। রাজসভার থিয়েটারের পাশাপাশি ইংলণ্ডে ব্যক্তিগত থিয়েটার গড়ে ওঠে। অভিজাত শ্রেণী, স্কুল-কলেজের জন্য আলাদা আলাদা নাট্যালয় গড়ে ওঠে। মঞ্চদৃশ্য, পোশাক-পরিচ্ছদের যথাযথ ব্যবহার শুরু হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে সরাইখানায় স্থায়ী রঙ্গমঞ্চ গড়ে ওঠে। ব্যবসায়িক প্রয়োজনে ব্যবসায়ীরা এই সব সরাইখানা ভাড়া দিয়ে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে। এক সময়ে এর ওপরেও নেমে আসে আঘাত। ফলে পৌরসভার বাইরে গিয়ে গড়ে ওঠে রঙ্গালয়।

শেকস্‌পীয়রীয় যুগে রঙ্গালয় কাঠ, খড়, টালি দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এই সময়ে চরিত্রদের মধ্যে স্বগতোক্তি দেখা যায়। গড়ে উঠেছে ব্যালকনি, সাজঘর, বর্ণবহুল রঙ্গামঞ্চ। নাট্যোন্নতির জন্য শেকস্‌পীয়র সর্বকালের শ্রেষ্ঠ সম্মান পান। নাটকে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জীবনের অন্তঃসারশূন্যতার ফলে নাটকের সঙ্গে মঞ্চের প্রকৃতি পাল্টেছে। অনেক বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে রেস্টোরেশন মঞ্চ দরবারী মঞ্চে পরিণত হয়েছে। বাস্তব এবং প্রথাসম্মত ব্যবস্থায় আধুনিক রঙ্গালয় এ যুগেই তৈরি হয়েছিল।

৮৮.১৪ অনুশীলনী ৪

১। নিচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন ঃ

(ক) প্রথম এলিজাবেথ — সালে সিংহাসনে বসেন।

(খ) 'ইনিগো জোন্‌স' — মঞ্চের অনুকরণ করেন।

(গ) প্রেক্ষাগৃহে দর্শকদের বসার জন্য — ব্যবস্থা ছিল।

(ঘ) ব্যবসায়ীরা লণ্ডনে — ভাড়া নিয়ে রঙ্গমঞ্চ তৈরি করে।

(ঙ) ইংল্যাণ্ড — বিরোধের ফলে থিয়েটারের ওপর আঘাত নেমে আসে।

২। নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) রানীর গ্রীষ্মকালীন আবাসের দায়িত্ব পান—
(১) এডোয়ার্ডস্‌
(২) ফ্যারাণ্ট
(৩) উইলিয়াম হানিস

(খ) শেকস্‌পীয়র সবচেয়ে খ্যাতি পেয়েছিলেন—
(১) রেনেসাঁস যুগে
(২) হেলেনীয় যুগে
(৩) এলিজাবেথীয় যুগে

(গ) 'ব্ল্যাকফ্রাইয়্যারস' রঙ্গালয়টি পুনর্গঠিত হয়—
(১) ১৬০৮ খ্রিঃ
(২) ১৮০৬ খ্রিঃ
(৩) ১৬০৬ খ্রিঃ

(ঘ) ইংলণ্ডের সরাইখানায় স্থায়িভাবে রঙ্গামঞ্চ তৈরি হয়—
(১) ষোড়শ শতাব্দীতে
(২) পঞ্চদশ শতাব্দীতে
(৩) সপ্তদশ শতাব্দীতে

(ঙ) রেস্টোরেশন যুগের মঞ্চশিল্প সম্পর্কে জানা যায়— (১) 'ইনিগো জোনস্'-এর রচনা থেকে
(২) 'জন ওয়েব'-এর রচনা থেকে
(৩) 'মার্লো'-র রচনা থেকে

৮৮.১৫ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১। ১। (ক) ঠিক (খ) ভুল (গ) ঠিক (ঘ) ঠিক (ঙ) ভুল
২। (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ১

অনুশীলনী ২। ১। (ক) ১ (খ) ১ (গ) ১।
২। (ক) ঠিক (খ) ঠিক (গ) ভুল (ঘ) ঠিক

অনুশীলনী ৩। ১। (ক) ২ (খ) ২ (গ) ১ (ঘ) ৩ (ঙ) ২ (চ) ২
২। প্যাশান (খ) অভিনেত্রীদের (গ) টাইপ (ঘ) পেপিং (ঙ) খোরাস।
৩। (ক) ঠিক (খ) ঠিক (গ) ঠিক (ঘ) ভুল

অনুশীলনী ৪। ১। (ক) ১৫৫৮ (খ) ইতালীয় (গ) বেঞ্চ (ঘ) সরাইখানা (ঙ) রাজতন্ত্রের।
২। (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ১ (ঘ) ১ (ঙ) ২

৮৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক — ড. গীতা সেনগুপ্ত।
২। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস— ড. অজিত কুমার ঘোষ।
৩। নাটকের কথা— ড. অজিতকুমার ঘোষ।
৪। লোক সংস্কৃতি গবেষণা ('যাত্রা' বিশেষ সংখ্যা)— সম্পাদনা : ড. সনৎকুমার মিত্র।

একক ৮৯ ❑ মঞ্চাভিনয় ঃ বাংলা নাটক

গঠন

৮৯.১ উদ্দেশ্য

৮৯.২ প্রস্তাবনা

৮৯.৩ মূলপাঠ (প্রথম অংশ) : কোলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় ও তার প্রেরণা

৮৯.৪ সারাংশ

৮৯.৫ অনুশীলনী— ১

৮৯.৬ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) : কোলকাতায় বাংলা নাট্য অভিনয়ের সূচনা : লেবেডফ, প্রসন্ন ঠাকুরের মঞ্চ

৮৯.৭ সারাংশ

৮৯.৮ অনুশীলনী — ২

৮৯.৯ মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) : শ্যামাবাজার নবীন বসু বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাট্যাভিনয়

৮৯.১০ মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) : জোড়াসাঁকো, পাথুরেঘাটা ও নবকৃষ্মদেবের শোভাবাজার নাট্যশালার নাট্যাভিনয়

৮৯.১১ মূলপাঠ (পঞ্চম অংশ) : বাগবাজার-শ্যামবাজার নাট্যসমাজ ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি

৮৯.১২ সারাংশ (মূলপাঠ ৩,৪,৫)

৮৯.১৩ অনুশীলনী (মূলপাঠ ৩,৪,৫)

৮৯.১৪ উত্তর সংকেত

৮৯.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

৮৯.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়লে আপনি—

- বিদেশী রঙ্গালয় থেকে কিভাবে আমাদের দেশে থিয়েটারী অভিনয় শুরু হয় তা জানতে পারবেন।
- থিয়েটারে বাংলা নাটকের অভিনয়ের সূচনা কিভাবে হয় তা জানতে পারবেন।
- লেবেডফ্ প্রতিষ্ঠিত বেঙ্গালী থিয়েটার থেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা পর্যন্ত সময়কালে বাংলা থিয়েটারের ইতিহাস সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ইংরেজি নাটকের অভিনয় ধারা বাঙালি অভিনেতাদের মধ্যে কিভাবে সংক্রামিত হয়েছিল তা জানতে পারবেন।
- তখনকার দিনের পত্র-পত্রিকাগুলো নাটক ও নাট্যমঞ্চ সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করত তা জানতে পারবেন।
- থিয়েটারের মাধ্যমে কিভাবে লোকশিক্ষা হয় জানতে পারবেন।

৮৯.২ প্রস্তাবনা

রঙ্গমঞ্চের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ আমাদের মধ্যে বৈচিত্র্য সঞ্চার করে। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কলকাতায় বিদেশী নাট্যালয় গড়ে ওঠার পর অনেক রঙ্গালয়ের সৃষ্টি হয়। প্রাচীন সংবাদপত্রে এর পরিচয় পাওয়া যায়। ইংরেজরা মূলত চিত্ত বিনোদনের জন্য এইসব নাট্যশালা গড়ে তোলেন। তবে এলিজাবেথীয় রীতি মেনেই এইসব রঙ্গামঞ্চ তারা গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। বিদেশী রঙ্গালয়ের অভিনয় দেখে তার সম্পর্কে দর্শকদের মধ্যে একটা নতুন বোধ গড়ে ওঠে। দেশী-বিদেশী বেশ কিছু নামকরা ব্যক্তি এখানে অভিনয় করেছেন। এইসব অভিনয় দেখে স্বদেশীরা বিদেশীদের অনুকরণে নিজেদের গৃহপ্রাঙ্গণে থিয়েটার প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ইংরেজদের থিয়েটারের ৩৯ বছর পরে ১৭৯৫ সালে প্রথম বাংলা নাট্যশালার আবির্ভাব। এই নাট্যশালার উদ্যোক্তা রুশ দেশীয় নাট্যানুরাগী 'গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডফ'।

জানা যায় বাঙালি প্রতিষ্ঠিত প্রথম নাট্যশালা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটারে এ দেশীয় লোকেরা ইংরেজি নাটকের অভিনয় করেছিলেন। লেবেডফের সময় থেকে ৭৭ বছর পরে অর্থাৎ ১৮৭২ সালে সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই এককে বাংলা নাটক, নাট্যমঞ্চ ও মঞ্চাভিনয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে যুগ প্রবণতা, মঞ্চের উদ্ভবের কথা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথা, সাজসজ্জা, আঙ্গিক, আলোক-

সম্পাতের কথা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলা রঙ্গমঞ্চ বাংলার শিল্প-সাহিত্য ইতিহাস সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা বাঙালিকে নতুন ভাবনার দিকে এগিয়ে নিয়ে চলে। রঙ্গমঞ্চ বাঙালির সংস্কৃতি ও সহিত্যচর্চাকে উজ্জীবিত করে তুলেছে।

৮৯.৩ মূলপাঠ (প্রথম অংশ) ঃ কোলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় ও তার প্রেরণা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমাদের দেশে বিদেশী রঙ্গালয় থেকে থিয়েটারী অভিনয়ের সুত্রপাত। এই সময়ে খোলামঞ্চে গীতপ্রধান যাত্রাভিনয়ের প্রচলন ছিল। চারদিকে ঘেরা মঞ্চে যখন অভিনয় শুরু হল তখন নাটক এবং মঞ্চের শিল্পরীতি পাল্টে গেল। ইংলন্ডের রঙ্গামঞ্চ ও তাদের রোমান্টিক অভিনয় তখন এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অনুসরণ করতেন। এই অভিনয়ে কণ্ঠস্বরের উচ্চতা, হৃদয়ের উচ্ছ্বাস, অতিনাটকীয় যা ছিল তা আমাদের দেশীয় অভিনয়েও দেখা যেত। ফলে বাংলা নাট্যশালা ইংরেজ রঙ্গালয়ের কাছে অনেকটা ঋণী— নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ীও একথা স্বীকার করেছেন।

ইংরেজরা কলকাতায় ব্যবসার নিমিত্তে এসে বসবাস শুরু করে। ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সময় থেকেই এদেশে রঙ্গামঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়। লালবাজার অঞ্চলের 'প্লে হাউস' সম্ভবত ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয়। এর প্রতিষ্ঠাকাল সঠিকভাবে না জানা গেলেও পলাশীর যুদ্ধের আগে যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে বিষয়ে তথ্য পাওয়া যায়। এমনকি ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে এখানে প্রথম অভিনয়ও হয়েছিল। ইংলণ্ডে বিখ্যাত অভিনেতা গ্যারিকের আদর্শ এখানকার অভিনেতারা অনুসরণ করতেন। অভিনেতারা সকলেই ছিলেন অ্যামেচার শিল্পী। সিরাজদৌল্লার কলকাতা আক্রমণের সময় এটি ধ্বংস হয়ে যায়। তারপর একে একে ক্যালকাটা থিয়েটার, মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার, হোয়েলার প্লেস থিয়েটার, এথেনিয়াম থিয়েটার, চৌরঙ্গী থিয়েটার, দমদম থিয়েটার, বৈঠকখানা থিয়েটার, সাঁ সুসি থিয়েটার— এরকম বেশ কিছু থিয়েটারের অভ্যুদয় ঘটে। আবির্ভাব ঘটে বহু স্মরণীয় শিল্পীর।

ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় নাট্যশালার নাম 'ক্যালকাটা থিয়েটার' বা 'দি নিউ প্লে হাউস'। প্রায় পাঁচ বিঘা জমির ওপরে লক্ষ টাকা ব্যয় করে জর্জ উইলিয়ামসন ১৭৭৫ সালে রাইটার্স বিল্ডিংস্-এর পিছন দিকে এই নাট্যশালাটি গড়ে তোলেন। ওয়ারেন হেস্টিংস, রিচার্ড বারওয়েল, স্যার ইলিজা ইম্পে, চেম্বার্স প্রমুখেরা এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ডেভিড গ্যারিকের পরামর্শে এই নাট্যালয়টিও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। এই নাট্যমঞ্চের টিকিটের মূল্য ছিল বেশি। ক্যাপ্টেন কল নামে এক ব্যক্তি এই মঞ্চে অভিনয় করে 'গ্যারিক অব দি ইস্ট' নামে অভিহিত হয়েছিলেন। মিসেস ব্রিস্টোর সময়ে ১৭৮৯ সালে প্রথম এই মঞ্চে স্ত্রী-লোকই অংশগ্রহণ করেন। এর দৃশ্যপট ছিল সুন্দর এবং অভিনেতাদের পোশাক

পরিচ্ছদও ছিল বেশ সাজানো-গোছানো। দৃশ্যপটে ও মঞ্চ সাজানোয় মুন্সীয়ানার ছাপ ছিল। অর্থাভাবে তেত্রিশ বছর পর এই নাট্যলয় বন্ধ হয়ে যায়।

ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত এবং পরিচালিত অনেকগুলো থিয়েটারের নাম পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এই নাট্যশালাগুলোর মধ্যে 'ক্যালকাটা থিয়েটার', 'চৌরঙ্গী থিয়েটার' এবং 'সাঁ সুসি থিয়েটার' ছাড়া অন্যগুলো ছিল স্বল্পস্থায়ী। সেদিনের কলকাতার গণ্যমান্য বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির চেষ্টায় ১৮১৩ সালের ২৫ শে নভেম্বর মহাসমারোহে চৌরঙ্গী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয়। অধ্যাপক হোরেস হেম্যান উইলসন, ক্যাপ্টেন ডি. এল, রিচার্ডসন, হেনরী মেরেডিথ পার্কার, স্যার জে.পি.গ্রান্ট অনেকেই এই নাট্যশালার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনেক উঁচুদরের শিল্পীর অভিনয় নৈপুণ্যে চৌরঙ্গী থিয়েটারের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়ে ওঠে। এই রঙ্গালয়ের একজন দরদী বন্ধু, প্রথম শ্রেণীর নাট্যসমালোচক ও অভিনেতা স্টোকলার তাঁর 'মেময়ার্স অফ এ জার্নালিস্ট' গ্রন্থে চৌরঙ্গী থিয়েটার সম্পর্কে বহু খবর রেখে গেছেন। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর এই রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এখানকার অভিনেতারা বেতন পেতেন। 'ক্যালকাটা গেজেট', 'জনবুল' প্রভৃতি সংবাদপত্রে এই মঞ্চের খবর থাকত। কোয়েলার, পার্কার, মিসেস এসথার লীচ প্রমুখেরা অভিনয় করে খ্যাতি অর্জন করেন। পরবর্তীকালে ঋণের দায়ে এই রঙ্গালয় প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কাছে বিক্রি হয়ে যায়। তখন এর দৃশ্যপট, সাজসজ্জা ও অভিনয়ের উন্নতির চেষ্টা করা হলেও নানা কারণে ১৮৩৯ সালের ৩১ শে মে এই রঙ্গালয়টি অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত হয় এবং এই রঙ্গালয়ের অবসান ঘটে।

চৌরঙ্গী থিয়েটারের পর ১৮৩৯ সালের ২১ শে আগস্ট সাঁ সুসি থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। স্টোকলারের প্রচেষ্টায় মিসেস লীচের যোগদানে এই রঙ্গালয়ে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। মঞ্চ, সাজঘর, প্রেক্ষাগৃহ সুন্দরভাবে নির্মিত হয়। প্রথম অভিনীত হয় 'You Can't Marry Your Grandmother'। এই নাট্যমঞ্চে অনেকগুলো নাটকের অভিনয় হয়। দর্শকদের বসার জায়গা খুব বেশি ছিল না। এখন যেখানে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ সেখানে সাঁ সুসির নিজস্ব বাড়ি ছিল। মিসেস লীচের মৃত্যুর পর এই নাট্যালয়ের পতন ঘনিয়ে আসে। এই রঙ্গালয়ের প্রথম একজন এদেশী অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্য অভিনয়ের সুযোগ পান। জানা যায় ওথেলোর ভূমিকায় অভিনয় করে আঢ্য খুব প্রশংসা অর্জন করেন, কিন্তু ঐ অভিনয়ের পর ১৮৪৯ সালে সাঁ সুসি বন্ধ হয়ে যায়।

কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত বিদেশী রঙ্গালয়গুলির মধ্যে বেশ কিছু রঙ্গালয় স্বল্পস্থায়ী হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে ১৭৮৯ সালের ১ লা মে পুয়োর সোলজার নামক নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে মিসেস ব্রিস্টোর প্রাইভেট থিয়েটার-এর দ্বারোদঘাটিত হয়। মিসেস ব্রিস্টোর অভিনয়, দৃশ্যপট এবং অর্কেস্ট্রার কথাও উল্লেখ ছিল। মেয়েরা এই রঙ্গামঞ্চে পুরুষের ভূমিকায় অভিনয় করে। এই রঙ্গমঞ্চ বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। ১৭৯৭ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারি হোয়েলার প্লেস থিয়েটার নামে এক নতুন রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। অর্থাভাবে পরের বছরই এই রঙ্গালয় বন্ধ হয়ে যায়। ১৮১২ সালের ৩০ শে মার্চ এথেনিয়াম থিয়েটারের

দ্বারোদঘাটন হয়। কিন্তু এই রঙ্গালয়ের জীবনেও সুদিন না আসায় এই মঞ্চে যবনিকা পড়েছিল। কলকাতার উপকণ্ঠে গড়ে ওঠা দমদম থিয়েটার, ১৮২৪ সালে বৈঠকখানা থিয়েটারের নামও জানা যায়। তবে এসব থিয়েটার স্বল্পকাল স্থায়ী হয়েছিল।

ইংরেজ পরিচালিত রঙ্গালয়গুলিতে টিকিট বিক্রি করে অভিনয় দেখার ব্যবস্থা ছিল। শিল্পীরা বেতন পেত। ইংরেজ শিল্পীদের কাছ থেকে এদেশীয় শিল্পীরা মঞ্চে চলাফেরা, দাঁড়ানো বা বসার ভঙ্গি, অঙ্গসঞ্চালন প্রভৃতিতে পারদর্শিতা অর্জন করে। চৌরঙ্গী ও সাঁ সুসি থিয়েটার থেকে বাঙালিরা নাট্যচর্চার প্রেরণা পায়। সাঁ সুসির পরে উনিশ শতকের শেষার্ধে সেন্ট থিয়েটার, থিয়েটার রয়্যাল, অপেরা হাউস, গ্যারিসন থিয়েটার নামক কয়েকটি স্বল্পকালীন রঙ্গালয় নাটক অভিনয়ের ধারা বজায় রেখেছিল। এবং এসব থেকে রঙ্গমঞ্চ সজ্জা, অভিনয় কৌশল বাঙালি রপ্ত করেছিল।

৮৯.৪ সারাংশ

বিদেশী রঙ্গালয় থেকে আমাদের দেশে থিয়েটারী অভিনয়ের সূচনা। ইংরেজদের অভিনয়ের উচ্ছ্বাস, তাদের ভাবধারা এখানকার অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অনুকরণ করতে শুরু করে। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয় প্লে- হাউস পলাশীর যুদ্ধের আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এখানকার অভিনেতারা ছিলেন অ্যামেচার শিল্পী। এরপর একে একে এখানে অনেক থিয়েটার গড়ে ওঠে। ইলিজা ইম্পে প্রমুখের পৃষ্ঠপোষকতায় ডেভিড গ্যারিকের পরামর্শে ‘ক্যালকাটা থিয়েটার’ ও সুন্দরভাবে পরিচালিত হয়। এই মঞ্চে প্রথম স্ত্রী চরিত্রে স্ত্রী অভিনেতা অভিনয় করে। ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত থিয়েটারগুলোর মধ্যে পরবর্তীকালে ‘চৌরঙ্গী থিয়েটার’ ও ‘সাঁ সুসি থিয়েটার’ ছাড়া অন্যগুলো বিশেষ চলে নি। এই থিয়েটারগুলো গণ্যমান্য কয়েকজন ব্যক্তির চেষ্টায়, বেশ কিছু শিল্পীর অভিনয় নৈপুণ্যে কিছুদিন ভালোভাবে চলেছিল। সাঁ সুসি থিয়েটারে মঞ্চ, সাজঘর, প্রেক্ষাগৃহ সুন্দরভাবে তৈরি হয়েছিল। এই রঙ্গালয়ে প্রথম এদেশী অভিনেতা বৈষ্ণবচরণ আঢ্য ওথেলার ভূমিকায় অভিনয় করে খুব প্রশংসা অর্জন করেন। ইংরেজ পরিচালিত রঙ্গালয়গুলিতে টিকিট বিক্রির ব্যবস্থা ছিল। এই সমস্ত রঙ্গালয়গুলি থেকে বাঙালিরা অভিনয় কৌশল এবং নাট্যচর্চার প্রেরণা পায়।

৮৯.৫ অনুশীলনী ১

১। নীচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) ইংরেজ প্রতিষ্ঠিত প্রথম রঙ্গালয়— ১। দমদম থিয়েটার
২। প্লে হাউস
৩। ক্যালকাটা থিয়েটার

(খ) ক্যালকাটা থিয়েটারের অপর নাম— ১। চৌরঙ্গী থিয়েটার
২। এথেনিয়াম থিয়েটার
৩। দি নিউ প্লে-হাউস

(গ) চৌরঙ্গী থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় — ১। ১৮১৩ সালে
২। ১৮৩১ সালে
৩। ১৮৩৩ সালে

২। যথাযথ শব্দ বসিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করুন।

(ক) বাংলা নাট্যশালা —— রঙ্গালয়ের কাছে অনেকটা ঋণী।

(খ) দ্বারকানাথ ঠাকুর —— থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

(গ) বৈষ্ণবচরণ আঢ্য —— ভূমিকায় অভিনয় করেন।

(ঘ) কলকাতার উপকণ্ঠে গড়ে ওঠে ——

৮৯.৬ মূলপাঠ (দ্বিতীয় অংশ) কোলকাতায় বাংলা নাট্য অভিনয়ের সূচনা ঃ লেবেডফ, প্রসন্নকুমার ঠাকুরের মঞ্চ

কোলকাতায় বাংলা নাট্যাভিনয়ের সূচনা করেন রুশ দেশীয় একজন জ্ঞানতাপস গেরাসিম স্টেপানোভিচ লেবেডফ। তিনি বাংলার অভিনয় জগতে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনেন। কলকাতায় নাট্যশালা নির্মাণ করে বাংলা নাটকের অভিনয় করানোর কৃতিত্ব তিনি দাবি করতে পারেন। ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'বেঙ্গালী থিয়েটার' নামে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে এম জডরেলের লেখা 'The Disguise' নাটকের বাংলা অনুবাদ 'কাল্পনিক সংবদল' তিনি তাঁর নির্মিত মঞ্চে পর পর দুবার অভিনয় করিয়েছিলেন। প্রথমবার ১৭৯৫ সালের ২৭ শে নভেম্বর এবং দ্বিতীয়বার ১৭৯৬ সালের ৩ রা মার্চ। তাঁর শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের সাহায্য নিয়ে তিনি 'The Disguise' গ্রন্থের বাংলা অনুবাদ করেন। লেবেডফ একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। কলকাতায় ইংরেজদের প্রতিষ্ঠিত 'ক্যালকাটা থিয়েটার'-এর দৃশ্যপট ও অভিনয় দেখে এবং ইংরেজ অভিনেত্রী ব্রিস্টোর নাচ-গান দেখে ও শুনে তাঁর একটি বাঙালি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা হয়। তিন মাসের মধ্যেই নিজেই নকশা করে বিলাতি রঙ্গামঞ্চের মত করে তিনি নাট্যশালাটি তৈরি করেন।

'কাল্পনিক সংবদল' নাটকটি অভিনয়ের সময় সেটিকে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য তার মধ্যে 'বিদ্যসুন্দর' থেকে কিছু গান যুক্ত করা হয়। নাটকে বাঙালি ভাব সঞ্চারিত হয়। বাঙালি অভিনেতা ও

অভিনেত্রী সংগৃহীত হয় নাটকের জন্য। বঙ্গীয় রীতিতে মঞ্চসজ্জা, কণ্ঠ যন্ত্রসঙ্গীতে ভারতীয় ভাবধারা অনুসরণ করা হয়। বেহালাবাদক লেবেডফের পক্ষে এগুলো সহজসাধ্য হয়েছিল। এদেশীয় দর্শকদের চাহিদা অনুসারে তিনি নাটকে গান, বাজনা ও নানারকম দৃশ্যের অবতারণা করেছিলেন। এমনকি নাট্যাভিনয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য নাটকের 'বাজিয়্যার' বাজনার ব্যবস্থা ছিল। অভিনয়ের চরিত্রগুলিকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে তিনি সতর্ক দৃষ্টি রেখেছিলেন।

লেবেডফের থিয়েটারে স্ত্রী চরিত্রে অভিনয়ের জন্য অভিনেত্রীদের আগমন অবশ্যই তখনকার দিনের অভিনয়ের একটি আকর্ষণীয় দিক। অভিনেতারা সমাজের সাধারণ স্তর থেকে এলেও অভিনেত্রীরা খিদিরপুরের ডক অঞ্চলের বারাঙ্গনা পল্লী থেকে সংগৃহীত। তবে অনুমান করা হয় যাত্রা-রসিক গোলাকনাথ দাস অভিনেত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে ঝুমুর গান, সারিগান এবং কীর্তন গান গাইয়েদের গুরুত্ব দিতেন। লেবেডফের সময় কলকাতায় ধনী বা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের প্রভাব ততটা চোখে পড়ত না। ফলে সমাজের সাধারণ স্তরের লোকেরা একটু নিকৃষ্ট মানের নাচ গানে মেতে থাকত। আবার যারা লেবেডফের নাট্যশালার অভিনয়ের দর্শক ছিলেন তারা বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্পর্কে খুব বেশি সচেতন ছিলেন না। এই রঙ্গমঞ্চে টিকিটের মূল্যও বেশি ছিল। তবে ইংরেজদের রঙ্গালয়ের টিকিট মূল্যের চেয়ে কম হওয়ায় ইংরেজ সাহেবরা এখানে ভিড় জমাত।

লেবেডফের রঙ্গমঞ্চের অভিনয় সাফল্য এবং জনপ্রিয়তা ইংরেজি থিয়েটার কর্তৃপক্ষের কাছে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠে। ফলে তারা নানাভাবে তাঁর ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করেন। কিন্তু এদেশীয় লোকেরা কৌতুকপূর্ণ বিষয় বেশি পছন্দ করতেন বলে লেবেডফও সেই রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চেয়েছিলেন। তাঁর জন্যই বাংলা নাট্যশালায় নাচ ও গান প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশের যাত্রাশিল্পে দৃশ্যবিভাগ ও গর্ভাঙ্ক রচনার ব্যাপারেও লেবেডফের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। বাংলার রঙ্গমঞ্চ পাশ্চাত্য ভাবধারায় গড়ে উঠলেও তা জাতীয় বৈশিষ্ট্যে সমুন্নত হয়েছিল লেবেডফের বাস্তবজ্ঞান ও নিষ্ঠায়। সেজন্য লেবেডফের কাছে বাঙালি নাট্যপিপাসুদের ঋণ অপরিসীম।

ইংরেজদের চক্রান্তে লেবেডফের থিয়েটার ধ্বংস হলে উনিশ শতকের প্রথমে বাংলার রঙ্গালয়ে অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। অবশ্য এই সময়ে যাত্রা, পাঁচালি কবিগান, হাফ আখড়াই জাতীয় কিছু মাধ্যম বাঙালি জনমানসের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ফলে রঙ্গমঞ্চের সংকট প্রশমনের জন্য ১৮৩১ খ্রিস্টাব্দের ২৮শে ডিসেম্বর প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁর নারকেলডাঙার বাগানবাড়িতে একটি নাট্যশালা তৈরি করেন। প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটারের নাম 'হিন্দু থিয়েটার'। আবার হিন্দু কলেজ প্রতিষ্টার পর থেকে বাঙালি ইংরেজি নাটকের সঙ্গে পরিচিত হওয়ায় তারা যাত্রা-পাঁচালির পরিবর্তে মঞ্চে অভিনয়ের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল। এদের মধ্যে কেউ কেউ নাট্যশালা গড়ে তুলতে চাইল। সেই সুত্রে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আবির্ভাব. তিনিই প্রথম বাঙালি যিনি রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠা করেন। বাঙালি সমাজে বিদ্যা-

বুদ্ধিতে তিনি আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি। হিন্দু থিয়েটার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর তখনকার দিনের নাট্যামোদী শ্রীকৃষেণ সিং, কিষেণ দত্ত, গঙ্গাচরণ সেন, মাধবচন্দ্র মল্লিক, তরাচাঁদ চক্রবর্তী, হরচন্দ্র ঘোষ প্রমুখদের সাহায্য পেয়েছিলেন।

'হিন্দু থিয়েটার' বাঙালি কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হলেও এখানে প্রথম ইংরেজি নাটকের অভিনয় হয়। শেক্সপীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের পঞ্চম অঙ্ক এবং পরে ভবভুতির 'উত্তর রামচরিত'-এর প্রথম অঙ্ক অভিনীত হয়। স্যার এডোয়ার্ড রায়ান, কর্নেল ইয়ং, রাজা রাধাকান্ত দেব প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ সেদিন দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন। ১৮৩২ সালের ২৯ শে মার্চ এখানে বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে 'নাথিং সুপারফ্লুয়াস' (Nothing Superflous) নামে একটি ছোট প্রহসনের অভিনয় হয়। এই অভিনয়ের খুব প্রশংসা হয়েছিল। এখানকার পাত্র-পাত্রীর বেশভূষা ও অভিনয় ছিল চমৎকার এবং দৃশ্যপট ইত্যাদি রুচিসম্মত হয়েছিল। তবে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি। তাই খুব তাড়াতাড়ি এই থিয়েটার উঠে যায়।

৮৯.৭ সারাংশ

বাংলা নাট্যাভিনয়ে গেরাসিম লেবেডফের অবদান স্মরণযোগ্য। তিনি 'বেঙ্গালী থিয়েটার' নামে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। এম জডরেলের 'কাল্পনিক সংবদল' তাঁর তৈরি মঞ্চে পর পর দুবার অভিনীত হয়। সঙ্গীতজ্ঞ লেবেডফ নিজের শিক্ষক গোলোকনাথ দাসের সাহায্য নিয়ে, ক্যালকাটা থিয়েটারের অভিনয় দেখে, মিসেস ব্রিস্টোর নাচ দেখে বাঙালি নাট্যশালা তৈরি করেন। বাঙালি ভাবধারা সমন্বিত এই নাটকে বাঙালি দর্শকদের চাহিদা অনুসারে তিনি গান, বাজনা, মঞ্চসজ্জা, যন্ত্রসঙ্গীত এমনকি অভিনেতা-অভিনেত্রী ব্যবহারের ব্যবস্থাও করেছিলেন। লেবেডফের থিয়েটারে অভিনেত্রীদের আগমন ছিল উল্লেখযোগ্য বিষয়। এখানে সাধারণ সম্প্রদায়ের মানুষদের ভিড় ছিল বেশি। ফলে বঙ্গ-সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব ছিল। লেবেডফের রঙ্গামঞ্চের সাফল্য ইংরেজদের দুশ্চিন্তার কারণ হওয়ায় তারা এই থিয়েটারের ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে, কিন্তু লেবেডফ এদেশীয় মানুষের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলায় তা সংঘটিত হতে কিছুটা দেরী হয়েছিল।

ইংরেজরা চক্রান্ত করে লেবেডফের থিয়েটার ধ্বংস করলে বাংলা রঙ্গালয়ে অস্তিত্বের সংকট দেখা দেয়। এই সংকট প্রশমনের জন্য প্রসন্নকুমার ঠাকুর ১৮৩১ সালে 'হিন্দু থিয়েটার' প্রতিষ্টা করেন। বাঙালিরাও মঞ্চে অভিনয় দেখা এবং অভিনয় করার জন্য চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রসন্নকুমার সেই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে কিছু নাট্যামোদী ব্যক্তির সাহায্যে সখের নাট্যশালা গড়ে তুললেন। শেকস্‌পীয়রের 'জুলিয়াস সীজার' নাটকের অভিনয় দিয়ে এই নাট্যশালার যাত্রা শুরু। বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই নাট্যশালা রুচিসম্মত অভিনয় বজায় রাখলেও হিন্দু থিয়েটার সাধারণ মানুষের মধ্যে বিশেষ সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি।

৮৯.৮ অনুশীলনী ২

১। শূন্যস্থাগুলি যথার্থ শব্দযোগে পূরণ করুন।

(ক) লেবেডফ একজন —— ছিলেন।

(খ) অভিনেত্রীরা —- ডক অঞ্চল থেকে আসত।

(গ) ইংরেজরা লেবেডফের নাট্যশালার —— চেষ্টা করে।

২। নিচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) 'The Disguise' নাটকের বাংলা অনুবাদ করেন —
(১) জডরেল
(২) গোলোকনাথ দাস
(৩) লেবেডফ

(খ) লেবেডফের সময় নাটক দেখত—
(১) ধনী
(২) শিক্ষিত
(৩) সাধারণ মানুষ

(গ) প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত নাট্যশালা—
(১) বেঙ্গালী থিয়েটার
(২) হিন্দু থিয়েটার
(৩) বঙ্গীয় নাট্যশালা

৮৯.৯ মূলপাঠ (তৃতীয় অংশ) শ্যামবাজার নবীন বসু ও বেলগাছিয়া নাট্যশালার নাট্যাভিনয়

তখনকার দিনে বিত্তবান ব্যক্তিরা নিছক আমোদ উপভোগ করার জন্য থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করতেন। সাধারণ মানুষের জন্য থিয়েটার তৈরি কিংবা অভিনয়ের ব্যবস্থা ছিল না। স্থায়ী রঙ্গমঞ্চের পরিবর্তে বাড়ির উঠান, নাটমন্দিরে অভিনয়ের ব্যবস্থা করা হত। এরকম ভাবেই উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারের বাসিন্দা তৎকালীন কলকাতার বিত্তশালী ব্যক্তি নবীনচন্দ্র বসুর বাড়িতে ১৮৩৩ সালে একটি নাট্যশালা গড়ে ওঠে। নবীনচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটার শ্যামবাজার থিয়েটার নামে পরিচিত। ১৮৩৫ সালের ২২শে অক্টোবর হিন্দু কলেজের ছাত্রদের পরিচালিত 'হিন্দু পাইয়োনীয়র পত্রিকা থেকে জানা যায় ১৮৩৩

সালে এই থিয়েটারটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে শ্যামবাজার থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা কাল নিয়ে বিতর্ক থাকলেও 'হিন্দু পাইয়োনীয়র' পত্রিকার সিদ্ধান্ত আমাদের কিছুটা সন্দেহ মুক্ত করে।

বাংলা ভাষায় হিন্দুদের দ্বারা অভিনীত এই থিয়েটারটিকে স্বদেশী থিয়েটার নামে অভিহিত করা হত। এখানে বছরে চার/পাঁচটি করে নাটক অভিনীত হত। এখানকার অভিনয় পদ্ধতি সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য জানা যায়। এই থিয়েটারের জন্মলগ্ন থেকেই নারী অভিনেত্রী নিয়োগ করা হয়েছিল। এই থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য দৃশ্যপট নির্মাণ ছাড়াও দৃশ্যাঙ্কনের ব্যবস্থা ছিল। এখানে বাংলা নাটক অভিনয়ের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

'হিন্দু পাইয়োনীয়র' নামক পত্রিকা থেকে জানা যায় যে ১৮৩৫ সালের ৬ই অক্টোবর ভারতচন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' নাটকের প্রথম অভিনয়ের মাধ্যমে শ্যামবাজার থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। ৬ই অক্টোবরের পূর্ণিমা রাত্রিতে ১২টার সময় 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয় শুরু হয় এবং পরের দিন সকাল সাড়ে ৬টা পর্যন্ত চলে। স্বদেশী বিদেশী মিলিয়ে প্রায় হাজার মানুষ এখানে অভিনয় দেখে। সেতার, সারেঙ্গী, পাখোয়াজ, বেহালা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। আলোর কৌশলে স্টেজে ঝড়-বিদ্যুৎ দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মঞ্চে পর্দার ব্যবহার ছিল। পর্দা অর্থাৎ যবনিকা তোলার আগে স্তোত্রপাঠের ব্যবস্থা ছিল। তবে মেঘ, জল জাতীয় পশ্চাৎপট চিত্র অঙ্কনের ক্ষেত্রে উৎকর্ষ প্রকাশ পায় নি। বিদ্যাসুন্দরের অভিনয় পদ্ধতিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির প্রয়োগ চোখে পড়ে. কাহিনীটি ছিল লোকপ্রিয়। নবীন বসুর প্রাসাদ ও উদ্যান জুড়ে এর অভিনয় হয়েছিল। কৃত্রিম দৃশ্যপট ছাড়াও নবীনচন্দ্র বসুর বাড়ির কাছাকাছি থাকা পুকুর ও বাগানের গাছ ইত্যাদি দৃশ্যরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। পুরুষ অভিনেতা অপেক্ষা স্ত্রী অভিনেত্রীদের অভিনয় মনোজ্ঞ হয়েছিল এবং দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছিল। সুন্দরের ভূমিকায় শ্যামাচরণ, দিব্যার ভূমিকায় রাধামণি, রানী ও মালিনীর ভূমিকায় জয়দুর্গার অভিনয় অনেকের ভালো লেগেছিল। নাট্যকার নিজেই 'কালুয়া'র ভূমিকায় অভিনয় করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন। নাটকের মধ্যে নাট্যকার সমাজ সংস্কার ও নারী প্রগতির কথা উল্লেখ করেছেন।

শ্যামবাজার থিয়েটার নামক মঞ্চটি তৈরি করতে নবীনচন্দ্র বসু দুই লাখের বেশি টাকা ব্যয় করেছিলেন। এই থিয়েটারে বাংলার প্রথম নাট্যাভিনয় অভিনীত হয়। তবুও এই থিয়েটার চার/পাঁচ বছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। বাংলা নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে এই থিয়েটারের ভূমিকা উল্লেখযোগ। প্রথম বাঙালি প্রতিষ্ঠিত এই থিয়েটার সমকালীন শিক্ষিত ও উচ্চবিত্ত জনসমাজে খুবই উদ্দীপনা সঞ্চার করেছিল।

রঙ্গমঞ্চকে কেন্দ্র করে বাংলা নাটক রচনার ক্ষেত্রে একটা নবজীবন সঞ্চারিত হয়েছিল যেমন,তেমনি সখের নাট্যশালারও বিকাশ ঘটতে শুরু করে। 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' এরকম একটি সৌখিন নাট্যশালা।

বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে এই নাট্যশালাটি তৈরি করা হয়েছিল। পাইকপাড়ার রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের বাগানবাড়িতে মহারাজ যতীনমোহন ঠাকুরের পরামর্শে এই রঙ্গালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৮৫৮ সালের ৩১শে জুলাই এর দ্বারোদঘাটন হয়। এই মঞ্চে প্রথম অভিনীত হয় রামনারায়ণ তর্করত্ন অনুদিত শ্রহর্ষের 'রত্নাবলী' নাটক। সে যুগের ইংরেজি শিক্ষিত ও নব্যশিক্ষিত অনেক বাঙালি এই মঞ্চের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মধুসূদন দত্তের সহপাঠী গৌরদাস বসাকের 'স্মৃতিকথা' ছাড়াও তৎকালীন বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে এ জাতীয় অনেক তথ্য জানা যায়।

এই নাট্যশালার মঞ্চসজ্জা, গীতবাদ্য এবং অভিনয় খুব উচ্চমানের ছিল। গ্যাসের আলোয় পাদপ্রদীপ আলোকিত করা হয়েছিল। লাইমলাইটের সাহায্যে একটা বিশেষ মোহময় পরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। এখানেই প্রথম ঐকতানবাদন প্রবর্তিত হয়। ইংরেজ শিল্পীরা মঞ্চের দৃশ্যপট অঙ্কন করেছিলেন। জানা যায় সিংহ ভ্রাতারা এর জন্য দশ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন। বিদূষক-এর ভূমিকায় কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দেখার জন্য দেশী-বিদেশী অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। ছোটলাট স্যার পেডারিক হ্যালিডে, বিদ্যাসাগর, প্যারিচাঁদ মিত্র, রামগোপাল ঘোষ, রামনারায়ণ তর্করত্ন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কিশোরীচাঁদ মিত্র, মধূসূদন দত্ত প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই অভিনয় দেখার জন্য মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। 'রত্নাবলী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদের দায়িত্ব বর্তায় মধুসূদন দত্তের ওপর। এই জন্যেই বেলগাছিয়া নাট্যশালার সঙ্গে মধুসূদনের সংযোগ গড়ে ওঠে। 'হিন্দু প্রেট্রিয়ট' পত্রিকা থেকে জানা যায় 'রত্নাবলী' নাটকের প্রথম অভিনয়ে গীতবাদ্য, আলো, সাজসজ্জা খুব প্রশংসনীয় হয়েছিল। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকাতে প্রশংসা করে এর বিবরণ প্রকাশিত হয়। 'রত্নাবলীর' নাটক বেলগাছিয়া নাট্যশালায় ছয় /সাত বার অভিনীত হয়।

এখান থেকেই মধুসূদন দত্ত বাংলা নাটকের অভাব অনুভব করে নাটক লিখবেন মনস্থ করেন। সেই অভিলাষেই রচিত হয় 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। এই নাটকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মেলবন্ধন ঘটে। প্লট রচনা, চরিত্র চিত্রণ এবং সংলাপ প্রয়োগের ক্ষেত্রে এই নাটক বাংলা নাট্যজগতে যুগান্তর সৃষ্টি করে। ১৮৫৯ সালের ৩ রা সেপ্টেম্বর 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা'য় 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। ২৭শে সেপ্টেমবর ষষ্ঠ এবং শেষ অভিনয় হয়। মাত্র পঁচিশ দিনের মধ্যে ছয়বার অভিনয় হওয়ায় এই নাটকের জনপ্রিয়তা কতটা ছিল তা বোঝা যায়। শর্মিষ্ঠার পর আর কোনো নাটক এই নাট্যশালায় অভিনীত হয়নি। ১৮৬১ সালের ২৯শে মার্চ রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহের অকাল মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই বেলগাছিয়া নাট্যশালার উজ্জ্বল-দীপ নির্বাপিত হয়। তবুও অল্প সময়ের মধ্যে এই নাট্যশালা যেভাবে দর্শকদের উৎসাহিত করেছিল তা প্রশংসা করার মতো। বাঙালির নাট্যচিন্তার ক্ষেত্রে এই রঙ্গমঞ্চের অবদান কম নয়।

৮৯.১০ মূলপাঠ (চতুর্থ অংশ) জোড়াসাঁকো, পাথুরেঘাটা ও নবকৃষ্ণদেবের শোভাবাজার নাট্যশালার নাট্যাভিনয়

ঠাকুরবাড়িতে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নাটক নাট্যশালা ও নাট্যাভিনয়ের প্রতিও বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তার প্রমাণ স্বরূপ, 'জোড়াসাঁকো নাট্যশালার নাম উল্লেখ করা যায়। এটি সখের নাট্যশালাগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার মূলে গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ তৎকালীন কয়েকজন নাট্যামোদী ব্যক্তি বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। জানা যায় গোপাল উড়ে নামক একজনের যাত্রা দেখে উপরিউক্ত ব্যক্তিরা এই নাট্যশালা প্রতিষ্ঠার সংকল্প গ্রহণ করেন। তার জন্য অভিনেতা এবং নাট্যবিশেষজ্ঞ কৃষ্ণবিহারী সেনের নেতৃত্বে পাঁচজনের একটি কমিটিও গঠিত হয়। এই কমিটিতে কৃষ্ণবিহারী সেন ছাড়াও ছিলেন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী ও যদুনাথ মুখোপাধ্যায়। নাট্যশিক্ষক হিসাবে নির্বাচিত হন কৃষ্ণবিহারী সেন।

জোড়সাঁকো নাট্যশালায় প্রথম অভিনীত হয় মাইকেল মধুসূদন দত্তের লেখা 'কৃষ্ণকুমারী' নাটক। এই নাটকের অভিনয় তারিখ নিয়ে কিছু বিতর্ক থাকলেও শেষ পর্যন্ত ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী তারিখটিকে গ্রহণ করা হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কৃষ্ণকুমারীর মা অহল্যাবাঈ-এর ভূমিকায় অভিনয় করেন। এর পরেই মধুসূদনের আর একটি প্রহসন 'একেই কি বলে সভ্যতা-র অভিনয়ও এখানে অনুষ্ঠিত হয়। তবে এখানকার কর্তাব্যক্তিরা লোকশিক্ষামূলক নাটকের অভাব অনুভব করতে থাকেন। ফলে ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর প্রধান শিক্ষক ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর পরামর্শ নিয়ে সমাজ সমস্যা বিষয়ক নতুন ধরনের নাটক লেখার কথা ভাবেন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৬৫ সালের জুন মাসে 'Indian Daily News' পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সমাজ বিষয়ক উৎকৃষ্ট নাটক আহ্বান করা হয় এবং তার জন্য পুরস্কারও ঘোষণা করা হয়। নাটকের বিষয় ছিল 'বহু-বিবাহ'। রামনারায়ণ তর্করত্ন এই নাটক লেখার সম্মতি দেওয়ায় আগের বিজ্ঞাপন প্রত্যাহার করে নতুন করে দুটো বিষয়ে নাটক লেখার জন্য আবার বিজ্ঞাপন দেন। এবারের বিষয় (১) হিন্দু মহিলাদের দুরবস্থা এবং (২) পল্লীগ্রামের জমিদারদের অত্যাচার।

নাট্যকার রামনারায়ণ তর্করত্ন বহু-বিবাহ বিষয়ে 'নবনাটক' নামে একখানি নাটক রচনা করেন। এজন্য ১৮৬৬ সালের ৬ ই মে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে প্যারীচাঁদ মিত্রের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে রামনারায়ণ তর্করত্নকে একটি রৌপ্যাধারে করে দুইশত টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৮৬৭ সালের ৫ই জানুয়ারী নবনাটকের প্রথম অভিনয় অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। 'The National paper'১৮৬৭সালের ৯ই জানুয়ারী এবং 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা ১৮৬৭ সালের ২৮শে জানুয়ারী

‘নবনাটক’-এর অভিনয় সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে। ফলে অল্প সময়ের ব্যবধানে নবনাটক আরও নয় বার অভিনীত হয়েছিল। নবনাটক অভিনয়ের পর এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় অভিনীত নাটকগুলোতে নানারকম মঞ্চোপকরণ ব্যবহারের পরিচয় পাওয়া যায়। স্টেজ বাঁধা, দক্ষ পটুয়াদের দিয়ে দৃশ্যপট আঁকানো বিবিধ যন্ত্রের ব্যবহার, কনসার্টের ব্যবস্থা ছিল। মঞ্চে বিভিন্ন দৃশ্য প্রায় জীবন্ত ও বাস্তবসম্মত করার চেষ্টা করা হত। আলোকসম্পাতে নৈপুণ্য দেখানো হয়েছে। এই নাট্যমঞ্চ গতানুগতিক ছিল না। দৃশ্যাঙ্কন ও সুরসৃষ্টিতে দেশীয় ভাবধারাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সব মিলিয়ে জোড়াসাঁকো নাট্যশালা আধুনিক থিয়েটারের প্রস্তুতিতে অন্যতম ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

সখের থিয়েটারের বিকাশ পর্ব প্রতিষ্ঠিত আরও একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যশালার নাম পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়। এই রঙ্গালয় প্রকৃতপক্ষে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। কিন্তু তারও আগে যতীন্দ্রমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুরগোষ্ঠীর আদি বাড়িতে থাকা রঙ্গমঞ্চে কালিদাসের ‘মালবিকাগ্নিমিত্র’ নাটকের বাংলা ভাবানুবাদের অভিনয়ের মাধ্যমে ১৮৫৯ সালে এই থিয়েটারের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ১৮৬০ সালের ৭ই জুলাই এই নাটকের দ্বিতীয় এবং শেষ অভিনয় হয়েছিল এই মঞ্চে।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। বেলগাছিয়া নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং পারিবারিক পরিমণ্ডল তাঁকে এ কাজে অগ্রণী করেছিল। ১৮৬৫ সালের ৩০শে ডিসেম্বর যতীন্দ্রমোহন তাঁর নিজের বাড়িতে নিজের লেখা ‘বিদ্যাসুন্দর’ নাটকের অভিনয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই নাট্যালয়ের দ্বারোদ্‌ঘাটন করেন। ভারতচন্দ্রের কাহিনীর অবান্তর ও অশোভন অংশ বর্জন করে এই নাটকের সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। ঘনশ্যাম বসু এই নাট্যশালার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। বিদ্যাসুন্দরের প্রথম অভিনয় সম্পর্কে ‘সোমপ্রকাশ’ পত্রিকা ১৮৬০ সালের ২৩শে জুলাই কিছু বিবরণ দিয়ে থাকে। তা থেকে জানা যায় এখানে দুশোর বেশি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি দর্শক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। অভিনয়ে বাদ্যসঙ্গীত খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল। মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এবং সৌরীন্দ্রমোহন যথাক্রমে বিদূষক ও কুঞ্চকীর ভূমিকায় প্রশংসনীয় অভিনয় করেছিলেন। প্রথম রজনীতে বিদ্যাসুন্দরের পর একই সঙ্গে রামনারায়ণ তর্করত্নের লেখা ‘যেমন কর্ম তেমনি ফল’ প্রহসনটিও অভিনীত হয়েছিল। ১৮৬৬ সালের ৬ই জানুয়ারী বিদ্যাসুন্দর দ্বিতীয়বার অভিনয় হয়। ‘বেঙ্গলী’ পত্রিকার ১৮৬৬, ১৩ই জানুয়ারী সংখ্যা থেকে জানা যায় বিদ্যাসুন্দরের দ্বিতীয় অভিনয়ের সময় সেখানে রেওয়ার মহারাজা উপস্থিত ছিলেন। তিনি অভিনেতাদের অভিনয়ে সন্তুষ্ট হয়ে প্রত্যেককে তিন হাজার করে টাকা এবং একটি করে কাশ্মীরি শাল উপহার দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উচ্চবংশোদ্ভুত অভিনেতারা আত্মমর্যাদার জন্য তা গ্রহণ করতে চাননি। বিদ্যাসুন্দর দ্বিতীয় অভিনয়ের পর স্ত্রী চরিত্রের ভূমিকায় স্ত্রী অভিনেত্রীর

প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। বিদ্যাসুন্দর এবং যেমন কর্ম তেমনি ফল এই নাট্যালয়ে প্রায় দশবার অভিনীত হয়েছিল।

১৮৬৬ সালে 'বুঝলে কি না' প্রহসনটির অভিনয় হয়। এই প্রহসনের দৃশ্যপট, অভিনয় এবং সঙ্গীত পরিচালনা দর্শকদের তৃপ্ত করেছিল। রামনারায়ণ তর্করত্নের অনুদিত 'মালতীমাধব' নাটক ১৯৬৯-এ এখানে অভিনীত হয়। নাটকটি পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গ নাট্যালয়ে দশ-বারো বার অভিনীত হয় বলে জানা যায়। রামনারায়ণ তর্করত্নের অনেকগুলো নাটক ও প্রহসন এই রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়। 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটক, 'চক্ষুদান' ও 'উভয়সংকট' নামক প্রহসন ১৮৭০ সালের প্রথম দিকে অভিনীত হয়েছিল। তারপর একবছর বাদে ১৮৭২ সালের ১৩ই জানুয়ারী রামনারায়ণের 'রুক্মিণীহরণ' ও 'উভয়সংকট' নামক পৌরাণিক নাটক অভিনীত হয়। 'রুক্মিণীহরণ' নাটকটি এই নাট্যালয়ে দশ-এগারো বার অভিনীত হয়েছিল বলে স্বয়ং নাট্যকার অভিমত প্রকাশ করেছেন। ১৮৭৩ সালের পর এই নাট্যশালা কিছুদিনের জন্য বন্ধ থাকে। ১৮৮১ সালে পুনরায় সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের লেখা 'রসাবিষ্কারকবৃন্দ' নামক দৃশ্যকাব্য এখানে অভিনীত হয়।

পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয় দীর্ঘস্থায়ী রঙ্গমঞ্চ। এই মঞ্চে দীর্ঘদিন ধরে নানা ধরনের নাটকের অভিনয় চলেছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা এই নাট্যালয়কে জাতীয় নাট্যালয় আখ্যা দিয়েছিল।

উত্তর কলকাতার শোভাবাজার রাজবাড়িতে 'শোভাবাজার প্রাইভেট থিয়েট্রিক্যাল সোসাইটি' নামে একটি নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৮৪৪ সালে এখানে প্রথম ইংরেজি নাটক অভিনীত হলেও দীর্ঘ কুড়ি বছর আর কোনো নাট্যাভিনয়ের ব্যবস্থা হয়নি। ১৮৬৫ সালের ১৮ই জুলাই মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' অভিনয়ের মাধ্যমে এখানে বাংলা নাট্যাভিনয় শুরু হয়। শোভাবাজর রাজবাড়ির রাজা রাধাকান্ত দেববাহাদুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা দেবীকৃষ্ণ দেববাহাদুরের বাড়িতেই প্রথমবার 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের অভিনয় হয়। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকে জানা যায় ভালো নাটক দেখানোর জন্য কয়েকজন রাজকুমারের বিশেষ উদ্যোগে এই নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা। মধুসূদনের এই প্রহসনটি দ্বিতীয়বার এই নাট্যশালায় অভিনীত হয় ২৯শে জুলাই ১৮৬৫। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় এই নাটকের প্রভুত প্রশংসার বিবরণ পাওয়া যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা থেকেও এই নাটকের অভিনয় সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

জানা যায় কালীপ্রসন্ন সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রমুখ বেশ কিছু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই নাটকের অভিনয় দেখতে এসেছিলেন। এ নাটকে ঊনত্রিশ জন অভিনেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন। নববাবু ও নর্তকীদ্বয়ের অভিনয়ের স্বাভাবিকতা ছিল। রঙ্গভূমিতে নট-নটীর আগমন ও তাদের কণ্ঠের গান সকলের ভালো লেগেছিল। অন্তঃপুরের ললনাদের তাসখেলা, পরিজনদের অনুশোচনা—এসবই ছিল স্বাভাবিক। নাট্যশালার উদ্যোক্তাদের মধ্যে চন্দ্রকালী ঘোষের প্রস্তাবে এই থিয়েটারের সংক্ষিপ্ত নাম হয় 'শোভাবাজর নাট্যশালা'।

১৮৬৭ সালের ৮ই ফ্রেব্রুয়ারী শোভাবাজর নাট্যশালায় মাইকেল মধুসূদন দত্তের ঐতিহাসিক বিয়োগান্তক নাটক 'কৃষ্ণকুমারী' অত্যন্ত আড়ম্বরের সঙ্গে অভিনীত হয়। হিন্দু পেট্রিয়ট পত্রিকা 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয়ের গঠনমূলক আলোচনা করে। এই নাটক সকলকে আনন্দ দান করে। এই নাট্যদলের অভিনেতাদের অভিনয় দক্ষতা ছিল অসাধারণ। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব গিরিশচন্দ্র ঘোষ শোভাবাজার নাট্যশালায় কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় দেখেছিলেন। ১৮৬৭ সালের অভিনয়ের পর এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে গেলেও বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের ইতিহাসে শোভাবাজার নাট্যশালা নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাবার যোগ্য।

৮৯.১১ মূলপাঠ (পঞ্চম অংশ) বাগবাজার-শ্যামবাজার নাট্যসমাজ ও সাধারণ রঙ্গমঞ্চ, গিরিশচন্দ্র, অমৃতলাল প্রভৃতি

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পর থেকে বাংলায় সখের নাট্যশালার উদ্ভব। বাগবাজারের নাট্যশালাটি সখের নাট্যশালার পরিণতি পর্বের উল্লেখযোগ্য নাট্যশালা। এই নাট্যশালা সাধারণ নাট্যশালার জনক। ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে বাগবাজার অঞ্চলের কয়েকজন আগ্রহী যুবক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ধর্মদাস সুর, রাধামাধব কর, মহেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণচন্দ্র হালদার, অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী প্রমুখেরা মিলিত হয়ে একটি যাত্রার দল গঠন করেন। আর্থিক অসঙ্গতির জন্য তাঁর প্রথম মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা'কে বেছে নিয়ে যাত্রা করেন। পরে থিয়েটার করার প্রবল ইচ্ছায় দীনবন্ধু মিত্রের 'সধবার' একদশী' নাটক মঞ্চস্থ করেন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ এর অভিনেতা ছিলেন। বাগবাজারের প্রাণকৃষ্ণ হালদারের বাড়িতে ১৮৬৮সালের দুর্গাপূজার দিনে এই নাটকের প্রথম অভিনয় হয়।

এভাবেই গড়ে ওঠে 'বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার'। বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নাট্যশিক্ষক ছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। 'সধবার একাদশী' এখানে সাতবার অভিনীত হয়। নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অটলের ভূমিকায় নগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়, ঘটিরাম ডেপুটির ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী অভিনয় করেছিলেন। সধবার একাদশীর চতুর্থ অভিনয়ের রাত্রিতে স্বয়ং নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্র উপস্থিত ছিলেন। এখানে নিমচাঁদের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্রের অভিনয় এবং জীবনচন্দ্রের ভূমিকায় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর অভিনয় খুব প্রশংসা পেয়েছিল. স্বয়ং নাট্যকার অর্ধেন্দুশেখরের অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তারদ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাটকের বাস্তবসম্মত পরিবর্তনে সম্মত হয়ে অর্ধেন্দুকে বলেছিলেন 'আমি এবার সধবার একাদশীর নূতন সংস্করণে অটলকে লাথি মারিয়া গমন লিখিয়া দিব।" এই নাটকের শেষ অভিনয় হয়েছিল চোরাবাগানে লক্ষ্মীনারায়ণ দত্তের বাড়িতে দুর্গাপূজার সময়। এই নাটক জনমানসে বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল।

'সধবার একাদশীর শেষ অভিনয়ের দিনে একই সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের 'বিয়ে পাগলা বুড়ো'

প্রহসনখানি অভিনীত হয়েছিল। তারপর প্রায় কিছুদিন এই থিয়েটারে কোনো নাটকের অভিনয় হয় নি। একবছর পর অভিনীত হয় দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী' নাটক। নানা কারণে এই নাটকের অভিনয়ের সময় বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটারের নাম হয় 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। ১৮৭২সালের ১১ই মে শ্যামবাজারে রাজেন্দ্রলাল পালের বহির্বাটিতে অস্থায়ী মঞ্চ নির্মাণ করে 'লীলাবতী' নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। সকলে এই নাটকের অভিনয়ের প্রশংসা করেন। বিশেষ করে ধর্মদাস সুরের দৃশ্যপট অঙ্কন ও মঞ্চ নির্মাণ বিশেষ প্রশংসিত হয়েছিল। এখানকার সুরসৃষ্টিও দর্শকদের মুগ্ধতার কারণ হিসেবে ধরা যায়। পরপর কয়েক শনিবারের অভিনয় সত্ত্বেও দর্শকদের চাহিদা ছিল। আসলে এঁদের অভিনয় ছিল উচ্চাঙ্গের।

১৮৩৩ সাল থেকে প্রায় চার দশক ধরে সখের থিয়েটার পর্ব চলে। এই পর্বে প্রতিষ্ঠিত সৌখিন থিয়েটারগুলি সাধারণত অভিজাত সম্প্রদায়ের ইচ্ছায় গড়ে ওঠে। অল্পবিস্তর স্কুল-কলেজকে আশ্রয় করেও গড়ে ওঠে। উচ্চবিত্তরা ছাড়া সাধারণ মানুষ এই জাতীয় নাটক দেখার সুযোগ পেতেন না। ফলে সাধারণ মানুষের অভিনয় দেখার জন্য সাধারণ রঙ্গালয়ের প্রয়োজন অনুভূত হয়। তাছাড়া ইতিমধ্যে বেশকিছু জনপ্রিয় নাটকের অভিনয়ের প্রচার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে. সাধারণ মানুষ এসবের অভিনয় দেখার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে পড়ে। মঞ্চ চালনা, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে থিয়েটারকে পেশাদারী করাও জরুরী হয়ে পড়েছিল। তার ফলে বাগবাজার অ্যামেচার থিয়েটার-এর উদ্যোক্তাদের চেষ্টায় 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নাম নিয়ে পেশাদারী নাট্যশালা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৮৭২ সালের ৭ই ডিসেম্বর দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে এর সূচনা। বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে এটি একটি গৌরবময় দিন। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সেদিন এই অভিনয়ের সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। ন্যাশনাল থিয়েটারে সাধারণ মানুষ টিকিট কিনে অভিনয় দেখার সুযোগ পায়। এটি বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত, বাঙালি অভিনেতাদের দ্বারা অভিনীত বাংলা নাটকের মঞ্চ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হল।

'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করে। অর্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী, মতিলাল শূর, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু প্রমুখের অভিনয় মনে রাখার মত। 'এডুকেশন গেজেট' এই অভিনয়ের যেমন প্রশংসা করে তেমনি কিছু ত্রুটিও ধরিয়ে দেয়। নীলদর্পণের অভিনয়ের সাত দিন পরে অর্থাৎ ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৭২এই মঞ্চে দীনবন্ধু মিত্রের 'জামাইবারিক' মঞ্চস্থ হয়। এই অভিনয়ে আসন ও আলোর ভালো ব্যবস্থা ছিল। ১৮৭২-এর ২১শে ডিসেম্বর নীলদর্পণের দ্বিতীয় অভিনয়ে অভূতপূর্ব সাফল্য লক্ষ্য করা যায়। ১৮৭২-এর ২১শে ডিসেম্বর 'সধবার একাদশী', ৪ঠা জানুয়ারী ১৮৭৩ 'নবীন তপস্বিনী' এবং ১১ই জানুয়ারী, ১৮৭৩ 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় পরপর তিনটি শনিবারে অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে জানা যায় নাটকগুলোর অভিনয় ভালো হয়েছিল। অভিনয়ের ও দৃশ্যপটগুলির উচ্চ প্রশংসা করা হয়। সঙ্গীতের উন্নতির কথাও এখানে উল্লেখ করা হয়। জানা যায়

দৃশ্য-যবনিকা-র ব্যবহারের কথা। ন্যাশনাল থিয়েটারের সময় থেকেই নাট্যশালায় প্রমটার রাখার ব্যবস্থা হয়।

'লীলাবতী' নাটকের অভিনয়ের পর থেকে 'ন্যাশনাল থিয়েটারে' বুধবারেও অভিনয় শুরু হয়। ১৮৭৩-এর ১৫ই জানুয়ারী দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' ও কয়েকটি প্যান্টোমাইমের অভিনয় হয়। বাংলা রঙ্গমঞ্চে পাশ্চাত্যের অনুকরণে এই প্রথম প্যান্টোমাইম দেখানো হল। এরপর 'কুজ্জার অঘটন', 'নব-বিদ্যালয়', 'মুস্তাফী সাহেবের তামাসা', 'পরীস্থান' প্রভৃতি নাটকের অনুষ্ঠান হয়। কুজ্জার অঘটনের দৃশ্যগুলি খুব সুন্দর ছিল। ১৮৭৩-এর ১৮ই জানুয়ারী 'নবীন তপস্বিনী' দ্বিতীয়বারের অভিনয়ের পর রঙ্গালয়ের সংগঠকদের মধ্যে বিবাদ দেখা দেয়। পরে সালিশী কমিটির প্রচেষ্টায় বিবাদ মিটে যায়। ইতিমধ্যে রামানারায়ণের 'নবনাটক' দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', অমৃতবাজার সম্পাদকের লেখা 'নয়শো রূপয়া', দীনবন্ধুর 'জামাইবারিক' এবং কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা' নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৭৩ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের অভিনয় হয়। ১৮৭৩ সালের ৮ ই মার্চ এখানে শেষ অভিনয় হয়। সম্পাদকের পদ, টাকা-পয়সার গোলমাল এই নাট্যশালা বন্ধ হওয়ার মূলে সক্রিয় ছিল।

তিনমাসের নিয়মিত অভিনয়ের পর টাকা-পয়সার গোলমাল, বর্ষা, সাজ-সরঞ্জামের বাঁটোয়ারা নিয়ে মনোমালিন্যের কারণে ন্যাশনাল থিয়েটারের প্রথম পর্বের পরিসমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় বা মধ্য পর্বে গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখরকে কেন্দ্র করে ন্যাশনাল থিয়েটারের বিভাজন ঘটে। স্টেজ ও সিন্ পাওয়া গিরিশচন্দ্রের দল 'ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে এবং পোষাক-পরিচ্ছদ পাওয়া অর্দ্ধেন্দুশেখরের দল 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' নামে পরিচিত হয়। ন্যাশনাল থিয়েটার প্রথম টাউন হলে দেশীয় হাসপাতালের সাহায্যের জন্য নীলদর্পণ নাটকের অভিনয় করে। গিরিশচন্দ্রের এই দল অভিনয় সাফল্যে প্রশংসিত হয়।

'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' ১৮৭৩ সালের ৫ই এপ্রিল মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' ও কতকগুলি 'প্যান্টোমাইম'-এর অভিনয় করে লিন্ডসে স্ট্রীটে অপেরা-হাউস ভাড়া নিয়ে। তারপর ১২ই এপ্রিল উমেশচন্দ্র মিত্রের 'বিধবা-বিবাহ' নাটক অভিনয় করে। এরপর এই দল ঢাকায় চলে যায়। সেখানে তারা প্রায় একমাস ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে তারা 'নীলদর্পণ', রামানারায়ণের 'নবনাটক', দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী', 'নবীন তপস্বিনী', 'জামাইবারিক', মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় দেখিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। সেখানে অভিনয়ের সময় দলটি নবাব বাড়ির ব্যান্ড ও মোহিনীবাবুর কনসার্ট-এর সাহায্য পায় এবং সেখানকার দর্শকরা খুব আনন্দ পায়। এরপর হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার, ন্যাশনাল থিয়েটারের সঙ্গে মিলিতভাবে বিভিন্ন জায়গায় বেশ কিছু অভিনয় করে। তার মধ্যে মধুসূদনের মৃত্যুতে তার পরিবারকে সাহায্য করার জন্য ১৮৭৩-এর ১৬ই জুলাই 'কৃষ্ণকুমারী'র অভিনয় উল্লেখযোগ্য। এর পরে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' এককভাবে 'মোহান্তের এই কি কাজ' (১৮৭৩, ১৩ই সেপ্টেম্বর), 'যেমন কর্ম তেমনি ফল' নাটকের অভিনয় করে অভিনয় কলাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে।

পাশাপাশি 'ন্যাশনাল থিয়েটার'ও 'নীলদর্পণ' নাটকের অভিনয়ের পর শোভাবাজার রাজবাড়িতে এসে 'কৃষ্ণকুমারী', 'নীলদর্পণ', 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', একেই কি বলে সভ্যতা', রঙ্গনাট্য 'ডিসপেনসারি' এবং 'চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি'-র অভিনয় করে। শোভাবাজার নাটমন্দিরে এই থিয়েটারের শেষ অভিনয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা' ও তার সঙ্গে 'ভারতসঙ্গীত' ১৮৭৩ সালের ১০ই মে। অভিনয় ক্ষেত্রে দুদলই বিশেষ প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল। এভাবেই সাধারণ রঙ্গালয়ের দ্বিতীয় পর্বের সমাপ্তি।

শেষ পর্বে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার', গ্রেট ন্যাশনাল' নাম গ্রহণ করে। 'ন্যাশনাল থিয়েটার' পূর্ব নামেই থেকে যায়। তবে ১৮৭৩-এক ৭ই ডিসেম্বর দুদলই পৃথক পৃথক ভাবে একই দিনে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করে। তারপর কিছুদিন পরে হরলাল রায়ের 'হেমলতা', দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী'-র অভিনয় মঞ্চস্থ হয়। এরপর 'ন্যাশনাল থিয়েটার' 'গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর সঙ্গে মিলে যায়। এইভাবে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসে পেশাদারী থিয়েটারের প্রবর্তন ঘটায়।

বাংলা নাট্যজগতের অন্যতম প্রধান পুরুষ গিরিশচন্দ্র ঘোষ। তিনি একাধারে নট, নাট্যকার, নাট্যচার্য, অভিনয় শিক্ষক ও মঞ্চ পরিচালক। প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাশালী মাত্র ত্রিশ কি বত্রিশটি ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বাংলা নাট্যশালার সেবক হিসেবে উৎসর্গীকৃত প্রাণ তিনি। বাগবাজারের সখের দলে 'সধবার একাদশী'-তে নিমচাঁদের ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গিরিশচন্দ্রের আবির্ভাব। দেশী-বিদেশী দুই অভিনয় ধারার সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এ 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের ভীমসিংহ চরিত্রে অভিনয় করে তিনি খুব প্রশংসা পেয়েছিলেন। তিনি ন্যাশনাল, গ্রেট ন্যাশনাল, স্টার, মিনার্ভা-য় বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক জাতীয় নাটকে অভিনয় করে নিজ প্রতিভার দ্বারা তিনি বাঙালি দর্শকের চিত্ত জয় করেছিলেন। নাট্যালয়ের সঙ্গে গভীর যোগের কারণে তিনি চার/পাঁচটি নাট্যালয় গড়ে তোলেন। জনশিক্ষায় তাঁর নাটক মূল্যবান সম্পদ। রঙ্গালয়ের প্রয়োজনে এবং তার উন্নতির জন্য তিনি নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন। তিনি রঙ্গালয়ের অদ্বিতীয় পুরুষ। অভিনয় মঞ্চ এবং অভিনয় দল গড়ার ক্ষেত্রে তাঁর অসাধারণ আকর্ষণী শক্তি ছিল। যুগের প্রয়োজনে জাতির হৃদয়-ভাবনাকে উপলব্ধি করে নাট্যমঞ্চে নাটকের চরিত্রের মুখে তিনি ভাষা দিয়েছেন। গৈরিশ ছন্দের মধ্য দিয়ে তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। গিরিশচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, তাঁর ব্যক্তিত্ব রঙ্গমঞ্চে দর্শকদের মধ্যে বিস্ময়ের উদ্রেক করত। নিমচাঁদ, ভীমসিংহ, বিদূষক, করিমচাচা, যোগেশ এ জাতীয় বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় নবতর তাৎপর্যে দর্শকদের মনে আলোড়ন তুলত। ট্রাজিক চরিত্রের অভিনয়ে তাঁর প্রতিভা শ্রেষ্ঠত্ব পেয়েছিল। গিরিশচন্দ্রের অভিনয় দাপট বাংলা রঙ্গামঞ্চকে উজ্জীবিত করে তুলেছিল। বাংলা রঙ্গামঞ্চে ১৮৮০ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত তাঁর একচ্ছত্র আধিপত্য ছিল।

অমৃতলাল বসু বাংলা নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও সমৃদ্ধিতে আত্মনিবেদিত প্রাণ। গুরুগম্ভীর ও রঙ্গব্যঙ্গের চরিত্রের অভিনয়ে তিনি কৃতিত্বেরপরিচয় দেন। গিরিশযুগের নট, নাট্যকার ও নাট্যাচার্য হিসেবে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। নাট্যসংগঠক হিসেবেও তাঁর অবদান কম নয়। তাঁর সৃষ্টিকর্ম ও ব্যক্তিত্বে হাস্যরসের ফুলঝুরি। নাট্যশালা ও নাট্যমঞ্চের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় তিনি নিজেকে আন্তরিকভাবে জড়িয়ে নিয়েছিলেন। নাট্যমঞ্চের আলোকসম্পাতে, দৃশ্যসজ্জায়, রূপসজ্জায় ও প্রসাধনে তাঁর তীক্ষ্ম নজর ছিল। বাক্‌চাতুর্যে তিনি সকলকে মোহিত করতে পারতেন। সাহেবী ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করতে পারতেন। হাস্যরসের দিকে তাঁর স্বাভাবিক ঝোঁক থাকলেও উদার প্রসন্নতার জন্য তিনি করুণ ও ভক্তিরসাত্মক ভূমিকায় অভিনয়-পটুত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছিলেন। 'নীলদর্পণ' নাটকে সৈরিন্ধ্রীর ভূমিকায় প্রথম অভিনেত্রী হিসেবে,, 'মৃণালিনী'-তে দিগ্বিজয়ের ভূমিকায় প্রথম কৌতুক অভিনেতা রূপে তাঁর আত্মপ্রকাশ। বিদূষক জাতীয় চরিত্র, টাইপ চরিত্র, রসিক বৃদ্ধের ভূমিকায় তিনি অসাধারণ অভিনয় করতে পারতেন। নিজের লেখা নাটকেও তিনি অভিনয় করেছেন। 'সরলা' নাটকের নীলকমল, 'খাসদখল'-এর নিতাই, 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকের মদনিকা, 'হীরকচূর্ণ'-এ অ্যাডভোকেট জেনারেল, 'সুরেন্দ্রবিনোদিনী'তে ম্যাজিস্ট্রেট মাক্রেন্ডেলের ভূমিকায়, 'চন্দ্রশেখর'-এ লরেন্স, 'প্রফুল্ল' নাটকে রমেশ প্রভৃতি চরিত্রে তিনি অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন। প্রচুর নাটক লিখে, অনেক চরিত্রে অভিনয় করে, নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা ও পরিচালানায় দক্ষতা দেখিয়ে অভিনয় জগতে অমৃতলাল অবিস্মরণীয় নিদর্শন রেখে গেছেন।

৮৯.১২ সারাংশ (মূলপাঠ ৩, ৪, ৫)

সখের থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করার সমকালীন ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে নবীনচন্দ্র বসু শ্যামবাজার থিয়েটার তৈরি করেন। এই থিয়েটারে বাংলা ভাষায় হিন্দুদের দ্বারা বাংলা নাটক অভিনীত হত। 'বিদ্যাসুন্দর'-এর অভিনয় দিয়ে এর উদ্বোধন হয়। এখানে প্রথম নারী অভিনেত্রী নিয়োগ, দৃশ্যপট নির্মাণ, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, আলোকসম্পাত ইত্যাদির মাধ্যমে মনোজ্ঞ অভিনয় ও মঞ্চসজ্জার ব্যবস্থা করা হয়। এই থিয়েটার জনসমাজে উদ্দীপনা সৃষ্টি করলেও বেশিদিন স্থায়ী হয় নি। বিপুল পরিমাণ অর্থব্যয়ে পাইকপাড়ার রাজাদের দ্বারা তৈরি 'বেলগাছিয়া নাট্যশালা' ১৮৫৮ সালে 'রত্নাবলী' নাটকের অভিনয় দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। এর মঞ্চসজ্জা, গীতবাদ্য এবং অভিনয় খুব উচ্চমানের ছিল। বিদ্যাসাগর, মধুসূদন প্রমুখ দেশী-বিদেশী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই নাট্য মঞ্চ সরগরম থাকত। এখানকার ঐকতানবাদন, আলোকসজ্জা প্রশংসনীয় হয়েছিল। এখান থেকে মধুসূদন নাটক লেখার প্রেরণা পান। তাঁর রচিত 'শর্মিষ্ঠা' বেলগাছিয়া নাট্যমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে কয়েকবার অভিনীত হয়। এই নাট্যশালা বাঙালির নাট্যভাবনাকে বেশ কিছুটা অগ্রসর করেছিল।

জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে নাট্যামোদী সদস্যরা জোড়াসাঁকো নাট্যশালা প্রতিষ্ঠা করেন। মধুসূদনের কৃষ্মকুমারী নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে এখানকার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে। তবে লোকশিক্ষা মূলক নাটক লেখার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র নন্দীর পরামর্শে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। রামানারায়ণ তর্করত্নের 'নবনাটক' এই মঞ্চে নানারকম মঞ্চোপকরণের সাহায্যে অভিনীত হয়ে প্রশংসা অর্জন করে ও গতানুকতিকতা ভঙ্গ করে। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়-এর দ্বারোদঘাটন হয় 'মালবিকাগ্নিমিত্র' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। এখানকার বিভিন্ন নাটকে বাদ্যসঙ্গীত খুব আকর্ষণীয় হয়েছিল। রেওয়ার রাজা অভিনেতাদের উপঢৌকন দিতে চাইলেও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন। 'মালতীমাধব' সহ বেশ কিছু নাটক বেশ কয়েকবার সাফল্যের সঙ্গে এখানে অভিন্ীত হয়। কালীপ্রসন্ন সিংহদের প্রচেষ্টায় শোভাবাজার নাট্যশালা 'একেই কি বলে সভ্যতা' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রঙ্গভূমিতে নট ও নটীর আগমন এবং তাদের কণ্ঠের গান ছিল এখানকার আকর্ষণ। সাড়ম্বরে কৃষ্মকুমারীর অভিনয়ের পর এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়।

সখের নাট্যশালার পরিণতি পর্বে গিরিশচন্দ্র গোষ, অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফী এদের প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে 'বাগবাজার অ্যমেচার থিয়েটার'। 'সধবার একাদশী' নাটক সফল অভিনয়ের সংবাদে দীনবন্ধু মিত্র স্বয়ং এই নাটক দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই থিয়েটারের নাম হয় 'শ্যামবাজার নাট্যসমাজ'। এখানকার অভিনয় ছিল উচ্চাঙ্গের। কিন্তু সাধারণ মানুষ নাটক না দেখতে পাবার জন্য তাদের ও মঞ্চের দিকে তাকিয়ে এখান থেকেই গড়ে ওঠে 'ন্যশনাল থিয়েটার'। ১৮৭২ সাল বাংলা নাট্যশালার ইতিহাসে গৌরবময় দিন। নামকরা বাঙালি অভিনেতা, নামকরা বাংলা নাটকের অভিনয় ছিল এই নাটকের প্রাণ। দীনবন্ধু মিত্রের প্রায় সব নাটক এই থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয়। প্রায় একবছর ধরে বেশ কিছু নাটকের অভিনয়ের পর আভ্যন্তরীণ গোলমালে এই নাট্যশালা বন্ধ হয়ে যায়। মূলত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং অর্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তাফীর দ্বন্দ্বে এই বিভাজনে 'ন্যাশনাল থিয়েটার'-এর সঙ্গে 'হিন্দু ন্যাশনাল থিয়েটার' জন্ম নেয়। কোলকাতা এবং কোলকাতার বাইরে এই দুই দল বেশ কিছু নামী নাটকের অভিনয় করে। পরবর্তীকালে এরা একসঙ্গে মিলে যায়। গড়ে ওঠে 'গ্রেট-ন্যাশনাল থিয়েটার'। তবে বাংলা রঙ্গালয়ে 'ন্যাশনাল থিয়েটার' প্রায় একটা ইতিহাস। নট ও নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষ বহু নাটকে অভিনয় করে, প্রশংসা পেয়ে, দর্শকদের উজ্জীবিত করে বাংলা রঙ্গমঞ্চকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। এই যুগে নাট্যশালা ও অভিনয়ের সমৃদ্ধিতে নাট্যসংগঠক হাস্যরসিক অমৃতলাল বসু আন্তরিকভাবে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে নাট্যমঞ্চের ব্যবস্থাপনায় ও অভিনয় দক্ষতায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

৮৯.১৩ অনুশীলনী ৩, ৪, ৫

১। নিচের প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) নবীনচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত থিয়েটারের নাম—
(১) শ্যামবাজার থিয়েটার
(২) বেলগাছিয়া থিয়েটার
(৩) জোড়াসাঁকো নাট্যশালা

(খ) বেলগাছিয়া নাট্যশালা প্রতিষ্ঠিত হয়—
(১) ১৮৩৩ সালে
(২) ১৮৫৮ সালে
(৩) ১৮৫৯ সালে

(গ) রত্নাবলী নাটকের লেখকের নাম—
(১) দীনবন্ধু মিত্র
(২) মধুসূদন দত্ত
(৩) রামনারায়ণ তর্করত্ন

(ঘ) কৃষ্ণকুমারী কি জাতীয় নাটক?
(১) পৌরাণিক
(২) ঐতিহাসিক
(৩) সামাজিক

(ঙ) কোন পত্রিকা পাথুরিয়াঘাটা বঙ্গনাট্যালয়কে জাতীয় নাট্যালয় আখ্যা দেয়?
(১) হিন্দু পেট্রিয়ট
(২) বেঙ্গালী
(৩) সোমপ্রকাশ

২। নিচের বক্তব্যগুলি ঠিক বা ভুল তা নির্দিষ্ট ঘরে টিক্ (✓) চিহ্ন দিয়ে দেখান।

	ঠিক	ভুল
(ক) পাইকপাড়ার রাজার নাম প্রতাপচন্দ্র সিংহ।	☐	☐
(খ) গোপাল উড়ের যাত্রা দেখে জোড়াসাঁকো নাট্যশালার প্রতিষ্ঠা।	☐	☐
(গ) জোড়াসাঁকো নাট্যমঞ্চ গতানুগতিক ছিল।	☐	☐
(ঘ) বঙ্গারঙ্গামঞ্চের জনক গিরিশচন্দ্র ঘোষ।	☐	☐
(ঙ) ন্যাশনাল থিয়েটারের সময় থেকে প্রম্‌টার রাখার ব্যবস্থা হয়।	☐	☐

৩। নিচের শূন্যস্থানগুলিতে যথাযথ শব্দ বসিয়ে পূরণ করুন।

(ক) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের পরামর্শে——প্রতিষ্ঠা।

(খ) মধুসূদনের সহপাঠীর নাম ——।

(গ) রামনারায়ণ বহুবিবাহ বিষয়ে —— লেখেন।

(ঘ) ধর্মদাস সুরের —— অঙ্কন প্রশংসিত হয়েছিল।

(ঙ) —— ভূমিকায় অনবদ্য অভিনয় করতেন অমৃতলাল বসু।

৮৯.১৪ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ :

১। (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ১

২। (ক) ইংরেজ (খ) চৌরঙ্গী (গ) ওথেলো (ঘ) দমদম থিয়েটার

অনুশীলনী ২ :

১। (ক) সঙ্গীতজ্ঞ (খ) খিদিরপুরের (গ) ক্ষতিসাধনের

২। (ক) ৩ (খ) ৩ (গ) ২

অনুশীলনী ৩, ৪, ৫ ঃ

১। (ক) ১ (খ) ২ (গ) ৩ (ঘ) ২ (ঙ) ১

২। (ক) ঠিক (খ) ঠিক (গ) ভুল (ঘ) ঠিক (ঙ) ঠিক

৩। (ক) বেলগাছিয়া নাট্যশালা (খ) গৌরদাস বসাক

(গ) নবনাটক (ঘ) দৃশ্যপট (ঙ) সাহেবী

৮৯.১৫ গ্রন্থপঞ্জি

(১) কোলকাতায় বিদেশী রঙ্গালয় — অমল মিত্র।

(২) বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা — ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

(৩) বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

একক ৯০ ❑ বাংলা নাট্যাভিনয়ের নবযুগ

গঠন

৯০.১ উদ্দেশ্য
৯০.২ প্রস্তাবনা
৯০.৩ মূলপাঠ ১ : নাট্যপরিচালনা ও অভিনয়ে নবযুগের সূচনা ও শিশিরকুমার
৯০.৪ মূলপাঠ ২ : রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চাভিনয় — শান্তিনিকেতন
৯০.৫ সারাংশ (মূলপাঠ ১, ২)
৯০.৬ অনুশীলনী ১ (মূলপাঠ ১, ২)
৯০.৭. মূলপাঠ ৩ গণনাট্য আন্দোলন ও তারপর গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, নান্দীকার
৯০.৮ সারাংশ
৯০.৯ অনুশীলনী ২
৯০.১০ উত্তর-সংকেত
৯০.১১ গ্রন্থপঞ্জি

৯০.১ উদ্দেশ্য

এই একক পড়লে আপনি—

- গণনাট্য আন্দোলন কি তা জানতে পারবেন।
- স্বাধীনতা পূর্ববর্তীকালে দুর্ভিক্ষজনিত সামাজিক প্রেক্ষাপটে 'নবান্ন' নাটকের ভূমিকা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। গণনাট্যের প্রথম নাটক হিসেবে এর অবদান ও গণনাট্যের গুরুত্ব জানতে পারবেন।
- নবনাট্য আন্দোলন বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চের ক্ষেত্রে কি ভূমিকা পালন করেছিল সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চে রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতি যে নতুন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছিল তা জানতে পারবেন।

৯০.২ প্রস্তাবনা

বাংলাদেশে আধুনিক নাট্যকলা ইংরেজি নাটক ও নাট্যমঞ্চের রীতিকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে।

লেবেডফের নাটক বিদেশী রীতিতে প্রস্তুত হলেও বাঙালির নাট্যভাবনা অগ্রসর হয়েছে এই পথে। সখের নাট্যশালার পর পেশাদারী নাট্যমঞ্চ। এই সময় থেকে গিরিশ ঘোষ, শিশিরকুমার ভাদুড়ীরা বাংলার নাট্যচিন্তাকে অনেকদূর অগ্রসর করেছে। মঞ্চ, দৃশ্যপট, সাজসজ্জা, বাদ্যযন্ত্র, আলোকসম্পাত, প্রমট করা ইত্যাদি বিষয় ভাবনা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চকে ধাপে ধাপে উন্নীত করেছে। তারপর নাট্যমহলে ঢুকেছেন রবীন্দ্রনাথ। নাটক পেয়েছে নতুন ধারা। অবশেষে বিংশ শতাব্দীতে নানা ঘটনা ও সমস্যা, ফ্যাসিবাদ, দুর্ভিক্ষ প্রভৃতি মানবজীবনে যে যন্ত্রণা নামিয়ে আনে তার প্রভাব পড়ে নাটকে। যুগযন্ত্রণাকে প্রকাশ করার জন্য শুরু হয় গণনাট্য আন্দোলন। মানুষের জীবন ভাবনা, জীবন দর্শন এসবই নাটকে প্রতিফলিত হয়। উঠে আসে রাজনীতি। শুরু হয় দ্বন্দ্ব। ভাঙে গণনাট্য সংঘ। নতুন জীবন ভাবনার আলোকে গণনাট্য সংঘ ভেঙে বহুরূপী, নান্দীকার, শৌভনিক, গন্ধর্ব প্রভৃতি নাট্যগোষ্ঠী মানুষের কথা বলতে শুরু করে। দেশী-বিদেশী ভালো নাটক উপহার পেতে শুরু করে নাট্যামোদীরা।

৯০.৩ মূলপাঠ ১ : নাট্যপরিচালনা ও অভিনয়ে নবযুগের সূচনা ও শিশিরকুমার

সাধারণ রঙ্গালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রায় ১৯২০ সাল পর্যন্ত সময়কালকে গিরিশ যুগ নামে অভিহিত করা হয়। গিরিশ যুগের পর বাংলা সাধারণ নাট্যশালার দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। এই পর্বের অবিসংবাদিত অভিনেতা-পুরুষ নাট্যাচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর মহনীয় আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে বাংলা রঙ্গালয়ের অভিনয় জগতে এক অবিস্মরণীয় পরিবর্তন আসে। গিরিশচন্দ্রের যুগকে অমৃতলাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল বসু, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মতিলাল সুর প্রমুখ নাট্যব্যক্তিত্বরা বহন করে চলেছিলেন; কিন্তু শিশির ভাদুড়ীর আবির্ভাবের পর এই যুগের অবসান ঘটে এবং বাংলা রঙ্গামঞ্চের জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। শিল্পসম্মত অঙ্গাসঞ্চালন, কণ্ঠস্বরে বৈচিত্র্য, মননশীলতা প্রভৃতির মাধ্যমে তিনি অভিনয়ে নবরীতির প্রবর্তন করেন। তিনি নাটক উপস্থাপনা, অভিনয়, প্রয়োগ সবকিছুতেই নতুন ভাবনা জুড়ে, দিয়ে নাটক ও নাট্যমঞ্চের পূর্ণবিকাশের পথ সুগম করেছিলেন।

শিশিরকুমার ভাদুড়ী বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। তিনি ছিলেন শিল্পী স্রষ্টা, বোদ্ধা এবং সমালোচক। নাট্যমঞ্চে তাঁর প্রথম আবির্ভাব ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকে। আলমগীরের ভূমিকায় তাঁর বিস্ময়কর অভিনয় নাট্যজগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। বাংলা রঙ্গামঞ্চকে জনমানসে সমাদৃত করার ক্ষেত্রে, মঞ্চের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার ক্ষেত্রে, দর্শকদের রুচি উন্নত করার ক্ষেত্রে, সর্বোপরি নাট্যশালায় শৃঙ্খলা আনার ক্ষেত্রে শিশিরকুমারের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা যায়। অভিনেতা হিসেবে তাঁর প্রতিভা ছিল একটা ঐশ্বর্য। তিনি নাটক লেখেননি, কিন্তু নাটক লিখিয়েছেন। তাঁর সুললিত কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি, থিয়েটার সম্পর্কে পাণ্ডিত্য, সহজাত শিল্পপ্রতিভা বাংলা থিয়েটারের সম্পদ হিসেবে গৃহীত।

নাট্যাভিনয় ও নাট্য প্রযোজনার ক্ষেত্রে শিশিরকুমার অভিনবত্ব সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর পরিচালিত নাটকে তিনি প্রধান হলেও অপ্রধানদের প্রস্ফুটিত করার দায়িত্ব ছিল তাঁরই। মঞ্চে সাফল্য, দূরদর্শিতার পরিবর্তে ঝড়ের পাখির মত দুঃসাহসিকতা দেখাতে তাঁর জুড়ি ছিল না। নাটকে বাস্তবানুগ পরিবেশ সৃষ্টি করতে তিনি সচেষ্ট থাকতেন। অভিনয়ের সময় শিশিরকুমারের সত্তার সামগ্রিক ক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পেত। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল প্রশংসা পাবার যোগ্য। আবেগের সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির যোগ ঘটিয়ে দর্শকদের যেমন তিনি আনন্দ দিতেন, তেমনি তাদেরকে উদ্দীপ্ত করে তুলতেন। সচেতন শিল্পী ছিলেন বলেই অভিনয়ের চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে তুলতে পারতেন। রাম, আলমগীর, চাণক্য, জীবানন্দ প্রভৃতি চরিত্রের অভিনয়ে তিনি তা প্রমাণ করিয়েছেন। ‘সীতা’ নাটকে রামের ভূমিকায়, ‘নরনারায়ণে’ কর্ণের ভূমিকায়, ‘পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস’-এ ভীম-এর ভূমিকায় ‘চন্দ্রগুপ্তে’ চাণক্য, ‘আলমগীর’ নাটকে আলমগীরের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় সাফল্য মনে রাখার মত। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের নাটকেও তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি স্টার, রঙমহল, নাট্যনিকেতন, নাট্যমন্দির, শ্রীরঙ্গম প্রভৃতি নাট্যমঞ্চে বহু অভিনয় করে গেছেন। একজন দক্ষ নট হিসেবে নাট্য পরিচালনা, অভিনয় শৈলীতে যে নবরীতির ধারা শিশিরকুমার সৃষ্টি করে গেছেন তা বাংলা নাট্যমঞ্চের অমূল্য সম্পদ।

৯০.৪ মূলপাঠ ২ : রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চাভিনয় — শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাট্যমঞ্চের কথা বলতে গেলে জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতন দুই-এরই কথা মনে আসে। প্রথম প্রতিষ্ঠিত জোড়াসাঁকো নাট্যশালায় ‘কষ্মকুমারী’, ‘নবনাটক’ ইত্যাদি অভিনীত হয় এবং নাট্যশালাটি বন্ধ হয়ে যায়। ঠাকুরবাড়ির মধ্যেই এই নাট্যমঞ্চের অভিনয় সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীকালে এই শৌখিন নাট্যশালায় সাধারণের জন্য কিছু নাটক মঞ্চস্থ হলেও রঙ্গালয়টি বন্ধ হয়ে যায়। পরে এখানে ‘বিদ্বজ্জন সমাগম’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হয়। এখানে গীতিবাদ্য, আবৃত্তি এবং মাঝে মাঝে নাটকের অভিনয় চলত। দ্বারকানাথের সময় থেকেই জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মঞ্চ ও অভিনয়ের প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। ফলে রবীন্দ্রনাথ ও দ্বারকানাথ, দেবেন্দ্রনাথ, নগেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এঁদের কাছ থেকে নাটক ও নাট্যমঞ্চের অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। আবার বড় হয়ে তিনি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত ‘সঙ্গীত-সমাজ’-এ গিয়ে অভিনয় শিক্ষা দিতেন। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ নাটক লেখায়, অভিনয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। ১৮৮১ সাল থেকে ১৯৩৯ সালপর্যন্ত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এবং শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের অনেক নাটকের অভিনয় হয়েছিল।

১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে ‘বিদ্বজ্জন সমাগম’ মঞ্চে দেশী ও বিদেশী সুরের সহযোগে রবীন্দ্রনাথের লেখা ‘বাল্মীকি প্রতিভা’ নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথ বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। স্ত্রী

ভূমিকায় বাড়ির মেয়েরাই অভিনয় করেছিল। মঞ্চে গাছপালা দিয়ে অরণ্যপরিবেশ তৈরি করা হয়েছিল। ঠাকুরবাড়িতে 'কালমৃগয়া', 'মায়ার খেলা', 'রাজা ও রানী', 'গোড়ায় গলদ', 'বিসর্জন' এবং 'বৈকুণ্ঠের খাতা' অভিনীত হয়। এই সমস্ত নাটকগুলিতে রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে অন্ধমুনি, বসন্ত, বিক্রমদেব, গায়ক, রঘুপতি এবং কেদারের ভূমিকায় সফল অভিনয় করেছিলেন। এখানে রোমান্টিক ট্রাজেডি, লঘু কমেডি, গীতিনাট্য জাতীয় বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ছাড়া ঠাকুরবাড়ির আরও অনেকে ঐ সমস্ত নাটকগুলিতে অংশগ্রহণ করে স্ব স্ব যোগ্যতার স্বাক্ষর রেখেছেন। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে রবীন্দ্রনাটকের অভিনয় নাটক ও মঞ্চের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রবীন্দ্রনাটকের মঞ্চাভিনয়কে আমরা দুটি পর্বে ভাগ করতে পারি— (১) জোড়াসাঁকো পর্ব এবং (২) শান্তিনিকেতন পর্ব। জোড়াসাঁকো পর্বে ছিল আবেগ ও রোমান্টিকতা, কিন্তু শান্তিনিকেতন পর্বে অভিনয় এবং তার প্রয়োগ শিল্পের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া হয়। অভিনয়কে নাট্যকার শিক্ষার অঙ্গ মনে করে তাঁর আদর্শকে পরিবর্তন করেন। তাই সেখানকার ছাত্রদের উপযোগী নাটক 'শারদোৎসব', 'ডাকঘর', 'অচলায়তন', 'ফাল্গুনী', 'মুক্তধারা' নাটক রচনা করেছেন। ছাত্রদের জন্য লিখিত বলে অনেক নাটক স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত, খোলা মঞ্চে অভিনয়ের মতো। ১৯০২ সালে এখানে 'বিসর্জন' নাটকের অভিনয় হয়। 'শারদোৎসব' নাটক অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ প্রমটারেরর কাজ করেছিলেন। ১৯০৯ সালে 'মুকুট' ও 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের অভিনয় হয়। শান্তিনিকেতনে অভিনীত 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদার চরিত্রে অভিনয় মনে রাখার মত। ১৯২২-তে অভিনীত হয় 'ডাকঘর' নাটক। একই বছরে 'ফাল্গুনী' ও 'অচলায়তন' নাটকের অভিনয় হয়েছিল। এর পরেও 'গুরু', 'বিসর্জন', 'নটীর পূজা' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় হয়েছে। নাটকগুলোর অভিনয়ে যেমন রবীন্দ্রনাথ থাকতেন তেমনি ক্ষিতিমোহন সেন, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শরৎকুমার রায়, জগদানন্দ রায়, কালিদাস বসু সহ ঠাকুর পরিবারের অনেকেই অভিনয়ে অংশগ্রহণ করতেন।

নাট্যাভিনয়ে রবীন্দ্রনাথ নতুন আঙ্গিকের উদ্ভাবন করেন। মঞ্চে সাজপোশাক, মঞ্চোপকরণ প্রভৃতি যেমন তিনি ব্যবহার করতেন তেমনি ছাত্র তথা সাধারণের জন্যও নাটকের পটভূমি নির্মাণে স্বাভাবিকতা রাখার চেষ্টা করতেন। নাট্যধর্মী প্রয়োগরীতিতে তাঁর নাটক মঞ্চ সফল। বাংলা রঙ্গমঞ্চে প্রচলিত পাশ্চাত্য আদর্শকে রবীন্দ্রনাথ মানতে চাননি। এমন কি দৃশ্যপট, আলো, সাজসজ্জা প্রভৃতি থেকে তিনি অভিনয়কে মুক্ত রাখার কথা বলেছেন। শান্তিনিকেতন নাটক লিখতে গিয়ে অভিনয় সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে একটা নতুন ধারার প্রবর্তন ঘটেছে। শান্তিনিকেতন পর্বে সাঙ্কেতিক নাটকগুলিতে তিনি গানের সাহায্যে অসাধারণ ভাব ব্যঞ্জনা প্রকাশ করেছেন। ফলত রবীন্দ্রনাটক এবং নাটকের মঞ্চাভিনয় বাংলা রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

৯০.৫ সারাংশ (মূলপাঠ ১, ২)

গিরিশ যুগের পর বাংলা সাধারণ নাট্যশালার অবিসংবাদিত অভিনেতা শিশিরকুমার ভাদুড়ী। তাঁর আবির্ভাবের পর বাংলা রঙ্গামঞ্চের জগতে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। তিনি অভিনয়ে নবরীতির প্রবর্তন করেন। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'আলমগীর' নাটকে আলমগীরের ভূমিকায় আলোড়ন সৃষ্টি করা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে নাট্যমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব। নাট্যশালার শৃঙ্খলা আনা, দর্শক রুচির প্রতি নজর রাখা, নাটকে বাস্তবানুগ পরিবেশ সৃষ্টি করায় তিনি দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। বিভিন্ন নাট্যমঞ্চে বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে দক্ষতার সঙ্গো অভিনয় করে একজন সচেতন শিল্পী হিসেবে তিনি মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর, বাচনভঙ্গি, থিয়েটার সম্পর্কে পাণ্ডিত্য, অভিনয় শৈলীতে নবধারার প্রবর্তন বাংলা নাট্যমঞ্চের অমূল্য সম্পদ।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকে কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মঞ্চ ও অভিনয়ের প্রতি একটা বিশেষ অনুরাগ ছিল। নানা সময়ে ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন নাট্যামোদী সদস্যদের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়ে রবীন্দ্রনাথও নাটক লেখায় এবং অভিনয় করায় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভা নাটকটি ১৮৮১ সালে প্রথম অভিনীত হয়। রবীন্দ্রনাথও অভিনয় করেন। রবীন্দ্রনাথের নাটক জোড়াসাঁকো ও শান্তিনিকেতন দু'জায়গাতে অভিনীত হয়। দুই জায়গার অধিকাংশ নাটকে অন্যান্য চরিত্রাভিনেতার সঙ্গো রবীন্দ্রনাথ নিজেও অভিনয় করতেন। তাঁর 'কালমৃগয়া', 'রাজা ও রানী', 'গোড়ায় গলদ', বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'শারদোৎসব' প্রভৃতি নাটকের অভিনয় স্মরণযোগ্য। 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথের ঠাকুরদার চরিত্রে অভিনয় মনে রাখার মত। শান্তিনিকেতন পর্বে সাঙ্কেতিক নাটকে গানের ব্যঞ্জনায় বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নাটক ও নাটকের মঞ্চাভিনয় বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। নাট্যধর্মী প্রয়োগরীতিতে তিনি মঞ্চসফল।

৯০.৬ অনুশীলনী ১ (মূলপাঠ ১, ২)

১। নিচে কয়েকজন রচয়িতা ও গ্রন্থের নাম দেওয়া আছে। আপনি সেগুলিকে দুই স্তম্ভে উপযুক্ত স্থানে লিখুন।

গ্রন্থ	রচয়িতা
(ক) আলমগীর	(ক) মধুসূদন দত্ত
(খ) কৃষ্মকুমারী	(খ) ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ
(গ) নব নাটক	(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(ঘ) বৈকুণ্ঠের খাতা　　　　　　　　(ঘ) দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

(ঙ) সীতা　　　　　　　　　　　　(ঙ) রামনারায়ণ তর্করত্ন

গ্রন্থ	রচয়িতা
(ক)	
(খ)	
(গ)	
(ঘ)	
(ঙ)	

২। শূন্যস্থানগুলিতে যথাযথ শব্দ বসিয়ে বাক্য সম্পূর্ণ করুন।

(ক) গিরিশ যুগের পর ——— দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত।

(খ) শিশিরকুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবে বাংলা রঙ্গমঞ্চের ——— সূচনা।

(গ) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতিষ্ঠিত নাট্যসমাজের নাম ———।

(ঘ) 'রাজা' নাটকে রবীন্দ্রনাথ ——— চরিত্রে অভিনয় করেন।

৯০.৭ মূলপাঠ ৩ : গণনাট্য আন্দোলন ও তারপর ভারতীয় গণনাট্য সংঘ, বহুরূপী, এল.টি.টি, নান্দীকার

ভারতীয় গণনাট্য সংঘ :

ইতিহাসের সুনির্দিষ্ট ধারা বেয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা। নতুন চিন্তা, নতুন অভিনয় ধারা, নতুন মঞ্চসজ্জার মধ্য দিয়ে গণনাট্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সৌখিন আর পেশাদার এই দুই রীতিকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গণনাট্য সংঘ এক নতুন যুগের সূত্রপাত করেছে। আনুষ্ঠানিকভাবে গণনাট্য সংঘের জন্ম ১৯৪৩ সালে। ১৯৪৩-এর মে মাসে বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন' এবং বিনয় ঘোষের 'ল্যাবরেটরী' এঁরা প্রথম মঞ্চস্থ করেন। পরে বিজন ভট্টাচার্যের 'জবানবন্দী' ও মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের 'হোমিওপ্যাথি' অভিনীত হয়। ১৯৪৪ সালের ২৪শে অক্টোবর বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় দিয়ে ভারতীয় গণনাট্য সংঘের জয়যাত্রা শুরু।

ভারতীয় গণনাট্য সংঘের প্রতিষ্ঠা হয় 'ফ্যাসি বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ' (১৯৪২)-এর নাট্যবিভাগ রূপে। ১৯৪২ সালে ঢাকায় তরুণ লেখক সোমেন চন্দের হত্যাকে কেন্দ্র করে এই সংঘের আবির্ভাব। গণনাট্য সংঘের জন্মের আগে থেকেই বিভিন্ন বামপন্থী ছাত্র সংগঠন, ইয়ূথ কালচারাল

ইনসটিটিউট, ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ গঠনের প্রস্তুতি শুরু করে। মহাযুদ্ধকালীন ঘটনা, দেশব্যাপী মন্বন্তরের বিভীষিকার প্রতিক্রিয়ারূপে গড়ে ওঠে গণনাট্য আন্দোলন। ভারতীয় গণনাট্য সংঘ গণনাট্য আন্দোলনকে রাজনৈতিক চেতনা দিয়েছে। গড়ে তুলেছে সমসাময়িক জীবন সম্পর্কে চেতনাবোধ। কৃষকের সঙ্গো জমিদারের সংঘাত, শ্রমিকের সঙ্গো মালিকের সংঘাত, সাধারণ চেতনাবোধ নিয়ে সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীতে নাটক লেখার কাজ শুরু হয়। তৃপ্তি মিত্র, শোভা সেন, সুধি প্রধান, গঙ্গাপদ বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত প্রমুখেরা ছাড়াও গ্রাম-শহরের বহু শিল্পী এসে জড়ো হয় এর আকর্ষণে। গান, নাটক, ছাড়া, প্রবন্ধ, নৃত্য ইত্যাদি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি পৌঁছানোর চেষ্টা চলে। ঝড়, প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খাদ্য সংকট, দুর্ভিক্ষ, জাপানী আক্রমণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টির সাংস্কৃতিক ফ্রন্ট ভারতীয় গণনাট্য সংঘ বিভিন্ন নাটক অভিনয় করতে শুরু করে। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, অর্থনৈতিক বিপর্যয় থেকে আগামী প্রজন্মকে আশাবাদে উৎসাহিত করে সমাজজীবনে এক অদ্ভুত পরিবর্তন আনে গণনাট্য আন্দোলন। এই সময়ের নাটকে বক্তব্য ছিল নতুন, বাস্তব এবং নির্ভীক। মঞ্চে দৃশ্যপটেরপরিবর্তে প্রতীকধর্মিতা, বক্তব্যের বলিষ্ঠতা, কর্মীদের আন্তরিকতায় নতুনভাবে সমকালীন নানা সমস্যা শিল্পরূপ পায়। সংলাপ জীবনমুখী করা, আলো ও ধ্বনি দিয়ে মূলভাব ফোটানোর চেষ্টা, মতাদর্শের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির দ্বারা নাটকের গুরুত্ব বাড়ানোর চেষ্টা হয়।

বহুরূপী — শম্ভু মিত্র :

কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য প্রাধান্য পাওয়ায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের ভাঙন শুরু হয়। ভারতীয় গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে শম্ভু মিত্র ১৯৪৮ সালে 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী তৈরি করেন। এর সঙ্গো যুক্ত ছিলেন গঙ্গাপদ বসু, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, অমর গঙ্গোপাধ্যায়, রবীন মজুমদার, সবিতাব্রত দত্ত, গীতা দত্ত, কুমার রায় প্রভৃতি। এ সময় নাটকে আবার নতুন ধারার সূচনা হল। শম্ভু মিত্র জনমুখী চেতনার পরিবর্তে সাহিত্যমুখী চেতনার ওপর গুরুত্ব দিলেন। সম্পূর্ণ বামপন্থী চেতনা নয়, মতাদর্শের ভিত্তিতে নাটক নয়; বরং নাটকে সাহিত্য, ইমোশন, মঞ্চ ইত্যাদির ওপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হল। শম্ভু মিত্রের এই ধারাকে বলা হয় 'নবনাট্য' আন্দোলনের ধারা। 'বহুরূপী' প্রায় পঁচিশ বছর তার অসামান্য প্রভাব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থার নাট্য প্রযোজনা এবং অভিনয় আনে একটা ঐতিহ্য। ১৯৪৮ থেকে শুরু করে 'নবান্ন', 'পথিক', 'উলুখাগড়া', 'ছেঁড়াতার' তারা সাফল্যের সঙ্গো মঞ্চস্থ করেছে। পাশাপাশি 'রক্তকরবী', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা' অভিনয় করে নবনাট্যগোষ্ঠী দেখিয়ে দিয়েছে রবীন্দ্রনাথকে মানুষের মধ্যে আনা যায়। বহুরূপী প্রযোজিত 'রক্তকরবী' নাট্য আন্দোলনে এক নতুন ধারার বিবর্তন ঘটালো। অন্যদিকে 'বহুরূপী'র তৃতীয় পর্বে বিশ্বের সাহিত্য ও সমাজকে তুলে ধরার চেষ্টা হয়। নাট্য আন্দোলনকে আরও ব্যাপক করার আগ্রহে সৎ নাট্যের প্রতি উৎসাহ বেড়ে ওঠে। সফোক্লিস-এর 'রাজা

অয়দিপাউস', ইবসেনের 'ডলস হাউস' জাতীয় প্রাচীন ক্লাসিকস্-এর প্রযোজনা শুরু হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তের নাটকও এখানে মঞ্চস্থ হয়। তার মধ্যে বিজয় তেন্ডুলকারের 'চোপ আদালত চলছে' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 'বহুরূপী'র পাশাপাশি 'শৌভনিক' 'গন্ধর্ব', 'থিয়েটার ইউনিট'ও বেশ কিছু নাটক মঞ্চস্থ করেছেন।

উৎপল দত্ত : লিটল থিয়েটার গ্রুপ (এল.টি.জি) ও প্রগ্রেসিভ লিটল থিয়েটার (পি.এল.টি) :

ব্যবসায়িক মঞ্চে গিরিশচন্দ্র-অর্দ্ধেন্দুশেখর থেকে শিশির ভাদুড়ীর কাল পর্যন্ত অর্থাৎ চারের দশকের সূচনা পর্যন্ত ছিল পেশাদারী অভিনয়ের যুগ। কিন্তু চল্লিশের দশকের সামাজিক, আর্থ-রাজনৈতিক জটিলতার মধ্য দিয়ে 'ভারতীয় গণনাট্য সংঘ'-এর (সংক্ষেপে ভাগনাস) নেতৃত্বে কিছু সমাজ-রাজনীতি সচেতন থিয়েটারের সূচনা হল 'নবান্ন' নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। একদিন থিয়েটারকে একটা নেশা ভাবা হলেও পেশাদারদের কাছে ছিল সেটা পেটের দায়, সৌখিন অভিনেতাদের কাছে আনন্দ-স্ফূর্তির বিষয়, আর এই নতুন থিয়েটারে এ হল একেবারে অন্তরের টান, যার পেছনে সক্রিয় ছিল আদর্শের ভিত্তি। উৎপল দত্ত শেষোক্ত থিয়েটারের ফসল।

ব্রিটিশ থিয়েটারের ঘরানায় উৎপল দত্তের অভিনয়-পরিচালনা-প্রযোজনা জীবনের সূচনা। সেক্সপীয়রীয় নাটকের অভিনেতা জেফ্রি কেন্ডালের শিক্ষা ও সেক্সপীয়র প্রেম তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক নান্দনিক চেতনাকে তৈরি করেছে। জুন, ১৯৪৮-এ লিটল থিয়েটার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করে তিনি কয়েকটি ইংরেজি নাটক—ওথেলো, মিডসামার নাইটস্ ড্রিম, রোমিও জুলিয়েট, ম্যাকবেথ প্রভৃতি অভিনয়ের মধ্য দিয়ে পথ চলা শুরু করেছিলেন। পরে বেশ কয়েকটি বাংলা—বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ, অলীকবাবু, তপতী প্রভৃতি ইংরেজি নাটকের বাংলা অনুবাদ—ম্যাকবেথ, নীচের মহল প্রভৃতি প্রযোজনা করেন। ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ -তে পরপর দুটি নাট্যোৎসব শেষে ২৭শে জুলাই, ১৯৫৩-এ তিনি মিনার্ভা থিয়েটার 'লিজ' নিয়ে অঙ্গার, ফেরারি, ফৌজ, কল্লোল, তিতাস একটি নদীর নাম, লেনিনের ডাক প্রভৃতি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রযোজনার মাধ্যমে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। অবশেষে 'তীর' (১৯৬৯) নাটক অভিনয়ের পর তিনি বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। ফলে, এল.টি.জি. ভেঙে যায়। উৎপল দত্ত শেষ পর্যন্ত নিজের ভুল বুঝে নতুন নাট্যদল গঠন করেন, নাম দেন প্রগ্রেসিভ লিটল থিয়েটার (পি.এল.টি)। পি.এল.টি-র প্রযোজনায় 'টিনের তলোয়ার' (আগস্ট ১৯৭১), ব্যারিকেড ১৯৭২), দুঃস্বপ্নের নগরী (১৯৭৪), তিতুমির (১৯৭৮) প্রভৃতি স্মরণীয় হয়ে আছে। পরিচালক-অভিনেতা-প্রযোজক উৎপল দত্ত থিয়েটারকে একটি শিল্পকর্ম হিসেবে গণ্য করতেন বলেই তাঁর প্রতিটি প্রযোজনায় অভিনেতার অভিনয়-গৌরব অত্যধিক গুরুত্ব পেলেও, তিনি দৃশ্যসজ্জা, সঙ্গীত, আলোক, পোশাক, রূপসজ্জাতেও সমান গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন।

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় : নান্দীকার, নান্দীমুখ :

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় গণনাট্য থেকে বেরিয়ে এসে, কলেজের নাট্যপ্রেমী কয়েকজন বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে স্বতন্ত্র নাট্যদল গড়েন। (২৯শে জুন, ১৯৬০)। এতে ছিলেন, অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়, চিন্ময় রায়, দীপেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অজয় গঙ্গোপাধ্যায়। পরে যোগ দেন, ঝরনা চট্টোপাধ্যায়, মায়া ঘোষ, অশোক মুখোপাধ্যায়, দীপালি চক্রবর্তী, বিভাস চক্রবর্তী। ১৯৬৩-তে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত এবং আরও অনেকে। এঁরাও 'বহুরূপী'র মতো খোলা দৃষ্টিভঙ্গির যুক্তি অনেকাংশে গ্রহণ করেছিলেন। নাটক নির্বাচনে আরও একটু স্বাধীনতা প্রত্যাশা নিয়ে পৃথিবীর নাট্যসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলিকে নিজেদের স্বাধীন জ্ঞানবুদ্ধি মতো নির্বাচন ও পরিবেশন করবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করতেন। অজিতেশের নেতৃত্বে যে সমস্ত নাটক নির্বাচিত হত সেখানে প্রাধান্য পেত নাটকের বক্তব্য ও নাট্যরূপের চমৎকারিত্ব। 'নান্দীকার' অভিনীত নাটকের প্রতি লক্ষ্য রাখলেই তার বিষয়, উপস্থাপনা ও গঠনবৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রসঙ্গত, অজিতেশ পরিচালিত ও অভিনীত পিরানদেল্লোর নাটক অনুসরণে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র' নিয়ে কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। এ ক্ষেত্রে স্মরণীয় একজন বড়োমাপের নাট্যকার, অভিনেতা অভিনেত্রী ও অন্যান্য নাট্যকর্মীর সমাবেশ ঘটে। এঁদের কেউ কেউ সংগত কারণে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হতে বাধা নেই, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি ব্যক্তিত্বের সংঘাত। অজিতেশের ব্যক্তিত্ব, দলের ওপর তার সাংগঠনিক নিয়ন্ত্রণের ফল দলে কিছু জটিলতা তৈরি হয়। ফলে সংহতির সমস্যা দেখা দেয়। এরই পরিণতিতে দেখা যায়, ফ্যাসিস্ট মুসোলিনার সঙ্গে পিরানদেল্লোর ঘনিষ্ঠতা প্রসঙ্গ তুলে নান্দীকার প্রযোজিত ও অজিতেশ অভিনীত নাটক নিয়ে বিতর্ক ও বিরোধ সৃষ্টি হয়। অজিতের এর দায় গ্রহণ করে নান্দীকার ছেড়ে 'নান্দীমুখ' (১৯৭৭) তৈরী করেন। রুদ্রপ্রসাদ নান্দীকার পরিচালনার দায়িত্ব নেন। 'নান্দীমুখ'-এ অজিতেশ অভিনীত পরিচালিত নাটক 'নানারঙের দিন', 'সওদাগরের নৌকা', 'শর আফগান' ও 'পাপপূণ্য' প্রভৃতি।

৯০.৮ সারাংশ

নতুন চিন্তাধারা নিয়ে বাংলা নাট্যজগতে গণনাট্য সংঘের আবির্ভাব। শৌখিন এবং পেশাদারী এই রীতিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে গণনাট্য সংঘ গণনাট্য আন্দোলনের রূপ নেয়। দেশব্যাপী ফ্যাসিবাদ, দুর্ভিক্ষ নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে সমকালীন ঘটনার প্রতিক্রিয়াকে মাথায় রেখে নতুন যুগের সূত্রপাত করে এই নাট্য সংস্থা। বিজন ভট্টাচার্যের 'আগুন', 'নবান্ন' এই জাতীয় আর কিছু নাটকের অভিনয়ের মধ্য দিয়ে গণনাট্য সংঘ গণ আন্দোলনকে রাজনৈতিক রূপ দেয়। সমসাময়িক জীবনভাবনাকে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে নিয়ে আসে। শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত প্রমুখদের চেষ্টায় বিভিন্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে, সামাজিক মূল্যবোধের স্বপক্ষে সমকালীন নানা সমস্যা শিল্পরূপ পায়। কিন্তু রাজনৈতিক বক্তব্য প্রাধান্য পাওয়ায়

জনমুখী চেতনার পরিবর্তে সাহিত্যমুখী চেতনাকে গুরুত্ব দিয়ে শম্ভু মিত্ররা গণনাট্য ভেঙে গড়ে তোলেন 'বহুরূপী' নাট্যগোষ্ঠী। শুরু হয় নবনাট্য আন্দোলন। গুরুত্ব পায় রবীন্দ্রনাথ। গড়ে ওঠে সৎ নাট্য প্রচেষ্টা।

এল.টি.জি/পি.এল.টি 'বহুরূপী' থেকে স্বতন্ত্র পথে হেঁটেছে। দেশি-বিদেশি ক্লাসিক নাটক অভিনয় দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও, সবসময়ই এই গোষ্ঠীর নাট্যভাবনায় সমাজ-রাজনীতি ও নন্দন-তত্ত্বের বিষয়টি সদাজাগ্রত থেকেছে। উৎপল দত্তের বহুমুখী জ্ঞান, বিচিত্র অভিজ্ঞতা ও ব্যক্তিত্ব তাঁর নাট্যপ্রযোজনায় সামগ্রিকতা এনেছে। যে নাটকে যে বক্তব্য উপস্থাপিত করেন, প্রযোজনার গুণে তা দর্শকের অন্তঃস্থলকে নাড়া দেয়। ধ্রুপদী নাটক থেকে তাঁর রচিত নাটকগুলির প্রযোজনা সে স্বাক্ষর বহন করছে।

এর পরে সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে ভাল এবং বিদেশী নাটকের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে 'নান্দীকার' ও 'নান্দীমুখ'। এইভাবে নাট্য আন্দোলন নতুন মাত্রা পায়।

৯০.৯ অনুশীলনী ২

১। নিচের শূন্যস্থানগুলি যথার্থ শব্দযোগে পূরণ করুন।

(ক) ঢাকায় তরুণ লেখক —— হত্যা করা হয়।

(খ) বহুরূপী প্রায় —— বছর তার প্রভাব বজায় রেখেছিল।

(গ) নান্দীকার গোষ্ঠী —— গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকত না।

২। নীচের প্রশ্নগুলির সঠিক উত্তরের পাশে টিক্ (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) গণনাট্য সংঘের আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়—
(১) ১৯৪২ সালে
(২) ১৯৪৩ সালে
(৩) ১৯৪৪ সালে

(খ) 'জবানবন্দী' নাটকের লেখক—
(১) বিজন ভট্টাচার্য
(২) বিনয় ঘোষ
(৩) মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য

(গ) কার নেতৃত্বে 'বহুরূপী' গড়ে ওঠে?
(১) সুধী প্রধান
(২) উৎপল দত্ত
(৩) শম্ভু মিত্র

(ঙ) 'চোপ আদালত চলছে' কার লেখা? (১) ইবসেন
(২) বিজয় তেন্ডুলকার
(৩) সফোক্লিস

৩। উৎপল দত্ত পরিচালিত নাট্যসংস্থা এল.টি.জি ও পি.এল.টি.-র অবদান সংক্ষেপে লিখুন।

৪। অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নান্দীকার' ছেড়ে 'নান্দীমুখ' গড়লেন কেন? 'নান্দীমুখ' প্রগ্রেসিভ দুটি নাটকের নাম উল্লেখ করুন।

৯০.১০ উত্তর-সংকেত

অনুশীলনী ১ :

১। (ক) খ (খ) ক (গ) ঙ (ঘ) গ (ঙ) ঘ

২। (ক) সাধারণ নাট্যশালার (খ) নতুন যুগের

(গ) সঙ্গীত সমাজ (ঘ) ঠাকুরদার

অনুশীলনী ২ :

১। (ক) সোমেন চন্দ (খ) পঁচিশ (গ) সংকীর্ণ

২। (ক) ২ (খ) ১ (গ) ৩ (ঘ) ২

৩। ও ৪। এর জন্য ১০৭-এর এল.টি.জি, পি.এল.টি, নান্দীকার, নান্দীমুখ প্রসঙ্গ একটু ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৯০.১১ গ্রন্থপঞ্জি

১। বাংলা নাট্যাভিনয়ের ইতিহাস — ড. অজিত কুমার ঘোষ।

২। বাংলা নাট্যমঞ্চের রূপরেখা — ড. দুর্গাশঙ্কর মুখোপাধ্যায়।

৩। বিশ্বরঙ্গালয় ও নাটক — ড. গীতা সেনগুপ্ত।

৪। রঙ্গামঞ্চ ও রবীন্দ্রনাথ — সমকালীন প্রতিক্রিয়া — রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী।

৫। বিলাতি যাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার — সম্পাদনা : সুবীর রায়চৌধুরী।

৬। প্রসংগ : গণনাট্য — শক্তিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ই. বি. জি — ৬
বাংলা বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম

পর্যায়
২৪

একক ৯১ ❑ কাব্য ঃ গীতিকাব্য, আখ্যানকাব্য, মহাকাব্য

গঠন

৯১.১ উদ্দেশ্য
৯১.২ প্রস্তাবনা
৯১.৩ কবিতার সংজ্ঞা; কবির প্রসঙ্গ
৯১.৪ কবিতার শ্রেণিবিভাগ ঃ মন্ময় ও তন্ময় কবিতা
৯১.৫ অনুশীলনী
৯১.৬ মন্ময় কবিতার পরিচয় ঃ গীতিকবিতা
৯১.৭ গীতিকবিতার শ্রেণিবিভাগ ঃ ভাবকেন্দ্রিক, রূপকেন্দ্রিক
৯১.৮ ভাবকেন্দ্রিক গীতিকবিতা
৯১.৯ রূপকেন্দ্রিক গীতিকবিতা
৯১.১০ অনুশীলনী
৯১.১১ তন্ময় কবিতার শ্রেণিবিভাগ
৯১.১২ আখ্যানকাব্য ঃ সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ; উদাহরণ
৯১.১৩ অনুশীলনী
৯১.১৪ মহাকাব্য ; সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ ; উদাহরণ
৯১.১৫ সারাংশ
৯১.১৬ অনুশীলনী
৯১.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

৯১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি সাধারণভাবে কবিতা, কবিতার নানা ভাব-কল্পনা এবং রূপ-প্রকরণ সম্পর্কে পরিচিত হতে পারবেন। এক দেশের কবিতা কিংবা এক রূপ-প্রকরণের কবিতা কিভাবে অন্য দেশের কবির কাছে গৃহীত-অনুসৃত-পরিবর্তিত হয়, সে বিষয়েও অবহিত হতে পারবেন।

৯১.২ প্রস্তাবনা

কবিতা বিশ্বব্যাপী মানবিক অনুভূতির চিরস্থায়ী প্রকাশ। সব শ্রেণির মানুষের মনের মধ্যেই কিছু না কিছু কবিতার প্রভাব থাকেই। এক-এক দেশের মানুষ এক-এক ভাবনা-ভঙ্গির মাধ্যমে সেটি প্রকাশ করে। এর মধ্যে কখনো প্রাধান্য পায় Object বা বিষয়, কখনো প্রাধান্য পায় Subject বা বিষয়ী অর্থাৎ ব্যক্তি। দেখা গেছে, একই দেশের এক-এক যুগে কবিতার একটি বিশেষ মূর্তি ধরা পড়ে,— কি ভাব বা বক্তব্যের দিক থেকে, কি রূপ-প্রকরণের দিক থেকে। কখনো দেখা দেয় কোনো আন্দোলনকে ভিত্তি করে কবিতা কোনো নতুনতর মূর্তি। এক দেশের সেই ভাবনা-প্রকরণের ঢেউ অন্য দেশের কবিকে স্পর্শ করে, সে দেশেও সে আন্দোলন প্রসারিত হয়। কখনো বা কোনো দেশের কোনো কবি স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কিংবা নিজের প্রতিভার বিশেষত্ব অনুসারে কোনো নতুন ধারার প্রবর্তন করেন, অন্য দেশের কবি অবিকৃতভাবে সে ধারাকে গ্রহণ করেন কিংবা দেশ-কাল-কবির ভিন্নতার কারণে সে ধারার ঈষৎ পরিবর্তন-বিবর্তনও ঘটে। এই ভাবেই কবিতা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি হয়। পদ্যে বা গদ্যে, সমিল ও অমিল ছন্দে, কখনো বা নাটকের আভাসেও কবিতা রচিত হয়ে থাকে। কখনো বা হয় কবিতার ব্যঙ্গানুকৃতি। কখনো আকারে ছোট, কখনো বা বড়, কখনো বা কবিতার মাধ্যমে বলা হয় কথা-কাহিনী-গল্প। সেগুলি গাওয়াও হতে পারে। তবে, কবিতা সাধারণভাবে পড়াই হয়ে থাকে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে দীর্ঘাকার কবিতা সুদক্ষ কোনো পাঠক পড়তেন, অন্য সবাই তা শুনত। হ্রস্বাকার কবিতা এককভাবে নিজেই পড়া হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের করি ও কাব্য-সমালোচকগণ কবিতার রূপ ও স্বরূপ সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এর ফলে 'কাব্যশাস্ত্র' নামে একটি বিশিষ্ট শাস্ত্রই গড়ে উঠেছে। প্রাচীন গ্রিস এবং প্রাচীন ভারতের নাম এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য।

কবিতার এই বিচিত্র কথাই এই এককটির আলোচ্য।

৯১.৩ কবিতার সংজ্ঞা; কবির প্রসঙ্গ

কবি, রসিক, পণ্ডিতেরা নানাভাবে নিজের-নিজের দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। সেইসব সংজ্ঞার মধ্যে কোথাও আছে পরস্পরের সঙ্গে বিরোধ, আবার কোথাও বা সেই বিরোধকে অতিক্রম করে তাদের মধ্যে সামঞ্জস্যও সৃষ্টি করা যায়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের, প্রাচীন ও আধুনিকের প্রয়োজন ও মনোভাবের ভিন্নতা এখানে বিশেষভাবে কাজ করেছে।

এই সব বিরুদ্ধ চিন্তা-চেতনাকে সমন্বিত করে নিয়ে বলা যায় ঃ কবিতা হল—কবির সহৃদয় ও সত্য অনুভূতি, তাঁর ভাবনা-কল্পনা এবং উপযুক্ত শব্দ-ছন্দ-উপমা-চিত্রকল্পের সম্মিলিত দিক। এই তিনটি দিকেরই

গুরুত্ব ও মর্যাদা সমান, তবে কোনো কোনো কবি এই সমন্বয় কর্মটি সর্বদা সার্থক রূপে করতে পারেন না বলেই সেখানে এসে পড়ে বিঘ্ন ও ব্যর্থতা। আমাদের এই তিনটি দিককে পৃথক এবং সমন্বিত— দু'দিক থেকেই বুঝে নিতে হবে।

কবি পার্সি বিস্ শেলী যখন বলেন, 'Poetry is the expression of imagination', তখন কেবল কল্পনাশক্তির কথাই তিনি বলেন না, তার expression অর্থাৎ প্রকাশকলার কথাও বলেন। আবার কবি উইলিয়ম ওয়ার্ডসওয়ার্থ যখন কাব্যের সংজ্ঞায় বলেন, 'Poetry is the breath and finer spirit of knowledge', তখন সে 'knowledge' বলতে তথাকথিত কোনো 'জ্ঞান' নয়, তা হল কবির সহৃদয়-জীবন-অভিজ্ঞতার সঞ্চয়। আর তারই 'finer spirit' বা সূক্ষ্মতর সত্তার রসরূপ হল কবিতা। স্থূল, প্রত্যক্ষ এবং তৎক্ষণাৎ পাওয়া অভিজ্ঞতা নয়, তাকে থিতিয়ে পড়ার শান্ত হবার সময় দিতে হবে তবেই তা finer বা সূক্ষ্মতর হবে। 'finer' কথাটির যেমন সময়গত দিক আছে, তেমনি তার রূপগত দিকও আছে, একটি যথাযথ সার্থক ও উপযুক্ত রূপকের মাধ্যমে তার প্রকাশ হয়। এই 'finer spirit'-এর মাধ্যমে 'knowledge' নতুন মাত্রা লাভ করে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ এসে বললেন, ওই স্থুল-বাস্তব-প্রত্যক্ষ দিকটি হল—'তথ্য' মাত্র এবং 'finer spirit' -এ পরিণত হলেই তা হবে কাব্যের 'সত্য'। শেলীর 'imagination'. ওয়ার্ডসওয়ার্থের 'finer spirit' আর রবীন্দ্রনাথের তথ্যের স্তর পেরিয়ে 'সত্যে'র স্তরে উত্তীর্ণ ভাবনার মধ্যে মূলত কোনোই ভেদ নেই। কবির সহৃদয় ও আন্তরিক ভাবনার মাধ্যমেই 'তথ্য' পরিণত হয় 'সত্যে'। 'সত্য' হল এক চিরন্তন অনুভূতি—কোনোদিন তার ক্ষয় নেই। এই জন্যেই রবীন্দ্রনাথ বলেন, বাস্তব জগৎ নয়, কবির মনোভূমি'-ই কাব্যের উৎস। 'চিত্র' ও 'সঙ্গীত'-কে রবীন্দ্রনাথ কাব্যের দুই প্রধান উপকরণ বলে মনে করেন। 'চিত্র' দেয় ভাবকে রূপ ও 'সঙ্গীত' দেয় ভাবকে গতি।

শেলীর 'expression' আর রবীন্দ্রনাথের 'প্রকাশকলা' স্বরূপের দিক থেকে এক। মনের সত্য ভাবনাকে প্রকাশ করতে হবে এবং সে প্রকাশকে যথার্থ ও উপযুক্ত হতে হবে। কাজেই নিছক প্রকাশ নয়—'প্রকাশকলা।' সংস্কৃতে এ জন্যেই কবিতাকে বলা হয়েছে 'কবিকর্ম'— অর্থাৎ কবিকৃত 'কর্ম'। কবিতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল—'Poem'। এই 'Poem'কথাটি এসেছে গ্রিক 'Peiema' থেকে। এর অর্থ হল, কিছু করা বা প্রস্তুত করা। এই সৃষ্টিকে নির্মাণ/প্রস্তুত করার মধ্যে ওই 'প্রকাশকলা' বা 'কবিকর্ম'-র দিকটিই আছে। অভিনবগুপ্ত 'ধ্বন্যালোক'-এর প্রথমেই কবির এই ক্ষমতাকে বলেছেন—"অপূর্ব বস্তু-নির্মাণ-ক্ষমাপ্রজ্ঞা"। কাব্যসংসারে কবিদের তাই বলা হয় প্রজাপতি ব্রহ্মা। তাহলে, এই 'প্রজ্ঞাই কি Knowledge? ঠিক তাই। আর শব্দ-ছন্দ-উপমা-চিত্রকল্প হল সেই প্রজ্ঞারই প্রকাশকলার দিক, সৃষ্টি-নির্মাণের দিক।

এই নির্মাণ-সৃষ্টির একটি বিশেষ দিক কবির 'কল্পনাশক্তি' বা Imagination, আজ আমরা যে এক বিশুদ্ধ ও উচ্চ কল্পনাশক্তির কথা ভাবি, তা স্যামুয়েল টেলর কোলরিজের অবদান। মধ্যযুগে Imagination

আখ্যাটির বদলে Fancy আখ্যাটিরই প্রচলন ছিল বেশি। কোলরিজ তাঁর 'Biographia Literaria' (১৮১৭) গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে Fancy এবং Imagination-এর মধ্যে মাত্রাগত পার্থক্য করেছেন। কোলরিজের অন্বেষণের বিষয় ছিল—মানুষের 'সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব' ('Unified Personality'), এবং Imagination হল সেই 'সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব'কে অর্জন করবার উপায়। Imaginationহল— মানুষের Synthetic' এবং 'Magical' গুণ বা শক্তি। এই শক্তিই মানুষের বিভিন্ন Faculty (= কর্মশক্তি, দক্ষতা, মানসিক শক্তি)-র মধ্যে সমন্বয়ে সৃষ্টি করে সামগ্রিকতা বা অখণ্ডতা আনে। Fancy হল ওই Faculty-এর নিম্নস্তরের আর Imagination হল ওই Faculty -র উচ্চস্তরের দিক। খাঁটি Imagination কে তিনি Primary এবং Secondary–এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। এই Primary দিক হল—এক 'জীবন্ত সত্তা', যা Sensation এবং Perception-এর মধ্যস্থতা করে এবং এই Faculty-ই হল—Prime agent of all human perception, এই Faculty যে কোনো অনুভূতিশীল মানুষেরই থাকতে পারে। আর Imagination-এর Secondary দিক হল, Poetic imagination–তা প্রথম স্তরটিই একটি মাত্রাগত উচ্চতর দিক। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থ তাঁর 'Poems' (১১৫) ভূমিকায় কোলরিজ থেকে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তাঁর মতে Fancy একটি Creative Faculty এবং এর নিজস্ব নিয়ম-শৃঙ্খলা দ্বারা এটি পরিচালিত হয়। ইংরেজি এলিজাবেথীয় কাব্যসংস্কার অনুসারে কাব্য হল এক Divine বা স্বর্গীয় সামগ্রী, এর পেছনে কোনো যুক্তি নেই। এক 'Intuitive Perception' কবিকে যে অন্তর্দৃষ্টি দান করে তারই ফলে তিনি কবিতা রচনা করেন। কাজেই এলিজাবেথীয় যুগের Imagination-এর সঙ্গে কোলরিজের ধারণার বিশেষ পার্থক্য আছে।

Imagination সম্পর্কে শেকস্‌পীয়রের ধারণা 'A Midsummer Night's Dream' (পঞ্চম অঙ্ক/প্রথম দৃশ্য) নাটকে ব্যক্ত হয়েছে। কল্পনাশক্তির দ্বারাই কবিরা সবকিছুকে রুপ দেন এবং অস্তিত্বহীন বিষয়কে 'A local habitation and a name' দিয়ে স্পষ্টতর করে তোলেন। 'কল্পনা' নামে একটি সনেটে মাইকেল মধুসূদন দত্ত সেই অর্থেই একে গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'কবি' নামে সনেটটিও এ প্রসঙ্গে পঠিতব্য।

কবিতার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নিয়ে সব দেশের সমালোচকগণ লেখনী চালনা করেছেন। কবিতার দুটি অর্থ ঃ আক্ষরিক ও ব্যাচ্যার্থ, অন্যটি সেই বাচ্যার্থ পেরিয়ে এক ব্যঞ্জিত অর্থময় ব্যঞ্জার্থ। 'কাব্যজিজ্ঞাসা' বইতে অতুলচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন, "যেখানে কাব্যের অর্থ ও শব্দ নিজেদের প্রাধান্য পরিত্যাগ করে ব্যঞ্জিত অর্থকে প্রকাশ করে, পণ্ডিতেরা তাকেই ধ্বনি বলেছেন।.......এই ধ্বনি বা ব্যঞ্জ হচ্ছে কাব্যের আত্মা, তার সারবস্তু।' এর কিছু পরে তিনি লিখেছেন."......কাব্যের আত্মা হচ্ছে তার বাচ্য নয়, ব্যঞ্জনা, কথা নয় 'ধ্বনি'— এ ব্যঞ্জনা কিসের ব্যঞ্জনা, এ ধ্বনি কিসের ধ্বনি? ধ্বনিবাদীদের উত্তর—'রস-এর।"

কিছু রসই কাব্যের শেষতম লক্ষ্য নয়। যদিও কবি ভারতচন্দ্র বলে গেছেন,—'যে হৌক, সে হৌক ভাষা, কাব্যরস ল'য়ে।' রসকে ভিত্তি করে আসে 'আনন্দ',—এই 'আনন্দ'ই কাব্যের শেষ লক্ষ্য। এর আগে আলোচনা করেছি, কবির সৃষ্টির দিক থেকে। এবার সেই কবিতার পাঠকের প্রতিক্রিয়ার দিক থেকে প্রসঙ্গটিকে লক্ষ্য করছি। কবির সৃষ্টি এবং পাঠকের প্রতিক্রিয়া—এই দু'দিক থেকেই সমগ্র ব্যাপারটি বিচার্য। 'কাব্যলোক' বইটিতে ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত বিষয়টির সুন্দর পর্যালোচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টিকোণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—দু'দিকেই প্রসারিত। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'সাহিত্যদর্পণ'- এর প্রথম দিকেই কাব্যের যে বহুপ্রচারিত সংজ্ঞাটি দিয়েছেন—'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্',— যার বাংলা অর্থ সকলেরই জানা, ড. দাশগুপ্ত তার বাংলা অনুবাদ করেছেন এই বলেঃ "আনন্দময় বাক্যই কাব্য।" অর্থাৎ 'রস'-এর বদলে তিনি সচেতনভাবে 'আনন্দ' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। কেন? 'আনন্দ'-এর প্রতিশব্দ রূপে হ্লাদ, আহ্লাদ, নির্বৃতি, চমৎকার প্রভৃতি শব্দ মেলে। আহ্লাদের প্রসঙ্গে 'লোকোত্ত আহ্লাদ'-এর কথাও বলা হয়েছে। 'রস' ও 'আনন্দ'-এর মধ্যে পার্থক্য হল,—রস আস্বাদন করতে হয় এবং তারই ফলে 'আনন্দে'র প্রকাশ ঘটে। "আনন্দ ঊর্ধ্বে বর্তমান, তাহা শব্দার্থজাত ভাব পরিচ্ছিন্ন হইলে রস হয়।" অর্থাৎ 'ভাব' (এখানে শব্দার্থের বিশিষ্ট দিক) পরিষ্কৃত হয়ে যেমন 'রসে' পরিণত হয়। 'ভাবতন্ময় চিত্তে আনন্দের প্রতিফলন বা প্রকাশই রস।" পাশ্চাত্য সমালোচকদের কেউ কেউ এই কাব্যানন্দকে 'Delight' বা 'Pleasure' বলেছেন। কিন্তু বেনদেত্তো ক্রোচে একে বলেছেন—'Pure Poetic Joy', কবি কীটস্‌ও বলেছেন, 'A thing of beauty is a joy for ever'। ড. দাশগুপ্তের মতে, ভারতীয় 'আনন্দ'-এরই সমার্থক হল 'Joy'।

রবীন্দ্রনাথ কীটস্-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন, 'আনন্দ' এবং 'Joy' কে তিনিও সমার্থক বলে মানেন। তবে তাঁর নিজস্ব চিন্তার আলোকে তা গ্রহণ করেছেন। ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত সুন্দরভাবে লিখেছেন ঃ 'কাব্য শ্রবণ ও অভিনয় দর্শন তখনই সত্য ও সার্থক বলিয়া মনে হইবে, যখন তাহা চিৎ ও আনন্দস্বরূপের ভাঙিয়া দিয়া সত্ত্বগুণময় চিত্তে (ভারতীয় দর্শনে আত্মার 'সত্ত্বগুণময় ধর্মে'র অর্থ হল— আত্মার প্রকাশশীলতা) তাহার প্রকাশ ঘটাইবে। এই প্রকাশই আত্মোপল বা আনন্দোপলব্ধি। কাব্যের মহান লক্ষ হইতেছে শব্দার্থের আশ্রয়ে এই আনন্দের প্রকাশ।"

কাব্যের সঙ্গে নীতি ও উপদেশের প্রসঙ্গটির কথাও বহুলাংশে বলা হয়। কখনো সরাসরি কখনো 'কান্তাসম্মিত' উপায়ে সেই নীতি উপদেশ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। সাহিত্যের রস এবং উদ্দেশ্যকে ক্ষুণ্ণ না করে সুনীতিকে সাহিত্যে প্রশ্রয় দানের কথা বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, কবিরা নীতিব্যাখ্যার দ্বারা শিক্ষা দেন না। "তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।" এই 'চিত্তশুদ্ধি'-কে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের লক্ষ্য বলে মানেন। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু 'নীতি' নয়, 'মঙ্গল-কে স্বীকার করেন। গানে বলেন, 'আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য-সুন্দর"। সত্য ও সুন্দরের

অবস্থান, তাঁর মতে, একই সঙ্গে আনন্দলোকে এবং মঙ্গলালোকে। এইভাবে তিনি আনন্দ ও মঙ্গলের মধ্যে সমীকরণ করেছেন। মঙ্গালের জন্য যে দুঃখ-স্বীকরণ, তাই তাঁর কাছে আনন্দ। এইভাবে 'দুঃখ-এর প্রসঙ্গটিও এখানে এসে গেছে।

সমালোচকগণ, পণ্ডিতগণ, এমনকি কবি-শিল্পীরাও যতভাবেই কবিতার সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করুন না কেন, শেষ পর্যন্ত কবিতার সংজ্ঞা বোধ হয় চির-অসম্পূর্ণই থেকে যায়। খাঁটি ও অকৃত্রিম কবিতার সংজ্ঞা বোধ হয় কোনোদিনই দেওয়া যাবে না। কেউ যেমন জোর করে ফুল ফোটাতে পারে না, তেমনি কবিতা রচনা বা তার প্রক্রিয়া-প্রকরণও কেউ শিখিয়ে দিতে পারে না। অথচ, যে পারে সে কত সহজেই তা পারে। রবীন্দ্রনাথের বাণী মনে পড়ে ঃ

যে পারে সে আপনি পারে
পারে সে ফুল ফোটাতে
সে শুধু চায় নয়ন মেলে
দুটি চোখের কিরণ ফেলে,
অমনি যেন পূর্ণ প্রাণের
মন্ত্র লাগে বোঁটাতে।
যে পারে সে আপনি পারে,
পারে সে ফুল ফোটাতে।

— 'ফুল ফোটানো' ঃ খেয়া

৯১.৪ কবিতার শ্রেণিবিভাগ ঃ মন্ময় ও তন্ময় কবিতা

'Object' বা বস্তুকে দেখা যেতে পারে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঃ এক, বস্তুকে বস্তুরূপেই রেখে, তার নিজ স্বরূপকে বিকৃত না করে। দুই, সেই বস্তুকে যিনি দেখছেন, অনুভব করছেন, তিনি তাঁর নিজের ভাব ও ব্যক্তিত্বটি দিয়ে সেই বস্তুকে রাঙিয়ে নিচ্ছেন, তাকে পরিবর্তিত করে স্রষ্টার নিজ ভাব-ব্যক্তিত্বটিই যেখানে বস্তুকে ছাড়িয়ে বড় হয়ে উঠছে, সেখানে বস্তুটি হয়ে যাচ্ছে ভাব বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। কবিতার বিষয়ের মধ্যেও এই পার্থক্যটি দেখা যাবে। কবিতার বিষয়টিই যেখানে স্পষ্ট ও প্রধান হয়ে যায় সেখানে কবিতা হবে বিষয়মুখ্য অর্থাৎ কবিতা হবে Objective। এই কবিতার নাম—'তন্ময় কবিতা'। 'তন্ময়' অর্থ—'তদ্‌গত চিত্ত' অর্থাৎ চিত্ত যখন তদ্বিষয়ে একান্ত স্থিত।

আর 'মন্ময় কবিতা' হল— ঠিক এরই বিপরীত। বিষয় নয়, 'বিষয়ী' যেখানে মুখ্য বা প্রধান। বস্তু নয়, Object নয়, Subject অর্থাৎ ব্যক্তিই যেখানে প্রধান। কবিতার বিষয় যখন আত্মগত, ব্যক্তিকেন্দ্রিক—

ব্যক্তির নিজস্ব ভাবকেন্দ্রিকতা যখন বস্তুকে ছাপিয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলবেন, পান্না নিজস্ব রঙে সবুজ নয়, কবির চেতনার রঙে তা সবুজ হয়ে ওঠে। এই কবিতার নাম Subjective কবিতা। বাঙলায় বলা যায়—ব্যক্তিকেন্দ্রিক কবিতা।

কবিতার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, প্রারম্ভিক যুগে ব্যক্তির চেয়ে বস্তুই প্রাধান্য অর্জন করেছে অধিক। ক্রমে ইতিহাসের নানা পথ বেয়ে বস্তুর চেয়ে ব্যক্তির প্রাধান্যই সূচিত হয়েছে। আসলে প্রাথমিক যুগে মানুষ ছিল গোষ্ঠীবন্ধ জীব। সেই গোষ্ঠীবন্ধ মানুষের দৃষ্টিকোণ ছিল একতাবন্ধ, বস্তুপ্রধান দৃষ্টিকোণ। একক মানুষের ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিভাবনা সাধারণ ভাবেই তখন ছিল উপেক্ষিত। গোষ্ঠী ভেঙে যখন ব্যক্তির মূল্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখনই এসেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ভাবনা এবং ব্যক্তিত্বের দিক। এইখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় আর একটি কথাঃ ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণে বা ব্যক্তিক ভাবনার প্রাধান্যের দিক প্রতিষ্ঠিত হলেও বস্তুপ্রধান দৃষ্টিকোণ কিন্তু অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। দুটি দৃষ্টিকোণই সাহিত্যের নানা রূপ ও শাখার মধ্যে সমান্তরাল ধারায় প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এখানে কেবল আপেক্ষিক প্রাধান্যের কথা বলা হল। সাহিত্যের নানা Form বা রূপ প্রচলিত হবার পর কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কেবল বস্তুপ্রধান বা কেবল ব্যক্তিপ্রধান দৃষ্টিকোণ যেন সেই-সেই রূপ বা Form এর পক্ষে আবশ্যকীয় হয়ে ওঠে। যেমন Classical ও Romantic দৃষ্টিকোণ। দেখা গেছে, ক্লাসিক কাব্যের মধ্যেও কখনো-কখনো রোমান্টিক দৃষ্টিকোণের সঞ্চরণ ঘটেছে। বিভিন্ন ও বিচিত্র দৃষ্টিকোণের সংমিশ্রণ যে কোনো দেশেরই সাহিত্যের এক সাধারণ লক্ষণ।

সংস্কৃত রীতি অনুসারে কাব্যকে বস্তু ও ব্যক্তির ভাবগত প্রাধান্যের আলোকে বিচার করা হয়নি। সেখানে প্রয়োগ বা ব্যবহারের দিক থেকে কাব্যের শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। সংস্কৃত রীতিতে কাব্য দুই প্রকারের ঃ শ্রব্য ও দৃশ্য। যা কেবল শোনা হয়, তা শ্রব্যকাব্য। আর যা শোনা না হলেও অভিনয়ের সময়ে দৃষ্ট হয়, তা দৃশ্যকাব্য। 'কাব্য' অভিধাটির এই ব্যাপক সংজ্ঞা এখানে লক্ষ্য করা যায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর বহু বাঙালি লেখক-সমালোচক 'নাটক'-কে তাই কাব্যও বলেছেন। স্বয়ং মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকটি 'কাব্য' বলে অভিহিত করেছেন। এই অর্থেই নাট্যকার গিরিশচন্দ্রকে 'মহাকবি' বল হতো। 'শ্রব্যকাব্য' এই অভিধাটির মধ্যে আর একটি দিক আছে ঃ যেন পাঠক নিজে নন, আর কেউ একজন পাঠক তাঁকে তা পড়ে শোনাচ্ছেন। অবশ্য নিজেই নিজেকে পড়ে শোনানোর দিকটি কিন্তু এই ব্যখায় অস্বীকার করা হচ্ছে না। শুধু এইটুকু বলা হচ্ছে,—যেমন পাত্র-পাত্রীরা অভিনয় করে 'দৃশ্যকাব্য' ব্যাপারটিকে দর্শকের কাছে তুলে ধরেছেন, একজন পাঠকও তেমনই শ্রোতার কাছে 'শ্রব্যকাব্য' ব্যাপারটিকে রূপদান করছেন। এ জন্যেই বলা হল,— সংস্কৃতে কাব্যকে প্রয়োগ ও ব্যবহারের দিক থেকে বিভক্ত করা হয়েছে, পাশ্চাত্য ভাবনায় তেমনি কাব্যকে বিভক্ত করা হয়েছে ব্যক্তি ও বিষয়ের আপেক্ষিক প্রাধান্যের দিক থেকে।

তবে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রানুসারে শ্রব্যকাব্যকে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য ও কোষকাব্য। দীর্ঘাকার কাব্য মহাকাব্য, স্বল্পদীর্ঘাকার কাব্য খণ্ডকাব্য। এখানে আকারকে অবলম্বন করে বিভাগ করা হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালিরা ক্ষুদ্রায়তন কবিতাকে (যা আসলে 'গীতিকবিতা') বলতেন 'খণ্ডকবিতা'— যেমন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। সংস্কৃতে তেমনি গদ্যরুপ ও পদ্যরুপের মিশ্রণের ফলজাত কবিতাকে বলা হত 'চম্পূকাব্য'। 'কোশ' বা 'কোষ' শব্দের অর্থ হল—আধার, পাত্র। 'কোষকাব্যে'র অর্থ হল—বিভিন্ন কবিতাযুক্ত কাব্যগ্রন্থ। কাজেই দেখা যায়—নানা দৃষ্টিকোণ থেকে কাব্যকে বিভক্ত করা হয়েছে। বস্তু ও ব্যক্তিকে ভিত্তি করে বিভাগ-কল্পনা তার মধ্যে একটি।

৯১.৫ অনুশীলনী

(ক) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(১) কবি শেলীর অনুসরণে কাব্যের সংজ্ঞা দিন।

(২) কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের অনুসরণে কাব্যের সংজ্ঞা দিন।

(৩) রবীন্দ্রনাথের অনুসরণে কাব্যের দুই প্রধান উপকরণের নাম বলুন এবং সে দু'টির ভূমিকা সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

(৪) 'Poem' শব্দের উদ্ভব ও অর্থ সম্পর্কে মন্তব্য করুন।

(৫) 'Imagination' সম্পর্কে শেকস্‌পীয়ার তাঁর কোন্ নাটকে মন্তব্য করেছেন এবং কী মন্তব্য করেছেন?

(৬) 'রস' বা 'আনন্দ'—কাব্যের শেষ লক্ষ্য কী?

(৭) কবিতা রচনা সম্পর্কে 'ফুল ফোটানো' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যে কথা বলেছেন, তা নিজের ভাষায় বলুন।

(খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিশদ ও বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ

(১) কবিতার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শেলী-কথিত 'Expression' ওয়ার্ডসওয়ার্থ কথিত 'Finer Spirit' ও 'Knowledge' এবং রবীন্দ্রনাথ কথিত 'প্রকাশকলা' ও 'সত্য'-এর মধ্যে কোনো সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যায় কি?

(২) কবি কোলরিজের অনুসরণে 'Imagination' বা কল্পনাশক্তি সম্পর্কে নিজের ভাষায় আলোচনা করুন।

(৩) ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ সত্য সুন্দর’— রবীন্দ্রসঙ্গীতের এই পঙ্‌ক্তি অবলম্বন করে কবিতার সঙ্গে ‘আনন্দ’ ও ‘মঙ্গলে’-এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

(৪) ‘Objective’ ও ‘Subjective’ কবিতা বলতে কী বোঝেন?

(৫) কবিতার বিভাগ সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য রীতির তুলনা করুন।

৯১.৬ মন্ময় কবিতার পরিচয় ঃ গীতিকবিতা

বর্হির্জগৎকে বা বস্তুবিশ্বকে দু'ভাগে কবি-শিল্পীরা গ্রহণ করেন। কিছু পূর্বেই তার আলোচনা করা হয়েছে। আপন মনের রঙ ও নিজস্বতা দিয়ে যখন সেই দর্শন ও প্রদর্শণ এবং তারই ফলে সেই দৃষ্টিকোণের প্রতিফলন ঘটে যে কাব্য-কবিতায়, সেই রচনাকেই বলা যায় মন্ময় কবিতা। এখানে স্রষ্টার মন ও নিজের ব্যক্তিত্বটিই প্রধান বা মুখ্য—বস্তু বা বিশ্বের নিজস্ব স্বরূপ নয়। অনুভূতি যখন খুব তীব্র-তীক্ষ্ণ ও নিবিড় হয় তখনই এ ধরনের কবিতা রচিত হতে পারে। কাজেই স্রষ্টার ও শিল্পীর অনুভূতির তীব্রতা ও নিবিড়তাই এ জাতীয় কবিতার মূল উৎস ও উপকরণ। সেই তীব্র অনুভূতিটি হবে নির্দিষ্ট একটি লক্ষ্যাভিমুখী, লক্ষ্য-বিচ্যুতি ঘটলেই তার শিল্পগত সাফল্যও হবে বিঘ্নিত। আবার, যেহেতু ওই অনুভূতি তীব্র-তীক্ষ্ম, সেই হেতু তা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না, তার ্প্রকাশও স্বল্পায়তন রূপের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ একেই বলেছেন,“একটুখানির মধ্যে একটিমাত্র ভাবের বিকাশ!” রবীন্দ্রনাথ নিজে কবি বলেই এত সহজে এবং এত সুন্দর করে এ জাতীয় কবিতার স্বরূপ নির্দেশ করতে পেরেছেন। এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আরও একটি গুরুত্বর্ণ কথা বলেছেন ঃ “আমাদের মনের বহুদিনের অব্যক্ত ভাবের একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা।” ধরা যাক কোনো বর্ষা বা বসন্তের বিশেষ দিনে বা ক্ষণে। যে কথা কোনো দিন বলা হয়নি, যে কথা অব্যক্ত ছিল মনের গহনে, রবীন্দ্রনাথ সেই ভাব ও ভাবনাকে বিশেষ ধরনের কাব্য-কবিতা বলেন, যা একান্ত ব্যক্তিগত অনুভূতির নিবিড় প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তার মধ্যে দুটি দিক আছে ঃ রূপের দিক থেকে তা ‘একটুখানি,’ আর ভাবের দিক থেকে ‘বহুদিনের অব্যক্ত ভাবে’ এবং একটিমাত্র ভাবে'র প্রকাশ। ভাব ও রূপ—দু'দিক থেকেই রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গটিকে দেখেছেন। যেহেতু তা আয়তনে স্বল্প, যেহেতু তা ব্যক্তিগত একটি নিষ্ঠাময় অনুভূতি, সেই হেতু সহজেই তার মধ্যে এসে পড়ে সঙ্গীতের সৌকুমার্য ও সুষমা।

এই ধরনের কবিতাই ‘গীতিকবিতা’। বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্পীরা বলতেন—‘গীতিকাব্য’ বা ‘খণ্ডকবিতা’। অভিধাটি মূলত পাশ্চাত্য Lyric শব্দের বঙ্গানুবাদ। একথা আজ সকলেরই জানা যে lyre (lyra) বা বীণাজতীয় একপ্রকার যন্ত্রসহযোগে যে গান গাওয়া হত, গ্রীকরা তাকেই বলত—lyric। এই গানের অনুষঙ্গেই এসেছে ‘গীতিকাব্য’ বা ‘গীতিকবিতা’ অভিধাটি। তবে শিথিল অর্থে। এখন যে সব কবিতা আর গাওয়া হয় না, কিন্তু গানের সুষমা-মাধুর্য যে সব কবিতায় বিদ্যমান,

তাই হয়ে গেছে ‘গীতিকবিতা’। তবে অনেক গান কবিতারূপেও পাঠ্য এবং পাঠ্য কবিতা গীতিরূপে গেয়। এর বিশিষ্ট উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অনেক কাব্যগ্রন্থেই একটি-দুটি করে এমন কবিতা মেলে, যা গান। এসব রচনায় রবীন্দ্রনাথ গান ও কবিতার ভেদরেখা মুছে দিয়েছেন। গান ও কবিতার রচনারীতির মধ্যে তফাৎ আছে, কয়েকটি বিশেষ নিয়ম-নীতি-শৃঙ্খলাকে অনুসরণ করে গান লিখতে হয়। কবিতার ক্ষেত্রে সে সব কোনো বাঁধা নিয়ম-শৃঙ্খলা নেই। তবে এখানেও রবীন্দ্রনাথ নিজ-নিয়মের অনুসরণ করেছেন। অনেক সনেট কবিতাকে (যেমন, ‘তবু মনে রেখো..........’) তিনি গানে রূপ দিয়েছেন।

‘গীতিকবিতা’ কোনো একক ব্যক্তিত্বের চিন্তা ও অনুভূতি বটে, কিন্তু তা কবিরই হতে হবে, তা নয়। এখানেই অনেকে একটি ভুল করে বসেন। অনেকেই মনে করেন, গীতিকবিতা মাত্রই কবিরই ব্যক্তিগত জীবনের কথা বা অভিজ্ঞতা। সেটা অনেক সময় সত্য বটে কিন্তু সর্বদা নয়। কোনো বিষয়কে কবি আপনার ব্যক্তিগত ভাব-কল্পনা দিয়ে যখন একান্ত করে নিজের করে নেন, বিষয় এবং ব্যক্তি যখন অভিন্ন হয়ে যায়, সেই মানসিক অবস্থাই গীতিকবিতার উৎস। কাজেই মূল কথা হল—কবির নিজের ব্যক্তিজীবন নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্ব দিয়ে কোনো ভাবনা যখন একান্ত ভাবে তাঁরই হয়ে ওঠে, সেই অবস্থাটিই এখানে আমাদের মূল লক্ষ্য। আসল কথা, কবির নিজের দৃষ্টিকোণ,—যে দৃষ্টিকোণে জারিত হয়ে কোনো ভাবনা তাঁর ব্যক্তিক ভাবনাতেই পরিণত হয়ে ওঠে।

যেমন ধরা যাক—মধ্যযুগের বৈষ্ণব বা শাক্ত পদাবলী। বিষয়ের দিক থেকে এ দুটি ক্ষেত্রের বিষয় কবিদের নিজস্ব বিষয় নয়। রাধা-কৃষ্ণ বা শ্যামা-উমার বিষয় দুটি—দুটি সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর বিশ্বাসের বিষয়। কিন্তু তথাপি কবিতে-কবিতে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আছে, আর সেই পার্থক্যের ফলেই এই দুটি সম্প্রদায়গত বিশ্বাস অনেক খাঁটি গীতিকবিতার জন্ম দিয়েছে। এই কারণেই দেখা যায় বিদ্যাপতি রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার যে-অংশে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন ও শ্রেষ্ঠ কবি হন, চণ্ডীদাস ঠিক সেই-সেই ক্ষেত্রে ততখানি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন না। তাঁর ক্ষেত্র পূর্বরাগ কিংবা আক্ষেপানুরাগ। একই কথা রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত সম্পর্কেও সত্য। কাজেই, বিষয় এক হওয়া সত্ত্বেও, বিষয়ীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে, সে প্রসঙ্গটিকে একান্ত নিজের করে নেবার মধ্যেই গীতিকবিতার ব্যক্তিগত দিক নিহিত থাকে। নিছক ব্যক্তিগত দিক এখানে বড়ো কথা নয়। অনেকে কবির রচনায় কবি ব্যক্তিজীবনের অন্বেষণ করেন, হয়তো কখনো তা কিছু পরিমাণে মেলেও, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাবধানবাণী—কবির জীবনচরিত এবং তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি সম্পূর্ণই ভিন্ন। যে মাইকেল ব্যক্তিজীবনে কিছু অমিতচারী, সাহিত্যের মধ্যে তিনিই মিতাচারের সংযমকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই জন্যেই গীতিকাব্যের মূল ভাবনা কবির নিজের জীবনের কথা সর্বত্র প্রাধান্য পায় না। আসলে বিষয়কে তিনি কতোখানি নিজস্ব করে নিতে পারেন—সেটাই বড়ো কথা।

গীতিকবিতাকে রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন কোনো অব্যক্ত ভাববেদনাকে “একটি কোনো সুযোগ আশ্রয় করিয়া ফুটিয়া ওঠা”, সে কথাটি ভেবে দেখবার মতো। রবীন্দ্রনাথেরই গানের কলি—“তুমি হঠাৎ হাওয়ায় ভেসে আসা ধন।” এ যেন আকস্মিক মুহূর্তের অপ্রত্যাশিত প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথেরই একটি গানের বিষয়ঃ গেল কাল রাতের বেলায় তাঁর মনে গান এসেছিল, প্রেমিকা তখন উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু আজ প্রেমিকা উপস্থিত, কিন্তু গান এলো না। এই যে বিশেষ মূহূর্তের এক মূল্যবান অভিজ্ঞতার প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার উৎসারণের জন্য তাকে একটি বড়ো দিক বলে মানেন।

গীতিকবিতার ‘ভাব’ ও ‘রূপ’-এর কথা বিবেচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র এর মধ্যে কোনো জাতির জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় অন্বেষণ করেছেন। বাঙালির জাতীয় জীবনে কোনো ব্যাপক-গভীর আলোড়ন-আন্দোলন নেই, জীবনের মধ্যে এমন কোনো দুরূহ সমস্যার প্রবর্তন নেই, যা তাকে কোনো মহৎকাব্যের প্রেরণা দিতে পারে। বাঙালির জীবনের ছোট ছোট ভাব ও ছোট ছোট সমস্যা গীতিকাব্যেরই উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করেছে, সেইজন্য গীতিকাব্যের এত প্রাচুর্য এ দেশে দেখা যায়। বঙ্কিমের এই মন্তব্যকে গীতিকাব্যের এক বিশ্বব্যপী লক্ষণ বলে মেনে নেওয়া যায় না। কেননা, পৃথিবীর যে দেশে কাব্য-কবিতার অন্যান্য শাখার নিখুঁত বৈচিত্র্য দেখা যায়, সে সব দেশে গীতিকাব্যও সাফল্যের সঙ্গে রচিত হয়েছে। বাঙলার জল-হাওয়া এবং বাঙালির খাদ্যাভাস গীতিকাব্য রচনার অনুকূল— এ কথাও সর্বদা গ্রহণীয় নয়। গীতিকাব্য হল একটি বিশেষ জীবনভাবনা ও জীবন দৃষ্টিকোণের প্রকাশ তার সঙ্গে সে দেশের নৈসর্গিক ও ভৌগোলিক যোগাযোগ থাকতেই পারে, —কিন্তু সেই নৈসর্গিক পরিবেশজাত বিশেষ ধরনের জলবায়ু গীতিকবিতার প্রাচুর্যের কারণ হবে—এসব তত্ত্বের সর্বজনীনতা সম্পর্কে সন্দেহ হয়।

তবে নিসর্গজগৎ যে গীতিকবিতা রচনার একটি অনুকূল পরিবেশ রচনা করে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে, নিসর্গ যদি নিছক নিসর্গই থেকে যায়, তবে সে নিসর্গ গীতিকবিতার অনুকূল অবশ্যই হবে না। নিগর্স যখন একটি বিশিষ্ট অনুভবের দ্বারা রঞ্জিত হয়ে একটি বাণীরূপে কবির দিকে এগিয়ে আসবে এবং কবির দিক থেকেও একটি বাণী হয়ে নিসর্গের দিকে এগিয়ে যাবে, তখন এই দুই দিকের মিলিত সত্তা এক রোমান্টিক ভাবসত্তা হয়ে গীতিকবিতার জন্ম দিতে পারে। অবশ্য, এটিকে নির্মাণভিত্তিক গীতিকবিতা কেউ যদি বলেন, তবে আপত্তির কিছু নেই। শুধু আমাদের বক্তব্য এই ঃ নিসর্গ এবং কবিহৃদয়ের সম্মিলনের ফলে কবি যে-এক বিশেষ উপলব্ধির জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন, তাঁর সেই উপলব্ধির জগৎই অন্যান্য নানা বিচিত্র বিষয়কে আশ্রয় করে খাঁটি গীতিকবিতার সৃষ্টি করে। নিসর্গের অন্তর্নিহিত রহস্যময় শক্তিই কবির নিজের অন্তরের রহস্যকে অন্বেষণ করতে ব্যাপৃত করে।

আকারে ছোট, কিন্তু প্রকারে গভীর,—গীতিকবিতার এই বিশেষত্বের কথা অনেকেই বলবেন। সেই গভীরতাকে ব্যক্ত করতে চাই উপযুক্ত শব্দ-শিল্প, ছন্দের যথার্থ প্রয়োগ, চিত্র ও চিত্রকল্পের যোজনা।

আধুনিক গীতিকবিতার একটি বড়ো লক্ষণই হল—চিত্রকল্পের যোজনা। তবে সেই চিত্রকল্পকে হতে হবে সামগ্রিক ও অখণ্ড, যাতে সমগ্র কবিতাটি তার দ্বারা উদ্ভাসিত ও উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

পৃথিবীর প্রাচীনতম লিরিক বা গীতিকবিতার নিদর্শন মিলেছে ইজিপ্টের পিরামিডের গাত্রে উৎকীর্ণ কবিতারূপে (খ্রি.পূ. ২৬০০ আব্দে)। এসব লিরিক হয় শোককাব্য, নয় কোনো মৃত রাজার প্রশস্তিগীতি, কিংবা কোনো দেবতার আবাহনী গীতি। এরপর পাওয়া গেছে মেষপালক ও জালিকগণের গীতি, সমাধিস্তরে উৎকীর্ণ কিছু লিপি। গ্রিকরা লিখেছেন হিব্রু ভাষায় গীতিকবিতা। ইজিপশীয়, হিব্রু এবং গ্রিক লিরিকের মূল উৎস ছিল ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে খাঁটি লিরিক কবিতার উদ্ভব ঘটেনি। এই সময় থেকেই বিষয়কে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণের পার্থক্য রচিত হয়। পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রিসে Pindar প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ গীতিকবির আবির্ভাব ঘটে। ইসকাইলাস, সোফোক্লিস এবং ইউরিপিদিস প্রভৃতি নাট্যকারেরা তাঁদের নাটকের অন্তর্গত কোরাস-গীতি রূপে ভালো গীতিকাবিতাধর্মী কিছু লেখা লিখেছিলেন।

রোমান গীতিকবিরা ব্যক্তিময়তা ও আত্মজীবনকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে আছেন—ওভিদ, ভার্জিল প্রভৃতি। ৩০০ খ্রিস্টাব্দের পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় লাতিন কবিরা গীতিকবিতার বিষয়গত বৈচিত্র্যের প্রবর্তন ঘঠালেন, প্রকরণগত দক্ষতারও প্রমাণ দিলেন। ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর 'চার্চ লিরিক' ও উল্লেখযোগ্য। খ্রিস্টীয় ৩০০ থেকে ১৩০০ পর্যন্ত কালপর্বে চিন, জাপান, পারস্য প্রভৃতি দেশে গীতিকবিতার বিশেষ বিকাশ ঘটে।

অন্ত্য-মধ্যযুগে নানা অভিধায় গীতিকবিতার নিদর্শন মেলে। এসব গতিকবিতার সঙ্গে নৃত্য ও গীত হত। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকে বহু ভক্তিমূলক গীতিকবিতা পাওয়া গেছে। এই পর্বের বেশির ভাগ ইউরোপীয় গীতিকবিতাই পড়বার জন্য রচিত হয়েছে। গীতিকবিতার ঐশ্বর্যের যুগ হল—রেনেসাঁসের যুগ। ইটালির পেত্রার্ক প্রমুখ কবিরা সনেট কবিতায় বিশেষ দক্ষতা দেখান ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে Restoration যুগের মধ্যে প্রচুর গীতিকবিতা লিখিত হয়, যাঁদের মধ্যে আছেন স্পেনসার, শেকস্‌পীয়ার, জন মিলটন, ডন প্রভৃতি কবিরা।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে তেমন কোনো প্রতিভাধর গীতিকবি নেই। কিন্তু এই শতাব্দীর শেষে এবং রোমান্টিক যুগে গোটা ইউরোপ জুড়ে গীতিকবিতার ব্যাপক উদভাস লক্ষিত হয়। যেমন ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে বার্নস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ব্লেক, কোলরিজ, বাইরন, শেলী, কীটস, জার্মানীতে গ্যেটে, শিলার, ফ্রান্সে ভিক্তর উগো প্রমুখ, রাশিয়াতে পুশকিন। গোটা ঊনবিংশ শতকে এই কাব্যরূপটি বিশেষভাবে সমাদৃত হয়। ইংরেজ কবিদের মধ্যে টেনিসন, ব্রাউনিং, সুইনবার্ন, ম্যাথু আর্নল্ড, হপকিন্‌স। এছাড়া আছেন আরো অপ্রধান ও গৌণ কবি। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সের প্রুধোঁ বোদ্‌লেয়ার প্রভৃতিরা উল্লেখযোগ্য গীতিকবি। বোদ্‌লেয়ার সাঙ্কেতিক কবিতার অগ্রদূত। অন্য সাঙ্কেতিক কবি মালার্মে প্রভৃতি। ঊনবিংশ

শতাব্দীর শেষে এবং বিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে এবং আমেরিকার প্রায় সমস্ত প্রধান কবিই গীতিকবিতা রচনা করেছেন, যেমন ডব্লু. বি. য়েট্‌স্, এজরা পাউণ্ড, টি. এস. এলিয়ট, ডব্লু. এইচ. অডেন প্রভৃতি। জার্মান কবিদের মধ্যে আছেন রাইনের মরিয়া রিল্‌কে, হাইনরিশ হাইনে।

বাংলা গীতিকাব্যের উদ্ভব এবং তার স্রষ্টা কবিদের কথা এখানে অপরিহার্যভাবে এসে পড়ে। সাধারণ বিশ্বাস, পাশ্চাত্য গীতিকাব্যের প্রভাবেই বাংলা গীতিকবিতার সূচনা হয়। এই মত কতকাংশে সত্য হলেও সবটাই তা নয়। মধ্যযুগের বৈষ্ণব ও শাক্ত পদাবলীর ধারাটি এখানে বিশেষভাবেই কার্যকর হয়েছে। বিভিন্ন মঙ্গালকাব্যগুলিতে যেসব 'ধুয়া' গান রচিত ও প্রযুক্ত হয়েছে, তার প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত গীতিধারাও উল্লেখযোগ্য। পাশ্চাত্য গীতিকাব্যের প্রভাবের সঙ্গো দেশীয় সাহিত্যের এই দিকগুলিকে স্বীকার না করলে ইতিহাসকেও অস্বীকার করা হবে। মাইকেল মহাকাব্যের ধারার সূচনা করলেও সেই মহাকাব্যের মধ্যেই কোথাও কোথাও গীতিকবিতার আভাস ছিল। পরে আত্মভাবমুখ্য সনেট—'আত্মবিলাপ', 'বঙ্গাভূমির প্রতি' এবং কবিতার মাধ্যমে তিনি গীতিকাব্যের পূর্ণ প্রবর্তন করেন। বিহারীলাল চক্রবর্তীই বাংলা গীতিকবিতার বিশিষ্ট সুরটিকে প্রথম অনুধাবন করেন। রবীন্দ্রনাথ এই জন্যেই তাঁকে 'ভোরের পাখি' বলেছেন। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, দেবেন্দ্রনাথ সেন এঁরা হলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের কবি। শ্রেষ্ঠ গীতিকবি অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই যুগের অপর বিশেষত্ব হল, বাঙালি মহিলা কবিদলের গীতিকবিতা রচনা। গিরীন্দ্রমোহিনী দাসী, মানকুমারী বসু, বিনয়কুমার ধর, কামিনী রায় প্রমুখের নাম এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। গার্হস্থ্য জীবনকেই এই মহিলা কবিদল বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিলেন। পুরুষ কবিগণ নিসর্গজগৎ এবং রোমান্টিক জগৎকে ধীরে ধীরে গ্রহণ করে বিচিত্র বিষয়ের গীতিকবিতা রচনা করতে থাকেন। ছন্দ ও প্রকরণ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। ফলে বাংলা গীতিকবিতা বিশেষ উন্নত ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। গীতিকবিতার সঙ্গো বাঙালির গানও উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধিবাবুর টপ্পাগান, হরু ঠাকুর, রাম বসুর প্রমুখের কবিগান গীতিকবিতা রূপেও উৎকৃষ্ট। অন্যান্য কবিরাও তখন নানাভাবের গান লিখেছেন এবং সেগুলিও কাব্যগত দিকটিও ছিল সবিশেষ সমৃদ্ধ। এই কাব্যের দিকটির কথা মনে রেখেই এইসব গানকে বলা হত—'কাব্যগীতি'। বিংশ শতাব্দীতে বাংলা গীতিকাব্য অবিস্মরণীয় সাফল্য অর্জন করে। বাংলা নাট্যসাহিত্যকে আশ্রয় করেও গান-গীতিকবিতার বিকাশ ঘটেছে। বাংলা গীতিকবিতার পরিণতির দুটি দিকে : এক, গদ্যকবিতায়; দুই, কাব্যনাট্যে। দুটি ক্ষেত্রেই বাঙালি কবিরা উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আধুনিক কবিদের (পুরুষ এবং মহিলা) কথাও এখানে বলা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তাঁরাও উল্লেখযোগ্য প্রতিভা ও আন্তরিকতা নিয়ে এদিকে এগিয়ে এসেছেন।

৯১.৭ গীতিকবিতার শ্রেণিবিভাগ ঃ ভাবকেন্দ্রিক রূপকেন্দ্রিক

গীতিকবিতা নিয়ে কবিগণ নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছেন অবিরাম। এরই ফল হল—গীতিকবিতার বিবিধ Form বা রূপের আবিষ্কার ও প্রবর্তন। একই রাধা-কৃষ্ণ প্রণয়কে ভিত্তি করে অসংখ্য কবি পদাবলী রচনা করেছেন। কিন্তু কোনো-কোনো কবি তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে প্রকরণগত কিছু স্বাতন্ত্র্যেরও সৃষ্টি করেছেন। যেমন—চণ্ডীদাস। তিন পঙ্ক্তির তিনি একটি স্তবক রচনা করতেন, যা থাকত পদটির প্রারম্ভেই এবং সেটির মধ্যেই বক্তব্যের একটি প্রধান ভাব আত্মপ্রকাশ করত। Stylistics বা শৈলীবিজ্ঞানের দিক থেকে, কবির এই নিজস্বতাজ্ঞাপক স্তবকভঙ্গিকে বলা যায়—Stylometrics। বাঙলা গীতিকবিতার ক্ষেত্রে স্তবক রচনা বা বক্তব্যের বিন্যাসের সচেতনা একদিনেই বাঙালি কবিরা অর্জন বা আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়নি। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথই তাঁর কাব্যজীবনের প্রারম্ভেই এ বিষয়ে সচেতন হন সর্বপ্রথম। বিভিন্ন ভাবকেন্দ্রিক কবিতাকে (যেমন, প্রেম, প্রকৃতি, স্বদেশ ভক্তি ইত্যাদি ভাবমূলক কবিতা) এক-একটি বিশেষ Form বা রূপের মাধ্যমে প্রকাশ করা যেতে পারে। কোনো কোনো ভাব বা চিন্তা একটি বিশেষ রূপকল্প ব্যতীত যেন সার্থকভাবে প্রকাশিতই হতে পারে না। সেই ছন্দোগত এবং রূপগত বৈশিষ্ট্যটি ওই বিশেষ ভাবনার প্রকাশের জন্য অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য।

রূপের দিক থেকে এ-প্রসঙ্গে ওড, সনেট, গাথা ও পত্রকবিতার কথা বিশেষভাবে ওঠে। গ্রিক ওড, ল্যাটিন ওড, ইংরেজি ভাষার ওড,—সবেরই এক-একটি বিশেষ বিশেষ রীতি আছে। গ্রিক কবি পিন্ডার-ই তো একাধিক রীতির ওড লিখেছেন। 'কোর‍্যাল ওড' বা 'সনোডিক ওডে'র রচনা রীতি যেমন কিছুটা পৃথক তেমনি ভাবেরও বৈচিত্র্য আছে। একই ওড কবিতা বিভিন্ন ভাবের ক্ষেত্রে বিচিত্র রূপ নিতে পারে। তেমনি সনেট কবিতা। এই কাব্যরূপটিও বিভিন্ন ভাবনার প্রকাশক। তাই পেত্রার্কের সনেট ও শেক্সপীরীয় সনেট বিষয় ও ভাবের বিন্যাসে ভিন্ন, যেমন মাইকেলের সনেটের অমিত্রাক্ষর রবীন্দ্রনাথের সনেটে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। সমর সেন সনেটের ৭+৭=১৪ এই বিভাগে বিভক্ত করেছেন। জীবনানন্দ দাশ আবার সনেটের পঙ্ক্তিকে ১৮ বা ২২ অক্ষরে প্রসারিত করেছেন এবং এটি তাঁরা করেছেন ভাবের প্রকাশের চারুত্বের জন্য অর্থাৎ একই Form একাধিক ভাবের প্রকাশক হয়। সেই জন্য গীতিকবিতার শ্রেণিবিন্যাসের কালে কেবল ভাবের দিকটিকেই ভিত্তি না করে রূপের দিক থেকেও বিভাগ করা উচিত।

সব চেয়ে বিভ্রান্তিকর ব্যাপার 'গাথা'-র রূপটিকে নিয়ে ভারতীয় সাহিত্যে গাথার নানা পরিচয় দেখা যায়। গাথা কখনো বিশেষ এক ছন্দ, কখনো বা গ্রাম্যকবিতা। কখনো রাজাদের প্রশস্তি, কখনো বা কারোর বিবেচনায় 'ব্যালাড'। কখনো আকৃতিতে ক্ষুদ্র, কখনো দীর্ঘ। গাথায় কখনো পাই রোমান্টিক অনুভূতির প্রকাশ। Elegy বা শোকগীতিকে বা শোককাব্যকে 'শোকগাথা' ও বলো হয়েছে,—যেমন ভক্তিগীতিকে

বলো হয়েছে 'ভক্তিগাথা'। যদি শোকগীতি বা ভক্তিমূলক গীত ভাবকেন্দ্রিক ও Subjective Poetry হয়, তবে এসব ক্ষেত্রে গাথাকে কোন্ গুচ্ছের প্রকাশক বলা যাবে?

এই জন্যেই মন্ময় কবিতার শ্রেণিভাগ কালে ভাব এবং রূপ—বিভাজন দু'দিক থেকে করলে ঠিক হয়।

৯১.৮ ভাবকেন্দ্রিক গীতিকবিতা

নাম থেকেই বোঝা যায়, ভাবকেন্দ্রিক গীতিকবিতা (Sujective Poetry) হল সেই ধরনের গীতিকবিতা, যা কোনো ব্যক্তির নিজস্ব ভাবানুভুতিকে ভিত্তি করে প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ বিষয়ের চেয়ে বিষয়ীযেখানে বড় বস্তুর চেয়ে বস্তুকে (বিষয়কে) আশ্রয় করে গড়ে-ওঠা কোনো ব্যক্তিগত ভাবনাই যেখানে প্রধান হয়ে উঠে। এই ধরনের গীতিকবিতা হল ঃ

ক) কবির আত্মচিন্তামূলক (Reflective) গীতিকবিতা ঃ নিজেই নিজের আত্মদর্শনে যেখানে তিনি ব্যক্ত ও ব্যাখ্যা করেন। আত্মদর্শন বলেতে কিন্তু তাঁর সাহিত্যদর্শন বিষয়ক চিন্তা। 'চিত্রা'-র 'উর্বশী' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ যেমন তাঁর সৌন্দর্যদর্শন বা সৌন্দর্যবিষয়ক চিন্তাকে ব্যক্ত করেছিলেন।

খ) ভক্তিভাবমূলক (Devotional) গীতিকবিতা ঃ যেমন রামপ্রসাদের শাক্ত পদাবলী, রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলির রচনাগুলি। এই রচনাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর দেবতার প্রতি গানে গানে অঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

গ) স্বদেশপ্রেমমূলক (Patriotic) গীতিকবিতা ঃ এই শ্রেণীর কবিতার মাধ্যমে স্বাদেশিকতা সম্পর্কে কবির ভাবনা এবং বক্তব্য প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম' (এটিকে একটি ভক্তিগীতি রূপেও নেওয়া চলে), কিংবা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের গান এই পর্যায়ে পড়ে।

ঘ) প্রকৃতি বা নিসর্গকে আশ্রয় করে রচিত গীতিকবিতা ঃ এই ধরনের কবিতায় কেবল নিসর্গ জগতের বর্ণনাই থাকবে না। এক প্রান্তে নিসর্গজগৎ, আর অপরপ্রান্তে থাকবে কবির হৃদয়। এই দুই দিকের পারস্পরিক প্রভাবে ও সম্মিলনে গড়ে উঠবে এই শ্রেণীর কবিতা। এই শ্রেণীর কবিতার মাধ্যমেই কবিদের হৃদায়ানুভূতি ব্যাপ্তি ও গভীরতা লাভ করে। রোমান্টিক কবিদের পক্ষে নিসর্গজগৎ একটি বৃহৎ ভূমিকা নিয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বর্ষার মধ্যে 'মানবের রূপ' দেখেছেন। নিসর্গ একদিকে তাঁর হৃদয়ের কেন্দ্রে ছুটে এসেছে ঃ 'নিখিল তোমার এসেছে ছুটিয়া/ মোর মাঝে আজি পড়েছে লুটিয়া হে।' অপর দিকে তাঁর অন্তরের ভাব বাইরে নিসর্গ জগৎতে ছড়িয়ে পড়ছে ঃ 'ছিল পরানের অন্ধকারে / এল সে ভুবনের আলোকপারে।' এই পারস্পরিক প্রভাব সম্মিলন ব্যতীত খাটি নিসর্গ-কবিতার সৃষ্টি হয় না।

ঙ) প্রেমমূলক গীতিকবিতা ঃ প্রেমই যেখানে মুখ্য উপজীব্য, সেখানে প্রেমমূলক গীতিকবিতার

নিদর্শন—প্রেমের কবিতার এই সংজ্ঞা নিতান্ত স্থূল এবং সরল। প্রেমের কবিতা মিলন ও বিরহ—উভয়েরই হতে পারে বটে, তবে বিরহবোধক প্রেমের কবিতার স্থান উচ্চতর ক্ষেত্রে। বিরহের মাধ্যমে কবি তাঁর প্রেমের দর্শনকে ফুটিয়ে তোলেন। প্রেমের কবিতার দুটিদিক আছে ঃ এক,প্রেমের স্বরূপ ব্যাখ্যা, বৈষ্ণব কবিরা 'আক্ষেপানুরাগ' পর্যায়ে তা করেছেন। দুই, নরনারীর মন বা মানসিকতার তার প্রকাশ ও প্রতিক্রিয়ার পর্যালোচনা। অনেক প্রেমের কবিতায় কবির ব্যক্তিগত জীবনের ছাপও পড়ে।

চ) শোককাব্য (Elegy) ঃ ব্যক্তিগত কারণে বা অন্য কারণে কবি যখন শোকাহত হন, তাঁর সেই মর্ম বেদনা যখন কাব্যে প্রকাশিত হয় তখন তাকে বলে শোক কবিতা। এর মধ্যে বিশেষ এক করূণ সাময়িক দিক আছে। পৃথিবীর আদি শোককাব্য সম্ভবত বাল্মীকির অজ্ঞাতভাবে রচিত শ্লোক—ক্রৌঞ্চদ্বন্দ্ব বিয়োগে শোকার্ত কবির শ্লোক। কবি বিহারীলাল চক্রবর্ত্তীর 'বন্ধুবিয়োগ' (তুল্য ঃ Tennyson এর 'In Memoriam', অক্ষয়কুমার বড়ালের পত্নীবিয়োগ লিখিত 'এষা', কিংবা রবীন্দ্রনাথের 'স্মরণ'। হাসান-হোসেনের মৃত্যুতে যে স্মরণগীতি, যাকে 'জারিগণ' (জারি = প্রকাশ) বলে, তা ব্যক্তিকেন্দ্রিক নয়, ধর্মবিশ্বাস ভিত্তিক।

৯১.৯ রূপকেন্দ্রিক কবিতা

কেবল ভাবকে ভিত্তি করে যেমন গীতিকবিতার শ্রেণীবিভাগ করা যায়, তেমনি রূপ বা Formকেও ভিত্তি করে এই বিভাগ করা চলতে পারে। 'পত্ররীতি' বা 'গাথা' সম্পর্কে এখানে কিছু বক্তব্য আছে। গাথা যখন বিশেষ একটি রূপ, তখন তাকে রূপকেন্দ্রিক সাহিত্য বলা যাবে, কিন্তু সেই গাথাই যখন একটি বিশেষ আখ্যান, তখন তাকে Objective বা তণ্ময় কবিতার দলে ফেলব। বাংলা সাহিত্য গাথার যে বৈচিত্র্য দেখা যায়, তাতে গাথা একই সঙ্গো মন্ময় কবিতা হয়ে উঠেছে, যদিও তন্ময় কবিতা রূপেই এই পরিচয়—মূল পরিচয়। তেমনি Epistle বা পত্ররীতির কবিতা। মাইকেলের 'বীরাঙ্গানা' কাব্যের কোনো-কোনো রচনায় (যেমন, তারা, শূর্পনখা, উর্বশীর পত্রে) গীতিভাব ফুটে উঠেছে। এইজন্য 'পত্ররীতি'র মধ্যে Formটিই প্রধান হলেও, মন্ময় কবিতার দিকটি এর মধ্যেও ক্বচিৎ মেলে। অন্যান্য Formগুলির পরিচয় এই ঃ

ক) 'ওড' (Ode) কবিতা ঃ গ্রিকভাষায় 'ওড' কথাটিরও অর্থ 'গান'। সে দিক থেকে গীতি কবিতার সঙ্গো এর একটি বিশেষ সাযুজ্য আছে। এই বিশেষ কাব্যধারার উদ্ভব গ্রিস দেশে । প্রাচীন গ্রীসে গাইবার জন্যই এগুলি রচিত হত। তারপর তার একটি সাহিত্য রূপগত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় ঃ ওডের মধ্যে থাকত তিনটি স্তবক—স্ট্রোফি, অ্যান্টি-স্ট্রোফি এবং ইপোড। এই তিনটি মিলে একটি Triad । কোরাস অর্থাৎ যৌথ গীতিদলের গানের সঙ্গো তা যুক্ত। সাধারণত পনের জনের দল, তিন ভাগে বিভক্ত। বাঁ দিকের দল অ্যান্টি-স্ট্রোফি এবং শেষে মাঝখানের দল ইপোড অংশ গাইত। ভাষা ও ছন্দ সম্পর্কে রচয়িতাকে

সতর্ক থাকতে হত। এই ধরণের কোর‍্যাল ইডের বিখ্যাত কবি—পিণ্ডার। ধর্ম, নীতি, রূপক ও পৌরাণিক কাহিনীর মিশ্রণে এগুলি রচিত। বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সাফল্যে পিন্‌ডার এগুলি রচনা করেন। অতঃপর গ্রিস দেশে একক কণ্ঠে গাইবার জন্য প্রবর্তিত হয় 'মন্‌ডিক ওড'। এগুলি ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যক্তিগত ভাবনার প্রকাশক। কোর‍্যাল ওডের তুলনায় লিরিক বা মন্‌ডি ছিল অনেকটাই ধর্মনিরপেক্ষ এবং ব্যক্তিগত। আকারেও ছোট। কোর‍্যাল ওড (Choral Ode)-এর নানা রীতি ছিল। এক পিন্‌ডারই অন্তত আটটি রীতির ওড লিখেছিলেন। অতঃপর উল্লেখযোগ্য ল্যাতিন ভাষায় লেখা হোরাস-এর ওড। ল্যাতিন ভাষায় মনডিক্ ওডই বেশি লেখা হয়েছে। তাতে ধর্মনিরপেক্ষ ও ব্যক্তিগত ভাব আপেক্ষিক ভাবে অধিক। ফরাসি এবং ইংরেজি ভাষায় ওড লেখা শুরু হয় রেনেসাঁসের যুগে। ইংরেজ কবিদের মধ্যে রোমান্টিক যুগের অনেক কবিই (যথা ঃ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস) ওড কবিতা লিখেছেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থের Ode on Intimations of Immortality, শেলীর Ode to the West Wind. কীটস্-এর Ode to a Grecian Urn— সকলেরই পরিচিত।

বাঙালি কবিদের মধ্যে অনেকেই ওড কবিতা লিখেছেন। To-এর বাঙলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে 'প্রতি'। যেমন মাইকেলের 'বঙ্গভূমির প্রতি'। রঙ্গলালের 'পদ্মপুষ্পের প্রতি। Ode- এর প্রতিশব্দ 'স্তবকাব্য' বা 'স্তোত্র কবিতা'। তবে সর্বক্ষেত্রেই তা Ode-এর প্রতিশব্দ রূপে প্রযুক্ত হয়নি , কখনো Hymn-এর প্রতিশব্দ রূপেও ব্যবহৃত হয়েছে। Ode এবং Hymn- এর মধ্যে পার্থক্য আছে। তবে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত 'গঙ্গা-স্তোত্র' কবিতায় 'স্তোত্র' আখ্যাটিকে যেভাবে প্রয়োগ করেছেন,তাতে এটিকে Ode- এর বাঙলা প্রতিশব্দ রূপে গ্রহন করা যেতে পারে। বাঙালি কবিদের মধ্যে Ode আখ্যার প্রথম প্রয়োগ করেছেন মাইকেল। তিনি তাঁর চিঠিতে 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যের প্রসঙ্গে একাধিকবার Ode কথাটির ব্যবহার করেছেন। পাশ্চাত্য Ode নিয়ে সর্বাধিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন বাঙালি কবিদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। এই জন্য তাঁকে 'বাংলার পিনডার' বলা হত। শ্রেষ্ঠ ওড রচয়িতা—রবীন্দ্রনাথ।

খ) সনেট কবিতা ঃ ইতালীয় 'Sonetto' (অর্থ ঃ 'মৃদুশব্দ' বা 'গান') কথাটি থেকে 'Sonnet' কথাটি এসেছে। চৌদ্দটি পদ বা পঙ্‌তিতে এই ধরনের কবিতা সম্পূর্ণ হয় বলে মাইকেল এর বাঙলা করেছিলেন—'চতুর্দশপদী কবিতা'।

সনেট কবিতা সাধারণ ক্ষেত্রে চোদ্দ পঙ্‌ক্তিতে পূর্ণ হয়। তবে Curtal Sonnet (জেরার্ড ম্যানলে হপকিনস্ একে কেটে ছোট করে দশ পঙ্‌ক্তির করেন, স্তবক বিভাগ ছিল ৬+৪= ১০। কেটে ছোটো করেছিলেন বলেই তিনি এর নামকরণ করেন— Curtal Sonnet) -এর কথা ভিন্ন। সাধারভাবে Iambic Pentameter ছন্দে এগুলি রচিত (যেখানে Syllable) বা অক্ষর প্রথমে হবে শ্বাসাঘাত বিহীন এবং পরে থাকবে শ্বাসাঘাত যুক্ত, তাকে বলা হয় lamb । এই ছন্দের মধ্যে যখন পাঁচটি foot বা পর্ব থাকে, তখন হয় Iambic Pentameter। শ্বাসাঘাতের এই ধরনটি মানুষের কথাবার্তার খুব কাছাকাছি, এই জন্য

এই শ্বাসাঘাত রীতি সমগ্র ইউরোপে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে)। এর স্তবক বিভাগ ঃ ৮+৬ =১৪। প্রথম আট পঙ্‌তির স্তবককে বলে Octave (বাঙলায় 'অষ্টক'), পরবর্তী ছয় পঙ্‌ক্তির স্তবক—Sestet (বাঙলায় 'ষটক')। প্রথম আট পঙ্‌ক্তিকে আবার চার পঙ্‌ক্তির দুটি Quartrain-এর ভাগ করা হয়,তেমনি Sestet কেও দুটি Tercet -এ ভাগ করা যায়।

বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন কবি সনেটের নানা রীতির ও স্তবক বিভাগের প্রবর্তন করেন। সনেটের মধ্যে মূলত তিনটি রীতির পরিচয় দেখা যায় ঃ ১. পেত্রার্কীয় রীতি, যাতে অষ্টক (মিল ঃ কখখক কখখক) এবং ষটক (মিলঃ গঘক গঘক) থাকে,২. স্পেন্সারীয় সনেটে থাকে তিনটি Quatrain এবং একটি দ্বিপদী (Couplet) । মিল ঃ কখকখ গঘগঘ, গঘ গঘ, ঙঙ। ৩. শেকস্‌পীয়রীয় সনেটেও তিনটি Quatrain এবং একটি দ্বিপদী (Couplet) । মিল ঃ কখকখ, গঘগঘ, ঙচঙচ, ছছ। এর মধ্যে পেত্রার্কীয় বা ইতালীয় রূপটিই সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। অষ্টকে যে ভাব ও চিন্তা ষটকে তার পরিনতি ও পূর্ণতা।

ইংরেজ সাহিত্যে শেকস্‌পীয়রের সনেট বিশেষ বিখ্যাত। মিলটন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কীটস, শেলী—সকলেই নিজের নিজের রীতিতে সনেট লিখেছেন।

বাঙলায় মাইকেল প্রথম সনেট লেখেন । রবীন্দ্রনাথ অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে নানা ধরনের পরীক্ষা করেন এখানে। তবে চৌদ্দ অক্ষর এবং চৌদ্দ পঙ্‌ক্তির কোনো পরিবর্তন করেন নি । পরবর্তী কালের অনেক পঙ্‌ক্তির দৈর্ঘ্য যেমন বিস্তার ঘটিয়েছেন তেমনি অষ্টক-ষট্‌ক-এর বিভাগ লুপ্ত করে দিয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, মোহিতলাল মজুমদার প্রমুখ কবিরা যেমন সনেট লিখেছেন তেমনি পরবর্তীদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ, দিনেশ দাস, সমর সেন বসুপ্রমুখ কবিরাও সনেট লিখেছেন।

প্রমথ চৌধুরি বলেছিলেন, 'ভালোবাসি সনেটের কঠিন বন্ধন।' কিন্তু অনেক কবিই সে বন্ধনকে কাব্যস্ফূর্তির প্রতিবন্ধক বলেই মনে করেন।

৯১.১০ অনুশীলনী

(ক) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

(১) 'মন্ময় কবিতা বলতে কী বোঝেন?

(২) Lyric আখ্যাটির উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) Ode আখ্যাটির প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।

(৪) বৈষ্ণব এবং শাক্ত পদাবলীর কবিরা কোন্ অর্থে 'গীতিকবি'?

(৫) ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি মহিলা কবিদলের গীতি কাব্যর মূল আলোচ্য বিষয় কী ছিল?

(৬) রূপকেন্দ্রিক গীতিকবিতার দুটি রূপের উল্লেখ করুন।

(৭) প্রথম বাঙলা সনেট কবিতা কে লেখেন? 'সনেট'- এর বাঙলা প্রতিশব্দ তিনি কী দিয়েছিলেন?

(৮) ওয়ার্ড্‌সওয়ার্থ, শেলী এবং কীটসের Ode কবিতার একটি নাম উল্লেখ করুন।

(৯) 'Octave এবং 'Sestet' -এর গঠন প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করুন। এ দুটির বাঙলা প্রতিশব্দ কী?

(১০) শেকসপীয়রীয় সনেটের গঠনগত বৈশিষ্ট্য কী?

(খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ

(১) ভাবের দিক থেকে গীতিকবিতাকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?

(২) রবীন্দ্রনাথ গীতিকবিতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা ব্যক্ত করুন।

(৩) সনেট কবিতার সর্বাঙ্গীণ পরিচয় দিন।

(৪) পাশ্চাত্য গীতিকবিতার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরুন।

(৫) Ode কবিতার প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন।

৯১.১১ তন্ময় কবিতার শ্রেণিবিভাগ

Objective বা তন্ময় কবিতা হল — বিষয়নিষ্ঠ কবিতা। এখানে ব্যক্তি বা বিষয়ী নয়, বিষয়ই মুখ্য। তন্ময় কবিতা আকারে হ্রস্ব বা দীর্ঘ —দুই-ই হতে পারে। এগুলির উপস্থাপন রীতিও মন্ময় কবিতা থেকে ভিন্ন। মানুষের জীবনের অন্তরঙ্গ দিক এবং তার তীব্র তীক্ষ্ণ প্রভাব অপেক্ষা মানুষের জীবনের বহিরঙ্গীয় দিক তন্ময় কবিতায় প্রাধান্য অর্জন করে। যে সব বস্তুনিষ্ঠ কবিতা আকারে দীর্ঘ, সেগুলির মধ্যে আছে ঃ মহাকাব্য, আখ্যায়িকা কাব্য, গাথা কাব্য, ব্যালাড (বাংলায় গীতিকা)। এগুলির মধ্যে কাহিনী-আখ্যান-উপাখ্যান প্রভৃতি মুখ্য। 'ব্যালাড'কেও (Ballad) কেউ কেউ গাথা বলেছেন, যেমন, দীনেশচন্দ্র সেন। এসব কাব্য বা গাথা গাইবার জন্য নয়, — পড়বার বা আবৃত্তি করবার জন্য।

যেসব তন্ময় কবিতা আকারে হ্রস্ব, সেগুলির মধ্যে আছে ঃ পত্রকাব্য বা লিপিকবিতা (Epistee), রূপককাব্য (Allegory, রূপককাব্য অবশ্য দীর্ঘায়িত হতে পারে), ব্যঙ্গকবিতা (Satire,এও আকারে হ্রস্ব ও দীর্ঘ হতে পারে। Parody কবিতাকে এই দলে ফেলা যায়), নীতি কবিতা (Didactic), প্রশংসামূলক (Panegyric)। এছাড়া সমসাময়িক কোনো ঘটনাকে অবলম্বন করেও কবিতা লেখা হয়। সেগুলিকে বলা হয় Occasional Verse । আমাদের দেশে চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষে এ ধরনের কবিতা লেখা হয়, অবশ্য তা মুখ্যত গাইবার জন্যই। ব্যঙ্গ বা আমাদের জন্য কখনো কখনো কোনো বিশেষ উপভাষাতেও কবিতা

রচিত হয়. যা Dialect Verse নামে পরিচিত। আজকাল কেউ কেউ Serious বিষয় নিয়ে, এমন কি আত্মকেন্দ্রিক বিষয় নিয়ে উপভাষায় কবিতা লিখছেন,— আলোচ্য ক্ষেত্রে সেগুলিকে ব্যতিক্রম রূপে বিবেচনা করতে হবে।

৯১.১২ আখ্যানকাব্য ঃ সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ

ইংরাজিতে যাকে বলা হয় Narrative Poetry, বাংলায় তাকেই বলা যায়—আখ্যনকাব্য, কাহিনীকাব্য বা উপাখ্যান। Narrative কথাটি থেকে এর বর্ণনাগত দিকটি এবং 'আখ্যান' কথাটি থেকে এর ভাবগত দিকটি পরিস্ফুট হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই মিলিয়ে নিলে এর সম্পর্কে একটি ধারনা সহজেই গড়ে উঠে। মরিম উলসান Twentieth Century Narrative Poems-যে সঙ্কলন করেছেন, তার ভূমিকায় তিনি এই ধরনের রচনার পিছনে কাহিনী পরিবেশনের তাগিদটিকেই বড়ো করে দেখেছেন। এই কাহিনীকথনের বর্ণনাভঙ্গিটিকেই মনে রেখে Narrative কথাটি প্রযুক্ত হয়েছে। কিন্তু কোনো কোনো ক্ষেত্রে যে এর মধ্যে রোমান্টিকতার প্রভাব থাকতে পারে, কিংবা বর্ণনার মধ্যেও থাকতে পারে নানা বৈচিত্র্য— সে সম্পর্কে উলমান অবশ্য ততটা সচেতন নন।

প্রভাময়ী দেবী তাঁর 'বাংলা আখ্যায়িকা কাব্য, ১৮৫০-১৯০০ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত,১৯৫৮) নামে গবেষণা-গ্রন্থে আখ্যায়িকা কাব্যের গ্রহনযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। আখ্যান নাটক বা উপন্যাসেও থাকে। কিন্তু আখ্যান কাব্যের আখ্যানের উপস্থাপনার একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। নাটক-উপন্যাসের কাহিনী বাস্তব জগতের নানা বৈচিত্র্যের বর্ণনায় পূর্ণ। তার লক্ষ্য জীবনকে চিত্রিত করা। আর কাব্যে রচিত কাহিনীর লক্ষ্য হল, মানুষের জীবনের বাস্তব প্রকাশের পিছনে যে নিগূঢ় সত্য অদৃশ্য থেকেও নানা রূপে ও ভাবে জীবনকে সঙ্গীতে ও মাধুর্যে বেদনায় ও আবেগে অনুরঞ্জিত করে চলেছে, তাকে প্রকাশ করা। আখ্যানকাব্যও বাস্তবকে চিত্রিত করে কিন্তু তার মধ্যে বড় হয়ে ওঠে সৌন্দর্যের অনির্বচনীয়তা। এর মধ্যে যে কাহিনীটি থাকে, তা কবির ভাবলোকে দৃষ্ট সত্যের ছায়াময় প্রকাশ। আখ্যানকাব্যের সত্য হল — মানব আদর্শের সত্য নাটক বা উপন্যাসের কাহিনীর সত্য, মানবজীবনের সত্য। কাজেই, আখ্যানকাব্য এবং নাটক উপন্যাসের আখ্যানের উদ্দেশ্য ভিন্ন,দৃষ্টিকোণ ভিন্ন এবং উপায়ও ভিন্ন।

যেমন নাটক-উপন্যাসের আখ্যান থেকে আখ্যানকাব্যর আখ্যান ভিন্ন, তেমন গীতিকাব্য থেকেও এগুলো ভিন্ন। আখ্যানকাব্যগুলিতে কোনো একটি বিশেষ ঘটনাকে ভিত্তি করে মানবানুভূতির আবেগময় অভিব্যক্তি স্থান পায়। ফলে,গীতি কাব্যের-উচ্ছ্বাস এগুলিতে কিছু পরিমাণেই মেলে। কিন্তু গীতিকাব্যের যে মূল দিক কবির ব্যক্তি মানসের অনুভূতির প্রকাশ, তা এগুলিতে নেই।

গাথার-র সঙ্গে আখ্যানকাব্যের পার্থক্য আছে। আখ্যানকাব্যে থাকে ঘটনার বাহুল্য ও জটিলতা,

বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ ও সংঘাত—কিন্তু গাথাকাব্যে সেগুলি নেই। গাথাকাব্যে থাকে একটি বিশেষ আবেগ, অনুভূতি ও উচ্ছ্বাসের একমুখী তীব্রতা, কখনো বা কোনো আবেগ-উচ্ছ্বাসের সহজ-সরল প্রকাশ। এই ভাবে নাটক-উপন্যাসের আখ্যান, গীতিকাব্যের ব্যক্তিমানসের প্রকাশ এবং গাথাকাব্যের সহজ-সরল একমুখী উপস্থাপনা—এই তিন দিক থেকে বিচার করে আখ্যায়িকা কাব্যের সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে।

বিংশ শতকের ইংরেজি Narrative Poetry-এর উদাহরণ হিসেবে এই রচনাগুলির নাম উল্লেখ করা যায় ঃ

ওয়াল্টার ডে লা মেয়ার-এর Goliath (মাত্র ৫০ পঙ্‌ক্তির), সিসিল ড্যে লুইস-এর Flight to Australia (২০০ পঙ্‌ক্তির), W. B. Yeats-এর The Hour before Dawn (২২০ পঙ্‌ক্তি), টমাস হার্ডির-র 'The Choirmaster's Burial (৫০ পঙ্‌ক্তি)। আকারে বিশেষ বড় বলা চলে না। প্রাচুর্যের দিকে থেকে টমাস হার্ডির নাম উল্লেখযোগ্য। বাংলা আখ্যানকাব্যের সঙ্গে এগুলির পার্থক্য আছে। এগুলি মূলত 'গাথা'— কোনো-কোনোটির সঙ্গে Ballad নামও সংযুক্ত হয়েছে।

সেই তুলনায় বাংলা আখ্যানকাব্য আকারে দীর্ঘ, পুরোপুরি এক-একটি কাহিনীর রূপ দেওয়া হয়েছে। বাংলা আখ্যানকাব্যের এই প্রকার দৈর্ঘ্যের পিছনে সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বিশেষ জাতীয় কারণ অনুসন্ধান করেছেন। সুকুমার সেন মন্তব্য করেছেন, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের কাহিনীকাব্যগুলিতে ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলকাব্য' এবং ইসলামি রোমান্টিক সাহিত্যের প্রভাব ছিল। আর দ্বিতীয় ভাগের কাহিনীকাব্যগুলিতে রঙ্গলাল, মধুসূদন এবং সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব পড়েছে। কেউ কেউ ইংরেজি আখ্যায়িকার সরাসরি অনুসন্ধান করেছিলেন।

বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে মোট পাঁচটি ধারার সন্ধান মেলে ঃ

১. পৌরাণিক বা দেবদেবীর মাহাত্ম্য জ্ঞাপক আখ্যায়িকা কাব্য ঃ গিরিশচন্দ্র বসুর 'বালিবধ' (১৮৭৬), হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার' (১৮৭৫), হোমারের 'ইলিয়াড' অবলম্বনে লেখা আনন্দচন্দ্র মিত্রের 'হেলেনাকাব্য'।

২. জীবনীমূলক আখ্যায়িকা কাব্য ঃ নবীনচন্দ্র সেন 'খৃষ্ট' (১৮৯০), 'অমিতাভ' (১৮৯৫), 'অমৃতাভ' (১৯০০)। আনন্দচন্দ্র মিত্রের রাজা রামমোহনের জীবনী অবলম্বনে রচিত 'ভারতমঙ্গল' (১৮৯৪)।

৩. ইতিহাসাশ্রিত, দেশপ্রেমমূলক আখ্যায়িকা কাব্য ঃ রঙ্গলালের 'পদ্মিনীর উপাখ্যান' (১৮৫৮), নবীনচন্দ্র সেনের 'ক্লিওপেট্রা' (১৮৭৭), কালীপ্রসন্ন বন্দোপাধ্যায়ের 'লুক্রোশিয়া' (১৮৭৯), হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু কাব্য' (১৮৯৪)।

৪. আদিরসাত্মক, প্রণয়মূলক আখ্যায়িকা কাব্য ঃ মধুসূদন দাস ও কালীকৃষ্ম দাসের যৌথভাবে লেখা

'কামিনীকুমার' (১৮৫০), মহেশচন্দ্র মিত্রের 'লায়লা মজনু' (১৮৫৩), আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রমোদ-কামিনী কাব্য' (১৮১৭)।

৫. গাথা বা নবীন রোমান্টিক কাব্য ঃ অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর 'উদাসিনী' (১৮৭৪), রবীন্দ্রনাথের 'কবিকাহিনী' (১৮৭৮), 'বনফুল' (১৮৮০), ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'যোগেশ' (১৮৮১)।

সেই সব আখ্যানকাব্যগুলি বাঙালির কাছে খুব যে জনপ্রিয় হয়েছিল, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না।

৯১.১৩ অনুশীলনী

(ক) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১। Narrative Poetry কথাটির অর্থ কী?

২। আখ্যানকাব্য কথাটির মধ্যে কোন বিষয়টির প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়?

৩। নাটক-উপন্যাসের কাহিনীর সঙ্গে আখ্যানকাবের কাহিনীর পার্থক্য কোথায়?

৪। গাথা-র সঙ্গে আখ্যানকাব্যের পার্থক্য নিরুপণ কর।

৫। বাংলা গাথা বা রোমান্টিক আখ্যানের দুটি উদাহরণ দিন।

(খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ

১। আখ্যায়িকা কাব্যের সংজ্ঞা দিন।

২। ইংরেজি Narrative Poem-এর কিছু দৃষ্টান্ত দিন।

৩। বাংলা আখ্যায়িকা কাব্যের শ্রেণিবিভাগ করুন ও দৃষ্টান্ত দিন।

৯১.১৪ মহাকাব্য ঃ সংজ্ঞা, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ

ইংরেজিতে যাকে বলে Epic, প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রে তাকেই বলা হয়েছে 'মহাকাব্য'। কিন্তু Epic বলতে যে সংজ্ঞার্থ বোঝায়, মহাকাব্য ঠিক সেই অর্থেই প্রযুক্ত হয়নি। প্রাচীন ভারতীয় অলঙ্কার শাস্ত্র থেকে কেবল 'মহাকাব্য' অভিধাটিকেই গ্রহণ করা হয়েছে কিন্তু প্রযুক্ত হচ্ছে Epic অর্থে। কাজেই প্রথমেই এই ভিন্নতাটুকু লক্ষণীয়। তবে এপিক এবং মহাকাব্যের মধ্যে কোনো-কোনো দিক থেকে সাদৃশ্যও আছে।

গ্রিক 'epos' শব্দের অর্থ হল.—কথা, গাথা, গল্প, এর বিশেষণ—epikos। এই epikos থেকে

ইংরেজি epic শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। Epic কথাটির অর্থ হল ঃ কোনো দেশের ইতিহাস এবং ঐতিহ্যমূলক বীরচরিত্রাবলীর বীরত্বপূর্ণ কার্যাদির বিবরণ প্রদান করে রচিত দীর্ঘাকার বর্ণনামূলক কাব্য। এর রচনারীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ছিল ঃ ভাবে-ভাষায়-কল্পনায় চাই গাম্ভীর্য ও সমুন্নতি। অ্যারিস্টটল (৩৮৪-৩২২খ্রিঃ পূ.) তাঁর Poetics গ্রন্থে মহাকাব্যের (এপিকের) যে সংজ্ঞা দেন, তা এই ঃ এপিক হবে 'বর্ণনামূলক কাব্য', আগোগোড়া তাতে একই বিশেষ ছন্দের অনুসরণ থাকবে, তাতে থাকবে নাট্যগুণ। "It should have for its subject a single action, whole and complete, with a beginning, a middle, and an end. It will thus resemble a living organism in all its unity.........." বিষয়ের মধ্যে থাকতে হবে মহিমা। একদিকে যেমন থাকতে হবে 'great actions'. অপরদিকে তেমনি 'great issues' একটি জাতির উচ্চ আশা-কামনা এর মধ্যে ব্যক্ত, ফলে এর মধ্যে একটি 'জাতীয় তাৎপর্য' সংযুক্ত হয়ে যায়।

নব্য-ক্লাসিক যুগের সমালোচকগণ অ্যারিস্টটলের সংজ্ঞাকে বিশদতর করেছেন। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর সমালোচকগণ এপিককে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন ঃ(ক) প্রাথমিক (Primary), মৌখিক (Oral), এবং আদিস্তরের (Primitive)। এই স্তরের এপিক মৌখিক স্তর থেকে গৃহীত, এগুলি পরবর্তীকালে লিখিত রুপ লাভ করে। এগুলিকে Authentic epic-ও বলা হয়, অর্থাৎ খাঁটি epic বলতে এগুলিই বোঝায়। (খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের (Secondary) epic, যা Literary epic বা সাহিত্যিক মহাকাব্য নামে পরিচিত। এ একবারেই লিখিত রুপ প্রাপ্ত হয়। যেহেতু খাঁটি এপিক কাব্যের অনুকরণে এ ধরনের এপিক রচিত, সেজন্য এগুলিকে 'Imitative epic'-ও বলে। Authentic epic আবৃত্তির জন্য, Literary epic পড়বার জন্য রচিত হত। হোমারের মহাকাব্য Iiad এবং Odyssey প্রাচীন এথেন্স-এর অধিষ্ঠাত্রী দেবী Athena-র প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য, প্রতি চতুর্থ বৎসরে জাতীয় উৎসব—Panathenaea-তে আবৃত্তি করা হতো। Authentic epic-এর মধ্যে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ নেই, এখানে আছে চরিত্রের স্পষ্টতা ও স্বচ্ছতা, কোনো অন্তর্দ্বন্ধ বা জটিলতাও এখানে নেই। পাশ্চাত্য মত অনুসারে Authentic epic-এর মধ্যে থাকবে বন্দনা, নানা বিচিত্র বিষয়ের সমাহার, ইতিহাস-কিংবদন্তী-লোককথা, যাদুকর্ম ও অতিলৌকিক ঘটনাবলী, ভাবসমুন্নতিময় ভাষণ, কঠোর অভিযান, যুদ্ধাদির বর্ণনা, পরলোক ও নরকের দৃশ্যাবলী, নানা বযয়ে তালিকা, বিশিষ্ট ও বিশদ উপমা (এর ফলে 'মহাকাব্যিক উপমা', 'হোমারীয় উপমা' প্রভৃতির সৃষ্টি হয়েছে)।

মহাকাব্যের স্বরূপ ও বিশেষত্ব নিয়ে যে-সব বাঙালি উল্লেখযোগ্য ও মৌলিক আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের মতে, একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ তার সর্বপ্রকার অভিজ্ঞতা নিয়ে মহাকাব্যের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। প্রকৃত ও আদিস্তরের মহাকাব্য দেশের মধ্যে ছড়িয়ে-জড়িয়ে থাকে, তা কারো একা নিজের রচনা নয়,

কোনো মহাকবি পরে তাকে কাব্যের মধ্যে রূপ দিলে তা মহাকাব্য হয়ে ওঠে। কাজেই 'ব্যপকতা' মহাকাব্যের একটি লক্ষণ। তবে, 'বীররস'ই মহাকাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ—রবীন্দ্রনাথ তা মানেন না। রামায়ণে যুদ্ধাদির বর্ণনা যথেষ্টই আছে, কিন্তু "রামায়ণে যে রস সর্বাপেক্ষা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা বীররস নহে।" তবুও রামায়ণ একটি মহাকাব্য।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাকাব্যের লক্ষণ বলতে এক ধরনের 'সরলতা'কে বুঝেছিলেন। সরলতা' বলতে মানুষের জীবনের ও মনের অকৃত্রিমতা ও স্বাভাবিকতা। সভ্যতার বিবর্ধনের ফলে আমরা সেই 'সরলতা'কে হারিয়ে ফেলেছি, তা আর ফিরে পাওয়া যাবে না, অতএব মহাকাব্যের যুগ বিগত, মহাকাব্য আর রচিত হবে না। দ্বিতীয়ত, মহাকাব্যের মধ্যে থাকবে মূল কাহিনী ও নানা বিষয়ের অবতারণা।

প্রাচীন ভারতের আলঙ্কারিকেরা তাঁদের মতো করে মহাকাব্যের স্বরূপ লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। মহাকাব্য সম্পর্কে তাঁদের ধারণা পাশ্চাত্য 'এপিক' থেকে কিছু ভিন্ন। দণ্ডী তাঁর 'কাব্যাদর্শ' গ্রন্থে এবং বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্পণে' ভারতীয় মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করেছেন। দণ্ডী মহাকাব্যের যে লক্ষণগুলি নির্দেশ করেছিলেন, বিশ্বনাথ কবিরাজ তাকেই ভিত্তি করে প্রসঙ্গটিকে বিশদতর এবং আধুনিকতর করে এনেছেন (সাহিত্যদর্পণ ঃ ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ৩১৫-৩২৫ সংখ্যক শ্লোক)। তাঁর মতে ঃ মহাকাব্য—বেশি বড়ও নয়, বেশি ছোটও নয়, এমন আয়তনের আটটির অধিক সর্গে রচিত হবে। প্রতি সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের সূচনা থাকবে। দিনের বিভিন্ন সময়ের বর্ণনা থাকবে, প্রাকৃতিক জগতের নানাদিকের বর্ণনাও এতে দিতে হবে। মিলন, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, যুদ্ধযাত্রা, বিবাহ, মন্ত্রণা, প্রভৃতি যথার্থ ছন্দ-অলঙ্কার ব্যক্ত করতে হবে। কবি বা কাহিনীর নামে, নায়কের নামে, এমনকি অপ্রধান চরিত্রের নামেও মহাকাব্যের নামকরণ হতে পারে। প্রতি সর্গের মূল বর্ণিতব্য বিষয় অনুসারে সেই সর্গের নামকরণ হবে।

মহাকাব্যের নায়ক হবেন ধীরোদাত্ত দেবপুরুষ। ধীরোদাত্ত বলতে যিনি নিজের প্রশংসা করেন না, ক্ষমাবান, গম্ভীর, হর্ষ-শোকে অবিচলিত, যিনি দৃঢ়ব্রত। কিংবা, সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয়। শৃঙ্গার, বীর, শান্ত—এই তিনটি রসের মধ্যে একটিকে প্রধান রস রূপে দেখাতে হবে, অন্য রসগুলি এরই সহায়ক হবে। নাটকের মতো মহাকাব্যেও থাকবে সন্ধিবিভাগ (মুখ, প্রতিমুখ, গর্ভ, বিমর্ষ, উপসংহৃতি)। কাহিনীটি হবে ইতিহাস থেকে বা কোন ঐতিহ্যমূলক ধারা থেকে নেওয়া। ধর্ম, অর্থ, কাম মোক্ষ—এই চারটি বর্গই বর্ণিত হবে বটে, কিন্তু একটি বর্গ প্রাধান্য অর্জন করবে। নমস্কার, আশীর্বাদ অথবা বস্তু নির্দেশ করে মহাকাব্য শুরু হবে। কখনো থাকবে খলচরিত্রের নিন্দা বা সাধুচরিত্রের গুণগান। এক-একটি সর্গ এক-একটি ছন্দে রচিত হবে এবং সর্গ-শেষে ছন্দের পরিবর্তন করে অন্য ছন্দে শ্লোক রচনা করতে হবে।

এই বিস্তৃত নির্দেশ থেকে প্রাচ্য মহাকাব্য সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় এবং পাশ্চাত্য এপিকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য দুইই লক্ষ্য করা যায়।

মহাকাব্য-এপিকের যে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে, সেই অনুযায়ী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সাহিত্য থেকে তার উদাহরণও মেলে।

(ক) প্রাথমিক বা আদিস্তরের মহাকাব্য বা Authentic Epic : এই স্তরের মহাকাব্য বলতে হোমারের Iliad এবং Odyssey (খ্রি. পূ. ১০০০), Gilgamesh, Beowulf, Elder Edda-র কোনো পর্যায়, রামায়ণ-মহাভারত ইত্যাদিকে বোঝায়। রবীন্দ্রনাথ কেবল চারটি রচনাকে (ইলিয়াড, ওডিসি এবং রামায়ণ-মহাভারত) Authentic epic বলে মানেন। 'গিলগামেশ্' সুমেরীয় দেশের মহাকাব্য (খ্রি.পূ.৩০০০)। গিলগামেশ্ সে দেশের রাজার নাম,—Eukidu নামে এক আধা পশু আধা মানুষের সঙ্গে নানা স্থানে তাঁর দুঃসাহসিক অভিযানের কথা এতে বর্ণিত হয়েছে। মৌখিক ঐতিহ্যের এটি একটি নিদর্শন। বারো খণ্ডে এটি সম্পূর্ণ।

(খ) Literary Epic বা সাহিত্যিক মহাকাব্য ঃ এই স্তরের উল্লেখযোগ্য মহাকাব্য হল—ভার্জিল এর ঈণিড্ Aeneid; Lucan-এর Pharsalia, অজ্ঞাতনামা কবির Song of Roland, Camoens-এর Os Lusiades, তাসো-র Gerusalemme Liferata, মিলটন-এর Paradise Lost, ভিক্তর উগো-র La Legende des siecles। মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' এবং হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বৃত্রসংহার কাব্য'কে এই বর্গের অন্তর্ভুক্ত করা যায়।

৯১.১৫ সারাংশ

'কবিতা' মানবহৃদয়ের এক শাশ্বত প্রকাশ। এর আছে নানা ভাবগত বৈচিত্র্য, রূপগত প্রকরণ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কবিদল আজও কবিতার রূপ ও স্বরূপ নিয়ে নানান্‌ভাবে পরীক্ষা করে চলেছেন অবিরাম। কবিতার ভাব ও প্রকরণকে কখনো কোনো কবি নিজেই মতো করে আবিষ্কার কারন, কখনো বা অন্য কোনো কবির কাছ থেকে তা অর্জন করেন।

কবিতা হল কবির 'কল্পনা', তাঁর প্রজ্ঞা-অভিজ্ঞতার রূপ, তাঁর নির্মাণের নিদর্শন। তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতার তথ্যরূপ নয়, 'সত্য' রূপ। এই ভাবনা অনুসারে গড়ে ওঠে একটি কবিতার শব্দচয়নরীতি, ছন্দোনির্মাণ, উপমা, চিত্রকল্প ও অন্ত্যমিল। কবিতার আক্ষরিক দিককে পেরিয়ে নিয়ে কবিকে পৌঁছতে হবে এক ব্যঞ্জনাময় ক্ষেত্রে। কবির নিজের উপলব্ধি ও অনুভূতিকে পাঠকের মনের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়াই কবির মূল উদ্দেশ্য।

কবির ব্যক্তিত্ব, মানস ও গভীর উপলব্ধি যেখানে বড়ো হয়ে ওঠে, সেখানে কবিতা হয় ' মন্ময় কবিতা' (Subjective Poetry), যেখানে বস্তু ও বিষয়টিই প্রধান হয়, সেখানে কবিতা 'তন্ময় কবিতা' (Objective Poetry)। মন্ময় কবিতার মধ্যে সঙ্গীতের একটি ভাব আছে, একদা সেগুলি বীণাযন্ত্রযোগে গাওয়াও হত, তাই তার নাম 'গীতিকবিতা'। এগুলি আকারে ছোটো, কিন্তু প্রকারে গভীর। নিসর্গজগৎ

ও রোমাণ্টিক অনুভূতি এর মূল দিক। গীতিকবিতা নানা ভাবের হতে পারে ঃ কবির আত্মচিন্তামূলক, ভক্তিভাবমূলক, স্বদেশপ্রেমমূলক, নিসর্গাশ্রিত, প্রেমমূলক, শোকবিষয়ক। তেমনি গীতিকবিতার নানা রূপও আছে ঃ 'ওড' রীতি, পত্ররীতি, সনেটরীতির গীতিকবিতা।

তন্ময় কবিতারও নানা বিষয়-ভাব রীতি আছে। যেমন, মহাকাব্য, আখ্যায়িকাকাব্য, গাথাকাব্য ও ব্যালাডও (বাঙলায় 'গীতিকা')। এছাড়া, রূপককাব্য, ব্যঙ্গকবিতা, নীতিমূলক কবিতা, প্রশস্তিমূলক কবিতা। 'আখ্যানকাব্য' এই নাম থেকেই বোঝা যায়, কাব্যের আকারে একটি আখ্যানকে এর মধ্যে রূপ দেওয়া হয়। Narration বা বর্ণনা এর প্রধান দিক। বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়েই 'আখ্যানকাব্য' রচিত হয়।

'মহাকাব্য' ক্লাসিকরীতির কাব্য। মহাকাব্য দুই ধরনের ঃ একটি প্রাথমিক ও আদিস্তরের। অপরটি সহিত্যিক মহাকাব্য। প্রথম স্তরের উদাহরণ ঃ রামায়ণ-মহাভারত, ইলিয়াড-ওডিসি। দ্বিতীয় স্তরের উদাহরণ ঃ জন মিলটনের 'প্যারাডাইস লস্ট' বা মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'। মহাকাব্য সম্পর্কে ভারতবর্ষীয় চিন্তা এবং পাশ্চাত্য চিন্তার মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। প্রথম স্তরের মহাকাব্যের মধ্যে একটি দেশ-জাতি-সমাজের পূর্ণ পরিচয় ধরা পড়ে।

৯১.১৬ অনুশীলনী

(ক) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১। 'Epic' অভিধাটির উদ্ভব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

২। 'Epic' এর দুটি মূল বিভাগ কী কী?

৩। বিশ্বনাথের কোন্ গ্রন্থে কোন্ পরিচ্ছেদে এবং কোন্ শ্লোক থেকে কত-সংখ্যক শ্লোকে মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশিত হয়েছে?

৪। রবীন্দ্রনাথের মতে কোন্ চারটি মহাকাব্য Authentic epic?

৫। দুটি বাংলা Literary epic-এর নামোল্লেখ করুন।

(খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ

১। পাশ্চাত্যের সাহিত্য তাত্ত্বিকদের অনুসরণে এপিক বা মহাকাব্যের লক্ষণ নিরূপণ করুন।

২। বিশ্বনাথ কবিরাজের অনুসরণে ভারতীয় মহাকাব্যের লক্ষণ নির্দেশ করুন।

৩। Authentic epic এবং Literary epic-এর পার্থক্য নিরূপণ করুন।

৪। মহাকাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মতামত ব্যক্ত করুন।

৯১.১৭ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঃ প্রাচীন সাহিত্য।

২. অতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ কাব্যজিজ্ঞাসা।

৩. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ঃ কাব্যালোক।

৪. শ্রীশচন্দ্র দাশ ঃ সাহিত্য-সন্দর্শন।

৫. জীবেন্দ্র সিংহ রায় ঃ আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা।

৬. বঙ্কিমচন্দ্র ঃ বিবিধ প্রসঙ্গ (‘গীতিকাব্য’ প্রবন্ধ)।

৭. সুকুমার সেন ঃ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।

৮. প্রভাময়ী দেবী ঃ বাংলা আখ্যারিকা কাব্য।

৯. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ঃ নানাকথা।

১০. সাধনকুমার ভট্টাচার্য ঃ মহাকাব্য জিজ্ঞাসা।

১১. কুন্তল চট্টোপাধ্যায় : সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।

১২. J. A. Cudden : A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.

১৩. Wollman : Twentieth Century Narrative Poems.

১৪. W. J. Long : English Literature, Its HIstory and Its significance.

১৫. Hudson : An Introduction to the Study of Literature.

১৬. উজ্জ্বলকুমার মজুমদার ঃ সাহিত্যের রূপরীতি।

১৭ : A Glossary of Literary Terms : M H ABHRMS.

একক ৯২ ❑ নাটক

গঠন

৯২.১ উদ্দেশ্য
৯২.২ প্রস্তাবনা
৯২.৩ নাটকের সংজ্ঞা, উদ্ভব, প্রকারভেদ, উপকরণ
৯২.৪ ট্র্যাজেডি নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ
৯২.৫ অনুশীলনী
৯২.৬ কমেডি নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ
৯২.৭ প্রহসন নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ
৯২.৮ অনুশীলনী
৯২.৯ পৌরাণিক নাটক, উদাহরণ
৯২.১০ ঐতিহাসিক নাটক, উদাহরণ
৯২.১১ সামাজিক নাটক, উদাহরণ
৯২.১২ অনুশীলনী
৯২.১৩ সাংকেতিক নাটক, উদাহরণ
৯২.১৪ অনুশীলনী
৯২.১৫ একাংক নাটক, উদাহরণ
৯২.১৬ সারাংশ
৯২.১৭ অনুশীলনী
৯২.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

৯২.১ উদ্দেশ্য

বিশ্বসাহিত্যের একটি প্রাচীন শাখা হল—নাটক। এমন দেশ নেই, যেখানে নাটকের প্রচলন নেই। নানাদেশে নানাভাবে নাটকের উদ্ভব ঘটেছে এবং তার নানা রূপ-রূপান্তর দেখা দিয়েছে। নাটকের উপস্থাপনাও নানা রকমের। নাটকের সেই নানা বিচিত্র রূপও বিষয়ের দিকটি তুলে ধরাই এই

এককটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এটি পড়লে নাটকের বিচিত্র ভাব ও প্রকরণ সম্পর্কে আপনি অবহিত হতে পারবেন।

৯২.২ প্রস্তাবনা

মানুষের জীবন ও মনের বিচিত্র দিককে অবলম্বন করে নাটক রচিত হয়। শুধু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবন নয়, নাটকের মধ্য দিয়েই একটি জাতির পরিচয় ধরা পড়ে। কারণ সেই দেশ ও জাতির নিজস্ব পরিচয় নিবিড় ও ঘনিষ্ঠভাবে নাটকে প্রতিফলিত হয়। নাটককে তাই বলা হয়—একটি জাতির দর্পণ। আদিযুগে মানুষের নানা আনুষ্ঠানিক কৃত্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা ছিল। সেইসব অনুষ্ঠানের সময় যে-সব নৃত্য-গীত হতো, তারই ক্রমবিকশিত রুপ হলো নাটক। কালক্রমে সেই সব অনুষ্ঠানের পরিচয় লুপ্ত হয়ে গেছে, তবু ক্বচিৎ কখনো কোনো-কোনো নাটকের মধ্যে তার শেষ রেশ খুঁজে পাওয়া যায়। তারপর একদিন নাটক অনুষ্ঠান-মুক্ত হয়ে হলো—অনানুষ্ঠানিক। তখন মানুষের মন, জীবন, সমাজ ইত্যাদির কথা বিস্তৃত ও বিশদরুপে প্রতিফলিত হতে লাগল। নাটকের নানা প্রকরণ দেখা দিল। ট্র্যাজেডি-কমেডি-প্রহসন প্রভৃতি রুপে নাটকের বিকাশ হলো। কখনো পঞ্চাংক, কখনো তিন অংকে, কখনো একাংক রুপে তা উপস্থাপিত হতে লাগল। নৃত্য ও গীত তো আদিকাল থেকেই ছিল, কিন্তু নাটকের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই নৃত্য-গীতের তাৎপর্যময় প্রয়োগ শুরু হয়। সংলাপ হল নাটকের মূল উপকরণ। সংলাপ ছাড়া নাটকের অস্তিত্বই কল্পনা করা যায় না। সেই সংলাপের মধ্যেও কালে কালে নানা বিবর্তন দেখা গেছে। কখনো-গানেই সংলাপ, কখনো দীর্ঘ সংলাপ, কখনো উপভাষায় রচিত সংলাপ, কখনো মিশ্রভাষায় রচিত সংলাপ। প্রথমদিকে চরিত্র খুব একটা প্রাধান্য পেত না। চরিত্রের চেয়ে ঘটনাই প্রাধান্য পেত বেশি। তারপর চরিত্র তার আপন প্রাধান্য অর্জন করেছে। চরিত্রের সংখ্যা বেড়েছে, নারী-পুরুষ-শিশু-বৃদ্ধ-জীবনের সব পর্যায়ের মানুষ ক্রমে-ক্রমে নাটকে সম্মান পেয়েছে। অর্থাৎ জীবনকে পূর্ণরূপে প্রতিফলিত করবার চেষ্টা হয়েছে। চরিত্রের মধ্যে দেখা গেল—নায়ক চরিত্র, প্রতিনায়ক চরিত্র, নায়িকা-উপনায়িকা চরিত্রের বিভিন্নতা। তখন সংলাপও ভিন্ন হয়ে গেল। একক সংলাপ, স্বগতোক্তি, জনান্তিক উক্তি ইত্যাদি। কাহিনীতেও মূল একটি কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর সৃষ্টি হল। প্রথম যুগে রুপসজ্জা এবং দৃশ্যসজ্জা—কোনোটাই ছিল না। সাধারণ বেশবাসেই নাট্যাভিনয় করা হত। কালক্রমে বেশবাসের ভিন্নতা ও প্রয়োজনীতা বিশেষভাবে অনুভুত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দৃশ্যসজ্জা, যবনিকা, ইত্যাদির প্রবর্তন ঘটেছে। নাট্যকারেরা নতুন নতুন ভাব ও রুপের নাটক লিখতে শুরু করেছেন। সেই সঙ্গে অভিনয়রীতিরও উৎকর্ষ ঘটতে থাকে। গ্রিস দেশ ও ভারতবর্ষে নাটকের বিশেষ প্রচলন ঘটে। গ্রিস দেশের অ্যারিস্টটল এবং ভারতবর্ষের ভরতমুনি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেন। নাটকের এই বিচিত্র কথাই অতঃপর বিস্তৃতভাবে আলোচিত হচ্ছে।

৯২.৩ নাটকের সংজ্ঞা ঃ উদ্ভব, প্রকারভেদ ঃ উপকরণ

সংস্কৃতে নাটককে 'দৃশ্যকাব্য' বলা হয়েছে। দৃশ্য ও কাব্য এই দুটি প্রসঙ্গাকে ভিন্নভাবে বিচার করে এ দুটির মধ্যে ঐক্যবন্ধ লক্ষ্য করলে বিষয়টি স্বচ্ছ হয়ে যায়। 'দৃশ্য' বলতে চোখের সম্মুখে অভিনয় করে যা দেখানো হয়। অভিনবগুপ্ত বলেছেন, 'কাব্য বস্তুত নাটকই'। নাটক— শ্রব্যকাব্য। যাদের মন নির্মল দর্পণের মতো, চিত্ত ক্রোধ-মোহ মুক্ত, তাঁরা নাটক শুনলেও নাটক চোখে দেখার মতো তার রস পান। নাট্যরস ও কাব্যরস অভিন্ন। যাদের সে সামর্থ্য নেই, তাদের জন্যই অভিনয় ও নৃত্য-গীতের ব্যবস্থা করতে হয়। অভিনয়ের উদ্দেশ্য হলো—মনের প্রকৃত ভাবকে ব্যক্ত করা। সে জন্য নানা প্রকার সাজ-সজ্জা, অঙ্গভঙ্গির ও অনুকরণের আশ্রয় নেওয়া হয়ে থাকে। অ্যারিস্টটল বলেছেন, Mime বা অনুকরণ মানুষের এক স্বাভাবিক বৃত্তি এবং Mimesis বা অনুকৃতি থেকে অভিনয়ের উদ্ভব হয়েছে। সংস্কৃতে অভিনয়ের সামগ্রী বলতে চারটি : বাচিক (বাক্যের দ্বারা বিরচিত অভিনয়), আঙ্গিক (বিভিন্ন অঙ্গা-প্রত্যঙ্গা দিয়ে অভিনয়), আহার্য (এর অর্থ ঃ 'আহরণীয়', 'কৃত্রিম'। অভিনয়কালের শরীরকে সৌষ্ঠবশালী ও সৌন্দর্যযুক্ত করবার জন্য যে সব আভরণ গ্রহণ করা হয়, তাই-ই আহার্যাভিনয়ের অন্তর্ভূক্ত), এবং সাত্ত্বিক (যে ভাব চিত্তের একাগ্রতা উৎপাদনে সক্ষম হয়, তাই হল সাত্ত্বিক ভাব)।

অভিনয়ের সঙ্গো নৃত্য ও গীতের অবিচ্ছেদ্য যোগ আছে। গবেষকদের অনুমান, নৃত্য-গীত থেকেই নাটকের উৎপত্তি হয়েছে। সংস্কৃত 'নৃৎ' ধাতু থেকে 'নাটক' কথাটি এসেছে। সংস্কৃতে 'নাট্য' এবং 'নাটক' কথা দুটির মধ্যে যে পার্থক্য আছে, বাংলায় তা মেনে চলা হয় না। সংস্কৃতে দশবিধ রূপকের কথা বলা হয়েছে। 'রূপক' বলতে ইংরেজিতে যাকে বলে Drama, তাই হল 'নাট্য'। এ কিন্তু 'নাটক' নয়। নাটক হল, দশ প্রকার রূপকের "এক বিশিষ্ট প্রকার রূপক"। 'কাব্যালোক' বইতে ড. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত তাই মন্তব্য করেছেন, "বাংলায় রূপক অর্থে নাট্য শব্দের সঙ্গো ভুল নাটক শব্দ চলিয়া গিয়াছে।"

বাংলায় 'নাট' কথাটির অর্থ একাধিক—নৃত্য, অভিনয়, রঙ্গা-তামাশা। মধ্যযুগের বঙ্গীয় কবিরা এইসব নানা অর্থে 'নাট' শব্দটির প্রয়োগ করেছেন। চর্যাপদে 'বুদ্ধনাটক' এবং নটপেটিকার উল্লেখ মেলে ধর্মমঙ্গালে পাই : "সাতকাণ্ড রামায়ণ নাচিল নাটকে।" অর্থাৎ নৃত্যের মাধ্যমে রামায়ণ নাটক পরিবেশিত হলো। 'নাটমন্দির' কথাটির অর্থ : "দেবমন্দিরের সমীপস্থ নৃত্যগীতোৎসবের মণ্ডপ।" সহজেই বোঝা যায়, তখন নৃত্যগীতাদি হতো দেব-মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গাণে। সেই প্রাঙ্গাণে দেবতাদেরই কর্মক্রিয়া, যা 'লীলা' নামে খ্যাত, তাই প্রদর্শিত হতো। প্রদর্শিত হত পুতুল-নাটের মাধ্যমে। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন নাটকের প্রস্তাবক বা 'সূত্রধার' তা পুতুল-নাচের সূত্রধার থেকেই এসেছে। দেবতাদের কর্মক্রিয়া বা 'লীলা' প্রদর্শিত হতো বলেই, ভারতের কোনো-কোনো স্থানে নাটকের নামান্তর 'লীলা' আখ্যাটি

প্রচলিত আছে। বাঙলাতেও 'লীলা' নাটকের বিশেষ অংশ বোঝাতে প্রচলিত আছে (যেমন : 'দানলীলা', 'নৌকালীলা')।

প্রাচীনকালে মানুষের নানা পার্থিব প্রয়োজনে, নানাপ্রকার আচার-অনুষ্ঠান-অভিচার-যাদুকর্ম-পূজার আয়োজন করতে হত। কোনো আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যে থাকত আভিনায়িক দিক। এই অভিনয়মূলক অনুষ্ঠানগুলি থেকেই নাটকের উদ্ভব হয়েছে। এই সব অভিনয়ের কালে নৃত্যগীতাদিও হত। গ্রিস দেশের দিওন্যিসুস (Dionysus) দেবতার পূজা-উৎসবের কালে এক বিশেষ ধরনের গান হত, তা ডিথিরাম্ব (Dthyramb) গান নামে পরিচিত। এই পূজা ও সঙ্গীত থেকেই কালক্রমে গ্রিক ট্র্যাজেডি নাটকের উদ্ভব ঘটেছে, যদিও কেউ কেউ বলেন, পূর্বপুরুষের প্রতি পূজা নিবেদনের পরবর্তী ফলরূপেই ট্র্যাজেডির উদ্ভব হয়েছে।

যাই হোক ভক্তিমূলক-পৌরাণিক বিষয় বা সাধু-সন্তদের অলৌকিক কর্মাবলীর বিবরণমূলক বিষয় প্রথম যুগের নাটকের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। কমেডি নাটক প্রথম যুগে প্রাধান্য অর্জন করেনি। প্রথম দিকে কমেডি ছিল আসলে গান, — হাস্যরসাত্মক গান। অ্যারিস্টটল কমেডি নিয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নি, তাঁর মতে ট্র্যাজেডি যেমন উচ্চ-অভিজাত মানুষের নাটক কমেডি তেমনি অনভিজাত স্তরের মানুষের জন্য। নিজস্ব বা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সাহিত্য শাখা রূপে উদ্ভূত হবার পূর্বে কমেডি অন্যান্য নাটকে, দুই অঙ্কের মধ্যবর্তী ছোটো নাটক (অর্থাৎ Interlude) রূপে অভিনীত হত।

ভারতীয় নাটকের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন। Dramaturgy অর্থাৎ নাট্যতত্ত্ব নিয়ে এখানে ভরতমুনি লিখেছেন 'নাট্যশাস্ত্র', নন্দিকেশ্বর লিখেছেন 'অভিনয়দর্পণ'। ভারতীয় নাটকের মূল লক্ষ্য কিন্তু 'রস'। এখানে ট্র্যাজেডি নাটক নেই। নাটকের সৃষ্টিকর্তারূপে ব্রহ্মার নাম করা হয়ে থাকে। তিনি ঋগবেদ থেকে পাঠ্য অংশ, সামবেদ থেকে সঙ্গীত, যজুর্বেদ থেকে অভিনয় এবং অর্থবেদ থেকে রস সংগ্রহ করে নাটকের সৃষ্টি করেন। নাটককে তাই বলা হয়—'পঞ্চম বেদ'। দৈত্যরা নাটক অভিনয়ের তীব্র বিরোধিতা করলে তাদের উপদ্রব থেকে রক্ষা করবার জন্য ব্রহ্মা বিশ্বকর্মাকে নাট্যগৃহ প্রস্তুত করে দিতে বলেন। দৈত্যরা মনে করত, নাটক তাদের পক্ষে অপমানজনক। তার উত্তরে ব্রহ্মা বলেছিলেন, সকল শাস্ত্রের সার সংগ্রহ করে নাটক সৃষ্ট হয়েছে। নাটক সকলের জন্য। এইজন্য নাটক আরম্ভের পূর্বে 'রঙ্গাপূজা' করে নিতে হবে। ব্রহ্মা বলেছেন, নাটকে দেবগণের, রাজমণ্ডলের, ব্রহ্মর্ষিগণের থাকবে, তাদের সুখ-দুঃখের দিকগুলির অনুকরণ করে অভিনয় করলে তবেই তাকে 'নাট্য' বলা যাবে।

বেদের অনেক অংশ কথোপকথনে রচিত। যেমন—পুরুরবা-উর্বশীর কথোপকথন। এই সব অংশগুলিই নৃত্য-গীত সহযোগে অভিনয় করতে গিয়ে নাটকের উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেক গবেষক অনুমান করেন।

নাটকের প্রকারভেদ নানাপ্রকার দৃষ্টিকোণ থেকে করা যায়। বর্তমান ক্ষেত্রে নাটকের রূপগত ও ভাবগত—এই দুই দিক থেকে করছি। রূপের দিক থেকে নাটক পঞ্চাঙ্ক, তিনাঙ্ক ও একাঙ্ক হতে পারে। বাংলা নাটকের প্রথম যুগে সঙ্গীতপ্রান এক ধরনের পালার প্রচলন হয়, যাকে বলা যায় অপেরা বা গীতাভিনয়। নৃত্য ও গীত নাটকের দুই প্রধান উপকরণ। পরবর্তীকালে গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্যের উদ্ভব হয় এই দুটি উপকরণকে ভিত্তি করে। নকশা ও প্রহসন নাটকের প্রকরণ অন্যান্য 'রেগুলার' বা 'নিয়মিত' নাটক থেকে ভিন্ন। কাজেই নাট্যশিল্প এদের স্থান ও মান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে, ভাবের দিকের সঙ্গে রূপ-প্রকরণগত দিকটিকেও উপেক্ষা করা যায় না। তেমনি—শ্রুতিনাটক। এতে রঙ্গমঞ্চের যেমন প্রয়োজনীয়তা তেমনি, অনেক সময়েই পাত্র-পাত্রীরা থাকে অদৃশ্য। আজকাল অবশ্য পাত্র-পাত্রীরা দৃশ্য থেকেই নাটক পাঠ করে শোনাচ্ছেন, পাঠকালে অভিনয়ও করছেন, থাকছে আলো ও ধ্বনির ব্যবস্থা। মূকাভিনয়, মুখোস-নাটক প্রভৃতি এক-একটি বিশিষ্ট প্রকরণ।

ভাবগত দিক থেকে নাটকের বিভাগ সহজেই করা যায় ঃ ভক্তিমূলক নাটক, পৌরাণিক নাটক, ঐতিহাসিক, সামাজিক নাটক, ট্র্যাজেডি ও কমেডি নাটক রূপক-সাংকেতিক তত্ত্বনাটক, চরিতনাটক বা জীবনীমূলক নাটক, অ্যাবসার্ড নাটক। ট্র্যাজেডির সঙ্গে ট্র্যাজি-কমেডি নাটকেরও নাম করা যায়, যেমন কমেডির সঙ্গে প্রহসন বা Farce-এর নাম করা যায়। 'অতিনাটক' যদি পারিভাষিক অর্থে ধরি (অর্থাৎ পরিমাণে বেশি নয়), আমাদের বাঙলা সাহিত্যে তা নেই। এখানে 'অতিনাটক' বলতে তাকেই বুঝিয়ে থাকে, নাটকীয়তার পরিমাণ যেখানে অযৌক্তিক পরিমাণে অধিক।

নাটকের উপকরণ বলতে—কাহিনী, ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপ। কাহিনীর সঙ্গে উপকাহিনীর কথাও ওঠে। চরিত্র বলতে—চরিত্রের নাটকীয় তাৎপর্য , তার অর্ন্তদ্বন্দ্ব ও ক্রমবিকাশ। চরিত্রও নানা ধরনের হতে পারে। কমেডির চরিত্র, ট্র্যাজেডির চরিত্র, প্রহসনের চরিত্র—নাটকের ভাব ও রস অনুযায়ী চরিত্র পরিকল্পিত হবে। কখনো একক চরিত্র কখনো জনতা চরিত্র। সমাজের স্তর অনুযায়ী চরিত্র। ঐতিহাসিক নাটকে ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক চরিত্র একই ধরনের হবে না। তেমনি সামাজিক নাটকের চরিত্র সাংকেতিক নাটকে বা অ্যাবসার্ড নাটকে ভিন্ন রকমের হয়ে যাবে। সংলাপের মধ্যে থাকবে চরিত্র, পরিস্থিতি, প্রয়োজন অনুসারে সংলাপ। সংলাপও নানা ধরনের ঃ একোক্তি, স্বগতোক্তি, নেপথ্যে ও জনান্তিকে উক্তি। গান নাটকের আর একটি উপকরণ। গানের সংযোজন নানা ভাবে ও নানা কারণে হতে পারে। দেখতে হবে, অকারণে বা কেবল প্রমোদের কারণেই গান যোজনা না করা হয়। কোরাস (Chorus)-এর প্রয়োগ প্রাচীন গ্রিক নাটকের একটি প্রয়োজনীয় বিষয় যদিও আধুনিক নাটকে কোরাস-এর প্রয়োগ থাকে না। বাংলার ঐতিহ্যশালী যাত্রার পালাতে 'বিবেক' ইত্যাদি চরিত্রকে খানিকটা এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে।

রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা, অভিনয় রূপসজ্জা প্রভৃতি হল নাটকের প্রয়োগগত দিক। নাটকের আধখানা

তার সাহিত্যিক দিক আর বাকি আধখানা তার প্রয়োগগত বাস্তব দিক। এই প্রয়োগগত বাস্তব দিকটির ওপরেই আজকাল বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। নানা গবেষণা হচ্ছে। রঙ্গমঞ্চের বিবর্তন ঘটছে দিন-দিন, অভিনয় রীতিরও সূক্ষ্মতা বাড়ছে। আলো ও ধ্বনির প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই অধিক থেকে অধিকতর হচ্ছে।

নাটক দুভাবে পরিবেশিত হতে পারে ঃ পেশাদারী ও অপেশাদারী বা শৌখিন নাট্যদল কর্তৃক। পেশাদারী নাটকে স্বাভাবিক কারণেই তেমন কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা থাকে না, জনসাধারণকে আনন্দ দেওয়াই সেখানকার মূল লক্ষ্য। অপেশাদারী শৌখিন নাটক হলো এক-একটি বিশিষ্ট নাট্যভাবনাকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা এক-একটি নাট্যদলের বা গ্রুপ-থিয়েটারের সম্পদ। নাটক রচনা এবং অভিনয়ের মাধ্যমে রঙ্গমঞ্চে তার প্রয়োগ—দু'দিক থেকেই নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলে এখানে। এঁদেরই প্রয়াসে সে দেশের নাটকের উন্নয়ন ঘটে। অনেক নাট্যকার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত না হয়েও নাটক রচনা করেন।

এক-একটি নাট্যদলের নিজস্ব চিন্তা-ভাবনা ও আদর্শকে রুপ দেবার জন্য কিংবা তার প্রচার-প্রসারের জন্য নাট্যপত্রিকার প্রকাশ করা হয়। এইসব নাট্যপত্রিকার প্রবন্ধ তাঁদের বিশিষ্ট চিন্তাকে তুলে ধরে।

৯২.৪ ট্রাজেডি নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ

গ্রিক 'Tragoidia' কথাটি থেকে 'Tragedy' কথাটি এসেছে। কথাটির অর্থ—'ছাগসঙ্গীত'। বিশ্বসাহিত্যের একটি বিশেষ দিক হল, 'ট্র্যাজেডি'। বহু দেশের বহু রসজ্ঞ পন্ডিত যেমন ট্র্যাজেডির স্বরুপ লক্ষণ বিচার করেছেন, তেমনি জগতের বড়ো নাট্যকারই ট্র্যাজেডি নাটক রচনা করেছেন। অনেক রসজ্ঞ পন্ডিতই ট্র্যাজেডি সম্পর্কে আলোচনা করলেও গ্রিক সাহিত্যশাস্ত্রী অ্যারিস্টটল (খ্রি.পূ. ৩৮৪-৩২২) তাঁর Poetics নামক গ্রন্থে ট্র্যাজেডি সম্পর্কে যে আলোচনা-বিচার করেছেন, তাকেই প্রথম প্রাধান্য দেওয়া হয়ে থাকে। অ্যারিস্টটল তাঁর সমকালীন গ্রিক-নাট্যকারদের রচনাবলী অবলম্বন করে ট্র্যাজেডি তত্ত্বটি গড়ে তুলেছিলেন। অন্যান্য নাট্যকরাসহ এঁদের মধ্যে আছেন—এস্কাইলাস, সফোক্লিস এবং ইউরিপিদাস।

Poetics বা কাব্যতত্ত্বের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে ট্র্যাজেডি হলো—"The imitation of an action that is serious and also, as having magnitude, complete in itself; in language with pleasurable accessories, each kind brought in separately in the parts of the work; in a dramatic, not in a narrative form; with incidents arousing pity and fear, wherewith to accomplish its Catharsis of such emotions."

এই সংজ্ঞাটির মধ্যে ট্র্যাজেডির নানাদিকের কথা বলা হয়েছে। পর্যবেক্ষণ করে দেখলে এর মধ্যে ট্র্যাজেডির ছ'টি আঙ্গিক বিশেষত্বকে খুঁজে পাওয়া যাবে। সমালোচকেরা এই ছ'টি অঙ্গাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেনঃ একভাগ হলো—ট্রাজেডির বাহিরঙ্গাক দিক ঃ ভাষা, সঙ্গীত এবং দৃশ্যসজ্জার দিক। আর এক ভাগ হল—এর অন্তরঙ্গা দিক ঃ প্লট, চরিত্র ও চরিত্রের চিন্তার দিক। ট্র্যাজেডির ঘটনাবলী দর্শকের মনে 'ভয়' ও 'করুণা' জাগাবে। তারই ফল হিসেবে, মনের মধ্যে এক বিশেষ অবস্থা, যাকে বলা হয়—'Catharsis'। এই ভাবটি মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলাই ট্র্যাজেডির মূল লক্ষ্য। ট্র্যাজেডির বহিরঙ্গোর ও অন্তরঙ্গোর যে ছ'টি অঙ্গাকে নির্দেশ করা হল,—এই ছ'টি অঙ্গাই পরস্পরের সঙ্গো যুক্ত ও অন্বিত, কোনটিই বিচ্ছিন্ন দৃষ্টিতে বিচার্য নয়। প্রথমে বহিরঙ্গীয় বৈশিষ্ট্যের কথা ঃ

বহিরঙ্গোর দিক বলতে অ্যারিস্টটল নাটকের ভাষা, সঙ্গীত ও দৃশ্যসজ্জা (spectacle)- কে বুঝিয়েছেন। Poetics গ্রন্থের বিংশ থেকে দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত ট্র্যাজেডির শব্দচয়ন ও ভাষা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেন ট্র্যাজেডিতে লক্ষ্যপূরণের জন্যে যে-কোনো ধরনের ভাষাই ব্যবহার করা চলতে পারে। ট্র্যাজেডিতে গান বলতে যাকে মুখ্যত কোরাসদলের গীত। এই গানকে কোরাসদলের একটি প্রধান দিক বলতে হয়। দৃশ্যসজ্জাকে অ্যারিস্টটল যথোপযুক্ত মূল্য দেন নি। শেকসপীয়ারের 'কিং লীয়ার' নাটকে রাজা লীয়ারের মনের মধ্যে যে ঝড় চলছিল, বাইরের প্রাকৃতিক জগতেও তখন ঝড় চলছে। কিন্তু দৃশ্যসজ্জার মধ্যেও যদি সেই ঝড়কে ব্যক্ত করা না হয়, তবে ঝড়ের ব্যাপকতার হানি ঘটে। কোরাসের গান ছাড়াও কোনো-কোনো নাটকে অভিনেতাদেরও গান থাকত। শোকসঙ্গীতগুলি অভিনেতাগণ এবং কোরাসের দল সকলেই একসঙ্গো গাইত।

অতঃপর অন্তরঙ্গা বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচ্য। প্লটকেই অ্যারিস্টটল সর্বাধিক প্রাধান্য দিয়েছেন চরিত্রের চেয়েও বেশি। এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে নানা সংশয়-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু প্লট সম্পর্কে অ্যারিস্টটলের ধারণাটি বুঝে নিলে এই সংশয় অনেকটাই দূরীভূত হয়। প্লট হল, জীবনের নানা ঘটনার একটি শৃঙ্খলাময় সজ্জা বা বিন্যাস, বা পরিকল্পনা, যা সেই নাটকটির Catharsis জাগ্রত করতে সক্ষম। নাটকের পাত্র-পাত্রীরা সেই প্লটটিরই অনুকরণ করে, কোনো বিশেষ চরিত্রের জীবনের ঘটনাবলীকে নয়। এইজন্যেই চরিত্র নয়, প্লটকে অ্যারিস্টটল প্রাধান্য দিয়েছেন।

ট্র্যাজেডির প্লটের তিনটি প্রধান উপকরণ হল—Peripety বা Peripetia (= বিপর্যয়/বিপ্রতীপতা। আরম্ভের সঙ্গো শেষের বিপরীতভাব), Anagnosis(=আবিষ্কার করা), নায়ক-নায়িকা জীবন ও কর্ম সম্পর্কে যে নতুন সত্য ও ভাবকে শেষে আবিষ্কার করে), এবং তৃতীয়ত, নায়ক-নায়িকার জীবনের দুঃখ-যন্ত্রণা-বেদনা-ধ্বংসের দিক। নাটকের মধ্যে যে বিপরীতমুখী ঘটনা থাকবে, তাকে সম্ভবপর ও অপরিহার্য হতে হবে। Anagnosisহল— নায়ক-নায়িকার জীবন সম্বন্ধে একপ্রকার জ্ঞান লাভ। এই জ্ঞান কোনো ব্যক্তি বা বস্তু সম্পর্কে হতে পারে। প্লটকে তিনি সরল ও জটিল—এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন।

যেখানে ঘটনার পরিণতিতে কোনো বিপ্রতীপতা থাকে না, সেখানে প্লট হল সরল। আর যেখানে তা থাকে, তা জটিল প্লটের নাটক। উৎকৃষ্ট নাটকের প্লট হবে জটিল। বিপ্রতীপতা এবং আবিষ্কার—এই দুটি দিকের উদ্ভব ঘটবে প্লটের ভেতর থেকেই, যাতে মনে হবে এগুলো যেন পদর্বের ঘটনার অনিবার্য ফল।

প্লটের মধ্যে থাকবে স্থান-কাল-পাত্রের ঐক্য। পাত্র বা চরিত্রের ঐক্যের মূল কথা হলো—প্রতিটি চরিত্রের জীবনের সেই-সেই ঘটনাবলীকে নাটকটিতে স্থান দিতে হবে, যা নাটকটির মূল বক্তব্যের পরিপোষক। নাটকের সমস্ত ঘটনা সম্ভাব্যতা ও অপরিহার্যতার দৃঢ়বন্ধনে বাঁধা থাকবে। নাটকের উপকাহিনীও মূল কাহিনীর পরিপোষক হবে।

প্লটের পর অ্যারিস্টটল চরিত্রের কথা বলেছেন। ট্র্যাজেডি নাটকের নায়ক চরিত্র হবে এমন যার পরিণতি দর্শকের মনে 'ভয়' ও 'করুণা' জাগায়, যার পরবর্তী ফল রুপে মনে Catharsis-এর সৃষ্টি হতে পারে। নাটক হবে ভালোয়-মন্দয় মিশ্রিত মাঝামাঝি চরিত্র। পরিণামে একজন মন্দ লোকের সমৃদ্ধি ও উন্নতি ট্র্যাজেডির অনুকূল নয়। যে-মানুষের মধ্যে কিছু উদার ও মহৎ গুণের সমাবেশ থাকে, সেই মানুষই ট্র্যাজেডির আদর্শ নায়ক চরিত্র হতে পারে। নায়কের পতন ও ব্যর্থতার কারণ রুপে থাকবে তার জ্ঞানকৃত বা অজ্ঞানকৃত কোনো 'ভুল' কর্ম। একে বলে—'Hamartia' (অর্থ ঃ 'ভুল')। এই 'ভুল' কর্মের জন্যই নায়কের পতন-ব্যর্থতা ঘটে। এই প্রসঙ্গেই উল্লেখযোগ্য নায়ক চরিত্রের Hubris/Hybris (= অবাধ ঔদ্ধত্য)। অবাধ ঔদ্ধত্যের কারণে নায়ক যেখানে দেবনির্দেশকে উপেক্ষা করে কিংবা তাকে অতিক্রম করতে চায়, তখন তার পতন ঘটে। নায়কেরই 'ভুল'-জনিত কর্মের প্রসঙ্গে তার চরিত্রগত কোনো Flaw বা ত্রুটির কথাও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নায়ক চরিত্রের Thouhgt বা 'চিন্তা'ই তার কর্মের মাধ্যমে নাটকে রুপায়িত হয়। অনেক সময়েই নায়ককে তার বিরুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। সেই নায়ক চরিত্রকেই অ্যারিস্টটল শ্রেষ্ঠ বলেছেন, যে তার বিরুদ্ধে পরিস্থিতিতেও প্রারম্ভিকভাবে সক্রিয় এবং সংগ্রামশীল হতে পারে। তবে এই সংগ্রামের ফলেই তার মধ্যে যখন অপ্রতিরোধ্য রুপে এসে পড়ে নিয়তি-নির্দিষ্ট অনিবার্য বিফলতা—সেখানেই ট্র্যাজেডির সূচনা হয়। সেখানে নায়ক অসহায়ভাবে আত্মসমর্পণ করে।

ট্র্যাজেডির নায়ক চরিত্রের পতন-মৃত্যুর ফলে দর্শকের মনে যে 'ভয়' ও 'করুণা'র বোধ জাগ্রত হয়, তার ফলে এর পরবর্তী স্তরে, দর্শকের ভাবাবেগের যে মোক্ষণ ঘটে, তাকে বলে Catharsis (ইংরেজি অর্থ : Purgation, বাংলায় বলা যায় 'মোক্ষণ')। এই Catharsis-ই ট্র্যাজেডির মূল লক্ষ্য। অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে এর উল্লেখ করেছেন, যদিও এ নিয়ে বিশদ আলোচনা করেননি। সমালোচকদের মধ্যে পরবর্তীকালে এ নিয়ে বিশেষ সংশয় ও বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। যাই হোক, অ্যারিস্টটল প্লটকে এমনভাবে সজ্জিত করতে বলেছেন, যাতে দর্শকমনে Catharsis-রে উদ্বোধন ঘটে।

এ যেন দর্শকের মনের সব তীব্র আবেগের নিঃশেষ প্রকাশের পর এক শান্ত-গভীর অবস্থা। এ যেন দর্শকমনে এক ধরনের 'স্বাস্থপ্রদ প্রতিক্রিয়া'। অনেকে মনে করেন, ঝড়ের পর এই প্রশান্ত অবস্থাই ট্র্যাজেডির 'আনন্দ' (pleasure)। মন যেন পার্থিব জগৎ থেকে উর্ধ্বে উন্নীত হয়। যে-পরিস্থিতিতে মানুষ তার আপন প্রিয়জনকেও হত্যা করতে বাধ্য হয় সেই পরিস্থিতির প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য বিচার করে দর্শক যেন নিজের চিত্তকেও পরিশুদ্ধ করে নেয়। অবশ্য এই ধরনের চিন্তার মধ্যে একটি নৈতিক দিকও এসে পড়ে। Catharsis-জনিত ভীতি ও পরিশুদ্ধির অনুভব দর্শককে নিজের অজান্তেই বেদনা ও পরিণামের সঙ্গে সমীকৃত করে তোলে।

অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডি-চিন্তার মধ্যে Destiny বা নিয়তি একটি প্রধান দিক হয়ে উঠেছে। মানুষ এখানে নিয়তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এবং সে নিয়তি পূর্ব-নির্ধারিত। এই পূর্ব-নির্ধারিত নিয়তি দ্বারাই চালিত হয়ে মানুষ তার প্রিয়জনকে হত্যা করে বা এমন কাজ করে যা সে করতে চায়নি। এ যেন এক অনতিক্রম্য, অপ্রতিরোধ্য শক্তি, যাকে লঙ্ঘন করা যায় না। আসলে প্রাচীন গ্রিকরা ছিল নানা দৈবীশক্তিতে বিশ্বাসী। মানুষের উদ্ধত ব্যবহারে বা আচরণে এ যেন এক Nemesis (= প্রতিদান, প্রতিশোধ ; মানুষের আচরণে ক্ষুব্ধ দেবতার বিরূপতাময় প্রতিদান।— তারই ফলে মানুষের জীবনে নেমে আসে নিয়তির নিষ্ঠুর বিধান। এই শক্তির অধিষ্ঠান জগদ্ব্যাপী, ট্র্যাজেডির নায়ক-নায়িকা এই শক্তিমান সত্তার হাতের ক্রীড়নক। নিজেদের চরিত্রের কোনো বিশেষ দোষ-দুর্বলতার কারণে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করতে বাধ্য হয়। তারা মহৎ ও উদার চরিত্রের মানুষ হলেও এই শক্তির হাত থেকে মুক্তি নেই। নায়ক-নায়িকার জীবনের সেই দুঃখ- যন্ত্রণার দিকটি নাটকে রূপায়িত হয়। মানুষ এখানে অসহায়।

গ্রিক ট্র্যাজেডির আর এক বৈশিষ্ট্য হল Chorus (= অর্থ হল—'সমবেত সঙ্গীত/'নৃত্য')-এর প্রয়োগ। মূলত উর্বরতা বিষয়ক অনুষ্ঠানে 'কোরাস' দলবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করত, পরে এটি ট্র্যাজেডির এক অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে ওঠে। Aeschylus-এর নাটকে কোরাস সক্রিয় ভূমিকা নিত, Sophocles-এর নাটকে Actionসম্পর্কে টীকা-ভাষ্য প্রদান করত, আর Euripides-এর নাটকে এরা গীতিকবিতার যোগান দিত। গ্রিকদের কাছ থেকে রোমানরাও তাদের নাটকে এই ধারাটিকে গ্রহণ করে। গ্রিক নাটকের আদিযুগে কেবল একজন চরিত্রের সঙ্গে কোরাসের আলাপনই ছিল নাটক। পরে চরিত্রসংখ্যা বাড়তে থাকে। তাঁর Poetics গ্রন্থের অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে অ্যারিস্টটল লিখেছেন, কোরাস নাট্য ঘটনার action-এ অংশগ্রহণ করবে। ভূমিকাধর্মী ভাষণ দিয়ে কোরাস রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করবে, শেষ পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে, এবং অতীত ঘঠনাবলীর চারণা করবে, বর্তমানের ঘটনাবলীর টীকা-ভাষ্য করবে এবং ভবিষ্যতের ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত দান করবে। কোরাস যখন অতীত ঘটনার চারণা করে, তখন নাটকটির বিষয়গত পটভূমিকা সম্পর্কে দর্শককে অবহিত করে। যখন বর্তমানের ঘটনাবলীর ওপর টীকা-মন্তব্য করে তখন নাটকের প্লট ও চরিত্র সম্পর্কে দর্শকদের বুঝতে সাহায্য করে। আর ভবিষ্যতের ঘটনার ওপর ইঙ্গিত দিয়ে নাটকের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করে। কোরাস যেন ট্র্যাজেডি নাটকের নায়ক চরিত্রের সঙ্গে এক ধরনের মানসিক

সাযুজ্য অনুভব করে, নায়কের মহত্ত্বের কথা, যে বিরুদ্ধ পরিস্থিতিতে যে সংগ্রামশীল, তার কথা দর্শককে জানায়, তাকে সমবেদনা জানায়, সান্ত্বনা দেয়, উৎসাহিত করে, সর্তক করে দেয়, উপদেশ দেয়। তার কর্মে ও যন্ত্রণায় অংশগ্রহণ করে। এ-বিষয়ে 'কোরিক গীতি' (Ode) বিশেষ সহায়ক দিক।

নাটকের গঠন ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রেও কোরাস-এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেহেতু কোরাস রঙ্গমঞ্চে সর্বক্ষণ উপস্থিত থাকে, নাটকের স্থানগত, কালগত এবং Action বা ক্রিয়াগত ঐক্য রক্ষিত হয়ে থাকে। নাটকের পাত্র-পাত্রীর প্রবেশ প্রস্থানের কথা তারাই ঘোষণা করে। গ্রিক নাটক দৃশ্য বা অঙ্ক দ্বারা বিভক্ত হত না। এক-একটি পর্যায় (যাকে দৃশ্য বা অঙ্ক বলা যেতে পারে) শেষ হলে তারা যে 'গীতি' (একে Ode বলা হত) গাইত, তার দ্বারাই দৃশ্য-অঙ্কের বিভাগের আভাস ফুটে উঠত।

গ্রিক নাটকের গঠনের কয়েকটি বিশেষত্ব ছিল। সেগুলি এই ঃ ১.Protasis : নাটকের প্রারম্ভিক অংশে চরিত্র যেখানে প্রবর্তিত হচ্ছে, পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। ২.Epitasis : প্লট যেখানে ঘনীভূত হচ্ছে। ৩. Catastasis : ট্র্যাজেডির চারটি স্তর বিভাগের মধ্যে এটি তৃতীয়। এটির অন্যতম অর্থ হল, কোনো ভাষণের ভূমিকা। ৪. Catastrophe : এর আক্ষরিক অর্থ হল— 'ওলটানো অবস্থা'। নাটকের আখ্যানের সর্বোন্নয়নের পরবর্তী অংশ, গ্রন্থিমোচনের অংশ।

এই প্রসঙ্গ গ্রিক ট্র্যাজেডির আয়তন-পরিমাপগত অংশগুলোও (Quantitative Parts) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেগুলি হল—Prologue, Episode, Exode এবং Choric Song। Prologue হল সমগ্র নাটকটির সেই অংশ যা কোরাসের আগমনের পূর্ববর্তী Episode দু'টি সম্পূর্ণ কোরাস গানের মধ্যবর্তী অংশ। Exode হল একটি সমগ্র নাটকের সেই অংশ, যার পরে আর কোরাসগীতি হবে না। Choric অংশকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হত ঃ 'Parode' হল কোরাসের অবিভক্ত গান, প্রথম গান। কোরাস-গীতি (একে বলে Ode) এক বিভাজিত অংশ Stasimon, অপর বিভাজিত অংশকে বলে Trochee। এদের ছন্দোরুপ ভিন্ন।

ট্র্যাজেডির স্বরুপ নির্দেশ করবার জন্য অ্যারিস্টটল ট্র্যাজেডির সঙ্গে মহাকাব্যের পার্থক্যও নিরুপণ করেছেন। মহাকাব্য ও ট্র্যাজেডির মধ্যে প্রথম পার্থক্য হল, মহাকাব্য হল বর্ণনারীতির দৃষ্টান্ত, আর ট্র্যাজেডি হল জীবনের Action-এর অনুকরণ। দ্বিতীয়ত, ট্র্যাজেডির কালসীমা সাধারণত সূর্যের এক আবর্তনকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ, মহাকাব্যের তেমন কোনো কালগত সীমা নেই। তৃতীয়ত, একটি মহাকাব্য আগা-গোড়া একই ছন্দে লিখিত হতে পারে কিন্তু একটি ট্র্যাজেডি নাটকে থাকতে পারে একাধিক ছন্দের প্রয়োগ। মহাকাব্যের সব উপকরণই ট্র্যাজেডিতে মেলে, কিন্তু ট্র্যাজেডির সমস্ত বিশেষত্ব ও উপকরণ মহাকাব্যে মেলে না। অবশ্য মহাকাব্য এবং ট্র্যাজেডির মধ্যে সাদৃশ্যও আছে। প্লটের মধ্যে যে ঐক্যের দিক তা ট্র্যাজেডি এবং মহাকাব্য উভয়ের ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য এক অপরিহার্য দিক।

যুগে-যুগে ট্র্যাজেডি নাটকের নানা বিবর্তন ঘটেছে, নানা দেশের নাট্যকারদের দ্বারা। খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম

থেকে চতুর্থ শতাব্দী ছিল গ্রিক নাটকের স্বর্ণযুগ। এই যুগকে বলা হয় 'ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডি'র যুগ। Aeschylus, Sophocles, Euripides ছিলেন এই যুগের নাট্যকার। কোরাসের প্রয়োগ, স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্য রক্ষা, দুতের মাধ্যমে নাটকের ঘটনার চরম বিপর্যয়ের সংবাদ দান— এইগুলি ছিল ক্লাসিক্যাল ট্র্যাজেডির প্রধান লক্ষণ। অতঃপর ট্র্যাজেডির কেন্দ্রভূমি গ্রিস থেকে রোমে স্থানান্তরিত হয়। Hellenic অর্থাৎ গ্রিক নাট্যধারার প্রভাব ইতালীয় নাট্যকারদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এখানকার শ্রেষ্ঠ ট্র্যাজেডিকার— সেনেকা (Seneca)। তবে গ্রিক বা ক্লাসিক্যাল আদর্শকে এঁরা সর্বত্রই গ্রহণ করেন নি। গ্রিক নিয়তিবাদের পরিবর্তে এঁরা গ্রহণ করলেন— মানুষের নিজস্ব ক্রিয়া-কর্মকে, মানবিক-শক্তিকে। ফলে একদিকে এখানকার ট্র্যাজেডি নাটকে এল—মৃত্যু, রক্তপাত, প্রতিশোধ, পারস্পরিক নির্বাধ হত্যা এবং অতিপ্রাকৃত ভয়ঙ্কর শক্তির প্রতি বিশ্বাস। গ্রিক নাটকের Catharsis নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, দেখা গেল অতিনাটকীয়তার প্রভাব । নাটকের মধ্যে গীতিভাব অপেক্ষা দীর্ঘ অলংকারপূর্ণ ভাষণ ও বক্তৃতা স্থান পেল। সেনেকার এই নাট্যরীতি ইউরোপে বিশেষ সমাদৃত হল। এই ট্র্যাজেডির যুগকে বলা হয় Revenge ট্র্যাজেডির যুগ।

ইতালির রেনেসাঁস (Renaisance)-এর লব্ধ ফল গোটা ইউরোপেই প্রসারিত হয়। ট্র্যাজেডির এক নতুন রঙ্গভূমির সৃষ্টি হয় ইংলণ্ডে, স্বভাবতই শেকস্‌পীয়ার ছিলেন তার নায়ক। সেখানকার ট্র্যাজেডি মূলত রোমান্টিক আদর্শের ট্র্যাজেডি। রানী এলিজাবেথের যুগে এর বিকাশ। শেকস্‌পীয়ার ছাড়া মার্লো, বেন জনসন প্রভৃতি নাট্যকারেরা এই যুগকে অলংকৃত করেন। সেনেকার আদর্শে এখানে নিয়তির বদলে মানুষই ভাগ্যের পরিচালক হয়েছে। শেকস্‌পীয়ার দেখালেন, নিয়তির অধিষ্ঠান বাইরে নেই, মানুষেরই অন্তরে সে আছে। এরই ফলে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে মানবিক চরিত্রগুলি অনেক বিকশিত হলো। যদিও সেনেকার প্রভাবজাত অশরীরী আত্মার মূর্তি পরিগ্রহ ইত্যাদি সব ভৌতিক ব্যাপার শেকস্‌পীয়ারের নাটকেও (যথা : 'হ্যামলেট', 'ম্যাকবেথ', 'জুলিয়াস সীজার') দেখা দিয়েছিল। তবে, গ্রিক কোরাস রীতির অনুসরণ সাধারণভাবে এখানে নেই, দুতের মাধ্যমে চরম বিপর্যয়ের সংবাদদানের প্রথা নেই, অপ্রধান চরিত্রের মাধ্যমে কোরাস-রীতির পরোক্ষ অনুসরণ অবশ্য আছে, আছে স্বগতোক্তির ব্যবহার, গীতির ব্যবহার। সেই সঙ্গে ট্র্যাজেডির মধ্যে Dramatic relief রূপে কিছু কিছু লঘুরসের দৃষ্টান্তও মেলে।

ফ্রান্সে ও জার্মানিতে প্রতিভাধর অনেক নাট্যকার এক বিশিষ্ট নাট্যধারার প্রবর্তন করলেন, যা নব্য, ক্লাসিক্যাল যুগ বা Neo-classical যুগ রূপে কথিত। এঁদের মধ্যে আছেন, জার্মানির গ্যেটে, লেসিং শিলার এবং ফ্রান্সর Racine। রীতির দিক থেকে এ ধারার নাটক গ্রিক নাট্যরীতিরই অনুসারী। বিষয়ের দিক থেকে প্রাধান্য পেয়েছে প্রেম ও রোমান্টিকতার দিক। তবে ভাষার দিক থেকে অলংকার ও আড়ম্বরপূর্ণ রীতির প্রভাব দেখা গেছে। কোরাসের প্রয়োগ নেই। স্থান-কাল-ঘটনার ঐক্য রক্ষার নিদর্শন আছে। এই নব্য ক্লাসিক্যাল যুগের ট্র্যাজেডির বিষয়গত আর একটি দিক হল বীর নায়ক পুরুষদের নিয়ে ট্র্যাজেডি রচনা। তা ইংলণ্ডেও দেখা গেছে।

অতঃপর ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রে আর এক পরিবর্তন সূচিত হল। সামাজিক-পারিবারিক-গার্হস্থ্য জীবনকে অবলম্বন করে এবং এই জীবনেরই সমস্যাকে ভিত্তি করে ট্র্যাজেডি রচনা করা। এতদিন ট্র্যাজেডি বলতে বোঝাত উচ্চ-অভিজাত-রাজপুত্রদের কাহিনী, প্রখ্যাত বীর নায়কদের কাহিনী। কিন্তু নরওয়ের ইবসেন এসে ট্র্যাজেডিকে একেবারে নিতান্ত ঘরের বিষয় করে তুললেন তাঁর 'A Doll's House', 'An Enemy of the People' প্রভৃতি নাটকে। এরই ফলে, ইংলণ্ডের জন গলস্‌ওয়ার্দির (Galsworthy) 'Justic' নাটকের মধ্যে নায়ক চরিত্ররূপে দেখা দিল এক ব্যাংক কর্মচারী, — যে মধ্যবিত্ত অর্থ-সংস্কৃতির একজন প্রতিনিধি।

নানা ভিন্ন ভিন্ন নাট্যরূপ (dramatic form)-এর মধ্য দিয়েও ট্র্যাজেডির বিকাশ ঘটেছে। যেমন, একাংক নাটক, কাব্যনাটক। অনেক কবি ও নাট্যকার এদিকে লেখনী চালনা করেছেন।

ট্র্যাজেডি নাটকের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর সব দেশের সব ভাষাতেই মেলে। তার থেকে কেবল কয়েকটি পরিচিত ট্র্যাজেডি নাটকের কথা এখানে আলোচিত হল ঃ

শেকস্‌পীয়ার শিক্ষিত বাঙালির কাছে বিশেষ পরিচিত। তাঁর ট্র্যাজেডি নাটকের মধ্যে অনেকগুলিই বাঙালির প্রিয়। ধরা যাক, শেকস্‌পীয়ারের ট্র্যাজেডি নাটকে নিয়তির প্রসঙ্গটি। 'Othello' নাটকে ডেসডিমোনার রুমাল হারিয়ে ফেলা,— যা নিজেরই অজ্ঞাতে কৃত একটি কর্ম, সেই রুমালই ইয়াগো ওথেলোকে দেয়, ডেসডিমোনার অসতীত্বের সাক্ষী রূপে। ওথেলার মনে ডেসডিমোনার প্রতি সন্দেহ চলছিলই। আরো পারিপার্শ্বিক নানা কারণের যোগফল রূপে, একদিন রাতে সে যখন গলা টিপে ডেসডিমোনাকে মৃতপ্রায় করে তুলল, এমন সময়ে এমিলিয়া এসে সব ঘটনা খুলে বলল, ওথেলোর তখন আত্মহত্যা করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নিয়তি এখানে ডেসডিমোনারই অন্তরস্থিত এক বিরূপ ও বিরুদ্ধ সত্তা। 'নীলদর্পণ' নাটকেও নিয়তি একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। গোলোক বসুর বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা করা হয়েছিল, তাঁকে হাজতবাসের নির্দেশ দেওয়া হয়, এদিকে মামলা মিথ্যে বলে প্রমাণিত হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় ; সে হুকুম নিয়ে আসার আগেই গোলোক উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেন— অথচ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। এখানে নিয়তি এভাবেই কাজ করেছে, এই ফলেই পরবর্তীকালে, এই বসু-পরিবারে পারিবারিক বিপর্যয়ের সূচনা হয়।

King Lear নাটকে রাজা লীয়ার তিন কন্যার (গনেরিল, রিগেন এবং কর্ডেলিয়া) মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যা কর্ডেলিয়ার প্রতি 'ভুল' করে অন্যায় কাজ করেছিলেন। অপর দুই কন্যার বিরূপ আচরণে তিনি উন্মাদ হয়ে যান। শেষে তাঁর মনে এল Anagnorisis, (ওথেলার মধ্যেও এই Anagnorisis-এর প্রবর্তন ঘটেছিল), তখন মৃতা কন্যার প্রতি যথেষ্ট পিতৃস্নেহ প্রদর্শন করেও আর তাকে ফিরে পেলেন না। দ্বিজেন্দ্রলালের 'শাজাহান' নাটকেও দেখা যায়, শাজাহানের পিতৃস্নেহের দুর্বলতাই তাঁর ট্র্যাজেডির কারণ। পিতৃস্নেহ এখানে Tragic flaw হয়ে দেখা দিয়েছে। শচীন্দ্রগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকে দেখা যায়, সিরাজের মধ্যে একটি রোমান্টিক আবেগ কাজ করেছিল, সেটাই তাঁর সব কর্ম-ক্রিয়া Dianoia, Thought বা চিন্তা, তাকেই তিনি রূপদান করতে ব্যর্থ হয়েছেন। এই আবেগই তাঁর Fatal flaw।

গ্রিক ট্র্যাজেডিকার ইউরিপিদেস-এর বিখ্যাত ট্র্যাজেডি নাটক 'ইফিগেনেইয়া হে এন আউলিদি' (Iphigeneia-e-en Aulidi)/ইফিগেনিয়া ইন আলিসে-র প্রসঙ্গে মাইকেলের 'কৃষ্ণকুমারী' বা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'সরোজিনী' নাটক দুটি স্মরণীয়। 'কৃষ্ণকুমারী' যে পদ্মিনীর অশরীরী সত্তাকে দেখেছিলেন বা তাঁর বাণী শুনেছিলেন, সে কি গ্রিক ট্র্যাজেডির দৈবাদেশ? আমরা মনে করি, এ কৃষ্ণকুমারীরই অন্তরের নির্দেশ, কাজেই নিয়তি এখানে বাইরের কোনো শক্তি নয়।

কয়েকটি নাটক পর্যালোচনা করে দেখা গেল, বিভিন্ন নাটকে ট্র্যাজেডির নানাদিকের বিকাশ ঘটেছে।

৯২.৫ অনুশীলনী

(ক) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১। অভিনয় কাদের জন্য, অভিনয়ের উদ্দেশ্য কী?
২। 'Mimesis-কথাটির অর্থ ও প্রয়োগ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৩। সংস্কৃত ' নাট্য' এবং 'নাটকে'র মধ্যে পার্থক্য কী?
৪। 'সুত্রধার' অভিধাটির পরিচয় দিন।
৫। ভারতীয় নাটককে কেন 'পঞ্চম বেদ' বলা হয়?
৬। 'Tragoidia' কথাটির অর্থ কী?
৭। অ্যারিস্টটলের মতে ট্র্যাজেডির শেষ লক্ষ্য কী?
৮। 'Nemesis' কথাটির প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন।
৯। 'Hybris/Hubris কাকে বলে?
১০। 'Anagnorisis' কী?

(খ) নীচের প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন।

১। 'দৃশ্যকাব্য' সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২। রুপগত এবং কাব্যগত—এই দুই দিক থেকে নাটকের শ্রেণিভাগ করুন।
৩। অ্যারিস্টটলের অনুসরণে ট্র্যাজেডির সংজ্ঞা দিন এবং ছয়টি অঙ্গের উল্লেখ করে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করুন।
৪। 'প্লট' বলতে অ্যারিস্টটল কী বুঝিয়েছেন? কেন তিনি চরিত্রের ওপর প্লটের স্থান নির্দেশ করেছেন?
৫। গ্রিক ট্র্যাজেডিতে কোরাসের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
৬। সেনেকা এবং শেকস্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য কী?
৭। বিভিন্ন যুগের ট্র্যাজেডির বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করুন।

৯২.৬ কমেডি নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ

গ্রীক 'Komos' (অর্থ : আনন্দোৎসব করা) শব্দ থেকে 'কমেডি' কথাটি এসেছে। অ্যারিস্টটল তাঁর Poetics গ্রন্থের চতুর্থ পরিচ্ছেদে কমেডির কথা প্রথম উল্লেখ করেছেন এবং পঞ্চম পরিচ্ছেদে কমেডির চরিত্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। আদিযুগের কমেডি বলতে ব্যক্তিগত ব্যঙ্গামূলক রচনাকেই বোঝায় এবং তার লক্ষ্য ছিল—ব্যক্তিগতভাবে কাউকে নিন্দামূলক-আক্রমণ করা। কমেডির চরিত্র বলতে সমাজের নিম্নমানের মানুষ। তারা হাস্যকর হতে পারে কিন্তু মন্দলোক নয়। তাদের মধ্যে কোনো বিশ্রীভাব কিংবা কোনো অসম্পূর্ণতা থাকতে পারে, তবে তা দুঃখ-বেদনাদায়ক কিছু নয়। কমেডির কোনো পরম্পরামূলক ইতিহাস নেই বলে অ্যারিস্টটল জানিয়েছেন। কেউ এই সাহিত্য-শাখাটির দিকে সযত্ন ও সে নিষ্ঠ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেনি। কমেডির মুখোসের প্রবর্তক কে, এর প্রস্তাবনা প্রথার সূচনাকারী কে কিংবা এর অভিনেতা সংখ্যার বৃদ্ধি ঘটিয়েছেন কে—সে সবই অজানা। তবে সিসিলিতে প্রথম কমেডির উদ্ভব ঘটে।

বর্তমানে কমেডির সম্পূর্ণ বিশেষত্ব দু'টি : তা হবে প্রথমত, হাস্যরসাত্মক। দ্বিতীয়ত, মিলনাত্মক। কিন্তু বিরহ বা মৃত্যু মানেই যেমন ট্র্যাজেডি নয়, মিলনমাত্রই তেমনি কমেডি নয়। ট্র্যাজেডির মতো কমেডিরও একটি নিজস্ব দর্শন আছে। হাসিরও আছে নানা মাত্রাভেদ। বস্তুত, সমাজের নানা প্রয়োজন-প্রকৃতি-অবস্থা বিশেষত্ব, নায়ক-নায়িকার মিলনের প্রকার-বৈশিষ্ট্য-ব্যাপকতা, হাসির নানা প্রকারভেদ ও মাত্রাভেদ,—ইত্যাদির বিভিন্ন দিক বিচার পর্যবেক্ষণ করে তবেই কমেডির সংজ্ঞা নিরূপণ করা যেতে পারে। এই সব নানা বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতার কারণের ফলেই কমেডির নানা শ্রেণীবিভাজন এসে গেছে। কাজেই কমেডির স্বরূপ-লক্ষণ নির্দেশকালে এই তিনটি দিক প্রধানত বিচার্য : (ক) সমাজ, প্রতিবেশ ও সমাজের বিশেষ্ত্ব, (খ) নায়ক-নায়িকার মিলনের মূল স্বরূপ, (গ) হাসির প্রকারভেদ ও মাত্রাভেদ। অবশ্য এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয়, উচ্চস্তরের বিশুদ্ধ কমেডি কোনো বিশেষ দেশ-কাল-সমাজের রীতি-নীতি-সংস্কারের দ্বারা সীমাবন্ধ নয়। ব্রাহ্মসমাজ ও স্ত্রীশিক্ষাকে ব্যঙ্গ করে অমৃতলাল যে 'খাসদখল' কমেডি নাটক রচনা করেছিলেন, আজ তার সামাজিক প্রতিবেশ লুপ্ত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'বৈকুণ্ঠের খাতা' আজও সমানভাবে আদৃত।

এইখানে কমেডির সঙ্গে প্রহসনের কথা অপরিহার্য রূপে উঠে পড়ে, বিশেষত আমাদের দেশে। প্রহসন ও কমেডি দুই ভিন্ন সাহিত্য-শাখার নিদর্শন, তথাপি আমাদের দেশের মতো অন্যান্য অনেক দেশে এ-দুই সাহিত্যশাখার মিশ্রণ ঘটে গেছে। কমেডিকে এজন্যে উচ্চ ও নিম্ন—এই দুইভাগে বিভক্ত করে, প্রহসনকে নিম্নমানের কাছাকাছি সাহিত্যের নিদর্শন বলা হয়। কিন্তু বিশেষভাবে ভেবে দেখলে কমেডি এবং প্রহসনকে সহজেই ভিন্ন করে দেখা যায়। কমেডি এক নিয়মিত নাট্যশাখা, তার প্লট, চরিত্র, চরিত্রের বিবর্তন (এবং এমনকি দ্বন্দ্বও) সাধারণ নাটকের মতোই। আকারের দিক থেকে তা দীর্ঘায়তও হতে পারে। কিন্তু প্রহসনে নিয়মিত নাটকের নিয়মানুসারণের প্রয়োজন নেই, চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাই-ই। বিষয় প্রসঙ্গত আপেক্ষিকভাবে তুচ্ছ। এখানে 'প্রকৃষ্টরূপে হসন টাই বড়ো, কিন্তু সেই হাসির সূক্ষ্মতা ও মাত্রাভেদের প্রসঙ্গাটি ততো বড়ো নয়। 'পঞ্চভূত' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ যখন বলেছিলেন, কমেডিই উচ্চস্তরে উপনীত হয়ে ট্র্যাজেডিতে রূপ নেয়, তখন তিনি কমেডির বিশুদ্ধ খাঁটি ও উচ্চস্তরের রূপটিকেই মনে রেখেছিলেন, — কোনো প্রহসন জাতীয় নিম্নমানের কমেডিকে নয়। তবে, প্রহসনের সঙ্গে সমাজের চলমান প্রতিবেশ ও অবস্থা-বিপর্যয়ের যে গভীর যোগ আছে, কমেডির সঙ্গে সেই যোগ আরো সূক্ষ্ম, পরিমাণেও উচ্চস্তরের। রবীন্দ্রনাথের উক্তিকেই অবলম্বন করে বলা যায়, সমাজ ও সামাজিক বিপর্যয় যখন স্থূল ও প্রত্যক্ষরূপে প্রদর্শিত হয়, তখন তা প্রহসন। তাকেই উচ্চ ও সূক্ষ্ম করলে তা কমেডির প্রেক্ষাপট হয়।

সমাজ-প্রতিবেশের পরেই কমেডির দ্বিতীয় মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল—নায়ক-নায়িকার মিলন-প্রসঙ্গ। এই মিলন-প্রসঙ্গ ধরেই আসে প্রেমের কথা। প্রেম ও রোমান্স বিশ্বের কমেডি নাটকের একটি প্রধান দিক, সব বড়ো কমেডিকারই প্রেমকে একটি প্রধান উপকরণরূপে গ্রহণ করেছেন। তবে, কমেডির প্রেমকে কোনো লঘু-কৌতুকময় দৃষ্টিতে দেখা হয় না। প্রহসনের প্রেমের সঙ্গে কমেডির প্রেম-চিন্তার-পার্থক্য এখানেই। প্রেমকে এখানে নিতে হবে গভীর-গম্ভীর দৃষ্টিতে। দ্বিতীয়ত, নায়ক-নায়িকার নিছক মিলনই এখানে বড়ো কথা নয়। অপর কোনো প্রেমিক-প্রেমিকার সঙ্গে বিরহ বা বিচ্ছেদ ঘটিয়ে মিলন নয়। কিংবা, নাটকের অন্য কোনো পাত্র-পাত্রীর জীবনে ও মনে কোনো প্রকার দুঃখ-যন্ত্রণার সৃষ্টি করে মিলন নয়। এ-মিলন হবে সর্বাত্মক—সকল পাত্র-পাত্রীর কাছেই সমান সুখদায়ক, এমনকী, যে প্রেমিক বা প্রেমিকা নয়, তার পক্ষেও।

তৃতীয়ত, হাস্যরসের দিক। কমেডির হাসিকে বলা হয় Humour, বাংলায় বলা যায়—পরিহাসের হাসি। এ-হাসির মধ্যে এক ধরনের জীবনরস রসিকতা আছে। কেউ-কেউ বলেছেন, এ-হাসি একদিকে চিন্তার খোরাক জোগাবে আর অন্যদিকে তা প্রমোদমূলক হবে। রবীন্দ্রনাথ হাসির মধ্যে চিন্তার খোরাক এবং প্রমোদের আয়োজনকে না দেখে অন্যদিকের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে হাস্যরসের মূল উৎস Incongruity বা অসঙ্গতি, অবশ্য অসঙ্গতি নানা প্রকারের হতে পারে : চিন্তার সঙ্গে কর্মের, প্রত্যাশার সঙ্গে প্রতিফলের। দ্বিতীয়ত, সেই হাসিই শ্রেষ্ঠ হাসি, যা অশ্রুর আসঙ্গযুক্ত। ফাল্গুনের পূর্ণিমা আর শ্রাবণের পূর্ণিমার তুলনা করে তিনি শ্রাবণের পূর্ণিমার হাসিকে শ্রেয়োতর বলেছেন; কারণ, সেখানে হাসির সঙ্গে আছে শ্রাবণের বর্ষণ। এই অর্থে পাশ্চাত্যের 'হিউমার' এবং রবীন্দ্রনাথের হাসি-অশ্রুর সম্মিলন অভিন্ন। পাশ্চাত্য হাস্যরসিক যখন কমেডির হাসির মধ্যে 'চিন্তার খোরাক'কে দেখেন, তখন তিনিও এক বিশেষ 'দর্শনে'র কথা বলেন ঃ বাহ্যত কথাটি বিরুদ্ধতামূলক, কিন্তু মূল কথা হল, বহিরঙ্গে যা হাসির বিষয়, অন্তরঙ্গ চিন্তায় তাকেই মনে হয়,—জগৎ ও জীবন সম্পর্কে এক গভীর দিক তাতে নিহিত আছে। কাজেই কমেডির অন্তর্নিহিত হাসিকে গ্রহণ করতে হবে এক জীবনসত্যরূপে। হাসির নানা মাত্রা ও প্রকারভেদ আছে। বিশুদ্ধ কমেডিতে আমরা হিউমারের প্রকাশ দেখি। আবার কোনো-কোনো অন্য ধরনের কমেডিতে Wit বা বুদ্ধিদীপ্ত হাসির প্রকাশও দেখি। হাসির প্রকার ও মাত্রাভেদ অনুসারে কমেডির মধ্যেও শ্রেণিভেদ এসে গেছে।

কমেডির স্বরূপ সম্পর্কে শেষ কথা হলো, কমেডি নাটক দর্শকের মনের মধ্যে সৃষ্টি করবে এক প্রসন্ন ও মনোরম অনুভূতির। এই মানসিক দিকটিই কমেডির শেষ ফল। কমেডি মানে জীবনের লঘু-কৌতুকতার দিক নয়, কমেডি নাটকও কোনো তুচ্ছ শ্রেণির সাহিত্যসামগ্রী নয়। উচ্চস্তরের কমেডি মানুষকে মানুষের জীবন সম্পর্কে ভাবায়। যেমন উচ্চস্তরের ট্র্যাজেডি মানুষকে তার জীবন উপলব্ধি করায়। এই 'ভাবানো' ও 'উপলব্ধি করানো'—দুইই জীবনের দুই দৃষ্টিকোণ। রবীন্দ্রনাথ কমেডি ও ট্র্যাজেডির মধ্যে কোনো প্রকারগত (Kind) বিভেদ স্বীকার করেন নি। তাঁর মতে, এ দুয়ের মধ্যে যে ভেদ, তা মাত্রাগত (Degree)। তাই কখনো গানে বলেন, "বিরহ মধুর হল আজি মধুরাতে', কখনো বলেন—"ওগো অকরুণ কী মায়া জানো—মিলন ছলে বিরহ আনো।" মিলনের মধ্যে বিরহকে এবং বিরহের মধ্যে আনন্দকে তিনি অনুভব করেন।

যুগে যুগে কমেডির আকার ও প্রকারগত নানা বিবর্তন ও পরিবর্তন ঘটেছে। কমেডির বিষয়বস্তু ও প্লটেরও পরিবর্তন হয়েছে। ফলে কমেডির নানা শ্রেণিভেদ এসে গেছে।

এথেন্সে যে গ্রিক কমেডির সূত্রপাত ঘটে ট্র্যাজেডি নাটকের পাশাপাশি, তা একটি বিশেষ নাট্যধারা রূপেই স্বীকৃতি লাভ করে। এগুলিতে থাকত লঘু আমুদে চরিত্র, সুখে ও মিলনে নাটক সমাপ্ত হতো। গ্রিক কমেডির আদিযুগের বৈশিষ্ট্য ছিল,—কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যঙ্গ-বিদ্রুপাত্মক বিষয়। প্রখ্যাত ব্যক্তিগণের দোষ-নির্বুদ্ধিতাকে নিয়ে গড়ে উঠত এসব কমেডির কাহিনী। আরিস্তোফেনেস ছিলেন এই যুগের প্রধান

কমেডিকার। পরবর্তী যুগের কমেডির বিষয় হয়, সামাজিক রীতি-নীতি প্রথা এবং সামাজিক জীবন প্রতিবেশ,—মূল রচনা হারিয়ে গেছে, লাতিন ভাষার মাধ্যমে কিছু মেলে। গ্রিক কমেডির তৃতীয় বা নব্য কমেডির যুগে যে সব কমেডি নাটক মেলে, তার বিষয়-চিন্তা বা ভাবনা উদ্রেককারী হাসি। এরও নিদর্শন আজ অবলুপ্ত। তবে পরবর্তী যুগের বিভিন্ন কমেডিকারদের ওপর তাঁদের প্রভাব অন্বেষণ করা যায়। প্রাচীন গ্রিসে ট্র্যাজেডির যতখানি উন্নয়ন ঘটে, কমেডির উন্নতি সে তুলনায় কিছুই নয়। কমেডি বলতে তখন মূলত ব্যঙ্গবিদ্রূপ মুলক রচনাকে বোঝাত এবং তা ছিল এক প্রকার Burelesque' (= ইতালীয় Burlesco থেকে Furla, অর্থ হল—উপহাস-হাসি-ঠাট্টা)।

গ্রিক যুগের পর রোমান যুগ। গ্রিক কমেডির নব্যযুগের দ্বারা ইতালীয় কমেডি লেখকরা অনুপ্রাণিত হন। এঁদের অনেকেরেই রচনা অবলুপ্ত। তবে লাতিন নাট্যকার প্লতাস এবং তেরেন্স-এর কিছু রচনা পাওয়া গেছে। কৌতুক এবং অপ্রতিরোধ্য হাসি এঁদের কমেডির বিশেষত্ব, যদিও এসব কমেডি ছিল প্রহসনমূলক। এঁদের কমেডি সম্পর্কে চিন্তা ও কমিক পরিস্থিতির সম্পর্কীয় ধারণা পরবর্তীকালের কমেডি ধারায় প্রভাব ফেলেছে।

এরপর প্রবর্তিত হয় ইংরেজি কমেডি নাটকের প্রাথমিক যুগ ও তার পরে আসে এলিজাবেথীয় রোমান্টিক কমেডির যুগ। বাইবেলীয় ধর্মভাবনা এবং সাধু-সন্তদের অলৌকিক কর্মাবলীকে কেন্দ্র করে প্রাথমিক যুগে ইংরেজি কমেডির সূচনা হয়। এসব ধরনের রচনা আর একটু বিবর্ধিত হয়ে 'Interlude'–এ (নাটকের দুই দৃশ্য বা অঙ্কের মধ্যবর্তী অংশে অভিনেয় ; অনেকটা সংস্কৃত নাটকের 'বিষ্কম্ভক'-এর মতো)রূপ নেয়। খাঁটি অর্থে ইংরেজি কমেডির সূচনা হয় Renaissance-এর পরবর্তী যুগে লাতিন লেখকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে। প্রাথমিক যুগের ইংরেজি কমেডি নাটকের চরিত্র বলতে সাধারণ মানুষ এবং বিষয় বাস্তব জীবনকেন্দ্রিক। হাস্যরসাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভাবন ও প্রয়োগ ছিল এর সাহিত্যিক কৌশল। সঙ্গো ছিল কৌতুকাবহ চরিত্র। কৌতুকরস এবং আমোদ পরিবেশন ছিল এই ধরনের কমেডির লক্ষ্য।

শেকস্‌পীয়ারারের নাটককে অবলম্বন করেই রোমান্টিক কমেডির শ্রেষ্ঠ যুগ চিহ্নিত হয়েছে। কমেডি তখন আর কেবল কৌতুকপূর্ণ প্রহসনধর্মী বা হাস্যরসাত্মক কিছুর অনুকৃতি মাত্র হয়ে থাকল না। প্লটের নির্মাণ-কৌশলে, চরিত্রের চিত্রণে, রোমন্টিক বাতাবরণ সৃষ্টিতে তা এক নাট্যশিল্প হয়ে উঠল। সংলাপও হল নাট্যধর্মী। শেকস্‌পীয়ারের 'As You like It', 'A Midsummer Night's Dream', 'Twelfth Night', 'Much Ado About Nothing'–প্রভৃতি কমেডি নাটকের নাম এই প্রসঙ্গো উল্লেখ্য। এইসব নাটকে প্রেম ও রোমান্স একটি বড়ো উপকরণ। এই রোমান্টিক কমেডিগুলিতে প্রেমের যে উচ্চ এবং সূক্ষ্ম রূপ প্রতিফলিত হয়েছে, তার ফলে এই ধরনের কমেডিগুলিকে 'High Comedy' নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। যাকে বলে ভাবনাদ্যোতক বা চিন্তামূলক হাসি, এ কমেডিগুলির হাস্যরসও ছিল তাই। শেকস্‌পীয়ার ছাড়াও এলিজাবেথীয় যুগের অন্যান্য ইংরেজ নাট্যকারগণও 'High Comedy' রচনা করেছেন।

রোমান্টিক কমেডিরই এক ধারা যেমন High Comedy, তেমনি তার অপর ধারা হল—ট্র্যাজি-কমেডি। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এর মধ্যে ট্র্যাজেডির ভাব-গম্ভীরতার সঙ্গো কমেডির আনন্দদায়ক মনোরম দিকের মিশ্রণ ঘটেছে। নাটকের পরিসমাপ্তিতে নায়ক-নায়িকার মিলন হয় বটে, কিন্তু নাটকটির ভাবপরিমণ্ডলে একটি গাম্ভীর্যময় বিষাদের আভাস ছড়িয়ে থাকে। অবশ্য এই দুই বিপরীত ভাবের মিশ্রণ সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, অনেকের পক্ষেই তা অসাধ্য থেকে গেছে। ট্র্যাজি-কমেডি নাটকের সফল দৃষ্টান্তরূপে শেকস্‌পীয়ারের 'The Merchant of Venice', 'Measure For Measure' প্রভৃতি নাটকের নাম সমগ্র বিশ্বেই পরিচিত। 'The Merchant of Venice' নাটকে নায়ক-নায়িকাগণের মিলন হল বটে, কিন্তু শাইলক পেল না কিছুই, নিঃসঙ্গ হয়ে সে বিদায় নিয়েছে। ফলে মিলনের মধ্যেও কোথাও যেন বিষাদের এক গভীর সুর বেজে উঠেছে।

ট্র্যাজি-কমেডির ধারা ফ্রান্সের বিখ্যাত নাট্যকারগণ—মলিয়ের এবং কর্নেঈ-এর প্রয়াসে এক নতুন কমেডি নাটকের ধারার সৃষ্টি করে, তাকে বলা হয়েছে—'Heroic Comedy'। এই কমেডির কেন্দ্রে থাকেন একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, তাঁরই 'সিরিয়াস' এবং গভীরতাপূর্ণ কথা-কর্মের সঙ্গে প্রহসনধর্মী লঘু-তরলতা যুক্ত করে এ ধরনের কমেডি নাটক রচিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক কমেডিরই প্রশাখা হল—ট্র্যাজি-কমেডি এবং হিরোইক কমেডি।

সামাজিক প্রতিবেশ ও অবস্থাকে অবলম্বন করে কমেডির নানা শ্রেণিবিভেদ দেখা দেয়। ইংলন্ডে রোমান্টিক কমেডির প্রতিক্রিয়ায় বেন জনসন প্রবর্তন করলেন Comedy of Humour। বাস্তব সমাজজীবন ছিল তার উৎস। যে মানুষের কথা-কর্মের সঙ্গে তার মূল ব্যক্তিত্ব সামঞ্জস্যমূলক নয়, সেই অসঙ্গতির মধ্যেই এ ধরনের কমেডির হাস্যরস নিহিত থাকত। অসঙ্গতিজাত হিউমারই লক্ষ্য বলে এদের বলা হত Comedy of Humour। সামাজিক দিক থেকে বিচার করলে এই ধারার কমেডি নাটককে রোমান্টিক কমেডি ধারার বিপরীতে স্থাপনা করা যায়।

Comedy of Humour-এর পাশাপাশি, সমান্তরাল ধারায় ফ্রান্সে আবির্ভূত হল Comedy of Manners। সমকালীন সামাজিক রীতি-নীতি প্রথাকে ব্যঙ্গ-উপহাস করাই এই ধারার কমেডির লক্ষ্য যথা উদ্দেশ্য ছিল। সামাজিক ব্যবস্থায় মানুষ যে-নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়, এই ধরনের কমেডিতে তারই মাধ্যমে হাস্যরস সৃষ্টি করা হয়। এই গোত্রীয় কমেডি সামাজিক দিক থেকে বাস্তব। মলিয়ের এই বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত দৃষ্টান্ত হয়ে আছেন। ইংলন্ডেও পিউরিটান যুগের শেষে Restoration পর্বে (১৬৬০-১৭০০ খ্রিঃ—এই পর্বটিকে ফরাসি সাহিত্যের প্রভাবের পর্ব বলা হয়) Congreve প্রভৃতি প্রতিভাবান কমেডিকারগণের দ্বারা Comedy of Manners-এর ব্যাপক প্রচলন দেখা দেয়। Conedy of Humdur এর মতো Comedy of Manners ও সমকালীন সমাজ ও সামাজিক জীবনের প্রতিবেশ থেকে উৎসারিত। তবে সমাজ বলতে তখনকার ইংলন্ডের অভিজাত সমাজ এবং সেই সমাজের রীতি-প্রথা ও তার অনুভূতিকে ব্যঙ্গ-উপহাস করাই এসব কমেডি নাটকের মূল লক্ষ্য।

Comedy of Manners-এর মধ্যে যে প্রাণপ্রাচুর্য ও আনন্দোল্লাসের দিকটি ছিল, অতঃপর তার অবক্ষয় ঘটে। তখন যে কমেডি ধারাটির উদ্ভব হল, তা Sentimental Comedy নামে পরিচিত। অর্থহীন ভাবাবেগ সর্বস্বতা এবং নিষ্প্রাণ আবেগ ছিল এই ধারার কমেডির প্রধান বিশেষত্ব। দ্বিতীয় ও মধ্যমশ্রেণির নাট্যকারগণ তার রূপদানকারী। জীবন এবং সামাজিক জীবনের প্রতিফলনের মধ্যে ছিল না জীবনের উষ্ম আবেগ—এসে পড়েছিল অতিরঞ্জন প্রবণতা ও কৃত্রিমতা। কিন্তু শীঘ্রই শেরিডান এবং গোল্ডস্মিথ এর মতো কমেডিকারদের আবির্ভাব ঘটল। তাঁদের কমেডি প্রাণপ্রাচুর্যময়, নাম হল—Anti Sentimental Comedy। কৌতুক, নির্বুদ্ধিতা এবং প্রহসনের সংমিশ্রণে এক অভিনব নাট্যধার প্রবর্তন ঘটল। শেরিডানের The Rivals এবং গোল্ড্স্মিথ-এর She Stoops to Conquer নাটকগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক কমেডির সূচনা হয়েছে 'Shavian' নাট্যধারা থেকে, জর্জ বার্নার্ড শ্য যার পুরোধা। এর মধ্যে হাসিও আছে, চিন্তার খোরাকও আছে। একই সঙ্গে আছে শিক্ষা ও আনন্দেরদিক। সেজন্যে এই ধারার নাটককে বলা হয়েছে 'উদ্দেশ্যমূলক কমেডি' (Purpose Comedy)। কমেডির পরিবেশ এখানে অনেকটাই ভাবগম্ভীর, হাসিও চিন্তার উদ্রেককারী, ট্র্যাজেডি-কমেডির কঠোর প্রাচীর এখানে উন্মুক্ত। বার্নার্ড শ্য নিজেই নিজেকে 'a classic writer of comedies' বলেছেন। কমেডির মধ্যে তাঁর উদ্দেশ্য হল, 'to chasten morals with ridicule', ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-উপহাসের মাধ্যমে নৈতিক উপদেশ দান ও সমাজ শোধন করা । মানুষ ও মানুষের সামাজিক জীবনের নানা সমস্যা তাঁর নাটকের আলোচ্য বিষয়। Action-এর চেয়ে সংলাপ তাঁর নাটকের মূল উপকরণ এবং এই সংলাপই তাঁর নাটকের ঐশ্বর্য। চরিত্রগুলি কৌতুহলোদ্দীপক। অনেক সময়েই তাঁর নিজ বক্তব্যের প্রচারক। রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি সম্বন্ধে

অনেকেই সচেতন নন, কমেডির তীক্ষ্ণ সংলাপের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করাই, তাঁর মতে কমেডির লক্ষ্য। তাঁর 'Man and Superman' নাটককে তিনি একই সঙ্গে কমেডি এবং 'দর্শন' বলেছেন। Arms and The Man', 'Pygmallion' 'Candida' প্রভৃতি তাঁর সর্বজন পরিচিত কমেডি নাটক।'

পণ্ডিতজনেরা কমেডির শ্রেণিবিভাগ অন্যভাবেও করেছেন। যেমন—Genteel Comedy এবং Comedy of Intrigue। Genteel কথাটির অর্থ হল, ভদ্র-শোভন-আদবকায়দা দোরস্ত লোক,. এর সঙ্গে ভাবগত সাদৃশ্য আছে Sentimental Comedy-র। Intrigue কথাটির অর্থ—ষড়যন্ত্র, গুপ্ত চক্রান্ত। নাটকের প্লটের মধ্যে যেখানে একটি বিশেষ ষড়যন্ত্র থাকে। এর সঙ্গে তুলনীয় হল—Anti Sentimental Comedy, Comedy of Humour এবং Comedy of Manners। এই শেষোক্ত ধরনের কমেডিগুলিকে বাস্তবজীবন ঘটিত কমেডি বলা যেতে পারে।

একাংক নাটক রূপেও কমেডি নাটক রচিত হয়েছে। অনেক নাট্যকারই এ বিষয়ে সফল হয়েছেন।

এইবারে কয়েকটি বাংলা কমেডি নাটকের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বাংলা কমেডির উদাহরণ প্রসঙ্গে দু'টি কথা মনে রাখা বিশেষ প্রয়োজন ঃ এখানে কমেডি-প্রহসন মিলে-মিশে গেছে, লেখক সমালোচকেরাও এ দু'টিকে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে মিশিয়ে ফেলেছেন। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত নাটকের কমেডির ধারা প্রথম যুগের কমেডিকারদের বিশেষত প্রভাবিত করেছে।

যেমন মাইকেলের 'শর্মিষ্ঠা' নাটক। শর্মিষ্ঠা-যযাতি-দেবযানী মিলে যে একটি ত্রিকোণ প্রেমের সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তা একটি খাঁটি কমেডির সৃষ্টি করতে পারত। মাইকেল প্রাচীন ভারতীয় রীতির অনুসরণে (যেহেতু কাহিনী মহাভারত থেকে নেওয়া) শর্মিষ্ঠা-দেবযানীর সঙ্গে যযাতির মিলনসাধন করে কমেডি লিখেছেন। কমেডির হাস্যরসের দিকটিকে বিদূষকের দ্বারা পূরণ করা হয়েছে। দীনবন্ধু মিত্রের 'লীলাবতী'তে নায়ক-নায়িকার চরিত্রের পারিবারিক পরিচয়ের রহস্য একটি ভালো কমিক উপকরণে পরিণত হতে পারত। পুরুষের স্ত্রী-সাজা এবং কমেডি নাটকের বিশেষ পরিস্থিতি নির্মাণ শেকস্‌পীয়ার থেকে রবীন্দ্রনাথের নাটক পর্যন্ত সর্বত্রই দেখা যায়, কিন্তু 'লীলাবতী'তে দীনবন্ধু এটিকে আরো নাটকীয় করে তুলতে পারতেন। কোনো-কোনো বিশেষ ধরনের কমেডিতে যে সমকালীন সমাজ পরিস্থিতি একটি প্রধান দিক হয়ে ওঠে, 'লীলাবতী'তে তা নিদর্শনও (যথা—কৌলীন্য প্রথা, ব্রাহ্মসমাজের ভূমিকা, স্ত্রীশিক্ষা) মেলে।

অমৃতলাল বসুর 'খাসদখল' একটি ভালো কমেডি নাটক, যদিও কেউ কেউ এটিকে প্রহসনও বলেন। কোনো-কোনো সমালোচক ইংরেজি Comedy of Romance-এর নিদর্শন এর মধ্যে পেলেও আসলে এটি Comedy of Manners। ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা স্ত্রীশিক্ষার প্রবর্তন, বিধবার পুনর্বিবাহ ইত্যাদি সমকালীন সামাজিক প্রসঙ্গ এতে স্থান পেয়েছে,—যদিও এখানে রোমান্টিক উপকাহিনীও আছে। শেষ দৃশ্যে মূলকাহিনী এবং উপকাহিনী—দুই কাহিনীরই নায়ক-নায়িকার মিলন ঘটেছে। ষড়যন্ত্র ও Intrigue এটির মধ্যে প্রাধান্য পেয়েছে। চিকিৎসকদের প্রতি কিছু আক্রমণাত্মক মন্তব্যও আছে।

আধুনিক নাট্যকারদের মধ্যে বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'তাইতো' একটি সুন্দর কমেডি। মিলন এবং হাস্যরস—কমেডির দুই প্রধান উপকরণের শিল্পসম্মত প্রয়োগ নাট্যকার প্রদর্শন করেছেন। নাট্যকারের নিজের মন্তব্য অনুসারে—সমস্যাময় জীবনের মধ্যে তিনি মানুষকে কিছু আনন্দদান করতে চান। নাটকটির সংলাপের বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

৯২.৭ প্রহসন নাটক ঃ বিবর্তন, শ্রেণিবিভাগ, উদাহরণ

ইংরেজিতে যাকে বলে Farce, বাংলায় তাকেই বলা হয় প্রহসন। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে প্রহসনের একটি বিশিষ্ট ইতিহাস ও ঐতিহ্য আছে, যেমন ইংরেজি Farce-এর। ইংরেজি Farce যে ভারতীয়

প্রহসনের প্রতিশব্দ, একথা সম্ভবত প্রথম বলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তাঁর পত্রাবলীতে। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' রচনাটির আখ্যাপত্রে তিনি 'প্রহসন' অভিধাটির ব্যবহার করেছেন।

কারো-কারোর অনুমান, সম্ভবত ফ্রান্সেই Farce-এর উদ্ভব হয়। তার একটি কারণ, লাতিন 'Faracire' (= to staff) শব্দটি ফরাসি ভাষায় Farce রূপেই প্রচলিত হয়। গ্রাম্য লাতিন ভাষায় বলা হত 'Farsa'। প্রাথমিক স্তরে Farce ছিল এক ধরনের প্রস্তুতিবিহীন নাটক। গুরুগম্ভীর বা অন্য যে কোনো নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের ফাঁকে-ফাঁকে যা staff করে দেওয়া বা ভরে দেওয়া হতো। ফলে পরবর্তীকালে হৈ-চৈ গণ্ডগোল পূর্ণ উদ্দামতাময় Comic Action রূপে এগুলির বিবর্তন ঘটে। Farce এর মূল লক্ষ্য ছিল, বাহ্যিক দৃশ্য-ঘটনা দ্বারা মানুষকে হাসানো। কোনো পরোক্ষ ভাবে নয়,—খাঁটি কমেডিতে যা হয়ে থাকে। হাসির মাত্রাভেদের দিক থেকে এখানেই প্রহসন ও কমেডির মধ্যে মূল পার্থক্য। প্রহসনের মধ্যে থাকে আকস্মিকভাবে কোনো কিছুর আবির্ভাব বা উপস্থিতি, দৈহিক অঙ্গভঙ্গি, পুনরাবৃত্তি, চরিত্রগত অতিশেয়োক্তি। এর জগৎ সম্ভব-অসম্ভবের এক মিশ্র জগৎ। ফরাসি নাট্যকার মলিয়ের নানাভাবে এই প্রাথমিক ও সম্পূর্ণ নাট্যধারাটির উন্নতিসাধন করেন। নানা অভিঘাতের মধ্য দিয়ে ধারাটি বেঁচে থাকে এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশে সেটি ছড়িয়ে পড়ে।

যোড়শ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের নাটকের মধ্যে একটি মিশ্র ধারার প্রবর্তন ঘটল, প্রহসনের ধারাটি তার মধ্যে একটি বড় দিক। এর বৈশিষ্ট্য হলো কোনো গুরুগম্ভীর বিষয়ের নাটকের মধ্যে কিংবা অন্য যে কোনো বিষয়ের নাটকের বিভিন্ন দৃশ্যের ফাঁকে ফাঁকে কোনো 'Farcial Episode' অনুপ্রবিষ্ট করিয়ে দেওয়া। শেকস্পীয়ারের বিভিন্ন কমেডি নাটকে (যথা : 'Comedy of Errors', A Midsummer Night's Dream'. The Twelfth Night' প্রভৃতি নাটকে। এই Episode বা খণ্ডকাহিনীগুলিকে বলা হতো Burlesque,—যার পরিচয় লিখেই দেওয়া হয়েছে) এগুলির প্রয়োগ দেখা যায়। ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে Commonwealth Period-এ প্রহসন একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নাট্যধারা হয়ে উঠলেও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিক থেকেই প্রহসন অন্য কোনো নাটকের শেষে অভিনীত হতে থাকে Afterpiece রূপে। After-piece রূপে প্রহসন নাটকের চাহিদা বেড়ে যেতেই ইংরেজি নাট্যধারায় এর নিজস্ব বিশিষ্ট প্রয়োগ প্রচলিত হল,—রচনা রীতিতেও পরিবর্তন এল। সেজন্য Sentimental Comedy, Melodrama প্রভৃতির সঙ্গে প্রহসনের মিশ্রণ ঘটে গেল। Farce বা প্রহসনের রচনানীতির মধ্যে Parody, Burlesque, Travesty (কোনো কিছুর হাস্যকর অনুকরণ করা) প্রভৃতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। তিনটির সঙ্গেই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সংযোগ আছে, প্রহসনেও তা আছে।

পাশ্চাত্য প্রহসনের উদ্ভব ও রচনাগত বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে দেশের সামাজিক অবস্থা বিপর্যয়ের সংযোগের কথা বিশেষভাবে বলা হয়ে থাকে। "প্রহসন-সামাজিক উপপ্লবের ও অশান্তির নির্দেশক।" অর্থাৎ যখনই কোনো দেশে বা সমাজে কোনো বিরুদ্ধ-বিরূপ রীতি-নীতির অনুসরণ দেখা যায়, তখনই তার প্রতিক্রিয়ায় সে দেশে প্রহসন ও Farce রচিত হয়। সমাজের এই বিপর্যয়ের কথাটি মনে রেখেই প্রহসনের প্রসঙ্গে Comedy of Manners-এর কথাটি উঠে পড়ে। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে মলিয়ার এই ধারাটির প্রবর্তন করতে শুরু করেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মলিয়ারের 'The Cit Turned Gentleman'-এবং 'Marriage Force', এ দুটি প্রহসনের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, যথাক্রমে 'হঠাৎ নবাব' এবং 'দায়ে প'ড়ে দারগ্রহ ' নামে।

প্রাচীন ভারতীয় নাট্যধারার অন্তর্গত প্রহসনের কথাও এখানে বলা প্রয়োজন। দীর্ঘায়ত সংস্কৃত নাটকের সমান্তরাল ধারায় হাস্যোদ্রেকের জন্য এক ধরনের স্বল্পায়তন নাটকের কথা সংস্কৃত আলংকারিকেরা বলেছেন, যার নাম প্রহসন। বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্যদর্শন' গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে প্রহসন সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেন, প্রহসন হবে একটি অঙ্কে প্রসারিত, কখনো বা দুই অঙ্কের।

হাস্যরস হবে তার মুখ্যরস, আখ্যানবৃত্তটি হবে কোনো নিন্দার্হ ব্যক্তিকে নিয়ে। নাটকে যদি একটি মাত্র ধৃষ্ট চরিত্র থাকে তবে তা হবে 'শুদ্ধ' স্তরের। আর যদি একাধিক ধৃষ্ট চরিত্র থাকে, তবে তা 'সংকীর্ণ' স্তরের প্রহসন। তবে, নায়ক চরিত্র হবে একজন তপস্বী বা বিপ্র। সংস্কৃত প্রহসনের দৃষ্টান্তরূপে 'কৌতুকসর্বস্ব', হাঁস্যার্ণব প্রভৃতির নাম করা যায়।

সংস্কৃত প্রহসনগুলির ধৃষ্ট বা নিন্দনীয় চরিত্রগুলি হতো নাট্যকারের কল্পিত। বাংলা প্রহসনগুলির মধ্যে বাস্তবতা এবং এমনকি কোনো-কোনো ক্ষেত্রে প্রকৃত বিষয়ই গৃহীত হতো। প্রহসনের ধারাটিকেই আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতার প্রাথমিক বিকাশ ঘটে। হাস্যরসাত্মক চরিত্র পরিস্থিতি-খণ্ডকাহিনী-নক্‌শাধর্মী আখ্যান সৃষ্টি করে সমাজ-শোধনের প্রয়াস বাংলা প্রহসনের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। সমাজ-শোধন বিশ্বের অন্যান দেশের প্রহসনেরও উদ্দেশ্য। প্রহসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের বিবর্তনটি এই রকমের : প্রথমে ব্যক্তিগতভাবে কোনো চরিত্রকে ব্যঙ্গ-উপহাস, তারপর নিছক ও আমোদমূলক হাস্যরসের যোগান দেওয়া, শেষে হাস্য-ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজ-শোধন করা। বাংলায় প্রহসনের নানা প্রতিশব্দ মেলে : 'সমাজচিত্র', 'সামাজিক নক্‌শা', 'পঞ্চরং'। সুকুমার সেন 'পঞ্চরং'-এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন এই বলে : 'বিদ্রূপাত্মক প্রহসন'। কাজেই প্রহসনের উদ্দেশ্য—কখনো বিদ্রূপ প্রকাশ, কখনো নিছক রঙ্গ-কৌতুক, আবার কখনো বা সমাজ-শোধন।

বাংলা প্রহসনের উদাহরণ : মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'একেই কি বলে সভ্যতা?' এবং 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ'—এই দুখানি রচনা বাংলা সাহিত্যের দুটি সেরা প্রহসন। সাহিত্যের ঐতিহাসিক লক্ষ্য করেছেন, এই দুটি রচনার প্রভাবে পরবর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রচুর প্রহসন লিখিত হতে থাকে। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির নামকরণের প্রভাবে ছড়া-প্রবাদের পঙ্‌ক্তি দিয়েই বাংলা প্রহসনের নামকরণের প্রথার সৃষ্টি হয়। এতে বাস্তবতা, কৌতুক-রঙ্গ-ব্যঙ্গ ভালোভাবে ফোটে। 'একেই কি বলে সভ্যতা?' প্রহসনটিতে 'ইয়ং বেঙ্গল' গোষ্ঠীর মদ্যপানের অতিরেক এবং আধুনিকতার নামে পানভোজনের প্রথাকে ব্যঙ্গ করা হলেও রচনাটির মধ্যে সাহিত্যিক কৌশলেরও অনেক দিকের প্রকাশ ঘটেছে। এটি নিছকই একটি প্রহসন নাটক নয়। 'বুড় সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটিতে প্রাচীনপন্থী মানুষদের অনাচার এবং তাদের শাস্তি প্রদর্শিত হয়েছে। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' বিশুদ্ধ প্রহসনের চরম দৃষ্টান্ত,—প্রহসনের সংজ্ঞার সব দিক বিচার করে দেখলে নিখুঁত সৃষ্টি,—যদিও ব্রাহ্মধর্মের প্রতি একটু প্রাসঙ্গিক তির্যক মন্তব্য মেলে। 'অলীকবাবু', সেই তুলনায় ততোখানি সফল সৃষ্টি নয়। এর আগে দীনবন্ধু তাঁর 'জামাইবারিক' (শ্বশুরবাড়িতে সব ঘর-জামাইদের 'ব্যারাক',—তার থেকে 'বারিক') প্রভৃতি প্রহসনের মধ্যে হাসির শুচিতা যেন রক্ষা করে উঠতে পারেন নি, কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হাসির শুদ্ধতা রক্ষার প্রথম শিল্পী। গিরিশচন্দ্র মূলত সীরিয়াস নাট্যকার, তথাপি তিনি 'পঞ্চরং' আখ্যায় কয়েকটি প্রহসন লিখেছিলেন,—সেগুলির তেমন সাহিত্যিক সাফল্য নেই। কিন্তু গিরিশচন্দ্রের শিষ্য অমৃতলাল বসু ব্যঙ্গাত্মক Satire-ধর্মী প্রহসন রচনা করে বাংলা সাহিত্যে আজও অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। উচ্চ ও অভিজাত সমসাময়িক সমাজের নর-নারীদের বিচিত্র কর্মাবলী তাঁর প্রহসনের মূল লক্ষ্য যদিও কখনো কখনো তিনি রক্ষণশীল দৃষ্টিকোনের পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন। সংলাপের ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ বৈদগ্ধ্যের প্রমাণ দিয়েছেন। 'বিবাহ বিভ্রাট' তাঁর একটি জনপ্রিয় প্রহসন। 'সম্মতি সঙ্কট', 'বাবু', 'একাকার', 'গ্রামবিভ্রাট' প্রভৃতি তাঁর অন্যান্য প্রহসন। দ্বিজেন্দ্রলালের প্রহসনের মূলধন তাঁর গান। 'কল্কি অবতার' সমকালীন জাতিভেদ প্রথাকে বিদ্রুপ করে রচিত, 'বিরহ' বিশুদ্ধ শ্রেণির প্রহসন, 'আনন্দবিদায়' রবীন্দ্রসাহিত্যের 'প্যারডিমূলক' প্রহসন। বিশুদ্ধ হাস্যরসের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রহসন নাটক 'বৈকুণ্ঠের খাতা' এবং 'গোড়ায় গলদ' দুটি অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

৯২.৮ অনুশীলনী

(ক) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

(১) কমেডি কথাটির উদ্ভব হয়েছে কোন্ কথাটি থেকে?
(২) কমেডির মূল বিশেষত্ব দুটি কী?
(৩) ট্র্যাজেডি-কমেডির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কোন্ বিভেদকে মান্য করেছেন?
(৪) Burlesque, Travesty, Interlude কথাগুলির অর্থ কী?
(৫) শেকস্‌পীয়ারের কয়েকটি কমেডি নাটকের নাম বলুন।
(৬) High Comedy, Comedy of Humour, Comedy of Manners, Sentimental Comedy প্রভৃতির পরিচয় দিন।
(৭) Purpose Comedy বলতে কী বোঝেন?
(৮) Genteel Comedy এবং Comedy of Intrigue বলতে কী বোঝায়?
(৯) Farce কথাটির উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(১০) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মলিয়েরের কোন্ প্রহসন দুটির বঙ্গানুবাদ করেন?

(খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত আলোচনা করুন ঃ

(১) অ্যারিস্টটলের 'Poetics' গ্রন্থে কমেডি সম্পর্কে কী বলা হয়েছে?
(২) কমেডি এবং প্রহসনের মধ্যে পার্থক্য কোথায়?
(৩) কমেডির হাস্যরস সম্পর্কে মন্তব্য করুন।
(৪) কমেডির শ্রেণিভেদ সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(৫) বার্নার্ড শ্যর কমেডি নাটকের বিশেষত্ব কী?
(৬) বাংলা কমেডি নাটকের কয়েকটি উদাহরণ দিন ও সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(৭) প্রহসনের উদ্ভব হয় কী প্রকারে?
(৮) প্রাচীন ভারতীয় প্রহসন নাটকের বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করুন।
(৯) বাংলা প্রহসন নাটকের উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৯২.৯ পৌরাণিক নাটক ; উদাহরণ

বাইবেলকে আশ্রয় ও অবলম্বন করে মধ্যযুগের ইউরোপে এক বিশেষ নাট্যধারার সৃষ্টি হয়, যাকে বলা হত—Miracle Play। মানুষের সৃষ্টি ও জন্ম, তার পতন, উদ্ধার-মুক্তি-প্রায়শ্চিত্ত ইত্যাদি ছিল এসব নাটকের আলোচ্য বিষয়। প্রথম পর্বে একে বলা হতো Mystery Play, যার থেকে ইউরোপে পরবর্তীকালে সৃষ্টি হয় Miracle Play-এর। এর আলোচ্য বিষয় ছিল, ধর্মীয় মহাপুরুষ এবং সাধুসন্তদের জীবনী ও জীবনলীলা, তাঁদের অলৌকিক ক্রিয়াকর্ম। তাঁদের সম্পর্কে প্রচলিত কিংবদন্তী ও কথা-কাহিনী ইংরেজি সাহিত্যে এর নিদর্শন ত্রিশচিহ্ন, কিন্তু ফ্রান্সে এই ধারাকে অবলম্বন করে বিখ্যাত কথা কাহিনীর ধারা সঞ্জীবিত। এ ধরনের রচনা সংখ্যায় ৪২টি,—মানুষের কর্মকৃতি সেগুলির আলোচ্য বিষয় এবং সবগুলিই শেষ হয়েছে কুমারী মেরীর (অর্থাৎ The Blessed Virgin, যিশুর জননী) অলৌকিক হস্তক্ষেপ। জার্মানিতে এই ধারার সন্ধান মেলে।

Mystery play-র সৃষ্টি হয়েছিল গির্জার প্রার্থনানুষ্ঠানের নিয়ম-বিধি-পদ্ধতির অনুসরণে, সঙ্গে ছিল ঈস্টারের সময় সংলাপমূলক বিশেষ অনুষ্ঠান। অর্থাৎ ধর্মানুষ্ঠানের সঙ্গে মধ্যযুগীয় ইউরোপের নাট্যোৎপত্তির একটি বিশেষ সংযোগ ছিল। ভক্তিভাবের উদ্দীপন ছিল এগুলির লক্ষ্য। প্রথমে এগুলি লাতিন ভাষায় লিখিত হত এবং যাজকদের দ্বারা চার্চেই অভিনীত হত। ক্রমে-ক্রমে তাতে অনুপ্রবেশ করতে থাকে আঞ্চলিক ভাষা, ছোট-ছোট লোকসঙ্গীত বা শোককবিতাও এই সঙ্গে গাওয়া হতে শুরু করে। ফলে এতে ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে এক অসাম্প্রদায়িক অনুষঙ্গের সৃষ্টি হয়, প্রয়োজনীয় নাট্যিক অঙ্গভঙ্গিও যুক্ত হয়। ফলে চার্চের অভ্যন্তরে যা অনুষ্ঠিত হতো, তা চার্চের প্রাঙ্গণে এবং সেখান থেকে হাটে-বাজারে অনুষ্ঠিত হতে থাকে। নাট্যরূপ ধীরে-ধীরে দীর্ঘায়ত হতে থাকে, সংলাপে আঞ্চলিক ও স্থানীয় ভাষা বেশি পরিমাণে গৃহীত হতে থাকে। হাট-বাজারের সংস্পর্শে ব্যবসায়ীদের এক-একটি সমবায় সংঘ এক-একটি ধর্মীয় বিষয়-প্রসঙ্গকে প্রাধান্য দিতে থাকে। যেমন, রাজমিস্ত্রিদের সমবায় সংঘ অভিনয় করত নোয়া-সম্পর্কান্বিত কাহিনী (Noah Story), তাঁতিরা অভিনয় করত যিশুর ক্রুশবিদ্ধ হবার কাহিনী। এইভাবে বাইবেলের এক-একটি অংশের কাহিনীর নাট্যাভিনয় করা হতো। যবনিকা দেওয়া বগিগাড়ির (Wagon) ওপর অভিনয় করা হত, নীচের দিকে থাকত সাজঘর। এক জায়গার অভিনয় প্রদর্শন হয়ে গেলে অন্য জায়গায় সেই বগি ঠেলে নিয়ে যাওয়া হতো, এবং বাইবেলের এক-একটি অংশের পর-পর অভিনয় করা হতো। এইভাবে এক একটি পর্বকে বলা হতো—'York'। তা হতো ৪৮টি খণ্ডকাহিনীর সমাহার। অধিকাংশ নাট্যরচনাগুলিই নামহীন রচকের। পদ্যাংশ অতি সাধারণ মানের, চরিত্রাভিনয়ও স্থূল প্রকারের।

আশ্চর্যের কথা এই ভারতীয় পৌরাণিক নাটকেরও উদ্ভবকথা প্রায় এরই কাছাকাছি সময়ে। চার্চের অভ্যন্তর থেকে চার্চের বাইরের প্রাঙ্গণে এসে অভিনয় করাকে বলা হত Profane (অর্থাৎ যা 'অপবিত্র', যাজকদের জন্য নয়, যা সাধারণ মানুষদের জন্য। 'Profane' কথাটির উদ্ভব হয়েছে 'Pro fano' থেকে, যার অর্থ 'গির্জা বা মন্দিরের বাইরে')। গির্জার বাইরের প্রাঙ্গণের সঙ্গে তুলনীয় হল— 'নাটগীতি'— দেবমন্দিরের সংলগ্ন নাটমন্দিরে যে গীতি-অভিনয় হত। প্রাচীন ভারতে এক-একটি নাট্যদল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ঘুরে ঘুরে নাট্যাভিনয় করত। এসব নাটকের বেশির ভাগই দেবলীলা বিষয়ক কিংবা বিভিন্ন পুরাণ গ্রন্থ থেকে গৃহীত এক-একটি কাহিনীর নাট্যরূপ। এজন্যেই এগুলির নাম—পৌরাণিক নাটক (Mythological Play)।

এইখানে 'ভক্তিমূলক নাটক' (Devotional Play) এবং 'পৌরাণিক নাটকে'র (Mythological Play) মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে হবে। ভক্তিমূলক নাটকে ভক্তিভাব উৎসারণ ও উদ্দীপনটাই বড়ো কথা, সেটাই এর মূল লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। তা একটি নাটক খাঁটি নাটক হয়ে উঠল কি না, সেটাও সেখানে তেমন বড়ো কথা নয়। কিন্তু খাঁটি পৌরাণিক নাটকে পুরাণাশ্রিত কাহিনী যেমন থাকবে, পৌরাণিকঅনুষঙ্গকে যেমন সাধারণভাবে লঙ্ঘন করা চলবে না, তেমনি নাটকের চরিত্রায়ণের ক্ষেত্রে বা গঠনতত্ত্বের ক্ষেত্রে তাকে একটি নাটকের সকল নিয়ম-বিধিকে মেনে চলতে হবে। পৌরাণিক নাটকের মধ্যেও ভক্তিভাব থাকতে পারে, থাকেও কিন্তু সেই ভক্তিভাব উদ্দীপনের ক্ষেত্রে অন্যান্য নাটকের সাধারণ নিয়মাবলী নাট্যকারকে অবশ্যই পালন করতে হবে। ভক্তিমূলক উদ্দীপনের ক্ষেত্রে অন্যান নাটকের সাধারণ নিয়মাবলী নাট্যকারকে অবশ্যই পালন করতে হবে। ভক্তিমূলক নাটকের ভাবানুষঙ্গ মোটামুটি ভাবে অলঙ্ঘ্য, তার নাট্যায়নও তেমন উচ্চ কলা-কৌশলমূলক নয়। কিন্তু পৌরাণিক নাটকে অনেক সময় নাট্যকার অভিনব কোনো অর্থ-ব্যঞ্জনার সঞ্চার করতে পারেন। একই ভীষ্ম চরিত্র নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নাটক লিখেছেন। কিন্তু দুজনের চিন্তায় সেই ভীষ্ম ভিন্নরূপে প্রকাশিত। নাট্যকার মন্মথ রায় তাঁর 'কারাগার' নাটকে কংসের কারাগারকে পরাধীন ভারতবর্ষ রূপে ব্যঞ্জিত করেছেন। পৌরাণিক

নাটককে প্রথমে হতে হবে একটি নাটক, নাট্যশিল্পের সকল দাবি তাকে মেটাতে হবে, পরে তার পুরাণাশ্রিত বিষয় ও কাহিনী। ভক্তিমূলক নাটকে ভক্তিভাবটিই প্রধান লক্ষ্য, নাট্যশিল্পের দাবিপূরণটি নয়। ভক্তিমূলক নাটকের সঙ্গে যাত্রা-র একটি বিশেষ যোগ আছে। যাত্রার বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গ ও উপস্থাপনের রীতিগত বৈশিষ্ট্য, অভিনয়প্রথা—সবই ভক্তি-উৎসারণের পরিপোষক ও অনুকূল। অবশ্য বর্তমান কালে যাত্রা অনেক বিবর্তন ঘটেছে এবং তা নিয়মিত নাটকের কাছাকাছি চলে এসেছে।

বাংলা নাটকের প্রাথমিক যুগে 'অপেরা' বা গীতাভিনয়ের মাধ্যমে ভক্তিভাব উৎসারণে যাঁদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য, তাঁদের মধ্যে মনোমোহন বসুর নাম করতে হয়। এ-ধরনের রচনা ছিল যাত্রা এবং খাঁটি নাটকের মাঝামাঝি স্তরের সৃষ্টি। 'রামাভিষেক', 'সতী', 'হরিশ্চন্দ্র' প্রভৃতি তাঁর রচনা। করুণরসকেই তিনি বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন। অতঃপর রাজকৃষ্ণ রায় রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি নাটক লেখেন। সীতার অগ্নিপরীক্ষা নিয়ে রচিত 'অনলে বিজলী'তে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ করেন।

গিরিশচন্দ্রই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাট্যকার। তিনি জানতেন, ভক্তিভাব বাঙালির এক জাতীয় মনোভাব। সেই মনোভাবটিকেই তিনি নানা পৌরাণিক নাটকের মধ্যে ফুটিয়ে তুলেছিলেন। 'পাণ্ডব গৌরব' ও 'জনা' তাঁর শ্রেষ্ঠ দু'খানি পৌরাণিক নাটক। ভক্তিভাবের আতিশয্যের কারণে 'জনা' নাটকের শেষে একটি 'ক্রোড় অঙ্ক' যোজনা করেন, যা সমালোচনার কারণ হয়েছিল। তবে একথাও আমাদের মনে রাখতে হবে যে, এটি 'অতিরিক্ত' একটি অঙ্ক,—নাটকের অঙ্কের মধ্যে বিবেচ্য নয়। গিরিশচন্দ্রের পর দ্বিজেন্দ্রলাল ও ক্ষীরোদপ্রসাদ পৌরাণিক নাটক লেখেন। ঐতিহাসিক নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে-প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন, 'পাষাণী' বা 'সীতা'তে তা দিতে পারেননি। বরং অমিত্রাক্ষর ছন্দের সার্থক প্রয়োগে এবং ভীষ্মচরিত্রের পরিকল্পনায় তাঁর 'ভীষ্ম' নাটকটি একটি উল্লেখযোগ্য নাট্যকর্ম। ভীষ্ম চরিত্র নিয়ে ক্ষীরোদপ্রসাদ নাটক লিখলেও তাঁর শ্রেষ্ঠ পৌরাণিক নাটক 'নব-নারায়ণ'। এই নাটকের কর্ণ চরিত্র বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পৌরাণিক নাট্যধারা নানা সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাহিত্যিক কারণে স্তব্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীকালে মন্মথ রায়, যোগেশ চৌধুরী প্রভৃতি নাট্যকারেরা নব মানবিকতার ভাবরসে উদ্বুদ্ধ হয়ে পৌরাণিক নাট্যরচনায় উদ্যোগী হন। মন্মথ রায়ের 'কারাগার', 'দেবাসর', 'সাবিত্রী', 'চাঁদ সদাগর' প্রভৃতি পৌরাণিক নাটকের মধ্যে 'কারাগার' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যোগেশচন্দ্র চৌধুরী তাঁর পৌরাণিক নাটক 'সীতা'র মধ্যে অর্ন্তদ্বন্দ্বের সৃষ্টি করে অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

৯২.১০ ঐতিহাসিক নাটক, উদাহরণ

যে নাটক ইতিহাসভিত্তিক, তাই ঐতিহাসিক নাটক। এখানে ইতিহাসের ঘটনার কালানুক্রমকে ও ঘটনার বিশুদ্ধিকে যে রকম রক্ষা করতে হবে, তেমনি চরিত্রের পরিকল্পনায়, নাট্যশিল্পের অনুসরণে তাকে খাঁটি নাটক হয়েও উঠতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাস ও নাটকের সংমিশ্রণের ফলে সৃষ্টি হলো—ঐতিহাসিক নাটক। ঐতিহাসিক নাটকের মূল লক্ষ্য হল, যে যুগ-কাল-পরিস্থিতিতে নাটকটি কল্পিত হয়েছে, সেই সময়কার ভাবানুষঙ্গ অনুসারে একটি 'ঐতিহাসিক রস' ফুটিয়ে তোলা, অপরদিকে ঐতিহাসিক চরিত্র অবলম্বন করে, অতীতের মধ্যে চিরকালের উপস্থিতিকে আবিষ্কার করা। যে নাট্যকার এই দুইদিকের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টি করতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার। পৌরাণিক নাটকের মতো ঐতিহাসিক নাটককেই প্রাথমিকভাবে হয়ে উঠতে হবে একটি নাটক, পরে তার বিষয়গত ইতিহাস-ভাবনার দিকটির কথা। এখানেও একই ঐতিহাসিক চরিত্র দুই নাট্যকারের যুগ ও ব্যক্তিমানসের ভিন্নতা অনুসারে

ভিন্ন হয়ে যায়। যেমন, 'ক্লিওপেট্রা' চরিত্রটি। একই ক্লিওপেট্রা চরিত্র নিয়ে শেকস্‌পীয়র ও বার্নার্ড শ্য নাটক লিখেছেন। কিন্তু দৃষ্টিকোণের স্বাতন্ত্র্যের কারণে সেই ক্লিওপেট্রা ভিন্নরূপে প্রদর্শিত।

ঐতিহাসিক নাটকের প্লটের গঠনরীতি সম্পর্কে যিনি সর্বাগ্রে আলোচনা করেছেন, তিনি অ্যারিস্টটল। তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে তিনি ট্র্যাজেডির প্লট নিয়ে আলোচনা কালে, প্রসঙ্গক্রমে, ঐতিহাসিক নাটকের প্লটের কথাও তুলেছেন। চরিত্রের চেয়েও তিনি প্লটকে ওপরে স্থান দিয়েছেন। অবশ্য, প্লটকে তিনি সর্বাত্মক একটি নাট্যপরিকল্পনা বলে মনে করেন। নাট্যকার এমনভাবে কাহিনী-ঘটনার ঐক্য-অখণ্ডতাময় উপস্থাপনা করবেন, চরিত্রের Action-এর মাধ্যমে তার চিন্তা-উদ্দেশ্য-Dianoia কে তুলে ধরবেন যেন নাট্য-পরিণতিতে উদ্দিষ্ট ফল লাভ করা যায়। অ্যারিস্টটল যেমন নাট্যরূপের দিকটিকে ব্যক্ত করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহ' নিয়ে আলোচনাকালে ঐতিহাসিক ভাব ও রসের কথা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক (বা নাট্যকার) যেন পাঠককে (দর্শক) মহাকালের দরবারে নিয়ে যান—অর্থাৎ অতীতের সমুন্নতিময় এক বৃহৎ সত্তার ক্ষেত্রে নিয়ে যান। একে যেন এক ধরনের সাহিত্যিক মুক্তির আস্বাদ দেওয়া বলা যায়। এ হলো ইতিহাসের দেশ-কালাতীত বৃহৎ অঙ্গনে পাঠক-দর্শককে নিয়ে এক চিরন্তন সত্যের মধ্যে তাদের মুক্তি দেওয়া।

তবে সেই কর্মসাধনের জন্য ঐতিহাসিক নাট্যকারের কিছু সাহিত্যিক স্বাধীনতাও আছে। ইতিহাসের মূল মর্মকথাটিকে ব্যক্ত করবার জন্য কিংবা তিনি যে অভিনব সত্যটিকে সেই নাটকে মুখ্য করে তুলতে চান, সেজন্য ইতিহাস-বহির্ভুত কোনো চরিত্রকে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু দেখতে হবে সে চরিত্র অনৈতিহাসিক হলেও নাটকের ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্যমূলক হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়ত, সেই চরিত্রগুলির যেন নাটকীয় মূল্য ও নাটকীয় তাৎপর্য থাকে। নাটকের অন্তর্গত কালগত ঐতিহাসিক পরিবেশের পক্ষে স্বাভাবিক-সঙ্গত-সামঞ্জস্যমূলক না হলেই সে চরিত্র কালানৌচিত্য দোষে দুষ্ট হয়ে উঠবে। একেই বলা হয় Anachronism। যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকে সুজার পত্নী পিয়ারা কীর্তনগান গেয়েছে। একটি মুসলমান চরিত্রের পক্ষে, এই বিশেষ ধরনের গান নাটকের ভাব-পরিবেশের পক্ষে সঙ্গত হয়নি। কিন্তু গিরিশচন্দ্রে 'সিরাজদ্দৌল্লা' নাটক করিমচাচা চরিত্র বা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একই নামের নাটকে আলেয়া বা গোলাম হোসেন চরিত্র অনৈতিহাসিক ও কাল্পনিক চরিত্র,—তবে নাটকের ভাবগত পরিবেশের দিক থেকে অস্বাভাবিক বা অসামঞ্জস্যমূলক বলে মনে হয়না। নাট্যকার যদি কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র বা নাটকের মাধ্যমে কোনো অভিনব ভাবসত্যের ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তুলতে চান, তবে তাঁকেও সমগ্র নাট্যপরিবেশের পক্ষে সহজগ্রাহ্য ও স্বাভাবিক হতে হবে। কেবল চরিত্র পরিকল্পনাতেই নয়, নাটকের পরিস্থিতিতে সংলাপে, দৃশ্য পরিকল্পনায়, সর্বত্রই নাট্যকারকে ঐতিহাসিক পরিবেশ ও পরিমণ্ডল সম্পর্কে সজাগ থাকতে হয়।

কেন নাট্যকারেরা ঐতিহাসিক নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত হন? ইতিহাসের মধ্যে আছে এক রোমান্টিক পরিমণ্ডল, তার কাহিনীতে আছে আখ্যানের চমকপ্রদ দিক, চরিত্রের মধ্যে আছে চিরকালীন মানুষের আবেগ-উৎকণ্ঠা-দ্বন্দ্ব। সে রাজ্যে প্রবেশ করে নাট্যকার যেমন, দর্শকও তেমনি এক রোমাঞ্চ অনুভব করেন। বর্তমানের বাস্তবজীবনের চেয়ে অতীতের সেই ফিরে পাওয়া জীবনের মহিমা কোনো অংশেই কম কিছু নয়। ইতিহাসের পুরুজ্জীবনের মধ্যে মানুষ তারই মতো এক মানুষের কর্মকৃতি ও সাফল্য-অসাফল্য দেখে এক মানবিক আত্মীয়তার পরিচয় লাভ করে। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে সচরাচর ট্র্যাজিডির প্রাধান্যই লক্ষ্য করি আমরা।

বিশ্বের সকল দেশের নাট্যসাহিত্যের ভাণ্ডারে ঐতিহাসিক নাটকের নিদর্শন সঞ্চিত আছে। বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে তার সফল দৃষ্টান্ত মেলে অনেকই। এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া হলো ঃ

মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' টডের 'রাজস্থান' গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বটে, কিন্তু

কৃষ্ণকুমারীর চরিত্র পরিকল্পনায়, তাঁর পিতা ভীমসিংহ ও মাতা অহল্যার ক্রন্দন-বেদনায় আমরা বিশেষ ভাবে অভিভূত হই। দেশ ও পিতার মান রক্ষার জন্য কৃষ্ণকুমারীকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। ইতিহাসে ছিল, কৃষ্ণকুমারীকে বিষ দিয়ে হত্যা করা হয়। মাইকেল কিন্তু সুন্দর একটি নাট্যপরিস্থিতি নির্মাণ করে, কৃষ্ণকুমারীকে ছুরিকা দ্বারা আত্মহত্যা করিয়ে তাঁকে মহনীয়া করে তুলেছেন। গ্রিক ট্র্যাজেডির মতো এখানে দৈবশক্তি বা নিয়তি একটি বড়ো ভূমিকা নিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে স্বাদেশিকতার দিকটিকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁর 'সরোজিনী' নাটকের বিষয় 'কৃষ্ণকুমারী'র অনুরূপ হলেও চিন্তা ভিন্ন। গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাটকের বিশেষত্ব দুটি : এক, ইতিহাসের তথ্যকে নিষ্ঠাভরে অনুসরণ করা। দুই, স্বাদেশিকতার প্রচার। 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের অনৈতিহাসিক চরিত্র করিমচাচা এক অবিস্মরণীয় চরিত্র। 'মীরকাশিম' ও 'ছত্রপতি শিবাজী' তাঁর আর দুখানি সফল ঐতিহাসিক নাটক। বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নাট্যকার হলেন—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। প্রাচীন হিন্দুযুগ, মুঘল যুগ এবং রাজপুত যুগ—তিন যুগ নিয়েই তিনি ঐতিহাসিক নাটক লিখেছেন। এগুলির মূল সুর একদিকে স্বাদেশিকতা, অন্যদিকে জীবন-প্রতিভাস। 'চন্দ্রগুপ্ত',. 'সাজাহান', 'নূরজাহান', 'মেবার পতন' প্রভৃতি নাটক এই বিষয়ের বিশিষ্ট উদাহরণ। ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে যে এক মানবমহিমা ও মহনীয়তা আছে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ঐতিহাসিক নায়ক-নায়িকাগণও যে কাতর হন, সংলাপ ও নাট্যরসের উদ্দীপক হতে পারে, দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক তারই নিদর্শন। ক্ষীরোদপ্রসাদ ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে তথ্যনিষ্ঠা তেমন প্রদর্শন করেন নি। তাঁর 'প্রতাপাদিত্য', 'আলমগীর' প্রভৃতি নাটক খ্যাতি অর্জন করেছিল। পরবর্তী যুগের নাট্যকারদের মধ্যে শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'সিরাজদ্দৌলা', মহেন্দ্র গুপ্তের 'মহারাজ নন্দকুমার' টিপু সুলতান', নিশিকান্ত বসু রায়ের 'বঙ্গো বর্গী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও তার জন্য প্রয়াস এই সব নাটকগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য।

৯২.১১ সামাজিক নাটক ; উদাহরণ

সামাজিক নাটকের প্রসঙ্গো বিশেষভাবে স্মর্তব্য কথা হলো, সাহিত্যের ক্ষেত্রে যতদিন বাস্তবতা (Relaism)-র উদ্ভব হয়নি, ততদিন সামাজিক নাটকও খাঁটি অর্থে লিখিত হয়নি। ১৮৩০-এর পর থেকে বাস্তববাদের প্রসঙ্গো মানুষের মনে চেতনা এসেছে। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে বাস্তববাদের প্রথম প্রকাশ দেখা গেছে উপন্যাসে, নাটকের ক্ষেত্রে তার প্রকাশ ঘটেছে একটু পরে। সামাজিক নাটকের পরিচয় ও প্রবর্তন প্রসঙ্গো এই দুটি কথা সকলের আগে মনে রাখতে হবে। মূলত রোমান্টিক ভাববাদের প্রতিক্রিয়ায় সামাজিক নাটক রচিত হতে থাকে।

পৌরাণিক নাটকের ভাবপ্রতিবেশ যেমন দূর আকাশের অতিলৌকিক জগৎ, ঐতিহাসিক নাটকের ভাবপ্রতিবেশ তেমনি অতীতের এক রোমান্টিক জগৎ। খাঁটি বাস্তবের চেনা-শোনা জগতের সহজ-স্বাভাবিক চরিত্র ও পরিবেশ সহজবোধ্য কারণেই সেখানে পাবার নয়। কিন্তু অতিলৌকিক ও অতীতের কল্পনার জগৎ ছেড়ে প্রতিদিনকার নিতান্ত পরিচিত ও বর্তমান জগতের সমস্যাবলী ও তার প্রতিরূপ নিয়ে রচিত নাটক বেশি হৃদয়গ্রাহী। এই কারণে সামাজিক নাটকের চাহিদা ও আকর্ষণ দুই-ই বেশি।

সামাজিক নাটকের মধ্যে দুটি দিক আছে। এক, প্রতিদিনকার পরিচিত, তুচ্ছ-নগণ্য জগৎ ও জীবনের প্রত্যক্ষ রূপায়ণ। সেখানকার প্রেম-রোমান্স, ঘর-গেরস্থালির প্রতিচ্ছবি সহজেই মনকে নাড়া দিয়ে যায়। দুই, প্রতিদিনকার তুচ্ছ পারিবারিক জীবনের বাইরে যে সামাজিক জীবন আছে, নানা অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চিন্তা ও সমস্যা দ্বারা জীবন যেখানে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে, তার পরিচয় প্রদান করা। বস্তুত, এই দ্বিতীয় দিকটিই সামাজিক নাটকের আধুনিক ও প্রকৃত দিক। নানাপ্রকার সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যার উত্থাপন, তার আলোচনা, এবং শেষে তার নাট্যসম্মত সমাধান যে সব নাটকে থাকে তাকেই

বলা যায় 'Problem Drama' বা 'সমস্যামূলক নাটক'। এই ধরনের নাটকের মধ্যে বাহ্য ঘটনার আলোড়ন-আন্দোলন-রূপায়ণ অপেক্ষা সংলাপের মার্জিত তীক্ষ্ণতা এবং বিতর্কের প্রকাশ অধিক। নাট্যকারের নির্দেশনাও বিস্তৃত ও দীর্ঘায়ত। চরিত্র পরিকল্পনার মধ্যে এক একটি ভাবনার ধারক-বাহকের দিকটিই যেন বড়ো এবং প্রধান হয়ে ওঠে। Hero বা নায়ক বলতে প্রাচীন ধারণাকে বর্জন করে 'Anti-Hero' -র ধারণাই এখানে কার্যকরী ভাবে রূপায়িত হয়। দৃশ্যসজ্জায় থাকে দৈনন্দিন জীবনের অতি পরিচিত দিক, ঘটনা-নির্বাচনেও তাই-ই। সংলাপের মধ্যে স্বগতোক্তি তবু এখানে সহনীয়, কিন্তু Aside বা জানান্তিক-উক্তি এখানে সম্পূর্ণ বর্জনীয়, কেননা তা বাস্তব জগতের পক্ষে অসামঞ্জস্যমূলক।

বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক লক্ষ্য করেছেন, বাংলা নাটকে সামাজিক ও বাস্তব সমস্যার প্রথম রূপায়ণ ঘটেছে প্রহসন নাটকে। প্রহসন নাটকের লঘু-তারল্যের বাতায়ন পথ দিয়েই বাংলা সামাজিক নাটকের প্রবর্তন ঘটেছে। তবে সামাজিক নাটকের নানা প্রকারভেদ ও মাত্রাভেদ আছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' নাটকটিকে সহজে কেউ একটি সামাজিক নাটক বলতে চাইবেন না, অথচ এটিকে একটি সামাজিক বা সামাজিক সমস্যার নাটক বলাও যায়। প্রথমত, এই নাটকে সামাজিক ও গার্হস্থ্য-জীবনের অনেক চিত্র আছে, দ্বিতীয়ত, নীলচাষকে কেন্দ্র করে এর মধ্যে একটি অর্থনৈতিক সমস্যার দিকও আছে, নীলকরগণের অত্যাচারে জর্জরিত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বিন্দুমাধব কৃষি অর্থনীতিকে পরিত্যাগ করে চাকুরজীবী হতে চায় সেখানে। কিংবা, স্বদেশী মহাজনদের অত্যাচারে ধান-চাষীরা নীলের দাদন নিতে বাধ্য হয় যেখানে। সেদিক বিচার করলে গিরিশচন্দ্রের 'বলিদান' বা 'শাস্তি কি শান্তি' প্রভৃতি নাটক খাঁটি সামাজিক নাটক। দুটিতেই পারিবারিক সমস্যার কথা আলোচিত হয়েছে,—নাটক হিসেবে অবশ্য 'বলিদান' সার্থক। বাঙালি পিতা-মাতার জীবনে কন্যাদায় একটি বড়ো সমস্যা, কন্যার বৈধব্যও তেমনি গুরুভার সমস্যা। গিরিশচন্দ্র সেই দুই পারিবারিক সমস্যার রূপ দিয়েছেন এই দু'খানি নাটকে। দ্বিজেন্দ্রলাল পরবর্তীকালে 'বঙ্গনারী' নাটকে 'বলিদান' নাটকের সমস্যার পুনঃপ্রবর্তন করেছেন, যদিও সামাজিক নাটকের মধ্যে রোমাঞ্চকর ঘটনার অবতারণা যথার্থ হয়নি। রবীন্দ্রনাথ 'চোখের বালি'র মতো সামাজিক উপন্যাস এবং নানা ধরনের নাটক লিখলেও সামাজিক নাটক লেখেননি। বরং রবীন্দ্রোত্তর কালপর্বেই বাংলা সামাজিক নাটকের প্রচলন অধিকমাত্রায় ঘটেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পঞ্চাশের মন্বন্তর এবং দেশবিভাগ বাঙালির চেতনাকে যে গভীরভাবে নাড়া দিয়ে গেছে, তাতে বাঙালি একদিকে বাস্তবের পৃথিবীতে পদার্পণ করেছে, অন্যদিকে নানা প্রকার সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। এর ফল সামাজিক ও সমস্যামূলক নাটকের প্রচলন বেড়েছে। গণনাট-আন্দোলনের অবদানও এখানে বিশেষভাবে বলবার। রবীন্দ্র-পরবর্তী এবং দেশবিভাগোত্তর কালের নাট্যকারগণ পাশ্চাত্য নাট্যকলাকে যেমন গ্রহণ করেন তেমনি পাশ্চাত্য নাটকের অনুবাদের মাধ্যমেও সামাজিক নাটকের নানাদিক সম্পর্কে অবহিত হন। এ বিষয়ে নরওয়ের নাট্যকার হেনরিক, ইবসেন, ইংলণ্ডের নাট্যকার বার্নার্ড শ্য বা জন গলস্‌ওয়ার্দি তাঁদের পথ-প্রদর্শক হয়ে আছেন। তবে এইসব পাশ্চাত্য নাট্যকারগণ তাঁদের সামাজিক এবং সমস্যামূলক নাটকের মধ্যে দুটি বিশেষত্বের সৃষ্টি করেছেন, নাট্যশিল্পের পক্ষে যা উন্নতির কারণ হয়ে ওঠেনি। যেমন, নাটকের মধ্যে অতিমাত্রায় তর্ক বিতর্কের আয়োজন। দ্বিতীয়ত, নাট্যকারগণ নিজেরাই যেন নিজ-তত্ত্বসহ নাটকে উপস্থিত,—বিশেষ কোনো চরিত্রকে আশ্রয় করে।

বাঙানিল নাট্যকারগণ সামাজিক নাটকের মূল প্রেক্ষাপট বলতে মধ্যবিত্ত ও নিম্ন-মধ্যবিত্ত অর্থনৈতিক পরিবেশকে গ্রহণ করেছেন। এই অর্থনৈতিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে তাঁরা সমস্যা ও তার স্বরূপকে প্রদর্শন করতে চেয়েছেন। নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্য তাঁর 'মাটির ঘর' বা 'মেঘমুক্তি' প্রভৃতি নাটকগুলিতে এই পটভূমিকাই গ্রহণ করেছেন। 'মাটির ঘরে' তিন বিবাহিতা বোনের প্রেম ও দাম্পত্য সমস্যার রূপ মেলে,

পরিণতিও করুণ। 'মেঘমুক্তি' তেও দাম্পত্য সমস্যার নাটকীয় রূপ পাওয়া যায়। দাম্পত্য সমস্যা শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের 'স্বামী-স্ত্রী' বা 'তটিনীর বিচার' প্রভৃতি নাটকের বিষয় হলেও তিনি সমস্যার রূপায়ণ ও গ্রন্থিমোচনে তেমন সাফল্য অর্জন করেননি। কথাসাহিত্যিক তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ক'খানি নাটকও লিখেছেন। 'দুইপুরুষ' নাটকের নামের মধ্যেই পিতা-পুত্রের দ্বন্দ্ব ব্যক্ত, সেই তুলনায় 'পথের ডাক' নাটকে এ যুগের অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার রূপায়ণ অধিকতর স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ। সামাজিক ও সমস্যামূলক নাটক অতঃপর তার নিজস্ব গতিতে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

৯২.১২ অনুশীলনী

ক) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন।

১) Miracle Play বলতে কী বোঝানো হয়?
২) Miracle Play গুলির পরিণতি কার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত?
৩) Mystery Play-র সাধারণ পরিচয় দিন।
৪) 'Pro fano' পদটির অর্থ কী? Mystery Play-র সঙ্গে এর যোগ কোথায়?
৫) 'অপেরা' কথাটি বাংলা নাট্যের ক্ষেত্রে কী অর্থে প্রযুক্ত হত?
৬) শ্রেষ্ঠ বঙ্গীয় পৌরাণিক নাট্যকার কে? তাঁর দুখানি পৌরাণিক নাটকের নাম বলুন।
৭) মন্মথ রায়ের কোন্ পৌরাণিক নাটকটির নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য?
৮) ক্লিওপেট্রা চরিত্র নিয়ে কোন্ কোন্ নাট্যকার নাটক লিখেছেন?
৯) ঐতিহাসিক নাটকের প্লটের গঠনরীতি সম্পর্কে অ্যারিস্টটল কী বলেছেন?
১০) 'Anachronism' কথাটির অর্থ কী?
১১) 'Problem Drama' কথাটির অর্থ কী?
১২) 'নীলদর্পণ' কে কি সামাজিক সমস্যার নাটক বলা যায়?

খ) নীচে প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর দিন।

১) Miracle Play এবং Mystery Play-র সঙ্গে বাংলা পৌরাণিক নাটকের যোগ কিভাবে অনুভব করা যায়?
২) 'ভক্তিমূলক নাটক' এবং 'পৌরাণিক নাটকে'র মধ্যে পার্থক্য কোথায়?
৩) ঐতিহাসিক নাটকের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে আলোচনা করুন।
৪) কেন নাট্যকারগণ ঐতিহাসিক নাটক লিখতে উদ্বুদ্ধ হন?
৫) সামাজিক নাটকের সংজ্ঞা ও পরিচয় দিন।

৯২.১৩ সাংকেতিক নাটক ; উদাহরণ

যে নাটকের মূল ভাবনা স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ ঘটনার দ্বারা ব্যঞ্জিত না হয়ে কোনো ভাব-সংকেত বা বস্তু সংকেতের মাধ্যমে ব্যঞ্জিত হয়, সাধারণ ভাবে তাকেই বলা যায় 'সাংকেতিক নাটক'। সাংকেতিক বলতে Symbolic। Symbol এবং Allegory-র মধ্যে পার্থক্য আছে, আমরা অনেকেই সে বিষয়ে অনেক সময়েই সতর্ক থাকি না। Allegory-র অর্থ—রূপক, সাহিত্যের ক্ষেত্রে বলা যায়. একটি রচনার প্রাথমিক ও বাহ্যিক একটি অর্থ, কিন্তু অন্তরে তার প্রকৃত আর একটি অর্থ। রূপকে তাই অর্থের দুটি মাত্রা বা ধারা থাকে। সংকেত হল সমগ্র ভাবটির একটির অর্থ যেখানে প্রকাশিত হয়।

আসলে বাংলায় যাকে 'সাংকেতিক নাটক' বলা হয়, পাশ্চাত্য সাহিত্যে তাকে বলা হয়—Expressionistic Play। Expressionism বলতে 'অভিব্যক্তিবাদ' কথাটি বাংলায় চালু থাকলেও 'অভিব্যক্তিবাদমূলক নাটক' না বলে বাংলায় 'সাংকেতিক নাটক' কথাটিই প্রচলিত হয়ে গেছে। বাংলাতে এর পরেও আবার কেউ কেউ রূপক ও সাংকেতিক নাটককে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। প্রমথনাথ বিশী রূপক-সাংকেতিক আখ্যার এই বিতর্কের কথামনে রেখে 'তত্ত্ব-নাটক' আখ্যার প্রবর্তন করেছেন। রূপক-সাংকেতিক আখ্যার এই সংশয় বিতর্ক আজও ঘোচেনি। প্রতিষ্ঠিত সমালোচকগণও অনেকেই 'রূপক' ও 'সাংকেতিক' নাটক বলতে অভিন্ন ধারার নাটককে বুঝিয়ে থাকেন।

'সাংকেতিক নাটক' আখ্যার প্রচলনের একটি কারণ অনুমান করা যায়। ইউরোপে এক বিশেষ পর্বে Symbolic গীতিকবিতার প্রবর্তন ঘটে। মনে হয়, Symbolic গীতিকবিতার অনুসারে Symbolic Drama'-র কল্পনা এসে গেছে, এবং তারই বঙ্গানুবাদ—'সাংকেতিক নাটক'। 'রবীন্দ্রসৃষ্টিসমীক্ষা'য় শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন,—"জীবনের এই অতীন্দ্রিয় রহস্য ও সাংকেতিকতা সর্বপ্রথম গীতিকবিতার ছন্দে বাঁধা পড়ে। কিন্তু যতই এই লীলাময় বিকাশ সুস্পষ্ট হইতেছে, যতই ইহা ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমা ছাড়াইয়া সাধারণ পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করিতেছে, বিশেষত মানবমন যতই ইহার আনন্দময় ঘাত-প্রতিঘাত সম্বন্ধে একটা সাগ্রহ কৌতূহল অনুভব করিতেছে, ততই ইহা গদ্যকবিতার রাজ্য অতিক্রম করিয়া নাটকের বিষয়ীভূত হইয়া উঠিতেছে।" তাঁর মনে, সাংকেতিক নাটকের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সর্বত্রই 'আধ্যাত্মিক' না হয়ে অন্য কোন 'গূঢ় জীবনসত্য' হতে পারে। দ্বিতীয়ত, সেই 'গূঢ় জীবনসত্যে'র প্রতীক-সংকেতের দিকটিকে কোন বিশেষ ভাব বা বস্তু দিয়ে নাটকে পুনঃপুনঃ উল্লেখ করা কিংবা বিশেষভাবে তার ওপর গুরুত্ব ব্যাপ্ত করা।

যাই হোক, Symbolic-ই হোক আর Expressiontic-ই হোক সেই নাট্যধারার একটি বিশেষ ইতিহাস আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) আরম্ভের পূর্ব থেকেই, 'প্রকৃতিবাদ' (Naturalism) এবং 'বাস্তববাদ' (Realism) এর বিরুদ্ধে জার্মানিতে একটি আন্দোলন গড়ে ওঠে। চিত্রে, সঙ্গীতে, সাহিত্যে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে সেই আন্দোলনটি সক্রিয় হয়। জীবনকে এই আন্দোলন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চায়। 'বাস্তবতা' কে বাইরের কোনো ক্রিয়া-ঘটনা রূপে না দেখে 'Inner Reality' অর্থাৎ আন্তর জগতের একটি ব্যাপার বলে মনে করতে থাকে। এর মধ্যে আছে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা ও চরম আবেগ। বার্লিনে, ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দে এই ভাবধারাকে Expressionism নাম দিয়ে থিয়েটার শুরু হয়। সুইডীশ নাট্যকার এ, ট্রিন্ডবার্গ জার্মানি লেখক ফ্র্যাংক হেবডেকাইনড-এর নাটকাবলী ১৯২০-র দশকে অভিনীত হতে থাকে। সম্পূর্ণত ১৯০০ থেকে ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মধ্য ইউরোপে এই নাট্যধারার প্রচলন ছিল। পরে সে ধারাটি আমেরিকাতে গিয়ে পৌঁছয়। ১৯১৫-১৯২৫ পর্যন্ত কালপর্বটি ছিল এই ধারার স্বর্ণযুগ। ১৯৩৩ খ্রিস্টব্দে নাৎসিরা ক্ষমতায় এসে এই নাট্যান্দোলনকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

বাংলায় এই ধারার একমাত্র নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ। তাঁর পর আর কেউ এই ধরনের নাটক লেখেননি। উদাহরণ হিসেবে 'রক্তকরবী' এবং 'ডাকঘর' এই দুটি নাটকের উল্লেখ করা যায়। 'রক্তকরবী' নাটকে রক্তকরবী ফুল প্রাণ ও সৌন্দর্যের প্রতীক ও সংকেত রূপে গৃহীত। রক্তকরবী ফুল নন্দিনীর অঙ্গের আভরণ, কিশোর তাকে এই ফুল এনে দেয়, কিশোরের মাধ্যমেই সেই ফুলের মঞ্জরী সে রঞ্জনকে পাঠায়, এই ফুলের কঙ্কণ বিশু তুলে নেয়, সর্দারের বর্শার ফলককে নন্দিনী এই ফুলের রঙে রঙিন করে দিতে চায়, মকররাজ সেই রক্তকরবীর রক্তিম আভাটুকু ছেঁকে নিয়ে তাঁর চোখের অঞ্জন করতে চান, আবার গোকুল সেই রক্তকরবীর মধ্যেই দেখে সর্বনাশা জ্বলন্ত মশালকে, অধ্যাপকের চোখে নন্দিনীই রক্তকরবী। নন্দিনী নিজে গোধূলির রক্তিম সূর্যের মধ্যে কিংবা তা সিঁথির সিঁদুরের মধ্যে দেখে সেই রক্তকরবীকে। এইভাবে গোটা নাটকটি জুড়ে রক্তকরবী বিশেষ একটি ভাবের প্রতীক বা সংকেত হয়ে উঠেছে। যক্ষপুরীর

ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণবিপ্লবের সংকেত নির্দেশ করে এই নাটক শেষ হয়েছে। তেমনি ‘ডাকঘর’ নাটকে বাদল ও শরৎ—দুই ঋতু—দুটি ভাবের প্রতীক। শরৎ অমলকে শরতের রোদের আলোকের ক্ষেত্রে নিয়ে যাবে। বাদল অর্থাৎ বর্ষা দূরের থেকে তার কাছে আসবে। এইভাবে ‘ডাকঘর’ নাটকের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এক বিশেষ ভাবনাকে তুলে ধরেছেন।

৯২.১৪ অনুশীলনী

ক) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১) Expressionistic Play বলতে কী বোঝেন?
২) Symbol এবং Allegory-মধ্যে পার্থক্য কী?
৩) Symbolic গীতিকবিতা থেকে ‘Symbolic নাটকে’র উদ্ভব সম্পর্কে প্রাজ্ঞ সমালোচকের মন্তব্যটি বিশ্লেষণ করুন।

খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিশদ উত্তর করুন ঃ

১) Expressionistic Play-র পরিচয় দিন।
২) একটি নাটক অবলম্বনে Expressionistic Play-র স্বরূপ প্রদর্শন করুন।
৩) Expressionistic Play-র উদ্ভবের পিছনে যে-যে দিকগুলি আছে, তার উল্লেখ করুন।

৯২.১৫ একাংক নাটক, উদাহরণ

ইংরেজিতে যাকে বলে One-Act Play, বাংলায় তাকেই বলে ‘একাংক নাটক’। নাম থেকেই বোঝা যায়, এ নাটক এক অংকে সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু এক অংকে পূর্ণ হলেই তা একাংক নাটক হয়ে উঠবে না। এর একটি নিজস্ব শিল্পরূপ আছে। পূর্ণাঙ্গ নাটক যেমন স্তরে-স্তরে, ক্রমে-ক্রমে বিকশিত হয়, একটি Climax অর্জন করে ধীরে-ধীরে উপসংহারের দিকে অগ্রসর হয়, একাংক নাটকের নাট্যরীতি ঠিক তার বিপরীত। অর্থাৎ এখানে ধীরে-ধীরে ক্রমবিকশিত হয়ে ধীরে-ধীরে স্তিমিত হয়ে পড়া নয়। একবারেই জ্বলে ওঠা,—নাট্যকাহিনীর ওই জ্বলে ওঠার অংশটিই এখানকার মূল লক্ষ্য। সে ভাবেই কাহিনীকে সাজিয়ে নিতে হয়। প্রারম্ভের সঙ্গে পরিণতির নানা প্রকার বিরোধ থাকতে পারে, সেটাই একাংক নাটকের কাহিনীগত বিবর্তন। কিন্তু একাংক নাটকের সবচেয়ে বড়ো বিশেষত্ব—পরিণতিতে বিশেষ ব্যঞ্জনার সৃষ্টি করা। শিল্পরূপের দিক থেকে একাংক নাটক যেন ছোটগল্পের মতো,—ছোটগল্পের একাগ্রতা, শেষের মধ্যে ব্যঞ্জনা সৃষ্টি, অপ্রাসঙ্গিকতাকে নির্মমভাবে বর্জন—সবই এতে দেখা যায়। প্রহসন, কমেডি, ট্র্যাজেডি,—সব ধরনের বিষয়ই একাংক নাটকের বিষয় হতে পারে। এমনকি একাংক কাব্যনাট্যও হতে পারে। বিশ্বের প্রায় সব প্রখ্যাত নাট্যকারই একাংক নাটক রচনা করেছেন এবং সাফল্য লাভ করেছেন।

একাংক নাটকের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে দেখা যায়, নানা দিক থেকে নানা বিশেষত্ব এতে এসে সংহত হয়েছে। মধ্যযুগে মূল নাটক আরম্ভ হবার আগে Curtain Raiser নামে যবনিকা উত্তোলনের পূর্বে ছোটো-ছোটো নাটক অভিনয় করবার প্রথা ছিল। কিংবা মূল নাটক শেষ হয়ে গেলে After-Piece রূপে ছোট ছোট নাটক অভিনীত হতো। আবার কখনো মূল নাটকের ফাঁকে ফাঁকে Interlude নামে অন্তবর্তী নাটক, Burlesque নামে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক নাটিকা অভিনীত হতো। এই সব

ছোট-ছোট নাটিকাগুলিই একদিন স্বয়ংসম্পূর্ণ একাংক নাটক রূপে আত্মপ্রকাশ করে। যুগ ও সময়ও একটি দিক। যেমন ছোটগল্প আধুনিক যুগেরই মানুষের সাহিত্যিক খোরাক, একাংক নাটকও যেন তাই। প্রহসন নাটকের গঠনরীতিও একাংক নাটকের উদ্ভবের পিছনে ভূমিকা নিয়ে থাকতে পারে। ভারতীয় দৃষ্টিতে বিচার করলে, 'পঞ্চরং', সঙের যাত্রা, গাজনের মেলায় প্রস্তুতিবিহীন নাটক—সবই একাংক নাটকের পরিপোষক। তবে একাংক নাটক শহরের শিক্ষিত মানুষের কাছে যতোখানি প্রিয়, গ্রামাঞ্চলে তা আদৌ নয়। আধুনিক যুগে নানা প্রকার নাট্যোৎসবে এবং নাট্য প্রতিযোগিতার জন্য বহু একাংক নাটক রচিত ও মঞ্চস্থ হচ্ছে।

একাংক নাটকের বাংলা উদাহরণ ঃ বাংলায় যাঁরা একাংক নাটক রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়ের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। একাংক নাটকের আত্ম ও শিল্পরূপটিকে তিনি বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে অনুধাবন করতে পেরেছেন। 'রাজপুরী', 'অসাধারণ' তাঁর দুটি উল্লেখযোগ্য একাংক। এটি একটি পৌরাণিক একাংক নাটক। রানী চরিত্রের মধ্যে প্রেমের বিচিত্র রূপের প্রকাশ এবং তাই অবলম্বনে তীব্র নাটকীয়তা সৃষ্টিতে নাট্যকার বিশেষভাবে সফল। তুলসী লাহিড়ীর 'দেবী', 'চৌর্যানন্দ', বনফুলের 'শিবকাবাব', বিধায়ক ভট্টাচার্যের 'উজানযাত্রা', নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'এক সন্ধ্যায়' প্রভৃতি একাংক নাটকের সফল দৃষ্টান্ত।

৯২.১৬ সারাংশ

বিশ্বের এমন কোনো দেশ নেই, যে দেশে নাটক নেই। নাটক একটি দেশ-জাতি-সংস্কৃতির দর্পণ। প্রাচীন ভারতবর্ষে এবং গ্রিসদেশে নাট্যচর্চা বিশেষভাবে অগ্রগতি লাভ করেছিল। নাটকের উদ্ভবের পিছনে আছে নানা যাদুকর্ম ও যাদু-অনুষ্ঠান। তারপর সাধু-সন্তদের জীবনের অলৌকিক ক্রিয়া-কর্ম। ক্রমেই আনুষ্ঠানিক দিক এবং অতিলৌকিক দিককে পরিত্যাগ করে নাটক তার নিজস্ব শৈল্পিক ক্ষেত্রে এসে পৌঁছেছে। নৃত্য ও গীত চিরকাল নাটকের দুই বিশেষ দিক বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। প্রাচীন ভারতে নাটককে বলা হত 'দৃশ্যকাব্য'। মনের ভাবকে দৃশ্য করে তোলা। অ্যারিস্টটল নাটকের উৎস রূপে অনুকৃতিকে লক্ষ্য করেছেন। প্রাচীন ভারতে নটনটীর বদলে পুতুল নাচের মাধ্যমেই নাটক প্রদর্শিত হত বলে গবেষকগণ অনুমান করেন। রঙ্গমঞ্চ, দৃশ্যসজ্জা এবং রূপসজ্জা, আলোকপাত, ধ্বনিসৃষ্টি,—নাটকের অন্যান্য প্রয়োগগত দিক।

নাটকের নানা বিভাগ আছে ঃ ট্র্যাজেডি, কমেডি, প্রহসন। বিষয়গত দিক থেকেও নানা বিভাগ আছে। যেমন, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও সামাজিক নাটক। তেমনি প্রকরণের দিক থেকে মেলে ঃ পঞ্চাংক, তিনাংক ও একাংক নাটক। আধুনিক যুগে একাংক নাটক বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

প্রাচীন ভারতে ট্র্যাজেডি নাটকের অস্তিত্ব ছিল না। অ্যারিস্টটল তাঁর 'Poetics' গ্রন্থে ট্র্যাজেডি নিয়ে বিশেষ আলোচনা করেছেন। চরিত্রের চেয়ে প্লটকে তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন এবং Catharsis কে ট্র্যাজেডির শেষ লক্ষ্য বলে নির্দেশ করেছেন। Peripety, Anagnorisis, Humartia ট্র্যাজেডির এক একটি বিশেষত্বপূর্ণ উপকরণ। তেমনি Chorus-এর প্রয়োগ। গ্রিক ট্র্যাজেডির পর রোমান ট্র্যাজেডি, তারপর ইংলণ্ডে এলিজাবেথীয় যুগে শেকস্‌পীয়রীয় ট্র্যাজেডি। নিয়তির প্রভাবকে শেকস্‌পীয়র মানুষের জীবনের এক আন্তর বৈশিষ্ট্যরূপে দেখিয়েছেন, গ্রিক নাটকের মতো কোনো বাইরের শক্তিরূপে নয়। নরওয়ের হেনরিক ইবসেন নাটককে সামাজিক প্রতিবেশের মধ্যে স্থাপনা করে তাকে অধিকতর বাস্তব করে তুলেছেন। পঞ্চাংকের বদলে তিনি তিন অংকের নাটকের প্রবর্তন করেছেন।

কমেডির মূলকথা কিন্তু কেবল নায়ক-নায়িকার মিলন মাত্র নয় এর হাস্যরসের মধ্যেও আছে চিন্তার দিক। সমকালীন সমাজ এবং তার নানা বিপর্যয় কমেডির সৃষ্টির কারণ হয়েছে এবং কমেডির মধ্যেও নানা শ্রেণিভেদের সূচনা করেছে। শেকস্‌পীয়র বিশ্বের একজন শ্রেষ্ঠ কমেডিকার। এই কমেডি ধারার মধ্যেই কমেডি নাট্যশিল্প সূক্ষ্মতা অর্জন করেছে। জর্জ বার্নার্ড শ্য আধুনিক যুগে অভিনব কমেডি নাটকের সৃষ্টি করেছেন। কমেডির সঙ্গে প্রহসনের পার্থক্য আছে। রবীন্দ্রনাথ কমেডি ও ট্র্যাজেডির মধ্যে কোনো প্রকারগত পার্থক্য করেননি,—মাত্রাগত পার্থক্য করেছেন।

ভক্তিমূলক নাটক ভক্তিসর্বস্ব, পৌরাণিক নাটক কিন্তু 'নিয়মিত' (Regular) নাটক। ঐতিহাসিক নাটক ইতিহাসও বটে, খাঁটি নাটকও বটে। সামাজিক নাটকে সামাজিক চিত্র ও সমস্যার আলোচনা হয়ে থাকে। বাঙলা প্রহসন নাটকের ধারার সূচনা হয় ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। মাইকেল এই ধারার শ্রেষ্ঠ নাট্যকার। বিংশ শতকে প্রহসন রচনার ধারা প্রায় বিলুপ্ত।

রূপক-সাংকেতিক নাট্যধারার উদ্ভব বিদেশে হলেও রবীন্দ্রনাথই বাঙলার একমাত্র এই ধারার নাট্যকার।

৯২.১৬ অনুশীলনী

ক) নীচের প্রশ্নগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

১) Curtain Raiser, After Piece নাটকের পরিচয় দিন।
২) Interlude ও Burlesque নাটকের পরিচয় দিন।
৩) সাধারণ নাটক ও একাংক নাটকের Climax স্থাপনের পার্থক্য কোথায়?

খ) নীচে প্রদত্ত প্রশ্নগুলির বিস্তৃত উত্তর কুরুন ঃ

১) একাংক নাটকের স্বরূপ-সংজ্ঞা সম্পর্কে আলোচনা করুন।
২) কতকগুলি বাংলা একাংক নাটকের নাম বলুন।
৩) ছোটগল্পের সঙ্গে একাংক নাটকের কোনো যোগ আছে কি না বলুন।

৯২.১৮ গ্রন্থপঞ্জি

১. সুধীরকুমার দাশগুপ্ত ঃ *কাব্যালোক।*
২. শিশিরকুমার দাশ ঃ *কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল।*
৩. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ঃ *সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ।*
৪. শ্রীশচন্দ্র দাশ ঃ *সাহিত্য-সন্দর্শন।*
৫. রবীন্দ্রনাথ ঃ *কৌতুকহাস্যের মাত্রা (প্রবন্ধ)।*
৬. অজিতকুমার ঘোষ ঃ *বাঙ্গালা নাটকের ইতিহাস।*
৭. সুকুমার সেন ঃ *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস।*
৮. সাধনকুমার ভট্টাচার্য, *অজিতকুমার ঘোষ ঃ একাঙ্ক সঞ্চয়ন।*
৯. কুন্তল চট্টোপাধ্যায় ঃ *সাহিত্যের রূপ-রীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ।*
১০. J. A. Cudden : A Dictionary of Literary Terms and Literary Theory.
১১. Kalynannath Dutta : Some Aspects of the Study of Literature.
A. Nicok : Theory of Drama.
Hudson : An Introduction to the Study of Litearture.
: A Reader's Companion to world Literature.

ই. বি. জি — ৬
বাংলা বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম
পর্যায়
২৫

একক ৯৩ ❑ প্রবন্ধ ঃ গুরু প্রবন্ধ ও লঘু প্রবন্ধ

গঠন

৯৩.১ উদ্দেশ্য

৯৩.২ প্রস্তাবনা

৯৩.৩ মূলপাঠ - ১ প্রবন্ধের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভব

৯৩.৪ সারাংশ - ১

৯৩.৫ অনুশীলনী - ১

৯৩.৬ মূলপাঠ - ২ প্রবন্ধের শ্রেণী বিভাগ, গুরু ও লঘু প্রবন্ধের পার্থক্য ও আলোচনা

৯৩.৭ সারাংশ - ২

৯৩.৮ অনুশীলনী - ২

৯৩.৯ উত্তরমালা

৯৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৯৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি প্রবন্ধ সাহিত্য বলতে কি বোঝায় তা আলোচনা করতে পারবেন। এই এককটি যদি আপনি যত্নসহকারে পাঠ করেন তবে অনুশীলনীর যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন। এককটি পাঠ করলে—

- বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের উৎপত্তি কিভাবে হ'ল, তা জানতে পারবেন।
- প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।
- বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রাবন্ধিকের উল্লেখযোগ্য গুরু ও লঘু প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৯৩.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পড়ে আপনি প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব থেকে প্রথম-যুগের কিছু প্রাবন্ধিকের রচনা সম্পর্কে এই এককের প্রথম অংশে আলোচনা করাহয়েছে।

এককের দ্বিতীয় অংশে প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এই শ্রেণীবিভাগ থেকে বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় (objective) ও আত্মনিষ্ঠ বা মন্ময় (subjective) প্রবন্ধের সংজ্ঞা সম্পর্কে যেমন আপনারা জানতে পারবেন, তেমনি এই দুই প্রকার প্রবন্ধের পার্থক্যও নির্ধারণ করতে পারবেন। এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য গুরু ও লঘু প্রবন্ধ সম্পর্কে আপনারা অবহিত হবেন।

আপনি এই এককটির দুটি পর্যায় মনোযোগ সহকারে পাঠ করুন। দুটি পর্যায় পাঠের পর আপনি অনুশীলনীর যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন। প্রয়োজনে উত্তর সংকেত দেখুন।

৯৩.৩ মূলপাঠ - ১ প্রবন্ধের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য ও উদ্ভব

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে এক নতুন ধরণের সাহিত্য শাখার উদ্ভব হ'ল, যাকে আমরা বলতে পারি, প্রবন্ধ সাহিত্য। সাধারণত প্রবন্ধ গদ্যে রচিত হয়। প্রবন্ধের ভিত্তি মানুষের চিন্তা, মনন ও তত্ত্ব। তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে মননজাত কোনো বিষয়ের প্রতিষ্ঠা দান প্রবন্ধের লক্ষ্য।

প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হ'ল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। প্রকৃষ্ট-বন্ধন যুক্ত রচনাকেই প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে। প্রবন্ধ সাহিত্যে সাধারণত জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন, ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি চিন্তামূলক ও তত্ত্বমূলক বিষয় গদ্যবাহিত হয়ে প্রকাশ পায়। এই সমস্ত লেখার পেছনে থাকে যুক্তি। কোনো চিন্তাগ্রাহ্য বিষয়কে লেখক যখন যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তখন তা প্রবন্ধ হয়ে ওঠে।

প্রবন্ধ মূলতঃ গদ্যে লেখা হলেও পদ্যাকারে যে প্রবন্ধ লেখা যাবে না, তাও নয়। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের "মহিলা কাব্য", সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের "আমরা", কালিদাস রায়ের "আসাম", Pope-এর "Essay on Man" ইত্যাদি কবিতার আধারে লেখা প্রবন্ধ। আবার প্রবন্ধের আকার দীর্ঘ না হলেও, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কৃষ্মচরিত্র", "কমলাকান্তের দপ্তর", শরৎচন্দ্রের "নারীর মূল্য", Maill-এর "Liberty" ইত্যাদি প্রবন্ধের আয়তন বেশ দীর্ঘ।

প্রবন্ধ যেমন গদ্যে লেখা হয়, পদ্যে লেখা হয়, তেমনি প্রবন্ধের আরো নানারকম রূপ লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন সাহিত্যে Plato-র কথোপকথন, Pliny এবং Seneca-র পত্রাবলী, Oscar Wilde-এর "The critic as an Artist" রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "পঞ্চভূত"-এর মধ্যে প্রবন্ধের লক্ষণ বিদ্যমান।

সংস্কৃত এবং গ্রীক, লাতিন ভাষায় গদ্যরচনা অনেক কাল আগে থেকেই শুরু হয়েছিল। মধ্যযুগের ইউরোপে লাতিন ভাষায় ধর্ম-সংক্রান্ত বহু আলোচনার নিদর্শন পাওয়া যায়। রেনেসাঁসের সময়ে এবং তার কিছু পরে ইউরোপে যখন ছাপাখানার কাজ শুরু হয়ে যায়, তখন থেকে নানা সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মসংক্রান্ত আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বিতর্ক ইত্যাদি দেশীয় ভাষাতে রচিত ও প্রচারিত হতে থাকে। এইভাবে বিশেষ বিশেষ আলোড়নকে কেন্দ্র করে ইউরোপে প্রবন্ধ রচনার সূত্রপাত ঘটে।

আমাদের দেশের সংস্কৃত পন্ডিতরা সংস্কৃত ভাষাতে নানাগ্রন্থের আলাপ-আলোচনা টীকাটিপ্পনী রচনা করেছেন। একটা সময় পর্য্যন্ত বাংলা গদ্য প্রধানত চিঠিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে এসে বাঙালীর জীবন-ইতিহাসে আমুল পরিবর্তনের সূচনা হয় এবং চিন্তামূলক গুরুতর ব্যাপারগুলো গদ্যে রচিত হতে থাকে। আর এভাবেই বাংলা সাহিত্যে গদ্য-প্রবন্ধের উৎপত্তি। উনবিশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তৎকালীন সামাজিক অবস্থার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় সেই সময়ে সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্ম-আন্দোলন সম্পর্কিত গদ্য রচনাবলীতে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলা সাহিত্যে চিন্তাশীল গুরু প্রবন্ধ সাহিত্যের উদ্ভব।

গুরু প্রবন্ধ সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি, এবার আসা যেতে পারে লঘু প্রবন্ধ প্রসঙ্গে। লঘু প্রবন্ধও গদ্যে লেখা, কিন্তু তা তত্ত্ব ও তথ্যবহুল আলোচনা নয়। লঘু প্রবন্ধে রচনাকারের ব্যক্তিসত্তার

প্রতিফলন ঘটে। কোনো বিষয়কে অবলম্বনকে করে, লেখক যখন নিজের মনের কথা প্রকাশ করেন, তখন তা লঘু প্রবন্ধ সাহিত্য হয়ে ওঠে। এই ধরণের রচনা সৃষ্টির জন্য কতকগুলি জিনিষের প্রয়োজন। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "গীতিকবিতার আত্মগতভাব, নাটকের চরমৎকারিত্ব, কাহিনীর সরসতা., রোমান্টিক সৌন্দর্য, নিস্পৃহ দার্শনিকতা, সরস কৌতুকপ্রবণতা, জগৎ, জীবন, পরিবেশ ও ব্যক্তি সম্বন্ধে উদার সহনশীল ভাব-এসব গুণ না থাকলে সার্থক রচনা সাহিত্য সৃষ্টি করা যায় না।" এ ধরণের প্রবন্ধ রম্যরচনা নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন এধরণের প্রবন্ধের মূল্য বিষয় গৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ (Personal Essays) যাকে ইংরেজীতে বলা হয় Eassay Literature, তা জনক হলেন প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক মিচেল মঁতেঁই (Montaigne, Michel Eyguem de) । ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে তিনি Essays নাম দিয়ে কতকগুলি গদ্যনিবন্ধ প্রকাশ করেন। ফরাসী ভাষায় essai শব্দের অর্থ চেষ্টা করা। মঁতেঁই Essay শব্দটিকে সাহিত্যের ক্ষেত্রে একটা নতুন ধরণের রচনারীতির সৃষ্টির চেষ্টা এই অর্থে ব্যবহার করেছিলেন। পরবর্তীকালে ইংরেজী সাহিত্যিক ল্যাম্ব, বেকন এই আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তারপরে অ্যাডিসন, স্টি, হ্যাজলিট, স্টিভেনসন, গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি সাহিত্যিকদের হাতে এই ধরণের রচনাসাহিত্য চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

আমাদের দেশের সাহিত্যে প্রবন্ধ ও রচনা শব্দদুটি সমার্থক। ইতিহাসের দিকে তাকালেও লক্ষ্য করা যাবে, বহু জায়গায় প্রবন্ধ ও রচনাসাহিত্য অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ থেকে আমাদের সাহিত্যে প্রবন্ধ রচিত হতে থাকলেও, ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনা গড়ে উঠেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে। বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের লেখনীমুখে এই জাতের রচনাসাহিত্য পরমোৎকর্ষ লাভ করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রবন্ধ-সাহিত্যের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) প্রবন্ধসাহিত্য গদ্যে লেখা। মানুষের চিন্তা, মনন ও তত্ত্বই এখানে প্রাধান্য পেয়ে থাকে। প্রবন্ধ মস্তিষ্ক প্রসূত রচনা। তথ্য তত্ত্ব যুক্তি তর্ক সিদ্ধান্ত প্রবন্ধের প্রধান উপকরণ।

(২) সাধারণত প্রবন্ধ সাহিত্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস, সমাজ, রাজনীতি, সাহিত্য, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়সমূহ প্রাধান্য পেয়ে থাকে। কোনো বিষয় সম্পর্কে লেখকের চিন্তাগ্রাহ্য তত্ত্বকে কেন্দ্র করে প্রবন্ধ গড়ে ওঠে।

(৩) প্রবন্ধ সাহিত্যের অপর ধারা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা রম্যরচনা লেখকের হৃদয়জাত সৃষ্টি। রচনাকারের আবেগ কল্পনা এই ধরণের লঘু-প্রবন্ধে প্রাধান্য পেয়ে থাকে।

এবার আলোচনা করা হ'ল—বাংলাসাহিত্যে প্রবন্ধের উৎপত্তি প্রসঙ্গে। আগেই বলা হয়েছে বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের উৎপত্তি হয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের নিদর্শন গদ্য-সাহিত্যে নয়, পদ্য রচনার মধ্যেও ছড়িয়ে আছে। এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য-ভাগবত", কৃষ্ণদাস কবিরাজের "চৈতন্য-চরিতামৃত", উল্লেখ্য। এগুলি সাধারণত চরিত-গ্রন্থ। এই গ্রন্থগুলিতে যেমন মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের এবং তাঁর সমসাময়িক বৈষ্ণবগণের জীবনী রয়েছে, তেমনি নানা তত্ত্বলোচনাও আছে। এছাড়াও এসব গ্রন্থে এমন কিছু বাক্য আছে যেগুলিকে গদ্যে পরিবর্তিত করলে প্রবন্ধ সাহিত্যের নমুনা পাওয়া যেতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত দোম আন্তনিও-র "ব্রাহ্মণ-রোমান-ক্যাথলিকসংবাদ" গ্রন্থটি এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে মনোএল-দা-আসুম্প্সাম- এর লেখা "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" গ্রন্থদুটি যুক্তি, তথ্য, বর্ণনায় ঠাসা। এই যুগেই বিদেশী পাদরীগণের লেখা দু- একখানি 'প্রশ্নোত্তর গ্রন্থ'-র উল্লেখ পাওয়া

গেছে, যেগুলিতে বহু যুক্তি ও তথ্যের ব্যবহার করা হয়েছে, যায় ফলে এগুলিকেও আমরা প্রবন্ধ বলতে পারি।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের প্রসারের ইতিহাস ফোর্ট-উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মাঝে মাঝে তর্কসভার ব্যবস্থা করা হোত এবং ছাত্ররা কোনো বিষয় সম্পর্কে নিজের বক্তব্য প্রবন্ধাকারে লিখে আনত। কলেজের ছাত্রদের এই প্রবন্ধ লেখবার চেষ্টা বাংলা রচনাসাহিত্যের ইতিহাসে খুবই উল্লেখযোগ্য। এই সকল প্রবন্ধ ছাড়া ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে যে সকল গদ্য রচিত হয়েছে, তার মধ্যেও প্রবন্ধের লক্ষণ পাওয়া যায়। রামরাম বসু-র "রাজা প্রতাপাদিত্য-চরিত" গদ্যে লেখা প্রথম জীবন চরিত। রামরাম বসুর "লিপিমালা' তেও প্রবন্ধের লক্ষণ পাওয়া যায়।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্রমবিকাশের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম জড়িয়ে আছে। তাঁর "প্রবোধচন্দ্রিকা" উপদেশমূলক ও নীতিমূলক লেখার এক সঞ্চয়ন। গ্রন্থটির ভিতরে বৈজপাল বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তার ছেলেদের কাছে যে উপদেশ দিয়েছেন, সেগুলি নিয়ে স্বতন্ত্রভাবে একটি প্রবন্ধ রচনা করা যেতে পারে। এছাড়া তাঁর "বেদান্ত চন্দ্রিকা" ও এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রবন্ধ সাহিত্যে পুষ্টির দিক দিয়ে কেরী সাহেবের "দিগ্‌দর্শন" পত্রিকাটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। এই পত্রিকাটি তৎকালীন যুবকদের জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রসারের জন্যই প্রকাশিত হোত। পত্রিকাটির মধ্যে নানা জ্ঞানগর্ভ নীতিমূলক ও কৌতুহলোদ্দীপক প্রবন্ধ প্রকাশিত হোত।

এছাড়া স্কুলবুক সোসাইটির "পশ্বাবলী" তে প্রতি সংখ্যায় একটি করে প্রকল্প প্রকাশিত হোত। তাছাড়াও "বঙ্গদূত", "বিজ্ঞানসার সংগ্রহ", "জ্ঞানান্বেষণ" ইত্যাদি সাময়িক পত্রিকাতে, ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর", মার্শম্যান-এর "সমাচার দর্পণ" ইত্যাদিও এই স্থলে স্মরণীয়। এই সকল পত্র-পত্রিকাকে অবলম্বন করে বাংলা প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটি শুরু হয়েছিল, তার গৌরবোজ্জ্বল পরিণতি ঘটেছিল রাজেন্দ্রলাল মিত্রের "বিবিধার্থ সংগ্রহ"তে। বাংলা প্রবন্ধ রচনাকে যেভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন তার জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে সাময়িক পত্রের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি আবার ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় বিবাদ-বিতর্ক এবং তৎসম্পর্কিত রচনাবলী প্রবন্ধসাহিত্যের ভিতকে পাকা করে দেয়।

বাংলাসহিত্যে প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটি ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল, তা আজও অব্যাহত। বাংলাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ ও প্রাবন্ধিকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ম মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রমুখ প্রাবন্ধিক অসংখ্য প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন এবং সেই ধারা আজও প্রবহমান।

৯৩.৪ সারাংশ-১

মধ্যযুগের ইউরোপের সামাজিক পরিস্থিতির সূত্র ধরে প্রবন্ধ রচনা শুরু হলেও ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাংলা সাহিত্যে গদ্যবাহিত প্রবন্ধের উৎপত্তি হ'ল। প্রবন্ধকে সাধারণতঃ ভাগ করা হয় দুভাগে-গুরু ও লঘু প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হ'ল 'প্রকৃষ্ট বন্ধন'। প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত রচনাই প্রবন্ধ। সাধারণত জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম দর্শন ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজ, সাহিত্য, শিল্প ইত্যাদি বিষয়ের চিন্তাগ্রাহ্য রুপকে লেখক যখন তথ্য ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠা করতে চান, তখন তা প্রবন্ধ হয়ে ওঠে। প্রবন্ধ যেমন গদ্যে লেখা যায়, তেমনি পদ্যেও লেখা যায়। পত্রের আকারেও প্রবন্ধ রচিত হতে পারে। প্রবন্ধের আকার দীর্ঘও হতে পারে, আবার নাতিদীর্ঘও হতে পারে।

লঘু প্রবন্ধ, মন্ময় রচনা বা রম্য রচনা প্রবন্ধেরই আর এক রুপ। রম্যরচনা গদ্যে লেখা হলেও, তা তত্ত্ববহুল আলোচনা নয়। লেখক যখন নিজের মনের ভাব কল্পনা রমনীয় রুপে প্রকাশ করেন, তখন তা রম্যরচনা হয়ে ওঠে। ফরাসী লেখক মিচেল মঁতেঁই ষোড়শ শতাব্দীতে এই ধরণের রচনার সূত্রপাত করেন। বাংলা সাহিত্যে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে মন্ময় প্রবন্ধ রচনা শুরু হলেও, রবীন্দ্রনাথই এই জাতীয় সাহিত্যকে ঐশ্বর্য দান করেছেন।

মধ্যযুগে রচিত "চৈতন্য ভাগবত" বা "চৈতন্য চরিতামৃত" গ্রন্থের মধ্যে প্রবন্ধ সাহিত্যের কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ, মৃতুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, উইলিয়াম কেরী, স্কুল বুক সোসাইটি ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও "বঙ্গাদূত", "বিজ্ঞানসার", "জ্ঞানান্বেষণ", "সংবাদপ্রভাকর", "সমাচার দর্পণ", "বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রভৃতি পত্রিকাও প্রবন্ধ সাহিত্য বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উনিশ শতকের ধর্মকলহসূত্রে বাদানুবাদ প্রবন্ধ সাহিত্যের পুষ্টিবর্ধক।

৯৩.৫ অনুশীলনী-১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) প্রবন্ধের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য লিখুন। এই প্রসঙ্গে বাংলা ও ইংরেজী কিছু প্রবন্ধের নাম লিখুন।

(২) গদ্য রচিত প্রবন্ধকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় তা উল্লেখ করে, সেগুলি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করুন।

(৩) বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশের ধারা বর্ণনা করুন।

(৪) প্রবন্ধসাহিত্যের গুরু ও লঘুর মধ্যে কোন ভেদ আছে কি? থাকলে তা স্পষ্ট করে বুঝিয়ে লিখুন।

(৫) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) প্রবন্ধ শব্দটির প্রকৃতি-প্রত্যয়গত অর্থ হ'ল—— ——।

(খ) এই গদ্যবাহিত রচনাকে —— ও —— এই —— ভাগ করা যায়।

(গ) —— যাকে ইংরেজীতে বলা হয় —— ——, তার জনক হলেন প্রসিদ্ধ—— লেখক —— ——।

(ঘ) বাংলাসাহিত্যে —— —— ই —— ঐশ্বর্য দান করলেন।

(ঙ) রামরাম বসুর —— —— —— গদ্যে লেখা প্রথম —— ——।

৬। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) বাংলা সাহিত্যে প্রবন্ধের উৎপত্তি (১) ঊনবিংশ শতাব্দীতে, (২) ষোড়শ শতাব্দীতে, (৩) মধ্যযুগে

(খ) মন্ময় প্রবন্ধ সাহিত্যের জনক (১) বেকন (২) মিচেল মঁতেঁই, (৩) হ্যাজলিট

(গ) "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ"-এর রচয়িতা- (১) দোম আন্তনিও, (২) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, (৩) মনোএল-দা-আসুম্প্সাম।

(ঘ) "বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকাটির সম্পাদক- (১) রাজেন্দ্রলাল মিত্র (২) স্কুল বুক সোসাইটি (৩) ঈশ্বরগুপ্ত।

৯৩.৬ মূলপাঠ- ২ প্রবন্ধের শ্রেণীবিভাগ, গুরু ও লঘু প্রবন্ধের পার্থক্য ও আলোচনা

সাহিত্যের যা উদ্দেশ্য, অর্থাৎ সৌন্দর্য সৃষ্টি ও আনন্দদান, প্রবন্ধসাহিত্যের লক্ষণও তদনুরূপ। প্রবন্ধকে দুভাগে ভাগ করা হয়,— (১) বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা গুরু প্রবন্ধ ও (২) মন্ময় বা ব্যক্তিগত বা লঘু প্রবন্ধ। নীচে এই দুইপ্রকার প্রবন্ধ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হ'ল।

(১) বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা গুরু প্রবন্ধ (Formal or Informative Essay)- এই শ্রেণীর প্রবন্ধ কোনো প্রাবন্ধিকের বিষয়জ্ঞান ও তার যুক্তিনিষ্ঠ উপস্থাপনা গুরুপ্রবন্ধে প্রাধান্য পায়। প্রকৃষ্টবন্ধনে আবদ্ধ এই জাতীয় প্রবন্ধকে "বিষয়-গৌরবী" প্রবন্ধও বলা হয়।

(২) ব্যক্তিগত বা মন্ময় বা লঘু প্রবন্ধ (Familiar বা Intimate Essay)-এখানে লেখকের চিন্তার চেয়ে ব্যক্তি-হৃদয়ই প্রধান। কখনো খুব পুরোনো কখনো বা পরিচিত বিষয়কে প্রাবন্ধিক এখানে নিজের কল্পনার দ্বারা রঞ্জিত করে প্রকাশ করেন। অন্তর্লীন সঙ্গতির সূত্র বজায় রেখে বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে গমনাগমনের স্বাধীনতা থাকে লেখকের। বিষয়ের থেকে প্রকাশ ভঙ্গির বৈশিষ্ট্য আকর্ষণ করে পাঠককে। এই জাতীয় প্রবন্ধকে আমরা "আত্মগৌরবী" প্রবন্ধও বলতে পারি। রচনার রস্যতাদৃষ্টে রম্যরচনা বলেও অভিহিত হয়ে থাকে এ জাতীয় প্রবন্ধ।

উপরের আলোচনা থেকে এই দুই জাতীয় প্রবন্ধের কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) গুরু প্রবন্ধ আমাদের বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণতর, দৃষ্টিকে সমুজ্জ্বল, জ্ঞানের পরিধিকে প্রশস্ত করে তোলে। আর লঘু প্রবন্ধ হালকা চালে বিষয়কে রমণীয় করে তোলে।

(২) গুরু প্রবন্ধ নানা প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে জীবনের নানা সমস্যার সমাধান করতে পারে, লঘু প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক গম্ভীর বিষয়কে স্নিগ্ধ করে পাঠকের চারিদিকে একটি সুন্দর ভাবমণ্ডল সৃষ্টি করেন।

(৩) বস্তুনিষ্ঠ বা গুরু প্রবন্ধে লেখকের বিচার-বুদ্ধি, চিন্তা ইত্যাদি প্রধান, আর ব্যক্তিগত বা লঘু প্রবন্ধে লেখকের রসময় মধুর আত্ম-স্পর্শ প্রধান।

(৪) বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে লেখক যদি আত্মপ্রচার করেন ব্যক্তিগত প্রবন্ধে লেখক করেন আত্ম-নিবেদন।

(৫) বস্তুনিষ্ঠ বা গুরু প্রবন্ধের বিষয়বস্তু জ্ঞানগর্ভ, গুরুগম্ভীর, কিন্তু সংসারের যে কোনো বিষয়, তা যতো তুচ্ছাতিতুচ্ছ হোক না কেন লঘু প্রবন্ধের বিষয়ীভূত হতে পারে।

এবার আমরা বাংলা সাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য গুরু ও লঘু প্রবন্ধ সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমে আসা যাক গুরু প্রবন্ধের কথায়। এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু প্রবন্ধের আলোচনা যেমন করা হবে, তেমনি সেই সব প্রবন্ধের রচয়িতাদের সম্পর্কেও সংক্ষিপ্ত আলোচনা থাকবে। বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যের প্রথম যুগের রচনাকারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনিই বাংলা গদ্যকে প্রথম বিতর্ক ও বাদ প্রতিবাদের বাহন করে তুললেন। তাঁর "বেদান্ত গ্রন্থ" (১৮১৫), "বেদান্ত সার" (১৮১৫), "উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার" (১৮১৮), "গোস্বামীর সহিত বিচার" (১৮১৮), "সহমরণ বিষয়ক প্রবর্তক-নিবর্তক সম্বাদ" (১৮১৮-১৯) ইত্যাদি গ্রন্থগুলি সবই গুরুগম্ভীর ও অনেকক্ষেত্রেই বিতর্কমূলক।

এর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ রচয়িতা হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তিনি ছিলেন চিন্তাশীল পণ্ডিত। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বিস্তৃত। তাই দেশ-বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকে তথ্য আহরণ করে তিনি তাঁর গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশ করেছেন। তাঁর "ভূগোল" (১৮৪১), "চারুপাঠ" (১৮৫৩-৫৯), "বাহ্য বস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার" (১৮৫১ প্রবন্ধ খণ্ড, ১৮৫৩ ২-য় খণ্ড) ইত্যাদি এই জাতীয় জ্ঞানগর্ভ রচনা। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে তাঁর যুক্তিশীল মনন ও চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

আমাদের আলোচিত পরবর্তী গুরু প্রবন্ধগুলি হ'ল "সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৫৩), "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৫৫), "বহু বিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার" (১৮৭১-১ম, ১৮৭৩-২য়) ইত্যাদি প্রবন্ধগুলি। এগুলি সবই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের লেখা। এই প্রবন্ধগুলির সবগুলিতেই যুক্তি ও তথ্যের সমারোহ লক্ষ্য করা যায়।

বিদ্যাসাগরের পরবর্তীকালে গুরু প্রবন্ধ রচয়িতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ভুদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ হ'ল "বিবিধ প্রবন্ধ" (১৮৯৫-১ম, ১৯০৫-২য় খণ্ড)। এই প্রবন্ধটিতে সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে সমালোচনার মধ্যে দিয়ে প্রাবন্ধিকের সাহিত্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থটির মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের নিপুণ, বিশ্লেষণমূলক ও সুদীর্ঘ পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হ'ল "পারিবারিক প্রবন্ধ" (১৮৮২), "সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২), এবং "আমার প্রবন্ধ (১৮৯২)। এই রচনাগুলি সবই গভীর চিন্তামূলক। ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং পরিবার ও সমাজের প্রতি ব্যক্তির কর্তব্য অত্যন্ত সংযত ভাষায় এখানে লিপিবদ্ধ হয়েছে।

এরপরে উল্লেখযোগ্য, প্রবন্ধ সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ। গুরু ও লঘু উভয় জাতীয় প্রবন্ধ রচনায় তিনি তাঁর কৃতিত্বের সাক্ষর রেখেছেন। গুরু প্রবন্ধের ক্ষেত্রে মোটামুটি সব রকম বিষয় অবলম্বন করে প্রবন্ধ রচনা করে তিনি বাঙালীকে প্রবুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, শিল্প, শাস্ত্র সবরকম বিষয়েই তাঁর প্রবন্ধ পাওয়া যায়। "বিজ্ঞানরহস্য" (১৮৭৫) প্রবন্ধের মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। "বিবিধ প্রবন্ধ" (১৮৮৭-১ম, ১৮৯২-২য় খণ্ড) তে সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে লেখা "ধর্মতত্ত্ব"তে ধর্মজিজ্ঞাসার নানা আলোচনা পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ হ'ল "সাম্য" (১৮৭৯), "বিবিধ সমালোচনা" (১৮৭৬), "প্রবন্ধপুস্তক" (১৮৭৯), "কৃষ্ণচরিত্র" ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলিতে যুক্তি, তথ্য মননের নানা পরিচয় পাওয়া গেলেও তা কখনই নীরস আলোচনা হয়ে ওঠেনি। বলা যেতে পারে বুদ্ধিপ্রধান বিশুদ্ধ রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কৃতিত্ব অসাধারণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালের এবং পরবর্তী সময়ের কিছু প্রবন্ধিক, যাঁদের বঙ্কিম অনুসারী বলা যায়, তাঁরা কিছু উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "গ্রীক ও হিন্দু" (১৮৭৫), "বাল্মীকি ও তৎসমসাময়িক বৃত্তান্ত" (১৮৭৬), যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণের "ম্যাটসিনির জীবনবৃত্ত" (১৮৮০), "গ্যারিবল্ডীর জীবনবৃত্ত (১৮৯০), "বীরপূজা" (১৯০০), রামদাস সেনের "ঐতিহাসিক রহস্য" (১৮৭৪-১ম, ১৮৭৬-২য়, ১৮৭৯-৩য়), "ভারতরহস্য" (১৮৮৫) ইত্যাদি। এই প্রবন্ধগুলিতে রাজনীতি, ইতিহাস, পুনরাবৃত্ত ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে। এই সময়কার আরো কিছু উল্লেখনীয় গুরু প্রবন্ধ হ'ল "সমাজ সমালোচনা" (১৮৭৫), "আলোচনা" (১৮৮২), "রূপক ও রহস্য"- অভয়চন্দ্র সরকার রচিত, "প্রভাতচিন্তা" (১৮৮৪), "নিভৃতচিন্তা" (১৮৮৩), 'নিশীথচিন্তা" (১৮৯৬)- কালীপ্রসন্ন ঘোষ রচিত, "নানাপ্রবন্ধ" (১৮৮৫)- রাজকৃষ্ম মুখোপাধ্যায় রচিত ইত্যাদি।

তখনকার সময়ের আরো তিনজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক হলেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন, স্বামী বিবেকানন্দ। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তত্ত্ব বিদ্যা" (১৮৬৬০৬৯), "নানা চিন্তা" (১৯২০), "প্রবন্ধমালা' (১৯২০) ইত্যাদি প্রবন্ধে দর্শনচিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। কেশবচন্দ্র সেনের ভক্তিবাদ, অধ্যাত্মানুভূতি তাঁর "জীবনবেদ" গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। স্বামী বিবেকানন্দের অধিকাংশ রচনাই ইংরেজীতে লেখা হলেও, বাংলায় তিনি কিছু গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। যেমন—"ভাববার কথা", "পরিব্রাজক", "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" ইত্যাদি। এবার আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কিছু উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ নিয়ে আলোচনা করব। রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি নানা বিয়য়ে তিনি গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এইসব বিষয়ে তিনি কতটা গভীরভাবে চিন্তা করতেন, তা তাঁর রচিত এইসব বিষয়ের ওপর লেখা প্রবন্ধগুলি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। "ভারতবর্ষ" (১৯০৬), "রাজাপ্রজা" (১৯০৮), "স্বদেশ" (১৯০৮), "পরিচয়" (১৯১৬), "সভ্যতার সংকট" (১৯৪১) ইত্যাদি প্রবন্ধে তিনি রাজনীতি, সমাজনীতি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সবজায়গায় তিনি মানবধর্মকে জয়যুক্ত দেখতে চেয়েছেন। শিক্ষা বিষয়ক তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হ'ল "শিক্ষা" (১৯০৮)। এই প্রবন্ধে তিনি আমাদের দেশের শিক্ষাসমস্যা, পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গো তুলনায় প্রাচ্যশিক্ষার বিশিষ্টতা মাতৃভাষাপ্রীতি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুগম্ভীর আলোচনা করেছেন। "ধর্ম" (১৯০৯), "শান্তিনিকেতন" (১৯০৯-১৬), "মানুষের ধর্ম" (১৯৩৩) ইত্যাদি প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্ম বিষয়ক নানা চিন্তা-ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। উপরিউক্ত প্রবন্ধগুলিতে তাঁর অসাধারণ মনীষা, পাণ্ডিত্য, যুক্তি প্রকাশিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পর বাংলা সাহিত্যে বস্তুনিষ্ঠ বা গুরু প্রবন্ধ আমরা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাতে পাই। তাঁর এই জাতীয় একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হ'ল "বাগেশ্বরী শিল্পপ্রবন্ধাবলী" (১৯৪৯)। শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে "বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী" শুধু প্রবন্ধ গুণসমন্বিত নহে,—যথেষ্ট রচনাগুণ সমন্বিত। প্রবন্ধটির মধ্যে শিল্প-সম্পর্কিত নানা আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাঁর শিল্পীমনেরই পরিচয় পাওয়া যায়।

এবার আমাদের আলোচনা লঘু প্রবন্ধ নিয়ে। লঘু বা মন্ময় প্রবন্ধ আলোচনায় আমাদের সবচেয়ে প্রথমেই মনে পড়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের "অতি অল্প হইল" (১৮৭৩), "আবার অতি অল্প হইল" (১৮৭৩), এবং "ব্রজবিলাস" (১৮৮৪) এই তিনটি প্রবন্ধের কথা। বিধবাবিবাহ প্রচলন এবং বহুবিবাহ নিরোধ করবার জন্য বিদ্যাসাগরের বিপক্ষে যে কুৎসা রটনা করা হয়েছিল, তার প্রতিবাদ করার জন্য বিদ্যাসাগর "কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপো সহচরস্য" এই ছদ্মনামে বিদ্রূপকৌতুক লঘুরসের মধ্যে দিয়ে উপরিউক্ত বিতর্কমূলক রচনাগুলি লিখেছেন। বন্ধুকন্যার মৃত্যু উপলক্ষে লেখেন শোকাঞ্জলি "প্রভাবতী সম্ভাষণ।"

এবার আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "লোকরহস্য" (১৮৭৪)। প্রবন্ধটির মধ্যে সমাজ, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং এসব আলোচনাই কৌতুকরসের আধারে পরিবেশিত হয়েছে।

এরপরে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত বা লঘু প্রবন্ধের আলোচনায় আসা যেতে পারে। এটি হ'ল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "কমলাকান্তের দপ্তর" (১৮৫৭)। প্রবন্ধটি কৌতুক পরিহাসে ভরা। ইংরেজ সাহিত্যিক ও সমালোচক ডি কুইন্‌সির "Confessions of an English Opium Eater"-এর কথা স্মরণে রেখে রচিত হয়েছিল এই গ্রন্থ। এর মধ্যে একদিকে যেমন গল্পরস আছে, নাটকীয়তা আছে, অন্যদিকে রচনাসাহিত্যের ব্যক্তিগত লক্ষণও রয়েছে। সব মিলিয়ে "কমলাকান্তের দপ্তর" বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হয়ে উঠেছে। সমাজ, স্বদেশ, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ের নানা সমস্যা

নিয়ে প্রাবন্ধিক এখানে আলোচনা করেছেন। গ্রন্থটি তিনটি অংশে বিভক্ত-কমলাকান্তের দপ্তর, কমলাকান্তের পত্র ও কমলাকান্তের জোবানবন্দী। এই তিনটি অংশের মধ্যে দিয়ে হাস্যরসাত্মক নানাধরনের রচনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। যেমন প্রথম অংশের প্রথম সংখ্যা "একা-কে গায় ওই"। এই অংশ কোনো তথ্য সংবাদ বহন না করলেও তা উপাদেয় সাহিত্য। এই অংশের আরো কয়েকটি উল্লেখ্য সংখ্যা হ'ল-"বিড়াল", "পতঙ্গ", "আমার মন", "বড় বাজার", "আমার দুর্গোৎসব", "বসন্তের কোকিল" ইত্যাদি। প্রবন্ধের ভিতরে আফিংখোর কমলাকান্ত চক্রবর্তীর মুখ দিয়ে সে সব কথা বেরিয়েছে, তা যে সবই বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব কথা, সে কথা বুঝতে পাঠকের কোনো কষ্ট হয় না। এর থেকে বোঝা যায় বঙ্কিমের ভিতরে একটি কবি-প্রাণ ছিল, দার্শনিক মনোভাব ছিল, স্বদেশের প্রতি ভক্তি ছিল, সর্বোপরি একটি হাস্যরসিক হৃদয় ছিল এবং সত্তার এই সমস্ত অংশ একসঙ্গে মিশে "কমলাকান্তের দপ্তর" সৃষ্টি করেছিল।

ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় হাস্যরস অবলম্বন করে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেছিলন। সেগুলি হোল— "হিন্দু জাতির একনিষ্ঠতা" (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮), "পিঠে পুলি" ইত্যাদি।

এরপরে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধ "পঞ্চভূত"। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৯৭খ্রীস্টাব্দে। "পঞ্চভূত"কে মানুষ বানিয়ে তাদের মুখনিঃসৃত বিতর্কের মধ্যে দিয়ে প্রচুর কৌতুকরসের আমদানি করে সাহিত্য, শিল্প সম্পর্কে প্রচুর গুরু কথাকে কবি লঘুভাবে এখানে প্রকাশ করেছেন। তাঁর "বিচিত্র প্রবন্ধ" (১৯০৭)-ও ব্যক্তিগত প্রবন্ধের পর্যায়ভুক্ত। বিচিত্র প্রবন্ধের ভূমিকাতেই লঘুপ্রবন্ধের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করে কবি মন্তব্য করেছিলেন, বিষয়বস্তুর গৌরব নয়, এ ধরনের লেখায় মূল উপভোগ্য হ'ল রচনার সরসতা।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে প্রমথ চৌধুরী কয়েকটি লঘু প্রবন্ধ লিখেছিলেন, যেমন-"বীরবলের হালখাতা" (১৯১৭), "তেল-নুন-লকড়ী" (১৯০৬)। ব্যঙ্গবিদ্রুপের সাহায্যে আমাদের জড়তাগ্রস্ত সমাজের স্থবিরতাকে তিনি নাস্তানাবুদ করেছেন।

আধুনিক যুগেও অনেক লেখক ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা করেছেন। এর মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য বুদ্ধদেব বসুর "হঠাৎ আলোর ঝলকানি"। এছাড়াও বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, "যাযাবর", মুজতবা আলি প্রমুখ জীবনের নানা অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার থেকে রস আহরণ করে ব্যক্তিগত প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

পরিশেষে একটি কথা বলা প্রয়োজন। ইংরেজি ভাষায় লেখা সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজ, অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর যেমন গুরু গম্ভীর প্রবন্ধ অনেক আছে, তেমনি এইসব বিষয় নিয়ে বাংলাতেও কম প্রবন্ধ নেই। কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ব্যক্তিগত বা লঘু জাতীয় প্রবন্ধের পরিমাণ তুলনামূলক ভাবে কম।

৯৩.৭ সারাংশ-২

বিষয়বস্তুর দিক থেকে প্রবন্ধ সাহিত্যকে দুভাগে ভাগ করা হয়। (১) বস্তুনিষ্ঠ বা তন্ময় বা গুরু প্রবন্ধ এবং (২) ব্যক্তিগত বা মন্ময় বা লঘু প্রবন্ধ।

বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধে একটা সুনির্দিষ্ট আয়তনে প্রাবন্ধিক তাঁর জ্ঞান, পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটিয়ে আমাদের মুগ্ধ করে রাখেন। আর ব্যক্তিগত প্রবন্ধে প্রাবন্ধিক পরিচিত বিষয়কেই নিজের কল্পনার সাহায্যে নতুন করে প্রকাশ করেন। অর্থাৎ গুরু প্রবন্ধ আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, দৃষ্টিকে প্রশস্ত, তীক্ষ্ম ও সমুজ্জল করে তোলে। আর লঘু প্রবন্ধ সাধারণ বিষয়কেই রচনাবৈশিষ্ট্যে অসাধারণ করে ফুটিয়ে তোলে।

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য গুরু প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রামদাস সেন, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, রাজকৃষ্ম মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ লেখকবৃন্দ। বাংলাসাহিত্যে গুরু প্রবন্ধ অনেক রচনা হলেও, লঘু প্রবন্ধের সংখ্যা বাংলাসাহিত্যে সেই তুলনায় কম। আর এই লঘু বা ব্যক্তিগত প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য রচয়িতারা হলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতি লেখক।

৯৩.৮ অনুশীলনী-২

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) গুরু ও লঘু প্রবন্ধের পার্থক্য নির্দেশ করুন এবং এই প্রসঙ্গে দুটি করে গুরু ও লঘু প্রবন্ধের ও তাদের রচনাকারদের নাম করুন।

(২) প্রবন্ধকে কটি ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি তা উল্লেখ করে তাদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচিত গুরু ও লঘু প্রবন্ধ সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

(৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের —— যুগের রচনাকারদের মধ্যে —— হলেন ——রায়।

(খ) —— প্রবন্ধের মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিক তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন।

(গ) কেশবচন্দ্র সেনের——, অধ্যাত্মনুভুতি তাঁর —— গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়।

(ঘ) —— বিষয়ক তাঁর উল্লেখযোগ্য —— হ'ল ——।

(ঙ) সব মিলিয়ে —— —— বাংলা সাহিত্যের এক উল্লেখযোগ্য —— হয়ে উঠেছে।

৫। সঠিক উত্তরে ঠিক (√) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) বিষয়- গৌরবী প্রবন্ধ হ'ল- (১) তন্ময় প্রবন্ধ, (২) মন্ময় প্রবন্ধ, (৩) ব্যক্তিগত প্রবন্ধ।

(খ) 'ভূগোল' গ্রন্থটির রচয়িতা - (১) অক্ষয়কুমার দত্ত, (২) বিদ্যাসাগর, (৩) বঙ্কিমচন্দ্র।

(গ) 'ধর্মতত্ত্ব' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়- (১) ১৮৮৬, (২) ১৮৮৮, (৩) ১৮৮০।

(ঘ) 'নানা প্রবন্ধ' রচনা করেছিলেন- (১) ভূদেব মুখোপাধ্যায়, (২) রাজকৃষ্ম মুখোপাধ্যায়, (৩) কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

(ঙ) অবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ-(১) ধর্ম, (২) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী, (৩) রাজা প্রজা।

(চ) 'লোকরহস্য গ্রন্থের রচয়িতা - (১) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, (২) প্রমথ চৌধুরী, (৩) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(ছ) ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়- (১) কমলাকান্তের দপ্তর, (২) ব্রজবিলাস, (৩) সাম্য।

৯৩.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী- ১

১-৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-১ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

(৫) (ক) প্রকৃষ্ট, বন্ধন।
(খ) প্রবন্ধ সাহিত্য, রচনা সাহিত্য, দুভাগে।
(গ) রচনা সাহিত্য, Essay, Literature, ফরাসী মিচেল মঁতেই।
(ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রচনাসাহিত্যকে।
(ঙ) রাজা প্রতাপাদিত্য, চরিত্র, জীবন-চরিত।

৬। (ক) ঊনবিংশ শতাব্দীতে
(খ) মিচেল মঁতেই
(গ) মনোএল-দা-আসুম্‌প্‌সাম
(ঘ) রাজেন্দ্রলাল মিত্র

অনুশীলনী-২

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-২-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

(৪) (ক) প্রথম, উল্লেখযোগ্য, রাজা, রামমোহন
(খ) বিজ্ঞানরহস্য
(গ) ভক্তিবাদ, জীবনবেদে
(ঘ) শিক্ষা, প্রবন্ধ, শিক্ষা
(ঙ) কমলাকান্তের দপ্তর, গ্রন্থ

৫। (ক) তন্ময় প্রবন্ধ
(খ) অক্ষয়কুমার দত্ত
(গ) ১৮৮৮
(ঘ) রাজকৃষ্ম মুখোপাধ্যায়
(ঙ) বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী
(চ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(ছ) কমলাকান্তের দপ্তর

৯৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

(১) শশীভূষণ দাশগুপ্ত— বাংলা সাহিত্যের একদিক
(২) শ্রীশচন্দ্র দাশ— সাহিত্য সন্দর্শন
(৩) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।

একক ৯৪ ❑ কথাসাহিত্য ঃ উপন্যাস, সামাজিক উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস

গঠন

৯৪.১ উদ্দেশ্য

৯৪.২ প্রস্তাবনা

৯৪.৩ মূলপাঠ- ১-কথাসাহিত্য ঃ উপন্যাস

৯৪.৪ সারাংশ- ১

৯৪.৫ অনুশীলনী - ১

৯৪.৬ মূলপাঠ - ২ সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৪.৭ সারাংশ - ২

৯৪.৮ অনুশীলনী - ২

৯৪.৯ মূলপাঠ - ৩-ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৪.১০ সারাংশ - ৩

৯৪.১১ অনুশীলনী - ৩

৯৪.১২ উত্তরমালা

৯৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৯৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি কথাসাহিত্যের একটি বিভাগ উপন্যাস সম্পর্কে যেমন জানতে পারবেন, তেমনি উপন্যাসের প্রধান দুটি বিভাগ সামাজিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কেও আলোচনা করতে পারবেন।

আপনি এককটি যত্নসহকারে পাঠ করুন এবং অনুশীলনীর যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এই এককটি থেকে আপনি-

- পাশ্চাত্য উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হ'ল তা জানতে পারবেন।
- বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হ'ল, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস কি এবং কেন সেটিকে প্রথম যথার্থ উপন্যাস বলা হয়, সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- এছাড়াও ইতিহাসের দিক দিয়ে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস কি এবং কেন সেটি প্রথম উপন্যাসের মর্যাদা পায়নি, তাও জানতে পারবেন।

- সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভব সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- উপন্যাসের এই দুটি শাখার অন্তর্গত বিভিন্ন ঔপন্যাসিকদের উপন্যাসগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

৯৪.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি পড়ে আপনি কথাসাহিত্যের একটি বিভাগ উপন্যাস সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং উপন্যাস সৃষ্টির মূলে কথাসাহিত্যের অপর বিভাগ গল্পেরও যে কিছু অবদান আছে, সে সম্পর্কেও অবগত হবেন। এছাড়া পাশ্চাত্য উপন্যাস এবং বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হ'ল, তার আলোচনা এই এককটিতে করা হয়েছে। এছাড়া বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস এবং ইতিহাসের ভিত্তিতে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস কোনটি, তার আলোচনাওএ এককটিতে আছে। আপনি এককটি ভালোভাবে পাঠ করলে পাশ্চাত্য ও আমাদের দেশে উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হ'ল, সে সম্পর্কে একটা ধারনা পাবেন।

এককটির দ্বিতীয় ভাগে সামাজিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও উদ্ভব সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে, তারপরে সামাজিক উপন্যাসের রচয়িতার নাম এবং তাঁদের উল্লেখযোগ্য কিছু উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এককটির তৃতীয় ভাগে ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এখানে, ঐতিহাসিক উপন্যাসকে যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়, তার কথাও আলোচিত হয়েছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর হাতে যে ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম হয়েছিল, সে কথাও এখানে আপনারা পাবেন। এছাড়া বাংলাসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কিছু ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এই এককটির তিনটি ভাগ মনোযোগ সহকারে পড়ুন। তিনটি ভাগ পড়ার পর সঙ্গে দেওয়া অনুশীলনীর যথাযথ উত্তর আপনি নিশ্চয় দিতে পারবেন। প্রয়োজনে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

৯৪.৩ মূলপাঠ- ১ কথাসাহিত্য ঃ উপন্যাস

কথাসাহিত্য বলতে আমরা গল্প-উপন্যাস উভয়কেই বুঝে থাকি। এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় যদিও উপন্যাস তবে উপন্যাসের আলোচনা করতে গেলেও গল্পের কথা কিছু চলে আসে। গল্পের প্রতি মানুষের চিরকালই আকর্ষণ ছিল এবং থাকবেও। প্রাচীন যুগে বনচারী মানুষ যখন সারাদিনের পরে নিজের আস্তানায় ফিরে আসত, তখন তাদের বিনোদনের একমাত্র অবলম্বন ছিল নৃত্যগীত এবং সেই নৃত্যগীতের মধ্যে তাদের নিজেদের জীবনকাহিনী-ই লুকিয়ে থাকত। এইভাবে মানুষ নিজের জীবনকে অবলম্বন করেই গল্প বানাতে শিখেছিল। পুরোনো যুগের মানুষ অলৌকিকতায় বিশ্বাস করত, ভয় পেত, তাই প্রাচীন যুগের গল্প অনেকসময় অবিশ্বাস্য ঘটনাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠত। আস্তে আস্তে অলৌকিকতার পাশাপাশি যুদ্ধ, প্রেম, ভালোবাসা ইত্যাদি নানা বিষয় অবলম্বন করে আখ্যান গড়ে উঠতে থাকে। সেই সমস্ত অপরিণত গদ্য-আখ্যান ক্রমে পরিণত উপন্যাসের রুপ লাভ করে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনের হাত ধরে।

গদ্য-আখ্যানকে মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ করা হয়। একটিকে বলা হয় রোমান্স, যাতে প্রাধান্য থাকে

অনৈসর্গিক, অলৌকিক ঘটনাবলীর। আর অপরটিকে বলা হয় উপন্যাস। এখানেও কাহিনী থাকে, তবে সে কাহিনী বাস্তব, বিশ্বাসযোগ্য ও যুক্তিগ্রাহ্য। উপন্যাসেও রোমান্সের উপাদান অবশ্য থাকতে পারে। তবে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় লেখকরা বুঝতে পেরেছিলেন, বাস্তব মানুষের কাহিনী, চরিত্র ইত্যাদি উপন্যাসের মূল উপকরণ। তার আগে মধ্যযুগের ইউরোপীয় সাহিত্যে উপন্যাস জাতীয় রচনার উল্লেখ পাওয়া যায়। মধ্যযুগে ইতালিতে "নভেলা"-র জনপ্রিয়তার কথা এখানে উল্লেখ করতে হয়। ইতালীয় লেখক বোকাচিও "Novella Storie'' নাম দিয়ে কতকগুলি গল্প লিখেছিলেন। "নভেল" (উপন্যাস) শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে এই "নভেলা" থেকে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দী থেকেই ইউরোপে দেশীয় ভাষা অবলম্বনে নানা ধরণের গল্প লেখা শুরু হয়। এর মধ্যে ছিল রাখালিয়া পটভূমিতে লেখা রোমান্টিক গল্প। ঐ সময় স্পেনে পিকারেস্ক কাহিনীর প্রচলন হয়, যার নায়ক হত নিম্নবর্গের কোনো দুঃসাহসী ব্যক্তি (পিকারো) এবং সেই ব্যক্তির দুঃসাহসিক কার্যকলাপই গল্পের প্রধান আকর্ষণ ছিল। এগুলিকে আমরা উপন্যাসের পূর্বপুরুষ বলতে পারি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এসে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশ, রাজনৈতিক আবহাওয়া, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি মানুষের মনকে এমন ভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, তখন থেকেই উপন্যাস রচনার পটভূমি তৈরী হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিকে মানুষ কিছু উদ্ভট, অসম্ভব কাহিনীর দিকে ঝুঁকলেও, আস্তে আস্তে ইংরেজি সাহিত্যে রিচার্ডসন, গোল্ডস্মিথ, জার্মানীর উইলেন্ড, গ্যয়ঠে, ফরাসী দেশের মাদাম ফেয়েত্তে, মারিভোস প্রেভোস - উপন্যাসের গোড়াপত্তন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় সাহিত্যে সমাজ ও পরিবারকে কেন্দ্র করে যুগান্তকারী উপন্যাস রচিত হল। এইভাবে ক্রমে ক্রমে সময় যত বদলাতে লাগল, উপন্যাসে তত বৈচিত্র্য সৃষ্টি হতে লাগল। বিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় উপন্যাসে তাই নানা বিচিত্রতা দেখা যায়, এবং সেই বৈচিত্র্যসৃষ্টির বিরাম আজ পর্যন্ত হয়নি, হয়তো হবেও না।

এতো গেল পাশ্চাত্য সাহিত্যের কথা, এবার আমরা আসি বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গে। মধ্যযুগে ধর্মপ্রধান কাব্যসাহিত্যে মানবজীবনের কাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। তার আগে "কথাসরিৎসাগর'', 'দশকুমারচরিত্র", "কাদম্বরী" ইত্যাদি সংস্কৃত গদ্য রোমান্স এবং "পঞ্চতন্ত্র", 'হিতোপদেশ", "বেতালপঞ্চবিংশতি" ইত্যাদি নীতিগল্প সুপরিচিত ছিল। এছাড়া ছিল জাতকের কাহিনী যা পালি ভাষায় রচিত হয়েছিল। কিন্তু যাকে কথাসাহিত্য বলা হয়, সংস্কৃত ও পালিভাষায় তার নিদর্শন মেলে না। মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছিল, যার মধ্যে মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর "চণ্ডীমঙ্গল" কাব্যে উপন্যাসের কিছু লক্ষণ পাওয়া যায়। কিন্তু যথার্থ উপন্যাস বলতে যা বোঝায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তা গড়ে ওঠে।

প্যারিচাঁদ মিত্র রচিত আলালের ঘরের দুলাল বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস রূপে অভিহিত হয়ে থাকে। তাই প্যারিচাঁদ মিত্র-ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

তবে সময়ের কথা মাথায় রাখলে অবশ্য বলতে হয় "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ" বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা খ্রিশ্চিয়ান ট্র্যাক্ট অ্যান্ড বুক সোসাইটির উদ্যোগে ঐ মিশনের এক খ্রিশ্চিয়ান বিদেশিনী হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স ভালোভাবে বাংলা শিখে দেশী খ্রীষ্টান সমাজের কাহিনী অবলম্বনে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। যদিও প্যারীচাঁদের আলালের ঘরের দুলাল রচনার কয়েকবছর আগেই গ্রন্থটি মুদ্রিত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও "ফুলমণি ও করুণার বিবরণ"কে প্রথম বাংলা উপন্যাসের মর্যাদা দানে কুণ্ঠা দেখা যায় কতকগুলি কারণে—

(১) গ্রন্থবর্ণিত কাহিনীতে যেহেতু খ্রীষ্টান পরিবারের ঘটনাই প্রাধান্য পেয়েছে, তাই বাঙালী হিন্দু পাঠকসমাজে গ্রন্থটির কোন প্রচার হয়নি,

(২) যেহেতু খ্রীষ্টান পরিবারের কাহিনী, তাই খ্রীষ্টধর্ম উপন্যাসটির মজ্জায় মজ্জায় ছড়িয়ে আছে। সেজন্য সাধারণ হিন্দু সমাজ উপন্যাসটি সম্বন্ধে এবং এর লেখিকা সম্পর্কে বিশেষ কোনো আগ্রহ দেখাননি।

(৩) উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীরা বাংলাদেশের বিশেষ কোনো অংশের প্রতিনিধিত্ব করেনি এবং তাদের জীবিকা, জীবনসংগ্রাম সম্পর্কে বিশিষ্ট কোনো ধারণার অভাব আছে উপন্যাসে।

"ফুলমণি ও কুরণার বিবরণ"-এর দীর্ঘ, নীরস লেখা কোনদিক থেকেই তখনকার পাঠকদের চিত্ত জয় করতে পারেনি। বরং তার ছয় বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৮ খ্রীঃ রচিত "আলালের ঘরের দুলাল"-এর সরস কাহিনী সহজেই পাঠকের মন জয় করে নিয়েছিল। উপন্যাসটির মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রথম যে সব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেল সেগুলি হ'ল—

(১) এখানে উপন্যাসোচিত একটি সমস্যার সন্ধান পাওয়া গেল। নায়কের জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ছবি এখানে পাওয়া যায়।

(২) কলকাতা ও প্রাচীন গ্রাম -জীবন, শহরতলীর বড়োলোকদের সমাজ, পল্লীবাংলার চাষী, জমিদার, নীলকর সাহেব — ইত্যাদি নানা পরিবেশের ছবি উপন্যাসে পাওয়া যায়।

(৩) লেখকের একটি মুক্ত মনের পরিচয় উপন্যাসে পাওয়া যায়। কোনো প্রকার নীতিশাস্ত্র লেখকের দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি।

(৪) এই উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর ভাষা। উপন্যাসটির হালকা চালের কথ্য ভাষাকে "আলালী ভাষা" বলা হয়। প্যারীচাঁদের ধারণা ছিল, এই চলিত ঘেঁষা আধা সাধুভাষা কথাসাহিত্যের আদর্শ ভাষা। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, "তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে - তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা করিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যেমন জীবনে তেমনই সাহিত্যে ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাঙ্গালা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গালা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে।"

এইসব নানা কারণে "আলালের ঘরের দুলাল" কে বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলে গণ্য করা হয়।

"আলালের ঘরের দুলাল"-কে অবলম্বন করে বাংলা উপন্যাসের যে যাত্রা শুরু হয়েছে, তা আজও অব্যাহত। নানা বিষয় অবলম্বন করে অজস্র বাংলা উপন্যাস রচিত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। বিষয় এবং প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে বিবেচনা করে বাংলা উপন্যাসকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন-সামাজিক উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, ঐতিহাসিক উপন্যাস, সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী উপন্যাস, আত্মজৈবনিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস, আঞ্চলিক উপন্যাস, রাজনৈতিক উপন্যাস ইত্যাদি। এই এককে আমরা সামাজিক উপন্যাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করে পরবর্তী এককগুলিতে ভিন্ন প্রকারের উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করব।

৯৪.৪ সারাংশ ১

উপন্যাসের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গেলে গল্পের কথা এসে যায়। প্রাচীন যুগে অলৌকিক গল্প গড়ে উঠলেও, যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয় নিয়েও গদ্য-আখ্যান রচিত হয়েছে। প্রথম দিকে এইসব গদ্য-আখ্যান অপরিণত, কিন্তু পরবর্তীকালে তার থেকেই উপন্যাসের সৃষ্টি হয়েছে।

গদ্য-আখ্যান দুভাগে বিভক্ত — রোমান্স ও উপন্যাস। রোমান্সে কল্পনার প্রাধান্য, আর উপন্যাসে থাকে বাস্তব বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা। মধ্যযুগের ইতালীয় লেখক বোকাচিও "Novella Storie" নামে কতকগুলি গল্প লেখেন, এই "নভেলা" থেকেই "নভেল" শব্দটির উৎপত্তি।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতে রাখালিয়া পটভূমিতে লেখা রোমান্টিক গল্প ইউরোপে রচিত হতে শুরু করেছিল। ঐ সময় স্পেনে কোনো ব্যক্তিকে নিম্নবর্গের দুঃসাহসিক অভিযাত্রী (পিকারো) নিয়ে পিকারেস্ক কাহিনীর প্রচলন হয়। এগুলি উপন্যাসের পূর্বপুরুষ। মোটামুটি অষ্টাদশ শতাব্দী থেকেই পাশ্চাত্য উপন্যাস রচনার পটভূমিটি তৈরী হয়ে যায়।

বাংলাসাহিত্যেও ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকে উপন্যাস রচনা শুরু হয়। যদিও মধ্যযুগের চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে উপন্যাসের লক্ষণ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও যথার্থ বাংলা উপন্যাসের জন্ম ঊনবিংশ শতাব্দীতেই।

প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস। যদিও সময়ের দিক দিয়ে হানা ক্যাথেরীন ম্যুলেন্স-এর "করুণা ও ফুলমণির বিবরণ" এর আগে রচিত হয়েছিল, তা সত্ত্বেও উপন্যাসের লক্ষণ বিচারে আলালের ঘরের দুলালকেই বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস বলা হয়।

৯৪.৫ অনুশীলনী ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন প্রয়োজনে মূলপাঠ আবার পড়ুন। সবশেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) উপন্যাসের জন্ম কিভাবে হ'ল, তা বর্ণনা করুন।

(২) পাশ্চাত্য উপন্যাস ও বাংলা উপন্যাসের উদ্ভব কিভাবে হ'ল, তার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।

(৩) বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ উপন্যাস কোনটিকে বলা হয় ও কেন বলা হয়, তা বুঝিয়ে দিন।

(৪) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) কথাসাহিত্য বলতে আমরা বুঝি (১) গল্পকে (২) উপন্যাসকে (৩) উভয়কেই

(খ) "Novella Storie"-র লেখক (১) গোল্ডস্মিথ (২) বোকাচিও (৩) রিচার্ডসন

(গ) "আলালের ঘরের দুলাল"-এর রচনাকাল (১) ১৮৫২, (২) ১৮৫৮, (৩) ১৮৬০

(৫) শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) — বলতে আমরা গল্প — উভয়কেই বুঝে থাকি।

(খ) গদ্য — মূলতঃ — ভাগ করা হয়।

(গ) — শব্দটির — হয়েছে এই — থেকে।

৯৪.৬ মূলপাঠ -২ সামাজিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের ছোটোখাটো সুখদুঃখের কথা যে উপন্যাসে থাকে, সেই উপন্যাসকে সামাজিক উপন্যাস বলা হয়। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক এবং ধর্ম সম্পর্কিত চিন্তা ভাবনার পরিচয়ও কখনো কখনো সামাজিক উপন্যাসে পাওয়া যায়। সমাজ, অর্থনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদির প্রভাব চরিত্র ও ঘটনার ওপর কিভাবে পড়ে এবং জীবনের সংকট সৃষ্টি করে, তা-ই এই জাতীয় উপন্যাসে দেখানো হয়।

সামাজিক উপন্যাসকে কেউ কেউ গার্হস্থ্য বা পারিবারিক উপন্যাসও বলে থাকেন। তবে পরিবারের কথা প্রাধান্য লাভ করলে বা গৃহ জীবনের আলেখ্য বর্ণিত হলে সামাজিক উপন্যাসের পারিবারিক সংজ্ঞাপ্রাপ্তি ঘটে।

বাংলা সাহিত্যে উপন্যাস আধুনিক যুগের সৃষ্টি। জন্মলগ্নে বাংলা উপন্যাস ছিল সামাজিক। মূলপাঠ ১-এ আলোচিত প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল" উপন্যাসটি সমাজকে নিয়েই গড়ে উঠেছিল। তবে যথার্থভাবে বলতে গেলে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীমুখেই সামাজিক উপন্যাসের প্রতিষ্ঠা।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত "বিষবৃক্ষ"-ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক উপন্যাস। উপন্যাসের কাহিনীটি বলে দেয়, এই উপন্যাস একেবারে স্বতন্ত্র। এই উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সবাই সামাজিক। তারা আমাদের ঘর-সংসারের মানুষ। তাদের সমস্যাও সামাজিক। কুন্দনন্দিনী নামে এক বালবিধবার রূপের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নগেন্দ্রনাথ নামে এক ধনাঢ্য ভূস্বামী নিজের স্ত্রী সূর্যমুখীর প্রতি উদাসীন হলেন। ফলে সামাজিক দিকে আলোড়ন ঘটল - কুন্দের সঙ্গে নগেন্দ্র-র বিয়ে হ'ল আর সূর্যমুখীর সঙ্গে হ'ল বিচ্ছেদ। সূর্যমুখী গৃহত্যাগ করলে নগেন্দ্র-র ভুল ভাঙল। সে কুন্দকে ছেড়ে সূর্যমুখীর সন্ধানে চলল। অনেক ঘটনার পর সূর্যমুখী ও নগেন্দ্রর মিলন ঘটল। আর অন্যদিকে কুন্দনন্দিনী বিষপান করে আত্মহত্যা করল। সব মিলিয়ে দেখা যায় উপন্যাসটিতে বিধবা-বিবাহ আন্দোলন, নব্যবঙ্গ সম্প্রদায়ের উৎকেন্দ্রিকতার প্রতি কটাক্ষ, বহুবিবাহ নিরোধ ভাবনা নিয়ে নায়কের বিবেক-দংশন স্থান পেয়েছে। এইভাবে বাংলা সাহিত্যে নতুন ধরনের সামাজিক উপন্যাসের জন্ম হ'ল এবং বাংলা সাহিত্য নতুন পথে চলার ইঙ্গিত খুঁজে পেল।

"বিষবৃক্ষ" উপন্যাসটি ছাড়া তিনি আরো দুটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন — "কৃষ্ণকান্তের উইল" (১৮৭৮ খ্রীঃ) ও "রজনী" (১৮৭৭ খ্রীঃ)। প্রথমে আসা যাক "কৃষ্ণকান্তের উইল" উপন্যাসে। উপন্যাসটি বঙ্গসাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস এবং বঙ্কিম প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান। এই উপন্যাসের কাহিনী, চরিত্র সবকিছুই সমাজ ও সময়কে তুলে ধরেছে। উপন্যাসের কাহিনী গড়ে উঠেছে পুরুষের আত্মসংযমে অনীহা, স্ত্রীকে ত্যাগ করে অন্য স্ত্রীলোক নিয়ে মত্ত হওয়া এবং তার ফলে শোচনীয় পরিণামকে নিয়ে। এই উপন্যাসের নায়ক সমাজ ও সময়। উপন্যাসটির বিষয় পুরোনো হলেও তা নতুনযুগের সামাজিক ও মানবিক চেতনায় প্রতিষ্ঠিত।

ইংরেজ ঔপন্যাসিক লিটন রচিত "The Last Days of Pompeii" উপন্যাসের কানা ফুলওয়ালী নিদিয়া চরিত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রচনা করলেন "রজনী" উপন্যাসের জন্মান্ধ রজনী চরিত্রটিকে। উপন্যাসের মূল ঘটনা হ'ল নানা পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে রজনীর সঙ্গে নায়ক শচীশের বিয়ে এবং তারপরে কোনও মহাপুরুষের কৃপায় রজনীর দৃষ্টিশক্তি লাভ। এর পাশাপাশি অমরনাথ ও

লবঙ্গলতার কাহিনী, যাকে উপকাহিনী বলা যেতে পারে, পরিবেশিত হয়েছে। সমকালীন সমাজ ও সময়ের ছবি উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়।

সামাজিক উপন্যাস রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে এক নতুন মাত্রা পেল। পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসে রোমান্সের লক্ষণ থাকলেও রবীন্দ্রনাথের সামাজিক উপন্যাস রোমান্সমুক্ত। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সামাজিক উপন্যাস "চোখের বালি" ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। বলা যেতে পারে এই উপন্যাসটি থেকেই বাংলা উপন্যাস বাস্তবিক অর্থে সামাজিক উপন্যাস হয়ে উঠল। উপন্যাসে দুজন পুরুষ ও দুজন স্ত্রীলোকের জীবনের সমস্যা কিভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল, কেমন করে তার গ্রন্থিমোচন হ'ল, বাঙালী সমাজ ও পারিবারিক জীবনের যুগসঞ্চিত সংস্কারে কবিগুরু কিভাবে আঘাত দিলেন, তার বলিষ্ঠ বিশ্লেষণাত্মক বর্ণনা উপন্যাসে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির মধ্যে যে প্রেম বর্ণিত হয়েছে তা সমাজনীতির দিক থেকে বিগর্হিত। মহেন্দ্র, আশা, বিহারী, বিনোদিনী এই চার যুবক-যুবতীর মনস্তত্ত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে উপন্যাসে সামাজিক সমস্যার রূপটি প্রতিফলিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী সামাজিক উপন্যাস "গোরা" (১৯১০ খ্রীঃ)। এক বিশাল মহাকাব্যিক পটভূমিকায় দেশ-কাল-সমাজ-সময়-যুগ সবকিছুই এই উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমকালীন হিন্দু-ব্রাহ্ম তর্ক, জাতপাতের উগ্র সহনশীল রূপ, ভারতীয় সমাজ-সময়ের সর্বজাতি ও সর্বধর্মী সমন্বয়ী রূপ - বিনয়, ললিতা, গোরা, সুচরিতা, কৃষ্ণদয়ালবাবু, পরেশবাবু ও আনন্দময়ীর মধ্যে দিয়ে রূপায়িত হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটি ভারতীয় সমাজজীবনের প্রতিরূপ।

"চতুরঙ্গ" উপন্যাসটি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বাংলা সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে "চতুরঙ্গ" এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। শচীশ ও দামিনীর মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। উপন্যাসটিতে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, যা শুধু সামাজিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে নয়, সমগ্র বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক অন্য মাত্রা যোগ করেছে—

(১) এর আগে পর্যন্ত সামাজিক উপন্যাসের নায়করা ছিলেন ব্রাহ্মণ, কিন্তু এই প্রথম সামাজিক উপন্যাসের নায়ক হলেন কায়স্থ - সোনার বেনে।

(২) বাংলা সামাজিক উপন্যাসের নায়করা এতদিন আস্তিক থাকলেও এই উপন্যাসে নায়ক শচীশ ঘোরতর নাস্তিক।

(৩) এতদিন সামাজিক উপন্যাসে ভৌগোলিক স্থান-কালের নাম থাকলেও, "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে তা পাওয়া যায় না।

এগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ" "ঘরে বাইরে" ইত্যাদি উপন্যাসেও সামাজিক উপন্যাসের লক্ষণ পাওয়া যায়। "যোগাযোগ" উপন্যাসে মধুসূদন ও কুমুদিনীর বিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবনের অশান্তি এবং তার পরিণাম মুখ্য বিষয়। হঠাৎ ধনী হয়ে ওঠা শিক্ষাসংস্কৃতিবর্জিত মধুসূদন পড়তি ঘরের মার্জিত মেয়ে কুমুদিনীকে বিয়ে করল। কুমুদিনীর চরিত্রে তার অগ্রজের স্নিগ্ধমধুর আভিজাত্যমণ্ডিত প্রভাব, অন্যদিকে মধুসূদনের স্থূলতর আকাঙ্ক্ষার অশুচি পীড়ন - কুমুদিনীর জীবন যখন ব্যর্থ হতে বসেছিল - তখন সে আবিষ্কার করল সে সন্তানসম্ভবা। উপন্যাসের চরিত্রগুলিতে বৈচিত্র্যের অভাব আছে।

"ঘরে বাইরে" উপন্যাসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পটভূমিকায় বিমলা, তার স্বামী নিখিলেশ এবং নিখিলেশের বন্ধু সন্দীপ - এই ত্রিভুজের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসের একদিকে বিমলার চরিত্রে দুই পুরুষের আকর্ষণ, আর একদিকে উগ্র স্বাদেশিকতার নগ্নমূর্তি ফুটিয়ে তুলে রবীন্দ্রনাথ লোভী স্বাদেশিকতার বীভৎস আকার তুলে ধরেছেন। উপন্যাসের চরিত্রদ্বন্দ্ব, উগ্র জাতীয়তাবাদের পরিণাম এবং

নারীর সামাজিক অধিকার সম্বন্ধে তিনি সর্বপ্রথম প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ থেকে এক যুগের বাঙালী জীবনের ছবি এঁকেছেন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা সামাজিক উপন্যাস যেন সমাজ ও সময়ের অন্তঃসত্তায় প্রবেশ করল। তাঁর প্রথম সামাজিক উপন্যাস "পল্লীসমাজ" (১৯১৬ খ্রীঃ)। এখানে রয়েছে জমিদার, ব্রাহ্মণ ও আচারের শাসনের ফলে সাধারণ মানুষের সঙ্কট। কোনো বিশেষ সামাজিক প্রথার প্রতি উপন্যাসে কটাক্ষপাত না করা হলেও, পল্লী সমাজের সমগ্র জীবনযাত্রার একটা নিখুঁত প্রতিকৃতি এখানে পাওয়া যায়। সামাজিক দলাদলির ছবিতে যে নীচতা, কাপুরুষতা, কৃতঘ্নতার ছবি পাওয়া যায়, তাতে আমাদের সমাজজীবনের মূল আদর্শগুলি সম্বন্ধে সন্দেহ জেগে ওঠে।

পরবর্তী সামাজিক উপন্যাস "গৃহদাহ" (১৯২০ খ্রীঃ)তে সম্পূর্ণ নতুন বিষয় আবির্ভূত হয়েছে। অচলার মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্বই উপন্যাসে সমাজ ও সময়কে ধরে রেখেছে।

শরৎচন্দ্রের "দেনা পাওনা" (১৯২৩ খ্রীঃ) উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায় নিজের বিবাহিতা পরিত্যক্তা স্ত্রী, অধুনা চণ্ডীগড়ের ভৈরবী ষোড়শীর সংস্পর্শে অত্যাচারী, লম্পট, পাপপূণ্য জ্ঞানহীন জমিদার জীবনানন্দের অভূতপূর্ব পরিবর্তন। এছাড়া তাঁর "চরিত্রহীন", "শেষপ্রশ্ন" — ও সামাজিক উপন্যাস। উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে শরৎচন্দ্র বাংলাদেশের নিতান্ত সাধারণ নরনারীর মলিন ও তুচ্ছ জীবনকে উপন্যাসের উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন। মানবজীবনের সুখদুঃখ ও অশ্রুবেদনাকে সহানুভূতির রসে ডুবিয়ে এমন স্নিগ্ধমধুর ও বেদনাবিধুর কাহিনী আর কেউ লিখতে পারেননি। সমাজের তথাকথিত চরিত্রনীতি, সতীত্ব, সংযম প্রভৃতি আদর্শকে উড়িয়ে দিয়ে, সমাজের অবিচার এবং সেই অবিচারের চাকায় পিষ্ট মানবমানবীর কাহিনী লিখে তিনি সমাজের শিক্ষিত স্তরে আঘাত হেনেছিলেন।

সামাজিক উপন্যাসের বিকাশের ধারায় এবার আমাদের আলোচ্য হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সামাজিক ও মানবিক নানা সমস্যা নিয়ে এতদিন সামাজিক উপন্যাস রচিত হচ্ছিল, বিভূতিভূষণের হাতে তার পরিধি বিস্তৃত হ'ল। তাঁর উপন্যাসে মানুষ ও সমাজের পাশাপাশি, প্রকৃতিও সমানভাবে স্থান করে নিল। "পথের পাঁচালী" উপন্যাসের পটভূমি দক্ষিণ নিম্নবঙ্গ। এখানকার প্রকৃতির সঙ্গে অপু, দুর্গার যে সম্পর্ক তা সমাজ ও সময়কে ভিন্নভাবে মূর্ত করল। আবার "আরণ্যক" উপন্যাসে বাংলাদেশ এবং তার সঙ্গে বিহারের অরণ্যের কিছু ছবিও পাওয়া যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অরণ্য লালিত মানুষের ছবিও উপন্যাসে পাওয়া যায়।

বিভূতিভূষণের সামাজিক উপন্যাস প্রকৃতিকে অবলম্বন করেছিল, আর তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সামাজিক উপন্যাস অবলম্বন করল মাটিকে অর্থাৎ আঞ্চলিকতাকে। ফলে সামাজিক উপন্যাসের এক নতুন ভাবধারা আবারও লক্ষ্য করা গেল। তারাশঙ্করের এই নতুন ধরণের সামাজিক উপন্যাসগুলি হ'ল "কবি" "গণদেবতা", "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা" ইত্যাদি।

"কবি" উপন্যাসে অন্ত্যজ মানুষের প্রেম -অপ্রেম, আশা- নিরাশার কাহিনী আছে। হাড়ি জাতির যুবক নিতাই এই উপন্যাসের নায়ক। আগে কোনো ঔপন্যাসিক যা ভাবতে পারেননি, সেই নীচুজাতের মানুষকে নায়ক-নায়িকা করে তারাশঙ্কর তাঁর সামাজিক উপন্যাসের পত্তন করলেন।

"গণদেবতা" উপন্যাসে একটা দেশ, একটা জাতির মোড় ফেরার ঘটনা পাওয়া যায়। আধুনিক পরিবর্তনের প্রভাবে গ্রাম্য সমাজের প্রাচীন রীতি-নীতি ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিপর্যয়ের কথা এখানে আলোচিত হয়েছে।

আবার "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা"তে একটা সমগ্র গোষ্ঠীর প্রাণস্পন্দন, মর্মরহস্য, সমগ্র সমাজবিন্যাসের

মূলতত্ত্ব প্রতিবিম্বিত হয়েছে। বাঁশবাঁদি অঞ্চলের মানুষ, তাদের জীবনের ছবি এখানে পাওয়া যায়। কাহার পাড়ার নেতা বনোয়ারী, নবযুগের প্রতিনিধি করালী, প্রেম ও বাসনার প্রতীক কালোশশী, অতীত ইতিহাসের দূত সুচাঁদ পিসি, এবং কর্তা বাবা - সকলেই সমাজ সময়ের বিভিন্ন পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। "হাঁসুলিবাঁকের উপকথা" সামাজিক উপন্যাসটিতে আঞ্চলিক সমাজই প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। এই উপন্যাসের প্রকৃত নায়ক নিম্নজাতির সমাজ—যে সমাজ বহু শতাব্দীর শিক্ষা-দীক্ষায়, কর্মে ও চিন্তায়, এক জীবন্ত অত্যাজ্য সংস্কৃতির আধাররূপে বিকশিত হয়েছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে সামাজিক জীবনের ছবির সঙ্গে ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণবাদের প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ শক্তির মিশ্রণ ঘটালেন। তাঁর উপন্যাসেই প্রথম নগ্ন বাস্তবতার ছবি পাওয়া যায়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "পদ্মানদীর মাঝি" এবং "পুতুল নাচের ইতিকথা" উপন্যাস দুটিকে আমরা সামাজিক উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি।

"পদ্মানদীর মাঝি" উপন্যাসে পদ্মা তীরবর্তী জেলেদের আহার, ব্যবহার, পোশাক, উৎসব সবকিছুই উপন্যাসটিকে স্বতন্ত্র করে দিয়েছে। উপন্যাসের নায়ক কুবের যখন ময়নাদ্বীপে যাত্রা করছে তখন সে যেন এক ভিন্ন সমাজে যাত্রা করছে। আবার "পুতুল নাচের ইতিকথা" উপন্যাস চেতন মনের সঙ্গে অচেতন মনের যে দ্বন্দ্ব নিয়ত মানুষকে নাচিয়ে বেড়ায়, তা নিয়ে গড়ে উঠেছে। গাউদিয়া গ্রামের জীবনযাত্রা প্রণালী ও বিশেষ কয়েকটি সমস্যার যে ছবি উপন্যাসে আঁকা হয়েছে তা এক হিসাবে আমাদের সাধারণ পল্লীসমাজেরই ছবি। শশী এইগ্রাম ছেড়ে কলকাতায় যেতে চেয়েছিল, পারেনি। কুসুম চেয়েছিল শশীর প্রেম, পায়নি। এই অপ্রাপ্তিই উপন্যাসে সবাইকে পুতুলে পরিণত করেছে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পরবর্তীকালে সতীনাথ ভাদুড়ী, সমরেশ বসু, অদ্বৈত মল্লবর্ধন, মহাশ্বেতা দেবী, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিক সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছেন। এই পর্বে বাংলা সামাজিক উপন্যাসে শ্রমজীবী মানুষের জীবন চিত্রিত হয়েছে। বিহারের তাঙমাটোলা ও ধাঙরটোলার শ্রমজীবী মানুষের জীবনের ছবি সতীনাথ ভাদুড়ির "ঢোড়াই চরিত মানস" উপন্যাসে ফুটে উঠেছে। অদ্বৈত মল্লবর্মনের "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসে কুমিল্লা জেলার তিতাস নামে এক অখ্যাত নদীর তীরে বাস করা জেলে - সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, পূজা-পার্বণ, উৎসব, রীতি-সংস্কৃতির একটি চিত্তাকর্ষক বর্ণনা পাওয়া যায়। উপন্যাসটির চতুর্থ খণ্ড সমাজচিত্র হিসাবে সবচেয়ে বেশি কৌতূহলোদ্দীপক। আবার সমরেশ বসুর "গঙ্গা" উপন্যাসে নদীর সঙ্গে জড়িত জীবনের কথা। মহাশ্বেতা দেবীর হাতে বাংলা সামাজিক উপন্যাস ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে। সাঁওতাল, মুণ্ডা, হেমব্রমদের জীবন-মরণের ছবি তিনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাঁর "হাজার চুরাশির মা", "অরণ্যের অধিকার" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস।

যুগ বদলের সাথে সাথে বাংলা সামাজিক উপন্যাসের রূপরীতিও বদলে গেছে। এই সময়কার ঔপন্যাসিকেরা হলেন কমলকুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কিন্নর রায়, অমর মিত্র, আবুল বাশার প্রমুখরা।

কমলকুমার মজুমদারের "অন্তর্জলী যাত্রা" সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ। অমিয়ভূষণ মজুমদারের "মহিষকুড়ার উপকথা" একটি সামাজিক উপন্যাস। উত্তরবঙ্গের অন্ত্যজ সমাজ জীবনের ছবি দেবেশ রায়ের "মফস্বলী বৃত্তান্ত" ও "তিস্তাপারের বৃত্তান্ত" উপন্যাসদুটিতে পাওয়া যায়, আবার সাধন চট্টোপাধ্যায়ের "গহীন গাঙ" উপন্যাসে সুন্দরবন ও নদী-নালার জীবনে একদল মানুষ কেমন করে মহাজন ও নিয়তির বিরুদ্ধে লড়াই করে জীবনের প্রান্তভূমিকে চিনে নেয় - তার ছবি পাওয়া যায়।

সাম্প্রতিককালে বাংলা সামাজিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য হ'ল রমাপদ চৌধুরীর "সারি", সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের "নিলয় না জানি", কিন্নর রায়ের "আগুনের সিড়ি", অমর মিত্রের "কৃষ্মগান্ধার", আবুল বাশারের "ফুলবউ" ইত্যাদি উপন্যাস।

বাংলা সামাজিক উপন্যাসের এই বিকাশের ধারা আজও অব্যাহত এবং তা বাংলা সাহিত্যকে দিনে দিনে সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে।

৯৪.৭ সারাংশ - ২

সামাজিক উপন্যাসে পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের পাশাপাশি রাষ্ট্রিক, অর্থনৈতিক, ধার্মিক চিন্তাভাবনার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি মানুষের চরিত্র ও নানা ঘটনার ওপর এই সমস্ত চিন্তাভাবনার প্রভাবও দেখানো হয়।

রাজনীতি, অঞ্চল, ইতিহাস সবই সমাজের অঙ্গ। সেদিক দিয়ে রাজনৈতিক, আঞ্চলিক, ঐতিহাসিক সবই সামাজিক উপন্যাসের রকমফের।

সামাজিক উপন্যাসে যখন পরিবারের কথা প্রাধান্য পায়, তখন তা পারিবারিক উপন্যাস রূপে অভিহিত হয়।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস "আলালের ঘরের দুলাল" সমাজকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

তবে বাংলাসাহিত্যে যথার্থ সামাজিক উপন্যাসের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং যথার্থ বাংলা সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ"। "বিষবৃক্ষ" ছাড়া তিনি আরো দুটি সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন- "কৃষ্মকান্তের উইল" ও "রজনী"। তবে তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলির কোনটিই বিশুদ্ধ সামাজিক উপন্যাস নয়, সেগুলি সবই রোমান্সের লক্ষণাক্রান্ত।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে সামাজিক উপন্যাস নতুন রূপ লাভ করেছে। তাঁর সামাজিক উপন্যাসগুলি রোমান্সমুক্ত সামাজিক উপন্যাস।

শরৎচন্দ্রের রচনায় সামাজিক উপন্যাস সমাজ ও সময়ের একেবারে ভেতরে প্রবেশ করল। বিভূতিভূষণের লেখনীতে সামাজিক উপন্যাসের পরিধি বিস্তার লাভ করল প্রকৃতি জগতে। তারাশঙ্করের সামাজিক উপন্যাসে আঞ্চলিকতা, আর মানিকের সামাজিক উপন্যাসে ফ্রয়েডীয় মনোসমীক্ষণবাদের প্রয়োগ ও বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের মিশ্রণ ঘটল।

সতীনাথ ভাদুড়ীর "ঢোড়াই চরিত মানস" উপন্যাসে বিহারের তাৎমাটোলা ও ধাঙরটোলার শ্রমজীবী মানুষদের পরিচয় পাওয়া যায়। অদ্বৈত মল্লবর্মনের "তিতাস একটি নদীর নাম" উপন্যাসে জেলে সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রার পরিচয় পাওয়া যায়, সমরেশ বসুর "গঙ্গা" উপন্যাসেও জেলেদের জীবনের পরিচয় ফুটে উঠেছে। মহাশ্বেতা দেবীর সামাজিক উপন্যাস সাঁওতাল, মুণ্ডা, হেমব্রমদের নিয়ে গড়ে উঠেছে।

পরবর্তীকালে সামাজিক উপন্যাস রচনা করেছেন কমল কুমার মজুমদার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, দেবেশ রায়, সাধন চট্টোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, কিন্নর রায়, অমর মিত্র, আবুল বাশার প্রমুখ উপন্যাসিকবৃন্দ।

১৪.৮ অনুশীলনী - ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) সামাজিক উপন্যাস কাকে বলে, উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথের একটি করে সামাজিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) বন্দ্যোপাধ্যায় ত্রয়ীর সামাজিক উপন্যাসগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন

(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত —ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম — উপন্যাস।

(খ) রবীন্দ্রনাথের — সামাজিক উপন্যাস — সালে রচিত হয়।

(গ) কমলকুমার মজুমদারের — সমাজবাস্তবতার রূপায়ণ।

(৫) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) বাংলা সাহিত্যের প্রথম সামাজিক উপন্যাস (১) বিষবৃক্ষ (২) চোখের বালি (৩) কৃষ্মকান্তের উইল

(খ) "হাজার চুরাশির মা" গ্রন্থের রচয়িতা (১) মহাশ্বেতা দেবী (২) সতীনাথ ভাদুড়ী (৩) কিন্নর রায়

(গ) সাধন চট্টোপাধ্যায় রচনা করেছেন (১) গহীন গাঙ, (২) আগুনের সিড়ি, (৩) কৃষ্মগান্ধার

১৪.৯ মূলপাঠ - ৩ ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

সামাজিক বিষয়কে অবলম্বন করে বাংলা উপন্যাসের জন্ম হলেও, তার জয়যাত্রা শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের হাত ধরে। এবং অল্প কিছুদিনেই উপন্যাসের বিভিন্ন শাখার মধ্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস তার স্থান পাকা করে নিয়েছে।

উপন্যাস লিখতে গেলে প্রথমেই প্রয়োজন একটা নিটোল কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, পরিবেশ এবং ঔপন্যাসিকের জীবন সম্পর্কে ভাবনা। উপন্যাস রচনার এই প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি বজায় রেখে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জীবনকে দেখার চেষ্টা করা হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে। তবে মনে রাখতে হবে ঐতিহাসিক উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের ঘটনা ও চরিত্র ছাড়া আরো অতিরিক্ত কিছু থাকে। ইতিহাসরস ও মানবরসের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করে তার পটভূমিকায় মানব-জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি অঙ্কনই ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য। সাধারণত ইতিহাস ও মানবজীবনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন খুব কঠিন শিল্পকর্ম বলে, পৃথিবীর সবদেশের সাহিত্যে সার্থক ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংখ্যা অল্প।

এই জাতীয় উপন্যাসে ঔপন্যাসিক সমসাময়িক জীবন না গ্রহণ করে, অতীতের কাহিনীকে বা বলা যায় অতীতের ইতিহাসকে সাহিত্য করে তোলেন। এই জাতীয় উপন্যাস রচনার সময়ে ঔপন্যাসিককে অতীত জীবনের ইতিহাস, রীতি-নীতি, সংস্কার, আচার-ব্যবহার, পোষাক-পরিচ্ছেদ, জীবন-যাপন প্রণালী ইত্যাদি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হয়, নয়তো কাল অনৌচিত্য দোষ ঘটতে পারে। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, "ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রকৃত আদর্শ দূরধিগম্য; ইতিহাসের বিশাল সংঘটনের ছায়াতলে আমাদের ক্ষুদ্র পারিবারিক জীবনের চিত্র আঁকিতে হইবে, দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সহিত ঐতিহাসিক ঘটনার যোগসূত্রগুলির মধ্যে সম্পর্কটি সুস্পষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে। একদিকে

ইতিহাসের বিপুলতা, ঘটনাবৈচিত্র্য ও বর্ণসম্পদ ক্ষুদ্র প্রাত্যহিক জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে, অন্যদিকে আমাদের বাস্তব জীবনের কঠিন নিয়মশৃঙ্খল, সত্যের কঠোর বন্ধনের দ্বারা ইতিহাসের অস্পষ্টতা ও অংশতঃ অনুমানসিদ্ধ কল্পনা-প্রবণতা নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে এবং সর্বোপরি উভয়ের মধ্যে মিলনটি সম্পূর্ণ ও অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে হইবে যেন সমস্ত উপন্যাসটির আকাশবাতাসের মধ্যে একটা নিগূঢ় ঐক্য আনিতে পারা যায়।"

ঐতিহাসিক উপন্যাসকে দুভাগে ভাগ করা হয় - শুদ্ধ ও মিশ্র। শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাসকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায় - রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক। বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ", রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "রাজর্ষি" রাষ্ট্রনৈতিক শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস। আর দ্বিতীয় ভাগে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-র "বেনের মেয়ে" উপন্যাসের নাম করা যায়।

মিশ্র-ঐতিহাসিক উপন্যাসকেও দুভাগে ভাগ করা যায়, প্রথম ভাগ হ'ল ইতিহাসের ছায়ায় কাল্পনিক সৃষ্টি। যেমন- রমেশচন্দ্রের "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা", মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাত ইত্যাদি। আর দ্বিতীয় ভাগ হ'ল কাল্পনিক কথা-মণ্ডিত ঐতিহাসিক উপন্যাস। যেমন - রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের "শশাঙ্ক", অনুরূপা দেবীর "ত্রিবেণী"।

অনেক ঔপন্যাসিক উপন্যাস ও রোমান্সের সংযোগ ঘটিয়ে আকর্ষণীয় গল্পকাহিনী সৃষ্টি করেছেন। যেমন ইংরেজ লেখক ওয়াল্টার স্কট-এর "আইভান হো"। উপন্যাস ও রোমান্সের মধ্যে পার্থক্য আছে। মধ্যযুগে ও এলিজাবেথীয় যুগে গদ্য ও পদ্যে অলৌকিক ঘটনা, কল্পনার প্রাধান্য, রহস্যের কুহেলিকাময় পরিবেশ, বিস্ময় ও রোমান্সের সমাবেশ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য সম্বলিত যে সব কাহিনী রচিত হয়েছিল তাদেরই রোমান্স বলা হয়। এগুলির সঙ্গে আধুনিকযুগের রোমান্সের পার্থক্য আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে রোমান্স নিজেকে আরো গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ পায়। রোমান্স হচ্ছে উপন্যাসধর্মী, আর রোমান্স যেহেতু অতীতাশ্রয়ী, যেহেতু সত্যের কঠোর সংযম সে স্বীকার করে নিয়েছে, তাই ইতিহাসের সঙ্গেও তাকে যোগসূত্র রক্ষা করে চলতে হয়। তবে রোমান্সের সঙ্গে ঐতিহাসকতার যোগ অচ্ছেদ্য নয়। রোমান্সের বাস্তবাতিরিক্ত কাল্পকিকতাকে খানিকটা বাস্তবতার রঙ দেবার জন্য ইতিহাসের একটা বিশেষ যুগের বিশেষ কোনো ঘটনার সঙ্গে একে সম্পর্ক রাখতে হয়। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন মূল সত্যকে অবিকৃত রেখে দেয়, রোমান্স লেখকের তেমন কোন দায়িত্ব নেই। তাই ইতিহাস এবং উপন্যাসের মিলনেই রোমান্স সম্ভব।

বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের লেখনীমুখে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কস্টারের "Romance of History" অবলম্বনে তিনি রচনা করলেন "ঐতিহাসিক উপন্যাস"। উপন্যাসটির মধ্যে দুটি অংশ লক্ষ্য করা যায়—(১) সফল স্বপ্ন ও (২) অঙ্গুরীয় বিনিময়। প্রথম অংশের কাহিনী ঐতিহাসিক বীরপুরুষ সবক্তগীনকে নিয়ে রচিত হয়েছে। এই অংশে ইতিহাসের খুব বেশি পরিচয় না পাওয়া গেলেও, দ্বিতীয় অংশ "অঙ্গুরীয় বিনিময়"-এ ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায় বেশ ভালোভাবেই। হিন্দু বীর শিবাজীর সঙ্গে ঔরঙ্গজেবের কন্যা রোশনারায় প্রণয়কথা এই অংশের আলোচ্য বিষয়। দুটি চরিত্রই ইতিহাস নির্ভর। এছাড়াও উপন্যাসে বর্ণিত অন্যান্য চরিত্র যেমন ঔরঙ্গজেব, শাজাহন, জয়সিংহ ইত্যাদি চরিত্রগুলিও ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকেই উঠে এসেছে। দাক্ষিণাত্য অভিযানে ঔরঙ্গজেব ও শিবাজীর সংঘাত, তারপর সন্ধিস্থাপন, জয়সিংহের কাছে পরাজয় ইত্যাদি ঘটনাগুলি ঔপন্যাসিক বেশ বিশ্বস্ততার সঙ্গেই উপন্যাসে তুলে ধরেছেন। তবে প্রণয়কাহিনীতে ঔপন্যাসিক অনেকটাই কল্পনার সাহয্য নিয়েছেন।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অপর উপন্যাস "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" ১৮৭৫ খ্রিস্টব্দে রচিত হয়। উপন্যাসটি প্রধানত কল্পনার ওপর ভিত্তি করেই দাঁড়িয়ে আছে। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মহারাষ্ট্র যদি জয়লাভ করত, তবে ভারতের ইতিহাস কোন পথে অগ্রসর হোত, তার কল্পনাময় কাহিনীই উপন্যাসটির উপজীব্য।

উপন্যাস রচনার প্রাথমিক যুগে সামাজিক অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাসই যে বেশি রচিত হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম যুগের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি হ'ল বিনোদবিহারী গোস্বামীর "পূর্ণশশী" (১৮৭৫), ললিতমোহন ঘোষের "অচলবাসিনী" (১৮৭৫), রাখালদাস গাঙ্গুলীর 'পাষাণময়ী" (১৮৭৯) ইত্যাদি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে বলেছেন, "এই ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি সত্য ও কল্পনার, সাধারণ ও অসাধারণের, এমনকি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতের একটি অদ্ভুত সংমিশ্রণ, বাস্তব জীবনের সহিত এঁদের যোগসূত্র নিতান্ত ক্ষীণ।"

তবে ভূদেব মুখোপাধ্যায় দুটি উপন্যাস রচনা করে বাংলা কথাসাহিত্যের যে নতুন পথের দরজা খুলে দিলেন, সেই পথের পথিক হয়েছেন তাঁর সময়কার এবং পরবর্তীকালের বহু কথাসাহিত্যিক।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রথম শিল্পী। তিনিই ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। তাঁর প্রথম ইতিহাস আশ্রিত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী" (১৮৬৫)। আকবরের রাজত্বকালে ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যা ও বাংলাদেশের সীমান্তে মুঘল-পাঠানের সংঘর্ষ, উপন্যাসটির পটভূমি। উপন্যাসে আয়েষা, ওসমান, জগৎসিংহ ও তিলোত্তমার মধ্যে দিয়ে ইতিহাসকে ফোটানো হলেও, উপন্যাসটিকে ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স বলাই সঙ্গত।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত "কপালকুণ্ডলা" উপন্যাসে মোগল সাম্রাজ্য, সপ্তগ্রামের ছবি ইত্যাদির উল্লেখ থাকলেও, ইতিহাসের তুলনায় উপন্যাসটির রোমান্টিক আবেদনই বেশী। বঙ্কিমের পরবর্তী উপন্যাসে যেমন "মৃণালিনী" (১৮৬৯), "চন্দ্রশেখর" (১৮৭৫), "আনন্দমঠ" (১৮৮৪), "সীতারাম" (১৮৮৭) ইত্যাদিতে অল্পবিস্তর ইতিহাস এলেও, এগুলিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ে ফেলা যায় না।

সেদিক দিয়ে বিচার করলে "রাজসিংহ"-ই (১৮৮২) বঙ্কিমের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস। রাজস্থানের চঞ্চলকুমারীকে ঔরঙ্গজেবের বিয়ের ইচ্ছা, ফলে রাজসিংহের সঙ্গে বিরোধ, সেই বিরোধে রাজসিংহের জয় ও চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে বিয়ে-ইতিহাস থেকে গৃহীত।

উপন্যাসটি লেখার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র জেমস্ টডের - Annals and Antiquities of Rajasthan এবং The General History of the Mogal Empire এই দুটি গ্রন্থের সাহায্য নিয়েছিলেন। রাজস্থানের রূপনগর রাজপ্রাসাদ থেকে কাহিনী শুরু হয়ে শেষ হয়েছে ঔরঙ্গজেবের সন্ধিচুক্তি দিয়ে। যদিও পাশাপাশি কিছু কাল্পনিক ঘটনাও উপন্যাসে এসেছে। তবু, "রাজসিংহ" কে সবদিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে "রাজসিংহ"-র সর্বশ্রেষ্ঠ মূল্যায়ন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন তাঁর "আধুনিক সাহিত্য" গ্রন্থের "রাজসিংহ প্রবন্ধে-"তাহার এক-একটি খণ্ড এক-একটি নির্ঝরের মতো দ্রুত ছুটিয়া চলিয়াছে। প্রথম প্রথম তাহাতে কেবল আলোকের ঝিকিঝিকি এবং চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি-তাহার পর ষষ্ঠ খণ্ডে দেখি ধ্বনিগম্ভীর, স্রোতের পথ গভীর এবং জলের বর্ণ

ঘনকৃষ্ণ হইয়া আসিতেছে, তাহার পর সপ্তম খণ্ডে দেখি কতক বা নদীর স্রোত, কতক বা সমুদ্রের তরঙ্গ, কতক বা অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জন, কতক বা তীব্র লবণাশ্রুনিমগ্ন হৃদয়ের সুগভীর ক্রন্দনোচ্ছ্বাস, কতক বা কালপুরুষ লিখিত ইতিহাসের অব্যাকুল বিরাট বিস্তার, কতক বা ব্যক্তি বিশেষের মজ্জমান তরণীর প্রাণপণ হাহাধ্বনি। সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আমাদের আলোচ্য ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত। তাঁর মোট ছটি উপন্যাসের মধ্যে চারটিই ঐতিহাসিক উপন্যাস। ১৮৭৪ খ্রীঃ প্রকাশিত হয় রমেশচন্দ্র দত্তের "বঙ্গাবিজেতা"। উপন্যাসটিতে আকবরের সময়কার কাহিনী আছে। পরবর্তী উপন্যাস "মাধবীকঙ্কণ" ১৮৭৭ খ্রীঃ প্রকাশিত হয়। সম্রাট শাজাহানের সময়ের ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। তবে উপরিউক্ত দুটি উপন্যাসে ইতিহাসের কাহিনীর চেয়ে সাধারণ মানুষের কাহিনীই বেশী প্রাধান্য পেয়েছে।

১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে রমেশচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস "মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত" প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটির মূল বিষয় শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা জাতির উত্থান। উপন্যাসটির সর্বত্রই অর্থাৎ যুদ্ধ, ষড়যন্ত্র, অভিমান, বীরত্ব সবকিছুর মধ্যেই ইতিহাসের ছায়া স্পষ্ট। ঔরঙ্গজেব এবং শিবাজী উভয়ের চরিত্রই ইতিহাস থেকে উঠে এসেছে। ঠিক এই জাতীয় আরেকটি উপন্যাস হ'ল "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা"। যা প্রকাশিত হয় ১৮৭৯ খ্রীস্টাব্দে। রাণাপ্রতাপের সংগ্রাম, মোগলদের সঙ্গে সংঘাত, রাজপুতদের স্বাধীনতা স্পৃহা- ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা উপন্যাসে স্থান পেয়েছে।

আলোচিত পরবর্তী ঔপন্যাসিক হলেন প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। তাঁর লেখা ঐতিহাসিক উপন্যাসটি "বঙ্গাধিপ পরাজয়"। উপন্যাসটির প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় যথাক্রমে ১৮৬৯ ও ১৮৮৪ খ্রীস্টাব্দে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন, বঙ্গাধিপ পরাজয়-এ ঘটনাবলী সম্পূর্ণরূপেই ইতিহাসানুগত, সমস্ত চরিত্রই ঐতিহাসিক পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে এটি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বিতীয়া কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে চারটি উপন্যাস রচনা করেন। প্রথমটি হ'ল "দীপনির্বাণ" (১৮৭৬)- উপন্যাসটির বিষয় মহম্মদ ঘোরীর দিল্লী আক্রমণ ও চিতোরের রাজপরিবারের কথা। পরবর্তী উপন্যাস "ফুলের মালা"। এখানে বাংলাদেশে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সেকেন্দার শাহের উদ্যোগে। তৃতীয় উপন্যাস "মিবার রাজ"-এর রাজপুত ও ভীলদের সংঘাতের কথা বলা হয়েছে। "বিদ্রোহ" উপন্যাসে রাজপুতদের কাহিনী এবং ভীলেদের জেগে ওঠার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে. উপন্যাসের পরিবেশ, চরিত্র সবকিছুতেই ইতিহাসবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করে দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন "কাঞ্চনমালা" ও "বেনের মেয়ে"। ডঃ সুকুমার সেন "বেনের মেয়ে" উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছিলেন, বইটির পাত্র পাত্রী সবাই কাল্পনিক হলেও, পরিবেশ একান্তভাবে ঐতিহাসিক।

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় কয়েকটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। "পাষাণের কথা"- তে প্রাক কুষাণ যুগে উত্তরাপথের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় দেওয়ার চেষ্টা আছে। "শশাঙ্ক"তে গুপ্তযুগের শেষদিককার ছবি পাওয়া যায়। "করুণা"-তে আছে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংসের

সূত্রপাতের ছবি আর "ধ্রুব"-তে গুপ্ত সাম্রাজ্যের উদয়ের কাহিনী। "ধর্মপাল" উপন্যাসে পাল সাম্রাজ্যের গৌরবোজ্জ্বল দিনের ছবি পাওয়া যায়। ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত "ময়ুখ"-এ শাহজাহানের আমলে বাংলায় পোর্তুগীজ অত্যাচারের ছবি পাওয়া যায়। "অসীম"- এ বাদশা ফর্‌রুখশিয়রের আমলে বাংলাদেশের অবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে। রাখালদাসের শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস "লুৎফুল্লা"। এতে নাদির শাহের দিল্লী অধিকারের সময়ের ছবি পাওয়া যায়।

অতঃপর আমাদের আলোচ্য ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন —"বৌঠাকুরাণীর হাট" (১৮৮৩) এবং "রাজর্ষি" (১৮৮৭)। "বৌ ঠাকুরাণীর হাট" এ রাজা প্রতাপাদিত্যের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। উপন্যাসটির মধ্যে কিছু অনৈতিহাসিক কাহিনীর মিশ্রণ ঘটেছে। যেমন— প্রতাপাদিত্যের কাকা বসন্তরায়কে স্বয়ং প্রতাপাদিত্য কর্তৃক হত্যা প্রসঙ্গ, প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্য ও কন্যা বিভার গল্প ইত্যাদি।

প্রতাপাদিত্যকে নিষ্ঠুর ও নির্মম করে এঁকেছেন ঔপন্যাসিক। প্রতাপাদিত্যের নির্মমতার ফলে কিভাবে তাঁর অন্তঃপুরের শান্তি বিঘ্নিত হল, পুত্র-কন্যার জীবন বিষময় হল, কাকা প্রাণ হারালেন, সদ্যবিবাহিত কন্যা বিভার দাম্পত্যজীবন ব্যর্থ হয়ে গেল- এই সমস্ত ঘটনা নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। চরিত্র অঙ্কণে বিশেষ করে প্রতাপাদিত্যের চরিত্র অঙ্কণে ঔপন্যাসিক সত্যিই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। পরবর্তীকালে উপন্যাসটি অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকটি রচনা করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজর্ষি"। ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। রাজা গোবিন্দমানিক্য, যিনি দেবীমন্দিরে বলিদানের ঘোর বিরোধী ছিলেন, তাঁর সঙ্গে মন্দিরের পুরোহিত রঘুপতি-র দ্বন্দ্বের পটভূমিকায় উপন্যাসটি রচিত হয়েছে, যে কাহিনী পুরোপুরি ইতিহাসসম্মত। তবে উপন্যাসটির মধ্যে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা বাদও পড়েছে। যেমন-মোগল সৈন্যর আক্রমণ, শাহসুজার প্রসঙ্গ ইত্যাদি। পরবর্তীকালে এই উপন্যাস অবলম্বনে তিনি "বিসর্জন" নাটকটি রচনা করেন।

তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন। "রাধা" (১৯৫৮) তারাশঙ্করের প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস। মুঘল সাম্রাজ্য যখন পতনোন্মুখ, সেই পটভূমিতে উপন্যাসের নায়কের বৈষ্ণবধর্মের শুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াস, পরে রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগদান, সংঘর্ষে আহত হয়ে মোহিনীর সেবায় পুনরুজ্জীবিত হয়ে রাধাকৃষ্ণের উপাসনার মহিমা উপলব্ধি উপন্যাসটির মূল বিষয়। "গন্নাবেগম" তারাশঙ্করের অপর ঐতিহাসিক উপন্যাস।

এবারে আসি ঔপন্যাসিক শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাসের আলোচনায়। তাঁর প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস "কালের মন্দিরা"। গুপ্ত বংশের শেষ সমৃদ্ধিশালী রাজা স্কন্দগুপ্তের রাজত্বে হুণ আক্রমণ এবং স্কন্দগুপ্ত কর্তৃক সেই আক্রমণ প্রতিহত করার প্রয়াসই উপন্যাসের মূল অবলম্বন। তবে ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সের মিশ্রণ এখানে লক্ষ্য করা যায়। ভাগ্যান্বেষী যুবক চিত্রকবর্মা এবং রাজকুমারী রট্টা যশোধরার প্রণয় কাহিনীতে ইতিহাসের সঙ্গে রোমান্সের মিশ্রণ ঘটেছে। আবার যুবক স্কন্দ যে একসময় রাজলক্ষ্মীকে বিবাহ করার জন্য তিনরাত্রি মাটিতে শয়ন করেছিলেন—এই ঐতিহাসিক তথ্যটি উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। উপন্যাসে হুণ-জাতীর পরিচয়ের মধ্যে ইতিহাসের বাস্তবসম্মত বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁর

পরবর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাস "গৌড়মল্লার"। উপন্যাসটির কাহিনী গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছু পরবর্তী সময়ে থেকে শুরু করে কুড়ি বছর অর্থাৎ সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বিস্তৃত। বাঙালীর সংস্কৃতি, গ্রাম্যজীবন, নাগরিক জীবন উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। রাজা শশাঙ্ক, শীলভদ্র ইত্যাদি চরিত্র ঐতিহাসিক হলেও, উপন্যাসের অন্য চরিত্র শশাঙ্কের পুত্র মানবদেবের চরিত্র অনৈতিহাসিক।

শরদিন্দুর তৃতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস "তুমি সন্ধ্যার মেঘ"। তুর্কী আক্রমণের আগে ভারতের অঙ্গ রাজ্যগুলির পারস্পরিক বিবাদের ছবি আছে এই উপন্যাসটিতে। পালরাজ ও চেদিরাজের মধ্যে বংশানুক্রমিক শত্রুতা, লক্ষ্মীকর্ণ কর্তৃক প্রথমবার গৌড়ে আক্রমণের চেষ্টা, নয়পাল ও লক্ষ্মীকর্ণের মধে সন্ধি স্থাপনে অতীশ দীপঙ্করের ভূমিকা ইত্যাদি ঘটনা ইতিহাস থেকে গৃহীত হয়েছে।

"কুমারসম্ভবের কবি" শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। তবে ইতিহাসের সঙ্গে কিংবদন্তীর মিশ্রণ ঘটেছে উপন্যাসে। কুন্তল রাজকন্যা হৈমশ্রীর সঙ্গে কালিদাসের বিয়ে, দেবীর আশীর্বাদে কাব্যজগতে অমর হয়ে থাকা, রাজা বিক্রমাদিত্যের সঙ্গে পরিচয়, মেঘদূত-কুমারসম্ভব রচনা ইত্যাদি ঘটনা অবলম্বনে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে।

"তুঙ্গাভদ্রার তীরে' শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। তুঙ্গা ও ভদ্রা নদীর মিলনস্থলে দুশো বছরের জন্য বিজয়নগর রাজ্যের যে সমৃদ্ধি ঘটেছিল, সেই সমৃদ্ধির ইতিহাস নিয়ে উপন্যাসটি রচিত হয়েছে। বিজয়নগরের রাজা দ্বিতীয় দেবরায়, বিদ্যুন্মালা, মণিকঙ্কণা, অর্জুন, কলিঙ্গের রাজবৈদ্য, রসরাজ, লক্ষ্মণ মল্লপ ইত্যাদি চরিত্রগুলি ইতিহাস ও কল্পিত কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি উপন্যাসটি রচনা করেছিলেন অর্থাৎ বিজয়নগর রাজ্যের সমৃদ্ধির ইতিহাস বর্ণনা, সেই উদ্দেশ্যের দিক থেকে উপন্যাসটি সফল। বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারায় শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "তুঙ্গাভদ্রার তীরে" এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এবার আমরা আলোচনা করব ঔপন্যাসিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে। তাঁর প্রায় সব উপন্যাসেই ইতিহাসের কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যায়। মুঘল ইতিহাস, মহারাষ্ট্র রাজপুতদের কথা তাঁর উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। তাঁর "সম্রাট ও শ্রেষ্ঠী", "মহানন্দা", "লালমাটি" এই তিনটি উপন্যাসে বরেন্দ্রভুমির ইতিহাস পাওয়া যায়। তবে "পদসঞ্চার" তার শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। ডি-মেলোর বন্দী হওয়া, খোদাবক্স খানের শর্ত ইত্যাদি ইতিহাসের প্রসঙ্গের সঙ্গে হেনরী, স ভাস্কো-ডা-গামা, আলবুকার্ক, গণ্ডুলা, মামুদ ও ফিরোজ শাহ, শ্রীচৈতন্য হুমায়ুন ইত্যাদি চরিত্রগুলিও ঐতিহাসিক। পর্তুগীজদের ভারতের মাটিতে পদার্পণ, ব্যবসা-বাণিজ্যে আধিপত্য লাভের চেষ্টা, উপন্যাসের মধ্যে স্থান পেয়েছে। বাংলার সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক জীবন, আচার-ব্যবহার, সংস্কার ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে।

এছাড়াও একাধিক ঔপন্যাসিক ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন এবং আজও করছেন। "বহ্নিকন্যা" উপন্যাসটি গজেন্দ্রকুমার মিত্র সিপাহী বিদ্রোহ অবলম্বন করে লিখেছেন। তাঁতিয়া তোপী, নানাসাহেব প্রভৃতি ঐতিহাসিক চরিত্রের পাশাপাশি নানা অনুমাননির্ভর কাহিনীও উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। নেতাজীর বীরত্বপূর্ণ কাহিনী নিয়ে লেখা দেবেশ রায়ের "রক্তরাগ" একটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস। সমরেশ বসুর "উত্তরঙ্গ", স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চন্দনডাঙার হাট" এই দুটি উপন্যাসে

অতীতে ইংরেজের বাণিজ্য পত্তনের ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠনের ইতিহাস আছে। সাম্প্রতিককালের দাঙ্গাহাঙ্গামা, দেশভাগের পটভূমিকা নিয়ে অমিয়ভূষণ মজুমদার "গড়শ্রীখণ্ড" উপন্যাসটি রচনা করেন। এইভাবে কখনো প্রত্যক্ষভাবে, কখনোবা পরোক্ষভাবে ইতিহাস উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। আজও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনাধারা অব্যাহত।

৯৪.১০ সারাংশ- ৩

বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে ঐতিহাসিক উপন্যাসের হাত ধরে। উপন্যাস রচনার প্রয়োজনীয় উপকরণগুলোকে অক্ষলব্জ রেখে ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে জীবনকে দেখার চেষ্টা করা হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসে। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস ও মানবজীবনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করা হয়। এ জাতীয় উপন্যাসে অতীত দিনের কাহিনীকে গ্রহণ করা হয় এবং সেই অতীত জীবন সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য মাথায় রেখে ঔপন্যাসিককে উপন্যাস রচনা করতে হয়।

ঐতিহাসিক উপন্যাস শুদ্ধ ও মিশ্র দুপ্রকারের। শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস যেমন-বঙ্কিমচন্দ্রের "রাজসিংহ"। আর মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস হ'ল রমেশচন্দ্র দত্তের "রাজপুত জীবনসন্ধ্যা"। শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস আবার দুভাগে বিভক্ত-রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় ও সামাজিক বিষয়কেন্দ্রিক। মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসও দুভাগে বিভক্ত— ইতিহাসের ছায়ার কাল্পনিক সৃষ্টি ও কাল্পনিক কথামণ্ডিত ঐতিহাসিক উপন্যাস।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "ঐতিহাসিক উপন্যাস" দিয়ে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের সূত্রপাত। উপন্যাসটির দুটি অংশ 'সফল স্বপ্ন' ও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। তাঁর রচিত অন্য ঐতিহাসিক উপন্যাস হ'ল "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস"। তবে ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসাবে দুটির কোনটিরই তেমন গুরুত্ব নেই।

উপন্যাস রচনার প্রথম যুগে আরো কতকগুলি ঐতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়েছিল। যেমন— "পূর্ণশশী", "অচলবাসিনী", "পাষাণময়ী" ইত্যাদি। এগুলিও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের হাতে বাংলা ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে সুচনা ঘটেছিল পরবর্তীকালে বহু ঔপন্যাসিক সেই পথের পথিক হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক উপন্যাস "রাজসিংহ"। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে আরো অনেকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন রমেশচন্দ্র দত্ত, প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, স্বর্ণকুমারী দেবী, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ ঔপন্যাসিকবৃন্দ।

৯৪.১১ অনুশীলনী- ৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১। ঐতিহাসিক উপন্যাসের সংজ্ঞা দিন ও শ্রেণীবিভাগ করুন।

২। ঐতিহাসিক উপন্যাসের উদ্ভবের ইতিহাস সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।
৩। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি লিখুন।
৪। যে কোন দুজন ঔপন্যাসিকের ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে নিজের ভাষায় লিখুন।
৫। শূন্যস্থান পূরণ করুন।
(ক) —— রস ও —— রসের মধ্যে সম্পর্ক রচনা করে তার পটভূমিকায় মানবজীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্খার ছবি অঙ্কনই —— ঔপন্যাসিকের লক্ষ্য।
(খ) ঐতিহাসিক উপন্যাসকে —— ভাগ করা হয় —— ও ——।
(গ) সেদিক দিয়ে বিচার করলে —— বঙ্কিমের —— ও —— ঐতিহাসিক উপন্যাস।

৬। সঠিক উত্তরে টিক ( ) চিহ্ন দিন।

(ক) "ঐতিহাসিক উপন্যাস" গ্রন্থটির রচয়িতা—
(১) ভূদেব
(২) বঙ্কিমচন্দ্র
(৩) শরদিন্দু

(খ) বঙ্কিমের "রাজসিংহ"—
(১) শুদ্ধ ঐতিহাসিক উপন্যাস
(২) মিশ্র ঐতিহাসিক উপন্যাস
(৩) রাষ্ট্রনৈতিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

(গ) ত্রিপুরার রাজবংশের কাহিনী পাওয়া যায়—
(১) রাজর্ষি
(২) বৌঠাকুরাণীর হাট
(৩) শশাঙ্ক

(ঘ) চিত্রকবর্মা কোন উপন্যাসের চরিত্র—
(১) কালের মন্দিরা
(২) রাজর্ষি
(৩) রাধা

(ঙ) সিপাহীবিদ্রোহের ছবি পাওয়া যায়—
(১) বহ্নিকন্যা
(২) পদসঞ্চার
(৩) রক্তরাগ

৯৪.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী-১

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন।
৪। (ক) উভয়কেই
(খ) বোকাচিও
(গ) ১৮৫৮

৫। (ক) কথাসাহিত্য, উপন্যাস

(খ) আখ্যানকে, দুভাগে

(গ) নভেল, উৎপত্তি, নভেলা

অনুশীলনী-২

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ২-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৪। (ক) বিষবৃক্ষ, সামাজিক

(খ) প্রথম, চোখের বালি, ১৯০৩

(গ) অন্তর্জলীযাত্রা

৫। (ক) বিষবৃক্ষ

(খ) মহাশ্বেতা দেবী

(গ) গহীন গাঙ

অনুশীলনী-৩

১-৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ৩-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৫। (ক) ইতিহাস, মানব, ঐতিহাসিক

(খ) দুভাগে, শুদ্ধ, মিশ্র

(গ) রাজসিংহ, সর্বপ্রথম, সর্বশ্রেষ্ঠ

৬। (ক) ভূদেব

(খ) রাষ্ট্রনৈতিক বিষয় কেন্দ্রিক ঐতিহাসিক উপন্যাস

(গ) রাজর্ষি

(ঘ) কালের মন্দিরা

(ঙ) বহ্নিকন্যা

৯৪.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বঙ্গসাহিত্যে-উপন্যাসের ধারা।

(২) অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত।

(৩) সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।

(৪) শ্রীশচন্দ্র দাশ — সাহিত্য সন্দর্শন।

(৫) শুদ্ধসত্ত্ব বসু — বাংলা সাহিত্যের নানারূপ।

(৬) উজ্জ্বল মজুমদার — সাহিত্যের রূপরীতি।

একক ৯৫ ❑ আত্মজৈবনিক উপন্যাস, কাব্যধর্মী উপন্যাস ও পত্রোপন্যাস

গঠন

৯৫.১ উদ্দেশ্য
৯৫.২ প্রস্তাবনা
৯৫.৩ মূলপাঠ-১ আত্মজৈবনিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা
৯৫.৪ সারাংশ-১
৯৫.৫ অনুশীলনী- ১
৯৫.৬ মূলপাঠ - ২ কাব্যধর্মী উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা
৯৫.৭ সারাংশ - ২
৯৫.৮ অনুশীলনী - ২
৯৫.৯ মূলপাঠ - ৩ পত্রোপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা
৯৫.১০ সারাংশ - ৩
৯৫.১১ অনুশীলনী - ৩
৯৫.১২ উত্তরমালা
৯৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

৯৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি উপন্যাসের আরো তিনটি প্রকার সম্পর্কে ধারণা পাবেন। আপনি যত্নসহকারে এটি পাঠ করুন এবং অনুশীলনীগুলির যথাযথ উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এই এককটি থেকে আপনি-

- আত্মজৈবনিক, কাব্যধর্মী এবং পত্রোপন্যাস সম্পর্কে জানবেন।
- এই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- উপন্যাসের এই তিনটি শাখার বিভিন্ন ঔপন্যাসিকের উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

৯৫.২ প্রস্তাবনা

আগের এককে আপনারা উপন্যাসের দুটি বিভাগ সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এই একককটিকেও আগের একককটির মতো তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমভাগে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের সংজ্ঞা আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য কিছু আত্মজৈবনিক উপন্যাসও আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়ভাগে কাব্যধর্মী উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং বাংলাসাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাসের আলোচনাও এখানে আছে।

তৃতীয়ভাগে পত্রোপন্যাসের সংজ্ঞা প্রথমে দিয়ে তারপরে উল্লেখযোগ কিছু পত্রোপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এই একককটি মনোযোগ সহকারে পড়ুন। তিনটি ভাগ পড়ার পর আপনি নিশ্চয় অনুশীলনীর যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন। প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত দেখুন।

৯৫.৩ মূলপাঠ- ১ আত্মজৈবনিক উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

যে ধরনের উপন্যাসে লেখকের নিজের ছবি ফুটে ওঠে, উপন্যাসের ঘটনা ও চরিত্রগুলি লেখককে স্মৃতি রোমন্থন করতে সাহায্য করে, লেখক তাঁর জীবনের পুরোনো কথাকে স্মরণ করেন, সেই ধরনের উপন্যাসকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়। যেহেতু এই জাতীয় উপন্যাসে লেখক অকপটে তাঁর জীবনের কথা প্রকাশ করেন, তাই পাঠকদের কাছে এই জাতীয় উপন্যাসের একটা স্বতন্ত্র আকর্ষণ থাকে। যদিও লেখক কোনো চরিত্র বিশেষের মধ্যে দিয়ে নিজের জীবনকাহিনী বলে থাকেন, তবুও সেটা যে লেখকের জীবনকাহিনী তা বুঝতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না।

আত্মজীবনের এমন অনেক কথা থাকে, যা জনসমক্ষে প্রকাশ করার তাগিদ, লেখক নিজের মন থেকে পান এবং সেই সব কথা লেখক আত্মজৈবনিক উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করে থাকেন।

এই প্রকারের উপন্যাসের কাহিনী নায়কের আশৈশব জীবনকাহিনী। তাই উপন্যাসের কাহিনী স্বভাবতই দীর্ঘ হয়ে থাকে। যেহেতু উপন্যাসে লেখক তাঁর নিজের জীবনকাহিনী বর্ণনা করেন, তাই মনে হয় লেখক এখানে অনেক বেশি স্বাধীন। তবে আত্মজীবনী যেন লেখকের ডায়েরী হয়ে না যায় - এই শর্তটি উপন্যাস লিখতে গিয়ে লেখককে অবশ্যই পালন করতে হবে।

আত্মজৈবনিক উপন্যাসে বহু ব্যক্তির সাক্ষাৎ মেলে, আবার সেইসব ব্যক্তি এবং বিভিন্ন ঘটনার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে আত্মজীবনীর নায়কের ব্যক্তিস্বরূপ গড়ে ওঠে। উপন্যাসের মধ্যে এই ব্যক্তিস্বরূপের জন্ম থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত ব্যক্তিটির "হয়ে ওঠা" কে আঁকা হয়।

আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস উত্তম পুরুষে কাহিনী বর্ণনার কয়েকটি ত্রুটির প্রতি হেনরি জেমস্ তাঁর "The Princess Casanassima" গ্রন্থে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। প্রথমত, উত্তম পুরুষে কাহিনী বললে কাহিনী সংকীর্ণ একপেশে হয়ে পড়তে পারে। কারণ লেখকের দেখা চরিত্র তাঁর দৃষ্টিতেই সীমাবদ্ধ

হয়ে পড়ে। লেখক যদি নিরপেক্ষ থাকতেন, তবে হয়তো সেই চরিত্রের অন্যান্য দিকও উদঘাটিত হতে পারতো। দ্বিতীয়ত, বক্তার সঙ্গো বর্ণিত চরিত্রটির মনস্তস্ত্বগত পার্থক্য না থাকার জন্যই চরিত্র সম্পর্কে অনেক শিথিল কথাবার্তা এসে যায় যা কাহিনীর অগ্রগতিতে বাধা দান করে, ফলে উপন্যাসটি অতিকথনের দোষে নষ্ট হয়ে পড়তে পারে।

এবার আসা যাক আত্মজৈবনিক উপন্যাসের বিকাশ ধারায়—

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "শ্রীকান্ত" উপন্যাসটিকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা যায়। শরৎচন্দ্রই প্রথম আত্মকাহিনীর ছলে উপন্যাস লিখলেন। তিনি জীবনকে নানারূপে দেখেছিলেন। জীবন সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। বহু মানুষ এবং ঘটনার সংস্পর্শে তিনি এসেছিলেন। এই সমস্ত কিছুর বর্ণনা "শ্রীকান্ত" উপন্যাসে পাওয়া যায়। উপন্যাসটির মধ্যে বিভিন্ন নারী ও পুরুষ চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে, রাজনৈতিক পটভূমিতে পরাধীন দেশের জন্য বেদনার ছবিও উপন্যাসে পাওয়া যায় এবং উপন্যাসে শরৎচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের অনেক হারানো দিনের স্মৃতির রোমন্থনও আছে। তাই এই উপন্যাসটিকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়, শ্মশানে অন্ধকার রাত্রি, সমুদ্রে সাইক্লোন-সব কিছুই তাঁর অভিজ্ঞতার ফসল।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী"কেও আমরা আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলতে পারি। কিন্তু আত্মজৈবনিক উপন্যাসে লেখককে যেমন করে পাবার কথা তেমন করে আমরা বিভূতিভূষণকে উক্ত উপন্যাসে পাই না। অনেকের মতে উপন্যাসে অপুর মধ্যে বিভূতিভূষণের জীবনের সামান্যই প্রতিফলিত হতে পেরেছে এবং পরে অপু লেখকের কল্পনায় বিশ্বজীবনের অংশ হয়ে গেছে। বিভূতিভূষণ তাঁর "তৃণাঙ্কুর"-এ এক জায়গায় লিখেছেন, "অনেকে ভাবেন আমার জীবনের সঙ্গো বুঝি বই দু'খানির যোগ আছে - চরিত্রগুলি বোধ হয় জীবন থেকে নেওয়া। অবশ্য কতকটা যে আমার জীবনের সংযোগ আছে ঘটনাগুলির সঙ্গো, এবিষয়ে, ভুল নেই, কিন্তু সে যোগ খুব ঘনিষ্ঠ নয়- ভাসা ভাসা ধরণের।"

তবে উপন্যাসটিতে অপুর বাল্যজীবনের মধ্যে দিয়ে লেখক তার শৈশব এবং কৈশোর কালকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। হরিহর হুবহু তাঁর পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো কর্মে উদসীন, ভ্রমণ-পিপাসু এবং কথকতাই তার বৃত্তি। সর্বজয়া তাঁর মা মৃণালিনী দেবীর আদলে রচিত। এমনকি তাঁর পিতার জ্ঞাতি-সম্পকের্র এক বোন- মেনকা দেবীর আদলে তিনি ইন্দির-ঠাকরুণ চরিত্রটিকে এঁকেছেন। এছাড়া অপুর প্রকৃতিপ্রীতি, সৌন্দর্যমুগ্ধতা ইত্যাদি সবগুণই বিভূতিভূষণের মধ্যেও আমরা পাই।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের "কালান্তর" ও আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস। উপন্যাসের নায়ক গৌরীকান্ত তারাশঙ্করেরই ছদ্মনাম এবং গৌরীকান্তের মধ্য দিয়ে লেখকের অতীত জীবনের নানা ঘটনা, সাহিত্যকৃতি ইত্যাদি ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের অধিকাংশ জুড়ে অতীত ঘটনার পুরনাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। যার মধ্যে পুরাণকাহিনী আছে, কিংবদন্তী আছে, ইতিহাসের ছায়া আছে, বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মতাদর্শগত বিরোধ আছে। উপন্যাসে গৌরীকান্তের পুরাণবিলাস সম্পর্কে শান্তি যে মন্তব্য করেছে, তা যেন তারাশঙ্করের নিজেরই সমালোচনা।

সজনীকান্ত দাসের "অজয়" জীবনকাহিনীর ছদ্মবেশধারী উপন্যাস। উপন্যাসটি "পথের পাঁচালী"

ও “অপরাজিত”-র আদলে লেখা হয়েছে। উপন্যাসটিতে নায়ক অজয়ের শৈশব থেকে যৌবনের প্রণয় অভিজ্ঞতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে।

প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর “মহাস্থবির জাতক”-এ আত্মজীবনীর মধ্যে দিয়ে পূর্বস্মৃতির পর্যালোচনা করা হয়েছে। প্রথমখণ্ডে লেখকের শৈশব-স্মৃতির স্পর্শ, শিশুমনের নানা কল্পনা উপন্যাসটির আকর্ষণ ছিল। কিন্তু পরবর্তী খণ্ডগুলিতে লেখক যখন শৈশব ছাড়িয়ে কৈশোর ও যৌবনের দিনগুলির বর্ণনা করেছেন তখন উপন্যাসটির আকর্ষণ অনেক কমে গেছে। উপন্যাসের মধ্যে যে সব নর-নারী লেখকের পথের ধারে এসেছে, যে সব ঘটনা লেখককে কৌতুহলী করেছে সে সবের বর্ণনা এলেও তার মধ্যে লেখককে খুঁজে পাওয়া যায় না। উপন্যাসটি যেন পথচলার কাহিনীতে পরিণত হয়েছে এবং লেখক তার মধ্যে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলেছেন।

উপরে উল্লিখিত উপন্যাসগুলি ছাড়া আর এক ধরণের উপন্যাসকেও আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা যেতে পারে। যে উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীরা নিজের কথা নিজেই বলে যায়, সেই উপন্যাসকেও আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়। এখানে পাত্রপাত্রীদের উক্তির সাহায্যেই চরিত্র চিত্র ও আখ্যানভাগ গড়ে ওঠে। উক্তির প্রকারভেদে আত্মজৈবনিক উপন্যাসকে দুভাগে ভাগ করা হয়। (১) একাক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস ও (২) অনেকোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস। ইংরাজী সাহিত্যে ডিকেন্সের “David Copperfield” একোক্তি মূলক উপন্যাস। হেনরি জেমসের “A small boy and others”. “Notes of a son”, “Middle Years” আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

এবার আমরা বাংলাসাহিত্যের এইরকম কিছু আত্মজৈবনিক উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমেই আসা যাক বঙ্কিমচন্দ্রের “রজনী” উপন্যাসটিতে। এখানে বিভিন্ন চরিত্রের উক্তির মধ্যে দিয়ে কাহিনী গড়ে উঠেছে। সাধারণত অনেকোক্তিমূলক উপন্যাসের গতি মন্থর হয়ে থাকে। কারণ একই ঘটনা সম্পর্কে বিভিন্ন লোকের মতামত এখানে প্রকাশ করতে হয়। কিন্তু “রজনী” উপন্যাসে কাহিনী অপ্রতিহত গতিতেই পরিণতির দিকে চলেছে। তবে বিভিন্ন বক্তার চরিত্রের মধ্যে ভাষাগত প্রভেদ লেখক রক্ষা করতে পারেননি বলে, অন্ধ রজনী সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তার মতের সঙ্গে রজনীর নিজের মতের কোনো মিল পাওয়া যায় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের “ইন্দিরা” উপন্যাসটিকে একোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের “চতুরঙ্গ” উপন্যাসে শ্রীবিলাস-ই কাহিনীর বক্তা। সে যেভাবে ঘটনা ঘটতে দেখেছে, সেভাবেই সে বলে গেছে। এবং তার ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকেই সে জ্যাঠামশায়, শচীশ দামিনী প্রভৃতি চরিত্রগুলিকে বিচার করেছে।

রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে” উপন্যাসটি অনেকগুলি আত্মকথার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। বিমলা, নিখিলেশ ও সন্দীপ এই তিনজন চরিত্রের উক্তির মধ্যে দিয়ে কাহিনীটি গড়ে উঠেছে।

সতীনাথ ভাদুড়ীর “জাগরী” উপন্যাসটি অনেকোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস। উপন্যাসটিতে কারাগারে বন্দী একজন স্বাধীনতা সংগ্রামীর চিত্র ফুটে উঠেছে।

সন্তোষকুমার ঘোষ আত্মজৈবনিক পদ্ধতিতে কিছু উপন্যাস রচনা করেছিলেন। তাঁর “কিনু গোয়ালার

গলি”-তে আত্মজৈবনিক উপন্যাসের কিছু উপাদান পাওয়া গেলেও, তা স্পষ্ট নয়। “স্বয়ং নায়ক” উপন্যাসেও আত্মজৈবনিক উপাদান পাওয়া যায়।

৯৫.৪ সারাংশ- ১

উপন্যাসে যেখানে নানা স্মৃতির মধ্যে দিয়ে লেখকের জীবনকাহিনী ফুটে ওঠে, এবং সেই স্মৃতির উন্মোচনে নানা ঘটনা ও চরিত্র লেখককে সাহায্য করে, সেই উপন্যাসকে আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়। বিশেষ কোনো চরিত্রের মধ্যে দিয়ে লেখকের জীবনকাহিনী ফুটে উঠলেও সেই কাহিনী যে লেখকেরই জীবনের কাহিনী তা বুঝতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না। যেহেতু নিজের জীবনের কাহিনী এখানে লেখক লিখতে বসেন তাই লেখক এখানে অনেক বেশি স্বাধীন।

আত্মজৈবনিক উপন্যাসে স্বাভাবিক কারণেই দীর্ঘ হয়ে থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তি এবং ঘটনার মধ্যে দিয়ে এই জাতীয় উপন্যাসের নায়কের ব্যক্তিস্বরূপ গড়ে ওঠে। ঘটনা পরম্পরায় এই ব্যক্তির যে বিবর্তন এখানে লিপিবদ্ধ করা হয় তার মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিটির “হয়ে ওঠা” আঁকা হয়ে যায়।

কাহিনী এখানে যেহেতু উত্তমপুরষে বর্ণিত হয় তাই কয়েকটি ত্রুটিও যেমন-চরিত্রের সীমাবদ্ধতা, অতিকথন ইত্যাদিও এই ধরণের উপন্যাসে দেখা যায়।

শরৎচন্দ্রের “শ্রীকান্ত” বাংলা সাহিত্যের প্রথম আত্মজৈবনিক উপন্যাস। এছাড়া বিভূতিভূষণের “পথের পাঁচালী”, তারাশঙ্করের “কালান্তর”, সজনীকান্ত দাসের “অজয়”, প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর “মহাস্থবির জাতক” ইত্যাদিও আত্মজৈবনিক উপন্যাস।

উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি ছাড়া যে ধরণের উপন্যাসে পাত্রপাত্রী নিজের কথা নিজেই বলে যায়, সেই উপন্যাসকেও আত্মজৈবনিক উপন্যাস বলা হয়। এই জাতীয় উপন্যাস দুভাগে বিভক্ত।

(১) একোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের “ইন্দিরা”, রবীন্দ্রনাথের “চতুরঙ্গ”।

(২) অনেকোক্তিমূলক আত্মজৈবনিক উপন্যাস যেমন-বঙ্কিমচন্দ্রের “রজনী”, রবীন্দ্রনাথের “ঘরে বাইরে”, সতীনাথ ভাদুড়ীর “জাগরী” ইত্যাদি।

৯৫.৫ অনুশীলনী- ১

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) আত্মজৈবনিক উপন্যাস কাকে বলে উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) বাংলা সাহিত্যের দুটি আত্মজৈবনিক উপন্যাস সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৩) বঙ্কিমচন্দ্রের “রজনী” ও “ইন্দিরা” কি জাতীয় উপন্যাস, আলোচনা করুন।

(৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) সাধারণত উপন্যাসের কাহিনী নায়কের বা গ্রন্থের প্রৌঢ় “——”-র আশৈশব জীবনকাহিনী।

(খ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের —— আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস।

(গ) —— "অজয়" জীবনকাহিনীর ছদ্মবেশধারী উপন্যাস।

(৫) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের কয়েকটি ত্রুটির উল্লেখ করেছেন-(১) হেনরি জেমস্, (২) রবীন্দ্রনাথ, (৩) বঙ্কিমচন্দ্র

(খ) গৌরীকান্ত চরিত্রটি- (১) শ্রীকান্ত-এর, (২) ঘরে বাইরে-এর, (৩) কালান্তর-এর

(গ) জাগরী উপন্যাসটি-(১) একোক্তিমূলক, (২) আত্মজৈবনিক, (৩) অনেকোক্তিমূলক

৯৫.৬ মূলপাঠ- ২ কাব্যধর্মী উপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

কোনো কোনো উপন্যাসে ঔপন্যাসিক প্লট সম্পর্কে বিশেষ মনোযোগী হন না এবং পাঠককেও সে সম্পর্কে কৌতুহল সঞ্চারের সুযোগ দেন না। বর্ণনাকে মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলায় বিশেষভাবে তৎপর হন। চরিত্র অপেক্ষা বর্ণনাই লেখকের কাছে প্রধান হয়ে ওঠে। এই ধরনের উপন্যাসকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা হয়। সাধারণত কবিতার ভাষা যেমন স্নিগ্ধ, কোমল হয়, তেমনি কাব্যধর্মী উপন্যাসের ভাষাও স্নিগ্ধ কোমল হয়ে থাকে এবং তাতে গীতিকাব্যের লক্ষণ বিদ্যমান থাকে।

বাংলাসাহিত্যে প্রচুর কাব্যধর্মী উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আরো অনেকে কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন এবং আজও করে চলেছেন।

আরেকজাতীয় কাব্যধর্মী উপন্যাস পাওয়া যায়। যাকে আমরা কাব্যধর্মী উপন্যাস না বলে কাব্যোপন্যাস অর্থাৎ একই সঙ্গে কাব্য ও উপন্যাস বলতে পারি। এই জাতীয় উপন্যাসে ভাষা বিন্যাস ধর্ম কাব্যাশ্রয়ী হলেও, ঘটনা ও চরিত্রচিত্রণ উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। আনন্দ বাগচীর "স্বকালপুরুষ", নচিকেতা ভরদ্বাজের "অন্যরূপে রূপান্তর" ইত্যাদি ও জাতীয় কাব্যোপন্যাসের উদাহরণ।

আপাতত আমাদের আলোচ্য কাব্যোপন্যাস নয়, কাব্যধর্মী উপন্যাস। এবার আমরা বাংলাসাহিত্যের কিছু উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করব।

প্রথমেই আসা যাক রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাস প্রসঙ্গে। তাঁর "যোগাযোগ" উপন্যাসে কুমুদিনী ও বিপ্রদাসের মধ্যে স্নেহ সম্পর্কটি, অপরূপ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় বর্নিত হয়েছে। "চতুরঙ্গ" উপন্যাসে শচীশ-দামিনী-শ্রীবিলাসের সম্পর্ক, "ঘরে-বাইরে" উপন্যাসে বিমলা ও সন্দীপের আকর্ষণ এ সবেরই অবস্থান যেন উপন্যাসের চেয়ে কাব্যজগতের এলাকায়। তবে রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস "শেষের কবিতা"। অমিত-লাবণ্যের চির অতৃপ্ত প্রেম এখানে কাব্যধর্মী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। উপন্যাসটি যেন Browning-এর অমর কবিতা "Two in the Campagna"-এর সুর বাঁধা। তারই মর্মকথার কবিত্বপূর্ণ উদাহরণ সংবলিত ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যায়। উপরিউক্ত উপন্যাসগুলি পড়তে পড়তে মনে হয় কোনো কবি ঔপন্যাসিকের হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে উপন্যাসের ফাঁকে কাব্যের বাঁশী বাজিয়ে তুলেছেন।

ঔপন্যাসিক বনফুল দুখানি উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছিলেন। সেদুটি হ'ল "রাত্রি" ও "লক্ষ্মীর আগমন"।

অতি-আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত উল্লেখযোগ্য কিছু কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছিলেন। এঁদের উপন্যাসের প্রধান বিশেষত্ব তা গভীরভাবে গীতিকাব্যধর্মী। উপন্যাসে যেসব ঘাত-প্রতিঘাত, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেছেন তাঁরা, তা একান্তভাবে গীতিকাব্যধর্মী। এমনকি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীও কাব্যধর্মী। জীবনের বিশেষ মুহূর্তগুলিকে দেখার ভঙ্গীও এঁদের কাব্যনুপ্রেরিত। প্রথমে আলোচনায় আসি বুদ্ধদেব বসুর কাব্যধর্মী উপন্যাস প্রসঙ্গে।

বুদ্ধদেব বসুর "যেদিন ফুটলো কমল" উপন্যাসটির বহুস্থানই কাব্যময়। গদ্যের ঢঙে এখানে যেন কবিতাই লেখা হয়েছে। বিশেষ করে যেখানে বর্ষার কথা বলা হয়েছে, কিংবা রাত্রির অন্ধকারের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করাহয়েছে। শ্রীলতা ও পার্থপ্রতিমের সম্পর্ক ছিল সহপাঠীর। আস্তে আস্তে তা প্রেমের পর্যায়ে পরিণতি লাভ করেছে। উপন্যাসটির কাব্যময় প্রতিবেশের জন্য এবং তাদের ভালোবাসা আত্মসচেতন ভাবে বেড়ে ওঠায় সমস্ত ব্যাপারটা কাব্যের অধ্যায় হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের শেষে তাই গীতিকাব্যের রেশই আমাদের অনুভূতিতে থেকে যায়।

তাঁর "একদা তুমি প্রিয়ে"-তে কাব্যলক্ষণ পাওয়া যায়। "বাসর ঘর" উপন্যাসেও মনস্তত্ত্ব অপেক্ষা কবিতারই প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কুন্তলা ও পরাশরের পূর্বরাগের মধ্যে কিছুটা মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার ছবি থাকলেও, তা শেষ পর্যন্ত কাব্যধর্মী উপন্যাসে পর্যবসিত হয়েছে। কবিত্বের প্লাবন এসে মনস্তত্ত্বকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। কুন্তলা-পরাশরের বিবাহিত জীবনের মুহূর্ত্তগুলি অসাধারণ কবিত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। চরিত্রের বৈশিষ্ট্য, ঘাত-প্রতিঘাত, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা সবই এখানে কাব্যময় হয়ে উঠেছে।

এবার আসা যাক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কাব্যধর্মী উপন্যাসের প্রসঙ্গে। "আসমুদ্র" অচিন্ত্যকুমারের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস। কবিত্বের অতিপ্রাধান্য উপন্যাসের মধ্যে পাওয়া যায়। নববধূর প্রথম পরিচয়ের মধ্যে লেখক কাব্যময়তা ফুটিয়ে তুলেছেন,-"একটি শঙ্খের মধ্যে যেমন বিশাল সমুদ্রের নিঃশ্বাস শোনা যায়, তেমনি মেয়েটির মধ্যে নিমীলিত হয়ে আছে জীবনের বিচিত্রিত আবেগময়তা।" সৌম্য ও বনানীর মধ্যে যে রহস্যময় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে-তাও গীতিকাব্যেরই বিষয়।

"প্রচ্ছদপট" উপন্যাসটিকেও কাব্যধর্মী বলা যেতে পারে। শ্রীপর্ণা ও নিরঞ্জনের পূর্বরাগ, প্রেম, বিয়ের বর্ণনায় কাব্যোচ্ছ্বাসময় ভাষা আমরা পাই। পরবর্তী স্তরে শ্রীপর্ণীর পূর্বস্বামীর ঔরসজাত পুত্র আদিত্যের প্রতি তার অপত্যস্নেহের আতিশয্য এই নবজাত দাম্পত্য প্রেমকে অভিভূত করেছে।

অচিন্ত্যকুমারের "বেদে" উপন্যাসটির মধ্যেও কিছু কাব্যধর্মী লক্ষণ পাওয়া যায়। এছাড়া তাঁর "রূপসী রাত্রি" উপন্যাসটিতেও কাব্যধর্মিতার লক্ষণ আছে। বইটির বহিরঙ্গ উপন্যাস হলেও, অন্তরঙ্গে কাব্যানুভূতি প্রবল।

আমাদের আলোচিত পরবর্তী কাব্যধর্মী উপন্যাস হ'ল মনীন্দ্রলাল বসুর "রমলা"। উপন্যাসটির ঘটনা-শৃঙ্খল এবং মনস্তাত্ত্বিক কাহিনী অনেকটা রবীন্দ্রকাব্যেরই অন্তর্গত। এক প্রভাতে রজত ও মাধবীর প্রাতঃভ্রমণ এবং সেদিনই পূর্ণিমার সন্ধ্যায় রজত ও রমলার মিলনের বর্ণনায় "সকালে মাধবীর সঙ্গে যাত্রার নীরবতার

সহিত, সে প্রভাতালোকদীপ্ত স্তব্ধতার সহিত” এই জ্যোৎস্নারাতের অভিসারের পার্থক্য লেখক অপূর্ব কাব্যময় বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। রমলা এখানে রবীন্দ্রনাথের মানসসুন্দরীর মত বিশ্বের সমস্ত সৌন্দর্য্যের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছে। মনীন্দ্রলাল বসুর ভাবকল্পনা, শব্দচিত্র, ঘটনা-বিবরণ সব কিছুর মধ্যেই রবীন্দ্রকাব্যের হুবহু প্রতিধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। রজত ও রমলার বিয়ের পর মধুচন্দ্রিমা যাপনের বর্ণনায়ও কাব্যময়তার আস্বাদ পাওয়া যায়। কোনারক যাত্রার বর্ণনায় লেখক তাঁর সমস্ত কাব্যানুভূতি উজার করে দিয়েছেন। সবদিক মিলিয়ে উপন্যাসটি বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে এবং “রমলা” উপন্যাসটি রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাসের প্রায় সমপ্রকৃতির।

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের “মধুরে মধুর” উপন্যাসটিকেও আমরা কাব্যধর্মী উপন্যাস বলতে পারি। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু উপন্যাস, শরৎচন্দ্রের কিছু উপন্যাসেও কাব্যধর্ম লক্ষ্য করা যায়।

৯৫.৭ সারাংশ- ২

যে ধরনের উপন্যাসে লেখক প্লট এবং চরিত্রের চেয়ে বর্ণনাকে বেশি প্রাধান্য দেন এবং তাকেই মাধুর্যমণ্ডিত করে তোলেন, তাকে কাব্যধর্মী উপন্যাস বলা হয়। কাব্যধর্মী উপন্যাসের ভাষা কবিতার ভাষার মতোই স্নিগ্ধ ও কোমল হয় এবং তাতে গীতিকাব্যের লক্ষণও থাকে।

বাংলা সাহিত্যে আরেকজাতীয় কাব্যধর্মী উপন্যাস পাওয়া যায়, যাকে আমরা কাব্যোপন্যাস বলতে পারি। যে উপন্যাসে কাব্য ও উপন্যাসের লক্ষণ একইসঙ্গে পাওয়া, যায় তাকে কাব্যোপন্যাস বলা হয়।

বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অনেক ঔপন্যাসিকই কাব্যধর্মী উপন্যাস রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী উপন্যাসের মধ্যে প্রধান হ’ল “শেষের কবিতা”। এছাড়াও “যোগাযোগ”, “চতুরঙ্গ” উপন্যাসেও কিছু পরিমাণে কাব্যধর্মিতার লক্ষণ পাওয়া যায়। বুদ্ধদেব বসু এবং অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের কিছু উপন্যাস পাওয়া যায় যেগুলিকে আমরা কাব্যধর্মী উপন্যাস বলতে পারি। বুদ্ধদেব বসুর “যেদিন ফুটলো কমল”, “একদা তুমি প্রিয়ে”, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের “আসমুদ্র” উল্লেখযোগ্য কাবধর্মী উপন্যাস। এছাড়াও মণীন্দ্রলাল বসুর “রমলা”, মহাশ্বেতা ভট্টাচার্যের “মধুরে মধুর”, বনফুলের “রাত্রি”, “লক্ষ্মীর আগমন”-ও কাব্যধর্মী উপন্যাস।

৯৫.৮ অনুশীলনী- ২

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) কাব্যধর্মী উপন্যাস কাকে বলে উদাহরণসহ বর্ণনা করুন। এই প্রসঙ্গে কাব্যোপন্যাসের সঙ্গে কাব্যধর্মী উপন্যাসের পার্থক্য বুঝিয়ে দিন।

(২) দুজন আধুনিক ঔপন্যাসিকদের কাব্যধর্মী উপন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(৩) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) রবীন্দ্রনাথের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস ——।

(খ) বুদ্ধদেব বসুর —— উপন্যাসটির বহুস্থানই ——।

(গ) —— অচিন্ত্যকুমারের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যধর্মী উপন্যাস।

৫। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) "স্বকালরুপুষ" একটি - (১) কাব্যোপন্যাস, (২) কাব্যধর্মী উপন্যাস, (৩) উপন্যাস।

(খ) "রাত্রি" উপন্যাসটির রচয়িতা - (১) বনফুল, (২) অচিন্ত্যকুমার, (৩) মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য।

৯৫.৯ মূলপাঠ- ৩ পত্রোপন্যাসের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

উপন্যাস যখন পত্রের সাহায্যে পরিবেশিত হয়, তখন তাকে পত্রোপন্যাস বলে। ইংরাজীতে এই জাতীয় উপন্যাসকে Epistolary Novel বলা হয়। এই জাতীয় উপন্যাসে, উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের লেখা পত্রাবলীর সাহায্যে কাহিনীর বিস্তৃতি সাধন করা হয়। যেহেতু বিবিধ চরিত্রের লেখা পত্রের সাহায্যে এই জাতীয় উপন্যাস গড়ে ওঠে, সেই হেতু পাঠক চরিত্রগুলির নানা অভিজ্ঞতার একটা পরিচয় লাভ করতে পারে যেমন, তেমনি সেই চরিত্রগুলির নানা অনুভব, মনের নানা অনুভূতির সঙ্গেও পাঠকের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে।

পত্রোপন্যাসের কাহিনী যেহেতু চিঠিপত্রের মাধ্যমেই বলা হয়ে থাকে, তাই চিঠিপত্রের লেখকদেরই আমরা কাহিনীর কথক বলতে পারি। ঔপন্যাসিক উপন্যাসটি লেখেন, কিন্তু কাহিনীর কথক হয় চিঠিপত্রের লেখকরা। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে পত্রোপন্যাসে চরিত্ররাই প্রধান।

পত্রের লেখকের মতামত প্রকাশ পায় পত্রের মাধ্যমে আর অন্যপক্ষের কাজকর্ম, চিন্তা সম্পর্কে পাঠককে কল্পনার সাহায্য নিতে হয়। আবার অন্যচরিত্র যখন পত্র লেখেন, তখন তাঁর সেই চিঠির সাহায্যে পাঠক আপন কল্পনার মিল বা অমিল বুঝতে পারেন এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক নিজের উপলব্ধির স্বরুপ বুঝে নিতে পারেন। এইভাবে উপন্যাসে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের আলোয় একটি চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না।

ইংরাজী সাহিত্যে Samuel Richardson কে পত্রোপন্যাসের জনক বলা যেতে পারে। তাঁর লেখা "পামেলা" নামক পত্রোপন্যাসের মধ্যে দিয়ে এই ধরণের উপন্যাস লেখার প্রচলন হয়। উপন্যাসটি একটি ঝি-এর কাহিনী, মনিবপুত্রের সঙ্গে তার প্রণয়ঘটিত কাহিনী এখানে পত্রাকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। আসলে Richardson এর কাছে বহু ঝি, নারীশ্রমিক তাঁকে দিয়ে প্রেমপত্র লেখাতে আসতো। পরে Richardson কোনো প্রকাশকের কাছ থেকে কয়েকটি প্রেমপত্র লেখার অনুরোধ পেলে, "পামেলা" নামক প্রথম একটি পত্রোপন্যাস লেখেন। পরবর্তীকালে তিনি এই ধরনের আরো কয়েকটি পত্রোপন্যাস লেখেন যেগুলিও বেশ খ্যাতিলাভ করেছিল। সেগুলি হ'ল "Clarissa", "History of Charles Grandieon" ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে পত্রোপন্যাসের সংখ্যা খুবই অল্প। তবে খাঁটি পত্রোপন্যাসের নাম করতে হলে প্রথমেই বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের "পোনুর চিঠি" উপন্যাসটির কথা মনে আসে। এটি ঠিক উপন্যাস নয়, পত্রের সাহায্যে বিভূতিভূষণ এখানে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। একটি বালক নিজের জীবনের কয়েকটি সমস্যা

পুরীর জগন্নাথদেবকে জানানোর উদ্দেশ্যে তাঁর নামে একটি চিঠি লিখে ডাকবিভাগের কর্মচারীদের বিভ্রান্তিতে ফেলে দিয়েছিল। চিঠিটির মধ্যে দিয়ে ছেলেটির ভগবান বিশ্বাস অপেক্ষা অকালপক্কতাই প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের "বিষবৃক্ষ" উপন্যাসের কিছু অংশ পত্রের সাহায্যে এগিয়ে গেছে। কয়েকটি পত্র উপন্যাসে পাওয়া যায়। যেমন-কমলমণির প্রতি সূর্যমুখীর পত্র, হরদেব ঘোষালকে নগেন্দ্র-র পত্র ইত্যাদি।

ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের "অন্তঃশীল" উপন্যাসের শেষের দিকের বেশ খানিকটা অংশ চিঠিপত্রের মধ্যে দিয়ে এগিয়ে গেছে। উপন্যাসের আসল বিষয় হ'ল সাবিত্রীর বন্ধু রমলার সঙ্গে খগেনবাবুর হৃদয়াবেগের সম্পর্ক গড়ে ওঠার কাহিনী। চিঠির মধ্যে দিয়ে খগেনবাবুর রমলার সাহচর্য পাবার আগ্রহ ফুটে উঠেছে। উপন্যাসটির শেষে সুজনকে লেখা চিঠিতে এই সুরই প্রতিধ্বনিত হয়েছে। যদিও রমলার উত্তরে প্রেমনিবেদন ব্যর্থ হয়েছে।

এছাড়া শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের "ক্রৌঞ্চ মিথুন" উপন্যাসটি অনেকখানি পত্রোপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত। তরুণকুমার ভাদুড়ীর 'সন্ধ্যাদীপের শিখা" উপন্যাসটিতে পত্রের মধ্যে দিয়েই কাহিনী অগ্রসর হয়েছে, তবে দু-এক জায়গায় লেখকের উক্তিও পাওয়া যায়।

তবে বাংলাসাহিত্যে প্রথম পত্রাকারে লেখা উপন্যাস হ'ল অম্বিকাচরণ গুপ্তের "পুরান কাগজ বা নথীর নকল"। ১৮৯৯ সালে এটি প্রকাশিত হয়। দক্ষিণ রাঢ়ের এক ঘরোয়া ঝগড়ার গল্প এখানে পত্রাকারে পরিবেশিত হয়েছে। তবে উক্ত উপন্যাসটিকে পত্রোপন্যাস অপেক্ষা ঐতিহাসিক উপন্যাস বলাই বেশি সঙ্গত হবে।

৯৫.১০ সারাংশ- ৩

পত্রোপন্যাসে উপন্যাসের নানা বিষয় পত্রের সাহায্যে প্রকাশিত হয় এবং সেই পত্রগুলির সাহায্যেই কাহিনীর বিস্তার ঘটে। এই জাতীয় উপন্যাসে চিঠিপত্রের লেখকদেরই কাহিনীর কথক বলা হয়ে থাকে এবং চরিত্ররাই উপন্যাসে প্রধান হয়ে ওঠে।

পত্রের লেখক নিজের মতামত যখন উপন্যাসে প্রকাশ করে থাকেন তখন অন্য চরিত্র সম্পর্কে পাঠককে কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। আবার অন্যচরিত্র যখন পত্র লেখেন, তখন সেই চরিত্রটি সম্পর্কে পাঠক তাঁর কল্পনাশক্তি মিলিয়ে নেন। এইভাবে উপন্যাসে বর্ণিত বিভিন্ন চরিত্র সম্পর্কে ধারণা করতে পাঠকের কোনো অসুবিধা হয় না।

ইংরাজী সাহিত্যে Samuel Richardson-এর 'পামেলা" উপন্যাসটিকে প্রথম পত্রোপন্যাস বলা হয়। মনিবপুত্রের সঙ্গে ঝি-এর প্রণয়ঘটিত কাহিনী এখানে পত্রের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলাসাহিত্যের প্রথম পত্রোপন্যাস বলতে গেলে অম্বিকাচরণ গুপ্তের "পুরান কাগজ বা নথীর নকল"-এর নাম করতে হয়। তবে খাঁটি পত্রোপন্যাস বলতে গেলে বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের 'পোনুর

চিঠি'। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের "বিষবৃক্ষ", ধূর্জটিপ্রসাদের "অন্তঃশীলা"-র শেষাংশ, শৈলজানন্দের "ক্রৌঞ্চমিথুন", তরুণ ভাদুড়ীর "সন্ধ্যাপ্রদীপের শিখা" ইত্যাদিতে পত্রোপন্যাসের আংশিক পরিচয় মেলে।

৯৫.১১ অনুশীলনী- ৩

নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) পত্রোপন্যাস কাকে বলে, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

(২) "পোনুর চিঠি" এবং "অন্তঃশীলা"-র মধ্যে কোথায় পত্রোপন্যাসের লক্ষণ ফুটে উঠেছে, তা বর্ণনা করুন।

(৩) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) খাঁটি পত্রোপন্যাসের নাম করতে হলে সবচেয়ে প্রথমেই —— মুখোপাধ্যায়ের —— উপন্যাসটির নাম করতে হয়।

(খ) বাংলাসাহিত্যে প্রথম পত্রাকারে লেখা উপন্যাস হ'ল—— গুপ্তের ——।

৪। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) "সন্ধ্যাদীপের শিখা" উপন্যাসের রচয়িতা— (১) তরুণ ভাদুড়ী, (২) শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, (৩) বঙ্কিমচন্দ্র

(খ) "অন্তঃশীলা"-র কোন অংশ পত্রোপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত — (১) শেষাংশ, (২) প্রথমাংশ, (৩) মধ্যাংশ।

৯৫.১২ উত্তরমালা

অনুশীলনী-১

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-১-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো ক'রে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৪। (ক) 'আমি'

(খ) কালান্তর

(গ) সজনীকান্ত দাসের

৫। (ক) হেনরি জেমস্

(খ) কালান্তর-এর

(গ) অনেকোক্তিমূলক

অনুশীলনী-২

১এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

(৩) (ক) শেষের কবিতা

(খ) সেদিন ফুটলো কমল, কাব্যময়

(গ) আসমুদ্র

৪। (ক) কাব্যোপন্যাস

(খ) বনফুল

অনুশীলনী-৩

১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-৩এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৩। (ক) বিভূতিভূষণ, পোনুর চিঠি

(খ) অম্বিকাচরণ, "পুরান কাগজ বা নথীর নকল"

৪। (ক) তরুণ ভাদুড়ী

(খ) শেষাংশ

৯৫.১৩ গ্রন্থপঞ্জি

(১) শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়- বঙ্গাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা

(২) শ্রীশচন্দ্র দাশ - সাহিত্য সন্দর্শন

(৩) শুদ্ধসত্ত্ব বসু - বাংলা সাহিত্যের নানারুপ

(৪) উজ্জ্বল মজুমদার - সাহিত্যের রুপরীতি

একক ৯৬ ❑ কথাসাহিত্য ঃ ছোটগল্প, অতিপ্রাকৃত গল্প, উদ্ভট গল্প এবং সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্প

গঠন

৯৬.১ উদ্দেশ্য

৯৬.২ প্রস্তাবনা

৯৬.৩ মূলপাঠ-

৯৬.৪ সারাংশ - ১

৯৬.৫ অনুশীলনী - ১

৯৬.৬ মূলপাঠ - ২ অতিপ্রাকৃত গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৬.৭ সারাংশ - ২

৯৬.৮ অনুশীলনী - ২

৯৬.৯ মূলপাঠ - ৩ - উদ্ভট গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৬.১০ সারাংশ - ৩

৯৬.১১ অনুশীলনী - ৩

৯৬.১২ মূলপাঠ - ৪ - সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

৯৬.১৩ সারাংশ - ৪

৯৬.১৪ অনুশীলনী - ৪

৯৬.১৫ উত্তরমালা

৯৬.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

৯৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি কথাসাহিত্যের আরেকটি ভাগ গল্প সম্পর্কে জানতে পারবেন। এই এককটি যদি আপনি যত্নসহকারে পাঠ করেন তবে অনুশীলনীগুলির যথাযথ উত্তর দিতে পারবেন। আপনি এককটি পাঠ করলে—

- পাশ্চাত্য সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব কিভাবে হ'ল তা জানতে পারবেন।
- বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব কিভাবে হ'ল, সে সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

● বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ছোটগল্প কোনটি এবং কেন সেটিকে প্রথম যথার্থ ছোটগল্প বলা হয়, তা জানবেন।

● ছোটগল্পের তিনটি বিভাগ - অতিপ্রাকৃত, উদ্ভট এবং সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী ছোটগল্প সম্পর্কে ধারণা পাবেন।

● ছোটগল্পের এই তিনটি শাখার বিভিন্ন গল্পলেখকদের গল্পগুলি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৯৬.২ প্রস্তাবনা

আগের দুটি এককে আপনারা কথাসাহিত্যের একটি বিভাগ উপন্যাস এবং উপন্যাসের বিভিন্ন প্রকার সম্পর্কে জানতে পেরেছেন। এই এককে আপনারা কথাসাহিত্যের অপর বিভাগ গল্পের উদ্ভব কীভাবে হ'ল, তার ধারণা পাবেন। এই প্রসঙ্গে আপনারা পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য উভয় দেশের সাহিত্যে গল্পের কিভাবে উৎপত্তি হ'ল, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

এককটির দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ ভাগে অতিপ্রাকৃত গল্প, উদ্ভট গল্প এবং সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্প কাকে বলে সে বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে গল্পের এই তিনটি বিভাগের কয়েকজন রচনাকারের নাম উল্লেখ করে তাঁদের উল্লেখযোগ্য কিছু গল্প সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এই এককটির চারটি ভাগ মনোযোগ সহকারে পড়ুন। সবকটি ভাগ পড়ার পর সঙ্গে দেওয়া অনুশীলনীগুলির যথাযথ উত্তর আপনি নিশ্চয় দিতে পারবেন। প্রয়োজনে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে নিন।

৯৬.৩ মূলপাঠ - ১ কথাসাহিত্য ঃ ছোটগল্পের সংজ্ঞা ও উদ্ভব

ছোটগল্প সাহিত্যের নবীন শাখা। যদিও গল্প মানুষের সভ্যতার মতোই পুরোনো। সভ্যতার শুরু থেকেই মানুষ গল্প বলেছে, শুনেছে। গল্পের প্রতি মানুষের কৌতূহল অনেকদিনের। তাই অন্যান্য শিল্প-অবয়বের আধারে গল্পরসের পরোক্ষ আস্বাদন অবিরাম চলেছে, ইতালীয় সাহিত্যে Gesta Romanorum, Baccacci Decameron, ইংরেজী সাহিত্যে বাইবেল, Chaucer -এর গল্প, AEsop's Fables, সংস্কৃতে বিষ্ণুশর্মার 'হিতোপদেশ', 'পঞ্চতন্ত্র', সোমদেবের 'কথাসরিৎসাগর', বৌদ্ধ সাহিত্যের 'জাতকের গল্প', 'দিব্যাবসান' প্রভৃতি গল্পের চিরন্তন আবেদনের সাক্ষ্যই বহন করছে।

ছোটগল্পের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা নির্দেশ করা কঠিন। যে-কোনো বিষয়কে নিয়েই ছোটগল্প রচনা করা যেতে পারে, অর্থাৎ জগতের সব কিছুই ছোটগল্পের বিষয়। আর সব কিছুর ছোটগল্প হয়ে ওঠার অপরিহার্য উপাদান হ'ল স্রষ্টার তীব্র ইচ্ছার একক শক্তি-প্রেরণা। ছোটগল্পতে অনাবশ্যক কথা, অনাবশ্যক চরিত্র, ঘটনা নিষ্ঠুরভাবে বর্জন করে লেখক শুধু একটি রসঘন নিবিড় মূহূর্তের জয়োল্লাস পরিকল্পনায় মগ্ন থাকেন। ছোটগল্পের প্রকৃতি ও গঠনরীতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

“ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু'চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হ'য়ে হইল না শেষ।”

আমেরিকার লেখক Washington Irving-এর Sketch Book রচনার কাল থেকে অর্থাৎ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব কল্পনা করা হয়। তাঁর ছোটগল্প লেখার ইতিহাস গল্পের মতোই আকর্ষণীয়। ছোটবেলা থেকেই তাঁর দেশভ্রমণের শখ ছিল। সেই শখের ফলে একদিন তিনি ইউরোপে গিয়ে পৌঁছোলেন, কিন্তু টাকা-পয়সা তাঁর হাতে ছিল না। সেই সময় অর্থের প্রয়োজনেই তিনি Sketch Book-এর গল্পগুলি লিখেছিলেন। তার মধ্যে সার্থক ছোটগল্প লেখকের দুটি উপাদানই প্রচুর ছিল। প্রবহমান জীবনধারার বৈচিত্র্য বিস্তার ও পরিবর্তনশীলতার প্রতি তাঁর কৌতূহল ছিল অপরিসীম। তিনি তাঁর গল্পের উপাদান সংগ্রহ করতেন প্রাচীন বৃদ্ধাদের কাছ থেকে। Irving-এর নিজের দেশে Edgar Allen Poe এবং ইউরোপের পূর্ব প্রত্যন্তে রুশ কথাশিল্পী Gogol ছোটগল্পের কলা-কৃতিকে প্রথম পূর্ণ পরিণতি দিলেন। ছোটগল্প রচনার প্রথম পর্যায়ে এঁদের ভূমিকা অবশ্য স্মরণীয়।

বাংলা সাহিত্যে সাময়িক সাহিত্য পত্রিকার পথ বেয়ে ছোটগল্পের অসচেতন বিকাশ শুরু হয়। উপন্যাসের আধারে গল্প-রস পূর্ণাঙ্গ হলেও সাময়িক পত্রিকার পক্ষে তার পরিধি ছিল অতিমাত্রিক। তাই সীমিত পরিসরে গল্প পরিবেশনের জন্য ছোট আকৃতির উপন্যাস বা বড়োগল্প রচিত হতে থাকে। এগুলি থেকেই শিল্পীর অবচেতনার মধ্যে অজ্ঞাত মুহূর্তে ছোটগল্প জন্মলাভ করে। তাই দেখা যাচ্ছে বাংলা ছোটগল্পের প্রথম রচয়িতা যিনিই হোন না কেন, সাময়িক সাহিত্য পত্রিকাই তার যথার্থ ধাত্রী।

বাংলা ভাষায় “বঙ্গাদর্শন” সাময়িক পত্রিকা হিসাবে নতুন যুগের পথিকৃৎ-ই শুধু নয়, নবজীবনের ধারাবাহকও। এই বঙ্গাদর্শনের পৃষ্ঠাতেই প্রথম সার্থকনামা বাংলা ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। ১২৮০ সালের জৈষ্ঠ্য মাসে গল্পটি প্রকাশিত হয়। গল্পটির নাম “মধুমতী”। গল্পের নীচে লেখকের নামের জায়গায় লেখা আছে, শ্রীপূঃ। ইনি ছিলেন বঙ্কিম সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ‘মধুমতী’-ই বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ছোটগল্প। তবে গল্পটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্গাদর্শনে “মধুমতী” উপন্যাস রূপে অভিহিত হলেও “মধূমতী” গল্প। আগেই বলা হয়েছে গল্পটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, লেখক হয়তো “ইন্দিরা”-র আদলে সংক্ষিপ্ত গল্প রূপে কাহিনীর পরিকল্পনা করেছিলেন। “বঙ্গাদর্শন”-এ “ইন্দিরা”-র বিস্তার ১৮ পৃষ্ঠা। আর “মধুমতী”-র বিস্তৃতি ১৪ টির কিছু বেশি পৃষ্ঠা। তবে শুধু আয়তন সংক্ষিপ্তির জন্য “মধুমতী” ছোটগল্প নয়। উপন্যাস-শিল্প, আদ্যন্ত

জটিল জীবনের চিত্রণেই নিজের পরিপূর্ণতার সন্ধান করে। আর একটি সংক্ষিপ্ত মুহূর্তের সংহত আধারে জীবনের অখণ্ড গভীর পরিচয়টিকে বিম্বিত করে তোলা ছোটগল্পের কাজ। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন জটিলতার অভিঘাত- সংকুল পূর্ণ জীবনের শিল্পী। তাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম দক্ষ ঔপন্যাসিক তিনি। অপরদিকে পূর্ণচন্দ্র জীবনকে বঙ্কিম-রচিত সমস্যা -জটিলতার মধ্যে দিয়ে দেখলেও, তার সঙ্গে নিজের মনের সহজ সৌন্দর্য পিপাসা জড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা জীবনের বিস্তার তাঁর রচনায় হ্রস্ব হয়ে পড়েছে। সমকালীন সমাজ-জীবনের আগাগোড়া বিন্যাসের পরিবর্তে একটি মুহূর্ত লেককের কাছে প্রধান হয়ে উঠেছে। "মধুমতী" সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠতে পেরেছে।

গল্পটির কাহিনীতে সমকালীন জীবন সমস্যার ছায়া পড়েছে। ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব ও প্রসারের অভিঘাত মধ্যযুগীয় সামাজিক সংস্কারের বনিয়াদকে ধাক্কা দিয়েছিল। শিক্ষিত, স্বাতন্ত্র্যসচেতন ব্যক্তিনারীর উদীয়মানতার পটভূমিতে নারী-জীবনের প্রাচীন সমস্যাগুলিকে নতুন করে যাচাই করে নিতে চেয়েছিল, সাহিত্যে যার প্রতিফলন ঘটেছিল। বঙ্কিমের উপন্যাসে এর বিস্তারিত চেহারাটা লক্ষ্য করা যায়। "মধুমতী" গল্পের লেখক সেই জটিল জীবন থেকে একটিমাত্র সমস্যাকে তুলে ধরেছেন গল্পের মধ্যে। এই কারণেই "মধুমতী" ছোটগল্পের চরিত্র নিয়ে প্রকট হয়েছে।

উপন্যাসের মতো ছোটোগল্পকেও বিষয়বস্তুর দিক থেকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন- সামাজিক, হাস্যরসাত্মক, অতিপ্রাকৃত, উদ্ভট, সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি। আমাদের এখানে আলোচ্য তিনপ্রকার ছোট গল্প - অতিপ্রাকৃত, উদ্ভট, সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী। এই এককটিরই পরবর্তী তিনটি ভাগে আপনারা এই তিনপ্রকার ছোটগল্প সম্বন্ধে সম্যক ধারণা পাবেন।

৯৬.৪ সারাংশ ১

সাহিত্যের সবচেয়ে নবীন শাখা ছোটগল্প। গল্প বলা এবং শোনার রেওয়াজ সেই সভ্যতার আদিযুগ থেকেই চলে আসছে। পৃথিবীর বিভিন্ন সাহিত্যের দিকে তাকালে ছোটগল্পের চিরন্তন আবেদনের প্রমাণ পাওয়া যায়।

জগতের সমস্ত কিছুই ছোটগল্পের বিষয় বলে, যে কোন বিষয়কে নিয়েই ছোটগল্প রচিত হতে পারে। তবে ছোটগল্পের মধ্যে সর্বপ্রকার বাহুল্যকে বর্জন করে লেখক একটি বিশেষ মুহূর্তকে ফুটিয়ে তোলেন।

আধুনিক ছোটগল্পের উদ্ভব ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার লেখক Irving-এর 'Sketch Book' শীর্ষক রচনার ভিতর দিয়ে। বাংলাসাহিত্যে ছোটগল্পের উদ্ভব হয় সাময়িক পত্রিকার সূত্র ধরে। ১৮৮০ সনের জ্যৈষ্ঠ মাসে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মধুমতী' গল্পটি বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প। গল্পটির মধ্যে লেখক জীবনের সমস্যার সঙ্গে নিজের মনের সৌন্দর্যপিপাসা যুক্ত করেছেন। এই কারণে "মধুমতী" সার্থক ছোটগল্প হয়ে উঠেছে।

৯৬.৫ অনুশীলনী ১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) ছোটগল্পের উদ্ভব ও সংজ্ঞা বিষয়ে যা জানেন লিখুন।

(২) বাংলা সাহিত্যের প্রথম ছোটগল্প কোনটি উল্লেখ করে, সেটি কি সার্থক ছোটগল্প হয়েছে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

(৩) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) ছোটগল্প সাহিত্যের সবচেয়ে — শাখা।

(খ) বাংলা সাহিত্যে — সাহিত্য পত্রিকার পথ বেয়ে — অসচেতন বিকাশ শরু হয়।

(গ) — ই বাংলা সাহিত্যের — যথার্থ —।

(৪) সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) "Sketch Book" প্রকাশিত হয় — (১) ১৮১৯ (২) ১৮১৮ (৩) ১৮২০

(খ) "মধুমতী" গল্পটির প্রকাশকাল — (১) ১২৮১ (২) ১৮২০ (৩) ১২৮০

৯৬.৬ মূলপাঠ - ২ অতিপ্রাকৃত গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

এমন ঘটনা ঘটে-যার ব্যাখ্যা বুদ্ধির সাহায্যে দেওয়া যায় না - সেইসব ঘটনাকে অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলা হয়। সাহিত্যে অতিপ্রাকৃতের এক বিশেষ স্থান আছে।

অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে অবলম্বন করে অজস্র গল্প রচিত হয়েছে। সাধারণত এই শ্রেণীর গল্পের অতিপ্রাকৃত বা অলৌকিক রহস্য গল্পটিকে আচ্ছন্ন করে রাখে। অতিপ্রাকৃত গল্পের কোনো ধরাবাঁধা সংজ্ঞা দেওয়া যায় না। তবে সাধারণ ভাবে বলা যায় যা প্রাকৃত নয় অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়, তাই অতিপ্রাকৃত। তবে এ ধরণের গল্পের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এই অতিপ্রাকৃত কাহিনী প্রকৃতিকে উল্লঙ্ঘন করলেও, প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন, অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাস করে মানুষ আনন্দ পায়। আর যারা তা বিশ্বাস করে না, তাদের অবিশ্বাস বুদ্ধির দ্বারা উপার্জিত।

অতিপ্রাকৃত কাহিনীর প্রতি মানুষের আকর্ষণ চিরকালীন যদিও কালে কালে অতিপ্রাকৃত কাহিনীর রূপ বদলে যায়। রামায়ণ-মহাভারতের সময় অতিপ্রাকৃত বলতে যা বোঝাত, একালের সঙ্গে তার কোনো মিল নেই। ভীতিরসই অতিপ্রাকৃত গল্পের প্রাণ। এই ভীতিরস সৃষ্টির জন্য লেখক এমন পরিবেশের সাহায্য নিয়ে থাকেন যা ভয়াবহ।

ইংরাজী সাহিত্যে Gogol-এর "Christmas Eve", H.G. Wells -এর "The Red Room", Mary Coleridge-এর "The king is Dead", "Long live the king" -ইত্যাদি উৎকৃষ্ট অতিপ্রাকৃত গল্প।

বাংলা সাহিত্যে সার্থক অতিপ্রাকৃত গল্প রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বিরল। তবে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় অতিপ্রাকৃত উপাদান নিয়ে বেশ কিছু কাহিনী রচনা করেছিলেন। তাঁর অধিকাংশ রচনার উপাদান ভূত-প্রেত-দত্যি-দানো। তাঁর লেখা "কঙ্কাবতী" বাস্তবে-অবাস্তবে মেশানো এক অপূর্ব কাহিনী। কাহিনীর দ্বিতীয় ভাগে স্বপ্নময় জগতের বিচিত্র কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কঙ্কাবতী রোগশয্যায় যে স্বপ্ন দেখেছে, তা তার অবচেতন মনের ছায়া। খেতুকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য কঙ্কাবতী যেসব চেষ্টা করেছে, তার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের আমেজ আছে।

"মুক্তমালা"-র বহু গল্পে অতিপ্রাকৃত ঘটনার বর্ণনা আছে। "মেঘের কোলে ঝিকিমিকি সতী হাসে ফিকিফিকি" গল্পটি পূণর্জন্ম বিষয়ক। "পিঠে পার্বণে চীনে ভূত" গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত রসের আমেজ আছে. তবে গল্পের উপসংহারে "স্বজাতি ও স্বদেশের" হিতসাধনের জন্য যেসব কথা বলা হয়েছে, তা অতিপ্রাকৃত রস-সৃষ্টিতে বাধার সৃষ্টি করেছে। তাঁর "পূজার ভূত" একটি সার্থক ও সুন্দর ভূতের গল্প। শরতের এক ঝড়-জলের সন্ধ্যায় অতীতের একটি কাহিনী যেভাবে শামীমাসীর মুখে বর্ণিত হয়েছে তা পড়তে পড়তে পাঠকের মন অজানা শঙ্কায় শিহরিত হয়ে ওঠে।

ত্রৈলোক্যনাথের পর আমরা চলে আসি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্পের আলোচনায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি হ'ল, "নিশীথে", "ক্ষুধিত পাষাণ" "মণিহারা", "সম্পত্তি সমর্পণ", "কঙ্কাল", "গুপ্তধন" "মাষ্টারমশাই" ইত্যাদি। এবারে আমরা গল্পগুলি সম্পর্কে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করব।

"নিশীথে" গল্পের নামের মধ্যে দিয়েই এর বিষয়বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের লেখা এটিই প্রথম গল্প যেখানে তিনি অতিপ্রাকৃত শিহরণ সৃষ্টি করেছেন। রাত্রির অন্ধকারে দক্ষিণাচরণবাবু কেমন এক অজানা আশঙ্কায় ভীতি-বিহুল হয়ে পড়েন -তার বিবরণ আছে গল্পটিতে। রবীন্দ্রসাহিত্যে অতিপ্রাকৃত আবহাওয়া সৃষ্টির দিক থেকে গল্পটি স্মরণীয়।

"ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পটিতে প্রাকৃত জীবনের ওপর অতিপ্রাকৃত ভূমিকা রচিত হয়েছে। গল্পের মধ্যে টুকরো টুকরো স্বপ্নের আবেগময় ঘটনাগুলিতে শিহরণ জাগে। অতিপ্রাকৃত পরিবেশের মধ্যে বাদশাহী যুগের সব ঐশ্বর্যের দীপ্তি, রাজকীয় আড়ম্বরের কেন্দ্রস্থ অবক্ত ক্রন্দন ও বহুযুগসঞ্চিত ক্ষুব্ধ দীর্ঘশ্বাসের সম্মিলিত ইঙ্গিত। গল্পটি বলা হয়েছে স্টেশনের বিশ্রামাগারে ট্রেন প্রতীক্ষার অবসরে। তাই গল্পটির হঠাৎ সমাপ্তিতে কোনো অসম্ভাব্যতা দেখা দেয়নি।

"মণিহারা" গল্পটিতে অতিপ্রাকৃত পরিবেশ পরিপূর্ণ ভাবে উদ্ভাসিত হয়েছে। সদ্য পত্নী বিয়োগে কাতর স্বামীর মনোবিকারের কাহিনী এখানে আছে। যিনি এর বর্ণনাকারী তাঁর চোখে স্বপ্নের কোনো মোহজাল নেই। পক্ষান্তরে আছে তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ শক্তি। গল্পের পরিণতিতে আছে বাস্তব সত্যের প্রাধান্য।

সংশয়, সন্দেহ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে গল্পের সমাপ্তি। গল্পশেষে পাঠকের মনে হবে আমি কি এতক্ষণ কোনো স্বপ্ন দেখছিলাম।

"সম্পত্তি সমর্পণ" গল্পটি আমাদের দেশের একটি সংস্কারের উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো শিশুকে যদি কোনো কোষাগারের মধ্যে হত্যা করা হয় তাহলে সে যক্ষ হয়ে সেই ধন পাহারা দেয় -এই বিশ্বাসে এক বৃদ্ধ একটি শিশুকে অন্ধকার কক্ষে শ্বাস রুদ্ধ করে মারে - এ পর্যন্ত গল্পটি ভয়াবহ। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধের অনুতাপের মধ্যে দিয়ে গল্পটি শেষ হয়েছে।

"কঙ্কাল" গল্পটির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা ভুতুড়েপানার অনুভব ছড়িয়ে আছে। গল্প বর্ণিত চরিত্রের অপরূপ যুবতীর কণ্ঠে তার পূর্বপ্রণয়ের কাহিনী আবেগ ও উত্তাপের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

"গুপ্তধন" গল্পের মধ্যেও ভয়াবহ আবহাওয়া ও রহস্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যে এক শ্রেণীর অতিপ্রাকৃত গল্প আছে, যেখানে ভৌতিক অস্তিত্ব স্বীকার করেও যেমন অতিপ্রাকৃত রস আস্বাদন করা যায়, তেমনি ভৌতিক অস্তিত্বকে অস্বীকার করেও অপূর্ব রোমাঞ্চকর রস অনুভব করা যায়, "মাস্টারমশায়" সেরকমই একটি গল্প। গল্পটির 'ভূমিকা' অংশটিতেই অতিপ্রাকৃত ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

প্রমথ চৌধুরী কতকগুলি অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ অতিপ্রাকৃত গল্প "আহুতি"। গল্পটিতে কোথাও ভৌতিক ক্রিয়াকলাপ চোখে পড়ে না, ভূতের উপস্থিতিও নেই। তবে একটা করুণ কাতর ধ্বনি ও নির্মম অট্টহাস্যের কথা গল্পে বলা হয়েছে, তা আপাতদৃষ্টিতে ভৌতিক বলে মনে হলেও, সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে তা আসলে 'ঊনপঞ্চাশ বায়ু' সৃষ্ট শব্দ।

রবীন্দ্রনাথের সমকালে অনেকগুলো অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছিলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি পড়লে বোঝা যায় গল্পের কোথাও তিনি ভাষার ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে পাঠকের কাছে এই অত্যাশ্চর্য কাহিনীগুলি বিশ্বাসযোগ্য করে পরিবেশন করেননি। তাঁর এই জাতীয় প্রথম গল্প "তারানাথ তান্ত্রিকের গল্প"। সমস্ত গল্পটির মধ্যেই যোগিনীর অত্যাশ্চর্য ও অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখা যাচ্ছে। তাঁর এই জাতীয় আরো কয়েকটি গল্প হ'ল "বিরজা হোম ও তার বাবা", "বাঘের মন্ত্র", "মায়া", "কবিরাজের বিপদ" ইত্যাদি। তাঁর "রঙ্কিনী দেবীর খড়গ" গল্পটি বাস্তবাশ্রিত। এছাড়া তাঁর "পেয়ালা", "মেডেল", "ভৌতিক পালঙ্ক", "খুঁটি দেবতা", "নুটিমন্তর" ইত্যাদি গল্পেও অতিপ্রাকৃতের ছোঁয়া পাওয়া যায়। তাঁর "রহস্য" গল্পটিতে পরিত্যক্ত বাগানবাড়ির বেদিকার শুভ্র মর্মর অপ্সরী মূর্তিগুলির ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় পুকুরের জলে জীবন্তের মত জলকেলি করার ঘটনাকে অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। "অভিশপ্ত" গল্পটিতে অতীত যুগের বারভুঁইয়াদের একটি বিস্মৃত অধ্যায় অতিপ্রাকৃতরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। "হাসি" গল্পে সুন্দরবনের কোনো এক জনপদের ধ্বংসস্তূপের চারিদিকে কোনো এক অভিশপ্ত অশীরীরী আত্মার পৈশাচিক হাসি বর্ণিত হয়েছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিপ্রাকৃত কাহিনীগুলি ভিন্ন ধরণের। তাঁর অধিকাংশ অতিপ্রাকৃত গল্প সংস্কার, জনশ্রুতি ও কিংবদন্তীকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। তান্ত্রিক সাধনার বলে মানুষ অলৌকিক শক্তি আয়ত্ত করতে পারে - এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে তিনি "ছলনাময়ী" গল্পটির রচনা করেন।

কোজাগরী পূর্ণিমায় লক্ষ্মীকে বন্দিনী করা যায়, অতীত দিনের এই সংস্কার ও জনশ্রুতি নিয়ে "বন্দিনী কমলা" গল্পটি রচিত হয়েছে। "আখড়াইয়ের দীঘি" গল্পটি প্রচলিত কিংবদন্তী নিয়ে গড়ে উঠেছে। "ডাইনী" গল্পের পটভূমি গড়ে উঠেছে বীরভূমের রৌদ্রদগ্ধ ছাতিফাটার মাঠকে কেন্দ্র করে।

এই সময়কার লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব বেশি অতিপ্রাকৃত গল্প না লিখলেও তাঁর "হলুদপোড়া" গল্পটি অতিপ্রকৃত গল্প হিসাবে অসামান্য। প্রেতাত্মা, ঝাড়ফুঁক, তন্ত্রমন্ত্র দ্বারা লেখক এমন এক অশরীরী জগৎ সৃষ্টি করেছেন, তাতে পাঠকের মনে ভয়ের সঞ্চার হয়।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে যে সমস্ত গল্পকার অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিপ্রাকৃতের সবরকম আঙ্গিক নিয়েই তিনি ছোটগল্প রচনা করেছেন, তাঁর প্রথম অতিপ্রাকৃত গল্প "প্রেতপুরী" তিনি ষোল বছর বয়সে রচনা করেছিলেন।

তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়-(১) সত্যিকারের ভূতের গল্প। যেমন-'যাত্রী', 'কামিনী', 'ছোটকর্তা', 'মধুমালতী', 'বহুরুপী' ইত্যাদি। (২) ভূতহীন ভূতের গল্প- এজাতীয় গল্পে ভ্রম ও বিভ্রমের দ্বারা এক অবয়বহীন আতঙ্কের জগৎ গড়ে তোলা হয়েছে। যেমন- 'কালোমোরগ', 'অশরীরী', 'পিছু পিছু চলে', (৩) জন্মান্তর বা জাতিস্মর বিষয়ক অতিপ্রাকৃত গল্প। যেমন-'রক্তসন্ধ্যা', 'দেখা হবে', 'প্রত্নকেতকী', 'জাতিস্মর', 'মায়াকুরঙ্গী', 'দেহান্তর' ইত্যাদি। তাঁর অন্যান্য অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি হ'ল - "রক্ত খদ্যোত", "টিকটিকির ডিম", "অন্ধকারে", "মরণ ভোমরা", "সবুজ চশমা", "প্রতিধ্বনি", "পঞ্চভূত", "আকাশবাণী", "ধীরেন ঘোষের বিবাহ", "দেহান্তর", "ভূত ভবিষ্যৎ", "নিরুত্তর", "গুহা", "শূন্য শুধু শূন্য নয়", "চিরঞ্জীব", "সতী", "নীলকর", "নখদর্পণ", "মালকোষ", "ফকির বাবা", "মরণ দোল" ইত্যাদি। তাঁর অধিকাংশ ভূতের গল্পের বক্তা হোল বরদা। সে বিহারপ্রবাসী, আড্ডাপ্রিয়। মিশুকে এই মানুষটি অতিপ্রাকৃত সম্বন্ধে নানা গল্প তার বন্ধুদের শুনিয়েছে।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি পড়লে বোঝা যাবে যে বিষয়বস্তু, উপস্থাপনা, চরিত্র-কল্পনা, সবদিক দিয়েই গল্পগুলি খুবই আকর্ষণীয় হয়েছে। অতিপ্রাকৃত কাহিনী রচনার ব্যাপারে তাঁর স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আমরা চলে আসি বনফুলের অতিপ্রাকৃত গল্পের আলোচনায়। তিনিও বিচিত্র বিষয় নিয়ে অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছেন। তাঁর এই জাতীয় গল্পগুলি হ'ল "অবর্তমান", "শেষ কিস্তি", "ছাত্র", "জবরদখল", "জাগ্রত দেবতা", "পালানো যায় না", "মায়া", "কেন" ইত্যাদি।

বনফুলের "পালানো যায় না" গল্পটি একটি উৎকৃষ্ট অতিপ্রাকৃত গল্প। তাঁর "অবর্তমান গল্পটি বিশিষ্ট। একটি কাহিনীর মধ্যে আরেকটি, তারমধ্যে আরেকটি কাহিনী, এই তিনটে কাহিনী একসঙ্গে যুক্ত হয়ে গল্পটিকে আলাদা মর্যাদা দিয়েছে।

বনফুলের পর যে কয়েকজন অতিপ্রাকৃত গল্প লিখে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন প্রমথনাথ বিশী। তাঁর অধিকাংশ গল্পেই ভুতের অস্তিত্ব আছে। তাঁর এই জাতীয় গল্পগুলি হ'ল "খেলনা", "আয়না", "ফাঁসিগাছ", "নিশীথিনী", "বিনা টিকিটের যাত্রী", "সিন্দুক", "কালো

পাখি", "কপালকুণ্ডলার দেশে", "চিলা রায়ের গড়", "তান্ত্রিক", "অশরীরী", "স্বপ্নাদ্য কাহিনী", "ভৌতিক চক্ষু", "পুরন্দরের পুঁথি", "দ্বিতীয় পক্ষ", "গোস্পদ" ইত্যাদি।

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছু অতিপ্রাকৃত গল্প আছে, যার বিষয়বস্তু ট্রেন দুর্ঘটনা, এবং তাকে অবলম্বন করে নানা অনৈসর্গিক ঘটনা। যেমন-যোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "গার্ড ভুত", সৌরেন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের "নরক একসপ্রেস", সুলতা করের "রাত্রির যাত্রী", মহাশ্বেতা দেবীর "গোলাপমঞ্জিলে একরাত্রি" ইত্যাদি।

৯৬.৭ সারাংশ - ২

সাহিত্যক্ষেত্রে অতিপ্রাকৃতের এক বিশেষ স্থান আছে। অতিপ্রাকৃত গল্প হ'ল সেইসব গল্প যাতে অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃত রস থাকে। যা কিছু স্বাভাবিক বা প্রাকৃত নয়, তাই অতিপ্রাকৃত।

রামায়ণ, মহাভারতের যুগ থেকে অতিপ্রাকৃত কাহিনী লেখায় স্থান পেয়ে থাকলেও বর্তমানে অতিপ্রাকৃত কাহিনীর সঙ্গে তার বিশেষ কোনো মিল নেই। তবে একথা ঠিক অতিপ্রাকৃত কাহিনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এর ভীতিরস।

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় কয়েকটি অতিপ্রাকৃত গল্প রচনা করেছিলেন। যেমন "কঙ্কাবতী", "মুক্তামালা", "পূজার ভূত", ইত্যাদি। তবে বাংলা সাহিত্যে সার্থক অতিপ্রাকৃত গল্প রচয়িতা হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর এইজাতীয় গল্পগুলি হ'ল "নিশীথে", "ক্ষুধিত পাষাণ", "সম্পত্তি সমর্পণ" "কঙ্কাল", "গুপ্তধন", "মাস্টারমশাই" ইত্যাদি। অতিপ্রাকৃত গল্প লেখকদের মধ্যে বিশিষ্ট বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য কতকগুলি অতিপ্রাকৃত গল্প লিখেছিলেন।

৯৬.৮ অনুশীলনী- ২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তর সংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) অতিপ্রাকৃত গল্প বলতে কি বোঝায়, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

(২) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

(৩) রবীন্দ্রোত্তর যুগে একজন শ্রেষ্ঠ গল্প লেখকের অতিপ্রাকৃত গল্প সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

(৪) শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

(ক) বাংলা সাহিত্যে সার্থক অতিপ্রাকৃত গল্প —— আগে পাওয়া যায় না।

(খ) —— গল্পের মধ্যেও ভয়াবহ আবহাওয়া ও রহস্যপূন্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে।

৫। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন ঃ

(ক) রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম অতিপ্রাকৃত গল্প— (১) নিশীথে (২) ক্ষুধিত পাষাণ (৩) মণিহারা

(খ) প্রমথ চৌধুরীর শ্রেষ্ঠ অতিপ্রাকৃত গল্প — (১) গুপ্তধন (২) আহুতি (৩) মায়া

(গ) "বন্দিনী কমলা" গল্পের রচয়িতা — (১) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (২) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (৩) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

৯৬.৯ মূলপাঠ- ৩ — উদ্ভট গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

Fantasy জাতীয় রচনাকে বাংলায় উদ্ভট রসের রচনা বলা যেতে পারে। সাধারণত এই শ্রেণীর গল্পে অসম্ভব কাহিনী বাস্তবতার সীমা অতিক্রমী রূপ লাভ করে। খেয়াল খুশির জগতের ঘটনাকে এই জাতীয় রচনায় দেখানো হলেও, মানব-জীবনের অসঙ্গতি দেখানোই এই জাতীয় রচনার মূল উদ্দেশ্য।

রূপকথা জাতীয় রচনা Fantasy-র পর্যায়ের হলেও, Fantasy-র সঙ্গে রূপকথার বড় পার্থক্য আছে। Fantasy-তে লেখকের কল্পনা বাস্তববর্জিত নয়, কিন্তু রূপকথা জাতীয় রচনা প্রায় বাস্তববর্জিত।

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় সর্বপ্রথম উদ্ভট জাতীয় গল্প রচনা করেন। ত্রৈলোক্যনাথের কল্পলোকের আকাশ "আবোল তাবোল,"-এর আকাশ, fantasy-র আকাশ। তবে তাঁর সাহিত্যলোকের আকাশ উদ্ভট কল্পনার হলেও, ভূমি সামাজিক। তাঁর উদ্ভট জাতীয় রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, গল্পগুলিকে কোথাও তিনি দ্বিধা সংশায়িত করেননি। ভূত, প্রেত, যক্ষ, পিশাচ, জীন, পরী প্রভৃতি অলৌকিক জীবের কল্পনায় তাঁর মন কানায় কানায় পূর্ণ ছিল ও তিনি যে কোনও উপলক্ষ্যে বাস্তব ঘটনার সঙ্গে এদের যুক্ত করে দিয়েছেন। তাঁর গল্পের ভূত ঠিক ভূতের মতোই ব্যবহার করে, এমনকি মানুষের সংস্পর্শে এলেও তাঁর ভৌতিক প্রকৃতি ক্ষুন্ন হয় না। তা ছাড়া বাঙালীর সাধারণ জীবনযাত্রা ও বিশ্বাসের সঙ্গে এই ভৌতিক আবির্ভাবের একটা সহজ মিল আছে। সময় সময় এর পেছনে বাঙালী সমাজের কুসংস্কার ও উদ্ভট ভাবকল্পনার বিরুদ্ধে একটা তীক্ষ্ম ব্যঙ্গ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের এই জাতীয় রচনা হ'ল - "কঙ্কাবতী", "মুক্তমালা", "ডমরুচরিত" ইত্যাদি। ত্রৈলোক্যনাথের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ সৃষ্টি ডমরুধর চরিত্র। ডমরুধর ত্রৈলোক্যনাথের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতীক। অর্থাৎ তাঁর উদ্ভট কল্পনা ও সামাজিক ব্যাঙ্গের মূর্তিমান বিগ্রহ। উদ্ভট গল্পের মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের অপূর্ব বিকাশ হয়েছে। অসম্ভব-কল্পনা-প্রসূত-কাহিনীর মুকুরে ডমরু-চরিত্র তার সমস্ত বীভৎসতা, আত্মপ্রসাদ, কূটবুদ্ধি ও ভক্তি অভিনয় নিয়ে আশ্চর্য সুসঙ্গাতির সঙ্গে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পৃথিবীর ব্যঙ্গাসাহিত্যে ডমরুধর এক অবস্মরণীয় চরিত্র।

ত্রৈলোক্যনাথের পরে আমরা চলে আসি রাজশেখর বসু ওরফে পরশুরামের উদ্ভট গল্পের আলোচনায়। রাজশেখর বসুর "ভূশণ্ডীর মাঠে" উদ্ভট কল্পনার এক পূর্ণ সফলতার নিদর্শন। এক মর-জীবনের দুই স্ত্রী-

পুরুষের জীবনে পূর্বজীবনের স্বামী ও স্ত্রীদের দাবির সম্মিলনে যে ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, তা উদ্ভট এবং হাস্যকর। সমসাময়িক বাস্তবজীবনের জটিলতার ওপরে এক জীবনের প্রচ্ছদ টেনে নিয়ে শিল্পী তারই গায়ে উদ্ভট কল্পনার হাসির তুলি বুলিয়েছেন।

"লম্বকর্ণ" গল্পটিতেও কিছুটা উদ্ভটত্বের আভাস পাওয়া যায় একটি ছাগলকে কেন্দ্র করে গল্পটি আবর্তিত হয়েছে। "দক্ষিণ রায়" গল্পটির শেষ সম্পূর্ণ লোককাহিনী নির্ভর এক দেবতার সক্রিয়তার সূত্র ধরে fantasy-তে। "স্বয়ংবরা" গল্পটি অতিরিক্ত প্রহসনের জন্য রসিকতার মর্যাদা হারিয়ে উদ্ভট খেয়াল বাস্তবতাকে অগ্রাহ্য করে কল্পনারাজ্যে উধাও হয়েছে। এছাড়া তাঁর "পরশপাথর" গল্পটিও fantasy-র পর্যায়ে পড়ে। "হনুমানের স্বপ্ন" গল্পটির মধ্যেও উদ্ভটত্বের ছোঁয়া পাওয়া যায়। গল্পগুলিতে লেখকের অসামান্য উদ্ভাবনশক্তি, কল্পনা-প্রাচুর্যের অজস্রতা ও বিসদৃশের সমাবেশ কৌশলে হাস্যরস সৃষ্টির সাবলীল নিপুণতা লক্ষ্য করা যায়।

পরবর্তী লেখক কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যদিও fantasy জাতীয় গল্পে তাঁর কৃতিত্ব বেশী খোলে নি। তাঁর এই জাতীয় শ্রেষ্ঠ গল্প হ'ল "ভগবতীর পলায়ন"। এছাড়া "পঞ্জিকা-পঞ্চায়েৎ", "পূজার প্রসাদ", "মুক্তি", "সুবুদ্ধি" ইত্যাদি গল্পেও উদ্ভটত্বের আভাস পাওয়া যায়।

এছাড়া শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকটি উদ্ভট রসের গল্প রচনা করেছিলেন। যেমন-"সবুজ চশমা"। গল্পটিতে প্রেতলোকের সমস্ত দৃশ্যই সবুজ চশমার মধ্যে দেখতে পাওয়ার ঘটনা fantasy মূলক। "মায়াকুরঙ্গী" গল্প সংগ্রহে প্রায় সব কটিই ভৌতিক কাহিনীর সমষ্টি। এতে লেখকের ভূত কল্পনা সর্বগ্রাসীরূপে দেখা দিয়েছে। এছাড়া "শূন্য শুধু শূন্য নয়" গল্পটিও উদ্ভট রসের। গল্পটি আজগুবি ভৌতিক কল্পনার চরম সীমা স্পর্শ করেছে।

উপরিউক্ত গল্পগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ইচ্ছাপূরণ", অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গুরুজী" শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "চিরঞ্জীব", মণীন্দ্রলাল বসুর "ব্লাউস্" ইত্যাদি গল্পগুলিতে উদ্ভট রসের স্বাদ মেলে।

৯৬.১০ সারাংশ- ৩

বাংলায় যাকে উদ্ভট বলা হয়, ইংরেজিতে তা অনেকাংশে fantasy-র সমতুল্য। উদ্ভট গল্পে বাস্তবের জগতের উপরে অবাস্তব বা অসম্ভব জগতকে প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং মানবজীবনের অসঙ্গতি এই জাতীয় গল্পে দেখানো হয়।

বাংলা সাহিত্যে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রথম উদ্ভট রসের গল্প রচনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য উদ্ভট গল্প হ'ল "কঙ্কাবতী", "মুক্তমালা", "ডমরুচরিত" ইত্যাদি।

ত্রৈলোক্যনাথ ছাড়া রাজশেখর বসু, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখরা উল্লেখযোগ্য উদ্ভট গল্প রচনা করেছেন।

৯৬.১১ অনুশীলনী- ৩

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) উদ্ভট জাতীয় গল্প কাকে বলে আলোচনা করে, বাংলা সাহিত্যের একজন লেখকের উদ্ভট গল্প সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(২) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এবং রাজশেখর বসুর উদ্ভট গল্প সম্পর্কে আলোচনা করুন।
(৩) শূন্যস্থান পূরণ করুন।
(ক) পৃথিবীর ব্যঙ্গসাহিত্যে —— এক অবিস্মরণীয় চরিত্র।
(খ) —— উদ্ভট কল্পনার এক পূর্ণ সফলতার নিদর্শন।
৪। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।
(ক) "দক্ষিণ রায়" গল্পের লেখক— (১) রাজশেখর বসু
(২) ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়
(৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
(খ) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় রচনা করেছেন — (১) সবুজ চশমা
(২) লম্বকর্ণ
(৩) সুবুদ্ধি

৯৬.১২ মূলপাঠ- ৪ সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পের সংজ্ঞা ও বিকাশের ধারা

সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পে কাহিনী, পাত্রপাত্রী ও পরিবেশ ইত্যাদি তার বাচ্যার্থকে অতিক্রম করে অন্য কোনো অর্থকে ব্যঞ্জিত করে এবং ব্যঞ্জনার মাধুর্য্যই গল্পের মধ্যে প্রধান হয়ে ওঠে। গল্পের সঙ্গে বাস্তবতার যোগ প্রত্যক্ষ এবং সেই বাস্তব ভিত্তিভূমির উপরেই গল্প রচিত হয়।

বাংলা সাহিত্যে সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পের সংখ্যা খুবই কম। এই শ্রেণীর গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "গুপ্তধন", "তাসের দেশ"। এছাড়া শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের "মরু ও সংঘ" গল্পটিকেও আমরা সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্প বলতে পারি। এ কাহিনীতে মরুইপ্রকৃতির ও বালুকারাশির আগ্রাসী তৃষ্মার যে কল্প চিত্র আঁকা হয়েছে তা এককথায় অনবদ্য।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের "একটি রাত্রি" গল্পটি সাংকেতিকতার বিদ্যুৎ-ঝলকে উজ্জ্বল। কুয়াশাচ্ছন্ন রাত্রির মহানগরী যেমন নিজের, তেমনি মানুষেরও, এক নতুন, প্রাত্যহিকতার ছদ্মবেশমুক্ত পরিচয় উদঘাটিত করেছে। "মহানগর" গল্পটি সাংকেতিকতার সুষ্ঠু প্রয়োগে অপরূপ অর্থব্যঞ্জনায় ভরে উঠেছে। রাত্রির মেঘাচ্ছন্ন অন্ধকার ও ঊষার কুহেলি ঢাকা তরল যবনিকা মহানগরীর প্রান্তশায়িনী নদীর ওপর বিস্তৃত হয়ে তার চারপাশের দৃশ্য ও বক্ষপ্রসারিত অগণিত নৌযানের জটিল বিশৃঙ্খল সমাবেশের মধ্যে এক অতলস্পর্শ রহস্যের ইঙ্গিত সঞ্চারিত করেছে।

সুবোধ ঘোষের "অলীক" গল্পটির মধ্যেও সাংকেতিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। গল্পটির প্রধান বৈশিষ্ট্য মানব চিত্রাঙ্কণে সাংকেতিকতার সার্থক প্রয়োগ। সাংকেতিক নির্দেশই গল্পটিকে বাস্তবের গ্লানি বীভৎসতা থেকে এক রূপকরাজ্যে উন্নীত করেছে।

এগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "তোতা কাহিনী"র সংকেত আগাগোড়াই বুদ্ধিগ্রাহ্য স্পষ্ট রূপগর্ভ। "ঘোড়া", "কর্তার ভূত"-ও প্রতীক ধর্মীর রচনা।

৯৬.১৩ সারাংশ- ৪

সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পে কাহিনী, পাত্রপাত্রী ও পরিবেশ অন্য কোনো অর্থের ব্যঞ্জনাবাহী।

অবশ্য তাতে বাস্তবজীবনের ওপর দাঁড়িয়ে থাকা কোনো কল্পনারই ছবি ফুটে ওঠে।

বাংলাসাহিত্যে এই জাতীয় গল্পের সংখ্যা খুবই কম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র এই জাতীয় কয়েকটি গল্প লিখেছেন।

৯৬.১৪ অনুশীলনী- ৪

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরসংকেতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

(১) সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্প কাকে বলে উল্লেখ করে, বাংলাসাহিত্যের কয়েকটি সাংকেতিক ও প্রতীকধর্মী গল্পের নাম করুন।

(২) শূন্যস্থান পূরণ করুন।

(ক) আর —— হ'ল —— পরিচয় দেয়, এমন কোন ————।

(খ) প্রেমেন্দ্র মিত্রের ———— গল্পটি সাংকেতিকতার বিদ্যুৎ ঝলকে উজ্জ্বল।

৩। সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) "মরু ও সংঘ" গল্পের রচয়িতা — (১) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (২) সুবোধ ঘোষ (৩) প্রেমেন্দ্র মিত্র

(খ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা করেছিলেন — (১) অলীক (২) কর্তার ভূত (৩) মহানগর

৯৬.১৫ উত্তরমালা

অনুশীলনী - ১

১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১ -এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৩। (ক) নবীন
(খ) সাময়িক, ছোটগল্পের।
(গ) মধুমতী, প্রথম, ছোটগল্প।

৪। (ক) ১৮১৯
(খ) ১২৮০

অনুশীলনী - ২

১-৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ-২ এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৪। (ক) রবীন্দ্রনাথের
(খ) গুপ্তধন
৫। (ক) নিশীথে
(খ) আহুতি
(গ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

অনুশীলনী - ৩

১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূল পাঠ ৩ -এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৩। (ক) ডমরুধর
(খ) ভুশণ্ডীর মাঠে
৪। (ক) রাজশেখর বসু
(খ) সবুজ চশমা

অনুশীলনী - ৪

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ৪-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

২। (ক) প্রতীক, বাস্তবজীবনেরই, কল্পনা
(খ) একটি রাত্রি
৩। (ক) শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
(খ) কর্তার ভূত

৯৬.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। শিশিরকুমার দাশ — বাংলা ছোটগল্প।

২। ভুদেব চৌধুরী — বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার।

৩। অমল কুমার ঘোষ — বাংলা সাহিত্যে অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত।

৪। শুদ্ধসত্ত্ব বসু — বাংলা সাহিত্যের নানারুপ।

৫। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বঙ্গাসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।